বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ

আবু সাইয়িদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ

আবু সাইয়িদ

বাংলা একাডেমি ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ
প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪২১/জুন ২০১৪

বা/এ : ৫২২৫
[অর্থবছর ২০১৩-২০১৪ গসঅবি : গবেষণা ৯]

মুদ্রণ সংখ্যা : ৫০০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
গবেষণা উপবিভাগ

প্রকাশক
শামসুজ্জামান খান
মহাপরিচালক
বাংলা একাডেমি ঢাকা

মুদ্রক
সমীর কুমার সরকার
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমি প্রেস ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
পাঁচশত টাকা মাত্র

BANGLADESHER SWADHINATA : KUTNOITIK JUDDHA by Abu Sayeed Published by Shamsuzzaman Khan, Director General Bangla Academy Dhaka 1000, Bangladesh. First Published : June 2014. Price 500.00 Taka Only.

ISBN 984-07-5234-0

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উ ৎ স র্গ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

'বাংলাদেশের স্বাধীনতা : কূটনৈতিক যুদ্ধ' শীর্ষক পিএইচডি অভিসন্দর্ভটি মুক্তিযুদ্ধের একটি জটিল ও অন্যতম প্রধান অধ্যায়। এই গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় নিয়ে গবেষণা কর্মের তথ্য-উপাত্ত, গোপন দলিল এবং আন্তরাষ্ট্রিক কূটনৈতিক যোগাযোগ সম্পর্কে খুব বড় একটি কাজ হয়েছে বলে প্রতিয়মান হয় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমগ্র পৃথিবীতে রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে যে আলোড়ন, উৎকণ্ঠা ও কৌশলগত পরিবর্তন এনেছিল যেকোনো গবেষকের নিকটই তা কৌতূহল ও আকর্ষণের বিষয়। ১৯৭১ সালে রণাঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার সময় হতেই আমার মনে বিশ্ব রাজনীতি ও কূটনৈতিক গতিধারার প্রতিনিয়ত কার্যকরণগত বিষয়সমূহ যে প্রশ্নের উদ্রেক করেছে, পরবর্তী বছরগুলোতে তার যথার্থ উত্তর খুঁজতে গিয়েই এ সম্পর্কিত অন্বেষা। প্রাথমিক পর্যায়ে বিক্ষিপ্ত ভাবনায় যে অনুসন্ধিৎসা তার প্রণালীবদ্ধ ও পদ্ধতিগত দিক সম্পূর্ণভাবেই অনুপস্থিত থেকেছে; যদিও এ সম্পর্কে পড়াশুনা, লেখালেখি অব্যাহত ছিল।

কালিক পরিক্রমায় উপযুক্ত এই সময়ে নিরবিচ্ছিন্নভাবে কাজ করার সুযোগ উন্মুক্ত হওয়ার ফলে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধীনে বর্তমান অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আগ্রহী হয়ে উঠি। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের গর্বিত আনুকূল্য আমাকে অভিসন্দর্ভটি নিয়ে কাজ করার উৎসাহ যোগায়। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চেন্সেলর ড. আবদুস সোবহান-এর সঙ্গে যোগাযোগ হলে তিনি আমাকে উৎসাহিত করেন। এই গবেষণা কর্মের সার্বক্ষণিক তত্ত্বাবধানে ড. মো. মাহবুবর রহমানের ঐকান্তিক আগ্রহ, প্রচেষ্টা, নির্দেশনা এবং নিরলস তাগিদ আমাকে দায়বদ্ধ করে রেখেছে। তার সুচিন্তিত দিক- নির্দেশনা, পরামর্শ ও গুণগত মান বৃদ্ধিতে যে সকল অভিজ্ঞান যুক্ত করেছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ ও ঋণী। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী বিভিন্ন সময় ব্যক্তিগতভাবে ও সেমিনারে যে সমস্ত পরামর্শ দিয়েছেন তার জন্য কৃতজ্ঞ।

স্বাধীনতার পূর্বে এবং পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুখ থেকে শ্রুত স্বাধীনতার পরিকল্পনা, ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক এবং সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকল্প আজও চিরসজীব। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ '৭১-এর সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে সোভিয়েত-ভারত চুক্তি সম্পর্কে রণাঙ্গনের ক্যাম্প সংগঠকদের কলকাতায় তাৎপর্যপূর্ণ অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন যা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে একটি টার্নিং পয়েন্ট হিসেবে উল্লেখিত থাকবে। মুজিবনগর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের মন্ত্রী এম. মনসুর আলী সরকার গঠনের জটিলতা সম্পর্কে যে আলোচনা করেছিলেন তা ইতিহাসের অঙ্গীভূত। ঐ সরকারের অন্যতম মন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান কুরমাইল ক্যাম্পে গিয়ে রাজনৈতিক সমাধানের যে শর্তাদি উল্লেখ করেছিলেন তাও ইতিহাস অন্তর্গত। যুদ্ধকালীন সময়ে জেনারেল অরোরা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে জনযুদ্ধ হিসেবে তুলে ধরেছিলেন তা যথার্থই সঠিক বলে এখনও আমার নিকট প্রতিয়মান। একইসাথে মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারতের কম্যুনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও আন্তর্জাতিক রাজনীতি সম্পর্কে কুরমাইল প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে যে বক্তব্য দিয়েছিলেন তা আমার গবেষণা কর্মধারা নির্ণয়ে আজও জাগরুক আছে।

স্বাধীনতার পূর্বে তৎকালীন ছাত্রলীগ নেতা সিরাজুল আলম খান, প্রয়াত জননেতা আব্দুর রাজ্জাক ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্র-নির্ণয়ে স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠার অভীপ্সা ব্যক্ত করেছিলেন যার মাধ্যমে কূটনৈতিক কৌশলের একটি দিক সরাসরি উন্মোচিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে তোফায়েল আহমেদ বন্দি শেখ মুজিবের উপর সাক্ষাৎকার দিয়ে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করেছেন। দেশ স্বাধীন হওয়ার পরে ব্রিটেনে প্রথম হাই কমিশনার সৈয়দ আবদুস সুলতান ১৯৭৩ সালে লণ্ডনে মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের অবদান সম্পর্কে অনেক বিষয় আমাকে অবগত করেন। সে সময় যুক্তরাজ্যের আওয়ামী লীগ সভাপতি গৌস খান প্রবাসী বাঙালিদের অবদান সম্পর্কে আমাকে ওহাকিফহাল করেছিলেন। আমার সহকর্মী এম.পি প্রয়াত মোল্লা জালাল উদ্দিন আহমেদ যুক্তরাজ্যে পার্লামেন্ট পার্টির প্রতিনিধি হিসেবে যোগদান করলে মধ্যপ্রাচ্যে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে তার অভিজ্ঞতা সম্পর্কে জানতে পারি। ১৯৯৮ সালে লন্ডন গমন করলে মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন বিশ্ব রাজনীতি সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় সুলতান শরীফ আমাকে ঋদ্ধ করেন। এ সময় ব্রিটেনে বাংলাদেশের হাই কমিশনার জনাব মাহমুদ আলী ও তার স্ত্রী শাহানা মাহমুদ মুক্তিযুদ্ধের সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কীভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে অবহিত করার জন্য তাদের ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ২০০০ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গমন করলে তৎকালীন এম্বেসেডর কে এম শিহাব উদ্দিন মুক্তিযুদ্ধের সময় দিল্লীতে কীভাবে কাজ করেছেন তার বিবরণ মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনেছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের এককালীন শিক্ষক এনায়েত রহিম মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা সম্পর্কে সাক্ষাৎকার দেন এবং গোপন দলিলপত্রের একাংশ আমার হাতে তুলে দিয়েছিলেন যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিদ্যমান। এ প্রসঙ্গে আরো উল্লেখ করতে হয়, তৎকালীন জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি আনোয়ারুল করিম চৌধুরী বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে তথ্যনিষ্ট ঘটনাবলি বর্ণনা করেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে কানাডা প্রবাসী মিজান রহমান আমার কন্যা আহুতা শাহীদের মাধ্যমে কানাডা প্রবাসী বাঙালিদের অবদান সম্পর্কে একটি লিখিত প্রতিবেদন প্রেরণ করেন যা ঐতিহাসিক মূল্যবান দলিল হিসেবে বিবেচিত হবে। তারজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে শহীদুজ্জামান ও নুরুল সগির অপ্রকাশিত গোপন দলিলাদি আমার বরাবর প্রেরণ করে কৃতজ্ঞতার পাশে আবদ্ধ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

[নয়]

মুজিবনগর সরকারের তথ্য উপদেষ্টা তৎকালীন এম.এন.এ আওয়ামী লীগ নেতা জনাব আব্দুল মান্নান, ব্যারিস্টার আমীর-উল ইসলাম, প্রফেসর রেহমান সোবহান, ড. এ আর মল্লিক, ড. মযহারুল ইসলাম এদের সান্নিধ্যে মুক্তিযুদ্ধের কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলি স্মৃতির ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। এ সবই এই অভিসন্দর্ভের উপজীব্য বিষয় হিসেবে অন্তর্ভুক্ত।

দেরী সময়ের দুঃসহ নিঃসঙ্গতায় গবেষণা কর্মের প্রাথমিক কার্যাদি সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে ড. মো. আব্দুল মজিদ ও এ.কে.এম. ফিরোজ যে সক্রিয় সহযোগিতা করেছেন তার জন্য তাঁদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

জাতীয় গ্রন্থাগার, ব্রিটিশ লাইব্রেরি, ইউএসএ লাইব্রেরি, ভারতীয় দূতাবাস লাইব্রেরি, সোভিয়েত তথ্যকেন্দ্রসহ পাবলিক লাইব্রেরি, এশিয়াটিক সোসাইটি লাইব্রেরি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি, বাংলা একাডেমিসহ হেরিটেজঃ বাংলাদেশের ইতিহাসের আর্কাইভস, কাজলা, রাজশাহী এবং বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, ঢাকা এর সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও ব্যক্তিবর্গ আমাকে সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। তাদের অকৃপণ আন্তরিকতা আমাকে মুগ্ধ করেছে। জাতিসংঘের তথ্য কেন্দ্র ঢাকা এবং ওআইসির প্রধান তথ্য কেন্দ্র, জেদ্দা, যথারীতি তথ্য প্রদান করেছেন তাদের ধন্যবাদ জানাই।

আমার বিদূষী মাতা গবেষণা কর্মটি সম্পন্ন দেখে যেতে পারেননি সে বেদনাবোধ আমার চিরদিনের। আমার এই গবেষণা কর্মটি কখনো যথাসময়ে সম্পন্ন করতে পারতাম না যদি দিলরুবা আঙ্গুরী সার্বিকভাবে সহযোগিতা না করতেন। কন্যা আহৃতা শাহীদ, পুত্র আলী নজির অনিন্দ্য ও অনিম সাইয়িদ সুদূর প্রবাসে বসেও অহর্নিশ উৎসাহ ও কর্ম-উদ্যোগী প্রেরণা দিয়েছে এবং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে প্রার্থিত তথ্য সরবরাহ করেছে। আহৃতা প্রদত্ত বইপত্র উপযোগিতায় এসেছে। তাদের জন্য শুভাশীষ। অভিসন্দর্ভটি রচনায় লন্ডন থেকে মূল্যবান বই সরবরাহ করেছেন ড. আলী আজগর ও ব্যারিস্টার প্রশান্ত কুমার বড়ুয়া, এবং ধানমন্ডি থানা আওয়ামী লীগের সভাপতি কামাল আহমেদ। কাগজপত্র সুবিন্যাস্ত করার ক্ষেত্রে সহযোগিতা করেছেন জীবন কুমার দত্ত এবং কম্পিউটার বর্ণ বিন্যাসে শ্রম দিয়েছেন রবিন, জুয়েল ও আরিফুল। বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক শামসুজ্জামান খান গ্রন্থটি প্রকাশের ক্ষেত্রে যে আন্তরিকতা দেখিয়েছেন এজন্য তাঁকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আরও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি গবেষণা উপবিভাগের উপপরিচালক আমিনুর রহমান সুলতানকে।

আবু সাইয়িদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়
ভূমিকা ১৩-৫০

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রম ৫১-১১৪

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা ১১৫-২০২

চতুর্থ অধ্যায়
বন্দী শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে বিশ্ব কূটনীতি ২০৩-২৫৬

পঞ্চম অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা ২৫৭-৩৫৪

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা ৩৫৫-৪০০

সপ্তম অধ্যায়
জাতিসংঘে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কূটনৈতিক তৎপরতা ৪০১-৪৬৬

অষ্টম অধ্যায়
বাংলাদেশের স্বাধীনতা : চতুর্ভূজ কূটনীতি ৪৬৭-৫৬০

নবম অধ্যায়
উপসংহার ৫৬১-৫৭৬
গ্রন্থপঞ্জি ৫৭৭-৫৯০
শব্দসূচি ৫৯১-৬২৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

ইতিহাসসচেতন বিশিষ্ট ব্যক্তি, গবেষক এবং বুদ্ধিজীবীদের নিকট সহজেই প্রতীয়মান হবে যে, বহু বিচিত্র জটিল আবর্তের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। সামরিক যুদ্ধে বিজয় লাভের পূর্বশর্ত হিসেবে কূটনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ী না হতে পারলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা মাত্র নয় মাসে অর্জিত হতো কিনা সন্দেহ। এই গ্রন্থে নিরপেক্ষভাবে এই বিশাল ও জটিল প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে বিভিন্ন অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে। একটি স্বাধীন, সার্বভৌম ও জাতিসংঘ স্বীকৃত এবং পরাশক্তি সমর্থিত রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যে পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠন সহজসাধ্য নয়, বলতে গেলে দুরূহ ব্যাপার। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার ভেতরে কী নিদারুণ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বৈরী অবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটেছে তা যেমন বিস্ময়কর, তেমনি ঐক্যবদ্ধ জনশক্তির আকাঙ্ক্ষা যে অপ্রতিরোধ্য তা প্রমাণিত হয়েছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহুমাত্রিক চক্রান্ত এবং ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে বাংলাদেশ নামে একটি জাতিরাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ইতিহাসে গবেষণার গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে সশস্ত্র-যুদ্ধের পাশাপাশি কূটনৈতিক তৎপরতা এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল যা কূটনৈতিক যুদ্ধের বিশ্বরূপ পরিগ্রহ করে। সম্প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলপত্র যা পঁচিশ বছর পর সাধারণ্যে ছাড় করা হয়েছে, সে সব গোপন তথ্য, ঘটনা, কৌশল, চাতুর্যপূর্ণ কূটনৈতিক তৎপরতার নির্মোহ পর্যালোচনায় দেখা যাবে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা শুধু সামরিক যুদ্ধের বিজয় নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে এক গভীর, জটিল এবং নিরবচ্ছিন্ন কূটনৈতিক যুদ্ধ। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে কূটনৈতিক যুদ্ধের বিজয় এক অপরিহার্য ভূমিকা পালন করেছে যার বিস্তৃত ও গভীরতর পর্যালোচনা আজো অসম্পূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা কূটনৈতিক যুদ্ধ বিজয়ের সম্পূরক। বৈশ্বিক পরিসরে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কীভাবে কূটনৈতিক যুদ্ধে পর্যবসিত হয়েছিল তা পর্যালোচনা ও গবেষণা করতে গেলে সেই সময়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট কৌশলগত কূটনৈতিক দিকসমূহ বিশ্লেষণ জরুরি। পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ, আন্তর্জাতিক এবং কূটনৈতিক সম্পর্ক এবং সেই প্রেক্ষাপটে বিভিন্ন রাষ্ট্র বিশেষকরে পরাশক্তি-রাষ্ট্রগুলোর ভূমিকা, পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতা, দায়বদ্ধতা, নিরাপত্তা ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতার কারণে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কূটনৈতিক যুদ্ধ গুরুত্বপূর্ণ ও নিয়ামক ভূমিকার প্রতিপাদ্য বিষয় হয়ে দাঁড়ায়।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির ক্ষেত্রে কূটনীতির ব্যবহার রাষ্ট্র ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত এবং এ সম্পর্ক জাতীয় বা রাষ্ট্রীয় স্বার্থ পূরণ, সংহতকরণ কিংবা জাতীয় উন্নয়ন ও নিরাপত্তার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। এই লক্ষ্যে কূটনীতিকে একটি বহুমাত্রিক কৌশল হিসেবে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এই কৌশল প্রয়োগের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুকূলে কিংবা ভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে মিত্রতা, বৈরীতা, আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন যা কখনও কখনও পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণের পর্যায়ে চলে আসে। অনেক ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণ সমুন্নত রাখার পাশাপাশি আদর্শগত বা তত্ত্বগত মূল্যবোধও ব্যবহৃত হয় কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দক্ষিণ এশিয়ার বিরাজমান সংকট হচ্ছে এ অঞ্চলে দু'টি দেশ ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে জন্মগত বিরোধ, বিভেদ, পারস্পরিক অবিশ্বাস ও আদর্শিক দ্বন্দ্ব যার ফলে উপমহাদেশে নিরবিচ্ছিন্ন উত্তেজনা এবং আঞ্চলিক বা বিশ্বব্যাপী ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়ার বিস্তৃতি লক্ষ্যণীয়।[১]

এই প্রেক্ষাপট সামনে রেখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কূটনৈতিক অবস্থান কীভাবে আবর্তিত, পরিবর্তিত বা কৌশলগত মোড় নিয়েছে তা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন, যা বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সঙ্গে সম্পর্কিত।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চের রাতে পাকিস্তানের সামরিক সরকার পূর্ব পাকিস্তানে নৃশংস সামরিক অভিযান (Operation Searchlight) পরিচালনা করে। এ ঘটনায় বিশ্বের তিনটি প্রধান শক্তি প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশ সংকটে জড়িয়ে পড়ে।[২] এমন নয় যে, বিশ্বের নীতিনির্ধারক শক্তিগুলি বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। সংকট সৃষ্টির প্রথম থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ঘটনাপ্রবাহের প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখে। বাংলাদেশ যে অনিবার্যভাবে স্বাধীনতার দিকে ধাবিত হচ্ছে পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের বক্তব্যে তা প্রতীয়মান। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে 'ন্যায্য তথ্য সংগ্রহ কার্যক্রমের' উপর বিধি-নিষেধ আরোপের কারণেও উদ্বেগ ব্যক্ত হয়। স্বাভাবিক কারণে আগ্রাসনের শিকার পূর্ব পাকিস্তানের বিক্ষুব্ধ ও আন্দোলনরত জনগণের জন্য জনগণের যথেষ্ট সহানুভূতি পরিলক্ষিত হলেও নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের পক্ষে থাকে। পাশাপাশি মানবিক কারণে পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিতাড়িত ও ভারতীয় শরণার্থী শিবিরে আশ্রিত লক্ষ লক্ষ বাংলাদেশীর জন্য মার্কিন খাদ্যসাহায্যে মার্কিন জনগণের সহানুভূতি প্রকাশ পায়। পক্ষান্তরে বেইজিং-এর প্রতিক্রিয়া ছিল কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির, যদিও তা ছিল কম্যুনিস্ট কূটনীতির চিরাচরিত ভাবধারার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। কার্যত, বেইজিং সরকার বাংলাদেশ সংকটকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট হিসেবে বিবেচনা করে, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে স্পষ্টভাবে বিঘোষিত নীতির পরিপূরক হিসেবে ভারতকে প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদান করে। বাংলাদেশের সংকটকালে দক্ষিণ এশীয় দেশসমূহের নীতি নির্ধারণে বিশ্বের বৃহৎ শক্তিবর্গ যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে; কিন্তু কিছু গবেষক ও বিশ্লেষক এসব শক্তির প্রতিপত্তিকে পাশ কাটাতে চায় বা অতিরঞ্জিত করে দেখাতে প্রয়াসী হয়।[৩] তারা যুক্তরাষ্ট্রকে বাঙালির আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি অবজ্ঞার ভাব প্রদর্শন করে পাকিস্তানি নৃশংস সামরিক জান্তার প্রতি অব্যাহত সমর্থন প্রদানের দায়ে দোষী সাব্যস্তকে কঠিন বলে মনে করেন না। তেমনি 'নীতিবিবর্জিত' ও পাকিস্তানপন্থি অবস্থান গ্রহণের দায়ে চীনের বাংলাদেশ বিরোধী ভূমিকাকে নানাভাবে বিশ্লেষণে তৎপর।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পরিপ্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠতে পারে, বৃহৎ শক্তিবর্গ ইচ্ছা করলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে রোধ করতে বা সহায়ক ভূমিকা পালন করে দ্বন্দ্বের শান্তিপূর্ণ সমাধান বিধানে সক্ষম হতো কিনা? কিন্তু এ ধরনের দায়িত্ব সম্পাদন করার সাধ্য বা সদিচ্ছা কি তাদের ছিল? ১৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে আপাত জিজ্ঞাসার আড়ালে প্রশ্ন উত্থাপন করেন বাংলাদেশের বিষয়টি শেখ মুজিবের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার চেয়ে একটি যুদ্ধের দিকে ঠেলে দেওয়া কি অধিক ধ্বংসাত্মক ছিল? অর্থাৎ একথা দ্বারা শ্রীমতী গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক দুরভিসন্ধিকে নগ্নভাবে তুলে ধরেছেন। পরাশক্তিবর্গ বিশ্বরাজনীতির শক্তিদ্বন্দ্বে মেরুকরণ প্রক্রিয়ায় এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছিল যা থেকে তাদের শান্তি কিংবা সহিংসতা অথবা রাজনৈতিক সমাধানের স্বাভাবিক অভিন্ন অভিলাষ বা কর্মপরিকল্পনা অনুপস্থিত ছিল। বাংলাদেশ সংকট শান্তিপূর্ণভাবে মীমাংসিত হলে তা হতো এক শক্তিজোটের জন্য স্বস্তির বিষয়, পক্ষান্তরে বিরোধী জোটের পাল্টা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির অবকাশ দৃশ্যমান হয়ে পড়ে। কোনো কোনো বিশ্লেষকের এ অভিমত অনুযায়ী, পাকিস্তানের ভাঙন ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় ছিল আন্তর্জাতিক শক্তি-রাজনীতির ফসল। এ ধরনের বক্তব্য প্রকৃতপক্ষে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ও মরণজয়ী ভূমিকাকে গৌণ করে দেখার অন্তরালে পাকিস্তানি সরকারের নৃশংসতা ও গণহত্যাকে চাপা দিয়ে বাঙালির আত্মত্যাগ ও তিতিক্ষার ইতিহাসকে লক্ষ লাশের স্তূপে ঢেকে দেওয়ার অর্বাচীন অপপ্রয়াস। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল বাঙালি জাতির অস্তিত্বের সংগ্রাম। এই সংগ্রামে বিজয়ী হওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা যেভাবে পাকিস্তান সামরিক শক্তিকে সমর্থন ও লোকচক্ষুর অন্তরালে বস্তুগত সহযোগিতা করেছে তা কোনোভাবেই নিরপেক্ষতার মানদণ্ডে বিচার করা সমীচীন হবে না।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিভিন্ন পরাশক্তির দৃষ্টিভঙ্গি ছিল তাদের পারস্পরিক নিরাপত্তা প্রভাব বলয় বিস্তারের সঙ্গে সম্পর্কিত অথবা ভারসাম্যমূলক কূটনৈতিক পদক্ষেপের মাধ্যমে স্ব-স্ব দেশের জাতীয় স্বার্থের অন্বেষার প্রয়াস। সেই বিবেচনায় তারা তাদের কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবার ঘুঁটি অত্যন্ত নিপুণতার সঙ্গে পরিচালনা করেছে।

সাম্প্রতিককালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের দলিল-প্রমাণাদি ও গবেষণাকর্ম থেকে এরূপ দৃঢ় প্রত্যয় জন্মায় যে, আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বৃহৎ শক্তিবর্গের কর্মকাণ্ড মার্চের স্বাধীনতা ঘোষণার পর্যায় থেকে কালক্রমিক মুক্তিযুদ্ধ জোরালো হয়ে ওঠার পেছনে ভারত ব্যতীত কোনো বৃহৎ শক্তি বাংলাদেশের পক্ষে নীতিগতভাবে পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে এগিয়ে আসেনি। কেবল ভারতবর্ষের সাহায্য সহযোগিতায় অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ ও মুক্তিযুদ্ধ সুসংহত অবস্থায় এগিয়ে যেতে থাকলে সোভিয়েত রাশিয়া জুলাই মাসে পরিবর্তিত নীতি ও কৌশল, বস্তুগত সহযোগিতায় বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের বিজয়কে ত্বরান্বিত করে তোলে।

দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বৃহৎ শক্তিবর্গের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ১৯৭১ সাল ছিল ক্রান্তিকাল। ১৯৬০-এর দশকব্যাপী এবং ১৯৭০ সাল অবধি দক্ষিণ এশীয় কৌশলগত পরিবেশ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন দেখা দেয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফলে এ অঞ্চলে তাদের পররাষ্ট্রনীতির ব্যাপক প্রভাব পড়ে। তৎকালীন দু'টি পরাশক্তির ঐ সময়কার পরিবর্তনমুখী পররাষ্ট্র নীতি সূক্ষ্ম ও পরোক্ষভাবে একই সময়ে চীনকেও এ অঞ্চলের প্রতি তার ভূমিকা ও নীতি পুনর্নির্ধারণে প্ররোচিত করে। বিশ্বপরিমণ্ডলে যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পরিবর্তন ছিল লক্ষণীয় এবং আঞ্চলিক পর্যায়ে দক্ষিণ এশিয়ায় সে দৃষ্টিভঙ্গিতে সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে গৃহীত নীতির ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হয়। এসব সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ায় ঐতিহ্যগত মার্কিন কৌশলগত নীতির ধারায় এমন একটি ভাব বিদ্যমান ছিল, যাতে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টির কোনো কারণ ছিল বলে প্রতীয়মান হয়নি বলে যারা বিবেচনা বা বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ একটি দেশের জন্মগত কৌশল হিসেবে মনে করেন সাম্প্রতিক প্রকাশিত মার্কিন গোপন ডকুমেন্টসগুলো তাদের সেই ধারণাকে অসার প্রমাণিত করবে। দেশি এবং বিদেশি গণমাধ্যম মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে ব্যাপক অবদান রাখে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র, আকাশবাণী, বিবিসি ও ভয়েস অব আমেরিকা-সহ বিভিন্ন ইলেকট্রোনিক ও প্রিন্ট মাধ্যম জনমত গঠনে যে ভূমিকা পালন করেছিল তা যেমন ছিল মুক্তিযোদ্ধা ও মুক্তিকামী মানুষকে সর্বদা উজ্জীবিত রাখা এবং একই সাথে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক যুদ্ধের এক অমোঘ অস্ত্র। একইসাথে একথা বিস্মৃত হলে চলবে না যে, মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রম, বিশ্বপরিসরে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ, পাকিস্তানে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকবৃন্দের বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা, প্রবাসী বাঙালিদের বিশ্বব্যাপী অহর্নিশ তৎপরতা এবং বিদেশি জনপ্রতিনিধিবৃন্দের সক্রিয় ভূমিকা কূটনৈতিকভাবে বিশ্বব্যাপী গণমানসের সামনে বাংলাদেশের উপস্থিতিকে আড়াল হতে দেয়নি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ছিল জটিল। বৃহৎ শক্তিবর্গের পররাষ্ট্র নীতি, নিরাপত্তা নীতি ও কৌশলগত বাধ্যবাধকতার জটিল সংশ্লেষ শেষ পর্যন্ত বাংলাদেশের সামরিক যুদ্ধকে কূটনৈতিক যুদ্ধে রূপান্তরিত করে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিজয় প্রধানত কূটনৈতিক যুদ্ধের বিজয়কে অপরিহার্য করে তোলে।

সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস পূর্ণাঙ্গ করতে হলে মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে বাংলাদেশের ঘটনাপঞ্জিকে কেন্দ্র করে সারা বিশ্বব্যাপী যে কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে তা পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করা আবশ্যক। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় এ দিকটি বেশি গুরুত্ব লাভ করেনি। মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে প্রায় তিন হাজার গ্রন্থ রচিত হলেও মুক্তিযুদ্ধকে ঘিরে সৃষ্ট কূটনৈতিক যুদ্ধ নিয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ গবেষণাকর্ম হয়নি বললেই চলে। আবু সাঈদ চৌধুরী প্রণীত 'প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি', আব্দুল মতিনের 'স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি', মোহাম্মদ সেলিম রচিত 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল', খন্দকার মোশাররফ হোসেন-এর 'একাত্তরের স্মৃতি: মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান' প্রভৃতি গ্রন্থে কূটনৈতিক যুদ্ধের একটা ধারণা পাওয়া গেলেও কোনো গ্রন্থেই মুক্তিযুদ্ধের কূটনৈতিক কার্যক্রমের পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাওয়া যায় না। সুতরাং মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের এই শূন্যতা পূরণ করার জন্যই আলোচ্য গবেষণাকর্ম সম্পাদন করি।

গবেষণাকর্মটিকে আমি মোট ৯টি অধ্যায়ে বিভক্ত করে উপস্থাপন করেছি। প্রথম অধ্যায়ে গবেষণার যৌক্তিকতা ব্যক্ত করার পাশাপাশি ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কূটনৈতিক বিভিন্ন পর্যায় এবং উপমহাদেশকে কেন্দ্র করে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের কূটনীতি পর্যালোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার বিশ্লেষণ, তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, চতুর্থ অধ্যায়ে বন্দি শেখ মুজিবকে ঘিরে বিশ্ব কূটনৈতিক তৎপরতা, পঞ্চম অধ্যায়ে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা, ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলির কূটনৈতিক তৎপরতা, সপ্তম অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধ ও জাতিসংঘ এবং অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চতুর্ভূজ কূটনৈতিক যুদ্ধ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। নবম অধ্যায়টি গ্রন্থের উপসংহার।

দ্বিতীয় অধ্যায় শুরু করার পূর্বে ১৯৪৭-৭১ সময়কালে পাকিস্তানের কূটনৈতিক তৎপরতা এবং উপমহাদেশকে ঘিরে বিশ্ব কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আলোচনা করা প্রাসঙ্গিক মনে করছি। সেই সঙ্গে বিভিন্ন অধ্যায় পরিচিতিও উল্লেখ করা হলো।

পাকিস্তান কূটনীতির বিভিন্ন পর্যায় : ১৯৪৭-৭১

পাকিস্তান জন্মলগ্ন হতেই ধর্মীয় স্লোগান, প্রকৃত অর্থে ধর্মীয় উন্মাদনা এবং পরবর্তীকালে রাজনৈতিক আবরণে ইসলামি প্রজাতন্ত্র হিসেবে দ্বিজাতি তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণে রাষ্ট্র পরিচালনায় ধর্মীয় ভাবধারা এবং প্রভাব বিস্তারে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে মুসলিম বিশ্বের মোড়ল হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। জাতীয় অখণ্ডতা, সংহতি ও নিরাপত্তা এবং উন্নয়নের স্বার্থে একদিকে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে দ্রুত গতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্র ঝুঁকে পড়েছে। পাকিস্তান কূটনীতির মূল লক্ষ্যই ভারত বিরোধিতা এবং ভারত বিরোধিতার হাতিয়ার হিসেবে বেছে নিয়েছে ধর্মকে। অন্যদিকে, ভারত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ও নির্জোট নীতি গ্রহণ করে। এই নীতির ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কূটনীতিক নীতি হিসেবে পঞ্চশীলা,[৫] গ্রহণ করে। পাকিস্তান ও ভারত অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্রীয় ও কূটনীতি পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে দেশ দু'টিকে সব সময়ই পরস্পর বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করতে হয়েছে। প্রতিপাদ্য এভাবে দাঁড়ায় যে, পাকিস্তান যখন যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়েছে, ভারত তখন ভিন্ন দিকে মিত্র সম্পর্ক স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে। এর অন্তর্নিহিত বাস্তব কারণ সর্বদাই দু'দেশকে দু'দিকে ঠেলে দিয়েছে।

পাকিস্তানের জন্মের সাথে সাথে যুক্তরাষ্ট্র 'ভৌগলিক স্ট্যাটেজিক' স্থান হিসেবে পাকিস্তানকে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়ে মিত্রতার বন্ধনে আবদ্ধ করার মনোভাব প্রকাশ করেছে।[৬] পাকিস্তান অতি দ্রুততার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রসারিত হাতকে শক্তভাবে চেপে ধরার চেষ্টা চালিয়েছে এবং পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত প্রথম গণপরিষদ ভাষণেই তা প্রতীয়মান হয়েছে। একই সাথে কাশ্মির প্রশ্নে যখন ভারত এবং পাকিস্তান পারস্পরিক দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয় তখন পাকিস্তানের কূটনীতি মার্কিনীদের কব্জায় গিয়ে পড়ে।[৭]

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ, বিশেষকরে রাষ্ট্রীয় গঠন প্রক্রিয়া সুসংহতকরণের আদর্শিক ও আর্থ-সামাজিক শর্তসমূহের মীমাংসা করতে নেতৃবৃন্দ ব্যর্থ হয়। যার ফলে নব রাষ্ট্রের নাজুক পরিস্থিতি বিদেশ নীতিতে দুর্বলতা হিসেবে উপস্থিত হয়। ১৯৫১ সালে ইরানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেল জাতীয়করণের ফলে উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলায় যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে সরাসরি নতুন সম্পর্ক স্থাপনের পদক্ষেপ গ্রহণ করে।[৮]

মার্কিন সামরিক প্রভাব বলয়ে পাকিস্তানকে অন্তর্ভুক্ত করার ব্লু প্রিন্টকে সামনে রেখে মার্কিনী মিত্র গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ও সেনাবাহিনী প্রধান চক্রান্ত করে গণপরিষদে সংখ্যগরিষ্ঠ সদস্যের আস্থাভাজন, কিন্তু দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দিনকে হটিয়ে দেওয়া হয়। চরম অসাংবিধানিকভাবে গণপরিষদে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও ১৯৫৩ সালের এপ্রিলে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ নাজিমুদ্দিন মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে দেন। নাজিমুদ্দিন সরকারের বিরুদ্ধে আক্রমণের বড়ো তূণটিই ছিল আসন্ন খাদ্য সংকটের। ১৯৫৩ সালে ফসল ভালো হয়নি পেন্টাগনের বিশেষজ্ঞ দ্বারা একটানা প্রচারিত হবার ফলে খাদ্য সংকটের আশংকায় ব্যাপকভাবে মজুতদারি বেড়ে যায়। খাদ্যসহ জিনিসপত্রের দাম বাড়তে থাকে। প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন অত্যন্ত মরিয়া হয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট খাদ্য প্রার্থনা করেন। যুক্তরাষ্ট্র এক সপ্তাহের মধ্যে খাদ্য সরবরাহের প্রতিশ্রুতি দিলেও খাজা নাজিমুদ্দিনের অপসারণ এবং মার্কিনীদের বিশ্বস্ত বশংবদ বগুড়ার মোহাম্মদ আলীর প্রধানমন্ত্রীর পদ দখল না করা পর্যন্ত প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার খাদ্য প্রেরণ বিলম্বিত করেন। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রথম থেকেই কীভাবে হস্তক্ষেপ করেছে এটি তার একটি উদাহরণ। ১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সেবা করার[৯] ঝুঁকিপূর্ণ প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়ন করার মত মানসিক শক্তি দুর্বলচিত্ত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের ছিল না।[১০]

খাজা নাজিমুদ্দিনের বিদায় গ্রহণের পর ১৯৫৩ সালের মে মাসে জন ফস্টার ডালেস পাকিস্তান সফরে আসন এবং এর পরবর্তী পর্যায়ে প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান ন্যাটোর ঘাঁটি তুরস্ক এবং তুরস্ক থেকে সামরিক শক্তিসমূহের পারস্পরিক সমঝোতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। পরবর্তী কালে লক্ষণীয় এ দুজনই মোহাম্মদ আলীর ক্যাবিনেটে অন্তর্ভুক্ত হন। পাকিস্তানের রাজনীতিতে একটি বিষয় অত্যন্ত পরিষ্কার হয়ে উঠে যে শাসনতান্ত্রিক রীতিনীতি, গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান ও প্রথাসমূহকে আমলাচক্র থোড়াই পরোয়া করে। অত্যন্ত অন্যায়, অবৈধভাবে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বগুড়ার মোহাম্দ আলীকে প্রধানমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর মন্ত্রীসভার কে কে সদস্য হবেন, তাদের কী কী দায়িত্ব দেওয়া হবে তাও গভর্নর জেনারেল ঠিক করে দেন।[১১]

এভাবে পাকিস্তানের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্র অপ্রতিরোধ্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। গণতন্ত্রহীনতা, প্রাসাদ ষড়যন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ, নব্য ধনিক, বণিক, ভূস্বামী ও সামরিকতন্ত্রের নগ্ন চক্রান্ত ও খেলায় পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে গণতন্ত্র ও মৌলিক অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার দাবি-দাওয়া রাষ্ট্রীয় চক্রান্ত হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে।

পাকিস্তান রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গের অধিবাসী হওয়ায় স্বাভাবিকভাবে এ অঞ্চলের মানুষ গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা, গণতান্ত্রিক বিধি-বিধান ও পদ্ধতি প্রতিষ্ঠায় আগ্রহী ছিল। কারণ গণতন্ত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠের শাসনের মৌলিক নীতিমালা বাঙালির জন্য অধিকার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিষ্ঠার রক্ষা কবজ হিসেবে কার্যকর থাকবে। কিন্তু পাকিস্তান সৃষ্টির প্রেক্ষাপটে মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিভ্রান্তিকর ধর্মীয় প্রবাহমানতায় বাঙালির মনন ও চিন্তা-চেতনা আচ্ছন্ন ছিল বলেই কেন্দ্রীয় রাষ্ট্র পরিচালনায় শাসকচক্রের চতুর ও চক্রান্তমূলক পদক্ষেপগুলো তার মোহাচ্ছন্ন দৃষ্টিতে সামগ্রিকভাবে ধরা পড়েনি। ধর্মীয় উন্মাদনা ও চেতনা বাঙালির আত্মপরিচয় ও সত্তাকে বিভ্রান্তি ও বিস্মৃতির চোরাবালিতে ঠেলে দেয়। বাঙালিরাই পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[১২]

রাষ্ট্রীয়ভাবে বাঙালিকে তার বাঙালিত্ব ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনে প্রাণে কেবল একজন পাকিস্তানি করার আপ্রাণ চেষ্টা শুরু হয়। এই মনোভাব থেকে সে তার নিজস্ব বাঙালি স্বার্থও একে একে পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে তুলে দিতে কুণ্ঠিত হয়নি।[১৩]

কারণ বাঙালি ভেবেছিল সবাই যখন পাকিস্তানি, মুসলিম এবং ভাই ভাই তখন সর্বক্ষেত্রেই পশ্চিম পাকিস্তানি ও পূর্ব পাকিস্তানিদের স্বার্থ এক ও অভিন্ন। সেজন্য ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ভাষার দাবিতে ঢাকায় ছাত্রদের প্রথম শোভাযাত্রায় স্থানীয় অধিবাসীদের পাকিস্তান জিন্দাবাদ ও ইসলাম রক্ষার ধ্বনি ও সশস্ত্র আক্রমণ লক্ষণীয়। ১৯৫০ সালে কেন্দ্রীয় শাসক গোষ্ঠীর উস্কানিতে দাঙ্গা সংঘটিত করতেও তার উৎসাহের অভাব ছিল না।[১৪] বাঙালির মানস চেতনার এই পশ্চাদপদতা ও ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তি অপসারণ ব্যতীত গণতান্ত্রিক অধিকার, অর্থনৈতিক শোষণের প্রতিকার দাবি 'শত্রুচক্র' পক্ষের কাজ বলে পূর্ববঙ্গের জনগোষ্ঠীর নিকটও ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছে।

মূলত মাতৃভাষার উপর আক্রমণই বাঙালির আত্মসচেতনতাকে ফিরিয়ে আনতে মূল উপাদান হিসেবে কাজ করে।[১৫] ধীরে ধীরে জাতীয় চেতনা ও বাঙালির বোধশক্তি জাগ্রত হয়। বাঙালি জাতি উপলব্ধি করতে পারে ধর্ম, মুসলমান এবং ইসলামি স্লোগানের আড়ালে কী নিদারুণভাবে তাদের শোষণ করা হচ্ছে। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসক ও শোষকগোষ্ঠী পরিকল্পিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মায়ের ভাষা বাংলার পরিবর্তে ব্যাপক প্রচার চালিয়ে পূর্ব বাংলার ধর্মপ্রাণ সরল মুসলিম জনতার কাছে উর্দুকে কোরআনের ভাষা বা 'লিসানুল কোরআন' বলে তুলে ধরে। দেশের মধ্যে অভিজাত ও বুদ্ধিজীবী দালাল শ্রেণি মুসলিম জাতীয়তার ধুয়া তুলে স্কুলপাঠ্য বাংলা বইয়ে নতুন করে উর্দু শব্দের অনুপ্রবেশ ও গাঁথুনি দিয়ে সৃষ্টি করে এক বিচিত্র বাংলা ভাষার। মোল্লা মৌলানাদের একটি শ্রেণিও সরকারি আনুকূল্যে বাংলা ভাষা ইসলামিকরণের জিগির তোলে। যারা বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, বাঙালির অধিকার, গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র কাঠামো, স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলেছে তাদেরকে কাফের, ইসলাম ও পাকিস্তান বিরোধী এবং ভারতীয় এজেন্ট বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১৬] মাতৃভাষার উপর আক্রমণ সাময়িকভাবে আত্মবিস্মৃত জাতিসত্তাকে প্রবলভাবে নাড়া দেয়। পাকিস্তানি শাসকচক্র, আমলাচক্র একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার যে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে তারই প্রতিবাদে বাংলার ছাত্রসমাজ দেশব্যাপী আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে।[১৭]

ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষা সাংস্কৃতি আন্দোলনের মধ্যে পরিবৃত্ত না থেকে রাজনৈতিক ও গণতান্ত্রিক সংগ্রমের হাতিয়ার হয়ে ওঠে। বাঙালি জাতীয়তা, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও অসম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যে সংগ্রাম, স্বায়ত্তশাসন, শোষণ নিপীড়ন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে সংগ্রাম এতদিন বিভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দাবি দাওয়ার ভেতর উচ্চারিত ছিল তা ভাষা আন্দোলনের সংগ্রামে একীভূত হয়ে পূর্ববঙ্গে এক প্রবল গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষা অর্জনের প্রগতিশীল মূলধারার সৃষ্টি করে। এর ফলশ্রুতিতে গঠিত হয় যুক্তফ্রন্ট।[১৮] ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গের প্রাদেশিক নির্বাচনের নাটকীয় ফলাফল গভর্নর জেনারেলের আমলাতান্ত্রিক কর্তৃত্বের প্রতি একটি চ্যালেঞ্জের সৃষ্টি করে।[১৯] নির্বাচনের পরপরই অতি দ্রুত সেনাবাহিনী, নৌবাহিনীর ইউনিটসমূহকে পূর্ববঙ্গে প্রেরণ করা হয়। অবস্থার গতিধারা নিয়ন্ত্রণে রাখার লক্ষ্যে জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে ঢাকায় পাঠানো হল। দাঙ্গা, বিশৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তার অজুহাত এবং যুক্তরাষ্ট্রের একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা ফজলুল হক স্বাধীন বাংলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছে এই অজুহাতে নবগঠিত যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রী সভাকে বরখাস্ত করা হল। মীর্জার নেতৃত্বে গভর্নর শাসন কায়েম হল। ৯২-ক ধারা জারি করে সভা বিচ্ছিন্ন, সমাবেশ মিছিল ঘোষণা করা হয়। শুরু হল ব্যাপক ধরপাকড়, নিপীড়ন।[২০] লক্ষণীয় যুক্তরাষ্ট্রের একুশ দফা ছিল শাসক-গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে গণদাবি। সমাজ প্রগতি কর্মসূচির প্রতি গণদাবি মার্কিন কর্তৃপক্ষকে চিন্তিত করে তোলে।

পূর্ববঙ্গের জনগণের নিরঙ্কুশ ও দ্ব্যর্থহীন রায় পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্যদের সাহসী করে তোলে এবং তারা কর্তৃত্বশালী আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে একটা স্বাধীন ভূমিকা নিতে সচেষ্ট হয়।[২১]

১৯৫৪ সালের অক্টোবরে তারা গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার লক্ষ্যে পরিষদে কিছু সাংবিধানিক সংশোধনী প্রস্তাব আনেন।[২২] কিন্তু এই সংশোধনী কার্যকরী করার আগেই গভর্নর জেনারেল জরুরি অবস্থা জারি করেন।[২৩] গণপরিষদ বাতিল করেন এবং পূর্ণ ক্ষমতা কব্জা করেন।[২৪] সামরিক-আমলাতন্ত্র চক্রের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর জেনারেলের অসীম ক্ষমতা পাকিস্তানের রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অচল ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষুদ্রতম প্রয়াসকে ব্যর্থতায় পর্যবসিত করে। গভর্নর জেনারেল কর্তৃক সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এবং জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জাকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ প্রথমবারের মত প্রত্যক্ষভাবে সামরিক আমলাতান্ত্রিক চক্রকে ক্ষমতায় নিয়ে আসে। এ অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গণপরিষদের স্পিকার উচ্চ আদালতে মামলা দায়ের করেন।[২৫] এই প্রত্যক্ষ ক্ষমতা দখলে দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, শোষণ বৈষম্য ও দুর্ভোগ পরিণতি বৃদ্ধি করে। এই নতুন সরকারের বৈধকরণের আইনানুগ ভিত্তি স্থাপনের জন্য গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রতীকীভাবেই সেনাবাহিনীকে ক্ষমতা গ্রহণের আমন্ত্রণ জানালে জেনারেল আইয়ুব সে আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেন এই ভেবে যে সেনাবাহিনীকে প্রতীকী নয়, পুরোপুরিভাবেই ক্ষমতা 'দখল' করতে হবে।[২৬]

ইতোপূর্বেই পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তির বৃত্তে ঢুকে পড়ে। ১৯৫৪ সালের ১৯শে মে পাক-মার্কিন সহযোগিতা চুক্তি (সামরিক চুক্তি) স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির প্রধান শর্ত ছিল, পেশোয়ারের কাছে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি প্রদান এবং এর বিনিময়ে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের ৪০ হাজার সৈন্যের ব্যয়ভার বহন করবে।[২৭] ১৯৫৪ সালের ১০ সেপ্টেম্বর সাউথ ইস্ট এশিয়া ট্রিটি অর্গানাইজেশন (সংক্ষেপে সিয়াটো) সামরিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ চুক্তি স্বাক্ষর করে পাকিস্তান মার্কিন জোটভুক্ত হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৫৪ সালের অক্টোবর পাকিস্তান বাগদাদ প্যাক্ট (পরবর্তী নামকরণ করা হয় সেন্টো প্যাক্ট) এ যোগদান করে।[২৮]

পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মোট তিনটি সামরিক চুক্তি করে। এর সবগুলিই ছিল পাকিস্তানের জনগণের স্বার্থবিরোধী চুক্তি। ১৯৫৪ সালের ২৫শে এপ্রিল আওয়ামী লীগের পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তিবিরোধী প্রতিবাদ দিবস পালন করে। আওয়ামী লীগ নেতা ১৯৫৬ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করেন। কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হয়ে ওই বছরই ডিসেম্বর মাসে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতি বিশেষকরে পশ্চিমা সামরিক জোটে যোগদানের স্বপক্ষে যুক্তি প্রদান করেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী যুক্তরাষ্ট্রের বিদেশ নীতির সমর্থক হলেও তিনি একই সাথে চীন এবং রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগী হন। সেই প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ১৯৫৬ সালের ২০-৩০শে ডিসেম্বর পাকিস্তান সফর করেন, এর মধ্যে তিনি ঢাকায় আসেন ২৮-৩০ তারিখে। তাকে বিপুল সম্বর্ধনা দেওয়া হয়।[২৯]

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গৃহীত পররাষ্ট্র নীতির প্রশ্নে আওয়ামী লীগ দ্বিধা-বিভক্ত হয়ে পড়ে। জোটনিরপেক্ষ পররাষ্ট্র নীতি ও সমাজতান্ত্রিক স্বাধীন দেশ গঠনের প্রত্যয় নিয়ে ২৫-২৭ তারিখে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। ন্যাপ গঠনের সময় প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী যুক্তরাষ্ট্র সফর করেন। প্রধানমন্ত্রী সোহরাওয়ার্দী ও আইজেনহাওয়ার যুক্ত ইশতেহার ঘোষিত হয়। ইশতেহারে বলা হয়, 'স্বাধীন বিশ্বের জন্য আন্তর্জাতিক কমিউনিজম এক বিরাট হুমকি হিসেবে অবস্থান করছে।'[৩০]

১৯৫৬ সালের ১৭ই জানুয়ারি পাকিস্তানের গণপরিষদে শেখ মুজিবুর রহমান কেন্দ্রীয় ষড়যন্ত্র, শোষণ, বৈষম্য ও প্রাসাদ চক্রান্তের বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি করে বলেন "ভৌগোলিক দিক দিয়ে আমাদের দেশের একটি অংশ অপরটি থেকে বহু দূরে– হাজার মাইলেরও বেশি দূরে অবস্থিত। বাইরে থেকে দেখতে এই দুটি অংশের চেহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন, বলতে গেলে দুটি পৃথক দেশেরই চেহারা এদের। কিন্তু তবুও পাকিস্তানের দেশপ্রেমী মানুষ স্বেচ্ছায় একই দেশ হিসেবে এই দুটি অঞ্চলকে মেনে নিয়েছে। অথচ তাই বলে আপনারা যদি পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতি ন্যায়সঙ্গত ব্যবহার না করেন, তাদের অভাব অভিযোগের কোন প্রতিকার না করেন তবে সে পরিস্থিতিতে বাংলাদেশের জাগ্রত সচেতন যুবশক্তি হতাশার চরম সীমায় উপনীত হয়ে দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে চাইলে তখন প্রধান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে আওয়ামী লীগেরও কিছু করবার থাকবে না। এখনও সময় আছে, আপনারা দেওয়ালের লিখন পড়ার চেষ্টা করুন।"[৩১] মার্কিন তাবেদার সরকারের নিকট তখন থেকেই শেখ মুজিব থ্রেট হিসেবে চিহ্নিত হন।

নানা চক্রান্ত, বাধা-নিষেধ প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করে ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানে একটি শাসনতন্ত্র গৃহীত হয়। শাসনতন্ত্রে রাষ্ট্রের সর্বক্ষেত্রে সংখ্যাসাম্য নীতি, সংসদীয় গণতন্ত্র বাস্তবায়িত হবে এই মর্মে পাকিস্তানকে দুটি ইউনিটে বিভক্ত করার বিধান রাখা হয়। গভর্নর জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা শাসনতন্ত্রের বিধান অনুযায়ী প্রথম রাষ্ট্রপতি পদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখল ও মন্ত্রীসভা গঠন করলেন ; আবার বরখাস্ত করলেন। নানারকম রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের সে এক জঘন্যতম ইতিহাস।[৩২]

১৯৫৭ সালের ১১ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে সোহরাওয়ার্দীকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়, যদিও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্ট অনুযায়ী, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মার্কিন নীতি ও মুক্ত বিশ্ব গঠনের প্রতি বিশ্বস্ত। কিন্তু পেন্টগন বিশ্লেষণ করে দেখেছে আসন্ন নির্বাচনে জনাব সোহওয়ার্দী বা আব্দুল কাইয়ুম খান বিজয়ী হবেন তারা যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থক হলেও পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাজনীতির চক্রান্তে স্থিতিশীল সরকার গঠন করতে পারবে কি না সন্দেহ। শুধু তাই নয়, পেন্টাগনের আরো একটি বিষয় ছিল জনাব সোহরাওয়ার্দী কমিউনিস্ট চীনের দিকে ঝুকে পড়ার নীতি গ্রহণ করেছে এবং সোভিয়েত এর প্রতিও হাত বাড়ানোর চেষ্টা করছে। এর কারণে প্রধানমন্ত্রী পদ থেকে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে সরিয়ে দেওয়া হলে প্রথম দিকে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টিকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি।[৩৩] কিন্তু পরে তা মেনে নেয় ১৮ই অক্টোবর চুন্দ্রিগড়কে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করা হয়। ১৯৫৭ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে চুন্দ্রিগড় পদচ্যুত এবং আওয়ামী লীগ ফিরোজ খান নুনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হতে এই শর্তে সমর্থন দেন যে তিনি অবিলম্বে পাকিস্তানে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেবেন। সেই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫৯ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনের দিন ঘোষিত হয়। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদে এই বিল গৃহীত হলে ১৯৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট তাতে সম্মতি স্বাক্ষর করেন। এদিকে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জার চক্রান্ত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানেও রাজনৈতিক সরকার গঠনকে অস্থিতিশীল করে ফেলেছিল। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের একটি অংশ পাকিস্তানকে অস্থিতিশীল রাখার জন্য ইস্কান্দার মীর্জা ও জেনারেল আইয়ুব খানের সঙ্গে আতাঁত রেখেছিলেন।[৩৪]

১৯৫৮ সালের ২৫শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার পতন, ২৬ মার্চ আবু হোসেন সরকার পুনরায় পূর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী, ১লা এপ্রিল আবু হোসেন সরকার মন্ত্রী সভার পতন, ১লা এপ্রিল পুনরায় আতাউর রহমান খান পুর্ব পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী এবং ১৮ই জুন আতাউর রহমান খান মন্ত্রীসভার পতন হয়। পূর্ববঙ্গ পরিষদে ডেপুটি স্পিকার শাহেদ আলীর হত্যাকাণ্ডকে[৩৫] কেন্দ্র করে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার ষড়যন্ত্রে মেতে ওঠে। দেশের শোচনীয় অর্থনৈতিক পরিস্থিতি, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, রাজনৈতিক অসহিষ্ণুতা, দলের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক দলগুলোর উপর দমন পীড়ন, দুর্নীতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিল জনগণ রাজনীতিবিদদের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলেছিল।

জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ২৭শে অক্টোবর সাময়িক আইনের মাধ্যমে ক্ষমতায় এসেই রাজনীতিবিদদের উপর নিপীড়ন, অত্যাচারের ও নির্যাতনের চরমপন্থা গ্রহণ করেন। রাজনীতিবিদদের গ্রেফতার, নজিরবিহীন অত্যাচারের পাশাপাশি তাদের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ নিষিদ্ধ করার পন্থাসমূহ উদ্ভাবন করা হয়।[৩৬] মার্কিন উপদেষ্টা ও দেশিয় অফিসারগণ সরকারের বেসামরিক প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি করতে তৎপর হলো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উদ্ভাবিত হল মৌলিক গণতন্ত্র যা ১৯৬২ সালের সংবিধানের ভিত্তি। মৌলিক গণতন্ত্র না ছিল গণতন্ত্র, না ছিল মৌলিক। বরং এটা ছিল সামরিক স্বৈরশাসনকে পাকাপোক্ত করার এক অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, যা গণতন্ত্রের নামে চাপানো হয়। এই ব্যবস্থায় গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারায় পদ্ধতিগত ব্যবস্থাপনা গ্রামীণ উচ্চশ্রেণিকে সম্পৃক্ত করে। কিন্তু গ্রামীণ জোতদার ও গ্রাম টাউটদের ক্ষমতা গ্রাস ও সীমাহীন দুর্নীতি সর্বমহলেই এই মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থা ঘৃণিত বলেই জনসাধারণের নিকট প্রতীয়মান হয়। জেনারেল আইয়ুব খান অত্যন্ত নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সীমাহীন অত্যাচার, মৌলিক, মানবিক অধিকার এবং পূর্ববঙ্গের রাজনীতিবিদদের রাজনৈতিক অধিকার হরণ করে পূর্ববঙ্গে সরাসরি এক দালাল গোষ্ঠী সৃষ্টি করে।[৩৭] ঔপনিবেশিক কায়দায় সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক শক্তির সাহায্যে স্বৈরতান্ত্রিক কর্তৃত্ব স্থাপনে তিনি উদগ্রীব হয়ে ওঠেন।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ও ভারত[৩৮] যুদ্ধের সময় পশ্চিম পাকিস্তান ও বহিঃর্বিশ্ব হতে পূর্ব পাকিস্তান সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন ও অরক্ষিত হয়ে পড়ে। দেশপ্রেমিক বাঙালি জাতি যুদ্ধের মাধ্যমে আত্ম-উপলব্ধিতে উপনীত হল যে, পশ্চিমা শাসকগোষ্ঠীর এদেশের প্রতি কোনো প্রকার দায়দায়িত্ব নেই। পাক-ভারত যুদ্ধের অভিজ্ঞতাই বাঙালির নিকট শক্তিশালী কেন্দ্র ও এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থার অন্তর্নিহিত দারুণ বিপদ সম্পর্কে সচেতনতা এনে দেয়। জেনারেল আইয়ুবের এতদিনব্যাপী প্রচারিত ও প্রতিষ্ঠিত শক্তিশালী কেন্দ্রের ফর্মুলা প্রকৃত বিপদের দিনে যে তাদের কোনো কাজে আসবে না এই অভিজ্ঞতাই বাঙালিকে নতুন করে ভাবিত করে। যুদ্ধকালীন এই বিচ্ছিন্নতার কারণে বাঙালি জাতি বুঝতে শিখলো প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ও তাঁর দালালগণ যাই বলুক না কেন বর্তমান রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষার মতো মৌলিক বিষয়েও বাঙালির কোনো অংশীদারিত্ব ও ভূমিকা নেই। দেশরক্ষার ব্যাপারে পূর্ববাংলার প্রতি এতদিনের বঞ্চনা যুদ্ধের মধ্যে বাঙালি জাতিকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তান ভারত যুদ্ধে বাঙালি সেনা-বৈমানিকদের নিপুণতা ও সাহস–'বাঙালি যোদ্ধা জাতি নয়' এই প্রচারণার অসারত্ব প্রমাণ করে এবং পরিণতিতে জাতীয় গর্বের আত্মপ্রত্যয়ে জাতীয়তাবাদী মূলচেতনার ধারাকেই শক্তিশালী করে। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারিতে তাসখন্দ চুক্তি[৩৯] স্বাক্ষরিত হবার অব্যবহিত পরেই পশ্চিম পাকিস্তানে উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্ররোচনায় তাসখন্দ চুক্তির বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। লাহোরে অনুষ্ঠিত তাসখন্দ চুক্তিবিরোধী এই চক্রের কার্যধারার বিরোধিতা করে শেখ মুজিব স্বৈরাচারী শাসক আইয়ুবের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের লড়াই জোরদার, পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র, প্রত্যক্ষ ভোটাধিকার, পূর্ণ আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন, অর্থনৈতিক বৈষম্যের অবসানের লক্ষ্যে লাহোরে ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন।[৪০] ছয় দফা কর্মসূচি পূর্ব পাকিস্তানে অতি দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করতে থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের এই পর্যায়কে সুসংহত এবং জাতীয়তাবাদকে রাজনৈতিক অর্থনৈতিকসহ রাষ্ট্র পরিচালানার হাতিয়ার হিসেবে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করে বাঙালির আত্মনিয়ন্ত্রণ ও আত্মকর্তৃত্বের দাবিকে ছয় দফার মধ্যে বঙ্গবন্ধু উপস্থাপন করলেন। কেন্দ্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত জেনারেল চক্র, আমলাতন্ত্র ও পুঁজিবাদী ধনিক বণিক চক্রের নিকট বেশি করে যন্ত্রণাদায়ক বিষয়টি ছিলো কেন্দ্রীয় পরিসম্পদে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালিদের ন্যায্য হিসেবের দাবি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর কলোনি হিসেবে একযুগ পূর্ববঙ্গের সম্পদ শোষণের প্রবাহধারা শুকিয়ে এলে আন্তর্জাতিক পুঁজিবাদী ও সাহায্য সংস্থার নিকট থেকে প্রাপ্ত সম্পদে বাঙালিদের অধিকার দাবি তাদের নিকট এক অসহনীয় ও অমার্জনীয় অপরাধ বলেই বিবেচিত হয়েছিল। শেখ মুজিবের দাবি ও সংগ্রাম তাদের 'পরিতুষ্ট হৃৎপিণ্ডে' সরাসরি শূলবিদ্ধ করেছিল। শেখ মুজিবের ছয় দফা ছিল তাদের নিকট মারাত্মক বিভীষিকার অস্ত্র। শেখ মুজিব বাঙলার স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকার ও অর্থনৈতিক শোষণ বৈষম্যের অবসান, গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা কায়েম, পাকিস্তানি স্বৈরতন্ত্র জুলুমশাহীর নিপীড়ন, অত্যাচার, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্রের বহুবিধ তথ্য ও সত্য উদ্ঘাটন করে, উল্কার মতো দেশের গ্রাম বাংলা, শহর, গঞ্জ, নগরে ব্যাপক গণসংযোগের মাধ্যমে দ্রুত জনমত গঠনের ক্লান্তিহীন কাজে আত্মনিয়োগ করেন।[৪১] পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা, স্বৈরশাসন, শোষণ এবং আঞ্চলিক বৈষম্য প্রতিকার ও প্রতিবিধানের লক্ষ্যে উপস্থাপিত বাংলার মুক্তিসনদ ছয় দফা কর্মসূচির প্রচারকালীন শেখ মুজিবের উপর যে ধরনের অত্যাচার, হয়রানি ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গৃহীত হয় তার নজির সমকালীন ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। খুলনা হতে ফেরার পথে যশোরে, যশোর থেকে জামিন নিয়ে ঢাকায় এবং ঢাকার দায়রা জজ প্রদত্ত জামিনে সন্ধ্যায় বাসায় ফেরার পরপরই পুলিশ বাসা হতে বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে সিলেটে প্রেরণ করেন, সিলেটের দায়রা জজ কর্তৃক জামিন প্রদানে মুক্ত হবার পূর্বেই জেল হাজতের দরজায় পুনরায় তাঁকে গ্রেফতার করা হয় এবং ময়মনসিংহ জেলে প্রেরণ করা হয় এবং ময়মনসিংহ হতে জামিনে মুক্তি লাভ করে ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন। ১৯৬৬ সালের এপ্রিলেই এই সকল ধারাবাহিক গ্রেফতার ও হয়রানি চলতে থাকে।[৪২]

গ্রেফতারের প্রতিবাদে ঐতিহাসিক একই বছরের ৭ জুন বিক্ষুব্ধ জনতার উপর পুলিশের গুলিতে শ্রমিক মনুমিয়াসহ ১১ জন নিহত হয়। এর পরপরই নেমে আসে আওয়ামী লীগের অনুসারী নেতা কর্মীদের উপর জেল জুলুম গ্রেফতারি পরোয়ানা। আইয়ুব খানের দালাল পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর আবদুল মোনেম খান প্রকাশ্যেই বলে বেড়াতে থাকেন, তিনি যতদিন ক্ষমতাসীন আছেন ততদিন শেখ মুজিবকে দিনের আলো আর দেখতে হবে না। ২১ মাস কারাগারে বিচ্ছিন্ন কনডেম্ড্ সেলে আটক রাখার পর ১৯৬৮ সালের ১৭/১৮ই জুন রাত্রে কতিপয় সামরিক ব্যক্তি দৈহিক বল প্রয়োগ করে ঢাকা সেনানিবাসে শেখ মুজিবকে নিয়ে আসে এবং একটি রুদ্ধ কক্ষে আটক রাখে। পাকিস্তান প্রতিরক্ষা আইনে আটক শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার এই ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে দায়েরকৃত রাষ্ট্র বনাম শেখ মুজিব মামলা সম্পর্কে শেখ মুজিব তাঁর জবানবন্দিতে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, "ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের দাবিসহ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, চাকরির সংখ্যা ও অন্যান্য ক্ষেত্রে ক্ষমতার ন্যায়সঙ্গত দাবি আদায়ের পথে বিঘ্ন সৃষ্টি করাই ছিল ইহার মূল্য উদ্দেশ্য।" তিনি বলেন, "স্বার্থবাদী মহল কর্তৃক শোষণ অব্যাহত রাখার যে ষড়যন্ত্রজাল বর্তমান শাসকগোষ্ঠী বিস্তার করিয়াছে এই মামলা[৪৩] তাহারই বিষময় প্রতিক্রিয়া। পূর্ব পাকিস্তানের ন্যায্য দাবি দাবাইয়া রাখার জন্যই এই 'ষড়যন্ত্র মামলা'। স্বৈরাচার আইয়ুব খান ঠিকই বুঝেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বায়ত্তশাসনের দাবি হলো রাজনৈতিক ডিনামাইট আর ছয় দফা হলো তার ফিউজ। সেজন্য যে কোনো উপায়ে এই দাবি বানচাল করতে হবে, দাবি আদায়ের সকল পথ ও প্রচেষ্টাকে রুদ্ধ করতে হবে।

বাঙালি সেনা অফিসারদের জাতীয়তাবোধ ও জাতিসত্তা বিকাশের আকাঙ্ক্ষাকে অঙ্কুরেই বিনষ্ট করতে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তৈরি করা হয়। রাজনৈতিকভাবে শেখ মুজিবকে ধ্বংস ও সামরিকভাবে বাঙালি সেনাদের মধ্যে আতঙ্ক, সন্ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনে তাদের ভূমিকা খর্ব ও বানচাল করানোর সুচতুর কৌশল হিসেবে ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যার জন্যে পরবর্তীকালে লক্ষ্য করা গেছে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সমন্বিত ও পরিকল্পিতভাবে সশস্ত্র প্রতিরোধে বাঙালি সেনা অফিসারগণ উদ্যোগী ভূমিকা নিতে দ্বিধান্বিত ছিলেন।[৪৪]

আইয়ুবের অত্যাচার নিপীড়ন, ষড়যন্ত্র মামলা, শিক্ষা-সংস্কৃতির উপর হামলা জনজীবনের দুর্ভোগ–এসবকে সামনে রেখে গঠিত হলো ডেমক্রেটিক অ্যাকশন কমিটি।[৪৫] ডেমোক্রেটিক একশন কমিটি (ডাক) তে ভুট্টো ও মওলানা ভাসানী যোগদান থেকে বিরত থাকেন। অন্যদিকে, ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হলো। বিগত বছরগুলোতে অবিরাম সংগ্রাম, আন্দোলন ও নির্যাতন ভোগের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ স্বৈরতন্ত্র, বৈষম্য ও শোষণমুক্তি এবং গণতন্ত্র, পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের প্রতিষ্ঠার সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হলো। গঠিত হলো সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ, ছয় দফাকে অন্তর্ভুক্ত করে ঘোষিত হল ১১ দফা। অন্যদিকে, আগরতলা মামলার ষড়যন্ত্র ও শেখ মুজিবের অমলিন সংগ্রামী সত্তার অপোষহীনতা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হলো। বিক্ষুব্ধ বাঙালি শেখ মুজিবের মধ্যে তাদের মুক্তির প্রতিচ্ছবি দেখতে পেল। আইয়ুব–মোনায়েম চক্র ও শাসকগোষ্ঠীর নির্ভুল হিসেবে ছিল এই যে, ভারতের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেওয়া শেখ মুজিবের কার্যক্রম জনগণের মনে শেখ মুজিব সম্পর্কে ধিক্কার এনে দেবে। কিন্তু ঘটনার বাস্তবতায় এর উল্টোই প্রমাণিত হলো। শেখ মুজিব বাঙালির জাতিসত্তার প্রাণ-প্রতীক হয়ে উঠলেন। বাঙালি জাতি ও শেখ মুজিব একক সত্তায় গ্রথিত হলেন। ডাক ১৭ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবসের ডাক দিল। সমগ্র পাকিস্তানে সাড়া জাগালো। ২৪ জানুয়ারি প্রতিবাদ দিবস। পাকিস্তানের বহু শহরে কার্ফু জারি হলো। শুরু হলো বাঙালি জাতীয়তাবাদের অভিযাত্রা। পূর্ব পাকিস্তানে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হলো। আন্দোলনের তীব্রতা দেখে এবং রক্তাক্ত দমননীতি ব্যর্থ হলে সামরিক স্বৈরাচারী আইয়ুব খান ১০ ফেব্রুয়ারি রাওয়ালপিণ্ডিতে একটি গোলটেবিল বৈঠক ডাকলেন। তাতে কেউ সাড়া দিল না। শেখ মুজিবকে বিনা শর্তে মুক্তি দিতে হলো। প্যারোলে মুক্তি কিংবা একাকী মুক্তি পাওয়ার যাবতীয় শর্ত শেখ মুজিবের মানসিক শক্তির নিকট হার মানলে শর্তহীন মুক্ত মানব হিসেবে শেখ মুজিবসহ সকল অভিযুক্ত ব্যক্তি মুক্তি পেলেন। ফাঁসির মঞ্চ থেকে সংগ্রামের নবযাত্রায় উদ্দীপিত এই বীরপুরুষকে জনগণ বঙ্গবন্ধু[৪৬] উপাধিতে ভূষিত করলো। বঙ্গবন্ধু গোলটেবিল বৈঠকে যোগ দিলেন এবং ছয় দফা এগারো দফার পক্ষে বক্তব্য রাখলেন। বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বেলিত বাঙালি জাতি 'তোমার আমার ঠিকানা–পদ্মা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মেঘনা, যমুনা' 'তুমি কে আমি কে–বাঙালি বাঙালি' এবং 'জয় বাংলা' স্লোগান জাতীয় সত্তার নির্যাস হয়ে বাঙালি অস্তিত্বকে গ্রথিত করে তীক্ষ্ণ সংগ্রামের পথ প্রেরণার উৎস হয়ে দাঁড়ায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান প্রস্তাবিত ও বহু প্রতীক্ষিত গোলটেবিল বৈঠকের শেষে কয়েকটি পরিবর্তন ঘোষণা করেন : ১. শাসন ক্ষমতা থেকে তিনি অবসর নেবেন। ২. প্রাপ্তবয়স্কের ভিত্তিতে সংসদীয় গণতন্ত্র। ৩. ফেডারেল শাসনব্যবস্থা। ৪. কেন্দ্রের হস্ত ক্ষেপবিহীন প্রাদেশিক পরিষদ ক্ষমতা। ৫. কেন্দ্র ও প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতার এক্তিয়ার শাসনতন্ত্রে লিপিবদ্ধ থাকবে।[৪৭]

সেনাবাহিনীর কাঠামোগত ঐক্য ও ক্ষমতার কর্তৃত্ব ধরে রাখার স্বার্থেই ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ প্রধান সেনাপতি জেনারেল ইয়াহিয়া খানের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হয়।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্ষমতা দখল করার পরই ১৯৬৯ সালের ২৬ মার্চ এক বেতার ভাষণে শাসনতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার উপযোগী পরিবেশ ও জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করে বলেন, তার সরকারের ভূমিকা হবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের। ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ ইয়াহিয়া খান আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। এই আদেশ বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, পাকিস্তানের ২৩ বছর ধরে চলে আসা অগণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা বহাল রাখার সূক্ষ্ম কৌশল। গণতন্ত্রবিরোধী এবং মৌলনীতির পরিপন্থি আইনগত কাঠামো আদেশে প্রেসিডেন্টের হাতে যথেচ্ছ ক্ষমতা প্রদানের ফলে প্রস্তাবিত সংসদ এবং তার দ্বারা প্রণীত শাসনতন্ত্র অর্থহীন হয়ে পড়বে। পশ্চিম পাকিস্তানের বৃহৎ পুঁজি সামরিক বেসামরিক আমলা চক্রের এবং জেনারেল ইয়াহিয়ার ব্যক্তি স্বার্থে আটঘাট বেঁধেই এল.এফ.ও. জারি করা হয়। শেখ মুজিবসহ অন্যান্য দলের নেতৃবৃন্দ এল.এফ.ও.-র বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করেন।

এর অগণতান্ত্রিক দিকগুলিও বাতিল করার দাবি উত্থাপন করেন। সামরিক চক্র কর্তৃক ঘোষিত এল.এফ.ও.-কে ইস্যু করে আন্দোলনের পথে না গিয়ে শেখ মুজিব নির্বাচনে যাবার কথা ঘোষণা করলেন। এল. এফ. ও. দ্বারা শেখ মুজিবের হাত পা বেঁধে ফেলা হয়েছে। মূলত এটি ছিল ছয় দফা কনসেপ্টের পরিপন্থি। শেখ মুজিবের এর ধরনের ঘোষণা সামরিক চক্রের পূর্ব পরিকল্পিত ব্লু-প্রিন্টকে অকেজো করে তোলে।[৪৮]

পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর রিপোর্ট ও মুজিবের চরিত্র বিশ্লেষণের সঙ্গে শেখ মুজিবের এই ঘোষণা শাসক চক্রকে হতবাক করে তোলে। শেখ মুজিবের কৌশল ছিল গণতান্ত্রিক পথে সামরিক চক্রের পরিকল্পিত চক্রান্তকে তিনি মোকাবিলা করবেন।[৪৯] কেননা জনগণের ঐক্য ও শক্তি সম্পর্কে শেখ মুজিবের হিসেব ছিল নির্ভুল। নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় বিজয়ী হতে পারলে জনগণের শক্তি নিয়ে এল.এফ.ও. কে ছুঁড়ে ফেলতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কোনো তোয়াক্কা করবেন না।[৫০]

অভ্যন্তরীণ এই অবস্থার পাশাপাশি দুই পরাশক্তির সক্রিয় কূটনৈতিক টানাপোড়নের ক্ষেত্র হিসেবে এবং বৃহৎ শক্তি হিসেবে চীনের উত্থান দক্ষিণ-এশীয় কূটনৈতিক ত্রিভুজকে আরো জটিলতা প্রদান করে। দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলটি সামরিকভাবে না হলেও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ। চীনের প্রথম দিকে সোভিয়েত রাশিয়ার সহযোগিতা এবং তৎপরবর্তী চীন-সোভিয়েত বিবাদ, যার ফলে অঞ্চলটি মস্কো ও পিকিং এর কাছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক দিক দিয়েও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও চীনের বিশ্ব–পরিকল্পনা এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার বিবাদ, বিসংবাদ ও আঞ্চলিক উত্তেজনা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এভাবে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিশ্বের সবচেয়ে বেশি পাঁচটি জনবহুল দেশ 'পারস্পরিক গুতোগুতি ও ধাক্কাধাক্কি' করছিল বিভ্রান্তিকর পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে।[৫১]

দক্ষিণ এশিয়ায় বহিঃশক্তির উপস্থিতি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার আঞ্চলিক বিবাদের ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল। পারস্পরিক অসমাপ্তিকর বিবাদে বাংলাদেশ সংকট যখন ঘনীভূত ও উত্তপ্ত ইস্যুতে পরিণত হয় তখনও বিদ্যমান বিচ্ছিন্ন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে জনগণের নতুন অখণ্ড পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি অর্জন এবং ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন একটি সত্যিকারের ফেডারেল বা কনফেডারেল ইউনিয়নে বসবাসের উপযুক্ত একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা বের করতে ব্যর্থতার ফলশ্রুতিতেই নতুন পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানকে সবদিক থেকে বঞ্চিত করা, শোষণ ও প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে নগ্নভাবে লুণ্ঠন ও শাসন করার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী ইঙ্গ-মার্কিন শক্তিবলয়ের নেপথ্য কার্যকর দৃশ্যমান বিষয়টি কূটনৈতিক পটভূমিকায় বিধৃত করা হয়েছে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের হোয়াইট হাউসে আসা অবধি যুক্তরাষ্ট্র এশিয়ায় তার ভূমিকা নিম্ন পর্যায়ে রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলো। ১৯৬৯ সালের আগস্ট মাসে বিশ্ব সফরের প্রাক্কালে যখন তিনি ভারত ও পাকিস্তানসহ পাঁচটি এশীয় দেশ সফর করেন তখন পর্যন্ত নিক্সন এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা যদিও যথাযথভাবে তার চুক্তিবদ্ধ প্রতিশ্রুতি পালন করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ একই সঙ্গে সে সেরকম নীতিমালাও পরিহার করে চলবে যা এশীয় দেশগুলোতে যুক্তরাষ্ট্রের উপর এতটা নির্ভরশীল করে তুলবে না যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম যুদ্ধের ন্যায় এমন সংঘর্ষে জড়িয়ে যেতে পারে। নিক্সন এটা স্বীকার করেন যে, এ নীতিমালা অনুসরণ শক্ত, কিন্তু তিনি বিশ্বাস করতেন যে, এটা এমন এক নীতিমালা যা সঠিক পরিকল্পনার মাধ্যমে উন্নত করা যেতে পারে। নিক্সন ১৯৬৪ সালে ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন এবং থাইল্যান্ড বা সে রকম যে কোনো এশীয় দেশ যা অভ্যন্তরীণ ধ্বংসের মোকাবিলা করেছে– সেসব দেশে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা হওয়া উচিৎ তাদের পক্ষে সে লক্ষ্যে কূটনৈতিক নীতিমালায় মৌলিক পরিবর্তন আনেন। যুদ্ধ করে দেওয়ার বদলে তাদেরও যুদ্ধে সাহায্য করা। নিক্সন এটাকে একটি উত্তম মূলনীতি ভেবেছিলেন। নিক্সন মতবাদের অধীন যুক্তরাষ্ট্রের নয়া মূলনীতি ছিল প্রকাশ্য তৎপরতা নিম্ন পর্যায়ে রাখা। ইত্যবসরে যুক্তরাষ্ট্র ১৯৬৫ সালের ধ্বংসাত্মক পাক-ভারত যুদ্ধের পর হতে উপমহাদেশের ব্যাপারে জড়িয়ে না পড়ার নীতি শুরু করেছিল; ভারত ও পাকিস্তান উভয়কে সামরিক সাহায্য প্রদান বন্ধ করে দেওয়া হয়, অর্থনৈতিক সাহায্য চালু থাকে, যদিও তার পরিমাণ হ্রাস পায়।

নতুন মার্কিনী নীতিমালার অধীনে দক্ষিণ এশিয়া কিংবা মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় কম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত এলাকায় পরিণত হলেও যুক্তরাষ্ট্র এ অঞ্চলে পূর্বে গৃহীত কূটনৈতিক তৎপরতা থেকে সরে আসেনি বা সম্পূর্ণভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের জন্য ছেড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে চায়নি। নিকট প্রাচ্য, আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক সহকারী প্রতিরক্ষা সচিব জেমস্. এইচ. নয়েস ১৯৭৩ সালে দক্ষিণ এশিয়ার প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নতুন নীতিমালা ব্যাখ্যা করে বলেন, দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা স্বার্থ নেই। উপমহাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের যে সব স্বার্থ রয়েছে তা প্রথমত রাজনৈতিক। তা হচ্ছে এ অঞ্চলের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় মৌলিক আগ্রহ এবং কোনো বহির্শক্তি কোনো একটি আঞ্চলিক রাষ্ট্রের উপর যাতে প্রাধান্য বিস্তার না করে তা নিশ্চিত করা।[৫২]

সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চীনের প্রাথমিক বিরোধ আদর্শিক প্রতীয়মান হলেও প্রকৃত পক্ষে তা ছিল দু'টি দেশের প্রভাব বলয় বিস্তারের প্রতিযোগিতা। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে তার ক্রমবর্ধমান বিবাদের কারণে সম্প্রসারণবাদী পথ অনুসরণ করে চলে আপাতদৃষ্টিতে উপমহাদেশে রাশিয়ার ঐতিহ্যগত স্বার্থানুসারে, যা লর্ড কার্জন মানসপটে দেখতে পেয়েছিলেন ১৯০০ সালের দিকে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আটককৃত সোভিয়েত নাজী দলিলাদিতে প্রকাশ পেয়েছে "সোভিয়েত সরকার পারস্য উপসাগর ও ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে তার স্বার্থ অনুসন্ধানে পুরানো জার আমলের নীতিরই অনুসারী।[৫৩] ক্রেমলিন নেতৃবৃন্দ ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালব্যাপী নিরবচ্ছিন্নভাবে কূটনৈতিক তৎপরতায় নিয়েজিত ছিল চীনকে ঘিরে ফেলার নীতিতে, যার পূর্ণাঙ্গ পরিকল্পনা ছিলো এশিয়ায় অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক বলয় তৈরি করা। ব্রেজনেভ পরিকল্পনা নতুন সোভিয়েত পদক্ষেপসমূহের প্রধান উদ্দেশ্য চীনকে বিচ্ছিন্ন ও ঘিরে ফেলার সাথে সাথে এ অঞ্চলে তার বৃহৎশক্তিসুলভ আশা আকাঙ্ক্ষারও চরিতার্থ সাধন। সোভিয়েত-চীন বৈরিতার ক্রমবর্ধমানতায় প্রতিফলিত হয় ১৯৬৯ এবং ১৯৭০ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কূটনৈতিক পদক্ষেপসমূহে। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে সামরিক চুক্তির বিরোধিতা করে রুশ নেতৃবৃন্দ উৎকর্ষতা দেখতে পান 'ডালেসবাদ-এ' ফিরে যান। যার মূল কথা ছিল "we took strong action" কারণ চীনের বিরুদ্ধে তাদের জাতীয় স্বার্থের দ্বন্দ্ব প্রকট আকার ধারণ করে। বিশেষত ডামনেস্কি দ্বীপ ও উসুরী নদীর পূর্বতীর পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে। ১৯৬৯ সালে জুন মাসে মস্কোতে বিশ্ব কমিউনিস্ট সম্মেলনে ৭৫টি দেশের পার্টি প্রতিনিধিদের সামনে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সেক্রেটারি ব্রেজনেভ চীনের কঠোর সমালোচনা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পদক্ষেপসমূহের প্রতি সাড়া দিতে পাকিস্তানের বিশেষ অসুবিধা ও উভয় সংকট ছিলো। কারণ, সে বুঝতে পেরেছিল যে, কোসিগিনের আঞ্চলিক অর্থনেতিক গোষ্ঠীবদ্ধকরণ পরিকল্পনা এবং ব্রেজনেভের এশীয় সম্মিলিত প্রতিরক্ষা[৫৪] পরিকল্পনা উভয়ই তার ঘনিষ্ঠতম মিত্র চীনের বিরুদ্ধে তাক করা, যে চীন ভারত ও পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞার পরও দেশটি পাকিস্তানে প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারীতে পরিণত হয়েছে। পাকিস্তান ও চীন এবং সোভিয়েত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার বৈপরীত্য এবং পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের বিনিময়ে মস্কোর সম্পর্কের অন্বেষণে অনেক কাঠখড় পোড়ানোর দরকার ছিল।

কিন্তু ১৯৭০ সালের শুরু হতেই সোভিয়েত পত্র-পত্রিকা ও প্রচার মাধ্যম পুরানো পাকিস্তানবিরোধী নিন্দাবাদের অভিযানে ফিরে যায়।[৫৫] উদাহরণস্বরূপ নিউ টাইমস্

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পত্রিকা ১৯৭০ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের উপর এক দীর্ঘ নিবন্ধ প্রকাশ করে যা ছিলো সমালোচনা ও বিদ্বেষপূর্ণ মন্তব্যে পরিপূর্ণ। এমন সময়ে তা করা হয় যখন পাকিস্তান সরকার মোকাবিলা এড়াতে এবং পূর্ব ও পশ্চিম-পাকিস্তানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক আলোচনায় রত ছিল। নিউ টাইমস্ পত্রিকার নিবন্ধ এ সময়ে পাকিস্তানের প্রতি কঠোরতর সোভিয়েত মনোভাবকেই প্রতিফলিত করে; মস্কোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতও 'ক্রমবর্ধমান চাপ' এবং 'কঠোর মনোভাব' এর খবর পাঠাতে থাকেন। বাংলাদেশ সংকটের প্রাক্কালে পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েত মনোভাব ও নীতি এবং "বাংলাদেশর দুর্গত মানবতা'র জন্য সোভিয়েত উদ্বেগ অনুধাবন করার দূরবর্তী সিগন্যাল মাত্র। সোভিয়েত রাশিয়া কেবল বাংলাদেশে দুর্গত মানবতার কারণেই বিচলিত এমনটি নয়।[৫৬] বরং এক্ষেত্রে উপমহাদেশে বিশেষকরে ভারতের সঙ্গে তার সম্পর্কের বিষয়টিও প্রাধান্য পেয়েছে।

চীনও সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কারণে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মধ্যে ছিলো যা আইয়ুবের মনে চীনা সাহায্যের ব্যাপারে ভয়ের সৃষ্টি করেছিল, মওলানা ভাসানী চীনা বিপ্লবের অনুসরণে লালটুপি বাহিনী তৈরি করে এবং মাও সেতুং-এর নির্দেশে দীর্ঘ দিন 'আইয়ুবকে বিরক্ত না করার' নীতি আঁকড়ে ধরে থাকলেও ১৯৬৮ সালের শেষের দিকে এসে দেশের বিরাজমান অবস্থা বিবেচনায় আইয়ুব খানের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করতে মওলানা ভাসানী বাধ্য হন।[৫৭] চীন ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্তানে অস্ত্রের চালান অব্যাহত রাখে।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান যখন নিক্সনের দেওয়া বিরাট দায়িত্ব ওয়াশিংটন ও পিকিং এর মধ্যে 'দূত' হিসেবে কাজ শুরু করেন তখন চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক আবারো ঘনিষ্ঠ হয়। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভূমিকা ওয়াশিংটনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক উন্নত করে যেহেতু পাক-ভারত সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে উপ-মহাদেশের বাস্তবতা ও গতিশীলতার ব্যাপারে নিক্সনের উত্তম উপলব্ধি ছিলো। ১৯৭০ সালের নভেম্বরে ইয়াহিয়া খান যখন পিকিং সফর করেন, তখন চীন পূর্ব-পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতা আন্দোলনের জন্য সক্রিয় 'বহিঃশক্তি'র ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল।[৫৮] পাকিস্তানের গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ, বেসামরিক এবং সামরিক উভয়ই ১৯৭০ সালে পাকিস্তান যখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান উত্তেজনা প্রশমনে একটি টেকস্ই রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্বেষণ করছিল তখন পূর্ব-পাকিস্তানে সক্রিয় বহিঃশক্তিসমূহের হস্তক্ষেপের 'ব্যাপারে খবর দিয়েছিল'।

এ হচ্ছে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধপূর্ব দক্ষিণ এশীয় বহুমাত্রিক কূটনীতিক চিত্র। সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল এবং অন্যান্য চীনবিরোধী পদক্ষেপে যোগ দিতে তার অস্বীকৃতির কারণে। পাক-চীন এবং পাক-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক ছিল আন্তরিক এবং নিক্সনের নয়া চীন নীতির প্রেক্ষাপটে যাতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন, তা আরো উন্নত হয়।[৫৯] মস্কোর সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক যার পশ্চাতে ছিল পনের বছরের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কের ইতিহাস তা চীনের প্রভাব খর্ব করার ক্ষেত্রে দেশ আরো ঘনিষ্ঠতর হতে থাকে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তান সামরিক জান্তা ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতীয় পরিষদে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দল আওয়ামী লীগের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে না এই মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর নানা ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত এবং হীন কৌশল গ্রহণ করে। প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন তার মূল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু পশ্চিম পাকিস্তান এবং সামরিক বাহিনী। মূল শক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ তার পক্ষে সম্ভব ছিল না এবং ইচ্ছাও ছিল না। তিনি তার লক্ষ্য অর্জনের জন্য জুলফিকার আলী ভূট্টোকে উস্কে দিলেন যাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও ভূট্টোর মধ্যে কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা না হয়। ভূট্টো ও সামরিক জান্তার পরামর্শে তিনি ৩রা মার্চ আহুত পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। স্থগিত ঘোষণার ফলে বাঙালি জাতির নিকট পরিষ্কার হয়ে গেল যে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের কাছে ক্ষমতা দেবে না। এ সম্পর্কে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিরাজমান অবস্থা ও তাঁর পূর্ব অভিজ্ঞতা এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের ভিত্তিতে অবগত ছিলেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রাজ্ঞ রাষ্ট্রনায়কদের মতো এসব ষড়যন্ত্রকে মোকাবেলা করার জন্য শান্তিপূর্ণ হরতাল ও অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দিলেন। অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে তিনি তিন ধরনের কৌশল গ্রহণ করলেন : ক. শান্তিপূর্ণ অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে সমস্ত বাঙালি জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করা, খ. আলোচনার পথকে রুদ্ধ না করে বিশ্বকে দেখাতে চাইলেন তিনি নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পথকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন ও গ. অসহযোগ আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি বাংলাদেশের (পূর্ব পাকিস্তান) শাসনভার সহস্তে তুলে নিলেন। তাঁর নির্দেশ মতোই শাসন, নির্বাহী বিভাগ ও বিচার বিভাগের কার্যক্রম চলতে থাকে, সামরিক শাসকদের সমস্ত নির্দেশ অচল ও অকার্যকর হয়ে পড়ে। অসহযোগ আন্দোলনকে সশস্ত্রকরণের গোপন কৌশল গ্রহণ করেন। ১৫ই মার্চ ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বাংলাদেশে আলোচনার জন্য আগমন করলে তাকে 'অতিথি' হিসেবে অভিহিত করেন। একথাটির সহজ অর্থ বাংলাদেশ তখন প্রকৃত অর্থেই যেন একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। ইয়াহিয়া খান আলোচনা করলেন। জুলফিকার আলী ভূট্টো এলেন। আলোচনা ব্যর্থ হলো। প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক প্রশাসক ২৫শে মার্চ সন্ধ্যায় গোপনে বাংলাদেশ ছেড়ে চলে যাওয়ার পূর্বে সামরিক আক্রমণের নির্দেশ দিলেন যার ব্লুপ্রিন্ট 'অপারেশন সার্চলাইট' পূর্বেই প্রস্তুত ও অনুমোদিত ছিল। ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নিরস্ত্র বাঙালি জাতি ও বাঙালি সেনা অফিসার, ইপিআর, পুলিশ বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ শুরু করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[৬০]

দ্বিতীয় অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকারের[৬১] কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে আলোকপাত বিশেষ গুরুত্ব বহন করে যা সামগ্রিক কূটনৈতিক যুদ্ধকে সমৃদ্ধ করেছে।

নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি কর্তৃক স্বাধীনতার সনদ প্রণীত, সমর্থন এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ঘোষিত স্বাধীনতা ঘোষণার অনুমোদন, বাঙালি জাতির ন্যায়সঙ্গত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক পন্থায় মুজিবনগর সরকার গঠন ছিল যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণার প্রায় অনুরূপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশে মাটিতে বসে প্রতিবেশী ভারতীয় কূটনীতিকদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা প্রাপ্তির বিষয়টি চূড়ান্ত করা দুরূহ ছিল বলেই বঙ্গবন্ধু ব্রিটেনে এ-সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করেন। তার ফলশ্রুতিতে জনাব তাজউদ্দীন আহমদের পক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করা সহজ হয়।[৬২] দিল্লিতে ৪ঠা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারি বাসভবনে তাজউদ্দীন আহমদের সাক্ষাৎ হয়।[৬৩] তাজউদ্দীন আহমেদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বলেন, বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র এবং অন্যান্য সামরিক উপকরণ, সহযোগিতা এবং সংশ্লিষ্ট সাহায্যাদি প্রয়োজন।[৬৪] ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার পর তাজউদ্দীন আহমেদ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনের আনুষ্ঠানিক প্রয়োজনীয়তা তীব্রভাবে অনুভব করেন। কারণ ইন্দিরা গান্ধীর নিকট তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে উপস্থাপন এবং ২৬শে মার্চেই শেখ মুজিব হাইকমান্ডারদের নিয়ে সরকার গঠন করেছিলেন বলে ইন্দিরা গান্ধীকে জানিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল তাজউদ্দীন আনুষ্ঠানিক ঘোষণায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। নির্বাচিত সংসদ সদস্যগণ ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগরে স্বাধীনতার সনদ ঘোষণা করেন। ঘোষণাপত্রে বলা হয়, "বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের অবিসম্বাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের আইনানুগ অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ তারিখে ঢাকায় যথাযথভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা প্রদান করেন।" উক্ত ঘোষণায় আরো বলা হয়, "বাংলাদেশের সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী জনগণ কর্তৃক আমাদিগকে প্রদত্ত কর্তৃত্বের মর্যাদা রক্ষার্থে," "বাংলাদেশের জনগণের জন্য সাম্য, মানবিক মর্যাদা ও সামাজিক সুবিচার নিশ্চিত করণার্থে সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী রূপে বাংলাদেশের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করিলাম, এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক ইতিপূর্বে ঘোষিত স্বাধীনতা দৃঢ়ভাবে সমর্থন ও অনুমোদন করা হয়, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রপতি থাকবেন এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম প্রজাতন্ত্রের উপ-রাষ্ট্রপতি থাকবেন, এবং রাষ্ট্রপতি প্রজাতন্ত্রের সকল সশস্ত্র বাহিনীর সর্বাধিনায়ক।" এবং অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ করবেন। নির্বাহী, আইন প্রণয়ন, করারোপ, অর্থব্যয়ন এবং বাংলাদেশের জনগণকে একটি নিয়মতান্ত্রিক ও ন্যায়ানুগ সরকার প্রদানের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় অন্যান্য সকল কার্য সম্পাদন করতে পারবেন। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতার ঘোষণায় (Proclamation of Independence) জাতিসংঘ সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি প্রদান করা হয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রদত্ত ১০ই এপ্রিল ভাষণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতির রূপরেখা তুলে ধরেন। ভারত সরকারের নিকট বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায়, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার ক্ষেত্রে সাহায্য সহযোগিতার অনুরোধ, বিশ্বব্যাপী সুসংগঠিতভাবে প্রচার, বিশ্বজনমত বাংলাদেশের স্বপক্ষে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা, পাকিস্তানে কর্মরত কূটনৈতিকবৃন্দের পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক বার্তা হিসেবেই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ। ১৮ই এপ্রিল কলকাতায় পাকিস্তানের দূতাবাসের ডেপুটি হাইকমিশনার হোসেন আলী প্রথম বাংলাদেশের আনুগত্য স্বীকার, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তদ্‌পূর্বে ৮ই এপ্রিল নতুন দিল্লি দূতাবাসের বাঙালি কর্মকর্তা কে.এম. শাহাবুদ্দিন এবং আমজাদুল হক পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে ভারত সরকারের রাজনৈতিক আশ্রয় প্রার্থনা করেন এবং বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। পর্যায়ক্রমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় অধীন কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন ও সুইডেনে দূতাবাস গড়ে তোলা হয় এবং সেখান থেকে পরিকল্পিতভাবে মুক্তিযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার স্বীকৃতি আদায়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ২১ এপ্রিল বাংলাদেশ সরকার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনের প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করে। তিনি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন এবং ইউরোপের দেশসমূহে স্বাধীনতার স্বপক্ষে যৌক্তিক, বস্তুগত ও বিষয়ীগত দিকগুলো গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে তা ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়।

মুজিবনগর সরকার শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই তাদের কূটনৈতিক তৎপরতা সীমাবদ্ধ রাখেনি। পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতি এবং পাকিস্তানকে সামরিক ক্ষেত্রে সহায়তা বন্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এপ্রিলের তৃতীয় সপ্তাহে পাকিস্তান সামরিক প্রেসিডেন্টের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা এম. এম. আহমেদ যখন ওয়াশিংটন দাতা দেশগুলোর কনসোর্টিয়ামে যাচ্ছিলেন সাহায্য অব্যাহত রাখার আবেদন নিয়ে তখন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের নির্দেশে প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান তার পিছু নিয়ে লন্ডন ও ওয়াশিংটনে রওনা হন। রেহমান সোবহান-এর সঙ্গে প্রথম যোগাযোগ ঘটে এক ইংরেজের সঙ্গে যার নাম আইপি কারগিল। বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারার সঙ্গে তিনি সংক্ষিপ্ত বৈঠক করেন। বাংলাদেশের সমস্যার মানবিক দিকগুলো তাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। তিনি পাকিস্তানে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। প্রতিনিধিদল বাংলাদেশে পাকিস্তান সেনাবাহিনী নৃশংসতার উপরে একটি 'মানবিক বিপর্যয়'-এর প্রতিবেদন পেশ করলে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক সাহায্যকরণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসা পর্যন্ত কনসোর্টিয়াম পাকিস্তান নতুন সাহায্য দানের কোনো আশ্বাস দিতে অস্বীকৃতি জানায়। কনসোর্টিয়াম বৈঠকের ফলাফল পাকিস্তানের জন্য ছিল এক বিরাট ধাক্কা।[৬৫]

ভারতের অভ্যন্তরে জনমত গঠন, রাজনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের পদক্ষেপ গ্রহণ, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তির লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক উদ্যোগ গ্রহণ এবং সরকারের অভ্যন্তরে পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের ষড়যন্ত্র প্রতিহত করতে কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ, মুক্তিযুদ্ধকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে রূপ দেবার লক্ষ্যে সর্বদলীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন উল্লেখযোগ্য সিদ্ধান্ত। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া, চীন, ব্রিটেন এবং ভারতসহ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের নিকট মুজিবনগর সরকার গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশের মাটি হতে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাহার এবং সর্বোপরি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের বহুমাত্রিক কূটনৈতিক তৎপরতা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। মুক্তিবাহিনী ও মুজিববাহিনীর প্রশিক্ষণ শক্তিশালী করা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে গণমাধ্যমে দেশে-বিদেশে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে ব্যাপক প্রচার প্রপাগান্ডা ও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল গ্রহণ এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতায় স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় পরিকল্পিত কার্যোদ্যগ বিশেষভাবে উল্লেখ্য।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয় লোকসভায় বক্তৃতা করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানান।[৬৬] প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ই অক্টোবর, ১৫ নভেম্বর ও ২৩শে নভেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ প্রসঙ্গে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে ৩টি চিঠি লেখেন।[৬৭] বাংলাদেশ সরকার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার অনুরোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট বিবেচনায় এনে ভারত সরকার ১৯৭১ সালের ৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। ইতোমধ্যে ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতে সামরিক হামলা চালায়। এ আক্রমণও ভারতের জন্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার ক্ষেত্র তৈরি করে দেয়। স্বীকৃতির পরই পাকিস্তানিদের উপর বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর তীব্র হামলা শুরু হয়। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে পাকিস্ত ান বাহিনী বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর কাছে পরাজিত হতে থাকে এবং যুদ্ধের এক পর্যায়ে পর্যুদস্ত হয়ে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ১৬ই ডিসেম্বর ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পণ করে। মুক্তিযুদ্ধে মিত্রবাহিনীর সহায়তা, প্রবাসী সরকারকে ভারতের সার্বিক সাহায্য প্রদান ও শরণার্থীদের পুনর্বাসনে ভারত সরকারের উদ্যোগ মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের পরিচায়ক। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মুজিবনগর সরকার অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে একদিকে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, অন্যদিকে কূটনৈতিক যুদ্ধের কৌশলগত ভূমিকা যথাযথভাবেই পালন করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র ও সংগঠনসমূহের নিকট স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের যৌক্তিকতা তুলে ধরা, সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায়, গণহত্যা বন্ধ এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থ ও অস্ত্র সংগ্রহের উদ্যোগ, বহির্বিশ্বে বাংলাদেশ-স্বপক্ষে জনমত গঠন, জাতিসংঘ ও অন্যান্য সংস্থার সহযোগিতা কামনা, শরণার্থীদের দুর্দশা লাঘবের জন্য বিভিন্ন রকম তৎপরতা এই অধ্যায়ের আলোচিত বিষয়। এর সঙ্গেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিদেশি জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকে সার্থকভাবে জড়িয়ে ফেলার কূটনৈতিক তৎপরতা।

১৩ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী সুইডেন থেকে ফিনল্যান্ড গিয়ে ফিনিশ টেলিভিশনে সাক্ষাৎকার দেন এবং পার্লামেন্ট ভবনে কতিপয় পার্লামেন্ট সদস্যের সাথে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। ১৪ সেপ্টেম্বর আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের কোপেনহোগেনে পৌঁছেন, ডেনমার্কে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক কিস্টেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওস্টেগার্ড ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে একটা বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এভাবে তিনি একনাগাড়ে ৭-১৬ই সেপ্টেম্বর স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশগুলো সফর করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। এ সফরে সংশ্লিষ্ট দেশগুলোর সরকার ও জনগণ বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভে সক্ষম হয়।

১-১০ই সেপ্টেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় লন্ডনের বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির একটা প্রতিনিধি দল গমন করেন।[৬৮] প্রতিনিধি দলটি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জনপ্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশ পাকিস্তানি গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ কয়েকটি মুসলিম দেশ বিশেষকরে মিশর ও জর্ডানের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় সফল হন।[৬৯] প্রবাসী বাঙালিরা বিদেশে এক একজন রাষ্ট্রদূত হিসেবে উদ্যোগে কাজ করে বিশ্বজনমত গঠনে অবিস্মরণীয় তৎপরতা চালান।

২৫শে মার্চ হত্যাযজ্ঞের খবর প্রকাশিত হবার পরই বাঙালিদের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গের কাছে এর প্রতিবাদ জানাবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সেক্রেটারি রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী কিসিঞ্জার ও সিনেটে বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইটের কাছে কয়েকটি ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। জাতিসংঘের মহাসচিব উথান্ট ও নিরাপত্তা পরিষদের কাছেও অনুরূপ বার্তা যায়।[৭০]

১লা এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে সিনেটর কেনেডি ও সিনেটর হ্যারিস বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের গণহত্যার নিন্দা জানান এবং নিরীহ মানুষের উপর পাকিস্তানিদের আক্রমণ বন্ধে যথাযথ পদক্ষেপ নেবার জন্য মার্কিন সরকারকে আহ্বান জানান। মার্কিন প্রবাসী বাঙালিগণ এ দুই সিনেটনের বক্তব্যে উৎসাহিত হন।[৭১] এভাবে ক্রমান্বয়ে মার্কিন সমাজে বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি জাগ্রত হয়। এপ্রিল মাসেই হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডীন রবার্ট মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গলিন বাংলাদেশের অতীত বঞ্চনা ও সংঘটিত নারকীয় ঘটনার উপর ভিত্তি করে একটা প্রতিবেদন প্রস্তুত করে তা সরকারের কাছে তুলে ধরেন এবং পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধের সুপারিশ করেন। এ সুপারিশ বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে মার্কিন জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।[৭২]

১২ই এপ্রিল ইন্টারন্যাশনাল কমিটি অব ইউনিভার্সিটি ইমারজেন্সি (ICUE) বাংলাদেশে শিক্ষক ও ছাত্র হত্যার নিন্দা জানিয়ে একটি বিবৃতি প্রকাশ করে। এতে অনেক নোবেল বিজয়ী পণ্ডিত ও কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের শতাধিক শিক্ষক স্বাক্ষর করেন। ২৯শে এপ্রিল 'আমেরিকান সোসাইটি অব ইন্টারন্যাশনাল ল' এর বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় স্টেটলার হিলটন হোটেলে। এ সম্মেলনে নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক গর্ডন গটলিয়ের মানবাধিকারের উপর বক্তৃতায় বাংলাদেশের গণহত্যার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে পাকিস্তানে আন্তর্জাতিক নিষেধাজ্ঞা আরোপের দাবি জানান। তাঁর এ বক্তব্য মুক্তিসংগ্রামী মানুষকে নাড়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিতে সমর্থ হয়। এপ্রিল মাসের শেষদিকে বাংলাদেশ সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্রে গমন করেন। তিনি বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানের বৈষম্যমূলক নীতির কিছু চিত্র তুলে ধরেন এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানের বর্বরতার কথা উল্লেখ করেন। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের ১৭ই এপ্রিলের ভাষণের লিখিত কপি প্রচারের ব্যবস্থা করেন।[৭৩] তিনি ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্ক বাঙালি কূটনীতিকদের নিয়ে একটা বাংলাদেশ মিশন স্থাপনের উদ্যোগ নেন।

যুক্তরাষ্ট্রের অনেক সংস্থা ও সংগঠন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করে। বেঙ্গল স্টাডিজ কনফারেন্স, কমিটি অব কনসার্নড এশিয়ান স্কলারস, বেঙ্গল ক্রাইসিস কমিটি ও আমেরিকান এনথ্রোপোলজিক্যাল সোসাইটি নামক সংগঠনগুলো বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করে। নিউইয়র্কের মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেনে ১ আগস্ট জর্জ হ্যারিসনের বাংলাদেশ কনসার্ট সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[৭৪] পণ্ডিত রবিশংকের প্রচেষ্টায় এ অনুষ্ঠান হয়। অনুষ্ঠানের উপার্জিত অর্থ ইউনিসেফের মাধ্যমে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য পাঠানো হয়।[৭৫] এফ.আর. খানের প্রচেষ্টায় মে মাসেই শিকাগোতে বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ গঠিত হয়। ৬ই জুন শিকাগোতে সকল বাঙালি সমিতির প্রতিনিধিদের এফ.আর. খান শিকাগোতে আমন্ত্রণ জানান। সেখানে আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা হয়। ২৩শে জুন নিউইয়র্কে একটি কনভেনশন হয়। এ কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রে একটি বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টায় ৪ঠা আগস্ট ছয়জন কূটনীতিকসহ ১৪ জন বাঙালি পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতেই আগস্ট মাসে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট এ ঘটনাগুলো যুক্তরাষ্ট্রে সাড়া জাগায় এবং পাকিস্তান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়।

আগস্টের প্রথম সপ্তাহে এম. আর. সিদ্দিকী ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। এ সময় আনুষ্ঠানিক ভাবে ১২২৩, কানেকটিকাট এভিনিউতে মিশন স্থাপিত হয়। এম. আর. সিদ্দিকী মিশন প্রধান হিসেবে যোগদানের পর মিশন গতিশীল হয়। তিনি কানাডার টরেন্টো ও যুক্তরাষ্ট্রের লস এঞ্জেলসসহ বেশ কিছু জায়গায় সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বরে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে যোগাদানের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ১৬ সদস্যের একটি প্রতিনিধিদলকে বাংলাদেশ সরকার নিইউয়র্কে পাঠায়। এ প্রতিনিধি দল বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাঙালিদের উপর পাকিস্তানি বর্বরতার বর্ণনা দেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করেন। সাংবাদিক জে.কে. ব্যানার্জির অতিথি হিসেবে এ প্রতিনিধি দল জাতিসংঘ ভবনে যাতায়াত করতেন।[৭৬] বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের প্রচারমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিগণ বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের পটভূমি জানতে পারে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনেক দেশই সহমর্মিতা জ্ঞাপন করে। উল্লেখ্য যে, এ সময় বাঙালি হয়েও শাহ আজিজুর রহমান, রাজিয়া ফয়েজ ও মাহমুদ আলী পাকিস্তানের পক্ষে প্রচার চালানোর জন্য নিউইয়র্কে গিয়েছিলেন।[৭৭] বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ জাতিসংঘ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে জনসংযোগ করেন। প্রফেসর এ. আর. মল্লিক আমেরিকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা দেন।

২৭শে সেপ্টেম্বর–১লা অক্টোবর ওয়াশিংটনে বিশ্বব্যাংক ও আইএমএফ-এর যৌথসভা ছিল। এতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত হন। ড. নুরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান ও এ. এম. এ. মুহিত এখানে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচার কাজ চালান এবং পাকিস্তানে সাহায্য বন্ধের ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালান। বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ চিলি, ফিলিপাইন, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। ২রা অক্টোবর কনসোর্টিয়ামের সভায় কোনো দাতা দেশ পাকিস্তানকে কোনো প্রকার ঋণ প্রদান করেনি।[৭৮] এক্ষেত্রে পাকিস্তান কূটনৈতিকভাবে চরম পরাজয় বরণ করে এবং বাংলাদেশের কূটনৈতিক সাফল্য অর্জিত হয়।

সিনেটর কেনেডি ২৩শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশের শরণার্থীদের সহায়তার জন্য ৪০০ মিলিয়ন ডলার বরাদ্দ চেয়ে একটা বিল উত্থাপন করেন। এরপর অক্টোবর মাসে মার্কিন সিনেটে স্যাক্সবি চার্চ সংশোধনী উত্থাপিত হয়। এতে পাকিস্তানে মার্কিন সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব ছিল। অন্যদিকে, সিনেটর ফুলব্রাইট উত্থাপিত ভিন্ন একটা বিলে বাংলাদেশের শরণার্থীদের জন্য ২৫০ মিলিয়ন ডলার ত্রাণ সাহায্য বরাদ্দ করা হয়।[৭৯] স্বাধীনতাকামী মানুষের জন্য মার্কিন সিনেটে এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে অনুপ্রেরণাদায়ক। বাংলাদেশের কূটনীতিক ও বিশেষজ্ঞগণ সিনেটের এসব অধিবেশনকালে সদস্যদের সাথে যোগাযোগ রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে স্নায়ুযুদ্ধ বিরাজমান থাকায় যে কোনো আন্তর্জাতিক সংকটে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই বিপরীতমুখী অবস্থান গ্রহণ করে। মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নেয়। এজন্য বাংলাদেশ কমিউনিস্টভুক্ত দেশগুলোর সাথে যোগাযোগ রক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে। এরই অংশ হিসেবে হাঙ্গেরীর বুদাপেস্টে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে (১৬-২৪ মে, ১৯৭১) বাংলাদেশের প্রতিনিধিত্ব করেন আব্দুস সামাদ আজাদ, ডা. সারোয়ার আলী ও দেওয়ান মাহবুব আলী।[৮০] আবদুস সামাদ আজাদ এ সম্মেলন থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্র ও সরকারপ্রধানের কাছে বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের অনেক চিঠি পোস্ট করেন। বুদাপেস্ট থেকে আব্দুস সামাদ আজাদ পূর্ব জার্মানি যান। পূর্ব জার্মান সরকার বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে সরকারি মর্যাদা দেন। অতঃপর এখান থেকে তিনি চেকোশ্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড ও বুলগেরিয়া গমন করেন। সামগ্রিক বিচারে মুজিবনগর সরকারের উদ্যোগে, প্রেরণায় বিদেশি বাঙালিরা বলতে গেলে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সার্বিকভাবে যে সাহায্য-সহযোগিতা, বিশ্বজনমত গঠন, বিদেশে জনপ্রতিনিধি ও গণমাধ্যমকে বাংলাদেশের স্বপক্ষে সক্রিয় করা এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করেন তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়ে বন্দি শেখ মুজিবকে ঘিরে বিশ্ব কূটনৈতিক তৎপরতা পর্যালোচনা করা হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী যে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, পাকিস্তান কারাগার হতে নিঃশর্ত মুক্তি প্রদান, পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট কর্তৃক সামরিক ট্রাইব্যুনালে তাঁর বিচার কার্য বন্ধ এবং নিঃশর্ত মুক্তির লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র, ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়া ও ব্রিটেনসহ বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহের প্রতি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পত্র প্রেরণ, কার্যক্রম ও উদ্যোগ মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার এক বিশেষ অধ্যায়। পঞ্চম অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলির কূটনৈতিক তৎপরতা আলোচনা করা হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায়ে জাতিসংঘে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতিসংঘের বহুমাত্রিক ভূমিকা এবং মুক্তিযুদ্ধের বিশেষ পর্যায়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সামরিক সংঘর্ষ এবং জাতিসংঘের কার্যক্রম সম্পর্কে এই অধ্যায়ে আলোচনা করা হয়েছে। বাংলাদেশের গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব উদ্বেগ প্রকাশ করলেও পাকিস্তান সামরিক জান্তার নৃশংস গণহত্যার বিরুদ্ধে নিন্দাসূচক বক্তব্য প্রদানে বিরত থাকেন। তবে বাঙালি শরণার্থীদের জন্য সাহায্য-সহযোগিতার ক্ষেত্রে তাৎক্ষণিক ইতিবাচক ভূমিকা লক্ষণীয়। কিন্তু শরণার্থী প্রশ্নে মূল স্থায়ী সমস্যা নিরসনে যে রাজনৈতিক প্রশ্ন জড়িত জাতিসংঘ সে ক্ষেত্রে অর্থবহ ভূমিকা পালন করতে সক্ষম হয়নি। জাতিসংঘের অভ্যন্তরে অথবা বাইরে পরাশক্তিগুলোর পারস্পরিক স্বার্থ সমন্বিত করার কোনো উদ্যোগ দেখতে পাওয়া যায়নি। নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে জাতিসংঘ কেবল দীর্ঘ বিতর্কের অঙ্গন হিসেবেই বিবেচিত হয়। তবে লক্ষণীয় ৪ঠা ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশনের পূর্বাহ্নে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য মৌলিক পত্র পেশের আবেদন জানান। তাঁর পরিপ্রেক্ষিতে দীর্ঘ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। সে বিতর্কে বাংলাদেশের প্রতিনিধি আবু সাঈদ চৌধুরীকে পরিষদে বক্তব্য রাখার সুযোগ না দিলেও নিরাপত্তা পরিষদে পত্রটি বিলি করার অনুমতির মাধ্যমে তা জাতিসংঘে অফিসিয়াল ডকুমেন্ট হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। এটা ছিল একটি কূটনৈতিক বিজয়।

নিরাপত্তা পরিষদে চীন-মার্কিন উদ্যোগ অকেজো হয়ে যায় প্রধানত সোভিয়েত ভেটোর কারণে। পাশাপাশি ফ্রান্স ও ব্রিটেনের নিরপেক্ষ অবস্থান বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধের সহায়ক ভূমিকা হিসেবে কাজ করে। সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার পক্ষে ১০৪টি দেশ ভোট প্রদান করে, বিপক্ষে ১১টি এবং ভোটদানে বিরত থাকে ১৬টি দেশ। কিন্তু, ততদিনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় নিশ্চিত হয়ে গেছে। ফলে সাধারণ পরিষদের বৈঠকের ফলাফল কার্যত কোনো কাজে আসেনি। চীন-যুক্তরাষ্ট্রের বহুমাত্রিক কূটনীতি, আগ্রাসন এবং মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিলেও কূটনৈতিক বিজয়ের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাশাপাশি দ্রুততম সময়ে সামরিক বিজয় বাংলাদেশ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে শত কূটিল বৈরীতা ও প্রতিকূলতার মাঝেও প্রতিষ্ঠিত হয়।

অষ্টম অধ্যায়ে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে চতুর্ভূজ কূটনৈতিক যুদ্ধ বিষয়ে আলোচিত হয়েছে। ১৯৪৭-১৯৭১ সালের জাতীয়-আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন ঘটনা, পটভূমি ও ভূমিকা প্রথম অধ্যায়ে বিস্তারিত না হলেও মোটামোটিভাবে তুলে ধরার প্রয়াস নেওয়া হয়েছে। তৎকালীন বিশ্ব রাজনীতির অঙ্গনে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র এবং পুজিবাদী রাষ্ট্র বিশেষকরে পশ্চিমা দেশের মধ্যেকার স্নায়ুযুদ্ধ বিশ্বকে দুই শিবিরে বিভক্ত করে রেখেছিল। পূর্ব ইউরোপের মতো দেশ ওয়ারশ চুক্তির মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের আদর্শিক আনুগত্যের বলয়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপের একাধিক দেশকে নিয়ে ন্যাটো জোট গঠন করতে সমর্থ হয়েছিল। সমাজতান্ত্রিক ও পুজিবাদী গণতান্ত্রিক ধাচের জোটবদ্ধ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে এইসব দ্বন্দ্ব বিস্তৃত হয়েছিল। জন্মলগ্ন হতেই পাকিস্তান অর্থনৈতিক ও সামরিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। পাকিস্তানের কূটনৈতিক লক্ষ্য নির্ধারণে মূল শত্রু হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল ভারত। ভারত বিভক্তির পর পরই কাশ্মীরকে নিয়ে যে যুদ্ধ হয় সেই যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে পাকিস্তান মিত্র হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের কব্জায় গিয়ে পড়ে। ফলে সিয়াটো ও সেন্টো দুটি প্রতিরক্ষা চুক্তিতে স্বাক্ষর করে এবং তার সদস্যভুক্ত হয়, যা ছিল মার্কিন নেতৃত্বাধীন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব ও তাদের স্বার্থরক্ষার লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের গণ-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করার লক্ষ্যে ১৯৫৮ সালে পাকিস্তানের প্রধান সেনাপতি জেনারেল আইয়ুব খান মার্কিনীদের প্রত্যক্ষ সম্মতিতে ক্ষমতা দখল করে এবং সামরিক শাসন জারি করে। এর ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক এবং শাসনতান্ত্রিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের ব্যাপক ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান বিরোধী শক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো তাদের প্রভাব বলয়, প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার প্রচার প্রচারণা এবং ক্ষেত্র বিশেষে সম্প্রসারণ মনোভাব দুই পরাশক্তির দ্বন্দ্ব বিশ্বকে দুই কূটনৈতিক শিবিরে বিভক্ত করে। ১৯৪৯ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থনে সমাজতান্ত্রিক চীনের অভ্যুদয় ঘটে। কিন্তু রাশিয়া এবং চীনের মধ্যে প্রথম দিকে প্রতিরক্ষা, অর্থনৈতিক সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হলেও পরবর্তীকালে বিভিন্ন ঘটনা প্রবাহের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৬০ দশক থেকে এ দু'টি রাষ্ট্রের মধ্যে বৈরীতা সৃষ্টি হয়। ফলে আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক শিবির বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং বিশ্বব্যাপী একে অপরের শত্রুতে পরিণত হয়। ব্রেজনেভ মতবাদ ১৯৬৯ সালের জুনে ঘোষিত হলে চীন পর্যবেক্ষণ করে যে, এর অন্তরালে রয়েছে চীন-সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে এশিয়ায় সোভিয়েত যৌথ নিরাপত্তাব্যবস্থা। এ ধরনের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় সোভিয়েতের লক্ষ্য ছিল দ্বিমুখী। চীনকে ঘিরে ফেলা এবং এশিয়ার দেশসমূহের উপরে সোভিয়েতের প্রাধান্য বিস্তার। চীন স্পষ্টতই প্রত্যক্ষ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে কাছে টানার উদ্যোগ নিয়েছে এবং এই উদ্যোগ ছিল চীন-ভারত দ্বন্দ্বের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।[৮১] যুক্তরাষ্ট্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত ইউনিয়নের পারস্পরিক শত্রুতার প্রেক্ষিতে চীনের নিজস্ব স্বার্থেই যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি নমনীয়তা যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে মৈত্রী সম্পর্কে স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন চীন-মার্কিন দুই দেশ পারস্পরিকভাবে মৈত্রী বন্ধনে অগ্রসর হয়। দক্ষিণ এশিয়ায় পররাষ্ট্রনীতিতে চীনের আদর্শগত ভিত ছিল না, নিজস্ব স্বার্থগত অবস্থান তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। চীন নিজস্ব কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে লক্ষ্য করেছে পাকিস্তানের মতো একটি মিত্র দেশ দুর্বল হয়ে পড়লে তা অভিন্ন শত্রু ভারত শক্তিশালী হয়ে উঠবে। সেজন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন যে ভূমিকা গ্রহণ করে তা ছিল স্বীকৃত পঞ্চশীলা নীতির পরিপন্থি, কেননা পঞ্চশীলা নীতির মর্মকথাই হলো শান্তি পূর্ণ সহবস্থান। ১৯৪৯ সালে দক্ষিণ এশিয়ার বৃহৎ শক্তি হিসেবে ভারতের প্রতি চীনের মনোভাব ছিল প্রায় বন্ধুত্বসুলভ। ভারত প্রথম থেকেই নির্জোট পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করার ফলে কোরিয়া এবং তিব্বতের মতো চীনের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভারতের নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গির ফলে ভারতের প্রতি চীনের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। এশিয়া বিষয়ে দুই দেশই যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের হস্তক্ষেপমূলক নীতি সীমিতকরণ বিষয়ে ঐকমত্য প্রবণতা দেখা যায়। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৪ পর্যন্ত দুই প্রতিবেশী দেশ দুটির মধ্যে সংলাপ সহযোগিতা এবং ১৯৫৪ সালে তিব্বত চুক্তি সম্পাদন করে। এছাড়াও এ চুক্তিতে পঞ্চশীলা নীতি গৃহীত হয়, যে নীতিতে শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময়ে ভারত 'বান্দুং নীতি'র[৮২] ধারক বাহক হিসেবে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এশিয়া-আফ্রিকায় নব স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশসমূহের মুখপাত্র হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করতে প্রয়াসী হয়। চীনও ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুবাদে এবং পঞ্চশীলা নীতিমালার আলোকে অনেক আফ্রো-এশীয় দেশসমূহের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। ভারতের সঙ্গে চীন সুসম্পর্ক বজায় রাখলেও পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলার প্রয়াস চালায়। কিন্তু জাতীয় স্বার্থে দুই দেশের সীমান্তের অধিকার ও কর্তৃত্ব নিয়ে ভারত-চীন সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৬২ সালে চীন ভারত সীমান্তে স্বল্পকালীন অথচ এক তীব্র যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তি ভারতকে কূটনৈতিক সমর্থন এবং সামরিক সহযোগিতা প্রদান করে। এতে চীনের ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, ভারত বান্দুং নীতিমালা পরিত্যাগ করেছে, জোটনিরপেক্ষ নীতিমালা বিসর্জন দিয়েছে এবং সোভিয়েত এবং ভারত সম্পর্কের অন্তরালে পারস্পরিক স্বার্থের বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে।

চীন তার নিজস্ব নীতিমালার আলোকে ভারতের বৈরী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের মাধ্যমে চীন পাকিস্তানের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান গ্রহণ করায় চীন এবং ভারতের মধ্যে বৈরী সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত রাশিয়ার ভূমিকা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের বিষয়টি উল্লেখ্য।

আদর্শিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত এবং পাকিস্তান দুই প্রতিযোগী শক্তিকে কমিউনিস্ট বহির্ভূত রাষ্ট্র হিসেবে কাঠামোগত ব্যবস্থার মধ্যে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ছিল। যুক্তরাষ্ট্র কৌশলগত দৃষ্টিভঙ্গি ও আঞ্চলিক শক্তিদ্বয়ের দ্বান্দ্বিক সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিত মনে রেখেই তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৫০-এর দশকে ভারত মার্কিন সৃষ্ট সামরিক জোটে যোগ না দেওয়ার ফলে পাকিস্তানকে দিয়েছে সামরিক সরবরাহ। একই সাথে ভারতকে হাতে রাখার নীতি হিসেবে অর্থনৈতিক সাহায্য প্রদান করে একটি ভারসাম্যমূলক নীতি গ্রহণ করেছে। যা ভারত সর্বদা যুক্তরাষ্ট্রের এই ভারসাম্যমূলক নীতিকে পাকিস্তানপন্থি হিসেবেই বিবেচনা করে। ১৯৬২ সালে দক্ষিণ এশিয়া মার্কিন নীতির কৌশলগত পরিবর্তনকে পাকিস্তান মৈত্রী সম্পর্কের অবনতি হিসেবে ধরে নেয়। ঐ সময় চীন-ভারত যুদ্ধে মার্কিন সামরিক সরঞ্জাম ভারতে প্রেরণ পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করে তুলে। পক্ষান্তরে, ১৯৭১ সালে চীনের প্রতি মার্কিন দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ভারত তার কৌশলগত হুমকি হিসেবে দেখে। সোভিয়েত ইউনিয়ন পঞ্চাশ দশকের মাঝামাঝি দক্ষিণ এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক মৈত্রী চুক্তিকে সোভিয়েতবিরোধী বেষ্টনী সৃষ্টির প্রয়াস হিসেবে মনে করে। সোভিয়েত রাশিয়া কৌশলগত স্বার্থ অন্বেষায় দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের সঙ্গে বন্ধুপ্রতিম সম্পর্ক গড়ে তুলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ এশিয়ায় গৃহীত নীতির সঙ্গে ভারতের সমর্থন প্রায় সর্বদায় একীভূত হয়ে থাকে। ভারত এবং সোভিয়েত-এর সম্পর্ককে দৃষ্টান্ত হিসেবে তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে উপস্থাপন করার লক্ষ্যে প্রযুক্তি ও শিল্পখাতে ভারতের ক্রমবর্ধমান শক্তি সঞ্চয় সোভিয়েত নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এরূপ একটি বৈশ্বিক পরিস্থিতিতে একদিকে যুক্তরাষ্ট্র ও চীন এবং অন্যদিকে ভারত এবং সোভিয়েত রাশিয়ার পারস্পরিক বিরোধী চতুর্ভুজ কূটনীতির দ্বান্দ্বিক জটিলতা বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে বিশ্বযুদ্ধের অনুক্ত ঝুঁকির দিকে ঠেলে দিয়েছিল।

তথ্য সংকেত

১. *R. Palme Dutt, India Today and Tomorrow,* London, 1956, p.3. & p.287.

২. শুধু ১৯৭১-এর এপ্রিলের দিকে যুক্তরাষ্ট্র দ্রুত পর্যায়ে কয়েকটি 'Position Paper' Ges 'Report' তৈরি করে। বিশেষত কিভাবে মার্কিন বাংলাদেশ সমস্যা মোকাবেলা করতে হবে সে বিষয়ে সরকারের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কিত সুপারিশমালা সংযোজিত হয়।

৩. দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখ করা যায় যে, একজন বিশ্লেষক 'বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের বিষয়কে দুটো পরাশক্তি ও কয়েকটি বৃহৎশক্তির মিশ্র প্রক্রিয়ার ফল' বলে অভিহিত করেন। এ মতে, বৃহৎ শক্তিগুলোর একটি ছিল 'প্রতিবেশী চীন ও অতি উচ্চাভিলাষী কতিপয় মাঝারি ধরনের শক্তি, যাদের মধ্যে প্রতিবেশী ভারত ছিল একটি।' Dr. M. A. Aziz, "Bangladesh Relations with India", *Endeavor*, Vol. 8, Nos. 10 and 11 (February 1989।

৪. দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ্য, "China and the Energence of Bangladesh: Role of Great Power Global Perceptions", *India Quarterly*, Vol. 39, No. 2 (April-June 1983।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫. পঞ্চশীলের অর্থ ব্যাখ্যা করে পণ্ডিত নেহেরু বলেছিলেন যে, "The conception of Panchasheel means that there may be different outlooks but that broadly, the ultimate objectives may be the same."। পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিবৃন্দ পরস্পরের সীমানা অতিক্রম করে আক্রমণ করবে না ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে চুক্তিবদ্ধ। পারস্পরিক সহায়তা, সহাবস্থান ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করা পঞ্চশীলের অঙ্গ।

৬. Md. Abul Khair, *United States Foreign Policy in the Indo-Pakistan Subcontinent (1939-1947), Vol. I*, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1968, p. 99.

৭. ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মূল রাষ্ট্রীয় নীতিমালা ব্যাখ্যা করে গণপরিষদে প্রথম যে বক্তৃতা করেন সেই বক্তৃতায় অন্য কোনো রাষ্ট্রের প্রেরিত শুভেচ্ছাবাণী উল্লেখ না করলেও যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রেরিত বাণীটি গণপরিষদে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে পাঠ করেন। গভর্নর জেনারেলকে লেখা সে বাণীটি ছিল, "I have the honor to communicate to you. in your Excellency's capacity as President of the Constituent Assembly of Pakistan, the following message which I have just received from the Secretary of State of United State. on the occasion of the first meeting of the Constituent Assembly for Pakistan, I extend to you and to members of the Assembly, the best wishes of the Government and the people of the United States for the successful conclusion of the great work you are about to undertake.'

৮. Md. Abul Khair, *op.cit.*, p. 99.

৯. ইরানের প্রধানমন্ত্রী মোসাদ্দেক তেল সম্পদ জাতীয়করণ করলে ব্রিটিশ ও মার্কিন তেল কোম্পানি ও ওই দুটি দেশের স্বার্থে তা প্রচণ্ড আঘাত হানে। বস্তুত যুক্তরাষ্ট্র বেপরোয়া হয়ে মোসাদ্দেককে হটানোর জন্য সিআইএ-র মাধ্যমে ব্যাপক পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ইরানে ড. মোসাদ্দেকের কার্যক্রম যা ইরানের জাতীয় স্বার্থে গৃহীত হয়েছিল তাতে মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে মার্কিনীদের মার্শাল প্ল্যান চরম হুমকির সম্মুখীন হয় ও ডালেসের গ্লোবাল পরিকল্পনায় আঘাত হানতে উদ্যত হয়। এর পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সাথে কার্যকর ও অর্থবহ সামরিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী হয়ে ওঠে।

১০. পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পরপরই গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মার্কিন অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের জন্য মেমোরেন্ডাম প্রেরণ করেন। এই মেমোরেন্ডাম প্রণয়নের পেছনে লিয়াকত্ আলী খানের হত্যা-পরবর্তী নাটকীয়তায় ক্ষমতা দখলকারী গোলাম মোহাম্মদের হাত ছিল সর্বাপেক্ষা কার্যকর। গভর্নর জেনারেল কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ অর্থমন্ত্রী ও পাক-মার্কিন সম্পর্ক স্থাপনের বিশ্বস্ত ও অক্লান্ত ব্যক্তিত্ব গোলাম মোহাম্মদের পরিকল্পনা অনুযায়ী মীর লায়েক আলীকে ওয়াশিংটনে প্রেরণ করেন। মেমোরেন্ডামে বলা হয়–'Primarily defence and secondly, economic development are the two vitally essential features of Pakistan's life and for both of these he has to look firstly to the U.S. and then to Great Britain for assistance. M.S. Venkataramani, *American Role in Pakistan*, Pp. 18-19.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের আসন সংখ্যা ছিল ৬৯টি। জনসংখ্যা অনুপাতে পূর্ববঙ্গের ভাগে ছিল ৪৪টি। পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে ২৫টি। ভারত থেকে ৮০ লক্ষ রিফিউজি পশ্চিম পাকিস্তানে এলে গণপরিষদে আরো ১০টি আসন ছেড়ে দেয়া হয়। তারপরেও পূর্ববঙ্গের আসন সংখ্যা বেশি থাকায় প্রধানমন্ত্রী লিয়াত আলী খান আদেশের সুরে খাজা নাজিম উদ্দিনকে অনুরোধ করলে আরো ৬টি আসন ছেড়ে দেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গে আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১টি। তিনি প্রকৃত অর্থেই ছিলেন দুর্বল চিত্ত, উর্দুভাষী বলে জনবিচ্ছিন্ন ছিলেন।

১২. প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের হত্যার পর গভর্নর জেনারেল পদ হতে খাজা নাজিমুদ্দিনকে বিতাড়িত করে গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেলের পদ দখল করেন। খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীত্বের আসনে বসানো হয়। কিন্তু মাত্র আড়াই বছর যেতে না যেতেই (১৯-১০-১৯৫১ – ১৭-০৪-১৯৫৪) গোলাম মোহাম্মদ অন্যায়ভাবে খাজা নাজিমুদ্দিনকে প্রধানমন্ত্রীর পথ থেকে হটিয়ে দেয় এবং তদস্থলে বগুড়ার মোহাম্মদ আলীকে (যিনি ঐ সময়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত ছিলেন) মন্ত্রী পরিষদে মার্কিনীদের বিশ্বস্ত অনুচর প্রতিরক্ষা সচিব ইস্কান্দার মীর্জা ও প্রধান সেনাপতি আইয়ুব খানকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর নিকট প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব অর্পিত ছিল। এই প্রথমবারের মতো সেনাবাহিনী প্রধানকে প্রত্যক্ষ রাজনীতি ও নীতিনির্ধারণী ব্যবস্থাপনায় আনা হয়।.বলা বাহুল্য, যুক্তরাষ্ট্র বিশেষকরে গোলাম মোহাম্মদের সরাসরি হস্তক্ষেপেই এই দু'জনকে মন্ত্রী পরিষদে গ্রহণ করা হয়।

১৩. পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার ইস্যুকে সামনে রেখে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে পূর্ববঙ্গের প্রায় সবগুলো ভোট পড়ে পাকিস্তানের পক্ষে। মুসলিম লীগ নিরঙ্কুশভাবে পূর্ববঙ্গে বিজয়ী হয়। অন্যদিকে, ঐ নির্বাচনে সীমান্ত প্রদেশে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের নিকট হেরে যায়। সিন্ধু ও পাঞ্জাবে অল্প ভোটের ব্যবধানে কোনো রকম মুসলিম লীগ বিজয়ী হয়। সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব সব মিলিয়ে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের জনসংখ্যা ছিল পাকিস্তানের শতকরা ৪৪ ভাগ। পাকিস্তানের প্রথম গণপরিষদের সর্বমোট আসন সংখ্যা ছিল ৬৯টি। জনসংখ্যার অনুপাতে ঐ ৬৯টির মধ্যে পূর্ববঙ্গের ভাগে ৪৪টি আসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানিদের ভাগে ২৫টি আসন পড়ে। শরণার্থীদের জন্য দশটি আসন সবকটিই পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হয়। এতেও পূর্ববঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে গেলে পূর্ববঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববঙ্গের কোটা হতে আরো ৬টি আসন ছেড়ে দেন। ফলে পূর্ব বাংলার আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৩৮টি এবং পশ্চিম পাকিস্তানের আসন সংখ্যা দাঁড়ায় ৪১টি। পাকিস্তান গণপরিষদে লিয়াকত আলী খান পূর্ববঙ্গের আসন থেকে প্রতিনিধিত্ব করেন।

১৪. ১৯৫০ সালের ১০ই জানুয়ারি কলকাতার 'মুসলিম নিধন' এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ জানানোর জন্য প্রতিবাদ দিবসে আহূত জনসভাটিতে মুসলিম লীগ ঘোর সাম্প্রদায়িক বক্তৃতার মাধ্যমে কাফেরদের উপর আক্রমণ ও ধন-প্রাণ-সম্পত্তি ধ্বংসের উসকানি দেয়। এর ফলে ঢাকাসহ বরিশাল, ময়মনসিংহ প্রভৃতি কয়েকটি এলাকা দাঙ্গায় আক্রান্ত হলো। সারা পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা লাগানোর অশুভ তৎপরতা চলে। এই দাঙ্গায় ১৪ লক্ষ হিন্দু পশ্চিম বঙ্গে চলে গেলেন।

১৫. ভাষার উপর হামলাই বাংলার সকল শ্রেণি ও পেশার মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করল। মুখের ভাষা কেড়ে নেবার জঘন্য চক্রান্তের মধ্য দিয়েই বাঙালি মুসলমান ভাই ভাই, ইসলামি সংহতির ভিতরকার গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করতে শিখল। আত্মপ্রত্যয়ে একটি জাতি জেগে উঠল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬. *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, ৫ই মে ১৯৫২।

১৭. বশীর আল হেলাল, *ভাষা আন্দোলনের* ইতিহাস, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৯, পৃ.৪৮৯, ৫১৬।

১৮. দেশের অন্য কোনো শ্রেণি বা পেশার মানুষ রাজনৈতিকভাবে সচেতন ও সংগঠিত না থাকার ফলে ভাষা আন্দোলন পরিচালনার মূল দায়িত্ব ছাত্রসমাজ ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণির উপর এসে বর্তায়। ভাষা আন্দোলনে ছাত্রসমাজের গৌরবদৃপ্ত আত্মদান, ত্যাগ তিতিক্ষা এবং ব্যাপক সাংগঠনিক তৎপরতা সমগ্র দেশে মুসলিম লীগের গণবিরোধী কার্যকর তুলে ধরে এবং ব্যাপক গণ-আন্দোলনের ভিত্তি সৃষ্টি করে।

১৯. মো. মাহবুবর রহমান, *বাংলাদেশর ইতিহাস* ১৯৪৭-৭১, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯, পৃ. ১০৭-১২৯ দ্রষ্টব্য। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনী ফলাফল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর নিকট চ্যালেঞ্জ হিসেবে প্রতীয়মান হয়। পূর্ববঙ্গের আইনসভার নির্বাচনে ৩১০টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট ২১৮টি ও ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ পায় মাত্র ৯টি আসন।

২০. ১৯৫৩ সালের ২৪শে ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে রাষ্ট্র প্রধান গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ অত্যন্ত খোলাখুলিভাবেই পূর্ববঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করার জন্য যে সমস্ত রাজনীতিবিদ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে জনগণকে সতর্ক থাকার পরামর্শ দেন।

২১. মুসলিম লীগকে সমূলে পরাজিত করার পর শেরে বাংলা এ.কে. ফজলুল হক সাহেবের নেতৃত্বে কৃষক প্রজাপার্টি, মৌলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ ও আশরাফউদ্দিন চৌধুরীর নেতৃত্বে নিজাম-ই-ইসলাম পার্টি সমন্বয়ে গঠিত যুক্তফ্রন্ট ১৯৫৪ সনের ৩রা এপ্রিল প্রাথমিকভাবে মন্ত্রীসভা গঠন করেন। ১৯৫৪ সালের ১৫ই মে যখন মন্ত্রীসভায় কয়েকজন মন্ত্রী শপথ নিচ্ছিলেন তখনই নারায়ণগঞ্জের আদমজী জুট মিলে বাঙালি ও অবাঙালি শ্রমিকদের মধ্যে দাঙ্গা লাগিয়ে দেওয়া হয়। ৩০শে মে প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী জাতির উদ্দেশ্যে এক বেতার ভাষণে যুক্তফ্রন্ট পূর্ববঙ্গকে ভারতের সঙ্গে যুক্ত করতে যাচ্ছিল এই অজুহাত তুলে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভাকে বাতিল করে। ৩১শে মে গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে বললেন, আমার শাসনের বিরুদ্ধে কেউ 'টু' শব্দটি করলে তা বরদাস্ত করা হবে না। দরকার হলে আমি জেলায় জেলায়, গ্রামে গ্রামে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করব। পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার করার জন্য যদি দশ বিশ হাজার মানুষকেও হত্যা করতে হয়, তা হলেও আমি পিছপা হব না।' শুরু হল ধরপাকড়। নির্যাতন। গ্রেফতার। পরবর্তীকালে এ প্রেক্ষিতে গণপরিষদে শেখ মুজিব যে বক্তব্য উত্থাপন করেন তা প্রণিধানযোগ্য।

২২. শেখ মুজিব ১৯৫৬ সালের ২২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তান গণপরিষদে অত্যাচার ও নির্যাতনের বিস্তারিত চিত্র তুলে ধরেন। পাকিস্তান গণপরিষদ কার্যবিবরণী দ্রষ্টব্য।

২৩. গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ ১৯৫৪ সালের অক্টোবর প্রান্তিকে অসুস্থ হলে কিছুদিন রাজধানীর বাইরে অবস্থান করতে থাকেন। গভর্নর জেনারেলের ক্ষমতা খর্ব করার জন্য গণপরিষদে কিছু সংশোধনী প্রস্তাব উঠতে থাকে। এসব সংশোধনী প্রস্তাবে প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলীর সায় ও ইঙ্গিত ছিল। পাঞ্জাবি আমলা ও নিজের বিশ্বস্ত ব্যক্তিদের নিকট হতে সংবাদ পেয়ে গোলাম মোহাম্মদ রাতারাতি করাচি ফিরে এসে সারা পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করে মন্ত্রিপরিষদ ও গণপরিষদ ২৪শে অক্টোবর ভেঙে দিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪. জরুরি অবস্থা জারি ও গণপরিষদ বাতিলের ঘোষণা, বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, ১ম খণ্ড, পৃ. ৪১০। ৭ই অক্টোবর ১৯৫৮ সালে রাত আটটায় পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ফিরোজ খান নুনের সর্বশেষ মন্ত্রীপরিষদ গঠনের অক্লান্ত পরিশ্রমকে বাতিল করে দিয়ে রাষ্ট্রপ্রধান ইস্কান্দার মীর্জা জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদকে ভেঙ্গে দিয়ে সমগ্র দেশে সামরিক শাসন জারি করে শাসনতন্ত্র বাতিল ঘোষণা করেন। সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল আইয়ুব খানকে প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে নিযুক্ত করেন। এই ব্যবস্থার ফলে শাসনতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জার তেমন আইনানুগ বৈধতা থাকল না। প্রকৃতপক্ষে প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসকের একটি দ্বৈত শাসন কায়েম হলো।

২৫. গভর্নর জেনারেল কর্তৃক অবৈধভাবে গণপরিষদ ভেঙে দেবার বিরুদ্ধে তমিজউদ্দিন খান (গণপরিষদের স্বীকার) হাইকোর্টে এক রীট পিটিশন দায়ের করেন। ঢাকা- ল' রিপোর্ট পশ্চিম পাকিস্তান, সপ্তম খন্ড, ১৯৫৫।

২৬. ১৯৫৪ সালের ১২ই নভেম্বর 'ডেইলি টেলিগ্রাফ' পত্রিকার সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে ইস্কান্দার মীর্জা বলেছেন, গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদের সেনাবাহিনী কর্তৃক ক্ষমতা দখলের বিষয়টি তিনি মোটেই পছন্দ করেননি। তিনি বলেন যে, রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়ার কোনো ইচ্ছা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নেই।

২৭. Pakistan-United States Mutual Defence Assistance Agreement (19 May, 1954) এছাড়া সিয়োটো চুক্তিতে যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড ও পাকিস্তান এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছিল। চুক্তির সদস্যরা একমত ছিল যে, যে কোনো দেশের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে তারা সম্মিলিতভাবে প্রতিরোধ করবে।

২৮. বাগদাদ চুক্তিতে তুরস্ক, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, ব্রিটেন ও বাগদাদ চুক্তিতে স্বাক্ষর করে সামরিক জোট সৃষ্টি করে, তার মূল পৃষ্টপোষকতায় ছিল যুক্তরাষ্ট্র। ১৯৫৮ সালে ইরাকের রাজতন্ত্রের পতন হলে ইরাক এই জোট থেকে বেরিয়ে আসে তখন এই সংস্থা সেন্টো চুক্তি নামে পরিচিতি লাভ করে।

২৯. "But the most important ones were Suharwardy's 12 day godwill visit China October 1956 & Chou En-lai's 10-day return visit to Pakistan December 1956", Azizul Haque, *Trends in Pakistan's external policy 1947-71, op.cit.*, p. 29.

৩০. Azizul Haque, *op.cit.*, pp.160-163.

৩১. পাকিস্তান গণপরিষদ বিতর্ক ১৯৫৬, দ্রষ্টব্য

৩২. পাকিস্তান গণপরিষদ, ৫ই মার্চ ১৯৫৬। ইস্কান্দার মীর্জাকে ১৯৫৬ সালের শাসনতন্ত্রের বিধানমতে প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচন করার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাবকারীদের মধ্যে প্রধানমন্ত্রী চৌধুরী মোহাম্মদ আলী, এ.কে. ফজলুল হক, ফরিদ আহমদ, হামিদুল হক চৌধুরী, ফিরোজ খান নুন, আই আই চুন্দ্রীগড় এর নাম উল্লেখ্য। বলা বাহুল্য প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর ইস্কান্দার মীর্জাকে অভিনন্দন জানিয়ে নেতৃবৃন্দ বক্তৃতা করেন।

৩৩. যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্ট হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পক্ষে ছিলেন। কিন্তু পেন্টাগন সামরিক শাসকদের পক্ষে আঁতাত গড়ে তুলেছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৪. জটিলতা নিরসনে ২৩শে অক্টোবর মার্কিন প্রতিরক্ষা সচিব নেইল ম্যাক চার দিনের সফরে করাচি আসেন ও ইস্কান্দার মীর্জা ও আইয়ুব খানের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক শেষে কর্তৃত্বশালী শাসক হিসেবে আইয়ুব খানের ক্ষমতা গ্রহণের বিষয়টিকে অনুমোদন করেন।

৩৫. পূর্ববঙ্গ পরিষদের ডেপুটি স্পীকার পাকিস্তানের প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে তাদের দালালদের দ্বারা চক্রান্তে আঘাতপ্রাপ্ত হন। ১৯৫৮ সালে ২৬ শে সেপ্টেম্বর ঢাকা মেডিক্যাল হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন।

৩৬. পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট ও সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নীতি নির্ধারক এবং এককালীন সেক্রেটারি অব স্টেট সি.বি. মার্শাল বলেছেন, মীর্জার অধীনে কোনো স্থায়িত্ব সম্ভব নয়। তবে এই সামরিক অভ্যুত্থান পূর্ব অবস্থাতেও ফিরে যাওয়া সম্ভব নয়। নতুন সমাধান খুঁজে বের করতে হবে যা শুধু গণতন্ত্র নয় এমন একটি প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি, যা হচ্ছে ঐক্যমত এবং 'কর্তৃত্ব' যা দ্বারা দেশটি কোনো অবস্থায় পৌছতে পারবে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে মার্কিন উপদেষ্টা ও সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্র কর্তৃক রচিত ও ঘোষিত হলো মৌলিক গণতন্ত্রের ফর্মুলা।

৩৭. মৌলিক গণতন্ত্রী ব্যবস্থার ফলে পরাজিত গণধিকৃত প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিবর্গ রাজনীতিতে পুনর্বাসিত হয়। নিজস্ব শক্তি না থাকায় তারা সামরিক শাসকগোষ্ঠীর উপর নির্ভরশীল দালালগোষ্ঠীতে পরিণত হয়।

৩৮. ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর সমস্যাকে নিয়ে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার ব্যবস্থার সামরিক মৌলনীতির অসারত্ব প্রমাণিত হলো। পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে এতদিন ধরে প্রচারিত হচ্ছিল যে, 'পশ্চিম পাকিস্তানে শক্ত সমরশক্তি পূর্ব পাকিস্তানের রক্ষা কবজ'– পাক ভারত যুদ্ধে এই ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়

৩৯. সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দ নামক স্থানে সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে পাক-ভারত যুদ্ধ অবসানের লক্ষ্যে ১০ই জানুয়ারি ১৯৬৬ সাল উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ অবসানকল্পে স্বাক্ষরিত হয় তাসখন্দ চুক্তি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন।

৪০. এই চুক্তির প্রেক্ষিতে আইয়ুবের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য লাহোরে আহুত রাজনৈতিক দলগুলোর বৈঠকে শেখ মুজিব ৬ দফা পেশ করেন। আইয়ুব খানের আমলে পাকিস্তানে পুঁজিপতি বাইশ পরিবারের শোষণ তীব্রতর হয়। এই সময় বাঙালি উঠতি পুঁজিপতিগণের একাংশ আইয়ুব খানের দিকে ও অন্য অংশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

৪১. আবু সাইয়িদ, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের আড়ালে যুদ্ধ*, পৃ. ৩৫-৩৬।

৪২. *শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো লিঃ, পৃ. ২৩২। আগরতলা মামলায় শেখ মুজিবের জবানবন্দি। বঙ্গবন্ধু ছয় দফার বাণী নিয়ে পথে ঘাটে মাঠে নেমে পড়লেন শত শত হাজার সভা, পথ-সভা করলেন।

৪৩. ছয় দফা ছিল বাঙালি জাতির উদ্বোধনী শক্তি : ছ'দফাকে সামনে রেখে পাকিস্তানি সেনাকাঠামোর বাঙালি সেনা-অফিসারদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ ঘটায়। তার বহিঃপ্রকাশ আগরতলা মামলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৪. *শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, প্রভিন্সিয়াল বুক ডিপো, পৃ. ১৭৭। সেনাকর্মকর্তাদের আসামি করে নিষ্ঠুর নির্যাতন করা হয়

৪৫. ডেমোক্রেটিকে একশন কমিটি (ডাক) পি.ডি.এম, ৬-দফা পন্থি আওয়ামী লীগ, ন্যাপ, নেজামে ইউনিয়ন (মতিয়া) পূর্ব পাকিস্তান ছাত্র ইউনিয়ন (মেনন) ও ডাকসু একত্রে ১১-দফা ঘোষণা করেন। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধঃ দলিলপত্র, ২য় খণ্ড*, ঢাকাঃ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ. ৪০৫

৪৬. গণআন্দোলন গণ-অভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ২২শে ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯ সাল আগরতলা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হন। সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক তোফায়েল আহমদ পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দানের প্রস্তাব করলে রেসকোর্সে সমবেত জনসমুদ্র তুমুল করতালি ও হর্ষধ্বনির মাধ্যমে সমর্থন করে। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা ও গণ-অভ্যুত্থান সম্পর্কে বিস্তারিত দেখুন রাও ফরমান আলী, ভূট্টো শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ, পৃ.১৭৭।

৪৭. প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ভাষণ, *দৈনিক ইত্তেফাক ১৪ই মার্চ ১৯৬৯।*

৪৮. স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবসহ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ এই আইনগত আদেশ কাঠামো আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করেন। শেখ মুজিব বুঝলেন, এটি একটি চক্রান্ত, এমন চক্রান্ত যাতে গণতন্ত্র তথা বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়। সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার এই পরিকল্পনাকে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী কৌশলের মাধ্যমে জবাবদানে বদ্ধপরিকর হলেন।

৪৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, দ্বিতীয় খণ্ড*, ঐ, পৃ. ৫২৮, শেখ মুজিব ঘোষণা করেন আসন্ন নির্বাচন হবে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে গণভোট, *দ্য ডন*, ৮ জুন ১৯৭০।

৫০. Siddiq Salik, *Witness to surrender, op.cit.*, p.1. স্বাভাবিকভাবেই শেখ মুজিবসহ দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ এই আইনগত আদেশ কাঠামো আদেশের তীব্র প্রতিবাদ করেন। শেখ মুজিব বুঝলেন এটি একটি চক্রান্ত, এমন চক্রান্ত যাতে গণতন্ত্র তথা বাঙালির অধিকার প্রতিষ্ঠিত না হয়। সামরিক শাসন দীর্ঘায়িত করার এই পরিকল্পনাকে বঙ্গবন্ধু নির্বাচনী কৌশলের মাধ্যমে জবাবদানে বদ্ধপরিকর হলেন। শেখ মুজিবের প্রত্যয় ছিল এই যে নির্বাচনে গণরায় পেলে তিনি আইনগত কাঠামো আদেশ ছুড়ে ফেলে দেবেন।

৫১. নরম্যান ডি পামার, রিসেন্ট সোভিয়েত এন্ড চাইনীজ পেনিট্রেশন ইন ইন্ডিয়া এন্ড পাকিস্তান, গাইডলাইন্স ফর পলিটিক্যাল-মিলিটারি পলিসি, ম্যাকলিন, ভার্জিনিয়ার রিসার্চ এনালাইসিস কর্পোরেশন, ১৯৭০, পৃ. ৪৩

৫২. Henery Kissinger, *White House Years : The Indo Pakistan Crisis of 1971*, p. 913, 918.

৫৩. দেখুন- প্রতিনিধি সভার বৈদেশিক সভার বৈদেশিক বিষয়ক কমিটির নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ এশিয়ার উপর সাবকমিটির সামনে শুনানী, মার্চ-১২, ১৫, ২০ এবং ২৭, ১৯৭৩ ওয়াশিংটন ১৯৭৩, পৃ. ৮২

৫৪. Azizul Haque, *op.cit.*, pp. 65-67. "Efforts were also made by the USSR for close co-operation between India and Pakistan by bringing them in some sort of Asian Regional Co-operation. Peking observed these with increasing dismay. This

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

tended to bring about a 'freeze', as Bhutto admitted after quitting the office, in Pak-China relations, though overtly Peking still behaved in an extremely friendly fashion Rawalpindi. Moscow wanted 'to steal a march' on the diplomatic front over Peking in South East Asia. There she succeeded in getting India and Pakistan around a conference table to talk of peace on the soil of the Soviet Union. So Peking felt irritated. She condemned the Tashkent Declaration as a part of Soviet policy to encircle People's China. Pakistan did not respond to the Soviet proposal(in 1969) for greater co-operation and transit trade between India, Pakistan, Afghanistan, Turkey, Iran and USSR. In Pakistan's eyes permission to transit goods between India and Pakistan would be tantamount to normalization of their relations, for which Pakistan was not ready without resolving the Kasmir issue. Moreover, the proposal had an overt link with the Asian Security Plan. Pakistan felt that an economic alliance of this nature might be taken as first step towards the creation of a collective system obviously directed against Peking. Pakistan cold-shouldered the proposal lest it might cast doubts about the Pak-China friendship."

৫৫. দেখুন- 'নাজী সোভিয়েত রিলেশানস' ১৯৩৯-৪১ Documents form the Archieve of the German Foreign office (ওয়াশিংটনঃ স্বরাষ্ট্র বিভাগ ১৯৪৮) পৃ. ২৫৭ উইলিয়াম জে, বার্নডস এর 'ইন্ডিয়ান, পাকিস্তান এন্ড দি গ্রেট পাওয়াস' নিউইয়র্ক, ১৯৭২, পৃ. ৩৬৬-এ উদ্ধৃত।

৫৬. সোভিয়েত নীতি দক্ষিণ এশিয়ায় এ সময় প্রভাব বিস্তারের নীতি গ্রহণ করেছিল।

৫৭. এ সময় পাকিস্তান পুনরায় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকতে থাকে। চীন সাংস্কৃতিক বিপ্লবে যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয় সে প্রেক্ষাপটে মওলানা ভাসানী দেশের দিকে মুখ ফেরান।

৫৮. "পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম গোলযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৬৯ সালের ২০ শে জানুয়ারি। আন্দোলনের কারণ পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে। আন্দোলনের প্রথম সূত্রপাত করেন মওলানা ভাসানী। সূত্রপাতের কাহিনি খুবই চমকপ্রদ এবং এতে অনুধাবন করার অনেক কিছু আছে। ভাসানী দাবি করলেন গভর্নর হাউজের সামনের রাস্তা জনসাধারণের জন্য খুলে দেওয়া হোক। একটা ছোটো মিছিল এসে এই রাস্তায় হানা দিল। পুলিশ বাধা দিলে মিছিল তাকে আক্রমণ করলো। পুলিশ পালাবার জন্য একটা পানের দোকানে আশ্রয় নিল, তারপরও তাকে রেহাই দেওয়া হলো না। বাধ্য হয়ে প্রাণ বাঁচাবার জন্য পুলিশও গুলি চালাল, ফলে একজন লোক মারা গেল। আর চাই কি? এর পরে কেয়ামত কাণ্ড। মিছিলকারীরা এ ধরনের একটা পরিণতির আশা করছিল, যাতে একটা লাশ নিয়ে মিছিল করা যায়। পূর্ব পাকিস্তানে এ ভাবে লাশের প্রদর্শনী হতো। লাশ নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করা হতো। দেহের যে অংশ রক্ত ঝরছে তা বের করে রাখা হতো। রক্তমাখা কাপড় চোপড় প্রদর্শন করা হতো। মিছিলে অসংখ্য লোক হতো, কিন্তু এই শহীদের জানাজায় শরীক হতো মাত্র গুটিকয় লোক। এই ঘটনার পরদিন গভর্নর হাউজের সামনের রাস্তা লোকে লোকারণ্য। এ সময় মুজিব আগরতলা মামলায় বন্দি। 'আওয়ামী লীগের' পক্ষ থেকে স্টুডেন্ট ফোরাম এই আন্দোলনে নেমে পড়লো এবং এক একশন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিটি গঠন করল। দেখতে দেখতে এই আন্দোলন সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল।" রাও ফরমান আলী, *ভূট্টো শেখ মুজিব বাংলাদেশ*, পৃ. ১৭-১৮

৫৯. ইয়াহিয়া খানের পিকিং সফরের অনুগামী দলের সদস্য হিসেবে ডি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন এ তথ্য ইয়াহিয়া নিজে তাকে বলেছিলেন।

৬০. Department of State, Telegram Limited offical use 164, Roedad Khan, Compiled and Selected by, The American Papers Secret and Confidentail India, Pakistan, Bangladesh Documents 1965-1973, p. 334.

৬১. আশফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, পৃ. ৮৪-৮৫, দ্রষ্টব্য। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন সরকারকে বিদেশি সরকারগুলো কখনো প্রবাসী, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, মুজিবনগর সরকার বা অস্থায়ী সরকার নামে অভিহিত করা হয়েছে। এসব নামকরণগুলোর যথার্থতা তথা, জোরালো যুক্তি রয়েছে। আইনগত দিক বিবেচনা করলে ও প্রোক্লেমেশন অব ইন্ডিপেন্ডেন্স অনুসরণ করলে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার নামটিই গ্রহণীয়। কিন্তু সে সময়ের প্রেক্ষাপট ছিল ভিন্ন। ছিলো স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন। কিন্তু সরকার গঠনের পর কোনো রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়নি। বিভিন্ন দেশ বাংলাদেশকে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে একথা বাস্তব হলেও স্বীকৃতির প্রশ্নটি ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত ঝুলে থাকে। ১০ই এপ্রিল ১৯৭১ প্রবাসে প্রথম এই সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলা গ্রামের মুক্তঅঞ্চলে এই সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে শপথ গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বৈদ্যনাথতলার নতুন নামকরণ করেন মুজিবনগর। মুজিবনগর নামকরণ হলেও কয়েক ঘন্টার মধ্যেই উক্ত শপথ অনুষ্ঠানের স্থানটি পাকিস্তান সেনাবাহিনী দখল করে নেয়। শপথ অনুষ্ঠানের পরপরই অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ উপস্থিত সাংবাদিকদের সামনে এই স্থানটিকে বাংলাদেশ সরকারের রাজধানী হিসেবে মুজিবনগর হিসেবে উল্লেখ করায় মিডিয়ার মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী এই সরকার মুজিবনগর সরকার হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। কিন্তু নিরাপত্তার কারণে সরকার পরিচালিত হতে থাকে কলকাতার থিয়েটার রোডের এক বাড়ি থেকে। যেহেতু পাকিস্তান সরকার প্রথম থেকেই বলে আসছিল ভারত বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সহযোগিতা করছে, সেটাকে আড়াল করার জন্য এই সরকারের কর্মকান্ড ও নথিপত্র মুজিবনগর সরকারের নামেই পরিচালিত হতে থাকে। বাংলাদেশ সরকার নিজেকে কখনই প্রবাসী হিসেবে স্বীকার করেনি। শপথ অনুষ্ঠানের পরে ভারত সরকারের স্বীকৃতি চেয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্র মন্ত্রী যে পত্র ও সংশ্লিষ্ট আইনানুগ দলিলাদি প্রেরণ করেন তার ঠিকানা ছিল মুজিবনগর। বৈদেশিক ক্ষেত্রে মুজিবনগর সরকারের বহুমুখী তৎপরতা, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যোগাযোগ, বিদেশে প্রতিনিধি প্রেরণ এমন কি জাতিসংঘে প্রতিনিধিদল মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে কার্যক্রম চালিয়ে যায়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিশ্বের শান্তিকামী জনগণ, রাষ্ট্র এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্য এক গুরুত্বপূর্ণ বক্তৃতায় উল্লেখ করেন: "বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে আজ আমরা স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন, সার্বভৌম ও শান্তিকামী একটি দেশ হিসেবে রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান পাওয়া আমাদের জন্মগত অধিকার। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ 'রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠী'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে আন্তর্জাতিক আইনের পরিভাষায় 'রাষ্ট্র পরিবার গোষ্ঠী' বলতে বুঝিয়েছেন বিশ্বরাষ্ট্র-সমাজকে এবং সুনির্দিষ্টভাবে জাতিসংঘকে।

৬২. বাংলাদেশকে স্বীকৃতি এবং বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। মওলানা ভাসানী ১৯৭১-এর এপ্রিল মাসের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার রক্ষায় জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর পত্র লেখেন। ১৯৭১ সালের মার্চ পরবর্তী মাসগুলোতে বাঙালিরা লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপ ও নিউইয়র্কের জাতিসংঘ ভবনের সামনে গণহত্যা বন্ধ, শরণার্থী সমস্যা সমাধান এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি ও জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভের জন্য বিক্ষোভ করে। আগস্ট মাসে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিদলের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি পত্র যোগাযোগ হয়। সেপ্টেম্বর মাসে প্রতিনিধিদল জাতিসংঘ ভবনে বাংলাদেশের মানুষের সংগ্রামের পক্ষে জোরালো ভূমিকা রাখেন। ৪ঠা ডিসেম্বর প্রতিনিধি দলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির নিকট একটি পত্রে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ঐতিহাসিক বাস্তবতা তুলে ধরেন। তখন মুজিবনগর সরকারের সাথে জাতিসংঘের সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়নি। পরোক্ষ সম্পর্ক আরো বিস্তৃত হয়। ১৯৭১-এ দক্ষিণ এশিয়ার জাতিসংঘের ত্রাণ কার্যক্রমের মূল লক্ষ্য ছিল মুজিবনগরের অসহায় মানুষ। ফলে জাতিসংঘ ও মুজিবনগর সরকারের মধ্যে সরাসরি কোনো সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত না হলেও মুজিবনগরের মানুষের সাথে এ বিশ্ব প্রতিষ্ঠানের একটি গভীর সম্পর্ক সৃষ্টি হয়। বর্তমান গবেষণায় ১৯৭১-এর মার্চ-ডিসেম্বর কালপর্বে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে মুজিবনগর সরকার হিসেবে বর্ণনা করার যথার্থ কারণ বিদ্যমান।

৬৩. ঢাকা থেকে প্রেরিত মার্কিন টপ সিক্রেট টেলিগ্রামে উল্লেখিত হয়েছে শেখ মুজিবুর রহমান ২৬ শে মার্চ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১১১. ব্যারিস্টার আমির-উল-ইসলামের সাক্ষাৎকার। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.) *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ : দলিলপত্র ১৫ খণ্ড*, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, ১৯৮২, পৃ.১০৬।

৬৪. পি.এন. হাকসার, কে.রুস্তমজী ও গোলক মজুমদার প্রমুখ উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ সরকার গঠন প্রসঙ্গে তাজউদ্দীনের কাছে জানতে চান। সেজন্য তাজউদ্দীন সরকার গঠনের বিষয়ে পূর্বেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন

৬৫. রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, পৃ. ৮

৬৬. মুহাম্মদ নূরুল কাদের, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, ১৫তম খন্ড*, পৃ. ১৬১।

৬৮. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪০

৬৯. সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশীদের ভূমিকা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯, পৃ. ২৯

৭০. এ এম মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

৭১. *ঐ*, পৃ. ৪৫

৭২. *ঐ*

৭৩. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৪. কয়েকজন শিল্পীর নাম পণ্ডিত রবিশংকর, ওস্তাদ আলী আকবর খাঁ, আল্লারখা খাঁ, জর্জ হ্যারিসন, ববডিলান, রিঙ্গোস্টার ও ব্যাডফিঙ্গার

৭৫. এ.এম.এ. মুহিত, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৬

৭৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৮

৭৭. এ. আর. মল্লিক, *আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫, পৃ. ১০৪

৭৮. এ.এম.এ. মুহিত, *স্মৃতি অম্লান*, ১৯৭১, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৪-৫৫

৭৯. *ঐ*, পৃ. ১৪৮-৫০

৮০. আনিসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ.৭৬

৮১. Shirin Tahir-Kheli, "Chinese Objectives in South Asia:" vs "Collective Security", *Asian Survey*, Vol.XVIII, No. 10 (October 1978), 998-999, 1006.

৮২. বান্দুং চুক্তি : নবজাতক আফ্রিকা ও এশিয়ার জনগণের আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অংশগ্রহণ করার আকাঙ্ক্ষা ও বিশ্বশান্তিকে স্থায়ী করার বাসনা হতে বান্দুং আফ্রো-এশীয় সম্মেলনের উৎপত্তি। এই সম্মেলনের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আফ্রো-এশীয় রাষ্ট্রদ্বয়ের মধ্যে সহযোগিতা বৃদ্ধির আকাঙ্ক্ষাকে বাস্তব রূপদান করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর যুগে এইরূপ সহযোগিতা রাষ্ট্রসংঘের অভ্যন্তরে এবং বাইরে সুস্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়েছে। ইতিপূর্বে ডাচ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে ইন্দোনেশিয়াকে সমর্থন করার জন্য ১৫টি আফ্রো-এশীয় দেশ ১৯৪৯ সালে নিউ দিল্লিতে মিলিতভাবে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করেছিল। দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবৈষম্যের বিরুদ্ধে, আলজিরিয়া, তিউনিসিয়া ও মরক্কোর স্বাধীনতার জন্য এবং অন্যান্য বহু বিষয়ে এই সহযোগিতা প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৫৪ সালে কলম্বো শক্তিবৃন্দ (এদের মধ্যে ভারত অন্যতম) তাদের বোগর সম্মেলনে পরবর্তী বছর বান্দুংয়ে আফ্রো-এশীয় সম্মেলন আহ্বান কবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এই সম্মেলন আহ্বান করার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল আফ্রো-এশীয় দেশগুলির মধ্যে তাদের বিশেষ স্বার্থসংশ্লিষ্ট (যথা দক্ষিণ আফ্রিকার জাতিবৈষম্য নীতি) সম্পর্কে আলোচনা করা। দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য ও বিশ্বশান্তির উদ্দেশ্যে আফ্রো-এশীয় দেশগুলির অবদানের গুরুত্ব এই সম্মেলন আহ্বান করার অন্যতম কারণ। তৃতীয়ত, বিভিন্ন আফ্রো-এশীয় দেশের মধ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা বৃদ্ধি করা বান্দুং সম্মেলনের অন্যতম লক্ষ্য ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয় অধ্যায়
মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক কার্যক্রম

১. ভূমিকা

পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের ভিন্নতা, বৈষম্য, নিষ্ঠুরতা ও ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ বাঙালি জাতির মনে স্বাধীনতা অর্জনে অদম্য আকাঙ্ক্ষার জন্ম দিয়েছিলো। সেই স্বাধীনতা আন্দোলনের কার্যকারণগত প্রেক্ষিত ও যৌক্তিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিশ্বজনমত গঠন, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সমর্থন এবং স্বীকৃতি আদায় ছিল বৈরী পরিবেশে অসম এক বাস্তবতা। এই পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধের পাশাপাশি অপরিহার্য হয়ে ওঠে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা।

বাংলাদেশের সশস্ত্র যুদ্ধের পাশাপাশি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জরুরি ও অবিলম্ব তৎপরতার সাফল্যই কেবল বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে নিশ্চিত করতে পারে একথাটি গভীরভাবে উপলব্ধি করতে মুজিবনগরে গঠিত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বুঝতে অসুবিধা হয়নি। পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক শক্তিকে পরাজিত করতে যেমন অপিরহার্য ছিল মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করা তেমনি পাশাপাশি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যাপী তাদের বিস্তৃত কাঠামোতে আঘাত করে ফলাফল করায়ত্ত করতে কর্মক্ষম ও উদ্যোগী ভূমিকা ছিল জরুরি। পাকিস্তান জন্মের পর হতে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের এ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার ঘাটতি ছিল না– কোথায় কোন্ অবস্থায় কী ধরনের কৌশল গ্রহণ করতে হবে তা তাদের অজ্ঞাত ও অবিদিত ছিল না। পাশাপাশি বিশ্বব্যাপী প্রতিটি রাষ্ট্রীয় অভ্যন্তরে যে বিভিন্ন জাতিসত্তার কিছু না কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদী কর্মকাণ্ড চালু ছিল সেক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্র দেশের অভ্যন্তরে চোখ রেখে পাকিস্তান হতে পূর্ব পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকে প্রকাশ্য সমর্থন ও সহযোগিতা করার বিষয়টি সর্বদাই মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের নেতিবাচক দিকে তাড়িত করেছে।

১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হলে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, সমর্থন বা সাহায্য সহযোগিতা করবে এটা কূটনৈতিক দিক থেকে ছিল অচিন্তনীয়। ১৯৭০ সালে নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা প্রদেশে জেনারেল ওজুকো স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও তার করুণ পরিণতির বিষয়টি গভীর ক্ষতের মতো তখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পরিসরে ক্রিয়াশীল ছিল।[১] পাশাপাশি ভিয়েতনামের দীর্ঘদিনের লড়াই বিশ্বকে বিশেষকরে পরাশক্তিগুলোকে জড়িত করেছিল সে অভিজ্ঞতাও বিশ্বের রাষ্ট্রগুলোর সামনে দৃশ্যমান ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই অবস্থায় বিশ্বব্যাপী দীর্ঘ ২৪ বছর যাবৎ কূটনীতিক ক্ষেত্রে, বিভিন্ন দেশের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রকার বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে চুক্তি এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা, চুক্তি এবং পারস্পরিকভাবে কাঁধে হাত রাখার বন্ধন ছিন্ন করে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সদ্য স্বাধীনতা ঘোষিত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি, সমর্থনদানের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পাবে একথা ভাববার কোনো কারণ ছিল না। এই অবস্থায় মুজিবনগর সরকারকে স্বাধীনতাযুদ্ধের পাশাপাশি নানা মাত্রিকতায় কূটনৈতিক যুদ্ধ পরিচালনার কৌশল গ্রহণ করতে হয়। এই অধ্যায়ে মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন কূটনৈতিক কার্যক্রম আলোচিত হয়েছে।

২. কূটনৈতিক তৎপরতার প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনের অপরিহার্যতা ছিল অনস্বীকার্য। এ লক্ষ্যে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর দীর্ঘদিনের আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে চরম বৈষম্য, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতন্ত্রহীনতা, সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী বাঙালি জাতিকে শাসন ক্ষমতা থেকে হটিয়ে রাখা এবং বাঙালি সংস্কৃতির বিলোপ সাধন করে জাতিসত্তাকে ধ্বংসের পরিকল্পিত পদক্ষেপ এবং ২৫শে মার্চে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্মম আক্রমণ, বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর ভারতে গমন, গণহত্যা ও মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ড বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরা ছিল প্রাথমিক পর্যায়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এজন্য বাঙালি জাতিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামোতে সার্বিকভাবে অবদমন করা হয়েছে তার অভ্যন্তরীণ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার পরিণতিতে স্বাধীন বাংলাদেশ যে অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তার বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

৩. কূটনৈতিক তৎপরতার সূচনা

স্বাধীন বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আনুষ্ঠানিকভাবে ২৬শে মার্চ প্রথম প্রহরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।[২] স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশকে সাহায্য করার জন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে বারবার উদাত্ত আহ্বান জানানো হয়। ২৭শে মার্চ জিয়াউর রহমান বঙ্গবন্ধুর পক্ষে স্বাধীনতার ঘোষণা পাঠ করেন এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সাহায্য সহযোগিতার আহ্বান জানান। স্বাধীন বাংলা বেতার হতে বারবার জাতিসংঘ, বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ বিশেষকরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের প্রতি বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা করার জন্য ও পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে নিশ্চিহ্ন করার লক্ষ্যে সহযোগিতার আহ্বান জানানো হয়। এই আহ্বানে তাৎক্ষণিক সাড়া পাওয়া যায়। ৬ই এপ্রিল নয়াদিল্লিতে কার্যরত দু'জন কূটনীতিক কে.এম. শেহাবউদ্দিন (সেকেন্ড সেক্রেটারি) এবং সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হক বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং যারা বাংলাদেশের নিরীহ জনগণকে নির্বিচারে হত্যা করছে তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে এবং বিশ্বজনমতকে এই ভয়াবহ পরিস্থিতি অনুধাবন করার আহ্বান জানান। তারা ভারত সরকারের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেন।[৩] কলিকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশনার অফিসের ডেপুটি হাই কমিশনার এম. হোসেন আলী ১৮ই এপ্রিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করেন।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭ই এপ্রিল প্রণীত হয় স্বাধীনতার সনদ। সেখানে স্পষ্টভাবে বলা হয় নির্বাচিত গণ পরিষদের সদস্যগণ স্বাধীনতার এই সনদে দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করেছেন যে, "জাতিসংঘের চার্টার মোতাবেক মুজিবনগর সরকার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করবে, বিশ্ববাসীকে এ বিষয়ে আশ্বস্ত করা হয়।"[৫]

৩ ক. তাজউদ্দীন আহমদের প্রাথমিক কূটনৈতিক তৎপরতা (এপ্রিল ১৯৭১)

১০ই এপ্রিল প্রবাসী সরকার গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ঐ দিন জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক ভাষণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতার আবেদন জানান। তিনি ভাষণে বলেন:[৬]

...আমরা এখন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রের প্রতিনিধি, কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রতিনিধিদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি, তাঁরা যেন স্বচক্ষে এবং সরেজমিনে দেখে যান যে, স্বাধীন বাংলাদেশ আজ সত্যে পরিণত হয়েছে। সাথে সাথে আমরা সমস্ত বন্ধুরাষ্ট্র ও পৃথিবীর সমস্ত সহানুভূতিশীল ও মুক্তিকামী মানুষের কাছে ও 'রেডক্রস' এবং অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সাহায্যের আহ্বান জানাচ্ছি। যাঁরা আমাদের সাহায্য করতে ইচ্ছুক অথচ বর্বর ইসলামাবাদ শক্তি যাঁদের এই মানবিক কাজটুকু করবার বিরুদ্ধে নিষেধ উচিয়ে দাঁড়িয়েছে তাঁরা এখন স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেন। ...বৃহৎ শক্তিবর্গের অস্ত্রাগারের আধুনিক সরঞ্জামে সজ্জিত জেনারেল ইয়াহিয়ার হানাদার বাহিনী আজ আমাদের শান্তিপ্রিয় ও নিরস্ত্র বাঙ্গালীর কণ্ঠ স্তব্ধ করে দেয়ার এক পৈশাচিক উন্মত্ততায় মত্ত। আমরা সেই সব বৃহৎ শক্তিবর্গের কাছে মানবতার নামে আবেদন জানাচ্ছি, যেন এই হত্যাকারীদের হাতে আর অস্ত্র সরবরাহ করা না হয়। ...বিদেশি বন্ধু রাষ্ট্রসমূহের কাছে যে অস্ত্র সাহায্য আমরা চাইছি, তা আমরা চাইছি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে–একটি স্বাধীন দেশের মানুষ আর একটি স্বাধীন দেশের মানুষের কাছে। এই সাহায্য আমরা চাই শর্তহীনভাবে আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি তাদের শুভেচ্ছা ও সহানুভূতির প্রতীক হিসাবে–হানাদারদের রুখে দাঁড়াবার এবং আত্মরক্ষার অধিকার হিসাবে, যে অধিকার মানব জাতির শাশ্বত অধিকার। বহু বছরের সংগ্রাম, ত্যাগ ও তিতিক্ষার বিনিময়ে আমরা আজ স্বাধীন বাংলাদেশের পত্তন করেছি। স্বাধীনতার জন্যে যে মূল্য আমরা দিয়েছি তা কোন বিদেশি রাষ্ট্রের উপরাষ্ট্র হবার জন্যে নয়। পৃথিবীর বুকে স্বাধীন ও সার্বভৌম একটি শান্তিকামী দেশ হিসাবে রাষ্ট্র-পরিবার গোষ্ঠীতে উপযুক্ত স্থান আমাদের প্রাপ্য। এ অধিকার বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের জন্মগত অধিকার। ... ইতিমধ্যে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতবর্ষ এই নির্বিচার গণহত্যার বিরুদ্ধে তাঁদের হুশিয়ারী উচ্চারণ করেছে এবং সোভিয়েত রাশিয়া অবিলম্বে এই হত্যাযজ্ঞ ও নিপীড়ন বন্ধ করার আহ্বান জানিয়েছে। গ্রেট ব্রিটেনও বাংলাদেশের এ অবস্থা সম্পর্কে সজাগ হয়েছে উঠেছে। যে সমস্ত পাকিস্তানি বিমান মৃত্যুর সরঞ্জাম নিয়ে ঢাকায় আসার পথে জ্বালানী সংগ্রহ করছিল তাদেরকে জ্বালানী সরবরাহ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র সিংহল ও ব্রহ্মদেশ।

পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক এই ভাষণ প্রদানে কোনো প্রকার জটিলতার প্রশ্ন ছিল না। কেননা, ১৯৬৯ সালে ১লা আগস্টে গৃহীত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের নীতি ও কর্মসূচি, ঘোষণাপত্রে (ম্যানিফেস্টো) বৈদেশিক নীতি সম্পর্কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পষ্টভাবে উল্লেখ ছিল, "সকল রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব, বিদ্বেষ কাহারও প্রতি নয়" "আওয়ামী লীগ আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই নীতিতে বিশ্বাসী। বিশ্বে শান্তি স্থাপনের বিভিন্ন প্রচেষ্টায় আওয়ামী লীগ সর্বপ্রকার সহযোগিতা প্রদান করিবে। আওয়ামী লীগ জাতিসংঘ সনদের পূর্ণ সমর্থক এবং এই প্রতিষ্ঠানকে সর্বপ্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা দান করিবে। আওয়ামী লীগ স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতি এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান নীতিতে বিশ্বাস করে। সর্বপ্রকার সাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং একনায়কত্বমূলক শাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বের সকল মুক্তিকামী মানুষের সংগ্রামের প্রতি আওয়ামী লীগের একনিষ্ঠ সমর্থন থাকিবে।"[৭]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের পদক্ষেপ মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্ট থেকে পরিলক্ষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতায় ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার এবং মার্কিন কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রথম দিকে ব্রিটেনের পক্ষে সম্মতি জানানো হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ কলকাতায় কনসুলের সঙ্গে বৈঠকে অস্বীকৃতি জানায়। ঢাকা থেকে মনে করা হয়, এই বৈঠক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে বলে ধারণা করা হতে পারে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে তার কোনো প্রতিনিধি যেন মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারে তার জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

১৫ই এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন গোপনে কলকাতায় নিযুক্ত পাকিস্তানের ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। দু-দফা বৈঠকে স্থির হয় যে, ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী এবং ঐ কমিশনে বাঙালি কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ ১৮ই এপ্রিল একযোগে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে তাদের আনুগত্য প্রকাশ করবেন।[৮]

১৭ই এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে নবগঠিত সরকার শপথ গ্রহণ করেন। স্বাধীনতা সনদে ঘোষিত হয়, শাসনতন্ত্র প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের কার্যনির্বাহী ক্ষমতা, আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, প্রধান সেনাপতির ক্ষমতা, এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীসভার সদস্য নিয়োগের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতির হাতে থাকবে এবং বঙ্গবন্ধু ২৬শে মার্চ যে স্বাধীনতার ঘোষণা দেন তখন থেকেই তা কার্যকারিতা পেয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়। ১৭ই এপ্রিল বিশ্বের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের সামনে মন্ত্রীসভা এই শপথ অনুষ্ঠান মেহেরপুরে বৈদ্যনাথ তলায় অনুষ্ঠিত হয়। যার নতুন নামকরণ হয়, 'মুজিবনগর'। শপথ অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে বিশ্ব মানচিত্রে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের কথা ঘোষিত হয়। স্বাধীনতা ঘোষণা সনদে উল্লেখ করা হয়, জাতিসংঘ চার্টার অনুসরণ করেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তাঁর দায়িত্ব ও কর্তব্য যথাযথভাবে পালন করবে।[৯]

১৭ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক ভাষণে বৃহত্তর ও ক্ষুদ্র রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি আরো বলেন, কোন ব্লক বা প্যাক্টে আমরা যোগদানে উৎসাহী না, কিন্তু যারা আমাদের নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে শুভেচ্ছা ও সাহায্য করতে আগ্রহী তাদের কাছ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে সহযোগিতা চাই। আমরা বিশ্বের দেশসমূহের নিকট স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি, বস্তুগত ও নৈতিক সাহায্য চাই আমাদের সংগ্রামকে এগিয়ে নিতে। প্রতিটি মুর্হুতের বিলম্ব হাজার হাজার মানুষের জীবন ও সম্পত্তি ধ্বংস হচ্ছে। মানবিক কার্যক্রমে যারা এগিয়ে আসবে তাদের সঙ্গে আমাদের বন্ধুত্ব অমলিন থাকবে।[১০]

২৮শে এপ্রিল প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রতিবেশী দেশসমূহের প্রতি অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং বিনাশর্তে অস্ত্র সরবরাহ করার আবেদন জানান, যাতে পাকিস্তানের খুনি সামরিক বাহিনীর হাত থেকে নবরাষ্ট্র বাংলাদেশকে মুক্ত করা সম্ভব হয়।[১১]

৩ খ. কূটনৈতিক নীতিমালা প্রণয়ন

বিরাজমান অবস্থার প্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকারকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বহুমাত্রিক পরিকল্পনা ও নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়। যেমন :

ক. সরকারের পক্ষ হতে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়কে নিয়ে সমন্বিত পরিকল্পনা গ্রহণ,
খ. মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বব্যাপী জনমত গঠন,
গ. এ লক্ষ্যে পাকিস্তানে কর্মরত বিভিন্ন মন্ত্রণালয় বিশেষকরে বিদেশি মন্ত্রণালয়ে কর্মরত কূটনৈতিকবৃন্দকে পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা ও কর্মে যোগদান,
ঘ. বিশ্বের বিভিন্ন দেশে দূতাবাস খুলে স্বাধীনতার পক্ষে প্রচার, জনমত ও স্বীকৃতি আদায়ে তৎপর হওয়া,
ঙ. বহির্বিশ্বে প্রচার প্রচারণা চালানোর জন্য প্রয়োজনীয় প্রচারপত্র, নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও প্রামাণ্য চিত্র তৈরি,
চ. বাংলাদেশবিরোধী প্রচারের সমুচিত জবাবদান,
ছ. বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী যে কোনো চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করা,
জ. সর্বোপরি স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বীকৃতি আদায় ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি, এবং
ঝ. মুক্তিযুদ্ধকে জোরদার করার লক্ষ্যে সর্বক্ষেত্রে কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করা।

একই সঙ্গে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রনীতির মৌলিক বৈশিষ্ট্য সমন্বিত করা হয়। যেমন :

ক. সকলের সাথে বন্ধুত্ব, কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়,
খ. রাজনৈতিক অবদমন, অর্থনৈতিক শোষণ ও বঞ্চনা এবং সাংস্কৃতিক আগ্রাসন অবসানে অঙ্গীকার,
গ. জোটনিরপেক্ষ, সাম্রাজ্যবাদবিরোধী এবং শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান এ তিনটি বিষয় হবে বৈদেশিক নীতির গুরুত্বপূর্ণ ভিত্তি,
ঘ. পৃথিবীত্রাসী ও আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্টকারী সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরোধিতা,
ঙ. সেন্টো এবং সিয়াটো চুক্তিসহ ন্যায়সঙ্গত আন্দোলন দমন করার সহায়ক সকল প্রকার সামরিক চুক্তির বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. সাম্রাজ্যবাদ ও নব্যসাম্রাজ্যবাদ, উপনিবেশবাদ এবং ছোট দেশগুলোর উপর বহির্শক্তির সর্বপ্রকার অশুভ প্রভাব নিরোধ প্রচেষ্টা এবং

ছ. পারস্পরিক সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সংলাপ প্রক্রিয়ার ভিত্তিতে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে বিরাজমান জটিলতার সমাধান।

একই সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নে সকল পরাশক্তির সমর্থন প্রত্যাশা, এশিয়ার পুনজোটবদ্ধতার বিরোধিতার সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ, ভারত ও বাংলাদেশ সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক সংক্রান্ত প্রস্তাবের বিরোধিতা এবং বাংলাদেশ হতে পাকিস্তানের দখলদার বাহিনী প্রত্যাহার, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আবেদন ও অব্যাহত কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার।

১৯৭১ সালের জুন মাসে বিভিন্ন বক্তৃতা বিবৃতির মাধ্যমেও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র নীতি ব্যাখ্যা করেন। ১লা জুন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক নীতি নির্ধারণী বিবৃতি প্রদান করেন। তিনি বলেন, "বাংলাদেশ একটি স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্র। পাকিস্তানের কাঠামোতে কোন রকম আপোস-মীমাংসার প্রশ্নই উঠতে পারে না।" বহির্বিশ্বে বিভিন্ন মহলে বাংলাদেশ সমস্যার 'রাজনৈতিক সমাধান' সম্পর্কে যেসব কথাবার্তা উঠেছে তৎসম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে জনাব তাজউদ্দীন উপর্যুক্ত ঘোষণা দেন।[১২] এই বিবৃতির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান কাঠামোর আওতায় যে রাজনৈতিক সমাধান হবে না তার দ্ব্যর্থহীন প্রতিত্তোর দেওয়া হয়। বিদেশনীতি ব্যাখ্যা করে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "আমাদের বৈদেশিক নীতি হবে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।" তিনি বৃহৎ শক্তির নিশ্চুপ থাকার বিষয়ে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, "যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি বর্তমান আমাদের সংকটময় সময়ে প্রতিবেশি বা যে কোন রাষ্ট্র যে ভূমিকা পালন করুক না কেন, আমাদের বিদেশ নীতির মূল কথা হল, সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব কারো সাথে শত্রুতা নয়।" এই লক্ষ্য নিয়েই আমাদের বিদেশে প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে কাজ করে যাচ্ছে।[১৩]

এ সময় পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় যুক্তরাষ্ট্র কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করলে বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ৬ই জুন এক বেতার ভাষণে দেশের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, [১৪]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণপ্রতিনিধিদের অবিলম্বে মুক্তিদান, বাংলাদেশের মাটি থেকে সামরিকবাহিনী ফিরিয়ে নেওয়া, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান এবং পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকশ্রেণি কর্তৃক এ যাবৎ বাংলাদেশ থেকে অপহৃত ধনসম্পদ ও গত আড়াই মাসের লড়াইয়ে হানাদার বাহিনী বাংলাদেশের যে ক্ষতিসাধন করেছে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় করে লুণ্ঠিত ধন প্রত্যার্পণ ও পূর্ণ ক্ষতিপূরণের দ্বারাই কেবল রাজনৈতিক সমাধান আসতে পারে অন্যথা রাজনৈতিক সমাধানের কোনো প্রশ্নই উঠতে পারে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩ গ. কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করার লক্ষ্যে গণপরিষদ অধিবেশন আহ্বান

১৯৭১ সালের ২০শে জুন কলকাতায় ভারতীয় পররাষ্ট্র দফতরের যুগ্মসচিব অশোক রায় যথাশীঘ্র বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের বৈঠক অনুষ্ঠানের জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনকে অনুরোধ করেন এবং অনাপত্তি না থাকলে ২৯শে জুন নাগাদ মেঘালয় রাজ্যের তুরায় এই অধিবেশনের আয়োজন করা যেতে পারে বলে উল্লেখ করেন। সময়ের স্বল্পতা ও যোগাযোগের অসুবিধার কথা বিবেচনা করে গণপরিষদের এই অধিবেশন ৬ই ও ৭ই জুলাই শিলিগুড়িতে অনুষ্ঠানের দিন ধার্য হয়। দেশের অভ্যন্তরে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার উদ্দেশ্যে গৃহীত ব্যবস্থাদির ফললাভের আগেই নানা কারণে সন্দেহ, বিভক্তি, বিভ্রান্ত ও বিক্ষুব্ধ জনপ্রতিনিধিদের সম্মুখীন হওয়া প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ তথা মন্ত্রিসভার জন্য সুখপ্রদ ছিল না। জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদে নির্বাচিত প্রায় ৩১০জন প্রতিনিধির এই সমাবেশে নীতিগত, ব্যক্তিগত, পারস্পরিক, আঞ্চলিক অভিযোগ ও অপপ্রচারের স্রোতধারাই ছিল অধিক প্রবল। যুদ্ধ পরিচালনায় ত্রুটি-বিচ্যুতিও নিঃসন্দেহে ছিল সমালোচনার যোগ্য। এসব অভাব-অভিযোগ ও ত্রুটি-বিচ্যুতিকে অবলম্বন করে কয়েকটি গ্রুপ উপদলীয় স্বার্থ উদ্ধারের জন্য মন্ত্রিসভার ব্যর্থতাকে সামনে এনেছিল, যার লক্ষ্য ছিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী। লক্ষ্য ছিল তাদের পদত্যাগ। আওয়ামী লীগের ভেতরে একটি গ্রুপের পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের যোগ্যতা এবং তার ক্ষমতা গ্রহণের বৈধতা নিয়ে নানা বিরুদ্ধ প্রচারণা চলতে থাকে। কর্নেল ওসমানীর বিরুদ্ধেও জিয়ার নেতৃত্বে সামরিক বাহিনীর একাংশ এই মর্মে প্রচারণা চালাতে থাকে যে, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনায় তিনি অদক্ষ ও অক্ষম। প্রচারণা ছিল মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার ক্ষেত্রে ভারতের মৌলিক অনীহা। কূটনৈতিক স্বীকৃতির প্রশ্নে তাদের নানা অজুহাত এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম শেষপর্যন্ত তাদের সমর্থন লাভ করবে কিনা তা-ও ছিল সন্দেহজনক আলোচ্য বিষয়। এসবের পেছনে খন্দকার মোশতাক চক্র সূক্ষ্মভাবে প্রচার চালাচ্ছিল। মন্ত্রীসভার বাইরে মিজান চৌধুরী গণপরিষদের অধিবেশনে সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের পদত্যাগ দাবি করেন এই বলে যে, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক প্রধানমন্ত্রী হলে গঠনতন্ত্র মোতাবেক তিনি সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক পদে বহাল থাকতে পারেন না এবং মুক্তিযুদ্ধ ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে বিষয়গত ও বস্তুগত দুর্বলতার প্রশ্ন উত্থাপন করেন।

ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বে গণ-পরিষদ সদস্যদের মতামত, সরকারের প্রতি তাদের আস্থা পরীক্ষা ও স্বাধীনতা অর্জন বিষয়ে তাদের প্রকৃত মনোভাব অবগত হওয়া ছিল জরুরি।

গণপরিষদের এই অধিবেশন ৬ ও ৭ই জুলাই শিলিগুড়ির বাগডোগরাতে অনুষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা গান্ধীর আসন্ন বিদেশ সফর, বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রী পরিষদের অভ্যন্তরে নড়বড়ে অবস্থা, সেনাকাঠামোয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক উপনির্বাচন ও শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপ এবং আওয়ামী নেতৃত্বের উপদলীয় কোন্দল, কতিপয় বাঙালি সদস্যের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। এ খবরও ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান হতে '৭০ এর নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনে উপনির্বাচন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের নিকট এমনও প্রমাণ ছিল যে, সামরিক বাহিনীর, এমনকি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কতিপয় সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী। কনফেডারেশন গঠনের কূটনৈতিক তৎপরতা তখনও অব্যাহত ছিল। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের সরকারকে কার্যকর সামরিক ও রাজনৈতিক সর্বোপরি কূটনৈতিক সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতকে সর্বদিক নতুন করে ঝালাই করে নিতে হয়।

জাতীয় পরিষদের ১১০জন ও প্রাদেশিক পরিষদের আনুমানিক ২০০ জন সংসদ সদস্য সেদিন গণপরিষদ অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন। শপথ নেওয়া হয়, "শত্রুকে জলে, স্থলে ও অন্তরীক্ষে চিরদিনের মতো পরাস্ত করেই স্বাধীনতা সমুন্নত রাখতে হবে।" প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "আমরা যদি ভুল করে করে থাকি তবে দেশ স্বাধীন হলে আপনারা আমাদের বিচার করবেন এবং আপনাদের রায় মাথা পেতে নেব।" "পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতীত কোন কিছুই গ্রহণযোগ্য নয়।" অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান সৈয়দ নজরুল ইসলাম আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে বললেন :

"মনে রাখবেন বর্তমান মুহূর্তে যুদ্ধের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন ঐক্যের। আপনাদেরকে আমি প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি, যদি আমাদের নীতি ও আদর্শ থেকে কোনদিন বিচ্যুতি দেখেন, আপনারা আস্তাকুঁড়ে নিক্ষেপ করবেন। কিন্তু বাংলার এই সংকট মূহূর্তে, জাতির স্বাধীনতার এই ক্রান্তিলগ্নে যেখানে শত শহীদের রক্তে ইতিহাস লেখা হয়েছে, আর যেখানে হাজার হাজার সৈনিক বন প্রান্তরে ইতিহাস লিখে চলেছে, সেই মুহূর্তে আর একবার আপনারা আস্থা স্থাপন করুন।"

অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম-এর ভাষণ ছিল অত্যন্ত আবেগপূর্ণ এবং মর্মস্পর্শী। তিনি বললেন।

"আপনারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি। বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ বিশ্বাস করে তাদের দায়িত্ব আপনাদের ওপর অর্পণ করেছিল। আপনারা সবাই বাংলার স্বাধীনতা যুদ্ধের সৈনিক বৈ আর কিছু নন। আমাদের মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের দীর্ঘ দিনের সহচর হিসাবে তাঁর জীবনব্যাপী আদর্শ আর সংগ্রামের আমরা ধারক ও বাহক। আদর্শের জন্য, নীতির জন্য, নেতার কাছে আর বাংলার মানুষের কাছে দেয়া প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য এই ধরনের অটুট মনোবল আর কোন দেশের জনপ্রতিনিধিরা দেখাতে পেরেছেন কিনা তার নজির আমার জানা নেই। আপনাদের বীরত্ব, আদর্শনিষ্ঠা, মনোবল ও ত্যাগের জন্য আমি অভিনন্দন জানাই। আপনারা গৃহহারা, সর্বহারা হয়ে বাংলার স্বাধীনতা সংগ্রামে আত্মোৎসর্গ করেছেন তাই আপনাদের প্রতি আমার অকুণ্ঠ আন্তরিক সালাম আর অভিনন্দন।"

তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধু গ্রেপ্তার হওয়ার মুহূর্তে স্বাধীনতা ঘোষণা দিয়েছেন। আমরা জানতাম বঙ্গবন্ধু যদি গ্রেপ্তার হন, তবে স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি করেই যাবেন। আর এই স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্যই আমাদের সংগ্রাম করে যেতে হবে।" বিভিন্ন প্রচারণার জবাবে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি দৃঢ় ভাবে ঘোষণা করেন, "ভারত সরকার মুক্তিযুদ্ধকে সাহায্য করার যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং ইতোমধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং এর জন্য যে সব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে তার ফল সঞ্চারের জন্য ৩-৪ মাস সময় প্রয়োজন, এর জন্য অধৈর্য হয়ে পড়লে চলবে না।" তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য ছিল ডিসেম্বরের মধ্যেই বাংলাদেশ স্বাধীন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হবে। গণপরিষদে প্রকাশ্যে আলোচনা ও পরবর্তী পর্যায়ে স্থির হয় সাবেক নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ কার্যকরী কমিটি নয়, বরং সাবেক পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কার্যকরী কমিটিকেই অতঃপর দলের বৈধ নেতৃত্ব হিসেবে গ্রাহ্য করা হবে। বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির নানা প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ঐক্যবদ্ধভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে দৃঢ় অবস্থান এবং মন্ত্রিসভার সমর্থনে সর্বসম্মত আস্থা জ্ঞাপনের মাধ্যমে স্বাধীনতা সংগ্রামের দৃঢ় প্রত্যয় উজ্জীবিত হয়ে ওঠে। সার্বিক অর্থে গণপরিষদ অধিবেশনের তাৎপর্য ও গুরুত্ব ঐতিহাসিক। এই অধিবেশনের এক সপ্তাহের মধ্যে সেক্টর কমান্ডারগণ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুষ্ঠানিক আনুগত্য ও শপথ গ্রহণ করেন। শুরু হয় নব উদ্যমে যুদ্ধজয়ের গৌরবগাঁথা। অঙ্গীকারে রক্তস্নাত শপথ : "যে কোন মূল্যে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা করতে হবে।"

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে মুক্তিযুদ্ধচলাকালীন গণপরিষদ অধিবেশন, কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত পর্যালোচনা করা হয়নি। অথচ মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে গণপরিষদের এই অধিবেশন ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ টার্নিং পয়েন্ট।

৩ ঘ. প্রাথমিক সাফল্য অর্জন

মুজিবনগর সরকার কূটনৈতিকভাবে নিজেদের ভাবমূর্তি যথাসম্ভব তুলে ধরতে সক্ষম হন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে না হলেও তাদের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করেন। মার্কিন সিনেটর কেনেডি যখন তাজউদ্দীন আহমেদের সাথে দেখা করতে আসেন তার মাধ্যমে এই সরকারের গ্রহণযোগ্য ভাবমূর্তির উল্লেখ পাওয়া যায়। অশোক রায়ের বর্ণনা মতে : "কেনেডি সাহেব একটা গেট দিয়ে রাজভবনে ঢুকলেন। এমন ব্যবস্থা করেছিলাম তাজউদ্দীন সাহেব, খন্দকার মুশতাক আহমেদ সাহেব এলেন এবং দেখা হল। আমি সেখানে উপস্থিত ছিলাম। যে জিনিসটা হলো কেনেডি ঘরে ঢোকার পর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললাম, উনি হলেন তাজউদ্দীন আহমদ। মি. কেনেডি বললেন, আই অ্যাম ভেরি হ্যাপি টু মিট ইউ মি. প্রাইম মিনিস্টার।"

এটা নিছক কথা নয়। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার ও কংগ্রেসের ভেতরে আলোচনা হয়েছে। সে যাই হোক উনি কথা বললেন বেশ অন্তরঙ্গভাবে। সব কথা বেশ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তাজউদ্দীন আহমদকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে সম্বোধন করা অশোক রায়ের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ঠেকেছিল।[১৫]

৪. মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরীণ প্রতিবন্ধকতা

৪. ক. মুজিব বাহিনী

মুজিবনগর সরকার দায়িত্ব পরিচালনা করতে গিয়ে এক জটিল পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হয়। মুক্তিবাহিনীর সমান্তরাল মুজিব বাহিনী সৃষ্টি এবং বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সামরিক বাহিনীকে কমান্ডভুক্তকরণ এবং ভারতে ও বহির্বিশ্বে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করার পাশাপাশি সরকারের অভ্যন্তরে পাকিস্তান ও মার্কিন চক্রান্তকে প্রতিহত করার কঠিন অথচ নীরব কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ মুজিবনগর সরকারকে উদ্‌বিগ্ন করে তোলে। ৩১শে মার্চ ভারতের লোকসভা পূর্ব বাংলার জনগণের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমর্থন করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। এসময় কলকাতায় উপস্থিত তরুণ-যুব নেতৃত্বের মধ্যে বিশ্বাস ও আস্থা বদ্ধমূল হয় যে নিশ্চয় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মুক্তিযুদ্ধকে সহযোগিতা করার লক্ষ্যে ভারত সরকারের সঙ্গে পূর্বে ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে যুব সংগঠনের চার নেতা শেখ ফজলুল হক মনি, সিরাজুল আলম খান,আব্দুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমদ দাবি করেন মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার দায়িত্ব বঙ্গবন্ধু তাদের উপর ন্যস্ত করেছেন। তাদের দাবির প্রেক্ষিতে তখন একটি কথা পরিষ্কার হয়ে আসে যে, অসহযোগ আন্দোলনের কোনো এক পর্যায়ে এই চার নেতার অধীনে সশস্ত্র যুবকরা প্রশিক্ষণ নেবে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। তারা নিজেরাও সীমান্ত অতিক্রম করার পর প্রকাশ্যে দাবি করতে থাকেন যে সশস্ত্র বাহিনীর প্রশিক্ষণ, মুক্তিযুদ্ধ সংগঠন এবং পরিচালনার জন্য বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কেবল তাদের চার জনের উপরই দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অন্য কারও উপর নয়। একই সঙ্গে তারা বিপ্লবী কাউন্সিল গঠনের মাধ্যমে বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জোর দাবি জানায়। তারা বিকল্পভাবে মুজিব বাহিনী গঠন করেন।[১৬] এর ফলে মুজিবনগর সরকারকে অনেক সময় বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়।

৪.খ. খন্দকার মোশতাকের চক্রান্ত

বাংলাদেশ সরকারের জন্য যে-দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে তাঁর সমর্থকদের মার্কিনীদের সাথে আলাদাভাবে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। মুজিবনগর সরকারের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মতে এই ঘটনা জানাজানি হবার পর খন্দকার মোশতাককে তার কার্যক্রমে নিষ্ক্রিয় করে ফেলা হয়। এ বক্তব্য কেবিনেট সচিব হোসেন তৌফিক ইমাম ও খন্দকার আসাদুজ্জামানের। এ প্রসঙ্গে হোসেন তৌফিক ইমাম বলেন :[১৭]

বাংলাদেশে থেকে যে প্রতিনিধিদল বিদেশে যাবার কথা ছিল, তার নেতৃত্ব দেবার কথা স্বাভাবিকভাবেই তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমেদের। এরা রওয়ানা হবার বেশ কিছুদিন আগেই বিভিন্ন গোপন সূত্রে খবর পেলাম যে খন্দকার মোশতাক এবং যে প্রতিনিধি এখান থেকে যাচ্ছেন এবং পাকিস্তান থেকে যে দল যাবে তার নেতৃত্ব দেবেন শাহ আজিজুর রহমান। তারা ওখানে গিয়ে মিলিত হবেন এবং একটি আপোষ ফর্মুলা করে একটা মিত্রসংঘ করবেন। এটি কিন্তু তখনই একবারে মূলোচ্ছেদ করা হয়। খন্দকার মোশতাককে আর যেতে দেওয়া হয়নি। বাংলাদেশ থেকে কোনো প্রতিনিধি দল গেলেও এবং মীমাংসার প্রশ্নও ওঠেনি। কারণ আমরা জানতাম যে এখানে যুদ্ধ ছাড়া এবং সম্পূর্ণ স্বাধীন বা মুক্ত হওয়া ছাড়া আর কোনো বিকল্প ছিল না।

খন্দকার মোশতাকের অনুপস্থিতিতে ভিন্নভাবে এ বিষয়টি কখনো মন্ত্রিপরিষদে আলাপ হয়নি। আমরা জানি, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন-এর কাছে শুনেছি। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির কাছে শুনেছি এরকম ষড়যন্ত্র হতে যাচ্ছিল, এবং এটিকে এভাবে ঠেকানো হলো। কিন্তু এ সম্পর্কে প্রকাশ্যে আলোচনা কখনো হয়নি।

খন্দকার আসাদুজ্জামান বলেন :[১৮]

"খন্দকার মোশতাক এবং তার সাথে মাহবুব আলম চাষী, এই দু'জন সম্পর্কে তখন নানা আলাপ-আলোচনা, গুজব চলছিল ; খন্দকার মোশতাক-এর গতিবিধি ও কথাবার্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটু সন্দেহজনক ছিলো। আমরা তখন এদের সম্পর্কে একটু সতর্কতা অবলম্বন করছিলাম। ভারতীয় সরকারও এই সম্পর্কে অনেকটা জেনে গিয়েছিলেন। মোশতাক-এর পরিকল্পনা ছিল যে বিদেশ সফরের নাম করে কোনোভাবে যদি তিনি ঐ জায়গা থেকে বের হয়ে আসতে পারতেন, তবে পাকিস্তানিদের সাথে একটা সমঝোতা করার একটা উদ্যোগ তিনি নিতেন। সেটা শেষ পর্যন্ত তিনি করতে পারেননি। কারণ মুজিবনগর সরকার এটা বুঝতে পেরে খন্দকার মোশতাক যেন বিদেশ যেতে না পারেন সেই ব্যবস্থা করেছিলেন। তাদের গতিবিধির ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু এবং তার সাথে তার যারা সহযোগী নেতৃবৃন্দ ছিলেন বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যাঁরা আরও ছিলেন, তাঁদের যে স্বাধীন বাংলার ধারণা আর মোশতাক সাহেবের স্বাধীন বাংলার ধারণা এটা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের দলিল থেকে জানা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য কাজী জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন দূতাবাসের সাথে যোগাযোগ করেন এবং প্রস্তাব করেন যে, যেহেত পাক-ভারত যুদ্ধের পরিণতিতে বহু মানুষ মারা যাবে, ক্ষয়ক্ষতি হবে, তিনি খন্দকার মোশতাকের পক্ষ হয়ে পাকিস্তানের সাথে আলোচনার জন্যে একটি সমঝোতা প্রস্তাব পেশ করতে চান। এ প্রস্তাবের মধ্যে অবশ্য একটি দিক ছিল যে, যে সমাধান হোক না কেন শেখ মুজিবকে অবশ্যই এর সঙ্গে জড়িত রাখতে হবে। এ ধরনের একটি আলোচনার প্রস্তাব মার্কিনীদের হাত হয়ে ইয়াহিয়া পর্যন্ত পৌঁছেছিল এবং তিনি আলোচনা করতে রাজি হয়েছিলেন।[১৯] পররাষ্ট্র সচিবের সঙ্গে দিল্লিতে যখন এই বিষয়ে আলোচনা হয় তখন তিনি বলেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের ব্যাপারে কোনো আপোষ করা হবে না।[২০] এক পর্যায়ে এসে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সাথে দূতাবাসের এক কর্মকর্তার আলাপ হয় এবং সেখানে খন্দকার মোশতাক বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত পাকিস্তানের ওপর তাদের প্রভাব খাটিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ত্বরান্বিত করা।[২১] আমীর-উল ইসলাম তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে খন্দকার মোশতাক তাঁকে বলেছিলেন, "হয় স্বাধীনতা, না হয় শেখ মুজিব, দুটোর একটা বেছে নিতে হবে। তিনি এটা শুনে খুব মর্মাহত হন।" এ সম্পর্কে একটি লিফলেট বিলি করা হয়েছিলো। সেদিন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে বিভ্রান্তি ছড়ানোর জন্য এটা করা হয়েছিল তা মুক্তিযুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা সবাই ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। এই লিফলেটের মাধ্যমে এটাও প্রমাণিত হয়েছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র সরকার ও দলের অভ্যন্তরে সক্রিয় ছিল।[২২]

জহিরুল কাইয়ুম বামবিরোধী বা মার্কিনঘেঁষা। খন্দকার মোশতাক এদের নেতা। দলিল মতে, মার্কিনীদের সাথে আলাপকালে কাইয়ুম বলেছেন যে মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ বামদের হাতে চলে যাচ্ছে এবং যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে বামরাই ক্ষমতায় আসতে পারে। এমন ভাবনা অনেকেরই ছিল এবং মুজিব বাহিনীর একটা অংশ বামভাবনা প্রভাবিত ছিল। এটা তারা মুজিববাহিনীর বাম অংশকে বুঝিয়েছিলেন। তাছাড়া চীনপন্থি বামরাও বিভিন্ন স্থানে সক্রিয় ছিলো। যদিও তারা প্রতিপক্ষ অবস্থায় ছিল না, দীর্ঘ যুদ্ধ হলে কে ক্ষমতায় থাকবে এটা নিয়ে দুর্ভাবনা হতে পারে ডানপন্থিদের। মার্কিনীরা বামদের ব্যাপারে খুবই স্পর্শকাতর ছিলো। বাম শক্তি সম্পর্কে মার্কিন সরকারি মহলে যথেষ্ট দুর্ভাবনার কারণ ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাকের সাথে আলাপের পর অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আলাপ করতে আগ্রহী হয়। তবে তাজউদ্দীন আহমদ মার্কিনীদের সাথে যোগাযোগ করতে রাজি হন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ করে বলেন, মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। মার্কিন দলিলেও শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে কোনো সমঝোতা বা আলাপ প্রস্তাবে উল্লেখ নেই।[২৩]

২৩শে সেপ্টেম্বর জহুরুল কাইয়ুম একজন সংবাদ বাহককে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল-এর নিকট প্রেরণ করে বলেন, ভারত সরকার এই যোগাযোগ সম্পর্কে জেনেছে এবং এ বিষয়ে আমাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।[২৪] ২০শে অক্টোবর বাংলাদেশের কূটনীতিবিদ হোসেন আলী কলকাতার মার্কিন কনসালের নিকট বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের উপরে শেখ মুজিবের মুক্তি ও অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিষয়টি উত্থাপন করেন। এরপর বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক যোগাযোগ স্থগিত হয়ে যায়।[২৫]

২৮শে সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অবশেষে যুক্তরাষ্ট্রের কলকাতাস্থ কনসালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং বলেন, এসব আলোচনা ফলপ্রসু হবে না যদিও যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের আকাঙ্ক্ষা অনুসারে প্রভাব বিস্তার না করে, মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে এবং যা বাংলাদেশের স্বাধীনতার সঙ্গে জড়িত। ১৬ই অক্টোবর জহুরুল কাইয়ুম অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সঙ্গে কনসাল জেনারেলের সঙ্গে বৈঠকে অস্বীকৃতি জানান এই বলে যে, ভারত এতে আপত্তি দিয়েছে। খন্দকার মোশতাকের আগ্রহ সত্ত্বেও[২৬] এভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধানের আলোচনা ভেঙ্গে যায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় সহযোগিতার বিষয়ে জনাব জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন কনসালকে বলেন যে, "He and many others in the Awami League would walkout from the Bangladesh Government rather than 'Sellout to India.' Further more he added, 'We do not want the Indian army in our country any more than we want the Pak army."[২৭] ভারতে অবস্থান করে এবং ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পাবার পরেও আওয়ামী লীগের একজন নির্বাচিত প্রতিনিধির এ ধরনের বক্তব্য অন্তর্দলীয় কোন্দলকে উস্কে দেওয়া ছাড়াও শত্রুপক্ষকে অনেক ক্ষেত্রে উৎসাহিত করেছে।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা পলোঅফ-এর সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকের সময় বাংলাদেশের হাইকমিশনার হোসেন আলীকে ঘরের বাইরে রাখা হয়। বৈঠককালে মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেন যে, "I know Yahya, I know him to be a good man and I think he knows that I am a good man."[২৮] ইয়াহিয়া খানের প্রতি মোশতাকের এ উচ্চ ধারণা স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রকে জটিল করে তোলে।

১৯৭১ সালের ২৭শে নভেম্বর মোশতাকের প্রতিনিধি জহিরুল কাইয়ুম আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল অফিসের এক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। তখন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি ডি.পি. ধরের সাথে মোশতাকের আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গও স্থান পায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মোশতাকের যোগাযোগকে ডি.পি. ধর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাঘাতকতা বলে উল্লেখ করেন। কিন্তু মোশতাক সব অভিযোগ অস্বীকার করে বলে কাইয়ুমের সাক্ষ্যে পাওয়া যায়। জহিরুল কাইয়ুমের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন কনসাল অফিস উল্লেখ করে যে, "He (Zahirul Qaiyum) and his group in Awami League did not intend to be dictated to by GOI (Government of India) and in addition he had threatened to wallkout on BDG (Bangladesh Government) along with some 43 supporters and go to Pakistan rather than 'Sell out' to India."[২৯] জহিরুল কাইয়ুমের এ বক্তব্যে আরও পরিষ্কার হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখন পর্যন্ত ছিল অবাস্তব। ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আদর্শগত মিল থাকায় মুজিবনগর সরকার ভারতের সাহায্য কামনা করে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক, কাইয়ুম ও কয়েকজন নেতা ভারতে অবস্থান করে ভারতীয় সহায়তার বিরোধিতা করেন। এটা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ বিরোধিতার শামিল বলে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনে করা হয়। এ সমস্ত কারণে সরকারের অভ্যন্তরে বিরোধ চরম আকার ধারণ করে।

খন্দকার মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার যুক্তরাষ্ট্র গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৩০] যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাককে লন্ডন বা প্যারিসে গিয়ে পাকিস্তানের সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেয়।[৩১] মোশতাক পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগ রক্ষার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি চাইতেন কিনা তা নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে।

খন্দকার মোশতাকের পাকিস্তান সম্পৃক্ততার বিষয়টি মুজিবনগর সরকারের নিকট অজ্ঞাত ছিল না। পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে মোশতাক জনাব মাহবুবুল আলম চাষীকে নিয়োগ দেন। এ নিয়োগ মোশতাকের পছন্দের ছিল। কিন্তু মাহবুবুল আলম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে কট্টর পাকিস্তানপন্থি ছিলেন।[৩২] পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোশতাক মাহবুবুল আলম চাষীকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এ জন্য পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুল ফতেহকে পররাষ্ট্রসচিব নিয়োগ দেন। খন্দকার মোশতাক অত্যন্ত চতুরতায় তাঁর মিশনকে সফল করতে অনুগত ব্যক্তিদের তিনি মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন জায়গায় নিয়োগে অনেকটা সফলকামও হন। কুমিল্লা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বহিঃপ্রচার বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পান। এ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুল মান্নান এম.এন.এ.।[৩৩] ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথম দিকে আব্দুল মান্নান সরকারি কাজে কলকাতার বাইরে গেলে তাহেরউদ্দিন ঠাকুর বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন। তাহের ঠাকুর বেতার স্টুডিওতেই অবস্থান করতেন। আব্দুল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মান্নান কলকাতায় ফিরে এসে তার এ কর্মকাণ্ড পছন্দ করেননি। তখন ঠাকুর পার্ক সার্কাসে বাংলাদেশ হাইকমিশন ভবনে মোশতাকের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন।[৩৪] এর কিছু দিন পরই বেতারকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ দিনের এ ধর্মঘট এক 'গোপন মহলের' প্রচেষ্টায় হয়েছিল বলে এম.আর. আকতার মুকুল উল্লেখ করেছেন।[৩৫] এই 'গোপন মহল' কারা তা সহজেই বোধগম্য। তাহের ঠাকুর স্টুডিও থেকে চলে গিয়ে পার্ক সার্কাসে অবস্থান নিলেও তিনি সুকৌশলে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রকে নিয়ন্ত্রণ করার চেষ্টা করেন। যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ নিজেদের জীবন দিয়ে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল সেখানে ধর্মঘট করার মতো অনভিপ্রেত ও হঠকারী কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকেই বিপদগ্রস্ত করার নামান্তর।

৪ গ. সমঝোতার প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে সংকট সৃষ্টির চেষ্টা

রাজনৈতিক সমাধানের আপ্তবাক্য উচ্চারণের আড়ালে চক্রান্ত চলতে থাকে। মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সি. আই. এ.'র নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত, তার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে দিয়ে 'স্বাধীনতার চেয়ে কম' অর্থাৎ 'কনফেডারেশন' গঠনের ফর্মুলায় সম্মত করাতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে 'স্বাধীনতা চাও, না বঙ্গবন্ধুকে চাও,' এই স্লোগান ও লিফলেট ছড়িয়ে স্বাধীনতার মূলশক্তি টগবগে তরুণ মুজিব ভক্তদের বিভক্ত করার দুরভিসন্ধি চালানো হয়। স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করার সিআইএর চক্রান্ত ভারতীয় কর্তৃপক্ষ বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের গোচরীভূত করেন। তখন থেকে মন্ত্রীপরিষদে খন্দকার মোশতাকের ভূমিকা গৌণ, কর্তৃত্ব খর্ব হয় এবং তিনি কোণঠাসা হয়ে পড়েন। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর যৌথ সিদ্ধান্তে পররাষ্ট্রসচিবের পদ হতে মাহবুব আলম চাষীকে সরিয়ে দেওয়া হয়।[৩৬]

ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের ফর্মুলা অনুসারে বাংলাদেশের সঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রতিনিধি একটি সমঝোতার প্রস্তাব করলে বাংলাদেশ সরকার দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দেন বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র, অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় আলোচনার কোনো সুযোগ নেই।[৩৭] বাংলাদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ. এইচ. এম. কামারুজ্জামান ৩০শে মে এক বিবৃতিতে ইয়াহিয়া খানের সমঝোতার প্রস্তাবের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে বলেন, "সমঝোতার প্রশ্নই উঠে না। তিনি বিশ্বের যে সকল রাষ্ট্র শান্তিকামী ও গণতান্ত্রিক নীতি ও মূল্যবোধে প্রচার ও প্রয়োগ করে তাদের উচিত পাকিস্তান দখলদার বাহিনীর হাত থেকে বাংলাদেশের গণতন্ত্রে বিশ্বাসী জনগণকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করা।"[৩৮]

৫. সামরিক বিজয়ের লক্ষ্য নির্ধারণ

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি দু'জনের বক্তব্যের ব্যবধান থেকে এটা উপলব্ধি হয় যে, সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ প্রকট ছিল। প্রধানমন্ত্রী যেখানে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনাকে বাতিল করে শুধু যুদ্ধের মাধ্যমে সার্বভৌম বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষায় দৃঢ়প্রতিজ্ঞ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেখানে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অন্তরায় ছিল। কারণ ৫ ও ৬ই জুলাই (১৯৭১) শিলিগুড়ির সভায়ও সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা রক্ষার শপথ নেন এম এন.এ., এম.পি.এ বৃন্দ। এরপরই মূলত যুদ্ধ ক্ষেত্রকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামও সামরিক বিজয়ের উপর গুরুত্ব দেন। ১৯৭১ সালের ৩০শে জুন স্বাধীন বাংলা বেতারে তিনি বলেন, "Freedom fighteres would give a befitting reply on the battle field to Gen. Yaya Khan's audacity".[৩৯]

৬. মুজিবনগর সরকারের প্রতি বাংলাদেশি বিভিন্ন দল ও ব্যক্তির ভূমিকা

২৯শে আগস্ট ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের 'পলিসি প্লানিং কমিটি'-র চেয়ারম্যান ডি.পি. ধর-এর কলকাতায় মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে আলোচনায় ব্যগ্রতা প্রকাশ পায় যে, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে রাজনৈতিক দলগুলোকে একটি জাতীয় ফোরামে একত্রিত করা জরুরি। এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশের অপেক্ষাকৃত 'ক্ষুদ্র বাম দলগুলো' স্বাধীনতা সংগ্রামে কাঠামোগতভাবে সংযুক্ত করা যাতে এই সংগ্রাম জাতীয় মুক্তিসংগ্রামে রূপ পরিগ্রহ করে। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়ার সমর্থন পেতে হলে স্বাধীনতা সংগ্রামকে জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের তাত্ত্বিক বন্ধনে রণনৈতিক বিবেচনায় অগ্রসর হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। সেপ্টেম্বর মাসের শেষদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর মস্কো সফর শুরু করার পূর্বে জাতীয় মোর্চা গঠন করার তাৎপর্য বিশেষভাবে বিবেচিত হয়। এরকম একটি মোর্চা গঠন আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের একাংশের কোনো সময় মনপুত হয়নি। যার ফলে এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া স্বাভাবিকভাবেই আওয়ামী লীগের কিছু অংশকে ক্ষুব্ধ করে তোলে। তারপরেও বিরাজমান পরিস্থিতিতে মন্ত্রীসভা জাতীয় উপদেষ্টা কমিটি গঠন করে। উপদেষ্টা কমিটি গঠন করার লক্ষ্য যাই থাক না কেন এটা কোনো কার্যকরী কাঠামোগত রূপ যেমন নিতে পারেনি তেমনি সাংগঠনিক ক্ষেত্রেও তেমন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। এই কমিটির সীমায়িত বাস্তবতা ছিল মূলত মুজিবনগর সরকারকে মুক্তিসংগ্রামে পরামর্শ দান। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রে এর সম্পর্কে ১০ই সেপ্টেম্বর একটি তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ প্রচারিত হয়।[৪০]

ন্যাপ (মোজাফ্ফর)

১৯৭১ সালের ২০শে এপ্রিল ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) এর প্রেসিডেন্ট মোজাফ্ফর আহমদ এক বিবৃতিতে বলেন:[৪১]

আমরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় ঘোষণা করছি শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে যে সরকার গঠিত হয়েছে তা বাংলাদেশের বৈধ ও নিয়মতান্ত্রিক সরকার। আমরা সমগ্র বিশ্বের নিকট আবেদন জানাচ্ছি, সাংবিধানিকভাবে গঠিত সরকার ও নবজাত রাষ্ট্রকে নৈতিক ও বস্তুগত সমর্থনের জন্য। এ প্রসঙ্গে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে, বিশ্বের যে সমস্ত গণতান্ত্রিক শান্তিকামী দেশ বিশেষকরে ইন্ডিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সমর্থন ও সহযোগিতা করছে তার প্রতি। হাজার নিরীহ মানুষ, নারী এবং শিশুদের গণহত্যা করা হচ্ছে তা বন্ধ করতে জাতিসংঘকে যেন চাপ প্রয়োগ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কূটনৈতিক দৃষ্টিতে এই বিবৃতি ছিল মুজিবনগর সরকারের প্রতি সরাসরি রাজনৈতিক ও আদর্শিক অবস্থান।

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী[৪২]

মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর ন্যাপ ও তাঁর ছাত্র সংগঠন ভারত সরকারের সক্রিয় সহযোগিতা পায়নি। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ মওলানা ভাসানীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে বিশ্ব পরিসরে কূটনৈতিক তৎপরতায় যুক্ত করতে সমর্থ হয়। প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে তিনি পরাশক্তি-রাষ্ট্র, জাতিসংঘ বিশেষকরে চীনের প্রতি পত্র লেখেন। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এটা ছিল বিশেষ কার্যকর ও ফলপ্রসূ। তিনি ৭১ সালের ২১শে এপ্রিল বিশ্বের নেতাদের কাছে আবেদন জানান। এই নেতারা হচ্ছেন, জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট, প্রেসিডেন্ট মাও, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই, ইউ.এস.এস. আর.-এর সেক্রেটারি জেনারেল ব্রেজনেভ, প্রেসিডেন্ট পোদগর্নি, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন, যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হিথ, যুগোশ্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো, মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত প্রমুখ।

ক. জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে উদ্দেশ্য করে মওলানা ভাসানীর লিখিত পত্রে[৪৩] বলা হয়, সাড়ে সাতকোটি মানুষের পক্ষ থেকে আমি আবেদন জানাচ্ছি সামরিক বাহিনী ডিক্টেটর জেনারেল ইয়াহিয়া খান নিরীহ, নিরস্ত্র এবং অসহায় বর্ণ, ধর্ম, সম্প্রদায়, নারী, শিশু এমনকি সদ্যজাত শিশুকে হত্যা করছে, এই বর্বর নৃশংস কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে আপনি কার্যকর ভূমিকা নেবেন। বাংলাদেশের জনগণ তাদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে তার ব্যবস্থা নেন। একই দিনে মওলানা ভাসানী চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুং, প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনের কাছে ব্যক্তিগত বার্তা পাঠিয়ে বাংলাদেশে গণহত্যার ভয়াবহতা সম্পর্কে অবহিত করেন এবং পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধের দাবি জানান। ভারত সরকার তাঁর এই সমস্ত চিঠিপত্র-তারবার্তা যথাস্থানে পাঠাবার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা নেন।[৪৪]

খ. আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের নিকট বাংলাদেশের এই প্রবীণ নেতার আবেদন, "চীনের ও আপনাদের দেওয়া সামরিক সম্ভার দিয়ে স্বৈরাচারী একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া 'বাংলাদেশে' লক্ষ লক্ষ নিরীহ নরনারী শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করছে। আপনি অবিলম্বে পাকিস্তানকে নতুন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করুন। 'বাংলাদেশ' প্রজাতন্ত্রকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দিন। তাদের সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন।"

গ. চীনের চেয়ারম্যান মাও সে তুংকে মওলানা ভাসানী এক আবেগময় পত্র লেখেন। তিনি বলেন, সমাজতন্ত্রের আদর্শ হচ্ছে অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে লড়াই করা। একনায়ক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সামরিক চক্র বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর যে বর্বর অত্যাচার চালিয়েছে তা থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য আমি আপনার নিকট আবেদন করছি। পশ্চিম পাকিস্তানের কায়েমি স্বার্থের সাহায্যে সামরিকচক্র বাংলাদেশের অত্যাচারিত জনগণের উপর পশুর মতো যে বীভৎস আক্রমণ চালিয়েছে আপনার সরকার যদি তার প্রতিবাদ না করে তবে বিশ্ববাসীর এই ধারণাই হবে যে, আপনি অত্যাচারিত জনগণের বন্ধু নন। বাংলাদেশের নিরাপরাধ জনগণের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিকচক্র যে নির্যাতন চালিয়েছে তার তুলনা আপনার দেশে চিয়াং কাইশেকের, রাশিয়ার জারের এবং স্বাধীনতাপূর্ব ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের শাসনকালেও পাওয়া যাবে না। তিনি বলেছেন, "আপনি ভালভাবেই জানেন যে, স্বাধীন বাংলাদেশের সরকারের পেছনে যে প্রকাশ্য জনসমর্থন রয়েছে, কম্বোডিয়ার সিহানুক সরকারের পিছনেও ততোখানি সমর্থন নেই। তাই আপনার নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, বাংলাদেশের স্বাধীন জনগণতান্ত্রিক সরকারকে আপনি সমর্থন করুন, স্বীকৃতি দিন ও সর্বপ্রকারে সাহায্য করুন। বর্তমানে আমি ৮৯ বছরের বৃদ্ধ। আমার ৮৯ বছর বয়সে ইয়াহিয়া খানের বর্বর সৈন্যরা আমার সামান্য বাসগৃহ পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত আমার মূল্যবান বইগুলিও তারা পুড়িয়ে দিয়েছে। আমার বাড়িতে আগুন লাগাবার পর আমার পরিবারবর্গের ভাগ্যে কী ঘটেছে আমি জানি না।"

ঘ. ২৫শে এপ্রিলের আনন্দবাজারে 'রুশ নেতাদের কাছে ভাসানীর তারবার্তা' শিরোনামে আর একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। অসহায় মানুষের উপর ইয়াহিয়া খানের ফৌজের বর্বরোচিত অত্যাচার বন্ধের জন্য ন্যাশনাল আওয়ামী দলের নেতা মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী সোভিয়েট রাশিয়াকে আরো কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ জানিয়েছেন। রুশ প্রেসিডেন্ট পদগর্নী বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে যে-কথা বলেছেন, মওলানা ভাসানী তাকে স্বাগত জানিয়ে একটি বিবৃতিতে বলেন, 'শুধু এই কথাতেই সব হল না, অবিলম্বে বসে একটি কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।"

ঙ. ১৫ই মে। বিশ্বের সকল রাষ্ট্র এবং বিশেষ করে ইয়াহিয়া খাঁর প্রতি মওলানা ভাসানীর চ্যালেঞ্জ, "যদি কারো মনে বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের দাবি সম্পর্কে কোন সন্দেহ থাকে তা হলে জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে বাংলাদেশে গণভোটের ব্যবস্থা করতে পারেন। দেখবেন বাংলার শতকরা ৯৯ জনের বেশি লোক স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানাচ্ছে।[৪৫] এই সময় ভাসানীর 'পিকিংপন্থিত্ব'র ওপর জোর দেওয়ার কারণও রয়েছে। চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দিচ্ছিল তার 'ভৌগোলিক অখণ্ড ও সংহতি রক্ষার স্বার্থে।" অন্যদিকে, চীনের সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার একজন অবিচল অনুরাগী মওলানা ভাসানী বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছেন। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে অবস্থানকারী চীনপন্থি কয়েকটি কমিউনিস্ট উপদলও পাকিস্তানদের পক্ষেই কাজ করছিল, অন্যদিকে চীনপন্থি কোনো কোনো উপদল গড়ে তুলেছিল পাকিস্তানিদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ। চীন ও মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নানা লেখালেখি ও গুজব চলছিল। 'চীনের কূটনৈতিক লক্ষ্য[৪৬] এবং 'বাংলাদেশের প্রশ্নে মাওবাদীরা দ্বিধাবিভক্ত'।[৪৭] এ পরিপ্রেক্ষিতে মওলানা ভাসানীর বিবৃতি মুজিবনগর সরকারের নিকট ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

কমিউনিস্ট পার্টি[৪৮]

বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি ও এর ছাত্র-কৃষক সংগঠন মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকে মুজিবনগর সরকারকে সমর্থন করে। এর কারণ হিসেবে পাঁচটি যুক্তি উত্থাপন করে। যুক্তিগুলো হলো : এক, মুক্তিযুদ্ধের সফল পরিণতি দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করবে। দুই, সাম্রাজ্যবাদ দুর্বল হবে। তিন, সাম্প্রদায়িকতা হ্রাস পাবে। চার, প্রতিবেশি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশসমূহের সাথে সুসম্পর্ক দৃঢ়তর হবে এবং পাঁচ, সমাজতান্ত্রিক দেশগুলোর সাথে বাংলাদেশের সম্পর্কের উন্নতি হবে। মুক্তিযুদ্ধ সফল করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি স্পেশাল গেরিলা বাহিনী গঠন করে এবং একটি দলকে সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রশিক্ষণের জন্য প্রেরণ করেছিল। শুধু তাই নয়, পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক শক্তিসমূহকে মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান এবং শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে ইয়াহিয়া খানকে বাধ্য করার জন্য চাপ সৃষ্টি করতে অনুরোধ জানান।

পিকিং পন্থির ভূমিকা

পিকিংপন্থির উপদলীয় লাইন নিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, "এপ্রিলের ১৪ তারিখে সন্ধ্যায় রেডিও পাকিস্তানের এক খবরে শুনলাম চৌ এন লাই, চীনা প্রধানমন্ত্রী, পাকিস্তান সরকারের কাছে এক পাঠানো বাণীতে বলেছেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সুখসমৃদ্ধি পাকিস্তানের অখণ্ডতার উপর নির্ভরশীল। দ্বিতীয়, যারা পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা করছে তারা হল মুষ্টিমেয় লোক। রেডিও পাকিস্তান প্রচারিত এই সংবাদ শুনে আমি শুধু স্তম্ভিতই হলাম না, খুব ভীতও হলাম। কারণ, আমি আমাদের পার্টি নেতৃত্বের মেরুদণ্ডহীনতা এবং চীনের প্রতিটি বক্তব্য জো হুজুরি মনোবৃত্তি নিয়ে মেনে চলার কথা জানতাম। এ বিষয় পার্টি মুখপাত্র সাপ্তাহিক গণশক্তির সম্পাদক হিসেবে তাঁদের সাথে মাঝে মাঝেই আমার মতবিরোধ হত। কাজেই চৌ এন লাই-এর বক্তব্য শোনার পর আমি পরদিনই ভোরে যশোর থেকে ঢাকায় ফিরে যা দেখলাম এবং সুখেন্দু দস্তিদার ও অন্যদের যে বক্তব্য শুনলাম তার থেকে স্পষ্ট বোঝা গেল যে, আমাদের সর্বনাশ হয়েছে। নিজেরা দেশের সুনির্দিষ্ট বাস্তব পরিস্থিতির সঠিক বিশ্লেষণ করতে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়ে পার্টি নেতারা চীনের বক্তব্য অনুযায়ী রাতারাতি এমন অবস্থান গ্রহণ করলেন যাতে ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনী এবং পাকিস্তানি সরকার ও সেনাবাহিনীর পারস্পরিক সংঘর্ষ তাঁদের লাইন অনুযায়ী হয়ে দাঁড়াল দুই কুকুরের যুদ্ধ। চীনের বক্তব্য শুনে ও চারু মজুমদারের সন্ত্রাসী লাইনকে মুক্তিযুদ্ধের লাইনের সাথে যুক্ত করে এক উদ্ভট তত্ত্ব খাড়া করায় অতি অল্প সময়ের মধ্যেই বিভিন্ন এলাকায় বিপর্যয় দেখা দিল এবং সেই সাথে পার্টির মধ্যে নানা ধরনের চক্রান্তমূলক তৎপরতাও বৃদ্ধি পেল।' পাকিস্তান সরকার আমাদের জনগণের ওপর যে আক্রমণ করেছিল, সে আক্রমণ প্রতিহত করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার ক্ষেত্রে ব্যাপকতম ঐক্য গঠনের পরিবর্তে তাঁরা পাকিস্তান সরকারের সাথে আওয়ামী লীগকেও ঐ পরিস্থিতিতে কুকুর হিসেবে আখ্যায়িত করে তাদের পারস্পরিক যুদ্ধকে দুই কুকুরের বিরুদ্ধে লড়াই বলে আখ্যায়িত করে তাদের উভয়কেই বিরোধিতা করার মতো এক নির্বোধ লাইন ধারণ করেন। এছাড়া একাজ করতে গিয়ে তারা আওয়ামী লীগ ও মুক্তিবাহিনীকে সম্পূর্ণভাবে এক করে দেখে, সকলেরই বিরোধিতা করতে নিযুক্ত হন। যেখানে অন্য কোনো বিকল্পের অভাবে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে এক করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিণাম বা আওয়ামী লীগই নয়, সাধারণ জনগণ দ্বারা ধাবিত হয়েই অনেক ক্ষেত্রে এলাকা ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

৭. কূটনৈতিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়ন

১. মুজিবনগর সরকারের প্রচেষ্টা ছিল প্রতিবেশী ভারতকে কূটনৈতিকভাবে অধিকতর সক্রিয় করে পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিকভাবে বিচ্ছিন্ন করা,

২. ভারত কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করা এবং ভারত-বাংলাদেশের মধ্যে সার্বক্ষণিকভাবে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন,

৩. অন্য কোনো তৃতীয় দেশ যুদ্ধে যাতে জড়িত না হতে পারে সে লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা চালানো,

৪. যুদ্ধ পক্ষকালের মধ্যে শেষ করার পরিকল্পনা,

৫. যুদ্ধকালীন ভারতের মাধ্যমে অন্য কোনো পরাশক্তির হুমকি মোকাবেলা করার পরিকল্পনা গ্রহণ,

৬. যুক্তিযুক্ত শর্তে রাজনৈতিক সমাধান ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব সুদৃঢ়করণে ভারতের আন্তরিক ও কার্যকর সমর্থন আদায়,

৭. জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির লক্ষ্যে ভারতীয় নেতৃত্বকে বিশেষভাবে সক্রিয়করণ,

৮. শরণার্থীদের সম্মানজনকভাবে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা,

৯. ভারত-সোভিয়েত বলয়ের শক্তি সমাবেশের মাধ্যমে মনস্তাত্ত্বিকভাবে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে দুর্বল করা,

১০. ব্রিটেন, ফ্রান্স, কানাডা, জাপান এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ দেশ, এমনকি যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক জনমত গঠনে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা এবং তাদের নিরপেক্ষ রাখা বা আগ্রাসী মনোভাব হ্রাস করার পরিকল্পনা গ্রহণ,

১১. ইসলামাবাদের সামরিক জান্তার উপর চাপ সৃষ্টি করা যেন তারা অবিলম্বে বিশ্বজনমতের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয়, এবং

১২. পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে মুক্ত করা এবং বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

৭. ক. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অবকাঠামো গঠন

সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থাকলেও বৈদেশিক নীতি সংক্রান্ত যাবতীয় কাজকর্ম প্রধানমন্ত্রীর প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত হত। সকল প্রকার বৈদেশিক নীতি প্রধানমন্ত্রী নিজেই ঠিক করে দিতেন। এর কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, পাকিস্তানি ষড়যন্ত্রের কারণে এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীন সরকারের ভ্রান্ত নীতি অবলম্বনের ফলে সে সময় পৃথিবীর রাজনৈতিক গতি-প্রকৃতির প্রতি প্রধানমন্ত্রী প্রখর দৃষ্টি রেখেছিলেন। এমনকি তিনি বিশ্ব পরিসরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম, কার্যকরণ ঘটনাবলী ও স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে বৈদেশিক প্রচার বিভাগকে পরিকল্পিতভাবে বিন্যস্ত করার পদক্ষেপ গ্রহণ এবং এর কাঠামোগত ব্যবস্থাপনায় সুনির্দিষ্ট ছকে গ্রথিত করেছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

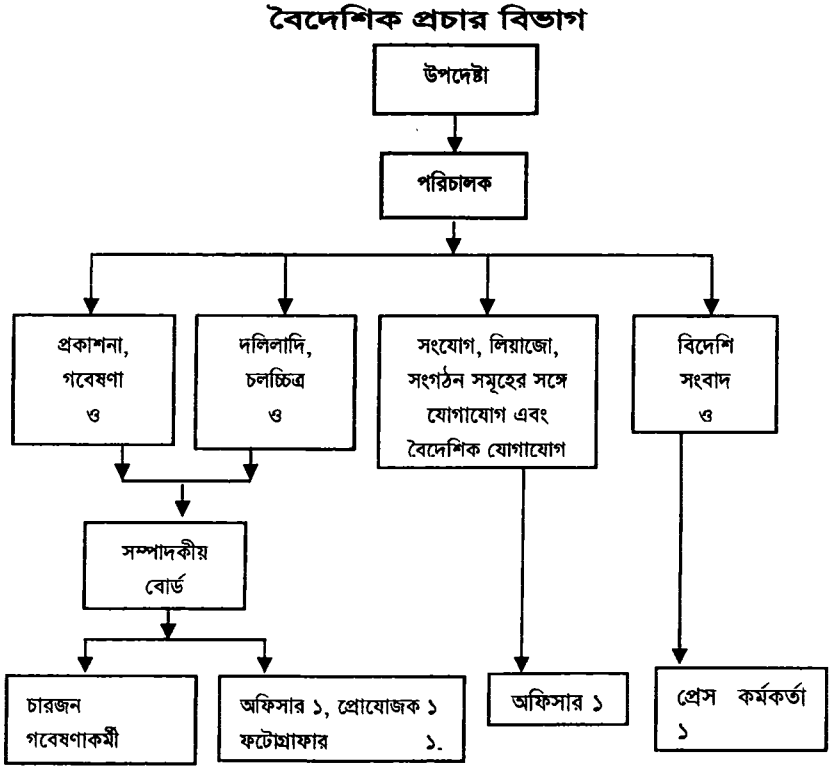

৭. খ. কূটনৈতিক প্রতিনিধি নিয়োগ

বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে সমর্থন, সাহায্য, সহযোগিতা করার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকার যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। বাংলাদেশ সরকারের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ যুগ্ম স্বাক্ষরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্ব ও জাতিসংঘে বাংলাদেশে কূটনৈতিক মিশনে প্রতিনিধি নিয়োগ প্রদান করেন।[৪৯]

৭.গ. বিভিন্ন দেশে দূতাবাস প্রতিষ্ঠা

১৯৭১ সালের নভেম্বর পর্যন্ত বিদেশে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের অনেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন যা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক সাফল্যের এক বিরাট মাইলফলক। সেদিন বিদেশে এক অনিশ্চিত জীবনের প্রান্তে দাঁড়িয়ে যারা আনুগত্য ঘোষণা করেন তারা বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে এক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যান।[৫০] একইভাবে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের দূতাবাসও প্রতিষ্ঠিত হয়। মুক্তিযুদ্ধকে বহির্বিশ্বের মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য করার ক্ষেত্রে এবং মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদেশিদের সহযোগিতা প্রাপ্তির ক্ষেত্রে এসব দূতাবাস গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একাত্তরে নভেম্বর মাসে সরকারের পক্ষ থেকে বিদেশে বাংলাদেশের মিশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের একটি তালিকা প্রকাশিত হয়। পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয় পরিবেশিত এই সার্কুলার বিদেশে কর্মরত মিশনপ্রধান ও মিশনের ঠিকানা তৎকালে সকল সচিবসহ সংশ্লিষ্টদেরও প্রদান করা হয়।

৭. ঘ. মুজিবনগর সরকার কূটনৈতিক নেটওয়ার্ক প্রতিষ্ঠা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বৃহৎ শক্তিবর্গ ও মুসলিম দেশসমূহের ভূমিকা শীর্ষক একটি পৃথক অধ্যায় প্রণয়ন করা হবে। সুতরাং এই অংশে বিষয়টি খুব সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হলো :

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র : মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর হতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের জন্য যা করেছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য :

১. বর্ষাকালে পূর্ব পাকিস্তানে চলাচলের জন্য কোস্টার কিনতে ৪ মিলিয়ন ডলার সাহায্য প্রদান।

২. বিভিন্ন জাহাজে অস্ত্র সরবরাহ। ভারী এবং অত্যাধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ইরান ও তুরস্কের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে এবং সহায়ক সরঞ্জামগুলো এবং যন্ত্রাংশ প্রকাশ্যেও সরাসরি প্রেরণ করা হয়েছে।

৩. ১৮টি কোবরা গানশীপ (বৃহৎ হেলিকপ্টার) ইরান থেকে আনা হয়েছে যা যুক্তরাষ্ট্র সরবরাহ করেছে বলে বিশ্বাস করা হয়।

৪. আগস্ট মাসের প্রথম দিকে লস এনজেলস্ টাইম পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, মার্কিন সমরাস্ত্র যা ভিয়েতনামে যাচ্ছিল তা পশ্চিম পাকিস্তানের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

৫. ভিয়েতনাম যুদ্ধে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কাউন্টার ইনসার্জেন্সি বিশেষজ্ঞদের ঢাকায় মার্কিন অফিসে পাঠানো হয়।

৬. পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র বেসরকারি ব্যাংকের মাধ্যমে সাহায্য করার প্রস্তুতি নিয়েছে।

এসব ঘটনাবলি থেকে প্রমাণিত হয় বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে জড়িত ছিল এবং ইয়াহিয়া খানকে পূর্ণ সমর্থন দিয়ে যাচ্ছিল। তবে মার্কিন জনমত ছিল বাংলাদেশের পক্ষে। ২৫শে মার্চ গণহত্যার সংবাদ প্রকাশিত হবার পরে প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন, সেক্রেটারি রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী কিসিঞ্জার ও সিনেটে বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইট এবং জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে ফ্যাক্স বার্তা পাঠানো হয়। ২৯শে মার্চ ওয়াশিংটনের এক র‍্যালী হতে আই.এম.এফ, বিশ্বব্যাংক ও মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। বাঙালি ছাড়াও ভারতীয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীরাও এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করলে মার্কিন গণপ্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। ৩০শে মার্চ ওয়াশিংটন পোস্ট পত্রিকায় সাংবাদিক সাইমন ড্রিংয়ের রিপোর্টে গণহত্যার লোমহর্ষক বিবরণ ছাপা হয়। মার্কিন মানবতাবাদী মানুষ ও সংস্থাগুলো সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ১লা এপ্রিল মার্কিন কংগ্রেসে সিনেটর কেনেডি ও সিনেটর হ্যারিস বাংলাদেশে পাকিস্তানি গণহত্যার নিন্দা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানান এবং নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণ বন্ধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য মার্কিন সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ৬ই এপ্রিল পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সেলর এ. এম. এ. মুহিত এবং পরবর্তীকালে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক বাংলাদেশের অতীত বঞ্চনা ও নারকীয় ঘটনা তুলে ধরলে বাংলাদেশের স্বপক্ষে জনমত গড়ে ওঠে।[৫১] এপ্রিল মাসের শেষ দিকে মুজিবনগর সরকারের অর্থনৈতিক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান যুক্তরাষ্ট্র ভ্রমণ করেন এবং বিভিন্ন বক্তব্যে পাকিস্তানের শাসন-শোষণ, বৈষম্য ও বর্বরতার চিত্র তুলে ধরেন এবং মুজিবনগর সরকার কর্তৃক প্রস্তুতকৃত প্রচারপত্র বিলি করেন। নিউইয়র্কে বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিক এ. এইচ. এম. মাহমুদ আলী ও স্থপতি জনাব ফজলুর রহমান খান বাংলাদেশের পক্ষে সক্রিয় ভূমিকা নেন। ২৪শে মে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকারের নির্দেশে যুক্তরাষ্ট্রে এসে নরওয়ে, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, লিবিয়া, জর্ডান, মিশর, ইরাক, ইরান, সিরিয়া ও পশ্চিম ইউরোপের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং বাংলাদেশের স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। ২৩শে জুন নিউইয়র্কের একটি কনভেনশনে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মিশন স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে ছয় জন কূটনীতিকসহ চৌদ্দ জন বাঙালি বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করেন। আগষ্ট মাসে আনুষ্ঠানিকভাবে ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হয়।[৫২] স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এই মিশন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে সমর্থ হয়, যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাপক সাড়া জাগায় এবং পাকিস্তান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। আগষ্টের প্রথম সপ্তাহে এম.আর. সিদ্দিকী বাংলাদেশ মিশনের প্রধান হিসেবে যোগ দেন। মার্কিন পত্রপত্রিকা ও জনপ্রতিনিধিদের আপত্তি সত্ত্বেও নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। সামরিক সাহায্য বন্ধ না হলেও কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে পাকিস্তানের ঋণ সহায়তা প্রদান বিবেচিত হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বিচারপতি আবু সাঈদের নেতৃত্বে ষোল সদস্যের একটি প্রতিনিধিদল নিউইয়র্কে গমন করে।[৫৩] এই প্রতিনিধিদল বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের উপর অত্যাচারের নির্মম কাহিনি তুলে ধরতে সমর্থ হন। এসময়ে ড. এ. আর. মল্লিক যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করে জনমত গড়ে তোলেন। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, ২রা অক্টোবর দাতাগোষ্ঠীর সভায় কোনো দাতা দেশ পাকিস্তানকে কোনো প্রকারের ঋণ প্রদান করেনি। এটা ছিলো পাকিস্তানের কূটনৈতিক পরাজয় ও বাংলাদেশের কূটনৈতিক বিজয়। ২৯শে অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রে আগমন করলে বাংলাদেশ মিশনের কর্মকর্তাগণ তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এসময়ে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানে অস্ত্রসরবরাহ বন্ধ করে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে গোপনে পাকিস্তানকে অস্ত্র প্রেরণের পথ অন্বেষণ করে। ৩রা ডিসেম্বর মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে নিরাপত্তা পরিষদে মার্কিন নীতি ছিল যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ করানো। সোভিয়েত ইউনিয়ন এ ধরনের তিনটি প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে। ১৬ই ডিসেম্বর মার্কিন নীতি অখণ্ড পাকিস্তানকে অক্ষুণ্ন রাখার কূটনৈতিক তৎপরতার পরাজয় ঘটে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত ইউনিয়ন : এই উপমহাদেশে বিশেষকরে ভারতের পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়াকে বাংলাদেশ নিয়ে ভাবতে হয়েছে। রাশিয়া যা করেছে : ১. প্রেসিডেন্ট পদগর্নি কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে একটি পত্র দিয়েছেন। পত্রটিতে কোনো হুমকি ছিল না বরং পাকিস্তানকে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমস্যা সমাধানের অনুরোধ করা হয়েছে; ২. সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের মধ্যে বেশ কিছু পত্র বিনিময় হয়েছে যা অপ্রকাশিত, কিন্তু মর্মবস্তু একই ধরনের; ৩. সোভিয়েত-ভারত চুক্তি[৫৪] স্বাক্ষরিত হলেও বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকট সম্পর্কে সমগ্র পাকিস্তানের সন্তুষ্টির মাধ্যমে সমাধানের কথা বলা হয়েছে; ৪. ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরাগান্ধীর মস্কো সফরে সোভিয়েত মনোভাব কিছুটা পরিবর্তন পরিলক্ষিত হলেও মূল সংকট সম্পর্কে তাদের অবস্থান ছিল পূর্বের মতোই। ভারতীয় প্রেক্ষাপটে এ পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই কোসিগিন বলেছেন, প্রতিবেশী ভারতে ৮০ লক্ষ শরণার্থী যাদের বাড়ি থেকে উচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের সম্পত্তি দখল ও আশ্রয়হীন করতে এবং দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে এ অবস্থায় পাকিস্তানের তেমন কিছু অর্জন অসম্ভব। পরের দিন কোসিগিন ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানে গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে সোভিয়েতের সমবেদনা রয়েছে কিন্তু 'ববর্রতা' এবং জঘন্য মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড সোভিয়েত জনগণের সমর্থন পেতে পারে না।" এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন 'পূর্ববঙ্গ' নামটি ব্যবহার করে। কিন্তু ২রা এপ্রিল ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট পদগর্নি কর্তৃক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে লিখিত পত্রের মর্মার্থের অগ্রসরতা দৃশ্যমান হয়নি। ভারত-সোভিয়েত চুক্তির পর যুক্ত বিবৃতি যা বলা হয়েছিল তা থেকে সোভিয়েত রাশিয়া পিছু সরে এসে বলে "অবিলম্বে সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমাঝোতায় উপনীত হতে হবে, জন্মগত, আইনগতভাবে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হবে" এবং "শরণার্থীদের নিরাপদ ও মর্যাদা সহকারে পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে।" এ সময়ও রাশিয়ার টেকনিশিয়ান ও বিশেষজ্ঞগণ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের উভয় অংশে কর্মরত ছিল। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ রয়েছে যে, রাশিয়া কোনোভাবেই ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ চাচ্ছিল না। বিগত দশ বছর ধরে সোভিয়েত রাশিয়া প্রকৃত সংঘর্ষ হতে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার নীতি অনুসরণ করে চলেছিল। কিন্তু সোভিয়েত রাশিয়া ক্রমশ ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। মুজিবনগর সরকার সোভিয়েত রাশিয়া যাতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহযোগিতা করে সেজন্য বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদককে মস্কোতে প্রেরণ করে।

চীন: চীন প্রথম থেকেই পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ এবং ইয়াহিয়া খানকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করে এসেছে। ডিসেম্বরের পূর্বেই চীন সীমান্তে সোভিয়েত রাশিয়া ৪০ ডিভিশন সৈন্য মোতায়েন করায় চীন সরাসরিভাবে ভারতকে আক্রমণ করার আত্মঘাতী পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকে। কিন্তু পাকিস্তানে ব্যাপক সমরাস্ত্র প্রেরণ, এমনকি বাংলাদেশের গেরিলা যুদ্ধ প্রতিহত করার লক্ষ্যে বিশেষজ্ঞ পাঠায়। চীন ভিন্নভাবে বাংলাদেশের বিষয়টিকে পর্যবেক্ষণ করেছে। অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে সর্বদাই রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে প্রকাশ্যে ভূমিকা রেখেছে যা গ্রন্থের পঞ্চম ও অষ্টম অধ্যায়ে আলোচনায় উল্লেখিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত: পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের বৈরিতার কারণে বাংলাদেশকে সমর্থন করেছে তার চিরায়িত কূটনৈতিক ও নীতিগত ধারণা ও অবস্থান থেকে। মুজিবনগর সরকার প্রথম থেকেই ভারতের বিষয়গত, বস্তুগত, নীতিগত, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে ভারতকে বারবার নানাভাবে অনুরোধ জানিয়েছে।[৫৫] বাংলাদেশের মুক্তিসগ্রামকে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে ভারত নানাভাবে কৌশল গ্রহণ করেছে। প্রথমত, বাংলাদেশ থেকে অগণিত শরণার্থী সমস্যাকে আন্তর্জাতিকীকরণ; দ্বিতীয়ত, শরণার্থী ইস্যুকে সামনে রেখে বাংলাদেশ প্রশ্নে কূটনৈতিক তৎপরতা; তৃতীয়ত, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সামরিক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদান এবং চতুর্থত জাতিসংঘে বাংলাদেশ সমস্যাকে উপস্থাপন। গণতন্ত্র, শান্তি, মানবতা এবং আদর্শিক কারণে বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও ভ্রাতৃত্বপূর্ণ মনোভাব থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে ভারত সমর্থন করেছে। বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিশ্ববাসী জনমত সংগঠিত করার উদ্যেগ গ্রহণ করেছে।

সুতরাং বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের ইতিবাচক নীতি পরিলক্ষিত হয়। প্রধানত ভারত-সোভিয়েত চুক্তির পর ভারত শক্তিশালী অবস্থানে চলে আসে। ২৮শে জুন ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পূর্ব পর্যন্ত ভারতীয় নেতৃবৃন্দ সরাসরি বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলেনি। ইয়াহিয়া খানের ভাষণের পর ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বলেন, ইয়াহিয়া খানের কঠোর পদক্ষেপের ফলে রাজনৈতিক সমাধানের কোনো সুযোগ নেই; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম জোরদার এবং বিশ্ব পরিসরে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতাকে প্রকাশ্য সহযোগিতা করে, এবং তৃতীয়ত, বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে দৃঢ় মনোভাব গ্রহণ করে।

যুক্তরাজ্য: ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চের পরে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। ২৭শে মার্চ তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এবং পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার কাছ থেকে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বেসরকারি সহযোগিতার সর্বপ্রকার আশ্বাস লাভ করেন।[৫৬] মুজিবনগর সরকার শপথ গ্রহণের পরপরই বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ প্রদান করেন। যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনের ভিতরে যোগাযোগ ও অনৈক্য ছিল। তাঁর মধ্যস্থতায় যুক্তরাজ্যে ২৪শে এপ্রিল কভেন্ট্রি শহরে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি এবং এটি পরিচালনার জন্য একটি কার্যকরী কমিটি গঠিত হয় এবং কার্যকরী কমিটি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শে পরিচালিত হবে বলে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ১১ নং গোরিং স্ট্রীটে কার্যকরী কমিটির অফিস স্থাপিত হয় এ অফিসকে কেন্দ্র করে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়। প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা ও ব্রিটেনের সংবাদ মাধ্যমগুলোর প্রচারণার কারণে ব্রিটেনের অনেক রাজনীতিবিদ বাঙালিদের গণহত্যার প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের জন স্টোনহাউস, ব্রুস ডগলাসম্যান ও পিটার শোর বাংলাদেশের সমর্থনে ব্যাপক প্রচেষ্টা চালায়। এই প্রচেষ্টার ফলে প্রায় ৩শ জন পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জানায়। ফলে ১৪ই মে পার্লামেন্টে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। ডানপন্থি নেতা স্যার জেরাল্ড নেবারো ও রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি ও বামপন্থি নেতা ইয়ান মিকার্গো ও এড্রু ফাউলস বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।[৫৭] দক্ষিণপন্থি ও বামপন্থি নেতাদের সমর্থন থাকায় এটি পূর্ণাঙ্গ আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সরকার যদিও বার বার বলে আসছিল বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার তারপরেও মানবিক কারণে তারা যথেষ্ট সমবেদনা ও সহমর্মিতা প্রকাশ করে। এমনকি পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলেক ডগলাস হিউম আলোচনার এক পর্যায়ে বলেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষে দুরত্বের কারণে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের উপর নির্যাতন চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে না। এটা ছিল মুজিবনগর সরকারের জন্য প্রবাসে প্রাথমিক কূটনৈতিক বিজয়।[৫৮] মুজিবনগর সরকার পাকিস্তান যেন দাতাদের সাহায্য না পায় তার জন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ প্রফেসর রেহমান সোবহানকে লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্রে যেতে অনুরোধ করেন। সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এবং বিভিন্ন গণমাধ্যমে সাক্ষাৎ দিয়ে তিনি পাকিস্তানের গণহত্যা, ধর্ষণ ও মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ড তুলে ধরেন। তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অন্যান্য এম.পি. দের সঙ্গে যোগাযোগ করে পাকিস্তান যেন আর্থিক সাহায্য না পায় তার জোর প্রচেষ্টা চালান। যুক্তরাজ্যে রক্ষণশীল দলের নেতা জেমস রেমসটেন ও টবিজেসেল এবং শ্রমিকদলের আর্থার বটমূলী ও রেজিনাল্ড প্রিন্টিঙ্গ ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করে যে রিপোর্ট প্রদান করেন তাতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর বর্বর চিত্র প্রতিফলিত হয়। লন্ডন থেকে রেহমান সোবহান ৭ই জুন প্যারিসে গমন করেন সেখানে পাকিস্তান এইড কনসোর্টিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক ছিল। সেই বৈঠকে পাকিস্তান যাতে আর্থিক সাহায্য না পায় সেজন্য তার নেতৃত্বে জোর প্রচেষ্টা চালানো হয়। বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিল পাকিস্তান সফর করে একটি বাস্তব রির্পোট কনসোর্টিয়ামে উপস্থিত করলে 'পাকিস্তানের অস্থিতিশীল এই পরিবেশে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে' এই অজুহাতে কনসোর্টিয়াম পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সাহায্য স্থগিত রাখে। এই বৈঠকের ফলাফল পাকিস্তানের জন্য ছিল এক ধাক্কা এবং আন্তর্জাতিক জনমতকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সারা বিশ্বেরই প্রাথমিকভাবে একটি সমর্থন আদায় করা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক কূটনৈতিক বিজয়।[৫৯] পলকানেটের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাকশন বাংলাদেশের' উদ্যোগে ১লা আগষ্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভায় পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। ১১ই আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কের এক জনসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের লুৎফুল মতিন ও ফজলুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বন করেন। এটা ছিল ব্রিটেনের বাঙালিদের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। ২৭শে আগস্ট লন্ডনের ২৪ নং প্রেমব্রিজ গার্ডেনে বিপুল সংখ্যক গণমাধ্যম ও জনগণের সামনে বাংলাদেশের দূতাবাস উদ্বোধন করা হয়। মে মাসে 'ওয়ার অন ওয়ান্ট'-এর চেয়ারম্যান ডোনাল্ড চেস্ওয়ার্থ মুজিব সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি ও প্রধানমন্ত্রীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। সে সময়ে লন্ডনে বাংলাদেশ মিশন স্থাপন সম্পর্কে তারা আলোচনা করেন। তার উদ্যোগে ২৪ নম্বর প্রেম্ব্রিজ গার্ডেন্সের বাড়িতে অবস্থিত টক্ এইচ. হোস্টেলের গ্রাউন্ড ফ্লোরে রুমগুলি নামমাত্র ভাড়ায় বাংলাদেশ মিশনকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়। লন্ডন মিশনকে ব্রিটিশ সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে অনুমতি না দিলেও এই মিশন ছিল বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের মূল কেন্দ্র। এটিই ছিল ভারতের বাইরে প্রথম বাংলাদেশ মিশন। মুজিবনগর সরকার বিশ্বে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কার্যক্রম পরিচালনা ও সমন্বয় সাধন করার উদ্দেশ্যে লন্ডনে এই মিশন স্থাপনের অনুমোদন দান করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লন্ডনের মিশনের প্রধান নিয়োগ করা হয়। মিশনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে বিশ্ববাসীর সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বাংলাদেশের উজ্জ্বল উপস্থিতি। এটা ছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য।[৬০] তাছাড়া জনমতের চাপে ব্রিটিশ সরকার নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য হয়। এটা ছিল মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বিরাট সাফল্য। ১৯শে নভেম্বর ম্যাঞ্চেস্টার বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশ্ববিদ্যালয় মিলনায়তনে বাংলাদেশের সমর্থনে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন ন্যাশনাল ইউনিয়ন অফ স্টুডেন্টস-এর আঞ্চলিক সভাপতি জেফ হ্যারিস। বাংলাদেশের ছাত্রদের পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখেন কবীর আহম্মদ। সভার প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ণ স্বাধীনতাই হচ্ছে বাংলাদেশের সমস্যার একমাত্র সমাধান। ব্রিটেনের তথাকথিত নিরপেক্ষতা ত্যাগ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে আহ্বান জানানো হয়। একই দিন (১৯ নভেম্বর) কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ইউনিয়ন এক সভা আহ্বান করে। সভার সভাপতিত্ব করেন কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র-ইউনিয়নের সভাপতি ওয়ার উইক। অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাবেকমন্ত্রী টেড বোলেন, সাবেক এম. পি. গুয়েনভার এভেন্স এবং বাঙালিদের পক্ষে ডা. নুরুল হোসেন প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার এবং 'পূর্ব বঙ্গের' নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দানের জন্য দাবি করা হয়। এভাবে বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধ যেমনি সাফল্যের পথে অগ্রসর হচ্ছিল তেমনি আন্তর্জাতিকভাবে মুক্তিযুদ্ধের স্বীকৃতি এবং কূটনৈতিক সাফল্য অর্জিত হচ্ছিল। স্টিয়ারিং কমিটি প্রকাশিত 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা' ১২ই নভেম্বর বিশ্বের বিভিন্ন রাজধানীতে পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাঙালি কূটনীতিকদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশগ্রহণের খবর পরিবেশন করে। সুইজারল্যান্ডের জেনেভাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি দ্বিতীয় সচিব জনাব ওয়ালিউর রহমান পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। এছাড়া নেপালের পাকিস্তান দূতাবাসের প্রেস এটাচি এসএম মাসউম এবং টোকিও দূতাবাসের তৃতীয় সচিব আবদুর রহিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগদান করেন। এসকল সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা বিলম্বে হলেও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করেছে। বাংলাদেশে আর যে পাকিস্তানের শাসন চালানো সম্ভব নয় তার নগ্ন প্রকাশ উপর্যুক্ত 'সম্পর্ক ছিন্ন' ঘটনার মাধ্যমে আন্তর্জাতিকভাবে প্রচার লাভ করে। ৩০শে নভেম্বর যুক্তরাজ্যস্থ আওয়ামী লীগের উদ্যোগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের 'গ্রান্ড কমিটি রুমে' এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। যুক্তরাজ্যস্থ আওয়ামী লীগের সভাপতি গউস খানের সভাপতিত্বে সভায় বক্তব্য রাখেন ব্রিটিশ এম. পি. পিটার শোর, রেজিনাল্ড প্রেনটিস, ব্রুস ডগলাস-ম্যান ও জুলিয়াস সিলভার ম্যান এবং বাংলাদেশ দূতাবাসের রেজাউল করিম প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সভায় বক্তাগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি জানান।[৬১]

এছাড়াও ব্রিটেন প্রবাসী বাঙালিদের কর্যক্রম পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেনমার্ক: ১৪ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কে গিয়ে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে যে বুলেটিন প্রকাশ করেন তার জন্য তাঁদের ধন্যবাদ জানান। উল্লেখ্য যে, ওয়েস্টগার্ড ২৫শে মার্চ ঢাকায় অবস্থানকালে পাকিস্তানিদের গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেছে। ডেনমার্কে তিনি পার্লামেন্ট প্রতিনিধি, স্পিকার ও বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও বাস্তব অবস্থা তুলে ধরে অনুরোধ করেন ডেনিস প্রতিনিধিদল যেন জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করেন।

ফ্রান্স: বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানি বাহিনীর নির্মম নির্যাতনের সংবাদ পেয়ে সাবেক ফরাসি সংস্কৃতিমন্ত্রী ও নোবেলবিজয়ী আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি অংশগ্রহণের ঘোষণায় সারাবিশ্ব আলোড়িত হয়। তিনি বলেন, "একটি রাষ্ট্র যখন সবকিছুর বিনিময়ে বিচ্ছিন্নতাকে অসম্ভব করে তোলার চেষ্টা করে তখন একটি দেশের অর্ধেক ভূখণ্ডকে দখলকৃত দেশ হিসেবে না দেখাই সবচেয়ে বুদ্ধিমানের কাজ। বিদ্রোহ যখন শুরু হল তখন থেকে ইসলামাবাদের সৈন্যরা পূর্ববাংলার কাছে আর স্বদেশবাদী বা স্বধর্মীয় থাকল না, তারা দখলদার বাহিনীতে পরিণত হল।" ১ থেকে ১০ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিভিন্ন দেশের পার্লামেন্টের স্পিকারদের নেতৃত্বে প্রায় সাতশত জন সংসদ সদস্য সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশের পার্লামেন্টের প্রতিনিধিদের বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বরতা, গণহত্যা এবং শরণার্থী শিবিরের করুণ অবস্থা ইত্যাদি বিষয়ে অবগত করার সুযোগ গ্রহণ করার জন্য যুক্তরাজ্যস্থ ছাত্র সংগ্রাম কমিটি একটি প্রতিনিধিদল প্যারিসে প্রেরণ করে। ছাত্র প্রতিনিধিরা প্যারিসে বিভিন্ন রকম প্রচারপত্র, বুকলেট, বিশ্বব্যাংকের রিপোর্ট, প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য এবং কয়েকটি প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে বিরাট অবদান রাখে।[৬২] পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, প্যারিসে পাকিস্তানকে প্রতিশ্রুত সাহায্য স্থগিত রাখার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদল সাফল্য অর্জন করেছিল।

৭. ঙ. কূটনৈতিক দূত প্রেরণ

লেবানন-সিরিয়া : বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মধ্যপ্রাচ্যের জনমত গঠন এবং দেশসমূহের সহযোগিতা লাভের উদ্দেশ্যে মুজিবনগর সরকার মোল্লা জালালউদ্দিন এম.পি. এ.'র নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল সিরিয়া-লেবাননে প্রেরিত হয়। এর অপর সদস্য ছিলেন ড. মাহমুদ শাহ কোরেশী। মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তান প্রচার করেছিল বাংলাদেশের জনগণ অধিকাংশ হিন্দু ও অমুসলিম। সে জন্য তারা দ্ব্যর্থহীনভাবে অখন্ড পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। প্রতিনিধি দল লেবাননে 'আল হিউম' ও 'আল নাহার' দুটি পত্রিকায় এক সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও পাকিস্তানিদের নির্মম নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন। লেবাননের রাজনৈতিক নেতা কামাল জুনবালাত, মারুফছার ও রশিদ কারামি প্রমুখের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের ফলপ্রসূ আলোচনা হয়। সাংবাদিক খায়রুল্লাহ ও বিশিষ্ট মহিলাচিকিৎসক হিতাব আবদেল ছামাদ বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনের সহায়তা করেন। প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত ওমর আবু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিশ যিনি পূর্বে ভারতে ছিলেন তার সহযোগিতায় বাংলাদেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল সিরিয়া গমন করেন। প্রতিনিধি দলটি দামেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর ও আইনজীবী সমিতির প্রধানের সাথে এবং প্রাক্তন ফরাসি কন্সাল লুই সেকুতুবিচও'-র সঙ্গে বৈঠক করেন। রাজনৈতিক নেতা তাকিয়া দিনসলের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদলের বৈঠক হলে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তার সরকারের প্রভাব বিস্তার করবেন বলে আশ্বাস দেন। এভাবে মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর সরকার মধ্যপ্রাচ্যের জনমত গঠনে উদ্যোগ নেন।[৬৩]

আফগানিস্তান-ইরান : আফগানিস্তানের সরকারকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করানো ও আফগান জনগণের মধ্যে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বিষয়ে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার আফগানিস্তানেও একটা কূটনৈতিক মিশন প্রেরণের সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৭১ সালে ২৯ জন পররাষ্ট্র সচিব মাহবুবুল আলম (চাষী) মোহাম্মদ আব্দুস সামাদ (আজাদ)কে এ বিষয়ে একটা পত্র প্রেরণ করেন। এ প্রতিনিধিদলে অন্য সদস্যগণ ছিলেন সর্বজনাব আশরাফ আলী চৌধুরী এম. এন. এ. মাওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী ও এডভোকেট নুরুল কাদের।[৬৪] ২৭শে আগস্ট আব্দুস সামাদ আজাদ ও নুরুল কাদের কাবুলে পৌঁছান। আফগানিস্তানে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে. এল. মেহতা ও কূটনীতিক সালমান হায়দার ও এইচ. কে. লাল আফগানিস্তানে প্রচারকার্যে বাংলাদেশের কূটনৈতিক মিশনকে সার্বিকভাবে সহায়তা করেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিরা আফগানিস্তানে বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সাক্ষাৎ করেন। 'ডায়েরি অন বাংলাদেশ' ও 'রিফিউজি' ৭১ নামে দু'টো ডকুমেন্টারি চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশে পাকিস্তানি নির্যাতন তুলে ধরা হয়। অনেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের কাছে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় কাটিং প্রদর্শন করা হয়।[৬৫] প্রতিনিধিদল আফগানিস্তানের রাজা জহির শাহ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী মুসা শফিক ও প্রাক্তন নেতা আবদুল গাফফার খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের সহযোগিতা কামনা করেন।[৬৬] বাঙালি কূটনীতিকরা বৈরী অবস্থায় সুদূর প্রবাসে থেকেও পাকিস্তানের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি যে আনুগত্য দেখিয়েছেন এবং যেভাবে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছেন তা ছিল কূটনৈতিক যুদ্ধের এক প্রশংসনীয় অধ্যায়।

নয়াদিল্লি : ২৫শে মে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি বাংলাদেশ পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল নয়াদিল্লির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন এবং নয়াদিল্লিতে তাঁরা ভারতীয় পার্লামেন্টের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সাথে উভয় দেশের সাধারণ স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করেন। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতা ও প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ফণীভূষণ মজুমদারের নেতৃত্বে গঠিত উক্ত প্রতিনিধি দলের অপর সদস্যদ্বয় হলেন আওয়ামী লীগের মহিলা শাখার সাধারণ সম্পাদিকা ও জাতীয় পরিষদ সদস্যা বেগম নূরজাহান মোর্শেদ এবং প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন। প্রতিনিধি দলটি ভারতের কতিপয় প্রদেশ সফর করে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। সপ্তাহব্যাপী সফর শেষে তাঁরা মুজিবনগর প্রত্যাবর্তন করে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে সফর সম্পর্কে এক রিপোর্ট পেশ করেন।[৬৭]

দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া: মুজিবনগর সরকার গণপ্রতিনিধিদের বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিক তৎপরতার লক্ষ্যে প্রেরণ করেছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কূটনৈতিক তৎপরতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাধ্যমে মূল্যবান গোপনীয় তথ্যাদি পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় প্রেরিত বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের দলনেতা ফকির শাহাবুদ্দিনের নিকট থেকে প্রাপ্ত চিঠির কপি প্রধানমন্ত্রীর দপ্তরে অবলোকন ও অবগতির জন্য পাঠানো হয়। এই চিঠিতে দলনেতা বিস্তারিত এক বিবরণ পাঠান। বিবরণে তিনি জ্যোতিপাল মহাথেরোর সঙ্গে এবং স্থানীয় বাঙালি ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে আলোচিত বিষয় সম্বন্ধে জানান। মহাথেরোর মতে জানা যায়, ধর্মীয় সম্প্রদায়ের লোকজন কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে সম্পৃক্ত হতে উৎসাহ বোধ করে না। ফকির শাহাবুদ্দিন আশঙ্কা ব্যক্ত করে জানান যে, পাকিস্তান দূতাবাসের কড়া নজরদারির মধ্যে তথাকার দু'তিন জন বাঙালিকে কাজ করতে হচ্ছে। এজন্য তাঁরা সতর্কতা অবলম্বন করেছে। এমন এক সংকটময় পরিস্থিতিতে মহাথেরোকে তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণা ও পদ্ধতিতে বাংলাদেশে সংঘটিত নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে কাজ করার প্রস্তাব দেন। ব্যাংককে পাকিস্তানি নৃশংসতার বিরুদ্ধে মহাথেরোর আবেদন যাতে ব্যাপক প্রচার পায় সে সম্বন্ধে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে বলে দলনেতা জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, ইয়াহিয়া খান এখানকার বাজার থেকে গোপনে অস্ত্র ক্রয় করে পি.আই.এ. বিমানযোগে বহন করছে। দলনেতা আরো জানিয়েছেন যে, পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত লাওসে গমন করে মার্কিন সহযোগিতায় হয়তো অস্ত্রসংগ্রহ করে থাকতে পারে। সেখানকার কালোবাজার থেকে বাংলাদেশের জন্যেও সস্তায় অস্ত্র ক্রয় করা যেতে পারে বলে তিনি মন্তব্য করেন এবং এর মূল্য অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ পাওয়ার পর পরিশোধ করার সুবিধা পাওয়া যাবে বলে তিনি জানান।

'ওয়ার্ল্ড বুদ্ধিস্ট ফেলোশিপ' নামক প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেন্ট রাজকুমারী পুনের সাথে তিনি দেখা করেন। বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। দলনেতা ফকির শাহাবুদ্দিন পরামর্শ দিয়ে জানান যে, বাংলাদেশ সরকারের প্রয়োজন থাই-সরকারের নিকট স্বীকৃতির জন্য আবেদন জানানো। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের আহ্বানে কর্মরত বাঙালি কর্মকর্তা-কর্মচারী পাকিস্তানের স্বাধীনতা দিবস অনুষ্ঠানে যোগদান করেননি। বন্ধুরা তাঁদের ক্ষতির আশঙ্কা থেকে প্রয়োজনে সহযোগিতা দানের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। দলনেতা ফকির শাহাবুদ্দিনের এই প্রতিবেদন থেকে বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের কর্মতৎপরতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর পাওয়া যায়।[৬৮]

৭. চ. কূটনৈতিক পত্র প্রেরণ

১৯৭১ সালের ২৪শে এপ্রিলে ভারত সরকার বরাবর পাঠানো পত্রের সূত্র ধরে মুজিবনগর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথ স্বাক্ষরে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে ৯টি অনুচ্ছেদ সম্বলিত একটি পত্র লেখেন। উক্ত পত্রে ১ম অনুচ্ছেদে পাকিস্তানে অনুষ্ঠিত প্রথম নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয়, গণরায়, গণতান্ত্রিক ও মৌলিক মানবিক অধিকারসমূহ পদদলিত করে ২৫শে মার্চ '৭১ পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নৃশংসভাবে আক্রমণ করায় ১০ই এপ্রিল বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন হিসেবে স্বাধীনতা ঘোষণা ও স্বাধীনতার সনদ, সরকার গঠন এবং শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে আলোচনার বিষয়টি উল্লেখিত আছে। দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বাঙালি জাতির উপর পশ্চিম পাকিস্তান কায়েমি চক্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্তৃক অর্থনেতিক শোষন, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বৈষম্যের নিপীড়নের কথা বিবৃতি করে বলা হয়, শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রেসিডেন্ট ও সৈয়দ নজরুল ইসলামকে ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত করে সরকার গঠিত হয় যা ২৪শে এপ্রিলের '৭১-এর পত্রে উল্লেখিত হয়েছে।

তৃতীয় অনুচ্ছেদে জাতীয় সংসদ অধিবেশন স্থগিত, উস্কানির মুখেও জনগণ শান্তিপূর্ণ অসহযোগ এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের লক্ষ্যে ২৪শে মার্চ পর্যন্ত '৭১ পর্যন্ত রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে আলোচনা চালানো হয়েছে। চতুর্থ অনুচ্ছেদে ২৫শে মার্চ রাত্রিতে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী নিরস্ত্র জনগণের উপর আক্রমণ চালায়, তারা নারী শিশু বুদ্ধিজীবী নেতাকর্মী কৃষক, সাধারণ মানুষ ও ছাত্রদের হত্যা করে। এই পরিণতিতে বাংলাদেশের জনগণকে অস্ত্র তুলে নিতে বাধ্য করে। পঞ্চম অনুচ্ছেদে ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী সরকার গঠনের পর বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সঙ্গে ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস্ এবং অন্যান্য প্যারামিলিটারি সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তানি কলোনিয়াল নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে যুক্ত হবার কথা বর্ণিত হয়। ষষ্ঠ অনুচ্ছেদে পাকিস্তান সামরিক জান্তা বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করা বিশেষ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে হত্যা খুন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের মত জঘন্য ঘটনা অব্যাহত রেখেছে সে কারণে ভারতে শরণার্থী হিসেবে তারা আশ্রয় নিয়েছে। সপ্তম অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা ও প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানকে গোপন আদালতে বিচার করে মৃত্যু সেলে রাখা হয়েছে। আওয়ামী লীগ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সামরিক জান্তা বাংলাদেশের ৭৯জন নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সদস্যপদের অযোগ্য ঘোষণা করেছে এবং ৭০-এর নির্বাচনে পরাজিত প্রার্থীদের নিয়ে একটি তথাকথিত বেসামরিক সরকার গঠন করছে। এ সকল কর্মকান্ড সাড়ে সাত কোটি মানুষকে প্রতারিত করতে পারবে না। বরং তা স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পথকে দৃঢ়তর করবে। অষ্টম অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সরকার আনন্দের সঙ্গে জানাতে চায় মুক্তিবাহিনী সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে এবং দেশের অর্ধেকাংশ তারা ঘেরাও করেছে সেখানে বেসামরিক প্রশাসন ভালোভাবেই পরিচালিত হচ্ছে এবং জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের সর্বোতভাবে সাহায্য, সহযোগিতা ও সমর্থন করে যাচ্ছে। নবম অনুচ্ছেদ বাংলাদেশে স্বীকৃতির আবেদন জানিয়ে বলা হয়, এই স্বীকৃতি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রচন্ডভাবে উজ্জীবিত করবে। এই স্বীকৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন স্বাধীনতা ও শান্তি প্রিয় দেশকে এগিয়ে আসতে গুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণা দেবে।

বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২৪শে জুন '৭১ ইসলামিক কনফারেন্স জেদ্দা সংস্থার সেক্রেটারি জেনারেল টেংকু আবদুর রহমান বরাবর এক টেলিগ্রাম বার্তায় অবিলম্বে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধের জন্য প্রভাব ও কর্তৃত্ব ব্যবহার করার আবেদন জানান। টেলিগ্রামের অনুলিপি সকল মেম্বার সদস্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। সৈয়দ নজরুল ইসলাম বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করার অনুরোধ জানান। ইউ.এন.আই. বার্তায় বলা হয়, উক্ত টেলিগ্রামে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যে নৃশংস হত্যাকাণ্ড ধর্ষণ ও ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়েছে তার বিবরণ তুলে ধরা হয়। বার্তায় বলা হয়, পবিত্র ইসলামের নাম ব্যবহার করে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক জান্তা এসব জঘন্য কর্মকাণ্ড ও অপরাধ সংঘটিত করেছে।[৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৩শে জুন '৭১ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। উক্ত টেলিগ্রামে বলা হয়, বাংলাদেশ সরকার ও জনগণ পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহের বিষয়ে গভীরভাবে আহত ও মর্মাহত। টেলিগ্রামে তিনি উল্লেখ করেন, পাকিস্তানে এই অস্ত্র ও ত্রাণকার্য সরবরাহ গণহত্যার উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হবে। "একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবেদন জানাচ্ছি, যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থেই এই গণহত্যার গণ উদ্দেশ্য এবং মূল্যবান সম্পদ ধ্বংস করা থেকে বিরত থাকার আবেদন জানাচ্ছি।"

বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন, 'এইসব অস্ত্র সরবরাহ বাংলাদেশের রক্তঝরা মানুষদের উপর এক কঠিন আঘাত' তবু একথাও ঘোষণা করতে চাই যে, পাকিস্তানকে যাই সাহায্য করা হোক না কেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অব্যাহতভাবে এগিয়ে যাবে। যদিও সামরিক সরঞ্জাম ও যন্ত্রাংশ ইতিমধ্যে পাকিস্তানে পাঠানো হয়েছে।"

বৈদেশিক মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র বলেন এ ধরনের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে মুক্ত বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধারণা দেবে। বিশেষকরে যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে। "মার্কিন সরকারের কর্মকাণ্ড যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা প্রিয় জনগণের মধ্যে অতীব অশ্রদ্ধা জানাবে এবং পৃথিবীর অন্যান্য অংশ বাংলাদেশে বিদেশি হানাদার বাহিনী কর্তৃক রক্তাক্ত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে।" মুখপাত্র , "যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যের প্রেক্ষাপট তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র ১৯৫১ সাল হতে ১৯৬৯ পর্যন্ত পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য দিয়েছে তিন হাজার মিলিয়ন ডলার। পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতে ১৯৬৪ সালে দেড় হাজার মিলিয়ন ডলার এবং ১৯৬৫ সালে দুই হাজার মিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্য পেয়েছে। এই ব্যাপক সামরিক সাহায্য বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হচ্ছে।" মুখপাত্র আরো বলেন, "সংবাদ পাওয়া যাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে তিনশত আর্মাড পার্সোন্যাল ক্যারিয়ার, চারটি শত্রু পক্ষের নৌ অবস্থান নির্ণয়ে বিমান, ছয়টি এফ-১০৪ জেট যুদ্ধ বিমান এবং সাতটি বি-৫৭ বোমারু বিমান সরবরাহ করছে।" মুখপাত্র বলেন, "বর্তমানে এসব সমরাস্ত্র সরবরাহ একথাই প্রতিষ্ঠিত করে যে, বর্তমানে যে সকল অস্ত্র পাকিস্তানকে প্রদান করা হচ্ছে তা বাংলাদেশের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। তিনি বলেন, বাংলাদেশ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের নিকট আবেদন জানাচ্ছে, অস্ত্র সরবরাহকারী জাহাজগুলি ফিরিয়ে নেবে এবং আরো অস্ত্র দেয়া এবং যে সকল অস্ত্র-শস্ত্র ও সরঞ্জাম পাকিস্তানকে দেয়া হয়েছে তা যাতে ব্যবহৃত না হয় তার ব্যবস্থা নেবে।"

এই পরিকল্পনাকে সামনে নিয়ে মুজিবনগর সরকার ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর যে পত্র প্রেরণ করেন যা কূটনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রেবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই পত্রে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের লক্ষ্যে ভারতকে প্রভাবিত করার যৌক্তিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। (পত্রটি পরিশিষ্ট ২ ক. এ উল্লিখিত হলো)

পত্রটির মূল্যায়ন, তথ্যমূলক বর্ণনা ইত্যাদি পরিদৃষ্টে প্রতীয়মান হয়, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করার পর মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুক্ত কথাগুলোই ব্যক্ত করেছেন যা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রশ্নে অগ্রসরমান অভিব্যক্তি। যদিও তাদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, ভারত সরকার বিরাজমান বাংলাদেশ-সংকট প্রশ্নে চূড়ান্ত ব্যবস্থা নিতে আর দ্বিধান্বিত নয়। বাস্তব অবস্থা পর্যবেক্ষণে দৃশ্যমান ছিল ইতোমধ্যেই ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ মুক্তিবাহিনীর সহায়তায় বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে শুরু হয়েছে।[৭০]

৭. ছ. আন্তর্জাতিক সম্মেলন আয়োজন

দেশের বুদ্ধিজীবীগণের উদ্যোগে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তৎপরতা চালানোর জন্য ১৫ ও ১৬ই আগস্ট ১৯৭১ সালে নয়াদিল্লিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে বিভিন্ন দিক তুলে ধরে বিশ্ব জনমত গঠনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।[৭১]

৭. জ. সমন্বিত প্রচার-পরিকল্পনা

১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বহির্বিশ্বে প্রচারের জন্য পররাষ্ট্র ও বহির্বিশ্ব সেল এক সভা আহ্বান করে। এই বৈঠকে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল ভারতের জাতিসংঘের ডেস্কের পরিচালক, ডি.জি. অল ইন্ডিয়া রেডিও, ডিরেক্টর পাবলিসিটি বিভাগ, ডিরেক্টর টেলিভিশন বিভাগ, ভারত সরকারের মুখ্য উপদেষ্টা, ডেপুটি ডিরেক্টর পিআইবি, কলকাতা, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিরক্ষা সচিব, বাংলাদেশ মিশন। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ সরকারের পাবলিসিটি ডিভিশনের উপদেষ্টা। সমগ্র বিশ্বে জনমত সৃষ্টির জন্য শিল্পী, সাহিত্যিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবীদের কীভাবে বিশ্বজনমত গঠনে কাজে লাগানো যায় তার উপর ব্যাপক আলোচনা হয়। কতিপয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়; যথা: ১. ক. সকল প্রকার সংবাদ বুলেটিন বেলা সাড়ে তিনটার মধ্যে বাংলাদেশ সরকার ইস্যু করবে, স্থানীয়ভাবে প্রচারের পূর্বে তা দিল্লিতে টেলিপ্রিন্টারের মাধ্যমে পাঠানো হবে; খ. খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে এসব বুলেটিন পরের দিন প্রচার করা হবে; গ. বাংলাদেশের পক্ষ থেকে এম. মাকসুদ আলী এ বিষয়ে ভারতের পিআইবি প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। ২. বাংলাদেশ থেকে জাতিসংঘে প্রেরিত প্রতিনিধিদের জন্য দীক্ষিত বিস্তারিত প্রতিবেদন-নিবন্ধ তৈরি করতে সহৃদয় সম্মতি দেন। মি: দীক্ষিত পরামর্শ দেন যে, বাংলাদেশের প্রতিনিধিবর্গ নিম্নোক্ত বিষয়াদি সঙ্গে নিয়ে যাবে। তা হলো: ক. নেতৃবৃন্দের রেকর্ড কৃত ভাষণ; খ. ১৯৭০ মার্চ – ১৯৭১ পর্যন্ত সংঘটিত ঘটনাবলি; গ. এসব ডকুমেন্টস্ যুক্তিগ্রাহ্য করার জন্য বিগত ২৩ বছর পাকিস্তান যে বাঙালিদের ন্যায্য অধিকারসমূহ অস্বীকার করে এসেছে বিশ্লেষণপূর্বক তার মৌলিক দিক উপস্থাপন; ঘ. শরণার্থীদের টেপে রেকর্ড করা সাক্ষাৎকার; ঙ. গুরুত্বপূর্ণ বিদেশি ব্যক্তিদের বাছাইকৃত সাক্ষাৎকার; চ. গণহত্যার উপর প্রামাণ্য ফিল্ম; ছ. জহির রায়হান কর্তৃক নির্মিত প্রামাণ্যচিত্র যথাযথ সম্পাদনাপূর্বক প্রদর্শন; জ. পাঠানদের ব্যক্তিগত ফিল্ম সাক্ষাৎকার, অল ইন্ডিয়া রেডিও-এর ডিজি এ সকল টেপ তৈরি করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্রমন্ত্রলয়ের সঙ্গে যুক্ত মওদুদ আহম্দকে সাহায্য করার জন্য একজন প্রকৌশলী সংশ্লিষ্ট করেছেন। তিনি আরো নিশ্চয়তা দেন যে, স্টেশন ডিরেক্টর ডি. কে. সেনগুপ্ত সম্ভাব্য সকল প্রকার সাহায্য ও সহযোগিতা করবে। ৩. বাংলাদেশের শিল্পী, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের পুনর্বাসন ও তাদের পূর্ণাঙ্গ কার্যক্রমে নিয়োজিত করার বিষয়টি পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করা হয়। আলোচনার শেষে নিম্নোক্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয় সভায় উপস্থাপন করা হয়; যথা–ক. শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীদের সংগঠন মোট পাঁচটি, খ. এই বিভক্তির কারণ বিশ্লেষণ করে বলা হয় যেহেতু শিল্পী ও বুদ্ধিজীবীরা তাদের কোনো সম্মানী পাচ্ছেন না সেজন্য তাদের নিজেদের উদ্যোগে তারা ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে বাংলাদেশে মুক্তিসংগ্রামের কাজ করছে, গ. শিল্পী-সাহিত্যিকদের অভ্যন্তরে দ্বন্দ্ব থাকলেও মূল লক্ষ্য দেশমাতৃকার মুক্তির লক্ষ্যে তারা কাজ করছে। এ সব সমস্যা সমাধান করে তাদের মেধাকে কীভাবে কাজে লাগানো যায় সে ব্যাপারে নিম্নোক্ত পরামর্শ গ্রহণ করা। এসকল শিল্পী সাহিত্যিককে কাজে লাগানোর জন্য : ক. একটি গ্রুপকে যুব ক্যাম্প ও শরণার্থী ক্যাম্পে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের দায়িত্ব দেওয়া, খ. একটি গ্রুপকে সেনাবাহিনী ও গেরিলা ছাউনিতে গিয়ে তাদের উজ্জীবিত করার দায়িত্ব দেওয়া, গ. একটি গ্রুপকে সমগ্র ভারতবর্ষে মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টি তুলে দেয়ার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়, ঘ. একটি গ্রুপকে বাংলাদেশ বেতারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা, ঙ. একটি গ্রুপকে বাংলাদেশের স্বপক্ষে বিদেশে প্রচার ও প্রচারণা করার জন্য নিয়োজিত করা হয়। সর্বোপরি তাদের স্বাধীনভাবে কাজ করার জন্য অনুমতি দেওয়া হয়। এই কাজ করার আগে নিম্নোক্ত পরামর্শ গৃহীত হয় : ক. সকল শিল্পীকে বাংলাদেশ সরকারের তালিকাভুক্তকরণ, খ. এসব বিষয় বাস্তবায়নের জন্য তথ্য প্রচার মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি কমিটি গঠন করা হয়। সভায় একথা উত্থাপিত হয় পাকিস্তান বেতার প্রচারিত সকল অনুষ্ঠান পরিবীক্ষণ করে বাংলাদেশ প্রতিনিধির নিকট উপস্থাপন করা।[৭২]

যে কোনো যুদ্ধের কৌশলী প্রচার-প্রচারণা একদিকে যেমন যুদ্ধরত সৈনিক ও জনগণকে উদ্দীপ্ত, উজ্জীবিত এবং শত্রুকে পরজিত করার দুর্জয় সাহস যোগায়, তেমনি মনস্তাত্ত্বিকভাবে শত্রুপক্ষের মানসিক অভিঘাত সৃষ্টির মাধ্যমে দুর্বল করে ফেলে। স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র মুক্তিযুদ্ধে এমনভাবে কার্যক্রম পরিচালনা করেছিল যার ফলে সমগ্র বাঙালি জাতি এক সাগর রক্ত ও মৃত্যুর ভয়ঙ্কর নির্মমতাকে অতিক্রম করে শত্রু হননে এগিয়ে যেতে অনুপ্রেরণা জুগিয়েছিলো। অশ্রুর মাঝেও এনে ছিল গভীর বিশ্বাস এবং বিজয়ের আলোকিত আশ্বাস। এই বেতার কেন্দ্র থেকেই বার বার প্রচারিত হয়েছে স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলার অস্তিত্ব এবং বিশ্ব স্বীকৃতির আহ্বান। নরঘাতক ইয়াহিয়া খানের বিজয় দম্ভকে প্রতিরোধের আগুনে ম্লান করে দিয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের ইথার তরঙ্গের বজ্রকণ্ঠ এবং পাকিস্তানের বেপরোয়া মিথ্যাচারের লাগসই জবাব। অনুষ্ঠানসূচিতে অন্তর্ভুক্ত ছিল বাংলা-ইংরেজি সংবাদ, অগ্নিশিখা, যুদ্ধসংগীত, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর বজ্র কণ্ঠ, বিশ্ব জনমত, দর্পণ, প্রতিনিধির কণ্ঠ, রণাঙ্গন ঘুরে এলাম, সূর্য শপথ, দৃষ্টিপাত, সংবাদ পর্যালোচনা, নাটক ইত্যাদি। মুজিবনগর সরকারের অনুরোধে ২৫শে মে ভারত সরকার ৫০ কিলোওয়াট মধ্যম তরঙ্গ-শক্তিসম্পন্ন ট্রান্সমিটার সরবরাহ করে সেই থেকে নব পর্যায়ে, নবোদ্যমে, উৎসাহে চালু হয়েছিল স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্রের নবযাত্রা। মুক্তিযুদ্ধে স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র একদিকে যেমন রণাঙ্গনের ২য় ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করেছে, অন্যদিকে বিশ্ব পরিসরে কূটনৈতিক মাধ্যম হিসেবে কৃতিত্বের সঙ্গে বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছে যথার্থভাবে।[৭৩]

মুজিবনগর সরকারের বহির্বিশ্ব প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন থেকে স্বাধীনতা শীর্ষক বস্তুনিষ্ঠ ঘটনাবলি, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবতাবিরোধী ঘৃণ্য কার্যক্রম, গণহত্যা এবং গণতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিকভাবে স্বাধীনতা সংগ্রামের বিষয়বস্তু নিয়ে প্রকাশিত বই, পুস্তক ও প্রামাণ্যচিত্র, বিশ্বব্যাপী প্রচার করার জন্য বাংলাদেশের বিভিন্ন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়।

৭. ঝ. বন্ধুরাষ্ট্রের পরামর্শে সুইস ব্যাংকে বাংলাদেশ সরকারের জন্য পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ব্যক্তিগত নামে হিসাব খোলা হয়। এছাড়াও অন্য আরো বাঙালির ব্যক্তিগত নামে সরকারের পক্ষে হিসাব খোলার প্রচেষ্টা নেয়া হয়। মূলত বিদেশে মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার সুবিধার্থে এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনো দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতিতে এসব হিসাব বন্ধ হয়ে গেলে তা বাংলাদেশের জনগণের ব্যবহারের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল।[৭৪]

৭. ঞ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে মুক্ত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক কার্যক্রম

বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তানের কাছে অনুরোধ জানানো হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকামী মুক্তিযোদ্ধাদের মানসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান স্বাধীনতার প্রতীক হয়ে সর্বদা উপস্থিত ছিলেন। তাঁর অভাব তীব্রভাবে অনুভূত হয়। মুজিবনগর সরকার ও ভারত সরকারের পক্ষ থেকে শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর মাধ্যমে পাকিস্তানের উপর চাপ প্রয়োগ করা হয়।

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির জন্য ভূমিকা রাখার আহ্বান জানিয়ে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২১শে জুলাই বিশ্বের ৭টি রাষ্ট্রের সরকার প্রধান ও জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেলকে তারবার্তা প্রেরণ করেন। তারবার্তায় বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ:[৭৫]

I wish to draw the attention of your Excellency to the reported decision of Yahya Khan to stage a trial of Sheikh Mujibur Rahman, the Head of State of the People's Republic of Bangladesh. As your Excellency is aware, the ruthless killing of nearly one million people and the driving out of more than seven million people has failed bring about the much desired 'normalcy'. On the contrary, the sagging morale of the West Pakistani army, now needs to be bolstered up by a desperate act– the execution of the Sheikh after a farcical trial.

The grave consequences of any such farcical trial and execution of the Sheikh can cause repercussions which will engulf the whole area in no time.

I, therefore, appeal to you, on behalf of the seventy five million people of Bangladesh, to use your good offices to stop this distardly act and secure the release of the Sheikh and his family.

১০ই আগস্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় বৃহৎশক্তিবর্গের নিকট বঙ্গবন্ধু মুক্তির লক্ষ্যে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য দাবি জানিয়ে এক বিবৃতি প্রচার করেন:[৭৬]

We feel alarmingly concerned at the reported trial of Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman tomorrow by the Army Junta of Islamabad. This

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

gruesome farce in the name of trial is going to be one of the greatest tragedies of civilisation.

Vindication of animalism and animosity of this nature does call for immediate and prompt intervention by the United Nations and all the peace-loving powers of the world. We want to clearly convey to all nations of the world that any attempt to try and execute Sheikh Mujibur Rahman will enjoin an obligation unto death on every man, woman and child of Bangladesh to avenge his murder. The situation is bound to escalate and engulf this area of the world into the eruptions of the volcano.

In the name of civilisation, democracy, humanity, justice and fair play I urge upon all Heads of states of the world and the U.N. Secretary General to intervene and get unconditional release of the Sheikh and his family to pave the way towards peace.

৮. আন্তর্জাতিক সহাযোগিতা ও প্রতিবন্ধকতা

সোভিয়েত ইউনিয়ন এ সময় শেখ মুজিবের বিচার ও বাঙালিদের ক্ষেত্রে যেন মানবাধিকার লঙ্ঘন করা না হয় সে ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্চ-এপ্রিলের প্রথম থেকেই রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, সামরিক এবং মানবিক ও নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশ-পাকিস্তান ও ভারতের ঘটনাবলি গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছে। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিরস্ত্র জনগণের উপর নির্মম আক্রমণ, গণহত্যা, ধর্ষণ ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের নিন্দা করে পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের অবিলম্বে রাজনৈতিক সমাধান খুঁজতে বলেছে। গণহত্যা বন্ধ এবং উদ্ভূত পরিস্থিতি নিরসন কল্পে পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীকে চাপ প্রয়োগ করে। বিরাজমান পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্ব ও আঞ্চলিক পর্যায়ে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও কৌশলগত সম্পর্কের সংশ্লিষ্টতায় বৃহৎশক্তি বর্গের মধ্যে একমাত্র সোভিয়েত ইউনিয়ন এর পক্ষেই রক্তক্ষয় ও নির্মম আক্রমণের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের জনগণের অনুকূলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করা সম্ভব হয়েছিল। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগর্নী ২রা এপ্রিল ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে চিঠি লেখেন।[৭৭] পরবর্তীকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করে।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কারও কোনো সংশয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু।[৭৮] এ সত্ত্বেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা খন্দকার মোশতাক বা তাঁর প্রতিনিধি কেন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যোগাযোগ রাখতেন তা অনুমেয়। যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে তারা পাকিস্তানের সাথেও যোগাযোগ রক্ষা করতেন। জহিরুল কাইয়ুম কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের এক দূতাবাস কর্মকর্তাকে প্রদত্ত বক্তব্যে এমন ধারণা পাওয়া যায়। কাইয়ুম বলেন যে,[৭৯] পাকিস্তানের সাথে একটা আপোষরফা করার ব্যাপারে মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে কাইউম যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন। ১৯৭১ সালের ১৯শে আগস্ট মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে অন্য এক বৈঠকে কাইয়ুম বলেন যে, "Mujib's life is more valuable

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

than independence."[৮০] কিন্তু তখন বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা দু'টো আদায়ের ব্যাপারেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। জহিরুল কাইয়ুম এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে, "If Mujib is alive there is hope for compromise, if he is killed there is no hope."[৮১]

যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে, বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে ১লা মার্চেই তারা অনুধাবন করেছিল বাংলাদেশ সম্ভবত দ্রুততার দিকে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। শেখ মুজিবুর রহমান বর্তমান পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে যেতে চায়। কিন্তু মার্কিন নীতি হলো অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে।[৮২] ৬ মার্চ হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত বৈঠকে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, শেখ মুজিব বাংলাদেশের পৃথক করার স্বীকৃতি চাইলে ঢাকায় আমাদের মিশনের কেউ যেন এ সম্পর্কে কোনো কথা না বলে তা ওয়াশিংটনে পাঠিয়ে দেয়। উক্ত বৈঠকে কিসিঞ্জার স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেনকে জিজ্ঞাস করেন, বাংলাদেশ নিজস্ব কোন বৈদেশিক নীতি অনুসরণ করবে কি না? এর উত্তরে ভ্যান হোলেন জানান, "বিষয়টি এখনও অমীমাংসিত।"[৮৩] মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্টে ১৫ই মার্চের আলোচ্য বিষয় ছিল মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, "মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের ৩৫টি নির্দেশনামা জারি করেছে এবং সরাসরি ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে, কিন্তু একতরফা স্বাধীনতা ঘোষণা সম্পর্কে সতর্ক থেকে শেখ মুজিব জনগণের নির্বাচিত নেতা হিসেবে গণতন্ত্রের ভাষায় তা প্রকাশ করছে।"[৮৪] ২৬শে মার্চে হেনরি এ. কিসিঞ্জার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত পাকিস্তান বিষয়ে আলোচনার সার সংক্ষেপে পুনরায় লক্ষণীয় যে, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি দেয়ার ব্যাপারে অনুরোধ আসলে তা বিলম্ব করা হবে।[৮৫]

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আন্তর্জাতিকভাবে বাংলাদেশকে উপস্থাপন এবং বিভিন্ন দেশ থেকে কূটনৈতিক স্বীকৃতি আদায়ের পদক্ষেপ যুক্তরাষ্ট্রের সিক্রেট ডকুমেন্ট থেকে পরিলক্ষিত হয়। ১৩ই এপ্রিল বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কলকাতায় ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার এবং মার্কিন কূটনীতিকের সঙ্গে বৈঠকে আগ্রহ প্রকাশ করলে প্রথম দিকে ব্রিটেনের পক্ষে সম্মতি জানানো হয়। কিন্তু ঢাকা থেকে মার্কিন কর্তৃপক্ষ কলকাতায় কনসুলারের সঙ্গে বৈঠকে অস্বীকৃতি জানায়। ঢাকা থেকে মনে করা হয়, এই বৈঠক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে বলে ধারণা করা হতে পারে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ওয়াশিংটনের স্টেট ডিপার্টমেন্টে ক্রিস্টোফার ভ্যান হোলেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে যে অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়েছে তার কোনো প্রতিনিধি যেন মার্কিন কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাৎ করতে না পারে তার জন্য বিশেষ উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৮৬]

এর পূর্বেই ঢাকায় যুক্তরাষ্ট্রের কনসুল জেনারেল আর্চার কে. ব্লাড ঢাকা থেকে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন বরাবর এক টেলিগ্রাম প্রেরণ করেছিলেন। সেখানে মার্কিন নীতির তীব্র সমালোচনা করে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্রের বিঘোষিত নীতি অনুসরণ করা হচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সামরিক জান্তার বর্বরোচিত ও অমানবিক আক্রমণের বিরুদ্ধে নিন্দা জানাতে ব্যর্থ হয়েছে এবং দেউলিয়াত্বের প্রমাণ দিয়েছেন। এই চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষিপ্ত মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার. কে. ব্লাডকে ঢাকা থেকে অবিলম্বে বদলি করেন। বলা বাহুল্য আর্চার কে. ব্লাড পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলাদেশের নিরস্ত্র জনগণের উপরে নির্বিচারে হত্যাকাণ্ড, অগ্নিসংযোগ, লুটতরাজ ও ধর্ষণের অভিযোগ উত্থাপন করেন।[৮৭]

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে বাংলাদেশ সরকার সাফল্য অর্জন করেন কলকাতায় পাকিস্তানি ডেপুটি হাইকমিশনের বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য স্থাপন যা কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তানের জন্য চপেটাঘাত। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আলোচনা করে ১৮ই এপ্রিল কলিকাতাস্থ পাকিস্তানি ডেপুটি কমিশনার হোসেন আলী এবং আরো ৫জন অফিসার এবং ৬৫ জন বাঙালি স্টাফসহ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। এবং পশ্চিম পাকিস্তানের ৩০জন স্টাফ এবং কর্মকর্তা বরখাস্ত করেন। তিনি এক সাক্ষাৎকারে বলেন, সকল ঘটনা, সাক্ষ্য দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে পাকিস্তানি সরকার বাংলাদেশে নিরবচ্ছিন্নভাবে গণহত্যা করে চলেছে, এই অবস্থায় পাকিস্তান সরকারের প্রতিনিধিত্ব করা সম্ভব নয়। ১৬শ শব্দের এক বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়, বাংলাদেশের জনগণের গণতান্ত্রিক রায় পাকিস্তান সরকার কীভাবে নসাৎ করে বাঙালি জাতিকে পদানত ও ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছে তা আজ স্পষ্ট। পাকিস্তান সরকার বিষয়টি পূর্বাহ্নে অবগত থাকায় মিশনের সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারীকে অবিলম্বে ইসলামাবাদে ডেকে পাঠানো হয়। তার পরিবর্তে পাকিস্তান সরকার মেহেদি মাসুদকে কলকাতাস্থ ডেপুটি হাইকমিশনার পদে নিয়োগ দেন। কিন্তু তিনি হাইকমিশনার হিসেবে কলকাতায় যোগদান করতে ব্যর্থ হন।[৮৮]

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা ঘোষণা, পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী কর্তৃক নিষ্ঠুর আক্রমণ, গণহত্যা, এবং জীবনের নিরাপত্তার লক্ষ্যে জনস্রোতের মতো বিপুল সংখ্যক বাঙালির সীমান্ত অতিক্রম, শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় গ্রহণ প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে বিচলিত ও উদ্বিগ্ন করে তোলে। একই সাথে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে ব্যাপক সশস্ত্র প্রতিরোধ যুদ্ধ বিশ্বের সকল প্রচারমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। ভারতীয় সামরিক বাহিনী, প্রাক্তন জেনারেলগণ, পার্লামেন্ট সদস্য, এমনকি মন্ত্রী পরিষদের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম ও অর্থমন্ত্রী ওয়াই বি. চ্যবন অবিলম্বে সামরিক পদক্ষেপ গ্রহণের পক্ষে মত প্রকাশ করেন। দেশ-বিদেশের প্রতিক্রিয়া দেশি-বিদেশি প্রচারমাধ্যম এবং ক্রমবর্ধমান জনমতের চাপে ২৭শে মার্চ ভারতের পার্লামেন্টে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, ধর্মনিরপেক্ষতার নীতিমালা এবং সমাজতন্ত্রের প্রতি শেখ মুজিবের প্রণীত নীতির সঙ্গে ভারতীয় নীতি ও আর্দশের মিল ইত্যাদি বিষয়ে ইন্দিরা গান্ধী উপস্থাপন করে ভারতীয় পার্লামেন্টে বাংলাদেশ সম্পর্কীয় বির্তকে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বাংলাদেশে সংঘটিত নিষ্ঠুর গণহত্যা, জনগণের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশা, নিরস্ত্র জনগণের প্রতিরোধ এবং স্বাধীনতার অদম্য আকাঙ্ক্ষা বিশ্লেষণ করে সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে বিলম্ব করেননি। ৩১শে মার্চ পার্লামেন্টের এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের সংগ্রামের প্রতি শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত এক প্রস্তাবে সর্বাত্মক সাহায্য ও সহযোগিতা প্রদানের অঙ্গীকার ঘোষিত হয়। ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্ন ধরনের সমর্থন, সাহায্য-সহযোগিতা দিয়ে যাচ্ছিলেন। এসব সহায়তা হলো : ১. প্রাথমিকভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বি.এস.এফ. কর্তৃক সীমান্তে অস্ত্র দ্বারা প্রতিরোধ যুদ্ধে সহায়তা, ২. গেরিলাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান, ৩. শরণার্থীদের জন্য সীমান্ত খুলে দেওয়া এবং ৪. সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল সর্বাত্মক কূটনৈতিক সমর্থন, বাংলাদেশ সংকটকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করা।

২৪শে এপ্রিল বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি ভারতের রাষ্ট্রপতি বরাবর এক পত্রে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের আহ্বান জানান এবং অবগত করেন যে, স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশে শেখ মুজিবুর রহমানের বৈধ সরকারের নেতৃত্বে রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ ও ঐতিহ্যগত সম্পর্ক বিদ্যমান থাকায় অবিলম্বে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুরোধ জানান।[৮৯]

জুন-জুলাই মাসে বাংলাদেশ প্রশ্নে 'রাজনৈতিক সমাধানের' বিষয়টি নিক্সন প্রশাসনের পক্ষ হতে স্পষ্টতই প্রচারিত হতে থাকে। ১লা জুলাই মার্কিন পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিঞ্জার নয়াদিল্লিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করে বলেন, 'আমরা পাকিস্তানকে যে অস্ত্র সরবরাহ করছি তা ২৫শে মার্চের পূর্বের চুক্তি অনুযায়ী। এ নিয়ে চিন্তিত হওয়ার কারণ নেই।" ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ঐ সাক্ষাতকারের সময় ছিল মাত্র ১৫ মিনিট। ৬ জুলাই ইন্দিরা গান্ধীর ব্যক্তিগত সেক্রেটারি পি.এন. হাকসার তার আলোচনায় স্পষ্ট করেই কিসিঞ্জারকে বলেছিলেন, "I did not want to go to war but did not know how not to go to war". পরবর্তীকালে কিসিঞ্জার ইন্দিরা গান্ধীর মনোভাব সম্পর্কে বলেছেন, "তিনি যুদ্ধ প্রস্তুতি নিচ্ছেন।"[৯০]

প্রকৃতপক্ষে ইন্দিরা গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, যুদ্ধ ব্যতীত উপমহাদেশের এই মানবিক বিপর্যয় থেকে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব নয়। তদ্‌পূর্বে বিশ্বজনমত ও কূটনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার কৌশল গ্রহণ করেন। সেই লক্ষ্যেই তিনি ৯ই আগস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে 'শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি' স্বাক্ষর করেন। ঐ চুক্তির ৮ ও ৯ অনুচ্ছেদে পরিষ্কারভাবে উল্লেখ ছিল চুক্তিবদ্ধ দু'টি দেশের মধ্যে কেউ আক্রান্ত হলে পরস্পর পরস্পরকে সার্বিক সহযোগিতা করবে। পাকিস্তানি সামরিক চক্রের ব্লু প্রিন্টকে কার্যকরী করার মার্কিন কূটনৈতিক প্রয়াস প্রথমবারের মতো সরাসরি বাধার সম্মুখীন হয়। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট এই চুক্তির প্রতিক্রিয়া ছিল বিরাট আঘাত।[৯১]

৯. কূটনৈতিক যুদ্ধে অগ্রযাত্রা

২৪শে অক্টোবর থেকে ১৯ দিনের জন্য ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্র সফরের পূর্বে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দিল্লিতে আলোচনাকালে এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশ-সংকট নিরসনে তিনি শেষবারের মতো সংশ্লিষ্ট সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনা করবেন, ব্যর্থ হলে পাকিস্তানি দখলদারদের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বনের পথ বেছে নেবেন।[৯২]

বিদেশ সফরে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, আন্তর্জাতিক শক্তি মূল সংকট নিরসনে আগ্রহী বা আন্তরিক নয়। দেশে ফিরে ১৫ই নভেম্বর তিনি ঘোষণা করেন, "বাংলাদেশ টিকে থাকার জন্য এসেছে। দুনিয়ার কোনো শক্তি নেই এই অবস্থান থেকে কেউ নড়াতে পারে।"[৯৩]

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই বক্তব্য ছিল ইয়াহিয়া খানকে উস্কে দেওয়ার একটি ফাঁদ। সেই ফাঁদে পা দিয়ে রাগান্বিতভাবে চীনা মন্ত্রীর উপস্থিতিতে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোষণা করেন, "তিনি দশ দিনের মধ্যে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবেন।" বাস্তব অর্থেই তা ছিল দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা।[৯৪]

যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠলে বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনীর প্রধান সেনাপতি এম. এ. জি. ওসমানী অবিলম্বে ভারতীয় সামরিক বাহিনীর সরাসরি হস্তক্ষেপের পক্ষে ব্যগ্রতা প্রকাশ করেন।[৯৫]

মুজিবনগর সরকারের পক্ষ হতে ভারত সরকারের নিকট প্রস্তাবগুলো ছিল : ১. ভারত সরকার কর্তৃক অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে আনুষ্ঠানিক ও আইনানুগ স্বীকৃতি প্রদান; ২. ভারতীয় সশস্ত্রবাহিনী ও বাংলাদেশ মুক্তিবাহিনী সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠিত হবে এবং অবিলম্বে যুদ্ধের পরিকল্পনা চূড়ান্ত করবে; ৩. জাতিসংঘের উদ্যোগকে শ্লথ করতে হবে এবং জাতিসংঘ যাতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে কোনো আপোষ বা হস্তক্ষেপ না করতে পারে সে ব্যবস্থা ভারতকে নিতে হবে। বলা বাহুল্য, শ্রীমতী গান্ধী এই বিষয়গুলোতে সম্মতি জ্ঞাপন করেন।[৯৬]

১৬ই নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধীর আমন্ত্রণে মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রাধানমন্ত্রী দিল্লিতে সাক্ষাৎ করলে সফর সম্পর্কে তিনি দেশসমূহের অভিজ্ঞাতার বর্ণনা দেন। কলকাতায় ১ ও ৩ ডিসেম্বর যৌথ কমান্ড গঠিত হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নির্দেশে ডি. পি. ধর যৌথ কমান্ড গঠনে সমর্থ হন। সিদ্ধান্ত হয়, যৌথ কমান্ডে ইস্টার্ন কমান্ডের জগৎ সিং অরোরা ও মুক্তিবাহিনী প্রধান কর্নেল (অব.) এম. এ. জি. ওসমানী কাউন্টার-পার্ট দিবসে দায়িত্ব পালন করবেন।[৯৭]

ভারতীয় সমরবিশেষজ্ঞরা স্বীকার করেন, মুক্তিবাহিনীর সার্বিক সহযোগিতা ব্যতীত এত দ্রুত ঢাকার পতন ঘটতো না।[৯৮]

৩রা ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। পাকিস্তান ভারতের উপর আক্রমণ চালায়। এ পরিপ্রেক্ষিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশে সরকারের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বরাবরে ৪ঠা ডিসেম্বর লিখিত এক পত্রে বলেন, "আমরা এই মুহূর্তে গভীর দুঃখের সঙ্গে জানতে পারলাম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ৩রা ডিসেম্বর অপরাহ্নে আপনার দেশের উপরে আকস্মিক আক্রমণ চালিয়েছে। ইয়াহিয়া খান আন্তর্জাতিক নিয়মাবলিকে ভঙ্গ করে হঠকারি আক্রমণ চূড়ান্তভাবে প্রমাণ করেছে, পাকিস্তানের এই আক্রমণের বিরুদ্ধে আমাদের যৌথ ভূমিকা আরো জোরদার হবে যদি আমরা আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে সক্ষম হই।[৯৯]

১০. উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধকালে বৈদেশিক সম্পর্ক বিভিন্ন ভাবে গড়ে ওঠে। বহু প্রতিকূলতার মধ্যে সংগঠিত বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রিপরিষদ সদস্য ও প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে বিদেশিরা যোগাযোগ করেছে। মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের পাশে এসে দাঁড়াতে। আমেরিকান কংগ্রেসের স্বনামধন্য অনেক সদস্য যেমন এডওয়ার্ড কেনেডি, ফ্রাঙ্ক চার্চ প্রমুখ, যুক্তরাজ্য থেকে পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর, জন স্টোনহাউস, রেজিনাল প্রেনিটি, ও গণমাধ্যম প্রতিনিধিবৃন্দ প্রতিনিধি এবং আরও অনেকে ক্রমাগতই ভারতে আসছিলেন, মূলত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরেজমিনে অবস্থা পরিদর্শন করতে। তাঁরা মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী এবং অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাতও করতেন। কোনো কোনো সময় পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকতেন।

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব পর্যন্ত ভারত-সরকারের সাথে যোগাযোগ তিন ভাবে হতো। নীতি-নির্ধারণ বিষয় অথবা যুদ্ধের বিষয়ে ভারত-সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের প্রয়োজন হলে প্রধানমন্ত্রী বা প্রধান সেনাপতি; কূটনৈতিক বিষয়ে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী বা পররাষ্ট্রমন্ত্রী বা মন্ত্রণালয় আর দৈনন্দিন রুটিন কর্মনীতি হলে মন্ত্রিপরিষদ সচিবালয়ের মাধ্যমে যোগাযোগ হতো। কঠোর গোপনীয়তার মধ্যে ভারত-সরকারের প্রতিনিধি ও কর্মকর্তাবৃন্দের সঙ্গে বৈঠক হতো। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সন্দেহজনক কার্যকলাপের কারণে তাঁকে বৈঠকের বাইরেই রাখা হতো। তবে এই ব্যবস্থার কথা তাঁকে কখনই জানতে দেওয়া হয়নি। এমনকি ভারতের তরফ থেকে কূটনৈতিক শিষ্টাচার রক্ষার্থে নিরাপত্তাজনিত কারণ প্রদর্শন করা হতো।[১০০]

বস্তুত ভারত-সরকার বিভিন্ন পর্যায়ে যোগাযোগের কয়েকটি চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ভারতের পক্ষে তাঁরা কলকাতায় বিদেশ-মন্ত্রকের একটি আবাসিক অফিস স্থাপন করেন যার প্রধান ছিলেন এ. কে রায়, আর সহকারী মিস অরুন্ধতি ঘোষ। ঘোষ ব্যক্তিগতভাবেও বাংলাদেশ সরকারকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন। বাংলাদেশের মানুষের প্রতি মমত্ববোধ এবং তাঁর নিজস্ব দায়িত্ববোধ একাত্ম হয়ে গিয়েছিল।[১০১] গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কাজকর্মের, বিশেষকরে পররাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক বিষয়াদি দেখার জন্য পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আনোয়ারুল করিম চৌধুরী কর্তৃক প্রদত্ত এক প্রজ্ঞাপনে প্রমাণিত হয় একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কার্যক্রম ও কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হচ্ছিল।[১০২]

পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে মুজিবনগর সরকারের কার্যক্রমে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রীপরিষদ বিভাগের কর্মকর্তা, বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য-ঘোষণাকারী বিদেশে কর্মরত কর্মকর্তা, বিশ্বপরিসরে ব্যাপৃত দেশপ্রেমিক বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার কর্মকর্তা, কর্মচারী, বুদ্ধিজীবী, প্রশিক্ষণার্থী ও অধ্যয়নরত ছাত্র-শিক্ষকদের অবদান উল্লেখ্য। মুজিবনগর সরকারের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও পরিকল্পনায় প্রবাসী বাঙালিরা নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার প্রচারণায় যুক্ত হয় এবং বাঙালি জাতির স্বাধীনতার লক্ষ্যে প্রত্যয়দীপ্ত শপথ নিয়ে কাজ করেছে। তাদের নিঃস্বার্থ কর্মউদ্দীপনা মুজিবনগর সরকারকে যেমন সহায়তা করেছে, তেমনি উজ্জীবিত করেছে।

মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তৎকালে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করে বিদেশে কূটনৈতিক দূতাবাস স্থাপন করে। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ-প্রাথমিকভাবে কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, ওয়াশিংটন, নিউইয়র্ক ও স্টকহোমে মিশন স্থাপন ছিল পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিশেষ সাফল্য। এসব দূতাবাসে বিশেষকরে লন্ডনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন স্বাধীন হিসেবে বাংলাদেশের পৃথক অস্তিত্ব সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। জাতিসংঘে প্রতিনিধিদল প্রেরণ; আফগানিস্তান, সিরিয়া ও লেবাননে প্রতিনিধিদল প্রেরণ; নেপালে প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং শ্রীলংকা বার্মা ও অন্যান্য দক্ষিণ-পূর্ব দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ এবং এই তৎপরতায় আশানুরূপ ফললাভ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে সরকারের এক অভূতপূর্ব সাফল্য বললে অত্যুক্তি হবে না।[১০৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতায় বিদেশে আরো যেসব সাফল্য অর্জিত হয় সেগুলি তুলে ধরা যেতে পারে :

ক. বাংলাদেশি নাগরিক এবং সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের উদ্বুদ্ধ করে যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, সুইডেন, জাপান ও অন্যান্য কয়েকটি দেশের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয় এবং তাতে অনেক কর্মসফলতা অর্জিত হয়।

খ. বিভিন্ন দেশের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তানি শাসকবৃন্দের অকথ্য অত্যাচার, নির্যাতন আর হত্যাকাণ্ডের বিশদ খবর শিরোনামে প্রকাশের ব্যবস্থা করা হয়।

গ. পাকিস্তান বর্বর বাহিনীর অত্যাচারে বাংলাদেশ থেকে পার্শ্ববর্তী বন্ধুরাষ্ট্র ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী বিতাড়িত বাঙালি শরণার্থীদের জন্য তহবিল সংগ্রহে উল্লেখযোগ্য সাফল্য লক্ষণীয়।

ঘ. পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসমূহে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকগণ বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য প্রকাশপূর্বক পাকিস্তানের প্রতি অনাস্থা জ্ঞাপন ছিলো আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সফলতার দৃশ্যমান এক নিদর্শন। বিদেশে কর্মরত যে সব দেশে কূটনীতিকগণ বাংলাদেশ সরকারের প্রতি তাঁদের আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন, সেসব দেশের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল ইরাক, ফিলিপাইন ও আর্জেন্টিনা, ভারত, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র, নেপাল ও থাইল্যান্ড এসব কর্মরত উচ্চপদস্থ কূটনৈতিক কর্মকর্তাদের আনুগত্য লাভের বিষয়টিও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত।

ঙ. বিদেশে প্রশিক্ষণ গ্রহণরত সরকারি কর্মকর্তাদের স্বতঃপ্রণোদিত আনুগত্য প্রকাশ ছিল সরকারের কর্মতৎপরতার এক জ্বলন্ত স্বাক্ষর। যুদ্ধকালে এঁদের আনুগত্য পাকিস্তানি সরকারের মনোবল যেমন দুর্বল করে দেয়, তেমনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মনোবলকে প্রবলভাবে আশান্বিত ও উজ্জীবিত করে। এসব প্রশিক্ষণার্থী বাংলাদেশ সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী বাংলাদেশের পক্ষে কাজ করেছিলেন।

চ. বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে প্রচারণা জোরদার করার লক্ষ্যে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অধীন বহিঃপ্রচার ও প্রকাশনা বিভাগকে জোরদার করা হয়েছিল।[১০৪]

ছ. মুক্তিযুদ্ধকালে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের আহ্বানে জাতিসংঘের প্রতিনিধি প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান মুজিবনগরের মুক্তাঞ্চলে শরণার্থীদের দুর্দশা দেখতে এসেছিলেন। যুদ্ধ-পরবর্তীকালে বিপুল সাহায্যসামগ্রীসহ রেডক্রস দলের বাংলাদেশে আগমন পররাষ্ট্র বিষয়ক এক বিরাট সাফল্য।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় এক বক্তব্যে পাকিস্তান বাহিনীর বাংলাদেশে আত্মসমর্পণ এবং বাংলাদেশ স্বীকৃতির ব্যাপারে এক ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, "আমরা আশা করি ও বিশ্বাস করি যে, এই নতুন দেশের জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর জনগণের মধ্যে যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করে বাংলাদেশকে শান্তি ও সম্প্রীতির পথে নিয়ে যাবেন। সোনার বাংলায় একটি সার্থকতাপূর্ণ ভবিষ্যৎ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের সময় এসেছে তাদের জন্য আমাদের শুভেচ্ছা রইলো। তাদের এই বিজয় শুধু তাদের একার নয়। যে সব জাতি মানবিক চেতনার মূল্য দিয়ে থাকে সে সব দেশ এ বিজয়কে মুক্তির সন্ধানে মানুষের বিরাট সাফল্য হিসেবে স্বীকৃতি দেবে।"[১০৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা হাজারো কুটিল, জটিল আবর্ত ও ষড়যন্ত্রকে পরাভূত করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স, ভারত, জাপান, শ্রীলঙ্কা, বার্মা, পূর্ব জার্মানি, থাইল্যান্ড, পোল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে সফল হয়। মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির লক্ষ্যে বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধানদের কাছে তারবার্তা প্রেরণ করেন। মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধিবৃন্দ ব্রিটেনের পার্লামেন্ট সদস্য সহ বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাদের বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিয়ে আসতে সমর্থ হয়েছিলেন। মার্কিন বার এসোসিয়েশনের সদস্যবৃন্দ, সিনেটর ও কংগ্রেস সদস্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন মানবতাবাদী সংস্থার কাছে বাংলাদেশের ঘটনাবলি সম্পর্কে তথ্যাদি প্রেরণ ও প্রচার করে জনমত গঠন মুজিবনগর সরকারের সাফল্য।

মুজিবনগর সরকার প্রেরিত প্রতিনিধিবৃন্দ প্রবাসী বাঙালিদের সহযোগিতায় বিশ্ব শান্তি সম্মেলন, বাংলাদেশের বন্ধু সমিতি, বিভিন্ন দেশে গণমাধ্যম ও সাক্ষাতকারের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতার অনিবার্যতা তুলে ধরেন। পাশাপাশি সভা, মিছিল এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে একদিকে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি, অন্যদিকে মুক্তিবাহিনীর জন্য অর্থ ও অন্যান্য উপকরণ সংগ্রহ করতে সমর্থ হন। প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তঃইউনিয়ন কনফারেন্সসহ বিভিন্ন সম্মেলনে এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করে এক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন কূটনৈতিক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন যার সার্থক ফলাফল মুজিবনগর সরকারের প্রজ্ঞা, মেধা, দূরদৃষ্টি ও দেশপ্রেমের অনন্যসাধারণ অবদান। বৈদেশিক প্রচার বিভাগ পরিকল্পিতভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা যথার্থভাবে সমন্বয় ও সম্প্রচারের লক্ষ্যে কাঠামোগত পরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলো। এই পদক্ষেপগুলো সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়িত ও কার্যকর হওয়ার চলতি পথেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতার সঙ্গে ওতোপ্রতভাবে উজ্জ্বল চেহারা ও অনমনীয় মনোভাব নিয়ে কার্যকরভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন প্রবাসী বাঙালিসমাজ যা ইতিহাসে উল্লিখিত, এ বিষয়গুলো পরবর্তী অধ্যায়ে আলোচিত হবে।

পরিশিষ্ট ২ ক

২৩শে নভেম্বর, ১৯৭১ সাল ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ যৌথভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বরাবর পত্র প্রেরণ করেন। পত্রটি প্রকৃতপক্ষে কৌশলগত পরিকল্পনার মূল্যায়ন

"ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সফরে যাওয়ার পূর্বে আমরা ১৫ই অক্টোবর আপনার বরাবর যে পত্র লিখেছিলাম আশা করছি সে সম্পর্কে আপনার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। উক্ত পত্রে আমাদের মূল অনুরোধ শুধুমাত্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়ার বিষয়টিই ছিল না তার সঙ্গে আমরা আশা করেছি আমাদের গভীর অনুভূতি এবং বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম যে দিন দিন শক্তিশালী হচ্ছে সে সম্পর্কে বিশ্ব নেতাদের সঙ্গে সাক্ষাতকালে তুলে ধরা সহজ হয়। আপনার আলোচনা ও বিবৃতি যা আমরা জানতে পেরেছি তা থেকে আমাদের মনে এ আশা জাগ্রত হয়েছে যে, আপনি রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সংকট নিরসনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করার বিষয়ে বিশ্ব নেতাদের প্ররোচিত করেছেন।

এমনকি আপনি যখন বিদেশে বর্তমানের বাস্তব পরিস্থিতি এবং বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায় অনুযায়ী রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্ব আরোপ করছিলেন তখনও আমরা দেখলাম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাদের অত্যাচার নিপীড়নের নীতি যা তারা গ্রহণ করেছে তা অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের জনগণের উপর চালিয়ে যাচ্ছে। ১২ই অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিবৃতির পর পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশের বেসামরিক নাগরিকদের উপর আরো অত্যাচারের মাত্রা বৃদ্ধি করেছে। এবং বিশ্বব্যাপী রাজনৈতিক সমাধানের যে দাবী উঠেছে সে প্রস্তাবসমূহ তারা প্রত্যাখ্যান করে চলেছে যা আমাদের ধারণা ও মূল্যায়নের যথার্থকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বিগত দু সপ্তাহে এটাই পরিদৃষ্ট হয়ে উঠেছে পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কোন যুক্তিপূর্ণ পথ উন্মুক্ত রাখেনি এবং যাতে বিরাজমান বাস্তব অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়। ইতোমধ্যে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর অত্যাচারের সরাসরি পরিণতিতে বাংলাদেশ থেকে আরো অগণিত শরণার্থী ভারতে চলে আসছে। পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তা নিপীড়ন অব্যাহত রেখেই তথাকথিত স্বাভাবিক অবস্থা গ্রহণের পদক্ষেপ একটি প্রতারণাপূর্ণ নীতি। সাম্প্রতিককালে তাদের অত্যাচার ও ধ্বংসযজ্ঞ নতুন ও অভাবনীয় মাত্রায় উপনীত হয়েছে। গত একপক্ষ কাল ধরে আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন কারফিউ জারী করে গ্রেফতার, পোড়ামাটি নীতি গ্রহণ এবং ভিটেমাটি থেকে জনগণকে উচ্ছেদ করে চলেছে। সমগ্র গ্রামকে মাটিতে মিশিয়ে দেয়া হয়েছে এবং অধিবাসীদের হত্যা করা হচ্ছে। পশ্চিম পাকিস্তানি আর্মি পর্যাক্রমিকভাবে এই নৃশংসতা চালিয়ে যাচ্ছে যার ফলে আমাদের দেশে লক্ষ লক্ষ মানুষ আশ্রয়হীন এবং অন্নহীন অবস্থায় নিপতিত হয়েছে। আমাদের নিরূপণে কমপক্ষে ৫০ লক্ষাধিক নাগরিক নির্মম ট্রাজেডির ভেতরে অবস্থান করছে যারা কোন রকম সাহায্য ও রিলিফ হতে বঞ্চিত। এটা ভারতে যে এক কোটি লোক চলে এসেছে তার বহির্ভূত হিসাব এবং প্রতিদিনই এর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়ে চলেছে। এ সমস্ত ঘটনাবলী আমাদের এই সূত্রে উপনীত করে যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাদের মিথ্যাচারের পূর্ব পরিকল্পনা হতে সরে আসেনি এবং আমাদের জাতিসত্তাকে পরিকল্পিত ধ্বংস করার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে।

পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেয়নি, বাংলাদেশ সরকারের শর্তে আলাপ আলোচনা করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে। এর ফলশ্রুতিতে শুধু বাংলাদেশ নয় পশ্চিম পাকিস্তানের অন্যান্য অংশে ইয়াহিয়া খান সামরিক জান্তার উন্মত্ততা প্রকাশিত হচ্ছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের জনগণ যেভাবে তাদের অসন্তোষ প্রকাশ করেছে যার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের এ দুটো প্রদেশে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি নির্বাচনের যে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল সে পার্টিকে পশ্চিম পাকিস্তান সরকার নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে।

এ সবগুলো আমাদের পূর্বের মৌলিক ধারণাকে সমর্থন করে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গত কয়েক মাসের ঘোষণা ও কার্যকারণ সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ করে যে, সামরিক জান্তার চক্রান্তের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ সম্পৃক্ত নয়, এটা শুধু এই নির্দেশই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে যে, বাংলাদেশের মানুষের শুধু নয় সমগ্র পাকিস্তানের গণতান্ত্রিক অভিপ্রায়কে ধ্বংস করতে সামরিক জান্তা সংকল্পবদ্ধ।

১৫ই অক্টোবরে পত্রে আপনাকে অবগত করেছিলাম মুক্তিবাহিনীর অপারেশন কার্যক্রম ক্রমশই জোরদার হচ্ছে। বাংলাদেশের জনগণের সর্বজন সমর্থনে মুক্তিবাহিনী বিজয় অর্জন করে চলেছে এবং সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে দেশমাতৃকার এক বিপুল অংশ তারা কার্যকর প্রশাসিনকভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছে। আমরা আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে, বর্তমানে আমরা বাংলাদেশের দুই তৃতীয়াংশ এলাকায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছি। ১৫ই অক্টোবরের পত্রে আমরা বলেছিলাম বাংলাদেশের অর্ধেক অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করেছি। আমরা শুধু এসব অঞ্চল মুক্তই করিনি আমরা ক্রমাগতভাবে এসব মুক্ত অঞ্চলে আমাদের কর্তৃত্ব ও বেসামরিক নিয়ন্ত্রণ কার্যকরভাবে প্রতিষ্ঠা করেছি। এমনকি বাকি অঞ্চলসমূহে জনগণের সমর্থনে আমাদের মুক্তি সংগ্রাম এমন একটি পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যেখানে পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী শুধুমাত্র নিজের কয়েকটি দুর্গে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। আমাদের সাফল্যের পাশাপাশি সময়ের পরিসরে পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ বুঝতে সক্ষম হচ্ছে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের উপর জোরপূর্বক কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ চালাচ্ছে। এটা শুধু আমাদের দেশমাতৃকাকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত করার অঙ্গীকার এবং আমাদের লক্ষ্য অর্জনে দৃঢ় প্রত্যয়। হাজার হাজার দেশপ্রেমিক যুবক প্রতিদিন মুক্তিবাহিনীকে স্ফীতকায় করে তুলছে এবং তারা বাংলাদেশ থেকে চিরদিনের জন্য উপনিবেশিক শৃঙ্খলের দাসত্ব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য উৎসর্গকৃত। এটা আমাদের স্থিরকৃত ইচ্ছা দীর্ঘ দু-দশক ধরে বাংলাদেশের মানুষ যে নিপীড়ন ও মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্য দিয়ে দিন যাপন করেছে এবং ২৫শে মার্চের ধ্বংসযজ্ঞ এবং পরবর্তী ঘটনাসমূহ সংঘঠিত হয়েছে তার মূল শিকড় তুলে ফেলব। তাদের শোষণ ও দাসত্বের হাত থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য এটা আমাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রাম।

এটা আমাদের বিশ্বাস আমাদের এ সংগ্রাম অচিরেই বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট থেকে যথাযোগ্য সমর্থন লাভ করবে, বিশেষ করে আমাদের মহান প্রতিবেশী ভারতের নিকট থেকে। আমাদের এই প্রত্যাশার পেছনে ভারতের পার্লামেন্টের ৩১শে মার্চের দ্ব্যর্থহীন প্রস্তাব গ্রহণ যা বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক জীবন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে রত রয়েছে তার প্রতি সমবেদনা এবং সম্মতি জ্ঞাপন। ইতোমধ্যে ৮ মাস অতিক্রম হয়েছে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা, আন্তর্জাতিক চাপ, পরামর্শ বাংলাদেশের মহান এবং নির্বাচিত অবিসংবাদিত নেতা প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে আলাপ আলোচনা করতে অপারগতা অথবা আপনারা যে অসীম ধৈর্য এবং গঠনমূলক কার্যক্রম ও সহিষ্ণুতার দিকে চলেছেন তাকে উপেক্ষা করেছে। পক্ষান্তরে তারা নিরবচ্ছিন্নভাবে গণহত্যা, মানবাধিকার লঙ্ঘন, নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী সারা বিশ্বকে মূল সমস্যাকে পাস কাটিয়ে এই অবস্থাকে ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ হিসেবে চিহ্নিত করতে আন্তর্জাতিকভাবে এই ইস্যুকে তুলে ধরছে। আমরা এ সম্পর্কে সচেতন যে, আপনার সরকার যথাযথ প্রেক্ষিত তুলে ধরে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে প্রকৃত অবস্থার প্রতি সরাসরি দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এ সমস্ত শান্তিপূর্ণ মীমাংসার উদ্যোগ বাংলাদেশের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক জান্তার মধ্যে শান্তিপূর্ণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমাধানের উপনীত হতে ব্যর্থ হয়েছে। এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক ঘোষণা এবং কার্যকলাপ প্রমাণ করে রাজনৈতিক সমাধানের সামান্যতম সুযোগ নেই। এই প্রেক্ষিতে আমাদের আশ্চর্য এবং বিব্রত করে যে, ভারত এখন পর্যন্ত সতর্কতা ও সংযত নীতি গ্রহণ করে চলেছে একটি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক জান্তার বিপক্ষে।

বাংলাদেশের জনগণ অবগত আছে যে, আফ্রো-এশিয়া অঞ্চল হতে উপনিবেশিক দাসত্ব দূর করার জন্য ভারত অগ্রণী ভূমিকা পালন করছে। বিশ্বের অত্যাচারিত জনগণের স্বপক্ষে উপনিবেশ মুক্তকরণের লক্ষ্যে ভারত সবসময়ই নিরবচ্ছিন্নভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেছে এবং সোচ্চার হয়েছে। আপনার সরকার ও জনগণ সর্বদা মানবিক মর্যাদা, সাম্য ও স্বাধীনতা যেখানে বিপন্ন হয়েছে সেখানেই তারা সোচ্চার হয়েছে। বিশ্বের নিপীড়িত জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে আপনি অব্যাহতভাবে তাদের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামকে সমর্থন করে এসেছেন। ভারত সবসময়ই মৌলিক অধিকার এবং মুক্তির সংগ্রামকে সমর্থন দেয়ার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। আপনি সর্বদাই গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও জোট নিরপেক্ষ বিদেশ নীতির প্রতি সমর্থন অব্যাহত রেখেছেন। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সনদ এবং সরকার এই সমস্ত মহান আদর্শ ও প্রত্যাশার প্রতি ইতোপূর্বে সুস্পষ্টভাবে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এখানে আমরা পুনর্বার বলতে চাই ইতোমধ্যেই আমরা আমাদের রাষ্ট্রের নীতিমালা ঘোষণা করেছি, যেখানে গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং ধর্ম, বর্ণ, গোত্র এবং নারী পুরুষ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষের জন্য সমধিকার ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে চাই। বিদেশ নীতির ক্ষেত্রে আমরা দৃঢ়ভাবে জোট নিরপেক্ষতা ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পক্ষে এবং উপনেবিশবাদ, বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ যে কোন ভাবেই থাকুক বা প্রকাশিত হোক না কেন তার বিপক্ষে। এ সকল আদর্শ ও নীতিসমূহের অঙ্গীকার ঘোষণার প্রেক্ষাপটে আমরা বুঝতে পারছি না ভারত সরকার কেন আমাদের স্বীকৃতি বিষয়ে অনুকূল সাড়া দিচ্ছে না?

আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত সতর্ক যে, বাংলাদেশের অগণিত নাগরিক নির্মম অত্যাচারের প্রেক্ষিতে শরণার্থী হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, আমরা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদ্বিগ্ন এ সকল হাজার হাজার শরণার্থীদের ভারতে আগমন কীভাবে আপনাকে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে । ভারত ও বাংলাদেশ সরকার আমাদের দুদেশের একই ধরনের উদ্বিগ্নতা রয়েছে যে, এই হাজার হাজার শরণার্থীদের আগমন অর্থনৈতিক বোঝা এবং সামাজিক রাজনৈতিক উত্তেজনা সৃষ্টি করেছে। আমরা যে সমস্ত এলাকায় প্রশাসনিকভাবে নিয়ন্ত্রণ করছি এবং তা ব্যতীত ২৫শে মার্চ '৭১ সালে যে নির্মম ধ্বংস, গণহত্যার মাধ্যমে আমাদের দেশের নাগরিকগণকে শত প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনি যে উদার মনোভাব নিয়ে আশ্রয় দিয়েছেন আমরা যথাশীঘ্র সম্ভব তাদের দেশে ফিরিয়ে নেব। আমরা এখন আমাদের দেশে তাদের নিরাপত্তা, মর্যাদা ও সম্মানজনক অবস্থায় তাদের পুনর্বাসন করার পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছি। শীতের আগমনের প্রেক্ষিতে তাদের অস্তিত্ব, তাদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণ বিশেষকরে নারী, শিশু, বয়স্ক ব্যক্তি এদের নিরাপত্তার একমাত্র উপায় হল যদি তাদের অবিলম্বে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করা হয়। আমরা সরকারের পক্ষ থেকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক সহযোগিতা করব। আমরা সময়ের প্রয়োজনে ব্যর্থ হব না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দীর্ঘ ৮ মাস ধরে বাংলাদেশ ও ভারতের জনগণ যে উদ্বেগ ও যন্ত্রণার ভেতরে আছে তা থেকে মুক্ত হওয়ার প্রাথমিক প্রয়োজন হিসেবে আমরা বিশ্বাস করি বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান। আমাদের উভয়ের লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য শুধুমাত্র নৈতিক ও রাজনৈতিক সমর্থনই যথেষ্ট নয় তার সঙ্গে অপরিহার্য হয়ে পড়েছে বস্তুগত এবং মুক্তি সংগ্রামে সাহায্য করা। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রয়োজনীয় পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতায় কেবলমাত্র বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের পথ।

আমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি বাংলাদেশ সম্পর্কে আপনার নিরবচ্ছিন্ন সমর্থন এবং এজন্য আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন তার জন্য। আমরা অনুভব করি যে, বর্তমান সময়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনৈতিক সমর্থন যাতে আমাদের মুক্তির সংগ্রামকে তড়িৎ গতিতে সাফল্যের দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং আমাদের মুক্ত সমাজের অস্তিত্বে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতির মাধ্যমে আপনাদের স্বীকৃতি আমাদের মধ্যে নতুন উদ্যোগ এনে দেবে এবং আমাদের স্বাধীন অস্তিত্ব ও আশা-আকাঙ্ক্ষার সনাক্তকরণ করবে। আমরা গভীরভাবে অনুধাবন করেছি ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতি এই মুহূর্তে প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটা শুধু উপমহাদেশেই স্থিতিবস্থা সৃষ্টি করবে না বরং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও শান্তি, সমৃদ্ধি ও স্থিতিশীলতা নিয়ে আসবে। ১৫ই অক্টোবর আমরা আপনার বরাবর যে পত্র লিখেছিলাম তার পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আবেদন অবিলম্বে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করা হবে।[১০৬]

তথ্য সংকেত

১. "Nigeria was emerging from a civil war in which tens of thousands had been killed. and tens of thousands more had died and were still dying of starvation. The province of Biafra having broken away, the central government under General Gowon fought a prolonged war before, on January 15, is secured the breakaway province's surrender. The Biafran leader, General Ojukwu, fled to the neighbouring lovory Coast. He had hoped to continue the separatist struggle from there, but was only granted asylum on condition that they give it up. Tens of thousands of his former troops remained in Biafra, where they comprised an element of extreme lawlessness, concentrating their efforts on looting and brigandage. The government in Lagos used the deterrent of public executions to try to curb this anarchy, though not to any immediate effect", দেখুন: Martin Gilbert, *Challenge to Civilization*, London: Harper collins, 2000, p. 417.

২. স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র হতে ২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে প্রচারিত স্বাধীনতা ঘোষণা দ্রষ্টব্য : হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার (তথ্য মন্ত্রণালয়), ১৯৮২, (এরপর *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* লেখা হবে।), পৃ. ১। The Government of USA, Defense Intelengence Agency, Operational Intelengence Division DL-2, DIA SPORT REPORT, WHITE HOUSE SITUATION ROOM, March 26, 1971, Sub: Civil War in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pakistan.-এ উল্লেখ করা হয়েছে: "Pakistan was thrust into civil war today when Sheikh Mujibur Rahman proclamied the east wing of the two-part country to be "the sovereign independent People's Republic of Bangladesh."

৩. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ১৯৬-১৯৭।

৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ: দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, ১৯৮২ পৃ. ৩৩।

৫. *স্বাধীনতার সনদ*, ১০ এপ্রিল, ১৯৭১, গণপরিষদ সদস্যগণ কর্তৃক ঘোষিত ও অনুমোদিত। বাংলাদেশ সংবিধানের ১৫০ অনুচ্ছেদে তা' বলবৎ করা হয়েছিল।

৬. প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের ভাষণ, ১০ই এপ্রিল (১৯৭১) স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত। দ্রষ্টব্য : *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৮-১৫।

৭. ১৯৬৪ সনের মার্চ, ১৯৬৬ সনের মার্চ ও ১৯৬৭ সনের আগস্ট মাসে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনসমূহে গৃহীত সংশোধনীনিচয় অন্তর্ভুক্ত করিয়া এই 'নীতি ও কর্মসূচির ঘোষণা' (ম্যানিফেস্টো) তৃতীয় প্রকাশরূপে পুনর্মুদ্রণ করা হয়।

৮. পাকিস্তানি ডেপুটি হাই কমিশনার হোসেন আলী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশকে কেন্দ্র করে ২২শে এপ্রিল পাকিস্তান ভারতকে এই ঘটনার জন্য হুমকি প্রদান করে বলে যে, এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। এর জবাবে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের যুগ্মসচিব এ.কে. রায় দিল্লিস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনার সাজ্জাত হায়দারকে বলেন, বিষয়টি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারত আইনানুসারে তার দেশে কাউকে এ বিষয়ে শক্তি প্রয়োগ করতে দেবে না।

৯. 'We further resolve that we undertake to observe and give effect to all duties and obligations that devolpe upon us as a member of the family of nations and under the Charter of United Nations.' যা বাংলাদেশ সংবিধানের অংশ।

১০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৭ই এপ্রিল শপথ গ্রহণের পর দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে যে বক্তব্য রাখেন তার অংশবিশেষ, "In our struggle for survival we seek the friendship of all people, the big powers and the small. We do not aspire to join any bloc or pact but will seek assistance from those who give it in a spirit of goodwill free from any desire to control our destinies. We have struggled far too long for our self-determination to permit ourselves to become any one's satellite.

We now appeal to the nations of the world for recognition and assistance both material and moral in our struggle for nationhood. Every day this is delayed a thousand lives are lost and more of Bangladesh's vital assets are destroyed. In the name of Humanity act now and carn our undying friendship. This we now present to the world as the CASE of the people of Bangladesh. No nation has a greater right to recognition, no people have fought harder for this right." দেখুন: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২; সম্পূর্ণ ভাষণ দ্রষ্টব্য: ঐ, পৃ. ২৫-৩২। *Archer.k. Blood*, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ঢাকাস্থ কাউন্সিল জেনারেল ২৮শে মার্চ ৭১, এক বার্তায় (টেলিগ্রাম নং-৯৫৯) বলেন, "Recent Developments in East Pakistan serves neither our moral interests broadly defined nor our national interest narrowly defined." তিনি বলেন, 'our Government has failed to the denounce the suppression of Democracy. Our Government has failed to the denounce atrocities. Our government has failed to take forceful measures to prefect its citizens while at the same time barding over backwards to placate the West Pakistan dominated government and lessen likely

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

and deservedly. Negative international public relations impark against them. Our government has a evidence what many will considered moral Bankruptcy."

১১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩৭ *সূত্র- টাইমস্ অব ইন্ডিয়ায়* ২৮শে এপ্রিল (১৯৭১) উল্লেখ করা হয়। The Bangladesh Prime Minister, Mr. Tajuddin Ahmed, today appealed to neighbouring countries to grant immediate recognition to Bangladesh and to give unconditional arms aid and thus help a new born country to free itself from the clutches of a murderous army.

১২. *জয় বাংলা, ২রা জুন ১৯৭১।*

১৩. ২রা জুন অল ইন্ডিয়া রেডিও-র সঙ্গে এক সাক্ষাতকারে তাজউদ্দীন আহমেদ বলেছিলেন, "our irrevocable commitment to a policy of friendship for all, especially for neighbours irrespective of variations in the response of world Powers to our present difficulties. Asked what was his Government's feeling about the silence or ambivalence of big Powers, especially the U.S.A the United Kingdom and the Soviet Union," Mr. Ahmed replied, "Our friendship for all" policy shall continue to guide our foreign policy irrespective of the variations in the response of world powers to our present difficulties. He said the work of the emissaries sent by his Government abroad was bearing fruit in creating favourable lobbies in these areas and in organising public opinion in favour of Bangladesh." দেখুন : *টাইমস্ অব ইন্ডিয়া*, ২রা জুন; *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৩-৫৪।

১৪. তিনি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় রাজনৈতিক সমাধান বা আপোষ মীমাংসা সম্পর্কে যে জল্পনাকল্পনা চলছে সে সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ কোনো গোঁজামিলের সমাধান গ্রহণ করবে না। অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রধান বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করেন, বাংলাদেশের মাটিতে আর কোনোদিন সাম্প্রদায়িকতা মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না। এদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সকল বাঙালি হিন্দু-মুসলমান-বৌদ্ধ-খ্রিষ্টান একসাথে লড়েছেন-বুকের তপ্ত লহু ঢেলে দিয়ে বাংলার মাটি সিক্ত করে তারা এটাই প্রমাণ করেছেন যে, এদেশের প্রতিটি প্রাণ ঐক্যবদ্ধ, অভিন্ন। সূত্রঃ *জয়বাংলা*, ১৮ জুন, ১৯৭১; *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬।

১৫. *আফসান চৌধুরী, বাংলাদেশে '৭১*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৭, পৃ. ৬৪৮, (সাক্ষাৎকার, অশোক রায়, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায় দ্রষ্টব্য।)

১৬. *Faruq Aziz Khan, Spring 1971*, জুলাই,১৯৯৩ পৃ. ১৪৩-১৪৪। যুবনেতাদের সঙ্গে সরকার গঠন বাদেও মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে দ্বন্দ্ব দেখা দেয় মুজিববাহিনী গঠনকে কেন্দ্র করে। যুবনেতারা মুজিবনগর সরকার ও প্রধান সেনাপতির কমান্ডে যুদ্ধ করতে চায়নি। যুব নেতৃবৃন্দ স্বতন্ত্রভাবে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করতে প্রয়াসী হয়। এই লক্ষ্যে গড়ে ওঠে মুজিববাহিনী। মুজিববাহিনীর দাপ্তরিক নাম ছিল, 'বংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স' এই বাহিনীর উপর সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা RAW এই বাহিনী গঠনে সহায়তা করেছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনতা সংগ্রাম যেন উগ্রবামদের হাতে চলে না যায়। মুজিব বাহিনীকে মুক্তিবাহিনীর চেয়ে উন্নত মানের অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করা হয়। আগস্ট মাসে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ দিল্লি সফর কালে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি.এন. হাকসার ও RAW এর প্রধান রমানাথ কাও এর সহযোগিতা কামনা করেন। দেরাদুনের অদূরে চাকরাতায় মুজিববাহিনীকে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। মুজিববাহিনীর সদস্যদের ৪৫ দিনের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ছাড়াও জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র সম্পর্কে আদর্শিক ধারণা দেওয়া হত। দেরাদুন ছাড়াও আসামের জাফলংয়ে আরেকটি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। এ বিষয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন উদ্বিগ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকলেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির তেমন কোনো উদ্বেগ পরিলক্ষিত হয়নি। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক প্রফেসর অমলেন্দু দে এক বিশ্লেষণে বলেন, "ভারত সরকারের এ ধরনের কোনো অশুভ উদ্দেশ্য ছিল বলে তিনি মনে করেন না। বরং তাজউদ্দীন বিরোধী যুবসম্প্রদায়ের কর্মকাণ্ড যেন সমগ্র মুক্তিযুদ্ধকে নস্যাৎ না করে বা পাকিস্তানী শক্তিকে লাভবান না করে সে জন্যই ইন্দিরা গান্ধীর সরকার মুজিব বাহিনী গঠনে বা তাদের প্রশিক্ষণে নমনীয় মনোভাব প্রদর্শন করেছিলেন। ভারত সরকার চেয়েছিল শেখ মনি বা তাঁর অনুসারীগণ ভিন্ন প্ল্যাটফর্মে থেকেও যেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সক্রিয় থাকে। সে জন্যই মূলত মুজিব বাহিনীর প্রতি ভারত সরকারের এ আনকূল্য।" তাজউদ্দীনের সঙ্গে মুজিববাহিনীর অন্যতম নেতা সিরাজুল আলম খানের এক বৈঠকে বিষয়টি উদ্বিগ্নতা থেকে অনেকটা সহনীয় পর্যায়ে নেমে আসে।

১৭. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ* ৭১, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ৪০৭, হোসেন তৌফিক ইমাম, এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়।

১৮. ঐ, *পৃ. ৪১৪ ও ৪০৭*, আসাদুজ্জামান ও হোসেন তৌফিক ইমাম, *এই গ্রন্থের সাক্ষাৎকার অধ্যায়।*

১৯. Congressional Record, December, 9, 1971, P. 45735 এখানে কিসিঞ্জার নিজেই স্বীকার করেছেন, তিনি বলেছেন, "We established contact with the Bangladesh people in Calcutta, and during August, September and October of this year, no fewer than eight such contacts took place. We approached President Yahya Khan three times in order to begin negotiations with the Bangladesh people in Calcutta. The Government of Pakistan accepted."

২০. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971*, P. 177, দেখুন "On August 8 the Political Counselor of the Embassy in New Deilhi met with M. Alam, 'Foreign Secretary' of the Bangladesh movement. Alam requested a meeting with Ambassador Keating but accepted an informal meeting with the Political Counselor when informed that Keating's official position precluded him meeting with a Bangladesh representative. The thrust of Alam's remarks was that the goal of total independence for Bangladesh was firmly established, and he urged the United States to support that goal. (Telegram 12698 from New Delhi, August 9: National Archives, RG 59, Central Files 1970-73, POL 23-9 PAK"

২১. Henry Kissinger, *White House Years,* Little, Brown and Company, Boston, Toronto, p. 872 দেখুন, "The Next day (28 September 1971) the Bangladesh 'foreign minister' finally met with our Consul in Calcutta; he said talks were useless unless the United States used its influence to bring about Bengali 'desires,' which included full independence, freedom for Mujib, US aid and normal relations.'

২২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ*, দলিলপত্র ঃ পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮ দেখুন, "মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করার জন্য সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তিনি বলেন, "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both," আমি এ কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "We want both, Sheikh without

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete." আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পেছনে একটা যোগসূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরনের ব্ল্যাক মেইল বলে আমার কাছে মনে হলো। –পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।

২৩. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis, 1971*, p. 225, দেখুন "Telegram from the Department of State to the Consulate General in Calcutta, Washington, September 21, 1971. দেখুন, "Printed from an unsigned copy. A week after receiving this instruction, the Consulate General indicated that it was 'Stymied' in its efforts to arrange a meting with Islam. The only channel to Islam remained through Qaiyum. Qaiyum sent a message that Islam was still keen to talk to a political officer but was seeking permission from the Indian Government to do so. (Telegram 2570 from Calcutta, September 28, *Ibid.*)"

২৪. *Henry Kissinger-White House Years*, p. 873, "On October 20 senior Bangladesh Official, Hossain Ali, told our consul that his organization was not interested in passing messages to Yahya; the 'obvious solution' was Mujib's release and immediate independence for Bangladesh. By the end of October, the Indian press was publicly warning against Bengali negotiations with 'foreign representatives.' In short, the effort to encourage negotiations between the government of Pakistan and the Bangladesh government in extile was finished."

২৫. Ibid

২৬. Henry Kissinger-White House Years, p. 870, খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেছেন, "He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contrasts between the two governments and the Bengali exiles"

২৭. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis*, 1971, p. 157.

২৮. Enayetur Rahim and Joyce L. Rahim, *Bangladesh Liberation War and Nixons White House*, 1971, *op-cit*, pp-224-225.

২৯. *Ibid. p.411.* মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একাধিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটার আন্তর্জাতিক মাত্রাও ছিল। খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের সাথে শর্তসাপেক্ষে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন এমন প্রামাণ্য দলিল হেনরি কিসিঞ্জারের লিখিত বইতে পরিস্ফুট। জহিরুল কাইয়ুম মার্কিনীদের বলেন, তিনি মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে এসেছেন। পাকিস্তানিদের সাথে আলোচনার বিষয়টি জহিরুল কাইয়ুম সম্ভবত উপস্থিত করেন এবং সেভাবেই মার্কিনীরা ইয়াহিয়া খানকে জানায়। তিনি যে মোশতাক সমর্থিত একজন, এটা প্রমাণিত। কিন্তু অপর সমর্থক মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রসচিব মাহবুবুল আলম ও খন্দকার মোশতাক কখনো শেখ মুজবিকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তেমন উল্লেখ নেই। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু যাই থাকুক, যোগাযোগ যে করা হয় এবং সেটা যে মুজিবনগর সরকারকে না জানিয়ে করা হয়, সেটার প্রমাণ মার্কিন দলিলে রয়েছে। যেটা মুজিবনগর সরকারের ভেতরের দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রমাণ করে এবং কেউ যদি মনে করে, একে ষড়যন্ত্রের বিবরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এটা ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পরিকল্পনা ও কৌশলের বাইরে ছিল না। যারা ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ছিল তারাই এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যেমন এন.কে. ঝা-এর পরামর্শে কিসিঞ্জার বাংলাদেশ প্রতিনিধির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে ভারত সরকারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তী কালে বলা হয় যা কিছু আলোচনা হোক না কেন তা ভারত সরকার কে জানিয়ে বা তার মাধ্যমে করতে হবে। এর অভ্যন্তরে যেসব বিষয়াদি ছিল কোনোটাই তৎকালীন প্রধান বাস্তবতার বাইরে ছিলো না। সেই বাস্তবতা ছিলো পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করা, সেটা ঢাকা দখল করা হোক অথবা স্বাধীন দেশ ফিরে পাওয়া হোক–দুটোই ছিলো একই বাস্তবতার দুই দিক। এতে ভারত সরকার সফল হয়েছিলো এবং মুজিবনগর সরকারের রাজনীতির এই উদ্দেশ্য সফল হয়।

৩০. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asia Crisis*, 1971, p. 198.

৩১. *Ibid*, p. 197.

৩২. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২৪৪

৩৩. মোহাম্মদ নূরুল কাদের, *একাত্তর আমার*, ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৯, পৃ. ৬৬

৩৪. এম.আর. আকতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা:সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১, পৃ. ১৪২

৩৫. ঐ

৩৬. উপর্যুক্ত কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৬ ডিসেম্বরের পরে খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিয়োগ করেন। এতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব তুঙ্গে ওঠে। এ প্রসঙ্গে নূরুল কাদেরের একটি মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "এই মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সচিব মাহবুবুল আলম চাষী ও মন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের অনেক কাজই প্রশ্নাতীত ছিল না। এমনকি তাদের কর্মকাণ্ড স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য ক্ষতিকর প্রভাব ফেলার মতো অবস্থায়ও গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও সচিবের অনাকাঙ্ক্ষিত কর্মকাণ্ড প্রধানমন্ত্রীর নজর এড়ায়নি। বিচক্ষণ ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ সময়মত যথোপযুক্ত ব্যবস্থাও গ্রহণ করেছেন। তা না হলে বাংলাদেশের ইতিহাস হয়তো বর্তমানে অন্যভাবে লেখা হতো। দেখুন, মোহাম্মদ নুরুল কাদের, *একাত্তর আমার*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭১।

৩৭. The Radio quoting Awami League circles "Bangladesh is a free and sovereign country today and there is no scope for talks." These circles were commenting on a statement by the spokesman of the U.S. State Department about a formula suggested by an emissary of Yahya Khan for a settlement of the issue, p. 49.

৩৮. "Those nations which preach and practise democratic principles and value should try to protect the democratic forces now facing annihilation at the hands of the occupation army in Bangladesh. They really are great who stand by the oppressed and the suffering." সূত্র: প্যাট্রিয়ট (নিউ দিল্লি), ৩১ মে, ১৯৭১ (উদ্ধৃতি: *স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫১)।

৩৯. *The Times of India*, New Delhi, July 2, 1971.

৪০. Alamgir Kabir, *This was Radio Bangladesh 1971*, Dhaka: Bangla Academy, 1984, p. 118-120. "A historic four-party agreement has been reached yesterday iun Mujibnagar. After long discussions for 2 days the leader of the Awami League, Naitonal Awami Party (Bhashani Group), National Awamy Party (Muzaffar Group), Bangladesh Communist Party and Bangladesh National Congress agreed to form an 8-member National Consultative Committee. The Committee will be available for consultations in matters relating to the national liberation struggle. The Consultative Committee consists of the following members: Moulana Abdul Hamid Khan Bhashani, Bangladesh Premier Tajuddin

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Ahmed, Bangladesh Foreign Minister Khondoker Moshtaque Ahmed, Professor Muzaffar Ahmed of National Awami Party, Moni Sing of Bangladesh Communist Party and Monoranjan Dhar of Bangladesh National Congress. Two more members are to be included from other parties with definite commitment in the liberation struggle. For the first time since March 25 Moulana Bhashani attended such a top level political discussion. The Committee reaffirmed the determination to continue the liberation war until victory. In clearest possible language it has declared that any political settlement short of full independence for Bangladesh would not be acceptable to people *of* Bangladesh. The Committee appealed to the civilized countries of the world to declare their solidarity with the struggling people of Bangladesh and called upon them to recognize the People's Republic of Bangladesh. The committee also appealed to all countries for full support including arms and ammunition for the liberation struggle".

৪১. (ন্যাপ) মোজাফফর কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে সমর্থন করে নিম্নরূপ প্রস্তাব পাস করে "We declare in unequivocal terms that the government headed by Sheikh Mujibur Rahman is the only legally constituted government of Bangladesh. And urge upon all the demorcatic and progressive nations of the world to recognise the newly-born state and its government and to render all material help and moral support. In this connection, we deem it our duty to gratefully acknowledge the sympathy received from all peace-loving and democratic people of the world and especially the support and co-operation given by the people and the governments of India and the Soviet Union. In the name of humanity, tenets of civilisation and conscience we fervently appeal to all democratic and progressive nations of the world and to the UNO to effectively move so as to immediately stop the genocide being perpetrated on the hundreds and thousands of innocent and unarmed men, women and children of Bangladesh." মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৬, পৃ. ২৪।

৪২. প্রবাসী সরকার গঠনের মাস দু'য়ের মধ্যেই প্রবাসী সরকারের নেতাদের মধ্যে উপদলীয় কোন্দল দানা বাধতে থাকে। কলকাতার পার্কস্ট্রীটের পাঁচতলায় যেখানে মওলানা ভাসানীর থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন ভারত সরকার, তার পাশের কামরাটিই বরাদ্দ ছিল অস্থায়ী প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীনের পরিবারের জন্য। এভাবে থাকার আয়োজন করার একটি অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য অবশ্যই ছিল, প্রধানমন্ত্রী তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে দেখা করতে গেলে মওলানার সঙ্গেও দেখা হবে। মওলানা ভাসানীর সচিব লিখেছেন, "তাজউদ্দীন আহমদ প্রথম যেদিন এলেন, মওলানা সাহেবের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করলেন। প্রবাসী সরকার গঠনের কথা বললেন এবং মন্ত্রিসভার অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের আভাস দিলেন। মওলানা ভাসানীর সক্রিয় সহযোগিতা ও আশীর্বাদ কামনা করলেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীর আবেদনের প্রতি অনুকূল সাড়া দিয়ে বললেন, "তাজউদ্দীন, সংগ্রামটা মিটিং-মিছিল, হরতাল আর প্রস্তাব পাশের না। অস্ত্র হাতে লড়াই, রক্ত, ঘাম, আগুন, জীবন বাজি আর কূটনীতির। ভেতর বাইরে হাঙ্গরের হামলা। দোস্তের লেবাসের তলায় শাণিত ছুরি, তুমি একলা পারবা?" "হুজুর তো আছেনই, আপনার দোয়া, পরামর্শ, সহযোগিতা সব সময়ই চাইব।" এর দু'দিন পর প্রধানমন্ত্রী আবার কোহিনূর প্যালেসে এলেন। মওলানা ভাসানীর সাথে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আলাপ করলেন।

৪৩. Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani's appeal to world leaders, Dated April 21, 1971, Secretary General U thant, United Nationns, New york, U.S.A.

৪৪. তিনি অন্য এক পত্রে চীনের মাও সেতুং কে লেখেন, "Ideology of Socialism is to fight against oppression. I appeal to you to save seven and half crores of oppressed

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

people of Bangladesh from the atrocities committed on them by the military junta of dictator General Yahya Khan. Yahya's Military Government, by the help of modern war weapons supplied by your government, are mercilessly and brutally slaying the innocent, unarmed, helpess peasants, labourers, students, intelligentsia, women and children of Bangladesh. If your Government do not protest this brutal atrocities committed on oppressed masses of Bangladesh by the military junta with the help of vested interests of West Pakistan, the world may think that you are not the friend of oppressed people. No such example of oppression, which the military junta is inflicting upon the innocent masses of Bangladesh, will be found even in times of Chiang Kai-Shek's rule in your own land, Czar's rule in Russia and in times of British Impreialism in pre-independent India. The reports of atrocities and oppression, which are being given publicity by various Indian agencies, are in fact the smallest portion of the volume and nature of oppression and atrocities which are really happening in wretched land of Bangladesh at present. World will come to know the true picture and actual nature, and will know the truth of my complaints, if the journalists, intelligentsia, politicians of any country, even of the countries friendly to Yahya's government, made field survey. You are well aware that there are tremendous peoples' support behind the Independent Bangladesh Government than that of Sihanouk Governemnt's of Combodia. I, therefore, earnestly request you to please extend your support, recognition and all possible help to the Government of Independent People's Republic of Bangladesh. I had to undergo 31 years of imprisonment to achieve indepe:idence of Indo pak sub-continent and to achieve people's rights in Pakistan. I am at present an old man of 89. At this stage of my life my humble residence has been gutted by the barbarous soldiers of Yahya Khan. My precious collection of books from different countries has also been burnt by them. I do not know what has happened to the fate of my family after my house was set on fire."

৪৫. *আনন্দবাজার পত্রিকার ১৬ মে সংখ্যায় 'ইয়াহিয়া খাঁকে ভাসানীর চ্যালেঞ্জ' শিরোনামে একটি বড় প্রতিবেদন ছাপা হয়। সেই সঙ্গে মুদ্রিত ভাসানীর একটি বিরাট প্রতিকৃতি, যার নিচে শিরোনাম 'সেকি অত্যাচার! দেখলে কেউ সুস্থ থাকতে পারে না।'*

৪৬. দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা, কলকাতা, ৩১শে মে '৭১,

৪৭. ঐ

৪৮. মনি সিংহ, 'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি', মেসবাহ কামাল (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থীদের ভূমিকা*, ঢাকা: গণপ্রকাশনী, ২০০১, পৃ. ১৬৮-১৮১

৪৯. To
Mr. Justice Abu Sayed Chowdhury,
Vice Chancellor,
Dacca University,
Dear Sir,
On formation of Sovereign Independent Peoples' Republic of Bangladesh you Mr. Justice Abu Sayed Chowdhury, are hereby appointed as the Special

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Representative of the Government of Bangladesh for presenting and receiving communication to and from foreign countries, various Heads of States, Diplomatic Missions abroad, United Nations Organization and other International Bodies as you may be specifically assigned and instructed to act and represent from time to time by the Government of Bangladesh.
(Syed Nazrul Islam)
Acting President.
(Khandakar Moshtaque Ahmed)
Foreign Minister, বদরুদ্দীন উমর, *জনগণের সংগ্রামের পথ*, পৃ. ৩৬।

৫০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। কূটনীতিবিদ ও দূতাবাসের নাম: **নতুন দিল্লি** : ১. কে. এম. শাহাবুদ্দিন, দ্বিতীয় সচিব; ২. আমজাদুল হক, সহকারী প্রেস এ্যাটাচে; ৩. আবদুল মজিদ, মিনিস্ট্যারিয়েল স্টাফ; ৪. আব্দুল করিম, মিনিস্টারয়েল স্টাফ; ৫. এস. এম. নূরুল হুদা, মিনিস্টিরিয়েল স্টাফ; ৬. মফিজুর রহমান, স্টেনোগ্রাফার; ৭. এ কে আজাদ, ইউডিসি; ৮. গোলাম মোস্তফা, ডিসপ্রেসার; ৯. মোহাম্মদ জয়নুল আবেদিন, এলডিসি; ১০. আবদুল শাহেদ, পিয়ন; ১১. হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী কাউন্সিলর; **কলকাতা** : ১. এম. হোসেন আলী, ডেপুটি হাই কমিশনার; ২. আর. আই. চৌধুরী, সেক্রেটারি; ৩. আনোরুল করিম চৌধুরী, থার্ড সেক্রেটারি; ৪. কাজী নজরুল ইসলাম, থার্ড সেক্রেটারি; ৫. এম. মকসুদ আলী, এসিস্ট্যান্ট প্রেস এ্যাটাচে; ৬. সাইদুর রহমান, নন ডিপ্লোমেটিক অফিসার; ৭. এম. এ. হাকিম, হিসাব রক্ষক; ৮. আমির আলী, এডিশনাল এসিস্ট্যান্ট: ৯. আনোয়ার হোসাইন চৌধুরী, পিএটু ডি এইচ সি; ১০. এমডি সায়েদুজ্জামান মিয়া, স্ট্যোনোগ্রাফার, ১১. জয়নুল আবেদীন চৌধুরী, স্টেইনোগ্রাফার; ১২. মোস্তফিজুর রহমান, এসিস্ট্যান্ট; ১৩. আলিমুজ্জামান, এসিস্ট্যান্ট; ১৪. এ. জেড. এম. এ. কাদির, এসিস্ট্যান্ট; ১৫. মতিউর রহমান, এসিস্ট্যান্ট; ১৬. কাজী সেকান্দর আলী, এসিস্ট্যান্ট; ১৭. শামসুল আলম, এসিস্ট্যান্ট; ১৮. মোহাম্মদ গোলামুর রহমান, এসিস্ট্যান্ট; ১৯. আবদুর রব, ইউডিসি; ২০. মোহাম্মদ সিদ্দিকুল্লাহ, ইউডিসি; ২১. এ. কে. এম. আবু সুফিয়ান, ইউডিসি; ২২. মো. ফখরুল ইসলাম, ইউডিসি; ২৩. নুরুল আমিন, এসডিসি; ২৪. এবিএম খোরশেদ আলম, এলডিসি; ২৫. নূর আহমেদ, এলডিসি; ২৬. মো: আবদুর রহিম, এলডিসি; ২৭. মো. আমিন উল্লাহ, এলডিসি; ২৮. আবদুর রহমান ভূইয়া, এলডিসি; ২৯. আব্দুল মান্নান ভূইয়া, এলডিসি; ৩০. মো. আবুল বাশার, এলডিসি; ৩১. মো. আলাউদ্দিন, এলডিসি; ৩২. সমিরুদ্দিন, এলডিসি ৩৩. মো. সোলায়মান, এলডিসি; ৩৪. শামসুদ্দিন হোসেন, এলডিসি; ৩৫. জহুর হোসেন, এলডিসি; ৩৬. মীর মোজাম্মেল হক, এলডিসি; ৩৭. মোহাম্মদ জাকারিয়া, এলডিসি; ৩৮. মোহাম্মদ ওয়াহিদুর রহমান, এলডিসি; আবদুর নূর, এলডিসি; ৪০. এ. কে. এম. রব, এলডিসি;; ৪১. এ. কে. এম. কামরুল রশিদ, এলডিসি; ৪২. আনোয়ারুজ্জামান, এলডিসি; ৪৩. আব্বাস উদ্দিন আহমেদ চৌধুরী, টেলিফোন অপারেটর; ৪৪. ওয়াহিদুর রহমান, এলডিসি; ৪৫. মো. শাহেদুর রহমান, এলডিসি; ৪৬. সায়ফুল আলম, ডেসপাচ রাইডার; ৪৭. আব্দুল আমিন, দপ্তরি; ৫০. মো. হোসেন, অফিস অর্ডারলি; ৫১. মতিউর রহমান, অফিস অর্ডারলি; ৫২. আবদুল গফুর মৃধা, অফিস অর্দোলি; ৫৬. মো. হেদায়েত উল্লাহ, পিয়ন; ৫৭. নুরুল হক, পিয়ন; ৫৮. শামসুল আনোয়ার, পিয়ন; ৫৯. মো. ইসহাক, ইলেকট্রিসিয়ান; ৬০. মমতাজ মিয়া, পিয়ন; ৬১. হরমুস হক, পিয়ন; ৬২. আবদুস সোবান, পিয়ন; ৬৩. শানু মিয়া, পিয়ন; ৬৪. মো. ইলিয়াস, পিয়ন; ৬৫. আবুল হোসেন, গার্ডেনার: **নিউইয়র্ক-দূতাবাস**; ১. এ. এইচ. মাহমুদ আলী, ভাইস কনসাল, ২. এম. এ. কমির, ডেপুটি পারমানেন্ট রিপ্রেজেনটিভ; **ওয়াশিংটন দূতাবাস**; ওয়াশিংটনে কর্মরত বাঙালি ওয়াশিংটন দূতাবাস কর্মচারী কর্মকর্তাগণ ৪ আগস্ট বাংলাদেশের প্রতি অনুগত্য পোষণ করেন। আনুগত্য ঘোষণাকারী কর্মকর্তা কর্মচারী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হলেন: ১. এনায়েত করিম, মিনিস্টার; ২. এস. এ. এম. এস. কিবরিয়া, পলিটিক্যাল কাউন্সিলর; ৩. এ. এম. এ. মুহিত, ইকোনমিক, ইকোনমিক কাউন্সিলর; ৪. এ. আর. মতিন উদ্দিন, এডুকেশন এন্ড কালচারাল কাউন্সিলর; ৫. সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী, থার্ড সেক্রেটারি; ৬. এ. আর. চৌধুরী, ফাইন্যান্স এন্ড একাউন্টস অফিসার; ৭. এ. এম. এস. আলম, সহকারী প্রশাসনিক কর্মকর্তা; ৯. আফতাব উদ্দিন, মেম্বার অব স্টাফ; ১০. সোলায়মান, পিএ; ১১. এম হক, পিএ; ১২. নূরুল ইসলাম, এসিস্ট্যান্ট ডিফেন্স উইং; ১৩. মোশতাক আহমেদ, এসিস্ট্যান্ট এডমিনিস্টেটিভ উইং, **লন্ডন হাইকমিশন অফিস**; ১. মহিউদ্দিন আহমেদ, সেকেন্ড সেক্রেটারি; ২. মো. আকবর লুৎফুল মতিন, ডিরেক্টর অব অডিট এন্ড একাউন্টস; ৩. আবদুর রউফ, ডেপুটি ডিরেক্টর ফিল্ম এন্ড পাবলিকেশন্স; ৪. ফজলুল হক চৌধুরী, লেবার এ্যাটাচে; ৫. রেজাউল করিম, কাউন্সিলর, **প্যারিস দূতাবাসের** সাইফার এসিস্ট্যান্ট মোশাররফ হোসেন এবং শওকত আলী ৫ জুলাই বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করে পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন। **বনের গোলাম** মোস্তফা এং সেকেন্ড সেক্রেটারি ওয়ালিউর রহমান আগস্ট মাসের ৯ তারিখে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। **বাগদাদের** রাষ্ট্রদূত এ. এফ. এম. আবুল ফতেহ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন ২১ আগস্ট। **হংকং-এর ভারপ্রাপ্ত** ট্রেড কমিশনার মহিউদ্দিন আহমেদ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন ১৮ আগস্ট। **স্টকহোমের** সাইফার এসিস্ট্যান্স মো. সফিউল্লাহ পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করেন ২৫ আগস্ট। এছাড়াও বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য পোষণকারী অন্যান্য কূটনৈতিক কর্মকর্তা কর্মচারী ছিলেন : **বুয়েনস এয়ারসের** রাষ্ট্রদূত এ. মোমিন, **টোকিওর প্রেস** এ্যাটাচে মাসউদ এবং থার্ড সেক্রেটারি রহিম।

৫১. সিনেটর কেনেডি কর্তৃক যুক্তরাষ্ট্রের পাকিস্তান নীতির সমালোচনা, সূত্র: সিনেটের কার্যবিবরণী, ২২শে জুন ১৯৭১। বিস্তারিত দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* : ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৩৪৯। সিনেটর কেনেডি সংবাদমাধ্যমের কথা উল্লেখ করে অভিযোগ করেন, "সরকারিভাবে বারবার পাকিস্তানে সবধরণের অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ এমন আশ্বাস দেওয়া হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও তা চলবে বলে মনে হয়। বারবার এভাবে সরকার ও প্রশাসন নিজেদের প্রতিশ্রুতি নিজেরাই ভাঙলে তাদের ওপর থেকে বিশ্বাস উঠে যাবে– ফলে কংগ্রেসের হয়তো আইন পরিণত করতে হবে, যেন সহজে খেলাফ করা না যায়। তিনি আরও অভিযোগ করেন মার্কিন প্রশাসন বন্দুক বিক্রিতে যতো দক্ষ ত্রাণ সাহায্য দিতে ততোটা নয়, তাদের আন্তরিকতার অভাব এক্ষেত্রে প্রকট।"

৫২. ৩ জন অধ্যাপক ছিলেন ডীন রবার্ট মেসন, রবার্ট ডর্ফম্যান ও স্টিফেন মার্গলিন।

৫৩. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা:বাংলা একাডেমী। মিশনটি স্থাপিত হয় ওয়াশিংটন ১২২৩, কানেকটিকাট এভিনিউ। মিশন চালু হওয়ার পর মিশনের প্রচেষ্টায় আর্জেন্টিনার পাকিস্তানি কূটনৈতিক আবুল মোমেন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং এই মিশন জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে।

৫৪. ১৬ সদস্যের এ প্রতিনিধিদলে জাতীয় সংসদ সদস্য ছিলেন আব্দুস সামাদ (আজাদ) এম. আর. সিদ্দকী, সৈয়দ আব্দুল সুলতান, ড. মফিজ চৌধুরী ও সেরাজুল হক। প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য ছিলেন ডা. আসহাবুল হক, ফনীভূষণ মজুমদার ও ফকির শাহাবুদ্দিন। এছাড়া ছিলেন ন্যাপের মোজাফফর আহমদ, প্রফেসর এ. আর. মল্লিক, প্রফেসর রেহমান সোবহান এবং কূটনীতিবিদ এ. এফ. এম. আবুল ফতেহ, খুররম খান পন্নী, সৈয়দ আনোয়ার করিম, এ. এম. এ. মুহিত ও এ. এইচ. মাহমুদ আলী। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে ভিসা না দিতে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ যুক্তরাষ্ট্রকে অনুরোধ জানিয়েছিলো।

৫৫. ১৯৭১ সালে ভারত ও সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে "শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও সহযোগিতার নীতি রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থার বিভিন্নতা সত্ত্বেও বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সুসম্পর্ক স্থাপনে সহায়ক'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলে ঘোষণা করা হয়েছিল। এই চুক্তিতে ভারত ও সাবেক সোভিয়েত রাশিয়া রাষ্ট্রসংঘের সনদের নীতি ও উদ্দেশ্যের প্রতি উভয় রাষ্ট্রের অবিচল আস্থা স্থাপন করে ও সকল জাতির সঙ্গে এই নীতিতে মৈত্রী ও সহযোগিতা কাম্য বলে বর্ণনা করে। এই চুক্তির ৮নং ধারায় উভয় রাষ্ট্র অপর পক্ষের বিরুদ্ধে আগ্রাসনে রত কোনো তৃতীয় পক্ষকে সাহায্য করবে না ও অন্যকোন পক্ষকে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের জন্য তাহাদের ভূখণ্ড ব্যবহার করতে দেবে না বলে ঘোষণা করেছিল। ৯নং ধারায় সশস্ত্র সংগ্রামে কোন তৃতীয় পক্ষ যদি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্রদ্বয়ের কোন একপক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হয় তা হলে তাকে সাহায্য করবে না বলে উভয়ে ঐক্যমত হয়েছিল।

৫৬. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *প্রাগুপ্ত*, পৃ. ১৭৩, "৭১ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন এম. পি. ফণীভূষণ মজুমদার এমপিএ ও বেগম নূরজাহান মুর্শিদ এমএনও মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে দিল্লি সফর করেন এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের অনুরোধ জানান। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বিভিন্ন সময়ে ইন্দিরা গান্ধীর সাথে সাক্ষাতে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন। তিনি ১৯৭১ সালের ১৫ অক্টোবর, ১৫ নভেম্বর ও ২৩ নভেম্বর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে এ প্রসঙ্গে স্বীকৃতি দেবার অনুরোধ জানিয়ে ৩টি চিঠি লেখেন। বাংলাদেশ সরকার বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থার অনুরোধ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে বিবেচনায় এনে ভারত ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়।

৫৭. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮, পৃ. ৩৫, "স্যার আলেক ডগলাস হিউম এপ্রিল মাসের ১০ তারিখ বিচারপতি চৌধুরীকে সাক্ষাৎ দান করেন এবং বাংলাদেশের ব্যাপারে উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। তিনি বাংলাদেশের হত্যাযজ্ঞ বন্ধ করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে বলেন। একই দিনে বিবিসি বাংলা বিভাগের তরফ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী একটি সাক্ষাৎকার প্রচার করা হয় এবং এর মাধ্যমে বিচারপতি চৌধুরীর লন্ডন আন্দোলন অংশ গ্রহণের খবর দেশে ও বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে।"

৫৮. *পার্লামেন্টে ৩শ সদস্যের স্বাক্ষরযুক্ত এই প্রস্তাবে শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য ব্রুস ডগলাসম্যান প্রস্তাব করেন,* "That this house deeply concerned by the killing and destruction which have taken place in East Pakistan, and the posible threat of food shortage later this year call upon Her Majestys Government to use their influence to secure an end to the strife, the admission of United Nations or other international relief organisations and the achievement of a political settlement which will ensure the democratic rights of the people's of East Pakistan". নুরুল ইসলাম *প্রবাসীর কথা*, প্রাগুপ্ত, পৃ. ১০১২, *দেশে-বিদেশে*, ৬ই জুন ১৯৯৬ সংখ্যা। তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙালি সমাজ*, পৃ. ১০৩ দ্রষ্টব্য।

৫৯. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা:দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, *২০০৭, পৃ.* ৩১।

৬০. রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, *২০০৭, পৃ. ৮১*

৬১. আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি বাংলাদেশ :* ১৯৭১, ঢাকা: অনন্যা, পৃ. ১৩৭। মিশন উদ্বোধনী দিনে ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানিদের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করার জন্য বাংলাদেশ মিশনের বাইরে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। পাকিস্তান হাই কমিশনার সালমান আলী পররাষ্ট্র দপ্তরে গিয়ে মিশন স্থাপনের ব্যাপারে প্রতিবাদ জানান এবং বলেন বাংলাদেশ নাম নিয়ে লন্ডনে দূতাবাস স্থাপন পাকিস্তানের সার্বভৌমত্বের প্রতি অবমাননাকর। তিনি দাবি করেন অবিলম্বে অনুষ্ঠানটি বন্ধ করা হোক।

৬২. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান, প্রাগুপ্ত*, পৃ. ৯৩

৬৩. *ঐ, পৃ. ৭৮*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৪. মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও মুক্তিযুদ্ধ* গ্রন্থটির ১৯১ পৃষ্ঠায় মাহমুদ শাহ কোরেশীর সাথে একান্ত সাক্ষাতকারের উল্লেখ করে এই তথ্যটি দিয়েছেন।

৬৫. মুহম্মদ নুরুল কাদের, *দুশো ছেষট্টি দিনের স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ২০০০, পৃ. ১৩০

৬৬. ঐ, পৃ. ১৩৯

৬৭. শামসুল হুদা চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩১৪

৬৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৪৮*

৬৯. এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪, পৃ. ৪৭০-৪৭২। ব্যাংকক থেকে গণপ্রতিনিধি ফকির শাহবুদ্দিন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, সিংগাপুর ইত্যাদি দেশ ভ্রমণ করে বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে কী কৌশল গ্রহণ করা যেতে পারে তার উপরে বিস্তারিত প্রতিবেদন পাঠান।

৭০. *দি স্টেটসম্যান্*, ২৫ জুন ১৯৭১, ÔGenocide in the name of Islam.Õ Press Report of the Telegram Sent to Various Members of the Islamic Conference at Jeddah by Acting President of Bangladesh on June 24, 1971. Syed Nazrul Islam, acting President of Bangladesh, today sent a telegram to Tengku Abdul Rahman, General Secretary of the Islamic Conference at Jeddah, to use its influence and authority to put an immediate end to the genocide in Bangladesh. Copies of the telegram have been sent to all members of the Secretariat, including King Feisal of Saudi Arabia, Sheikh Sabban and Sheikh Bin Baz. Mr. Islam also requested them to support the independence demand of Bangladesh and referred to the killings, torture, desecration of mosques, murders of Imams and the burning of the holy Quran. UNI adds: The telegram gave a description of the devastation caused by the Pakistani Army and said, "The warlords of West Pakistan are bent upon perpetrating the worst crimes in human history while trying to cover their guilt under the holy name of Islam."

৭১. J. N. dixit. *Liberation and Beyond, Indio-Bangladesh Relations*- Dhaka: The University Press limited p. 86.

৭২. বাংলাদেশ সরকার, পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ৯ই জুলাই ১৯৭১, "Minute of the Conference held on July 9, 1971 in the Hall Room of Bangladesh Mission in connection with the International Seminar at New Delhi on 14th, 15th and 16th August, 1971. The following gentlemen participate. 1. Dr. A. R. Mallik, Vice Chancellor, Chittagong University. 2. Mr. Khitish Chandra Chowdhury, 12 D Sankar Ghose Lane, Calcutta-6. 3. Mr. Radha Krishnan. 4. Mr. R. I . Choudhury, 1st Secretary, Bangladesh Mission. The following decisions were taken: That a list of 25 eminent people from Bangladesh (Professors, Law years, Politicians, Journalists and Artists) who will attend the Seminar at New Delhi be drawn up immediately for information of the sponsors of the Seminar. The biodatas of these persons should also be obtained and sent to the management of the organisation along with the list much ahead of the Schedule. Dr. A.R. Mallik had kindly consented to draw up the list of Professors and Artists and submit it to the 1st Secretary, Bangladesh Mission along with their bio-datas. As regards the Politicians, Lawyers and Journalists it was suggested by the Ist Secretary that the following persons will be approached with the request for preparing the list with their bio-datas and submit to the Ist Secretary. 1. Mr. Moudud Ahmed, Advocte. 2. Mr.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Taheruddin Thakur, MNA, 2. That articles on the following subjects shall be written immediately and cyclostyled and sent to the sponsors of the Seminar much ahead of the Schedule for necessary action. a. Bangladesh as a viable State (Its manpower's, resources, political social aspirations of the people, etc.) b. Political aspect (a backgrounds story in its true perspective, the economic disparity onslaught on culture of Bangladesh, their impact leading to the present crisis. c. Legitimacy of the Issue. d. Genocide in Bangladesh. e. Refugee influx in India from Bangladesh the humanitarian aspect of the problem. 3. Mr. Radha Krishman and Professor Dr. Ali Hassen agreed to request Mr. Subrata Roy, Adocate, High court, Calcutta, to write the article on Genocide indicated in serial D. Dr. A. R. Mallik kindly agreed to write the article on "Political aspects" on Bangladesh issue indicated in serial (b)

Regarding other articles indicated in serial a, c and e it was decided that a meeting of the 25 eminent persons as indicated in para 3 above be convened above for discussion and entrust the work to individual experts. The Ist Secretary of Bangladesh Mission will convene the meeting at his earliest. 4. That the Press and Information Department of this Mission be requested to procure the following articles and submit to the same to the Ist Secretary Bangladesh Mission. 1. English translation of Sheikh Mujib's historical speech of March 7, 1971 (Fifty copies); 2. Tapes of Sheikh Mujib's speech of 7th March, 1971; 3. Films, Photographs on atrocities, Documentaries etc. on Bangladesh issue; 4. Painting by prominent artists of Bangladesh; 5. Big size Photograph of Sheikh Mujib (5 copies). 6. That a panel of speakers be prepared to project their views on Bangladesh issue for the period from July to August 1971. When selected these gentlemen be informed about it to keep themselves in readiness to move on short notice for tour to different places in India. First Secretary in consultation with Head of Mission will draw up the list. (R.I. Choudhury) First Secretary, Bangladesh Mission"

৭৩. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ১৩ সেপ্টেম্বর ১৯৭১, Minutes of the proceedings of meeting held on 13-9-1971. Present: 1. Director-External Publicity Ministry and Foreign Affairs, Government of India, 2. Director- U.N.'s Desk of India, 3. Director- General, All India Radio, 4. Director-Govt. Publicity Division, 5. Director- Television dealing, 6. Principal Advisor to the Govt. of India, 7. Dy. Director, PIB, Calcutta, 8. Mr. M.A. Samad, Defence Secretary, Govt. of Bangladesh, 9. A.P.A., Bangladesh Mission. President over by the Public Relations Advisor, External Publicity Division, Govt. of Bangladesh. Discussions were held on varied subjects ranging from release of press release up to the mobeilisation of artists, teachers an intellectuals of Bangladesh. 1. (a) About Bulletin: It was suggested that all bulletins including war bulletion from Govt. of Bangladesh should be issued before 3-30 p.m. and should be sent to the Delhi through PIB teleprompters before they are locally released to the press. b. In case and if it is not extremely urgent, issue of bulletin after 3-30 p.m. should be carried over for the next day. c. Mr. M. Maqsood Ali, APA was nominated as liaison from our side to keep

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

contact with Mr. Roth of PIB for this purpose. Both were present in the meeting and have first hand knowledge of the arrangements. 2. Details of necessary documentation to be carried by Bangladesh U.N. Delegation were discussed. Mr. Dikyit made generous contribution by suggesting the necessary articles which are to be carried by the delegation with them. They are: a. Recorded version of leaders. b. History of Bangladesh from December '70 to March'71 c. Documents justifying the struggle and analysing the basic aspect of denial of rights to the peoples of the Bangladesh in course of last 23 years. d. Taped interviews with refugees. e. Tapes of important events in Bangladesh, if any, f. Selective interviews of important foreign dignitaries. g. Film on genocide. h. Mr. Zahir Raihan's documentary films after proper editing. i. Pathans' personal interview film if possible. Director General of A.I.R. has been very kind to place services of an engineer a programme man at the disposal of Mr. Moudud Ahmed from our side to tape these interviews. He also assured us that Mr. D.K. Sen Gupta, Station Director will be available for all possible help in this direction. 3. Artists an intellectuals: Discussion on the aspect of rehabilitation and fruitful utilisation of services of Bangladesh artists and intellectuals were hold in detail. Friends participating in the discussion said that this meeting should not discuss the aspects of teachers and intellectuals; because a separate team is expected to move in Calcutta at a later date to discuss this subject. But the aspect of utilisation of talents of artists were deliberated upon quite exhaustively. The chair gave a detailed background of the activates of Bangladesh artists in India. The following facts were placed before the meeting: a. Names of organisation of artists and intellectuals. The total number is 5. b. The reason for so many organisations were explain. Since the Govt. could not provide subsistence to all artists or utilisation their talent they had to mobilise themselves for enhancement of Bangladesh cause and earning subsistence on the individual initiative. c. The conflicting interest among artists were also explained. But emphasises was laid on the common objective prevalent in all of this i.e. liberation of motherland. Then listening to these backgrounds the meeting wanted to discuss and final out purposeful ways of mobilisation of talent. In course of this discussion, the following suggestions were made by different participants. (ii) Whether there is any possibility of dividing artists into 5 groups such as: (a) A group responsible for holding cultural function for youth camps and refugee camps. (b) A group responsible for entertainment of army and guerilla bases. (c) A group to undertake travel to all the cities of India to propagate and project the Bangladesh issue among the people of India. (d) A group to feed Radio Bangladesh. (e) A group to propagate and project the Bangladesh issue abroad. (iii) Whether Govt. can exercise its influence on this organisation to keep their individual activities under suspension till liberation is complete. Suggestion were offered to plan out the specific

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

projects and proposals with this purpose in end and they assured that fund will be no problem. Prior to doing all these things essential suggestions are: (a) Registration of all artists with the Govt. of Bangladesh. (b) Constitution of a committee to study the possibility of all these proposals under the auspicious of Ministry of Information and broadcasting. It was suggested that our friends should meet the cross action of our artists to day (14.9.71) at 5. p.m in the Mission premises. They are kindly agreeably to the proposals. The entire situation obtaining in Bangladesh came up for review. The question of channalising the detailed information of operation deep inside Bangladesh was also discussed by thy way of a suggestion made in the shape of an Agency. However, no specific decisions were taken in this regard. The meeting was adjourned till 3.p.m. to day. A suggesting was put forward by APA for making Radio Pakistan monitoring report available to us. The Director General A.I.R. kindly noted it and assured all possible help. 1. Ministry of Information and Broadcasting 2. Foreign Minister 3. Foreign Secretary 4. High Commissioner, Calcutta 5. Mr. Samad, Defence Secretary. 6. Deputy Director, P.I.B. Calcutta. 7. Mr. Moudud Ahmed."

৭৪. শামসুল হুদা চৌধুরী, *ঢাকা: একাত্তরের রণাঙ্গন*, ১৯৮২, পৃ. ৬০-৭৫

৭৫. এইচ. টি. ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০

৭৬. Sukumar Biswas, *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005, বঙ্গবন্ধুকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত করার লক্ষ্যে গৃহীত কূটনৈতিক কার্যক্রম সম্পর্কে অভিসন্দর্ভে একটি স্বতন্ত্র অধ্যায় থাকবে।

৭৭. *Ibid.*, p. 78

৭৮. President Nikolai Padogarny's letter to President Yahya Khan dated April 2, 1971. Banglades Document, *op.cit.*, pp. 510-511, পত্রের একাংশে বলা হয়, "We consider it our duty to adress you, Mr. President, on behalf of the Presidium of the Supreme Soviet of the USSR, with an insistent appeal for the adoption of the most urgent measures to stop the blood shed and repression against the population in East Pakistan and for turning to methods of a peaceful political settlement. We are convinced that this would meet the interest of the entire people of Pakistan and the interest of preserving peace in the area. A peaceful solution of the problems that have arisen would be received with satisfaction by the entire Soviet people. In Appealing to you we were guided by the generally recognised humanitarian principles recorded in the universal Declaration of Human Rights and by consent of the welfare of the friendly people of Pakistan." এই পত্রের প্রথম অংশে বলা হয়, "Concern is also caused in the Soviet Union by the arrest and persecution of M. Rahman and other politicians who had received such convincing support by the overwhelming majority of the people of East Pakistan at the recent general elections."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৯. Henry Kissinger, *White House Years*, p. 856 দেখুন, "One proposal, for example, was all-out support for Yahya. এবং "The White House's main plank was to ensure the Security and integrity of Pakistan."

৮০. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol- XI, South Asian Crisis, 1971*, p. 157, "Vast majority believe that US is the only country that can save the situation in East Bengal." See p 53-54,

৮১. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim, *Bangladesh Liberation War and Nixons White House*, *op.cit.*, p.11.

৮২. *Ibid.*

৮৩. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971*, Released by the Office of The Historian, "National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Box 625, Country Files, Middle East, Pakistan, Vol. IV, 1 March 71 "Events in Pakistan today took a major step toward a possible early move by East Pakistan for independence."

৮৪. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asia Crisis, 1971*, Released by the Office of The Historian, Minutes of senior Review group Meeting. Washington, Date: March 6, 1971, p. 5.

৮৫. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asian Crisis, 1971*, Released by the Office of the Historian, Information Memorandum From the Assistant Secretary of State for Near Eastern and South Asian Affaris (Sisco) to Secretary of State Rogers./1/ Washigton, March 15, 1971.

৮৬. "We can drag our feet on that". ঐ পৃঃ 15।

৮৭. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, Vol-XI, South Asian Crisis, 1971*, Released by the Office of The Historian, "Telegram From the department of State to the Embassy in Pakistan, Washington April 17, 1971, Subject: Provisional Government of Bangladesh, Page-43, "Pakistan Ambassador Hilaly told Van Hollen of instructions April 16 that Government of Pakistan wished to bring to USG's attention possible approach by representatives alleging to represent "Provisional Government of Bangladesh." Hilaly said India had permitted establishment provisional government on its territory and was providing financial support. In GOP view, such provisional government exists only in GOI's imagination, is designed to justify Indian intervention, and to aggravate already serious situation. Hilaly said GOP understands that several representatives of so-called Provisional Government already have gone abroad to seek support. One such representative. Zakaria Choudhury, has already arrived in London. According Reuter news report London, April 15, he has held press conference and has been interviewed on BBC, claiming that Bengali separatists control three fourths of East Pakistan. Same news report states that FCO has refused receive Choudhury. Hilaly concluded by saying that it was probable that another representative of Bangladesh would come to Washington in effort see

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

USG officials. In anticipation of this possibility, hs has been asked formally to advise USG that GOP cosidered establishment of Provisional Government as essentially Indisn-sponsored action. Representatives of Bangladesh, who have been charged with treason, have no right to speak regarding Pakistan. On april 13 a representative of the Awami League called on the British Deputy High Commissioner in Calcutta and indicated that "Bangladesh Prime Minister" Tajuddin Ahmed wanted to meet with U.S. and British officials. (Telegram 641 from Calcutta, Aprol 13, ibid., POL 13-9 PAK) The consulate General in Dacca confirmed that Ahmed was a key figure in the Bengali resistance and would probably emerge as political head of the resistance movement. (Telegram 1297 from Dacca, April 14; ibid.) Although British officials agreed to meet with Ahmed, the Department instructed the Consulate in Calcutta to decline to do the same. The depertment fell that such a meeting arranged through the British raised questions about the organization Ahmed represented and could have inplications regarding recognaition of a government of Bangladesh. The department did not preclude, however future meetings with Ahmed or other repcsentatives of the Awami League. (Telegram 62715 to Calcutta, April 14; ibid)."

৮৮. *Archer.k Blood-এর বার্তার প্রতিক্রিয়ায় কিসিঞ্জার গ.ঝ.জ.এ.গ.-এর ১৯ তারিখের মিটিংয়ে তাকে ঢাকা থেকে প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।*

৮৯. রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১ এর দশ মাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ১৫৯

৯০. Communications and statements, Communications received from government of Bangladesh, Letter from the Acting President of the People's Republic of Bangladesh to the President of India, April 24, 1971.

Syed Nazrul Islam, Mujib Nagar, April 24, 1971
Acting President of the
People's Republic of Bangladesh
To
The President of Republic of India,
New Delhi,
Excellency,

Upon the proclamation of the sovereign, independent People's Republic of Bangladesh on March 26, 1971, a Government with Sheikh Mujibur Rahman as its head has been established.

A copy of the Proclamation of Independence, Laws Continuance Enforcement Order and a list of Cabinet Members are enclosed and marked with letters 'A', 'B' & 'C' respectively for favour of your perusal.

The Government of Bangladesh is exercising full sovereignty and lawful authority within the territories known as East Pakistan prior to March 26, 1971, and has taken all appropriate measures to conduct the business of State in accordance with custom, usage and recognised principles of International law.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

In view of the friendly relations that traditionally exist between the people of Bangladesh and that of India, I request Your Excellency's Government to accord immeidate recognition to the People's Republic of Bangladesh. The Government of Bangladesh will be pleased to establish normal diplomatic relations and exchange envoys with a view to further strengthening the ties of frienship between our two countries.

Please accept, Excellency, the assurances of our highest consideration.

(Sd.) Syed Nazrul Islam.

Acting President

(Seal of the Bangladesh Government)

(Sd.) Khandakar Mishtaque Ahmed

Foreign Minister.

৯১. মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪

৯২. Henry Kissinger, *White House Years*, Little, Brown and Company, Boston, Toronto, P. 867 দেখুন, 'With the treaty, Moscow thred a lighted match into powder keg.'

৯৩. মঈদুল হাসান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৫১

৯৪. কংগ্রেস কার্যকরী কমিটির সভায় ইন্দিরা গান্ধী *বলেন,* "Bangladesh has come to stay, there is no power on earth which can alter this position"- *The Financial Times*, Nov. 16, 1971.

৯৫. A.P. November 25th 1971 "In ten days, I might not be here in Rawalpindi. I will be fighting a war."

৯৬. J. N. Dixit. *Liberation and Beyond, Indio-Bangladesh Relations,* Dhaka: The University Press limited, p. 85.

৯৭. *Ibid*, p. 85

৯৮. *Ibid*. p. 87.

৯৯. *Ibid*, p.103.

১০০. *Bangladesh Documents Vol. II. Letter from the Govrnment of Bangla Desh to Prime Minister of India.* December 4, 1971, pp 586-587.

১০১. এইচ.টি. ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬২।

১০২. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ একাত্তর*, চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬৮-৬৭২। দেখুন অরুন্ধতি ঘোষ (আন্ডার সেক্রেটারি, ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, কলকাতা শাখা কার্যলয়) মিস অরুন্ধতি ঘোষ এক সাক্ষাতাকারে বলেছেন, বাঙালি ও পাকিস্তানি কূটনীতিবিদ বের হয়ে আসার জন্য সাহায্য চাইত তারা আমাকে বলত, আমি দিল্লিতে বলতাম। আমাদের মিশনগুলোতে দিল্লি থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, যদি কেউ সহযোগিতা চায় না বলবে না।... আমি প্রতিনিয়ত যে নামগুলো পেতাম তাদের সাহায্য করতাম। তখন প্রচুর তরুণ, বিশেষকরে জুনিয়র কূটনীতিবিদ, যারা বিদেশে ছিল, আমাদের কাছে আসতো এবং আমরা বাংলাদেশের কর্তৃপক্ষের কাছে তাদের সম্পর্কে হ্যাঁ বা না বলার জন্য তালিকা পাঠাতাম। সেখান থেকে তারা নির্বাচন করতো।

১০৩. এইচ. টি. ইমাম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৬৩

১০৪. ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৫. ঐ, পৃ. ১৭২

১০৬. *Bangladesh Documents. Vol-2, External Affairs Government of India*, p. 550) দেখুন- Statment by Prime Minister Indira Gandhi in Parliament on Pakistan Army's Surrender in Bangladesh. December 16, 1971. "We hope and trust that the Father of this new nation, Sheikh Mujibur Rahman, will take his rightful place among his own people and lead Bangla Desh to peace, progress and prosperity. The time has come when they can together look forward to meaningful future in their Sonar Bangla. They have our good wishes. The triumph is not theirs alone. All nations who value the human spirit will recognise it a significant milestone in man's quest for liberty."

১০৭. *Bangladesh Documents Vol. II.* Letter from the Govrnment of Bangladesh to Prime Minister of India November 23, 1971 Mujib Nagar. pp. 583-586.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৃতীয় অধ্যায়
বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

১. ভূমিকা

পাকিস্তান সামরিক জান্তা ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে বাংলাদেশে নৃশংস বর্বরোচিত গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ শুরু করে। গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাঁকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়।

পাকিস্তান বাহিনী কীভাবে বাংলাদেশকে আক্রমণ ও রক্তাক্ত করেছে তার বিবরণ ২৬শে মার্চ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন গণমাধ্যমে রক্তখচিত অক্ষরে ও হৃদয়মথিত কণ্ঠে প্রকাশিত ও প্রচারিত হতে থাকে। তার প্রতিক্রিয়া প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয় প্রবাসী বাঙালিদের এবং বিশ্ব বিবেককে। মিটিং-মিছিলে যেমন রাজপথ আলোড়িত হয়েছে, তেমনি শিল্পীর তুলিতে, সংগীতের মূর্ছনায়, কবিতায়-প্রবন্ধে, উচ্চকিত আলোচনা-অনুষ্ঠান ও গণমাধ্যমে অগ্নিদগ্ধ বাংলাদেশকে উপস্থাপন করেছে নির্দ্বিধায় নিরবচ্ছিন্নভাবে। প্রবাসে প্রতিটি পর্যায় ও স্তরের বাঙালি যে যেখানে পেরেছে সেক্ষেত্রেই জাতীয় স্বাধীনতা ও জাতির স্বার্থে যে অবিস্মরণীয় কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে তা কূটনৈতিক বিশ্বকে প্রভাবান্বিত করে দ্রুততার সঙ্গে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় নানা মাত্রিকতা। বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকারি নীতি বা ভূমিকা যাই থাকুক না কেন যন্ত্রণাদগ্ধ বিবেকের তাড়নায় মুক্তমনের মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী, শ্রেণি-পেশার মানুষ ও রাজনীতিবিদ নীরব থাকতে পারেননি। বিশ্বের সচেতন মানুষ ও সমাজের অগ্রসর চেতনাসম্পন্ন সংবেদনশীল অংশ বাংলাদেশের মানবিক ট্রাজেডি ও স্বাধীনতার পক্ষে দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়েছে যা তুলনাহীন। বিভিন্ন দেশের শাসকগোষ্ঠীর বৈরিতা বা আপাত নিরপেক্ষতার পরিবেশে তারা নানাভাবে যেমন মানবিক সাহায্য-সহযোগিতা করেছে, তেমনি সাংগঠনিক কার্যক্রম পরিচালনায় ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে ব্যাপক জনমত সৃষ্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছে। এভাবে শত শত আলোকিত মানুষের মন্ত্রমুগ্ধ প্রতিবেদন, বেদনার্ত জপমালা আলোড়িত করেছে বিশ্ব-মানবতাকে। মূলত বিপুল ছিন্নমূল ও শোষিত-বঞ্চিত মানুষের মুক্তি ও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জন করার ক্ষেত্র-নির্মাণে প্রবাসী বাঙালিদের দিবস-রজনীর অক্লান্ত উদ্যোগ মুক্তিযুদ্ধের কূটনৈতিক ইতিহাসে এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই অধ্যায়ে সেই স্বর্ণোজ্জ্বল ঘটনাপরম্পরা ও কার্যকরণগত সংশ্লিষ্টতা পর্যালোচনা করা হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২. ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালি

২.১ ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের ১৯৭১ সাল পর্যন্ত ভূমিকা

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে লন্ডনে বাঙালির আগমন, অবস্থান এবং কার্যক্রম উল্লেখযোগ্য না হলেও অনুপস্থিত ছিল না। বাঙালির প্রবাস জীবনের ব্যাপ্তি শতাব্দী জুড়ে এবং তাদের সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ব্রিটিশ-ভারতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। বহুকাল ধরেই পূর্ব বাংলার জাহাজিরা লন্ডনে বসবাস করে আসছেন। ১৮৬৫ সালে যুক্তরাজ্যে ভারতীয়রা 'লন্ডন ইন্ডিয়ান সোসাইটি' নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে মূলত প্রবাসীদের দাবি-দাওয়া উত্থাপনের জন্য। পরবর্তী লক্ষণীয় যে ব্রিটিশ হাউজ অব কমন্‌সে যে সকল ভারতীয় নির্বাচিত হন তাদের লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ; এক, প্রবাসীদের সমস্যা লাঘব, ও দুই, ভারতীয়দের দাবি সরাসরি পার্লামেন্টে উপস্থাপন করা।[১] এসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে পূর্ববাংলার জাহাজি নাবিকদের বিশেষ ভূমিকা বিদ্যমান।

পূর্ববঙ্গের প্রবাসী বাঙালি বিশেষ করে জাহাজি নাবিক আবদুল মান্নান, আলী মাস্টার, শাহ আব্দুল মজিদ কোরাইশী, মেহনাজ উদ্দিন প্রমুখ ভারতীয় রাজনীতিকদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেন। তাঁরা ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে এবং রাজনীতিবিদ কৃষ্ণ মেননের সঙ্গে স্বরাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সংশ্লিষ্ট ছিলেন।[২] উনিশ শতকের চল্লিশ দশকে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দাবি জোরদার করলে লন্ডনে 'স্বরাজ আন্দোলন' পরিত্যাগ করে পূর্ব বাংলার প্রবাসীরা ১৯৪৪ সালে গঠন করে যুক্তরাজ্য মুসলিম লীগ শাখা।[৩]

১৯৪৬ সালে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ লন্ডনে আগমন করলে তাঁকে ব্যাপক সম্বর্ধনা জানানো হয়। তিনি হোবর্ণ হলে জনসভা করেন। সেখানে প্রায় এক হাজার শ্রোতা ছিলেন। তার মধ্যে তিন. চতুর্থাংশ ছিলেন বাঙালি। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠায় প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর প্রবাসী বাঙালিদের পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদানে লন্ডনের হাই কমিশনে পশ্চিম পাকিস্তানি অফিসারগণের 'দুর্ব্যবহার' ও 'দূরে ঠেলে রাখা' নীতির ফলে বাঙালিরা হয়রানি ও বৈষম্যের শিকারে পরিণত হয়। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী 'জাহাজ থেকে লাফিয়ে পড়া' নাবিকদের নগদ জামানত ব্যতীত আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ভিসা প্রদানে গড়িমসি, হয়রানি ও অস্বীকৃতি প্রবাসী বাঙালিদের বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে তারা পাকিস্তানের হাই কমিশনের বিরুদ্ধে প্রচারণা শুরু করে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে চলে যায় বিক্ষুব্ধ বাঙালিদের হাতে পাকিস্তান হাই কমিশনের লেবার এটাচি প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হয়। প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে পাকিস্তানি শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। এই পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৫০ সালে 'পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' গঠিত হয়। উক্ত সংগঠন গঠিত হবার পরপরই বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, কভেন্ট্রি, বেডবোর্ড, লীডস, লুটন, শেফিল্ডসহ অনেক জায়গায় বাঙালিদের মধ্যে এ-ধরনের সংগঠন গড়ে ওঠে।[৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাসী বাঙালিরা সবসময় স্বদেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড ও ঘটনাবলিতে আলোড়িত হয়েছে। স্বদেশে সংঘটিত ঘটনাবলি ও আদর্শিক ধারা লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের উদ্বেলিত করেছে। পূর্ব পাকিস্তানি বাঙালি ছাত্ররাই বেশিরভাগ এসব আন্দোলন ও কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছে। পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ পূর্ববঙ্গে বাংলাভাষার পরিবর্তে উর্দুভাষাকে চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে। ১৯৫২ সালে মাতৃভাষা আন্দোলনে বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রমিছিলে গুলি হয় এবং অনেকেই শাহাদাৎ বরণ করেন। এ ঘটনায় ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিরা ভাষা সংগ্রামে জড়িয়ে পড়ে। এ সময় থেকেই প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনা স্ফুরিত হয়। পাকিস্তান শাসক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে স্বদেশের মতো প্রবাসেও অসন্তোষ ও আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। ১৯৫৪ সালে নির্বাচনকে সামনে রেখে পূর্ববঙ্গে মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে ১৯৫৩ সালের ১৩ই নভেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। যুক্তফ্রন্টের নেতৃত্বে ছিলেন শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। নির্বাচনে মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয়। পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়। কেন্দ্রীয় শাসকগোষ্ঠী বাঙালির দ্ব্যর্থহীন গণরায়কে নসাৎ করার লক্ষ্যে চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্র করে। রাজনৈতিক চক্রান্তে পূর্ব বাংলায় যুক্তফ্রন্টের বিশাল বিজয় ও জনগণের রায় বানচালের জন্য চন্দ্রঘোনা পেপার মিলে ও আদমজীতে দাঙ্গা বাধিয়ে রাষ্ট্রীয় 'নিরাপত্তা' ও 'জনবিশৃঙ্খলা' এবং 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' কর্মকাণ্ড পরিচালনার অজুহাতে কেন্দ্রীয় শাসন বলবৎ করা হয়।

কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৫৪ সালের ১৯ মে, পূর্ববাংলায় যুক্তফ্রন্ট সরকার বাতিল এবং প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হককে 'বিশ্বাসঘাতক' আখ্যা দিয়ে গৃহবন্দি করে। জেনারেল ইস্কান্দার মীর্জা পূর্ববঙ্গের গভর্নর নিযুক্ত হন। জারি করা হয় ৯২ (ক) ধারা। যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী ও আওয়ামী মুসলিম লীগ নেতা শেখ মুজিবুর রহমানসহ প্রায় তিনহাজার নেতা-কর্মী কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। কেন্দ্র-নিযুক্ত গভর্নর ইস্কান্দার মীর্জা করাচি থেকে ঢাকা বিমানবন্দরে আগমনের পর সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে সদম্ভে বলেন, "মওলানা ভাসানী এ দেশে ফেরত এলে তাকে গুলি করে হত্যা করার জন্যে আমি আমার শ্রেষ্ঠ হাবিলদারকে বিমান বন্দরে পাঠাবো।" সে সময় আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি ও মজলুম জননেতা আবদুল হামিদ খান ভাসানী বিশ্বশান্তি পরিষদের সম্মেলনে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধিদের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। সম্মেলন থেকে দেশে ফেরার পথে তিনি লন্ডনে যাত্রাবিরতি করেন। ব্রিটেনে তাঁকে নির্বাসিত জীবন কাটাতে হয়। তিনি লন্ডনসহ বিভিন্ন স্থানে সভা-সমাবেশ করেন। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর নিষ্ঠুর-নির্মম, শাসন-শোষণ ও বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরেন। বাঙালিদের বুঝিয়ে বলেন দেশের অবস্থা, 'ইসলাম' আর 'মুসলমানের' নামে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বেঈমানি আর মোনাফেকির স্বরূপ, সারা পাকিস্তানে গণতন্ত্রের নামে স্বৈরতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা, তুলে ধরেন পূর্ববঙ্গের মানুষের প্রতি নিদারুণ অত্যাচার, নির্যাতন আর শোষণের চিত্র। বস্তুত মওলানা ভাসানীর দীর্ঘ আট মাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিলাতে অবস্থানের ফলে প্রবাসী বাঙালিসমাজ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতির হালচাল সমন্ধে ওয়াকিবহাল হন। এ সময়ই প্রবাসে বাঙালির স্বজাত্যবোধ দৃঢ় হয়। শুরু হয় এর বাস্তব রূপায়নের মানসিক প্রক্রিয়া, স্বাধীন পূর্ববাংলা রাষ্ট্র স্থাপনের চিন্তাধারা। প্রবাসী বাঙালি জনগণ উপলব্ধি করে এক রাষ্ট্রের হলেও তারা এক জাতি নয়, স্বাধীন নাগরিক নন, স্বদেশে তারা পরবাসী।

১৯৫৭ সালে 'পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন' এর বাঙালি কর্মকর্তাদের অনুরোধে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নির্দেশে 'জাহাজ থেকে লাফিয়ে' পড়ে যে সমস্ত বাঙালি যুক্তরাজ্যে প্রবাসী ছিল, এমন ত্রিশ হাজার বাঙালিকে নগদ অর্থ ও জামানত ব্যতিরেকে আন্তর্জাতিক পাসপোর্ট ও ভিসা ইস্যু করা হয়। সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালে ক্ষমতা দখল করলে পুনরায় তা বন্ধ হয়ে যায়। ব্রিটেনে বাঙালিরা সামরিক শাসন বিরোধী আন্দোলন শুরু করে। ১৯৬০ সালে পূর্ব পাকিস্তানের বামঘেঁষা ছাত্ররা 'পূর্বসূরি' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে তোলে। অকাট্য তথ্য, উপাত্ত সম্বলিত "অসন্তুষ্ট পূর্ব পাকিস্তান" নামে পাকিস্তান সরকারের শাসন, শোষণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সিরিজ প্রকাশনা বের করে।

১৯৬০ সালে ব্রিটেনে রেস্টুরেন্ট মালিকদের মধ্যে ঐক্য ও সমন্বয় সাধনের জন্য গঠিত হয় 'পাকিস্তান ক্যাটারারস এসোসিয়েশন'। ইমপ্লয়মেন্ট ভাউচার সিস্টেম চালু হওয়ার পর রেস্টুরেন্টের মালিকগণ তাদের কাজের জন্য বহু বাঙালিকে ব্রিটেনে নিয়ে আসেন। রেস্টুরেন্ট মালিকদের সঙ্গে ব্রিটিশ রাজনৈতিক দলের যোগসূত্র ও সখ্যতা গড়ে ওঠে। ৬০ দশকের প্রথম দিকে ব্রিটেনের বাঙালি ছাত্ররা 'পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফেডারেশনের' নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৬২ সালে ঢাকায় ছাত্র আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটেনের ছাত্ররাও মিটিং, বিক্ষোভ মিছিল করে সামরিক শাসক জেনারেল আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলে।

১৯৬৩ সালে ১৩ ও ১৪ এপ্রিল লন্ডনের রয়েল হোটেলে পাকিস্তান ন্যাশনাল কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। 'পাকিস্তানি ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশন'সহ ২২টি কমিউনিটি সংগঠন এই সম্মেলনে যোগদান করেন। এই বছরই ৪৩টি সংগঠনসহ স্টুডেন্ট ফেডারেশন ন্যাশনাল-এর কনভেনশন ও বার্ষিক সাধারণ সভা বার্মিংহামে অনুষ্ঠিত হয়। তাছাদ্দুক আহমেদ, নুরুল ইসলাম সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। এভাবে যুক্তরাজ্যের পাকিস্তানি সংগঠনসমূহের পুরো নেতৃত্ব বাঙালিদের নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত এই পরিস্থিতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।[৫] পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা 'পাকিস্তান স্টুডেন্ট ফেডারেশন'-এর নেতৃত্বে থাকলেও ১৫ চেসহাম ... অবস্থিত ছাত্রদের হোস্টেলটি পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্রদের দখলে ছিল। পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্ররা উক্ত হোস্টেলে সমতার ভিত্তিতে আসন বণ্টণ ও থাকার বিষয়ে দাবি তুললেও তার কোনো সুরাহা হয়নি। এক্ষেত্রে 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস' নামে একটি স্বতন্ত্র আবাস স্থাপন করার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্য ছাত্ররা এগিয়ে আসে। এর সঙ্গে দু'টি বিষয়ে তারা জোর দেয়; এক, এই স্বতন্ত্র হোস্টেলের মাধ্যমে বাঙালিদের জন্য ছাত্রাবাস; দুই, সামাজিক ও রাজনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনার কেন্দ্র নির্মাণ। পাকিস্তান হাই কমিশনার আগা হিলালী পাকিস্তান থেকে সরকারি বৃত্তি নিয়ে আসা ছাত্রদের উপর প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন এবং পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্রদের এসব কর্মকাণ্ডকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' আন্দোলন হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং দেশে গেলে তাদের গ্রেফতার করা হবে বলে হুমকি প্রদান করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের অধিকাংশ ছাত্র ও কমিউনিটি নেতৃত্ব হুমকি উপেক্ষা করেন। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি ব্যবসায়ী, শ্রমিক ও ছাত্ররা মিলে ১৯৬৪ সালে ৯১ হাইবুরি হীলে ১০ হাজার পাউন্ড মূল্যে ১৩ কক্ষবিশিষ্ট একটি বাড়ি ক্রয় করে প্রতিষ্ঠা করেন 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস'।[৬] এই সময় কমিউনিটি নেতৃত্ব ও ছাত্র নেতৃত্বের মধ্যে সিদ্ধান্ত হয় 'পাকিস্তান ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের' নেতৃবৃন্দ 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস' কেন্দ্রিক রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে নিজেদের জড়িয়ে না ফেলে প্রবাসী বাঙালিদের দাবি-দাওয়া আদায়ের প্রশ্নে পাকিস্তান হাই কমিশনের সঙ্গে লিঁয়াজো বজায় রাখবে।[৭]

১৯৬৫ সালে প্রবাসী বাঙালিরা সভা-সমিতি করার জন্য ৩৯ ফোরনিয়ার স্ট্রিটে একটি বাড়ি ক্রয় করেন এবং ভাষাশহিদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধার নিদর্শন স্মরণে এর নাম রাখেন 'শহিদ ভবন'। এ সময়ে লন্ডন বাংলা একাডেমী নামে একটি সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান জনাব তাছাদ্দুক আহম্মদের নেতৃত্বে গঠিত হয়। এ সংগঠনটির সেক্রেটারি হন ড. আলীম চৌধুরী, যাঁকে মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় স্বাধীনতাবিরোধী চক্র নির্মমভাবে হত্যা করে। বিলাত প্রবাসী বামপন্থি নেতা জাকারিয়া চৌধুরী শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন। শেখ মুজিবুর রহমানের স্পষ্ট মূল্যায়ন হলো পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী কখনো বাঙালিদের অধিকার মেনে নেবে না। স্বাধীনতা ব্যতীত বাংলার মানুষের মুক্তি নেই। সেই লক্ষ্যে জাকারিয়া চৌধুরী, তাছাদ্দুক আহম্মদ, ড. কবির, ড. মনোয়ার হোসেন ও আজিজুল হক লন্ডনে 'ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্ট' গঠন করেন এবং কিউবান দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু ১৯৭০ সালে বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রবল ধারা ও নির্বাচনী প্রচারণায় ইস্ট বেঙ্গল লিবারেশন ফ্রন্টের কার্যক্রম তলিয়ে যায়।

১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা ঘোষণা করলে প্রবাসী বাঙালিরা ৬ দফা ছাপিয়ে যুক্তরাজ্যে তা প্রচারের ব্যবস্থা করে এবং বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে তা পৌঁছে দেওয়া হয়। এ সময় চীন মতাদর্শের সমর্থক কতিপয় প্রবাসী ছাত্র ৬-দফাকে সি. আই. এ.- এর দলিল বলে উল্লেখ করে এবং বিরোধীতা করে।[৮]

১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করে। ২৯ জুলাই মামলার দিন ধার্য হয়। এ খবর ছড়িয়ে পড়লে প্রবাসী বাঙালিরা প্রচণ্ড বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। ১৪ই জুলাই বিক্ষোভকারী ছাত্ররা পাকিস্তান হাই কমিশন দখলের চেষ্টা করে এবং শেখ মুজিবের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্বের প্রতি দ্ব্যর্থহীন আস্থা প্রকাশ করে। আগরতলা মামলা পরিচালনার ব্যাপারে সর্বপ্রকার সাহায্যের জন্য 'ডিফেন্স কমিটি' গঠিত হয়। সুলতান মাহমুদ শরীফ এই কমিটির অফিস পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই কমিটির পক্ষ থেকে লন্ডনে বিভিন্ন সংবাদপত্র, পার্লামেন্ট সদস্যর সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা হয়। প্রবাসী বাঙালিরা 'ডিফেন্স কমিটি' তহবিলে সাধ্যমত দান করেন। এই অর্থ হতে কুইন্স কাউন্সিল ও শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য স্যার টমাস উইলিয়ামকে মামলা পরিচালনার জন্য ঢাকায় পাঠানো হয়। আগরতলা মামলার ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত প্রকাশিত হয়ে পড়লে গণবিক্ষোভ চরম পর্যায় উপনীত হয়। প্রবাসী বিক্ষুব্ধ বাঙালিরা শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে লন্ডনে পাকিস্তান হাই কমিশনে হামলা করে। হাই কমিশনার নিরাপত্তার জন্য পুলিশ ডাকতে বাধ্য হন।[৯] গণঅভ্যুত্থানের এক পর্যায়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন। ৫ই মার্চ, ১৯৬৯ পাকিস্তান সেনাপ্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খান প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশের বিরাজমান অবস্থায় হতাশা প্রকাশ করে সামরিক শাসন জারি করার জন্য চাপ দেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তাকে ১০ মার্চ বিরোধী দলের সঙ্গে বর্তমান রাজনৈতিক অবস্থার উন্নয়নে অগ্রগতির সম্ভাবনা ঝুলিয়ে রাখেন। আহুত গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হলে তীব্র গণআন্দোলনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের পতন হয়। ক্ষমতা দখল করেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। সামরিক শাসন জারি করা হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৯ সালে ২৪শে অক্টোবর লন্ডনে যান। লন্ডনে তাঁর আগমন ও কার্যক্রম পর্যালোচনায় তিনটি দিক থেকে ঐতিহাসিক ও তাৎপর্যপূর্ণ। এক, লন্ডনে প্রবাসী বাঙালি, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য, নেতৃবৃন্দ এবং গণমাধ্যমের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ; দুই, যুক্তরাজ্যে বাঙালি জাতীয়তাবাদের চেতনায় উজ্জীবিত জনগোষ্ঠীকে রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাঠামোয় শক্তিশালীকরণ; এবং তিন, বাংলাদেশের মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নে ও গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী বাধা সৃষ্টি করলে বহির্বিশ্বের, বিশেষকরে প্রতিবেশী দেশ ভারতের সমর্থন ও সাহায্য পাওয়া যাবে কী না তা নিশ্চিত হওয়া। এ সময় ভারত সরকারের প্রতিনিধির সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়।[১০]

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান লন্ডনের বর্ষীয়ান নেতা গাউস খান, মিনহাজ উদ্দিন, নেছার আলী, তৈয়বুর রহমান, হাফিজ মজির উদ্দিন, বার্মিংহোমের আফরোজ মিয়া ও জমশেদ মিয়া, ম্যাঞ্চেস্টারের আব্দুল মতিন, নজির উদ্দিন এবং মকদ্দস বখ্‌ত প্রমুখকে বিলাতে আওয়ামী লীগ গঠন করার নির্দেশ দান করেন। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে বিলাতে আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। সংগঠনের নাম দেওয়া হয় আওয়ামী লীগ, যুক্তরাজ্য শাখা।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান যুক্তরাষ্ট্রে যাওয়ার পথে প্রবাসী বাঙালিরা লন্ডনে ক্লারিজেস হোটেলের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন। এক পর্যায়ে তিনি বিক্ষোভকারীদের বক্তব্য জানতে বেরিয়ে আসলে সুলতান শরীফ ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করেন আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী হলে শেখ মুজিবকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে কি না? জবাবে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, পাকিস্তানকে ধ্বংস করার সুযোগ আমি কাউকে দেব না। যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানকে রক্ষা করবো।[১২]

২.২ ব্রিটেনের প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা, মার্চ-এপ্রিল-মে (১৯৭১)

১৯৭১ সালের ১লা মার্চ থেকে বাংলাদেশে যে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয় তার সমর্থনে ব্রিটেনে বসবাসকারী বাঙালিগণ ৭ মার্চ রবিবার লন্ডনে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিলের আয়োজন করেন। ধর্ম, দল বা রাজনৈতিক মতামত নির্বিশেষে সকল শ্রেণির বাঙালি সকাল দশটায় ব্রিটেনের সকল প্রান্ত থেকে দলে দলে কোচ, ভ্যান, কার এবং রেলযোগে লন্ডনের হাইড পার্ক কর্নারে সমবেত হয় ও পার্কে পৌঁছাবার সঙ্গে সঙ্গে জনতা 'স্বাধীন বাংলাদেশ জিন্দাবাদ', 'জয় বাংলা', 'খুনী ইয়াহিয়ার মুণ্ডু চাই' ইত্যাদি স্লোগানে পশ্চিম লন্ডনের এই প্রান্তকে প্রকম্পিত করে তোলে। সভায় উপস্থিত জনতা পরম শৃঙ্খলার সঙ্গে পার্ক লেইন রাজপথ ধরে পাকিস্তান হাই কমিশন অভিমুখে যাত্রা করে। এই সময় রাস্তার সমস্ত যানবাহন বন্ধ হয়ে যায় এবং পুলিশের তত্ত্বাবধানে স্লোগান দিতে দিতে মিছিলটি হাই কমিশন অফিস প্রাঙ্গণে সমবেত হয়। দূরভিসন্ধিমূলক মনোভাব নিয়ে পাকিস্তানি হাই কমিশনার আগে থেকে পুলিশ ডেকে বাধার সৃষ্টি করে এবং বন্ধ করে দেন হাই কমিশন ভবনের দু'পাশের প্রবেশ পথ। ফলে জনতা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। হাই কমিশনার পুলিশ বেষ্টনে থেকে জনতাকে কিছু বলার চেষ্টা করেন। ক্ষিপ্ত জনতা হাই কমিশনারকে ব্যানারের কাগজ এবং দণ্ড ইত্যাদি নিক্ষেপ করে তার এই দূরভিসন্ধি ও দুষ্কর্মের প্রতিবাদ করে। পুলিশের সঙ্গে ধস্তাধস্তির ফলে কয়েকজন বিক্ষোভকারী আহত হন এবং একজনকে হাসপাতালে পাঠাতে হয়। ইংল্যান্ডের ইতিহাসে অশ্বেতাঙ্গদের এত বড় বিক্ষোভ মিছিল এই প্রথম। আনুমানিক দশ হাজারের অধিক বাঙালি এই মিছিলে অংশগ্রহণ করে এ কথা প্রমাণ করে দেন যে, তাদের আর কোনোভাবেই দাবিয়ে রাখা যাবে না।[১৩]

৭ই মার্চে বঙ্গবন্ধুর রেসকোর্সে ভাষণের পরই স্বাধীনতার জন্য লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিরা প্রকাশ্যে স্বাধীনতার মন্ত্রে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন। ছাত্রনেতা শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও আফরোজ আফগান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটের পাশে অনশন ধর্মঘটে অংশ নেন। লেবার পার্টির পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোর এ অনশন ভঙ্গ করান। ১৪ই মার্চ যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ লন্ডনের হাইড পার্কে সমাবেশ শেষে পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাইকমিশনে গিয়ে একটা স্মারকলিপি প্রদান করে। এ সমাবেশের পর ইংল্যান্ডের প্রায় ১৫টি শহরে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি গঠিত হয়।[১৪] এ সময় লন্ডনের স্বাধীনতাকামী প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে 'বিদ্রোহী বাংলা', 'নিউজলেটার' ও 'বাংলাদেশ টুডে' প্রকাশিত হয়। এছাড়া প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিরোধী আন্দোলন চলাকালে প্রকাশিত 'জনমত' পত্রিকা মুক্তিযুদ্ধকালে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলন, সংগ্রাম, সভা-সমাবেশ, বিক্ষোভ, বক্তৃতা-বিবৃতি, প্রবন্ধ-প্রতিবেদন পর্যালোচনায় স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক সমর্থন, জনমত গঠন ও সহযোগিতার বিষয়টি প্রাধান্য পেয়েছে যা কূটনৈতিক বিশ্বে ইতিবাচক প্রভাব দৃঢ় করেছে। ২৬শে মার্চের পূর্বেই বাংলাদেশের প্রতিটি এলাকায় বঙ্গবন্ধুর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্তৃত্ব প্রয়োগের তাৎপর্য ছিল মূলত বিদেশি সরকারের সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি প্রদানের আবশ্যকতার চেয়েও অনেক বেশি।[১৫] বাংলাদেশে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক গণমাধমে তিনি এই বার্তা দিতে চেয়েছেন যে, গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে তিনি স্বাধীন স্ব-শাসন প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাবেন। বাধা দিলে স্বাধীনতা যুদ্ধে নেমে পড়তে দ্বিধা করবেন না।

১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চ রাতে ঢাকায় সংঘটিত পাকিস্তানি বাহিনীর গণহত্যার সংবাদ লন্ডনে পৌঁছলে ২৬শে মার্চ লন্ডনে অধ্যয়নরত শতাধিক ছাত্র পাকিস্তান হাই কমিশন ভবনের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।[১৬] বঙ্গবন্ধু কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার পর বাঙালিদের সহমর্মিতা ও সমর্থনের সক্রিয়তা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে নব উদ্যমে দৃশ্যমান হয়। ২৮শে মার্চ উত্তর-পশ্চিম লন্ডনে অবস্থিত 'ইস্ট পাকিস্তান হাউসে' প্রায় ৮০০ জন বাঙালির এক সভা অনুষ্ঠিত হয়।[১৭] সভার শেষে প্রদৃপ্ত চেতনায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলিত হয়। একই দিনে বার্মিংহামের স্মল হিথ পার্কে আরও একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বহনকারী ব্যানারে 'পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' কথাগুলি বড় বড় অক্ষরে লেখা হয়।[১৮] এই সভাটিকে 'শপথ-সভা' নামকরণ করা হয়। এই সভার প্রচারপত্রের একাংশে বলা হয় :

বাংলার সাড়ে সাত কোটি মানুষ কামান, বন্দুক আর বোমার সামনে প্রাণ দিয়ে চালিয়ে যাচ্ছে মুক্তিযুদ্ধ। 'বাংলাদেশ' আর তার সাড়ে সাত কোটি লোককে বাঁচাতে হলে চাই অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ আর তার জন্য চাই আপনার আমার সাহায্য। আসুন, শপথ সভায় যোগ দিয়ে আমাদের এই জীবনমরণ সংগ্রামকে সার্থক করে তুলি। এই সভাতে দলে দলে যোগ দিয়ে স্বাধীন বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে বাংলার এই স্বাধীনতা আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তুলুন।[১৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে আন্দোলন-সংগ্রাম পরিচালনার উদ্দেশ্যে মার্চ মাস থেকেই ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও অন্যান্য দেশে বাঙালিদের বিভিন্ন সংগঠন গড়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ওঠে। পরিশিষ্ট-৩.ক-এ সংগঠনগুলির নাম, ঠিকানা ও সংগঠকদের পরিচয় উল্লেখ করা হয়েছে।

২৮ মার্চ পশ্চিম লন্ডনে লেডবেরি রোডে জনৈক মিসেস জেবুন্নেসা বখ্‌তের বাড়িতে নেতৃস্থানীয় বাঙালি মহিলাগণ সমবেত হয়ে 'বাংলাদেশ মহিলা সমিতি' গঠন করেন।[২০] মহিলা সমিতি বিভিন্ন সভা ও সম্মেলন আয়োজনের মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টি করে। তাছাড়া মহিলা সমিতির সদস্যগণ প্ল্যাকার্ড ও পতাকা তৈরি করেন। ভারতের শরণার্থী শিবিরের শিশুদের জন্য অর্থ সংগ্রহের কাজও করেছেন মহিলা সমিতির সদস্যগণ।

২৯শে মার্চ লন্ডনে 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নামক একটি সংগঠন গঠিত হয়। এই সংগঠনের ১১ সদস্যবিশিষ্ট কার্যকরী পরিষদের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন যথাক্রমে গাউস খান ও শেখ আব্দুল মান্নান। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধি দল ব্রিটিশ পররাষ্ট্র দপ্তরে চার দফা দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি পেশ করেন। দাবিগুলি ছিল নিম্নরূপ :[২১]

ক. ব্রিটেন কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান,

খ. জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভের লক্ষ্যে বাংলাদেশের পক্ষে ব্রিটেনের উদ্যোগ গ্রহণ করা,

গ. ব্রিটেনে তৈরি অস্ত্র-শস্ত্র পাকিস্তান বাহিনীকে সরবরাহ না করা, এবং

ঘ. পাকিস্তান বাহিনীর গণহত্যা বন্ধের জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর ব্রিটেনের রাজনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা।

এই চার দফা দাবি মূলত প্রবাসে বাঙালিদের কূটনৈতিক তৎপরতার সমন্বিত আকর।

২৯শে মার্চ পিটার শোর এম. পি. হাউজ অব কমন্‌সে পূর্ব বাংলার গণহত্যা বন্ধ, সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার, শেখ মুজিবুর রহমান ও তার অনুসারীদের উপর পাকিস্তানি অত্যাচার বন্ধে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর চাপ প্রয়োগ করেন।[২২] বাংলাদেশ আন্দোলনের সমর্থনে ৩০শে মার্চ 'নিউজ লেটার' নামক একটি ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এটি প্রকাশ করেন তাছাদ্দুক আহম্মদ এবং তাঁর স্ত্রী রোজমেরী। এর সম্পাদক ছিলেন ফরিদ জাফরী। আন্তর্জাতিক সমর্থন লাভ, প্রবাসী বাঙালিদের মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে উদ্বুদ্ধ করা, মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রকাশ ইত্যাদি ছিল এই পত্রিকাটির লক্ষ্য।[২৩]

৪ঠা এপ্রিল দুপুরে বাঙালি ছাত্রদের উদ্যোগে লন্ডনের হাইড পার্কে একটি এবং বিকেলে ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে প্রায় দশ হাজার লোকের একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এই জনসভায় অন্যান্যদের মধ্যে 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশে'র কেন্দ্রীয় কমিটির জেনারেল সেক্রেটারি শেখ আব্দুল মান্নান, সুলতান মাহমুদ শরীফ, আব্দুল মতিন, সাখাওয়াত হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু বক্তৃতা করেন। সভাপতিত্ব করেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গাউস খান।[২৪] এসব জনসভার মূল লক্ষ্য প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে ঐক্য দৃঢ় করা, স্বাধীন বাংলাদেশকে বিশ্বে উপস্থাপন ও মুক্তিযুদ্ধে সর্বোতভাবে সাহায্য করার অঙ্গীকার।

২৩শে এপ্রিল গাউস খানের নেতৃত্বে কয়েক শ' বাঙালি লন্ডনে চীনা দূতাবাসে গিয়ে পাকিস্তানের প্রতি চীনের সমর্থন প্রত্যাহারের আবেদন জানায়।[২৫]

১৬ই এপ্রিল, ১৯৭১ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষার প্রচেষ্টা চালানোর জন্য মার্কিন সিনেটরদের প্রতি ব্রিটেনের বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট উদাত্ত আহ্বান জানায়।[২৬] বাংলাদেশের গণহত্যা বন্ধের প্রচেষ্টা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থনদানের জন্য ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্যদের প্রতি বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট আহ্বান জানায়।[২৭] বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ইন স্কটল্যান্ড কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরের প্রতি আবেদন জানিয়ে প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় ১৯শে এপ্রিল ১৯৭১।[২৮]

কেন্দ্রীয়ভাবে কার্যকরী কমিটি গঠনের পর শুরু হয় পরিকল্পিতভাবে সমগ্র ব্রিটেনে জনসংযোগের কাজ। ব্রাডফোর্ড বার্মিংহামে স্থানীয় কার্যকরী কমিটির উদ্যোগে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। মোশারফ হোসেন জোয়ারদার, জাকারিয়া চৌধুরী ও শেখ আব্দুল মান্নান প্রমুখ বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে বিভিন্ন জনসভায় বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে প্রচারণায় অংশ নেন।

প্রবাসী বাঙালিদের তৎপরতা, ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যমগুলোর ব্যাপক প্রচারণা ও মানবিক রাজনৈতিক কারণে ব্রিটেনের অনেক রাজনীতিবিদ বাংলাদেশের পক্ষে বিশেষকরে পাকিস্তানে সামরিক বাহিনী কর্তৃক বাঙালি নিধনের প্রতিবাদ জানায়। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্য জন স্টোনহাউস, ব্রুস ডগলাসম্যান ও পিটার শোর বাংলাদেশের সমর্থনে নিরন্তর কাজ করেন। তাঁদের প্রচেষ্টায় প্রায় ৩০০ জন পার্লামেন্ট সদস্য বাংলাদেশে অবিলম্বে রক্তক্ষয় বন্ধে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্রিটিশ সরকারের কাছে দাবি জানায়। ফলে ১৪ই মে পার্লামেন্টে বাংলাদেশের গণহত্যার বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা হয়। ডানপন্থি নেতা স্যার জেরল্ড নেবারো ও রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি ও বামপন্থি নেতা ইয়ান মিকাডো ও এড্রু ফাউল্‌স বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। অবিলম্বে বাংলাদেশের রক্তক্ষয় বন্ধ করতে পার্লামেন্টের তিনশত সদস্য ব্রিটিশ সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।[২৯]

ব্রিটেনের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিরা পার্লামেন্টে গিয়ে সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশ পরিস্থিতি তুলে ধরেন। কার্যকরী কমিটির উদ্যোগে অক্সফোর্ড, গ্লাসগো, স্কটল্যান্ড, ম্যানচেষ্টার, শেফিল্ড ও লীডস প্রভৃতি শহরে জনসভা করে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করা হয়। প্রবাসী বাঙালিদের পাশাপাশি কয়েকজন ইংরেজ তরুণ-তরুণী 'অ্যাকশন বাংলাদেশ' নামে একটি কমিটি গঠন করে। পলকনেট ও ম্যারিয়টা এ সংগঠনের নেতৃত্ব দেন।[৩০] পাকিস্তানের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের জন্য বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার উদ্দেশ্যে ১লা আগস্ট (রবিবার) লন্ডনের ট্র্যাফালগার স্কোয়ারে পলকনেটের নেতৃত্বে গঠিত অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে এক বিরাট জনসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য করেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, লর্ড ব্রকওয়ে, অশোক সেন (পরবর্তীকালে ভারতের আইনমন্ত্রী), পিটার শোর, রেড প্রেন্টিস, ব্রুস ডগলাসম্যান, জন স্টোনহাউস, লর্ড গিফোর্ড, পল কনেট, বেগম লুলু বিলকিস বানু ও গাউস খান প্রমুখ।[৩১]

প্রবাসী বাঙালিরা সমগ্র যুক্তরাজ্যে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কেও জনমত গঠনের কাজে আত্মনিয়োগ করেন। প্রখ্যাত সংবাদিক এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস-এর চাক্ষুষ বিবরণ 'গণহত্যা' শিরোনামে ছাপা হয়। শিহরিত হয় সমগ্র বিশ্ব ২৫শে মার্চ বাংলাদেশে আত্মগোপন করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী নৃশংস আক্রমণ ও হত্যাকাণ্ডের প্রত্যক্ষদর্শী ড্রিং-এর মর্মস্পর্শী প্রতিবেদন দি ডেইলি টেলিগ্রাফে প্রকাশিত হয়। এ ধরনের চাঞ্চল্য সৃষ্টিকারী রিপোর্টসমূহ বিশ্বের বিভিন্ন সংবাদপত্র, টিভি ও রেডিওর মাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। এর ফলে পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ববঙ্গে গণহত্যা ও জঘন্য মানবতাবিরোধী কার্যক্রম সম্পর্কিত সংবাদ লুকানোর চেষ্টা ব্যর্থ হয়। একই সময়ে প্রফেসর রেহমান সোবহান লিখিত বাংলাদেশ-সংকটের বিস্তারিত বিবরণ ও গণহত্যার বিষয়টি প্রচারিত হয়। প্রবাসী বাঙালিরা এসব রিপোর্ট, প্রতিবেদন ব্যাপকভাবে বিশ্বব্যাপী প্রচার করে।

যুক্তরাজ্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কয়েকজন সদস্যকে বাংলাদেশ ও ভারতে শরণার্থীদের অবস্থা পর্যবেক্ষণের জন্য অনুরোধ জানায়। এদের মধ্যে রক্ষণশীল দলের জেমস্ রেমসটেন ও টবিজেসেল এবং শ্রমিকদলের আর্থার বটমূলী ও রেজিনাল্ড প্রেন্টিংঙ্গের নাম উল্লেখ্য। তারা শরণার্থীদের দুর্দশা পর্যবেক্ষণ করে মানব ইতিহাসের চরম ট্রাজেডি সম্পর্কে বিশ্ববাসীর সামনে তুলে ধরেন। তাদের রিপোর্টে পাকিস্তানি বর্বরতার চিত্রও প্রতিফলিত হয়।[৩২]

ব্রিটিশ পার্লামেন্টরী প্রতিনিধি দলের নেতা আর্থার বটমূলী সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপ প্রসঙ্গে বলেন, "পূর্ববঙ্গে আরো একটি ভিয়েতনাম সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। প্রতিনিধি দলের সদস্যগণ পাকিস্তানের গণতহ্যার ধ্বংস যজ্ঞের বিবরণ প্রকাশ করেন।"

এভাবে বাংলাদেশ-সমস্যা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে।

৩. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর (১৯২১-১৯৮৭)[৩৩] ভূমিকা

প্রবাসে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে প্রবাসী বাঙালিদের কর্মতৎপরতা অবিচ্ছিন্ন। মূলত মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বিভিন্ন সাংগঠনিক ও কূটনৈতিক তৎপরতা ও উদ্যোগের নেপথ্যে প্রবাসী বাঙালিরা নিবিড়ভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭১ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশে অসহযোগ আন্দোলনকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী জাতিসংঘ মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগদানের উদ্দেশ্যে জেনেভায় অবস্থান করছিলেন। মার্চ মাসের মাঝামাঝি সময়ে তিনি পাকিস্তানি বাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন ছাত্র হত্যার খবর শুনে ক্ষুব্ধ হন এবং তার প্রতিক্রিয়ায় শিক্ষাসচিবের নিকট উপাচার্যের পদ থেকে পদত্যাগ পত্র প্রেরণ করেন।[৩৪]

২৬শে মার্চ জেনেভায় অবস্থানকালে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বিবিসির মাধ্যমে শুনতে পান, ঢাকার সাথে বহির্বিশ্বের যোগাযোগ বন্ধ এবং তখনই তাঁর এ ধারণাটা বদ্ধমূল হয় যে, নিশ্চয়ই ঢাকায় সামরিক 'ক্র্যাকডাউন' হয়েছে। তিনি মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান এগিলার অনুমতি নিয়ে জেনেভা থেকে লন্ডন চলে আসেন এবং ব্রিটিশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দক্ষিণ এশিয়া বিভাগের প্রধান ইয়ান সাদারল্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করেন। ২৭শে মার্চ তিনি সাদারল্যান্ড ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একান্তসচিব ব্যারিংটনের সাথে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে তাদের কাছ থেকেই ঢাকায় গণহত্যার বিবরণ শোনেন। তাছাড়া করাচি থেকে পাঠানো কেনেথ ক্লার্কের একটি রিপোর্ট যেখানে বলা হয়, "জিন্নাহর একতার স্বপ্ন রক্তে ধুয়ে মুছে গেছে" এবং বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানকে দেশদ্রোহী ঘোষণার অশুভ পরিণাম সম্পর্কে হুঁশিয়ারি বিষয়ে অবহিত হন।[৩৫] টেলেক্সের লম্বা সংবাদ সাদারল্যান্ড পড়ে শোনান।[৩৬] সেখানেই তিনি পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর নির্মমতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র শিক্ষকদের মৃতদেহ, গণসমাধিতে ছুঁড়ে ফেলা এবং শেখ মুজিবকে বন্দি করার ঘটনা জানতে পারেন।

এসব কথা শোনার পর বিচারপতি চৌধুরী সাদারল্যান্ডকে বললেন, "এই মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে আমার আর কোনো সম্পর্ক রইলো না। আমি দেশ থেকে দেশান্তরে যাব আর পাকিস্তানি সৈন্যদের এই নিষ্ঠুরতা-নির্মমতার কথা বিশ্বাবাসীকে জানাব। তারা আমার ছেলে মেয়েদের হত্যা করেছে। এর প্রতিবিধান চাই।"[৩৭] বিচারপতি চৌধুরী সাদারল্যান্ডকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করেন। তিনি বললেন যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম (লর্ড হিউম) তখন স্কটল্যান্ডে। ফিরে এলেই সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে দেবেন। তবে তিনি বৈদেশিক মন্ত্রী (ওভারসিজ মিনিস্টার) রিচার্ড উডের সঙ্গে দেখা করার ব্যবস্থা শীঘ্রই করবেন বলে জানান। বিচারপতি চৌধুরী পার্লামেন্টের পরিচিত এমপিদের সঙ্গে এবং বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যদের সঙ্গে দেখা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "আমার একটিমাত্র কর্তব্য দেশ স্বাধীন করে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনীর সমুচিত শাস্তি র ব্যবস্থা করা।"[৩৮] বিভিন্ন দেশে গিয়ে পাকিস্তানের বর্বরতার কথা তুলে ধরবেন বলে তিনি সংকল্প ব্যক্ত করেন।[৩৯] এভাবে দেখা যায়, বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুজিবনগর সরকার গঠনের আগেই স্ব-উদ্যোগে লন্ডনে কূটনৈতিক তৎপরতা শুরু করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য, বিচারপতি ও মানবাধিকার কমিশনের সাথে যুক্ত থাকার কারণে ইউরোপের বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ তাঁর জন্য সহজ হয়। ৩০শে মার্চ তিনি অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও সেন্ট ক্যাথিরিন কলেজের অধ্যক্ষ লর্ড এলেন বুলেকের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের হত্যা এবং সার্বিকভাবে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যার কথা তুলে ধরেন। চৌধুরী কমনওয়েলথ ইউনিভার্সিটিজ এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি জেনারেল স্যার হিউ স্প্রিংগারের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার বিবরণ দেন। স্যার স্প্রিংগার ইয়াহিয়া খানের নিকট প্রেরিত এক তারবার্তায় বাংলাদেশের গণহত্যার প্রতিবাদ জানান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে শান্তি প্রতিষ্ঠার অনুরোধ জানান।[৪০] বিচারপতি চৌধুরী ব্রিটিশ ওভারসিজ মিনিস্টার রিচার্ড উডের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে রক্তাক্ত যুদ্ধ বন্ধ ও শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য চেষ্টা করার অনুরোধ জানান। রিচার্ড উড একটি বন্ধুরাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে যতটুকু চাপ দেওয়া যায় তা দেবেন বলে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করেন। ৬ই এপ্রিল তিনি ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর লর্ড জেমস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ৭১-এর এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কমনওয়েলথ সেক্রেটারি জেনারেল আরনল্ড স্মীথের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের সার্বিক অবস্থা তুলে ধরেন। তিনি বাংলাদেশে রক্তপাত বন্ধ ও শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানাবেন বলে উল্লেখ করেন। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে এসব কর্মসূচিতে শেখ আব্দুল মান্নান, ওয়ালী আশরাফ, মোশাররফ হোসেন, শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক ও রাজিউল হাসান রঞ্জু বিশেষভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন।

এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে আবু সাঈদ চৌধুরী ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউমের[৪১] সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং তার কাছ থেকে ব্রিটেনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারকার্যে সব ধরনের বেসরকারি সহযোগিতার ব্যাপারে আশ্বাস লাভ করেন। ১০ এপ্রিল তিনি বিবিসি ও লন্ডনের ডেইলি টেলিগ্রাফ পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়ে পাকিস্তানের সাথে তাঁর সব ধরনের সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেন। তাঁর এ ঘোষণা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের প্রবাসী বাঙালি ও ভারতে আশ্রিত বাঙালিদের মধ্যে বিপুল উৎসাহের সঞ্চার করে। এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহের প্রথমদিকে তিনি রক্ষণশীল দলের কমনওয়েলথ গ্রুপের সেক্রেটারি অধ্যাপক জিনকিনের সঙ্গে দেখা করেন এবং তাঁর আমন্ত্রণক্রমে পরবর্তীকালে রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্টের সদস্যদের এক সভায় বক্তৃতা করেন। এভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের রক্ষণশীল দলের সদস্যগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল হন।[৪২] বিচারপতি চৌধুরীর এসব কর্মকাণ্ডের মধ্যেই ১২ই এপ্রিল কলকাতা থেকে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম[৪৩] তাঁকে বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হবার জন্য অনুরোধ জানান এবং মুজিবনগরে সরকারের শপথ গ্রহণের তিন দিন পর ২১শে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এপ্রিল অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলামের স্বাক্ষরকৃত নিয়োগপত্রে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে বহির্বিশ্বে বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়।[৪৪] মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী অ্যামেনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল মার্টিন এনালস ও সোস্যালিস্ট ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি জেনারেল হ্যান্স ইয়ান্টিসেকের সাথে সাক্ষাৎ করেন। অ্যামেনেস্টি মহাসচিবের পরামর্শে যুক্তরাজ্য স্টিয়ারিং কমিটি অধ্যাপক ড্রেপারকে আন্তর্জাতিক রেডক্রস কমিটির মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা ও তাঁর সঠিক সংবাদ নিশ্চিত করার জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে মুজিবনগর সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে নিয়োগ দেওয়ার পর তাঁকে যথাশীঘ্র সম্ভব আমেরিকায় যাওয়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয়। সেই অনুযায়ী বিচারপতি চৌধুরী ৪ বছরের ভিসা এবং যতবার ইচ্ছা আমেরিকায় যাবার অনুমতি লাভ করেন।[৪৫] বিচারপতি চৌধুরী ইংল্যান্ডের বিভিন্ন অঞ্চলের বাঙালিদের পার্লামেন্টে পাঠিয়ে স্ব-স্ব অঞ্চলের এমপিদের সাথে দেখা করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি তাঁদের সমর্থন কামনা করেন। বিচারপতি চৌধুরী নিজেও প্রতিদিন একবার করে হাউস অব কমন্সের লবিতে গেছেন। এর ফলে ব্রিটিশ এমপিগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সহানুভূতিশীল হয়ে ওঠেন। পার্লামেন্টের আলোচনার সূত্র ধরে ব্রিটিশ পত্রপত্রিকাতেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে বক্তব্য, মন্তব্য, প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশিত হতে থাকে।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করার কারণে ব্রিটেনে বাঙালিদের আন্দোলনে গতি সঞ্চারিত হয়। ৩রা এপ্রিল ছাত্র-মহিলাদের প্রতিনিধি দল পৃথকভাবে লন্ডনের বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। চীনা দূতাবাস স্মারকলিপি গ্রহণে অস্বীকৃতি জানায়। দূতাবাসের কর্মচারীরা বলেন যে, ইয়াহিয়া খান সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনেবিশবাদবিরোধী এবং বিদ্রোহ দমন করার অধিকার তার রয়েছে। অতএব তারা ইয়াহিয়া খানকে পুরোপুরি সমর্থন করেন।[৪৬]

যুক্তরাজ্যে আওয়ামী লীগ ও অন্যান্য সামাজিক সংগঠনগুলোর মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যের অভাব ছিল। বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী এ অনৈক্য দূর করার লক্ষ্যে বিভিন্ন আঞ্চলিক সমিতিগুলোর সাথে প্রথমে ঘরোয়া বৈঠকে একটা সম্মিলিত প্ল্যাটফরম গঠনের উদ্যোগ নেন। ২৩শে এপ্রিল বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে ২৪শে এপ্রিল কভেন্ট্রি শহরের একটি মিলনায়তনে ১২৫জন প্রতিনিধি ও ২৫জন পর্যবেক্ষক যোগদান করে। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন মিসেস লুলু বিলকিস বানু।[৪৭] সভা শুরু হলেই বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিয়োগ সম্পৃক্ত পত্রখানি পাঠ করে শোনানো হয়।[৪৮] ঐ দিনই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ কর্তৃক লন্ডন প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশ্যে লিখিত একটি চিঠি[৪৯] পড়ে শোনানো হয়। চিঠিতে বলা হয়:

জাতির এক যুগসন্ধিক্ষণে এ দেশবাসী অধির আগ্রহ নিয়ে আপনাদের সামগ্রিক সাহায্য ও সহানুভূতির অপেক্ষা করছে। প্রবাসী সকল বাঙালি ভাইরা আজ পূর্ণ সংহতি নিয়ে একযোগে স্বদেশবাসীর পাশে দাঁড়াবেন এটাই আমাদের দৃঢ় প্রত্যাশা।

ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের কেন্দ্রীয় সংগঠন 'অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপল্‌স রিপাবলিক অফ পাকিস্তান ইন ইউকে' এর নাম পরিবর্তন করে 'অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপল্‌স রিপাবলিক অফ বাংলাদেশ ইন ইউকে' গৃহীত হয়। কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত বাঙালিদের এই সভার প্রস্তাবে এই সংগঠনকে কেন্দ্রীয় সংগঠন হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।[৫০] সংগঠন পরিচালনার জন্য ৫ সদস্যবিশিষ্ট একটা কার্যকরী কমিটি গঠিত হয়।[৫১] যুক্তরাজ্যের অন্যান্য এলাকার বিদ্যমান কমিটিগুলো অ্যাকশন কমিটির শাখা কমিটি হিসেবে বিবেচিত হবে এবং এই কার্যকরী কমিটি স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনায় সার্বিকভাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর পরামর্শে পরিচালিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।[৫২] ১১ নং গোরিং স্ট্রীটে কার্যকরী কমিটির অফিস স্থাপিত হয় এবং এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়।[৫৩] ৩রা মে নতুন অফিস আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন উপলক্ষে বিচারপতি চৌধুরী বলেন, "মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পাকিস্তান মৃত্যুবরণ করেছে। বাংলাদেশ আজ একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। বাংলাদেশের নিপীড়িত জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবিতে সংগ্রাম করছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে খতম না করা পর্যন্ত এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে।"[৫৪]

লন্ডনের বাইরে বসবাসরত বাঙালিদেরকে সংঘবদ্ধ করার জন্যও বিচারপতি চৌধুরী সচেষ্ট হন। ৯ই মে তিনি ব্রাডফোর্ড (সকাল ১০টা) ও বার্মিংহাম (বিকাল ৩টা) জনাকীর্ণ হলে বক্তৃতা করেন। সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি' গীত হয়।

বার্মিংহামের জনসভা সম্পর্কে বিচারপতি চৌধুরী লিখেছেন:[৫৫]

আমরা যখন হলে প্রবেশ করি তখন এই জনাকীর্ণ সভার সকলেরই মুখে-চোখে দৃঢ়তা, দেশপ্রেম ও দৃপ্ত শপথের সমন্বিত অভিব্যক্তি। আমি এই সভায় প্রবেশ করেই অনুভব করলাম এক অভূতপূর্ব শিহরন। মনে হলো প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের আত্মার গভীর মিলন হয়েছে। আমরা মঞ্চে স্থান গ্রহণ করার সঙ্গে সঙ্গে সভার কাজ শুরু হলো।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ২২শে মে অক্সফোর্ড শহরে এক জনসভায় ভাষণ দেন। অক্সফোর্ডের সভা শেষে তিনি ব্লেচলি শহরে, সেখান থেকে ২৩শে মে বিমানযোগে গ্লাসগো যান। এসময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন শেখ আব্দুল মান্নান। গ্লাসগোতে সংগঠক ছিলেন ডা. শামসুদ্দিন।[৫৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্লাসগো থেকে ফিরে ২৪শে মে বিচারপতি চৌধুরী নিউইয়র্ক যান। সেখানে পূর্ব থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে সংগঠকের কাজ করেন এ.এইচ. মাহমুদ আলী, স্থপতি ফজলুর রহমান খান, এ.এম.এ. মুহিত ও হারুন-অর-রশিদ প্রমুখ। বিচারপতি চৌধুরী নিউইয়র্কে কর্মব্যস্ত সময় কাটান। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে টেলিফোনে সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করেন শাহীন মাহমুদ আলী। তার সাক্ষাতের ব্যবস্থা ছিল সুপ্রণালীবদ্ধ।[৫৭] একজন রাষ্ট্রদূত সঙ্গে সাক্ষাৎ চলাকালীন তিনি অন্য একজন রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করে ফেলতেন। পূর্বের সাক্ষাৎ শেষে প্রতিনিধিদল বাইরে এলে তাঁদের জন্য নির্ধারিত সময়ে পরবর্তী সাক্ষাৎকারের কথা বলে দিতেন। এভাবে স্বল্প সময়ে নিউইয়র্কে তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নরওয়ে, সৌদি আরব, আলজেরিয়া, লিবিয়া, মিসর, জর্ডান, ইরাক, ইরান, সিরিয়া প্রভৃতি দেশের রাষ্ট্রদূতদের সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করা।[৫৮] ২৯শ মে তিনি ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন।

৩০শে মে ম্যানচেস্টারে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাটি আয়োজন করেন ম্যানচেস্টারে বসবাসরত বাঙালি নেতা আব্দুল মতিন, ছাত্রনেতা মহিউদ্দিন আহমেদ, স্টিয়ারিং কমিটির সদস্য কবির চৌধুরী প্রমুখ। জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে ভারতীয় নেতা জয় প্রকাশ নারায়ণ লন্ডনে এলে বিচারপতি চৌধুরী তাঁর সঙ্গে আলোচনা করেন। ৫ই জুন বিচারপতি চৌধুরী শেফিল্ড টাউন হলে বিরাট জনসভায় ভাষণ দেন। এরপর ৬ই জুন পূর্ব লন্ডনের এক জনসভায় ভাষণ দেন। ১১শে জুন লন্ডন উইক অ্যাণ্ড টেলিভিশন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ ব্যক্তিদের সমন্বয়ে একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ ও প্রচার করে। ঐ সাক্ষাৎকারে বিচারপতি চৌধুরী জোরালো যুক্তি, তথ্য ও উপাত্তের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষ গ্রুপের সকল প্রশ্নের যুক্তিপূর্ণ শানিত জবাব দেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত বৃদ্ধি পায়। লীডস-এর সভায় 'ওয়ার্কার্স প্রেস' বাংলাদেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্রসম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশ করে।

গণহত্যা ও নির্মম নির্যাতনের ছবি দেয়ালে সেঁটে দেওয়া হয়। এ দেখে অভিভূত বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী দৃঢ়কণ্ঠে বলেন, "পৃথিবীর এমন কোনো শক্তি নেই যে, আমাদের স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করতে পারে।"[৫৯]

১৬ই জুন সন্ধ্যাবেলা আই. টিভির 'ম্যান ইন দি নিউজ' প্রোগ্রামে বিচারপতি চৌধুরী-র সাক্ষাতকারের বিবরণ প্রচারিত হয়। এই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, পাকিস্তান সরকার বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হত্যাযজ্ঞের খবর চেপে যাওয়ার চেষ্টা করছে। সেনাবাহিনী পাকিস্তানকে খতম করেছে, বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হলেই হত্যাযজ্ঞ বন্ধ হবে। ১৭ই জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট সৈয়দ নজরুল ইসলাম বিচারপতি চৌধুরীর কূটনৈতিক পরিচয়পত্রে স্বাক্ষরদান করেন। এই পরিচয়পত্রে বিচারপতি চৌধুরীকে যুক্তরাজ্যে হাই কমিশনার হিসেবে নিয়োগের কথা আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়।[৬০] এই পরিচয়পত্র ইংল্যান্ডের রানী দ্বিতীয় এলিজাবেথের সরকারি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাসভবন বার্মিংহাম প্যালেসে পেশ করা হয়। যথাসময়ে পরিচয়পত্র প্রাপ্তিস্বীকার করে বার্মিংহাম প্যালেস থেকে বিচারপতি চৌধুরীর নিকট একটি পত্র পাঠানো হয়। এই পত্র প্রাপ্তিকে প্রকারান্তরে বাংলাদেশের স্বীকৃতি হিসেবে প্রবাসীরা প্রচার করেন।[৬১]

ওয়েলসের রাজধানী শহর কার্ডিফে বসবাসরত বাঙালিদের আমন্ত্রণে বিচারপতি চৌধুরী ২০শে জুন কার্ডিফের জনাকীর্ণ সভায় মুক্তিযুদ্ধের বিগত কয়েক সপ্তাহের অগ্রগতির বিবরণ দেন। এর ফলে সেখানকার কর্মীদের মধ্যে যেমন উৎসাহ ও উদ্দীপনা বৃদ্ধি দায়, তেমনি মুক্তিযুদ্ধেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি আন্তর্জাতিক সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

মুজিনগর সরকারের বিশেষ দূত হিসেবে আবু সাঈদ চৌধুরী এক ঝটিকা সফরে ২১শে জুন নেদারল্যান্ড গমন করেন। সেখানকার স্বল্পসংখ্যক বাঙালি সংশ্লিষ্ট সরকারের মনোযোগ আকর্ষণে সফল হন।[৬২] নেদারল্যান্ডের কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্য ও স্পিকারের সাথে বিচারপতি চৌধুরী সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশে পাকিস্তানের গণহত্যার বিবরণ দেন এবং মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট বর্ণনা করেন। তিনি পার্লামেন্টের ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন।[৬৩] এখানে তিনি এক সাংবাদিক সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন, যা নেদারল্যান্ডের পত্রিকাগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠার দু'তিন কলামব্যাপী শিরোনাম দিয়ে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।[৬৪]

২৩শে জুন তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। এ সময় প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের নির্দেশে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সঙ্গে দেখা করে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র প্রেরণে ভারত সরকারের অনুমতি না পাওয়ায় প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে হতাশা দেখা দিয়েছে বলে মত প্রকাশ করেন। শরণ সিংহ বলেন যে, বিদেশ থেকে অস্ত্র না পাঠালেও মুক্তিযোদ্ধারা প্রয়োজনীয় অস্ত্র পাচ্ছে। এসময় ব্রিটেনে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত উপস্থিত ছিলেন।[৬৫]

লন্ডনে ফিরে এসে তিনি ১০ই জুলাই বেডফোর্ড শহরে জনসভা করেন। আগস্ট মাসের মাঝামাঝি 'ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডশীফ এসোসিয়েশন'-এর ব্যানারে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত বিভিন্ন ইউরোপীয় দেশের রাষ্ট্রদূতদের সাথে বিচারপতি চৌধুরী আলাপকালে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন এবং স্বাধীনতা সংগ্রামে তাদের সমর্থন কামনা করেন।[৬৬] ৩১শে আগস্ট বিচারপতি চৌধুরী প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশ্যে একটি চিঠি প্রচার করেন।[৬৭]

বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠিত হবার পর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো সফরে বের হন। প্রথমে ১লা সেপ্টেম্বর নরওয়ের অসলো পৌঁছান । সেখানে সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পিয়ের অল্ডসহ অন্যান্য বিচারপতি এবং বিভিন্ন পর্যায়ে পেশাজীবী, পার্লামেন্ট সদস্য ও সরকারি-বেসরকারি বিভিন্ন পর্যায়ের ব্যক্তিবর্গের সাথে আলোচনা করে বাংলাদেশ স্বাধীনতা সংগ্রামের পটভূমি ও যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী স্টলটেনবার্গের সাথে বিচারপতি চৌধুরীর সাক্ষাৎ ঘটে। আলোচনার পর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্টলটেনবার্গে বলেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আসন্ন সম্মেলনে নরওয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি পেশ করবে। প্রত্যেকের সাথে আলোচনায় তিনি বাংলাদেশের প্রতি বিদেশিদের সহানুভূতি অর্জনের চেষ্টা করেন।[৬৮]

৭ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী নরওয়ে থেকে সুইডেন গমন করেন। সুইডেনে নিয়োজিত পাকিস্তানের প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আব্দুর রাজ্জাক বিমানবন্দরে উপস্থিত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর তিনি বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করেন। স্টকহোমে পৌঁছাবার পর বিচারপতি চৌধুরী নোবেল পুরস্কারপ্রাপ্ত অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক গুনার মীরডালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলনের আদর্শ ও উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করার পর বিচারপতি চৌধুরী অধ্যাপক মীরডালকে স্থানীয় বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির চেয়ারম্যান পদে নিযুক্ত করেন।[৬৯] ৭ই সেপ্টেম্বর সুইডেনের সোসালিস্ট ডেমোক্রেটিক পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল স্টোন এন্ডারসনের সাথে সাক্ষাৎ করেন বিচারপতি চৌধুরী। তিনি তাঁর পার্টির পক্ষ থেকে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অস্ত্র সরবরাহ করার ঘোষণা দিয়েছিলেন। পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং প্রধানমন্ত্রীর প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি পিয়ের শোরির সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এছাড়াও সুইডেনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যালবার্গ, সুপ্রিম কোর্টের অস্থায়ী বিচারপতি মিসেস ইনগ্রিড গার্ডেওয়াইডেমার এবং লিবারেল পার্লামেন্টারি পার্টির চিফ হুইপ ইয়ান স্টিফেনসনের সঙ্গে পৃথকভাবে সাক্ষাৎ করে বিচারপতি চৌধুরী পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আলোচনা করেন।[৭০]

১৩ই সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী সুইডেন থেকে ফিনল্যান্ড পৌঁছেন। ১৪ই সেপ্টেম্বর তিনি ফিনিশ টেলিভিশনে এক সাক্ষাৎকার দেন। অতঃপর পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে কয়েকজন পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। তিনি ফিনল্যান্ডের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের সাথে আলোচনা করেন। সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস ও মানবাধিকার কমিশনের সদস্য ভ্যাটিওসারিওর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।[৭১]

১৪ই সেপ্টেম্বর আবু সাঈদ চৌধুরী ডেনমার্কের কোপেনহেগেনে পৌঁছালে মতিউর রহমান ও লিয়াকত হোসেনসহ কয়েকজন বাঙালি তাঁকে অভ্যর্থনা জানান। ডেনমার্কে বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির আহ্বায়ক কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড ও তাঁর সহকর্মীরা বাংলাদেশের গণহত্যা সম্পর্কে একটা বুলেটিন প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। উল্লেখ্য যে, ওয়েস্টগার্ড ২৫ই মার্চ ঢাকায় অবস্থানকালে পাকিস্তানিদের গণহত্যা প্রত্যক্ষ করেন। বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি পার্লামেন্ট ভবনে গিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সদস্য, স্পিকার ও পার্লামেন্টের বৈদেশিক কমিটির সদস্যদের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি ও সমকালিন পরিস্থিতি তুলে ধরেন। সংবাদ সম্মেলন করেন। এর ফলে পাকিস্তানে যে কয়েকটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অস্ত্র সরবরাহ করতে চুক্তি করেছিল জনমতের প্রতিফলনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তা স্থগিত করে। তখন জাতিসংঘের অধিবেশন ছিল সমাগত। ডেনিশ প্রতিনিধিদের নেতা জাতিসংঘে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠনে সহায়তা করবেন বলে বিচারপতি চৌধুরীকে আশ্বস্ত করেন।[৭২]

এভাবে একনাগাড়ে ৭ই থেকে ১৬ই সেপ্টেম্বর পর্যন্ত স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশগুলো সফর করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে জনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৬ই সেপ্টেম্বর রাতে বিচারপতি চৌধুরী ডেনমার্ক থেকে লন্ডনে ফিরে এসে যথারীতি লন্ডনের কাজ শুরু করেন। অক্টোবর মাসের শেষ দিকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী প্রাক্তন রাষ্ট্রদূত আবদুল মোমেনকে সঙ্গে নিয়ে লন্ডনের একটি হোটেলে মরিশাসের কৃষিমন্ত্রী স্যার আবদুর রাজ্জাকের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

তিনি মরিশাস কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের ব্যাপারে সমর্থনদানের জন্য আব্দুর রাজ্জাককে অনুরোধ করেন। তাঁর বক্তব্য শোনার পর আবদুর রাজ্জাক বলেন, "পাকিস্তান ভেঙে দেওয়া ঠিক হবে না। অতীতের অন্যায় ক্ষমা করে নতুন পরিবেশ সৃষ্টি করার জন্য এগিয়ে যেতে হবে।" যদিও মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী স্যার সিউসাগর রামগোলাম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁর দলের মুসলমান সদস্যদের বিরোধীতার ফলে তা সম্ভব হয়নি।[৭৩]

নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী যুক্তরাষ্ট্রে কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রোগ্রাম করেন। ২৮ই নভেম্বর থেকে ৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি বাঙালির মুক্তিসংগ্রাম সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন হার্ভার্ড, নিউইয়র্ক সিটি, কলম্বিয়া এবং ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে।

ডিসেম্বর মাসে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত পর্যায়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব সম্পর্কে বাংলাদেশের অবস্থান ও মুজিব নগর সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে জাতিসংঘ সদরদপ্তরে একটি বিবৃতি প্রকাশ করেন যার ঐতিহাসিক ও কূটনৈতিক অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। বিবৃতিটি সদস্য দেশের মধ্যে প্রচার করা হয়। বিবৃতিতে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে তিনি ঘোষণা দেন চূড়ান্ত বিজয় অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত সংগ্রাম চলবে।

বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর প্রবাস পরিচালিত কর্মকাণ্ড পর্যালোচনায় লক্ষণীয় যে, বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম-উৎসে আদর্শিক রাজনৈতিক অভিঘাতের চেয়ে সার্বজনীন মানবাধিকার এবং কূটনৈতিক রীতি-পদ্ধতি এবং জাতিসংঘ স্বীকৃত আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রায়োগিক দিককে গুরুত্ব দিয়েছেন।

পরাশক্তি বিভাজিত বিশ্ব ব্যবস্থায় এরূপ পদক্ষেপই তার জন্য যথার্থ বলে বিবেচনা করেছেন। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তিনি যেমন মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন, তেমনি সোভিয়েত দূতাবাসে গিয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪. ইকোনোমিক ডিপ্লোম্যাসি : প্রফেসর রেহমান সোবহানের ভূমিকা[৭৪]

পাকিস্তান সরকার যেন দাতাদের সাহায্য না পায় এজন্য প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ রেহমান সোবহানকে লন্ডন ও যুক্তরাষ্ট্র যেতে অনুরোধ করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে রেহমান সোবহান এপ্রিলের মাঝামাঝি সময়ে লন্ডনে যান। তিনি সেখানে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সাথে সাক্ষাৎ করেন। তিনি তাঁর ব্রিটিশ বন্ধুদের সহায়তায় সরকারের উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গের সাথে দেখা করে বাংলাদেশে পাকিস্তানিদের নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরেন এবং পাকিস্তানকে কোনো ধরনের অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান না করার অনুরোধ জানান। তিনি ব্রিটিশ পররাষ্ট্রসচিব ডগলাস হিউম ও তাঁর ব্যক্তিগত সচিব নিকোলাস ব্যারিংটনের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। এছাড়া সাংবাদিক ব্রায়ান ল্যাপিং এর মাধ্যমে লেবার পার্টির কয়েকজন এমপির সাথে সাক্ষাৎ করেন। ব্রিটিশ সরকার যেন পাকিস্তানকে সহায়তা প্রদান না করে সেজন্য তাদেরকে সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির অনুরোধ জানান।

জুন মাসের ১৯ তারিখে (১৯৭১) প্যারিসে এইড কনসোর্টিয়ামের বৈঠক উপলক্ষ্যে পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক সাহায্যদানের উদ্দেশ্যে গঠিত হয় ১১ সদস্যবিশিষ্ট কমিটি। অন্যদিকে, বাংলাদেশে নিষ্ঠুর গণহত্যা, নারী নির্যাতন, লুণ্ঠন, ধ্বংসযজ্ঞ এবং নির্মম সামরিক আক্রমণের সংবাদ দেশে-বিদেশে অগণিত গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়। নরঘাতক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সরকারকে অর্থনৈতিক, সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য না দেওয়ার জন্য বাঙালিদের বিশ্বব্যাপী আবেদন জনমনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। লন্ডনস্থ দূতাবাসগুলোতে প্রবাসী বাঙালিরা মুজিবনগর সরকারের আহ্বানে ও স্বপ্রণোদিতভাবে বারবার সাহায্য বন্ধের উচ্চকিত দাবি তোলেন। তারপরও অনুষ্ঠিত হয় কনসোর্টিয়াম বৈঠক। সেজন্য জরুরিভাবে গৃহীত হয় কর্মসূচি। যে কোনো মূল্যে পাকিস্তান যাতে সাহায্য না পায় তার জন্য সর্বপ্রকার উদ্যোগ গ্রহণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের অংশ হিসেবে ১৪ই জুন ১১ জাতি কসসোর্টিয়ামের সদস্য দেশগুলোর লন্ডনস্থ দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। ঐদিন বিকেল ৩টায় ব্রিটেনের পররাষ্ট্র দপ্তরের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন বাঙালিরা। সাড়ে চারটায় মিছিল গিয়ে পৌঁছে ট্রাফালগার স্কোয়ারস্থ কানাডা হাউসের দূতাবাসের সামনে। সেখানে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। দাবি জানানো হয়, যেন বাঙালির খুনে রঞ্জিত ইয়াহিয়ার সরকারকে কোনো সাহায্য দেওয়া না হয়।

১৫ই জুন। দুপুর একটায় একই দাবি নিয়ে সংগ্রামী জনতা গিয়ে হাজির হন ফ্রান্স দূতাবাসের সামনে। দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ৫৮, নাইটব্রিজে বিক্ষোভ করেন পূর্ব ঘোষিত কর্মসূচি অনুসারে। সাড়ে চারটায় একই কর্মসূচি পালিত হয় দক্ষিণ-পশ্চিম লন্ডনের ইটন স্কোয়ারস্থ বেলজিয়াম দূতাবাসের সামনে, তারপর জার্মানির দূতাবাসের সামনে। ১৬ই জুন একই এলাকার বেলগ্রেড স্কোয়ারে দূতাবাসের সামনে বিকাল সাড়ে চারটায় সুশৃঙ্খল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয়। একই দাবিতে বিক্ষোভ হয় অস্ট্রিয়ীয় রাষ্ট্রদূতের অফিসের সামনে। ১৭ই জুন-এ দুপুর একটায় লন্ডন শহরের গ্রোভনার পার্কে যুক্তরাষ্ট্রে দূতাবাসের সামনে এবং সাড়ে চারটায় একই এলাকার গ্রোভনার স্ট্রিটে জাপান দূতাবাসের সামনে মুক্তিকামী বাঙালির বিক্ষুব্ধ সমাবেশ ঘটে। একইভাবে ১৮ই জুন হাইড পার্ক গেটে হল্যান্ড এবং থ্রিকিংস ইয়ার্ডে ইতালীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। স্ব-স্ব সরকার যাতে পাকিস্তানি সামরিক জান্তাকে সাহায্য প্রদান না করে তার যথাযথ ব্যবস্থা নেবার দাবি জানানো হয়।

পাকিস্তান সাহায্যদাতা কনসোর্টিয়াম বৈঠকের ঠিক আগে লন্ডনের মহিলারাও এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হয়ে ওঠেন। তাঁরা নারী নির্যাতনকারী খুনি ইয়াহিয়া চক্রকে সাহায্যদান বন্ধ রাখার দাবি উত্থাপন করেন। তাঁরা বলেন যে, পাকিস্তানি সামরিক সরকারকে দেওয়া প্রতিটি পেনি বুলেট হয়ে বিদীর্ণ করছে বাঙালির হৃদয়। পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার অর্থই হলো আরও রক্তপাত, গণহত্যা। এইড কনসোর্টিয়ামের বৈঠক আসন্ন। তাই বিক্ষুব্ধ বাঙালি রমণীরা বেরিয়ে আসেন লন্ডনের রাজপথে। সংগঠিত করেন মিছিল। ব্যানার, ফেস্টুনে সজ্জিত সেই মিছিল থেকে আওয়াজ ওঠে 'Not a penny, not a Gun-Yahya Bhutto Tikka Khan.' জনতা নেমে আসে রাজপথে। মিছিল স্ফীতকায় হয়ে ওঠে। রূপ নেয় বিশাল মিছিলে। কনসোর্টিয়াম বৈঠকের সময় ব্রিটেনের লন্ডন এবং বার্মিংহাম নগরী থেকে তিনটি কোচ ভর্তি হয়ে শ' দেড়েক বাঙালি চলে যান প্যারিস। এর আগে তাঁরা সবাই ব্রিটিশ পাসপোর্ট করে নিয়েছেন। সাথে করে নিয়েছিলেন দোভাষী। সেখানে তাঁরা বিক্ষোভ করেছেন পাকিস্তানের সামরিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক সাহায্যদানের বিরুদ্ধে, কথা বলেছেন গণমাধ্যমের সাথে। বিশ্লেষণ করেছেন দাবির যৌক্তিকতা। সাহায্যদানকারী দেশগুলোর প্রতিনিধিদের সভায় অ্যাকশন বাংলাদেশ ও ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের প্রতিনিধিদল জোর লবি করেন। সভাস্থলের বাইরেও তাঁরা দেড়ঘণ্টা বিক্ষোভ প্রদর্শনের সুযোগ গ্রহণ করেন। এই কর্মসূচি সফল হয় আশাতীতভাবে।

৭ই জুন পাকিস্তান প্যারিসে এইড কনসোর্টিয়ামের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে পাকিস্তান সরকারের আস্থা ছিল দাতা দেশগুলোর পক্ষ থেকে নতুন সাহায্যের আশ্বাস পাবে। যুদ্ধের কারণে তাদের আমদানি ক্ষমতা প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ রেহমান সোবহান প্যারিসে গিয়ে ডানিয়েল ও হাসান ইমামকে নিয়ে ইতিপূর্বে যে পেপারটি ম্যাকনামারাকে দিয়েছিলেন সেটার উপর ভিত্তি করেই তিনি কনসোর্টিয়ামের জন্য একটি মেমোরান্ডাম প্রস্তুত করেন। তিনি বিশ্বব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট পিটার কারগিলের সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। পিটার কারগিল সবেমাত্র পাকিস্তানের অবস্থা পরিদর্শন করে ফিরে এসেছেন। তার রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে পাকিস্তানের অস্থিতিশীল এই পরিবেশে উন্নয়ন-প্রচেষ্টা ব্যর্থ হবে এই অজুহাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কনসোর্টিয়াম পাকিস্তানকে সাহায্যের নতুন কোনো আশ্বাস দেয়নি। এমনকি নতুন সাহায্য প্রদানের বিষয় নিয়ে আলোচনাও অনুষ্ঠিত হয়নি। সদস্য দেশগুলো এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান না হওয়া পর্যন্ত নতুন সাহায্যদানের প্রস্তাব সম্পর্কিত আলোচনা স্থগিত থাকবে। পাকিস্তান সরকারের জন্য এটা ছিল এক বিরাট আঘাত। সামরিক চক্র বিচলিত বোধ করে। রেহমান সোবহান লিখেছেন, "মার্কিনী প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের সমর্থনে বেশ নমনীয় ভূমিকা পালন করেছে কিন্তু সাহায্যের ব্যাপারে তারা তেমন জোর করেনি। বরং কনসোর্টিয়ামের সিদ্ধান্তই মেনে নিয়েছেন তারা।"[৭৫]

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বিশ্বব্যাংকেও লবি করেছিলেন। বিশ্বব্যাংক যাতে পাকিস্তানে সাহায্য প্রেরণ থেকে বিরত থাকে তার জন্য বিশ্বব্যাংকের প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামার সাথেও তিনি সাক্ষাৎ করেন। এ সময় সাহায্য বন্ধ করার পক্ষে যুক্তি প্রদর্শন করে তৈরি করা একটি পেপারও বিশ্বব্যাংক প্রেসিডেন্টকে হস্তান্তর করেন রেহমান সোবহান। একাত্তরের সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ওয়াশিংটনের শেরাটন হোটেলে বিশ্বব্যাংক আই.এম.এফ.-এর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেও রেহমান সোবহান এবং এ.এম.এ. মুহিত উপস্থিত হয়ে পাকিস্তানকে কোনো রকম সাহায্য প্রদান না করার জন্য লবি অব্যাহত রেখে সফলতা এনেছেন।[৭৬]

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অর্থনীতিবিদ প্রফেসর রবার্ট ডর্ফমেন, প্রফেসর স্যামুয়েন হান্টিংটন, হার্ভার্ড বিজনেস স্কুলের প্রফেসর লজসহ আরো অনেকের সাথে প্রফেসর রেহমান সোবহান সাক্ষাৎ করে ড. কিসিঞ্জারের ওপর তাঁদের প্রভাব বিস্তার করার প্রয়াস চালান। এঁরা সবাই এককালে কিসিঞ্জারের সহকর্মী ছিলেন। হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের তাঁর সহকর্মী গুসতাভ পাপানেকসহ আরো অনেকে এই প্রচেষ্টা চালান। তাঁরা কিসিঞ্জারের মনোভাব পরিবর্তন করার লক্ষ্যে মিছিলও করেন। তাতে স্লোগান ছিল: "Wake up Henry." কিন্তু সকল প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পুরো বছরব্যাপী কোনো বাঙালিই তার সাক্ষাৎ লাভে সক্ষম হননি।

৪.১ ড. এ. আর. মল্লিক

মুজিবনগর সরকার কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে জাতিসংঘে লবি করার জন্য যে প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়েছিল ড. এ. আর. মল্লিক ছিলেন তার অন্যতম সদস্য। তিনি শুধু জাতিসংঘ কেন্দ্রিক লবি করেননি তার বাইরেও সক্রিয় ছিলেন।

প্রতিনিধি দলের সদস্য ড. আজিজুর রহমান মল্লিক ভিজিটিং প্রফেসর হিসেবে অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তব্য রাখেন। এ সময় ড. এ.আর. মল্লিক এককভাবে কিংবা অন্য প্রতিনিধিদের সাথে নিয়ে প্রোগ্রাম করেছেন নিউইয়র্ক, কলম্বিয়া, পেনসিলভেনিয়া, স্টানফোর্ড, বার্কলে, লংবিচ, শিকাগো, বাফেলো, নর্থ ক্যারোলিনা, হার্ভার্ড, বোস্টন, ইয়েল, টেক্সাস প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয়ে। এসব স্থানে তিনি ফ্যাকাল্টিতে বক্তব্য তুলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধরেছেন, সাংবাদিকদের সাক্ষাৎ দিয়েছেন, ছাত্র-শিক্ষকদের সভায় বক্তৃতা করেছেন। বহু কংগ্রেসম্যান ও সিনেটরদের সাথেও বৈঠক করেছেন। পূর্ব পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা তুলে ধরেছেন তাঁদের কাছে এবং তাঁদের সমর্থন আদায় করার চেষ্টা করেছেন। প্রভাবশালী সিনেটর কেনেডি, স্যাক্সবি, চার্চ প্রমুখের সাথে গড়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিগত সখ্য। আর তা ব্যবহার করেছেন বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকবৃন্দ তাঁকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বক্তৃতা করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতেন। তাঁর বক্তৃতা যুক্তরাষ্ট্রে কার্যকর প্রভাব ফেলে।

৫. স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতিকৃতি ডাকটিকিট প্রকাশের মাধ্যমে জনমত গঠন

২৬শে জুলাই, হাউস অব কমন্সের হারকোট রুমে পার্লামেন্টের সকল দলের নেতৃস্থানীয় সদস্য ও প্রায় ৪০জন সাংবাদিকের উপস্থিতিতে বাংলাদেশের ৮টি ডাকটিকিট প্রকাশ করা হয়।[৭৭] ডাকটিকিট প্রকাশের উদ্দেশ্য স্পষ্ট, বিদেশে মুজিবনগর সরকারের অস্তিত্ব ও রাষ্ট্র পরিচালনার ধারণা প্রচার করা। ডাকটিকিটগুলির পরিচিতি নিম্নে উল্লেখ করা হলো:

এক. প্রকাশিত দশ পয়সা মূল্যমানের ডাকটিকিটে বাংলাদেশের মানচিত্র ব্যবহৃত হয়েছে। এর উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangladesh ও দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় চ.১০ লেখা আছে। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ গঠনের প্রথম ও প্রধান শর্ত সেই দেশের একটি নির্দিষ্ট ভূখণ্ড, এই ডাকটিকিটে সদ্য স্বাধীনতা ঘোষিত দেশটির নিজস্ব ভূখণ্ড আছে এরই প্রচারণা ও বাংলাদেশের মানচিত্রকে বিশ্বব্যাপী পরিচিত করা ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য।

দুই. বিশ পয়সা মূল্যমানের ডাকটিকিটে উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh ও দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় P.20 লেখা আছে। এর নিচের অংশে সবুজ জমিনের উপর সোনালি ও সাদা রঙের লেখা। প্রথমে সাদা রঙের MASSACRE AT লেখা। এর নিচে সোনালি রঙের লেখা DACCA UNIVERSITY এবং এই লেখার উপর লাল রঙের ছোপ ছোপ। সবচেয়ে নিচে ON 25th 26th MARCH ১৯৭১। এই ছবিটি মূলত হানাদার পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের উপর ১৯৭১ সালে ২৫ মার্চ কালো রাতে ও ২৬ মার্চ যে নির্মম গণহত্যা সংঘটিত হয় তার চিত্র ফুটিয়ে তোলা হয়েছে।

তিন. রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, "একটি দেশ তখনই স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য হবে যখন তাঁর নিজস্ব জনসংখ্যা থাকবে।" সেই মতানুযায়ী বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা পাওয়ার যোগ্য। কেননা তাঁর নিজস্ব জনসংখ্যা আছে যার সংখ্যা সাড়ে সাত কোটি। পঞ্চাশ পয়সা মূল্যমানের ডাকটিকিটে উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh লেখা হয়। বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা ডান পাশে কোণায় চ.৫০ লেখা আছে। নিচের অংশে ছোট করে A NATION OF এর নিচে বড় করে ইংরেজিতে ৭৫ লেখা এবং এর নিচের অংশে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

MILLION PEOPLE লেখা আছে। এর অর্থ সাড়ে সাত কোটি মানুষ নিপীড়িত, নির্যাতিত ও গণহত্যার শিকার বিশ্ববাসীর কাছে এটা তুলে ধরা।

চার. বাংলাদেশ ভূখণ্ডের মানচিত্রসম্বলিত স্বাধীনতার পতাকা।

পাঁচ. দুই রুপি মূল্যমানের ডাকটিকিটটি বক্তব্যধর্মী। ১৯৭০ সালের ৭ই ডিসেম্বরের সাধারণ নির্বাচনের বিশদ বিবরণে এই ডাকটিকিট চিত্রিত হয়েছে। তৎকালীন পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচনে আওয়ামী লীগকে বাংলার জনগণ ৯৮% ভোটে নির্বাচিত করে, কিন্তু পাকিস্তানি শাসক-শোষক চক্র বাংলার জনগণের রায়কে ভূ-লুণ্ঠিত করে জনগণের ওপর অগণতান্ত্রিকভাবে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে তারা বিচ্ছিন্নতাবাদী ও মুক্তিযোদ্ধাদের গুটিকয়েক 'দুষ্কৃতিকারী' হিসেবে প্রচার করে। এই প্রচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এই ডাকটিকিটে তা মূর্ত হয়েছে। এর উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh ও দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় Rs.2 লেখা আছে। এর নিচের অংশে একটি ব্যালট বাক্সের ছবি এর দু'পাশে ইংরেজিতে ৯৮ লেখা এবং তার উপর % চিহ্ন। বাক্সের উপরে ELECTION ১৯৭০ লেখা। এর পরের ব্যালট পেপার ফেলার অংশে এক টুকরো কাগজের ছবি এর গায়ে VOTE এবং এর নীচের লাইনে RESULTS 167 SEAT লেখা। এর পরের লাইনে OUT OF 288 ও সর্বশেষ লাইনে FOR Bangla Desh লেখা রয়েছে।

ছয়. তিন রুপি মূল্যমানের ডাকটিকিটে উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh ও দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় জং.৩ লেখা আছে। নিচের দিকে ডাকটিকিটটিতে একটি বক্তব্যধর্মী বিশেষ ধরনের ছবির ব্যবহার দেখা যায়। এটি একটি সদ্য বিচ্ছিন্ন শিকলের ছবি। শিকলটি বিচ্ছিন্ন হয়ে দু'টি আলাদা অংশে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। ডানদিকের বিচ্ছিন্ন অংশটি অনেকটা বাংলাদেশের মানচিত্রের মত দেখতে। এই শিকলের ছবির উপরের লেখা আছে PROCLAMATION OF INDEPENDENT GOVERNMENT অর্থাৎ স্বাধীন সরকারের ঘোষণা। এর নিচে লেখা আছে বিপ্লবী স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের ঘোষণার দিন 10th APRIL ১৯৭১.

সাত. পাঁচ রুপি মূল্যমানের ডাকটিকিটটি মুক্তিযুদ্ধের মহান নেতা স্বাধীন বাংলার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের ছবিসম্বলিত। এর উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh ও দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় Rs.5 লেখা আছে। নিচের অংশে সোনালি জমিনের উপর বিপ্লবী বাংলাদেশ সরকারের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমানের ছবি, ছবির বাম দিকে সাদা হরফে লেখা SHEIKH MUJIBUR RAHMAN.

আট. দশ রুপি মূল্যমানের ডাকটিকিটটি বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবি অঙ্কিত একটি ডাকটিকিট। এর উপরের অংশে বাংলাতে বাংলাদেশ এবং ইংরেজিতে Bangla Desh ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুই বাংলাদেশ লেখার মাঝখানে POSTAGE REVENUE লেখা। ডান পাশে কোণায় Rs.10 লেখা আছে। এর নিচের ডানদিকে বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবি। এই ছবির বাম দিকে SUPPORT লেখা। ঠিক এর নিচে আড়াআড়িভাবে BANGLA এবং মানচিত্রের নিচে DESH লেখা।

আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী বিমান মল্লিক এই ডাকটিকিটগুলোর ডিজাইন করেন। ব্রিটিশ এম. পি. জনস্টোনহাউস মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য মন্ত্রীদের সাথে আলাপ করে সরকারের নির্দেশেই ডাকটিকিটগুলো প্রকাশনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।[৭৮] এসব ডাকটিকিট বিশ্বের বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়।

৬. ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা (জুন-ডিসেম্বর, ১৯৭১)

ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিরা মূলত বিভিন্ন সংগঠনের মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা রেখেছেন। বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আঞ্চলিক সংগঠনকেন্দ্রিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে নিজেদের জড়িত করেছে অবার বৃহত্তর পরিবেশে অনেকেই সংশ্লিষ্ট হয়েছেন রাজনৈতিক দলের সঙ্গে। প্রবাসী বাঙালিদের ব্যক্তিক উদ্যোগ বা স্থানীয় কমিউনিটি কর্মকাণ্ড ছাপিয়ে রাজনৈতিক চেতনাগত প্রবাহ তাদেরকে প্রভাবিত করেছে। মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রবাসী বাঙালিরা ব্যক্তিগত বা সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি অতিক্রম করে স্বাধীনতার মূল ধারায় ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। বিভিন্ন স্টিয়ারিং কমিটি ও অ্যাকশন কমিটির সঙ্গে আওয়ামী লীগের বিভিন্ন আঞ্চলিক বা কেন্দ্রীয় কমিটিগুলোতে সক্রিয় থেকেছেন।

মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই ব্রিটেনে আওয়ামী লীগ সংগঠন ক্রিয়াশীল থাকার ফলে দলীয়ভাবে প্রবাসী বাঙালিদের সে ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত হতে অসুবিধা হয়নি। তবে বামদল যেমন কমিউনিস্ট পার্টি ও ন্যাপের একটি অংশ ব্যতিরেকে কট্টরপন্থি হিসেবে চিহ্নিত চীনের মতাদর্শের অনুবর্তী গ্রুপ এমন কর্মকাণ্ডে ও বক্তব্যে নিজেদের জড়িয়ে নিয়েছে যা মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রশ্নবিদ্ধ করেছে। স্বাধীনতার প্রশ্নে বিভ্রান্তি ছড়িয়েছে এমনি অবস্থায় আওয়ামী লীগ স্বাভাবিক কারণেই সাংগঠনিক অবস্থানকে সুদৃঢ় ও কর্মকাণ্ডকে সুবিস্তৃত করতে সচেষ্ট থেকেছে। জনাব আবদুস সামাদ আজাদ এক ঝাটিকা সফরে বার্মিংহাম, ম্যানচেস্টার, ব্রাডফোর্ড, লুটন, সেন্ট আলোবান্স, হ্যাল্যিক্স, কিথলীসহ বিভিন্ন স্থানে আওয়ামী লীগ আয়োজিত জনসভায় মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষিত, বিশ্ব কূটনৈতিক যোগাযোগ ও অগ্রগতি সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ অক্টোবর আওয়ামী লীগের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় সেখানে বার্মিংহাম ব্রাডফোর্ড ও ম্যানচেস্টার আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরাও অংশগ্রহণ করেন। এই নেতা-কর্মীরা যেমন আঞ্চলিকভাবে গঠিত আওয়ামী লীগ কমিটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন পাশাপাশি তেমনি বিভিন্ন অ্যাকশন কমিটি বা স্টিয়ারিং কমিটির সঙ্গেও সম্পৃক্ত ছিলেন।

১৯৭১ সন। ৪ জুন। শুক্রবার। বাংলাদেশ মহিলা সমিতি মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে একটি মিছিল বের করে। দু'শ মহিলা ও শিশু এতে অংশ নেয়। শাড়ি পরিহিত এসব মহিলা সহজেই পথচারীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। এরা বহন করেন পোস্টার ও প্ল্যাকার্ড। মহিলা সমিতির আহ্বায়ক জেবুন্নেসা বক্স এর নেতৃত্ব দেন। মিছিলকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন মিসেস জাহানারা রহমান। সমিতির পক্ষ থেকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিনিধিদলের নেত্রী হিসেবে বক্স ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্থ হীথের নিকট পাকিস্তান সামরিক সরকারকে সাহায্যদান বন্ধ, তাদের বর্বরোচিত অমানবিক নৃশংস কর্মকাণ্ডের নিন্দা এবং মুজিবনগর সরকারের স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি পেশ করেন। প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষে এই সমিতি সেইভ দ্যা চিলড্রেন ফান্ড, ব্রিটিশ রেডক্রস সোসাইটি ও ক্রিশ্চিয়ান এইডসহ বিভিন্ন সংস্থার নিকট ত্রাণ কার্য পরিচালনার জন্য আবেদন পেশ করেন।

প্রবাসী বাঙালিদের মধ্যে শ্রমজীবী বাঙালির সংখ্যা অনুপাতে সিংহভাগ। হাজার হাজার শ্রমজীবী মানুষ বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঐক্যবদ্ধভাবে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৭০ সালে পাকিস্তান জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সমাজতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শোষণমুক্তির প্রতিশ্রুতি ঘোষণা করলে দেশের অভ্যন্তরে শ্রমিক শ্রেণি যেমন তেমনি প্রবাসে শ্রমজীবী মানুষের মধ্যে নতুন আশা ও আস্থার সঞ্চার হয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে নানা চক্রান্ত ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল ছিন্ন করে স্বাধীনতা সংগ্রামের উজ্জীবিত আকাঙ্ক্ষায় শ্রমজীবী মানুষ ঝাঁপিয়ে পড়ে। ব্রিটেনের শ্রমজীবী মানুষের ঐক্যবদ্ধ গণ-সংগ্রামকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে। শুধু বিভিন্ন মিটিং ও গণসমাবেশে অংশগ্রহণেই নয় কষ্টার্জিত বেতন থেকে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করার জন্য চাঁদা প্রদান করেছেন সাধ্যমত। জাতীয় শ্রমিক লীগের সভাপতি মোহাম্মদ শাজাহান ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল মান্নান ব্রিটেনে শ্রমিকদের সংগঠিত করেছেন। ব্রিটেনের ইঞ্জিনয়ারিং শ্রমিকদের নেতা হিউস্ক্যানলন্, রাসায়নিক শ্রমিক নেতা বর অ্যাডওয়ার্ডস, সিনেমা শিল্পের শ্রমিক নেতা অ্যালান স্যাপার, খনি শ্রমিকের নেতা লরেন্স ড্যালি ছাপাখানার শ্রমিদের নেতা রিচার্ড ক্রিগিনশ'-এর সঙ্গে আবদুল মান্নান সাক্ষাৎ করেন। শ্রমজীবী মানুষের কল্যাণে ব্রিটিশ শ্রমিক আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ শুধু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থনই দেননি, তারা আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন। প্রবাসী শ্রমজীবী মানুষের অবদান ইতিহাস নির্দিষ্ট। তবে এসব শ্রমজীবী মানুষ প্রবাসে শ্রম সংগঠনের চাইতে মুলধারায় আন্দোলনে সক্রিয় বা তৎপর ছিলেন।

ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিরা মুক্তিযুদ্ধের সময় প্রায় প্রত্যেকেই হয়ে উঠেছিলেন একজন স্বেচ্ছা-সৈনিক।

আবদুল মালেক একজন প্রবাসী সমাজকর্মী, পূর্ব লন্ডনের বাসিন্দা। তিনি ব্রিটিশ টেলিভিশনের একটি সংবাদ পরিক্রমা[৭৯] দেখে রাতেই শ্রমিক দলীয় পার্লামেন্ট সদস্য পিটার শোরকে টেলিফোনে এই মিথ্যা প্রচারের জোরালো প্রতিবাদ জানাতে বলেন। শোর তাকে বলেন যে, প্রবাসী বাঙালিদের পক্ষ থেকে একটি প্রতিবাদপত্র নিয়ে তাকে পার্লামেন্টে সাক্ষাৎ করতে। আবদুল মান্নান তার কন্যার সাহায্যে একটি প্রতিবাদলিপি টাইপ করে পরদিন পিটার শোর নিকট পৌঁছে দেন। পিটার শোর ও অন্যান্য সদস্য এ প্রতিবাদপত্র তুলে ধরে বাংলাদেশবিরোধী প্রচারণা বন্ধের দাবি জানান। একটিমাত্র ঘটনার মধ্যে দিয়ে প্রমাণিত হয় ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের দেশের প্রতি মমত্ববোধ, স্বাধীনতার প্রতি অঙ্গীকার এবং স্বাধীনতাবিরোধীদের প্রতি সতর্ক ও সচেতন দৃষ্টি।

২০শে জুলাই বাংলাদেশ স্টুডেন্টস্ অ্যাকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন লন্ডনে অনুষ্ঠিত 'আমেরিকান বার এসোসিয়েশনের' বার্ষিক সম্মেলনে দি গার্ডিয়ান পত্রিকার অর্ধ পৃষ্ঠাব্যাপী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি খোলা চিঠি বিজ্ঞাপন আকারে প্রকাশের ব্যবস্থা করে। 'খোলা চিঠি'তে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, ধর্ষণ, নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করা হয়। এসোসিয়েশনের সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলা হয় বাঙালিদের দুঃখ-দুর্দশা, নির্যাতন এবং গণহত্যা সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে তারা এমনভাবে অবহিত করেন যেন এই নৃশংস পাশবিকতার অবসান ঘটাতে পারেন।

এই খোলা চিঠিতে বার সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে আবেদন জানানো হয় 'জেনোসাইড কনভেনশন'-এর ধারাগুলো। 'স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি'র ছাত্রছাত্রী বার সমিতির সদস্যদের পাঁচ দফা দাবি প্রেসিডেন্ট নিক্সনের দৃষ্টি আকর্ষণ করাতে তাদের প্রতি আবেদন জানান। ছাত্রদের পাঁচ-দফা দাবির মধ্যে: ১. পাকিস্তানে অবিলম্বে মার্কিন সামরিক সাহায্য বন্ধ; ২. বাংলাদেশে থেকে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী প্রত্যাহার; ৩. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমানের মুক্তি; ৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান; এবং ৫. পাকিস্তান কর্তৃক 'জেনোসাইড কনভেনশন' ভঙ্গ ও বিশ্বশান্তি বিপন্ন করার জন্য সমগ্র বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন।

এই পাঁচ-দফা দাবি বিশ্লেষণ করলে সহজেই প্রতীয়মান হবে, প্রবাসী ছাত্র, রাজনীতিক, কূটনীতিক, ব্যবসায়িক, আইনজীবী, চিকিৎসক, শ্রমিক-মালিক-ব্যবসায়ী সকলেই স্ব স্ব অবস্থান থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সর্বত্রই একটি বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন বাঙালি জাতি স্বাধীনতা ও মুক্তির প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ ও আপোষহীন, নেতৃত্বের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও আস্থা এবং বিশ্ব শান্তি ও মানবতার প্রতি প্রত্যয়বদ্ধ অঙ্গীকার।

১লা আগস্ট লন্ডনে পল্ কনেটের নেতৃত্বে অনুমিত জনসভায় প্রায় বিশ হাজার প্রবাসী বাঙালি যোগ দেন। ট্রাফালগার স্কয়ারে অনুষ্ঠিত এ সভা ছিল ঐতিহাসিক। গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশের স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবিকে মুহুর্মুহু জয়বাংলা স্লোগানের মধ্যে বক্তারা উদ্দীপক ভাষণ দেন।

১১ই সেপ্টেম্বর গ্রেটার লন্ডনস্থ সাউথলে স্থানীয় বাঙালিদের উদ্যোগে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত জনসভায় 'সাউথল বাংলাদেশ সংগ্রাম' পরিষদ গঠিত হয়। সংগ্রাম পরিষদের ১১ সদস্যবিশিষ্ট ওয়ার্কিং কমিটি ও ২২ জন সাধারণ সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়।

৩০শে সেপ্টেম্বর 'বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গ্রেট ব্রিটেন' এক দীর্ঘ বুলেটিন প্রচার করে।[৮০] বুলেটিনে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি করা হয়।

১-১০ সেপ্টেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সভায় লন্ডনে বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটির একটা প্রতিনিধিদল গমন করেন।[৮১] প্রতিনিধিদলটি বিভিন্ন দেশ থেকে আগত জনপ্রতিনিধিদের কাছে বাংলাদেশে পাকিস্তানি-গণহত্যার চিত্র তুলে ধরেন। বাংলাদেশের প্রতিনিধিগণ কয়েকটি মুসলিম দেশ বিশেষ করে মিশর ও জর্ডানের প্রতিনিধিদেরকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যৌক্তিকতা ব্যাখ্যায় সফল হন।[৮২] উক্ত দেশ দুটির পাকিস্তানের প্রতি বিশেষ দুর্বলতা ছিল। এভাবে লন্ডনের বাঙালি ছাত্র- জনতা ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত গঠন করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাদের প্রচেষ্টায় এসব দেশের অনেক পত্র-পত্রিকা, বিভিন্ন পেশার মানুষ ও সাধারণ অথচ সচেতন জনগোষ্ঠী বাংলাদেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

ব্রিটেনে অবস্থানকারী বাঙালি ডাক্তার ও মেডিকেল ছাত্ররাও অ্যাকশন কমিটিতে অত্যন্ত সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন। বাঙালি ডাক্তারদের মধ্যে জাগরণ সৃষ্টি এবং তাদেরকে আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার পেছনে ছিল কয়েকজন ডাক্তারের বিশেষ অবদান। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডা. নূরুল আলম ও ডাক্তার সাইদুর রহমান প্রমুখ। এরা বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে সংগঠিত করেন বিভিন্ন স্থানের চিকিৎসক এবং মেডিকেল ছাত্রদের। তাঁদের ব্যানারে অর্থ সংগ্রহ করেন। সেই সাথে ব্রিটেনের বিভিন্ন ঔষধ প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান এবং সাহায্যকারী সংস্থার কাছ থেকেও ঔষধ ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ করেন, তা প্রেরণ করেন রণাঙ্গনে।

৭ই অক্টোবর ১৯৭১ সালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পুত্র রাশেদ সোহরাওয়ার্দী লন্ডনে এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করেন। ইতোপূর্বে পাকিস্তান সরকারের প্রচারের অংশ হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর কন্যা আখতার সোলায়মানকে দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে এক বিবৃতি প্রদান করে। রাশেদ সোহরওয়ার্দী তাঁর বক্তব্যে ঐ বিবৃতিতে তাঁর পিতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর ভাবমূর্তি নষ্ট করার প্রচেষ্টা বলে আখ্যায়িত করেন।[৮৩] রাশেদ সোহরাওয়ার্দীর এই বিবৃতি বাংলাদেশ মিশনের প্রেস এবং পাবলিসিটি ডিভিশন থেকেও প্রচার করা হয়।

১৯৭১ সালের ২৬ অক্টোবর বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ লন্ডনের হেনরি থরানাটন স্কুল মিলনায়তনে একটি জাতীয় ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠানের কর্মসূচি গ্রহণ করে। সম্মেলনে ৯টি প্রস্তাব গৃহীত হয় : ১. বাংলাদেশ জাতীয় ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণাকে পুনরায় স্বাগত জানায় এবং মুক্তি অর্জন না করা পর্যন্ত যে-কোনো ত্যাগ স্বীকারের অঙ্গীকার করে; ২. সম্মেলন বিশ্ব জনমতকে জানিয়ে দিতে চায় যে, সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া অন্য কোনো রাজনৈতিক সমাধান বাঙালিরা মেনে নেবে না; ৩. সম্মেলন পাকিস্তান জান্তার হাতে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি এবং তাঁদের উপর যাতে কোনো নির্যাতন না হয় তার নিশ্চয়তাদানের জন্য জাতিসংঘসহ বিভিন্ন সরকারের কাছে আবেদন জানায়; ৪. সম্মেলনে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীকে অবিলম্বে প্রত্যাহারের দাবি জানায়; ৫. ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত জনগণের সাহসিকতা, দেশপ্রেম ও আত্মত্যাগের জন্য অভিনন্দন জানায় এবং বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে সংগ্রামী ঐক্য কামনা করে; ৬. লন্ডনে অনুষ্ঠিত ছাত্র সম্মেলন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের রক্তিম অভিবাদন জানায় এবং তাদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামে একাত্মতা ঘোষণা করে; ৭. সম্মেলনে বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের ভারতে আশ্রয়দান এবং সাহায্য প্রদানের জন্য ভারতের জনগণ ও সরকারের প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে; ৮. সম্মেলনে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধীদের দেশের অভ্যন্তরে এবং প্রবাসে হুঁশিয়ার করে দেওয়া হয় এবং তাদের যে কোনো ষড়যন্ত্রকে প্রতিহত করার আহ্বান জানানো হয়; এবং ৯. ব্রিটেনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাঙালি ছাত্রদের বিভিন্ন সাহায্য প্রদান এবং বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত আন্দোলনে প্রবাসী বাঙালিদের প্রতি সহযোগিতার জন্য সম্মেলন বিলাতের জনগণ ও সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

৩০শে অক্টোবর বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটির স্টিয়ারিং কমিটি হাইডপার্কে এক জনসমাবেশ ও গণ মিছিলের আয়োজন করে।[৮৪] মিছিলটি ক্লারিজেস হোটেলে যায় এবং এক প্রতিনিধিদল ইন্দিরা গান্ধীর সাক্ষাৎ করলে তিনি বলেন, "শীঘ্র বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান হবে।" ভারত কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সাহায্যদানের জন্য কিছুসংখ্যক চীনপন্থি বাঙালি ভারতের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা প্রচারে আত্মনিয়োগ করে। চীনের বাংলাদেশবিরোধী নীতির সমর্থকরা দাবি করে, মুজিবনগর সরকারের প্রতি ভারতের সমর্থন দূরভিসন্ধিমূলক। বাংলাদেশকে ভারতের উপনিবেশ করাই তাদের আসল উদ্দেশ্য। ভারতবিরোধী প্রচারে চীনপন্থিরা মওলানা ভাসানীর নাম ব্যবহার করে। ভারতে ও বিদেশে প্রচারিত বিবৃতিতে বলা হয়, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি ব্যাহত করার জন্য ভারত সরকার মওলানা ভাসানীকে গৃহবন্দি অবস্থায় দিনযাপন করতে বাধ্য করেছে। কিন্তু মওলানা ভাসানী এই মিথ্যা প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। ১২ই নভেম্বর বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নিকট লিখিত এক পত্রে তিনি গৃহবন্দি থাকার সংবাদ দূরভিসন্ধিমূলক বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, যখন খুশি এবং যে-কোনো জায়গায় যাওয়ার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা তিনি ভোগ করছেন।[৮৫]

বিলেতে প্রবাসী বাঙালিরা ডিসেম্বর মাসের প্রথমদিকে লন্ডনস্থ বিভিন্ন দূতাবাসে গিয়ে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানান। ৬ই ডিসেম্বর ভারত সরকার কর্তৃক স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রীর উক্ত স্বীকৃতি ঘোষণায় পাকিস্তান ভারতের সাথে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। এই ঘোষণার ফলে এতদিনের অঘোষিত শত্রুতা প্রকাশ্য যুদ্ধের রূপ লাভ করে। ভারত-পাকিস্তানের সীমান্তেও যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে। প্রবাসী বাঙালিরা প্রতিদিন রণাঙ্গনের অগ্রগতি পত্র-পত্রিকা ও রেডিও-টেলিভিশনে অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রেখে বিলাতে বিভিন্ন প্রচার কার্য অব্যাহত রাখে। এদিকে বিশ্বজনমতকে আকর্ষণ করার জন্য বিলেতের সংগ্রাম পরিষদসমূহের কেন্দ্রীয় স্টিয়ারিং কমিটি ১২ই ডিসেম্বর বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে হাইড পার্ক স্পিকার্স কর্নারে এক সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন করে। উক্ত সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগের সভাপতি গাউস খান।[৮৬]

৭. ব্রিটেনে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিতে প্রবাসী বাঙালিদের আন্দোলন[৮৭]

২৬শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'রাষ্ট্রদ্রোহী' ঘোষণা করে অবিলম্বে তাঁর শাস্তিদানের সংকল্প ব্যক্ত করেন। বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানে নিয়ে কারাগারের নির্জন প্রকোষ্টে আটক রাখা হয়।

লন্ডনে আগস্ট মাসের প্রথম সপ্তাহে ব্রিটিশ পত্রিকায় বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার শুরু হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। জাতীয় ও আন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

র্জাতিক ক্ষেত্রে বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে যে ব্যাপক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া শুরু হয় যে সম্পর্কে ভিন্ন অধ্যায়ে আলোচনার অনিবার্যতা বিদ্যমান। এ সংবাদে উদ্বিগ্ন বিচারপতি চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন আইনজীবী শোন্ ম্যাক্‌ব্রাইডকে ইসলামাবাদে পাঠাবার ব্যবস্থা করেন। লন্ডনের বার্নাড শেরিডান সলিসিটার্স নামের প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে একজন অভিজ্ঞ সলিসিটারও তাঁর সঙ্গে যান। ইয়াহিয়া খানের আইনবিষয়ক উপদেষ্টা কর্নেলিয়াস আইনজীবী শোন্ ম্যাক্‌ব্রাইডকে বলেন, কোনো বিদেশি আইনজীবীকে শেখ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাৎ অথবা তাঁর পক্ষ সমর্থন করতে দেওয়া হবে না। ইয়াহিয়ার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রুদ্ধদ্বার কক্ষে শেখ মুজিবের বিচার এবং তাঁর পক্ষ সমর্থন করার জন্য একজন পাকিস্তানি আইনজীবী নিয়োগ করা হবে। আইনি সহায়তায় বাধাদান লন্ডনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

সামরিক আদালতে গোপনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি এবং তার প্রতিবাদ করার জন্য ১১ই আগস্ট হাইডপার্ক স্পিকার্স কর্ণারে এক গণসমাবেশে ব্রিটিশ সরকারকে শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা বিধানে কূটনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানানো হয়। সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক আইজুল হক মিয়া এবং প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। সমাবেশে বক্তৃতা রাখেন ব্রিটিশ এম. পি. পিটার শোর, মাইকেল বার্নস, ব্রুস ডগলাস-ম্যান, জন স্টোনহাউজ, রেজ প্রেন্টিস ও লগ গিফোর্ড ও বাংলাদেশের সমর্থক ব্রিটিশ নাগরিকবৃন্দ। এছাড়াও বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদের পক্ষে বক্তব্য রাখেন গাউস খান, শেখ আবদুল মান্নান, ব্যারিস্টার সাখাওয়াত হোসেন এবং লুলু বিলকিস বানু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ। সমাবেশ শেষে বিচারপতি চৌধুরী ও ব্রিটিশ এম.পিদের নেতৃত্বে একটি মিছিল ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে গমন করে এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে শেখ মুজিবুর রহমানের বিরুদ্ধে গোপন বিচার বন্ধ ও তাঁর মুক্তির দাবি জানিয়ে একটি স্মারকলিপি প্রদান করা হয়।

ইংল্যান্ডের লুটন শহরে একটি বিশাল র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে। এই শহরে এর আগে এত বড় মিছিল হয়নি।

বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা ও বাংলাদেশ সরকারের রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পাকিস্তানে গোপন বিচারের বিরুদ্ধে বিশ্বজনমত সৃষ্টি করার জন্য বাংলাদেশ ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ব্রিটিশ পত্র-পত্রিকায় একটি বড় ধরনের বিজ্ঞাপন প্রদানের ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করে। ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ বিজ্ঞাপন প্রদানের উদ্দেশ্যে আর্থিক সহযোগিতার জন্য বিলাতের বিভিন্ন সংগ্রাম পরিষদসমূহের কাছে আহ্বান জানিয়ে পত্র দেন। এই আহ্বানে সাড়া দিয়ে ৬৩টি কমিটি সহযোগিতা করতে সম্মতি জানায়। ৬৩টি কমিটির নামসহ ১৬ই আগস্টের 'দি টাইমস পত্রিকা'য় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা হয়। বিজ্ঞাপনে যে শিরোনাম শোভা পায় তা হলো– "Wake up world – please act immediately to stop camera trial-secure release of the President of the Peoples Republic of Bangladesh." বিজ্ঞাপনে সংক্ষেপে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি এবং ২৫শে মার্চ থেকে সংঘটিত হত্যাযজ্ঞের একটি বিবরণ প্রদান করা হয়। বিজ্ঞাপনে শেখ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুজিবুর রহমানের গোপন বিচারের প্রচেষ্টাকে ন্যাক্কারজনক, দূরভিসন্ধিমূলক আখ্যায়িত করে এই বিচার বাংলাদেশের সকল জনগণের বিরুদ্ধে বিচার অনুষ্ঠানের শামিল বলে উল্লেখ করা হয়। এতে বিশ্ব বিবেকের কাছে প্রশ্ন রাখা হয়, "Can the world really afford to watch such an outrageous act of vengeance?" বিজ্ঞাপনে বাংলাদেশের নির্যাতিত স্বাধীনতাকামী জনগণের পক্ষে ব্রিটিশ সরকার, জাতিসংঘ ও বিশ্বের জনগণের নিকট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা ও তার মুক্তি দাবি করা হয়।

বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে মার্কিন, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন, ভারত, চীন, জাপানসহ বিভিন্ন দেশে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে বিশ্বব্যাপী কূটনৈতিক তৎপরতা এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন ও শেখ মুজিবের মুক্তি সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়।

৮. পাকিস্তানের বাঙালি কূটনীতিকদের মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বজোড়া যেসব বাঙালি কূটনীতিবিদ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য গ্রহণ করেন তাঁদের একটি তালিকা পরিশিষ্ট ৩.খ-এ দেওয়া হয়েছে। উক্ত তালিকানুযায়ী পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগকারী প্রথম কূটনীতিক, দিল্লির পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত দ্বিতীয় সচিব কে.এম. শেহাবুদ্দিন ও সহকারী প্রেস এটাচি আমজাদুল হক।[৮৮] প্রবাসী মুজিবনগর সরকারের শপথ গ্রহণের (১৭.৪.৭১) পরদিন কলকাতাস্থ পাকিস্তান ডেপুটি হাই কমিশন অফিসে কর্মরত ডেপুটি হাই কমিশনার এম. হোসেন আলী ও অন্যান্য ৫জন কূটনীতিক, ১৮ই এপ্রিল পাকিস্তান সরকারের পক্ষ ত্যাগ করে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। ভারতের বাইরে প্রথম বাঙালি কূটনীতিক, নিউইয়র্কের ভাইস কনসাল এ.এইচ. মাহমুদ আলী পাকিস্তান কনস্যুলেট ত্যাগ করে বাংলাদেশ সরকারের আনুগত্য ঘোষণা করেন। এরপর থেকে ক্রমাগতভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিকগণ বাংলাদেশের আনুগত্য ঘোষণা করতে থাকেন। ওয়াশিংটনস্থ পাকিস্তান হাইকমিশনে কর্মরত আবদুর রাজ্জাক খান ১৭ই মে এবং আবুল মাল আবদুল মুহিত ৩০ জুন ঘোষণা দিয়ে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। অবশ্য ২৬শে মার্চ থেকেই তাঁরা গোপনে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করছিলেন।

৫ই জুলাই মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কর্মরত বাঙালি কূটনীতিবিদগণকে বাংলাদেশ সরকারের প্রতি অনুগত্য ঘোষণার আহ্বান জানান এবং তাদের চাকরির নিশ্চয়তা প্রদান করেন। এই অহ্বানে সাড়া দেন ওয়াশিংটন ও নিউইয়র্কে কর্মরত প্রায় সকল কূটনীতিবিদ (পরিশিষ্ট ৩.খ দ্রষ্টব্য)।

পলকানেটের নেতৃত্বাধীন 'অ্যাকশন বাংলাদেশের' উদ্যোগে ১লা আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারের সভায় পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মহিউদ্দিন আহমদ পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন। ১১ই আগস্ট লন্ডনের হাইড পার্কের এক জনসভায় পররাষ্ট্র দপ্তরের লুৎফুল মতিন ও ফজলুল হক চৌধুরী বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পক্ষাবলম্বন করেন।[৮৯] এটা ছিল ব্রিটেনের বাঙালিদের বিরাট কূটনৈতিক সাফল্য। এ সভা থেকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা ১০ নং ডাউনিং স্ট্রিটে গমন করে এবং রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার দাবি সম্বলিত একটা স্মারকলিপি ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী বরাবর পেশ করা হয়। লন্ডনের টাইমসসহ বেশ কিছু পত্রিকায় এ খবর পরদিন ফলাও করে প্রকাশিত হয়। এতে বাঙালিদের আন্দোলনের প্রতি ব্রিটেনের জনগণেরও সহমর্মিতা বৃদ্ধি পায়।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টায় আগস্ট মাসে ইরাকে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আবুল ফতেহ এবং সেপ্টেম্বরে আর্জেন্টিনায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবুল মোমেন বাংলাদেশের পক্ষে আনুগত্য ঘোষণা করে বাংলাদেশ সরকারের পররাষ্ট্র বিভাগে যোগ দেন। ২৭শে আগস্ট লন্ডনের বেজওয়াটার এলাকায় ২৪ নং পেমব্রিজ গার্ডেনের ওয়েস্ট এন্ডে দেশি-বিদেশি সাংবাদিকের সামনে বাংলাদেশ দূতাবাস স্থাপন করা হয়। ভারতের বাইরে লন্ডনেই প্রথম বাংলাদেশ মিশন স্থাপিত হয়। ১১ নং গোরিং স্ট্রিট থেকে সাংগঠনিক কর্মকান্ড এবং পেমব্রিজ গার্ডেনে কূটনৈতিক ও সরকারি কার্যক্রম চলতে থাকে। অফিস দুটো হলেও রাজনৈতিক, সাগঠনিক ও সরকারি কার্যক্রমের মধ্যে সমন্বয় করা হতো।[৯০]

৭ই অক্টোবর লন্ডনস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের কাউন্সিলর বাঙালি কূটনীতিবিদ রেজাউল করিম পাকিস্তান সরকারের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেন। তিনি এক বিবৃতিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে বিশ্বের সকল শান্তিপ্রিয় গণতান্ত্রিক সরকার ও জনগণকে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি ও সমর্থনের আবেদন জানান। এভাবে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করার প্রত্যয় ঘোষণা করেন এবং লন্ডনস্থ বাংলাদেশ মিশনে যোগদান করেন।

৭ই নভেম্বর স্টিয়ারিং কমিটি প্রকাশিত বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা ১২ই নভেম্বর পৃথিবীর বিভিন্ন রাজধানীতে পাকিস্তান সরকারের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাঙালি কূটনীতিবিদদের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অংশগ্রহণের খবর পরিবেশ করে। জেনেভাস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের বাঙালি দ্বিতীয় সচিব ওয়ালিউর রহমান পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে সুইজারল্যান্ডে রাজনৈতিক আশ্রয় লাভ করেন। এছাড়া নেপালের পাকিস্তান দূতাবাসের দ্বিতীয় সচিব মুস্তাফিজুর রহমান, কায়রোর হেড অফ চেন্সারি ফজলুল করিম, টোকিও দূতাবাসের প্রেস এটাচি এস.এম. মাসউদ এবং টোকিও দূতাবাসের তৃতীয় সচিব আব্দুর রহিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে যোগদান করে। এ সকল সম্পর্কচ্ছেদের ঘটনা বিলম্বে হলেও গুরুত্বপূর্ণ ইঙ্গিত বহন করে। মূলত ৪টি বিষয়কে গভীরভাবে স্পর্শ করে: এক. বাঙালি জাতির ঐক্য অভিন্ন; দুই. মুক্তিযোদ্ধাদের মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধকরণ; তিন. স্বাধীন বাংলাদেশের বিশ্ব পরিসরে আত্মপ্রকাশের বার্তা; এবং চার. আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দৃশ্যত কূটনৈতিক তৎপরতার সাফল্য।[৯১]

৯. যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

প্রায় পাঁচ হাজার বাঙালি মুক্তিযুদ্ধের প্রাক্কালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী ছিলেন।[৯২] যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসীরা ২৫শে নভেম্বর, ১৯৭০ ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস কবলিত পূর্ব পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি অবহেলার প্রতিবাদ জানিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট একটি লিখিত চিঠি প্রেরণ করেন। তখনই গঠিত হয় 'আমেরিকান পাকিস্তান লীগ'। এই সংগঠন গঠিত হবার পর প্রকৃতপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে রাজনৈতিক কার্যক্রম শুরু হয়। লিখিত পত্রে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বৈষম্য এবং পাকিস্তানের শাসক-চক্রের চরম অবহেলার কথা উল্লেখ করে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করা হয়।[৯৩]

২৬শে মার্চের পূর্ব থেকে প্রবাসী ছাত্ররা বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করে আসছিলেন। পূর্ব পাকিস্তানে রক্তপাত না ঘটিয়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার জন্য পাকিস্তানি সামরিক সরকারের উপর কার্যকর প্রভাব বিস্তারের আবেদন জানিয়ে এসব তারবার্তা প্রেরিত হয়। যাঁদের বরাবরে তারবার্তা পাঠানো হয় তাঁদের মধ্যে ছিলেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল ইউ থান্ট, মার্কিন প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, মার্কিন সিনেটর এবং বৃহৎ দেশের সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান এবং বিশ্ববরেণ্য নেতৃবৃন্দ উল্লেখ্য। ২৫শে মার্চের পর পরই এক ঘন্টার নোটিশে ছাত্ররা এক সভায় মিলিত হন। সেই থেকেই স্বাধীনতার পক্ষে তাদের কার্যক্রম শুরু। উদ্যোক্তরা প্রত্যেকে ন্যূন একশত ডলার চাঁদা প্রদানের প্রস্তাব গ্রহণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে ৩ হাজার ডলার সংগৃহীত হয়।

২৫শে মার্চের ঘটনার পর নানামুখি তৎপরতা শুরু হয়। প্রবাসী বাঙালিদের মূল কার্যক্রমের টার্গেট ছিল মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি অবস্থানের বিরোধীতা। প্রচার চালানো হয়েছে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম আমেরিকার গৃহযুদ্ধের সাথে তুলনীয়। 'ইস্ট পাকিস্তান লীগ' নামক একটি সংগঠন কর্তৃক ৫ এপ্রিলে বিলি করা এক প্রচারপত্রে বলা হয় যে, গৃহযুদ্ধ নয়, মার্কিনীদের স্বাধীনতা যুদ্ধের সাথে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের একমাত্র তুলনা চলে। এই সংগঠন তাদের নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ লীগ' নামে আত্মপ্রকাশ করে। সব সরকার ও রাষ্ট্রকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পাকিস্তানকে সাহায্য না করার জন্য অনুরোধ জানায়। কাজী এস.আহমেদ এর সভাপতি হন। মুজিবনগর সরকারের সাথেও এরা যোগাযোগ স্থাপন করে।[৯৪]

২৭শে মার্চ বিকালে ওয়াশিংটন ডিসিতে প্রবাসী বাঙালিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তানের গুরুত্বর্পূ কূটনীতিক এ.এম.এ. মুহিতের বাড়িতে।[৯৫] সে সভায় ঢাকায় পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর ধ্বংসলীলা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সিদ্ধান্ত হয় যে, পূর্বাংশে পাকিস্তানের কবর রচিত হয়েছে। সুতরাং পাকিস্তান নিয়ে কারো মাথাব্যথার প্রয়োজন নেই। পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে কত দ্রুত বাংলার মাটি থেকে বিতাড়িত করা যায় সেটাই একমাত্র কাজ। সেই সভায় আমেরিকা প্রবাসী বাঙালিদের তাৎক্ষণিক করণীয় হিসেবে বলা হয়: ১. আমেরিকার নেতৃত্ব, জনগণ ও বিশ্ববাসীর সমর্থন বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে নিয়ে আসা। বাংলার মাটিতে সংঘটিত ঘটনাবলির সঠিক তথ্য তাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া; ২. বাংলার মাটি থেকে সৈন্যদের উচ্ছেদ করার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করা; ৩. দুর্গত বাঙালিদের জন্য ত্রাণসামগ্রী সংগ্রহ ও প্রেরণ; এবং ৪. পাকিস্তানকে বিশ্বের যে কোনো ফোরামেই হোক অপদস্থ করে তোলা।

এসব লক্ষ্য বাস্তবায়নের জন্য মার্কিন এবং বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট কতগুলি বার্তা প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া মার্কিন কংগ্রেস ভবনের সিঁড়িতে, বিশ্বব্যাংক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের অফিসের সামনে অবস্থান এবং বিক্ষোভ প্রদর্শনের কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ২৯শে মার্চ যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটনে পালিত এই কর্মসূচি বাস্তবায়নে শামসুল বারী উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। র‍্যালির জন্য পুলিশের অনুমতি সংগ্রহ করা থেকে শুরু করে বিভিন্ন স্থানে বসবাসরত বাঙালিদের ফোনে আমন্ত্রণ জানানো এবং রাত্রিযাপনের স্থান নির্ধারণ ইত্যাদি সকল দায়িত্ব তিনি পালন করেন। মাহবুব আলী নামে আরো একজন বাঙালিও এসব কাজে অত্যন্ত উদ্যোগী ছিলেন। উচ্চতর ডিগ্রির জন্য ওয়াশিংটনে আসা রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক এনায়েত রহিম পোস্টার, ফেস্টুন লেখা, স্লোগান তৈরি করা ইত্যাদি অত্যন্ত নিখুঁতভাবে সম্পাদন করেন। আবুল মাল আবদুল মুহিত এবং হারুন রশীদের দায়িত্ব ছিল বিভিন্ন দফতরে প্রেরণের জন্য স্মারকলিপি তৈরি করা। উল্লেখ্য যে, নিউইয়র্ক থেকে ওয়াশিংটন গিয়ে এসব কাজে সহায়তা করেছেন এস.এ.করিম।

২৮শে মার্চ তৈরি অনেকগুলি স্মারকলিপি বাংলাদেশের নাগরিকদের পক্ষ থেকে তারবার্তা করে বিশ্বনেতৃবৃন্দের কাছে পাঠানো হয়। তাঁদের মধ্যে ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন, বিদেশ সচিব উইলিয়াম রজার্স, নিরাপত্তা সহকারী হেনরি কিসিঞ্জার, মার্কিন সিনেটের বৈদেশিক কমিটির চেয়ারম্যান সিনেটর ফুলব্রাইট প্রমুখ। তারবার্তা প্রেরণ করা হয় জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল ইউ থান্ট এবং নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতিকেও। সমাবেশস্থলে সেদিন উপস্থিত হন অনেকগুলো পত্রিকা, রেডিও এবং টেলিভিশনের প্রতিনিধি। সমাবেশের কারণ ব্যাখ্যা করার জন্য নির্ধারিত মুখপাত্রের মতো কাজ করেন শামসুল বারী ও এনায়েত রহিম। বাঙালিদের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে সহানুভূতি সৃষ্টিতে এই র‍্যালি ব্যাপক সফলতা লাভ করে। র‍্যালিটি মার্কিন প্রেসিডেন্টের বাসভবন, বিশ্বব্যাংক সদর দফতর ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিল অফিস প্রদক্ষিণ করে সবশেষে মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টে গিয়ে আবেদন পেশ করে।

মার্চ মাসে 'বাংলাদেশ ডিফেন্স লীগ' গঠিত হয় শিকাগো শহরে। এই সংগঠন গড়ার উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়: ১. বাংলাদেশের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী যে হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে সে সম্পর্কে মার্কিন জনগণকে সম্যক ধারণা দেওয়া। অন্যায়ের বিরুদ্ধে বাঙালিদের জীবন-মরণ লড়াইয়ে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে মার্কিনীদের সহায়তা আদায় করা; ২. পাকিস্তানি সৈন্যদের গণহত্যা এবং বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে সঠিক তথ্য সংগ্রহ, তা যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে প্রচার করা। এ কাজের জন্য একটি তহবিল গঠন ও পরিচালনাও ছিল অন্যতম লক্ষ্য; ৩. পাকিস্তান বিষয়ে মার্কিন সরকারের অনুসৃত নীতি পরিবর্তন করানোর জন্য নিক্সন সরকার এবং মার্কিন কংগ্রেসের কাছে লবি করাটাও ছিল লীগ গঠনের বিশেষ উদ্দেশ্য; ৪. বহু যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী বাঙালির আত্মীয়-স্বজন পাকসেনাদের হাতে প্রাণ দিচ্ছেন। এই আত্মীয়-স্বজনের পাশে দাঁড়ানো, প্রয়োজনীয় সহায়তা দান করা ইত্যাদি ছিল লীগ গঠনের অন্যতম লক্ষ্য।[৯৬]

এপ্রিল মাসে মার্কিন জনগণ এবং নেতৃবৃন্দের প্রতি ইস্ট পাকিস্তান লীগ অব আমেরিকা, নিউইর্য়ক আর একটি আবেদন জানায়। লীগ সভাপতি কাজী শামসুদ্দিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদ প্রেরিত এই আবেদনে যে বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয় তা হলো: প্রথমত, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বুটের তলায় পিষে হত্যা করছে গণতন্ত্রকে, সামরিকবাহিনী দিয়ে বাংলাদেশে মানুষকে নির্বিচার হত্যা ও নারী নির্যাতন করছে দেশব্যাপী। হত্যা করছে শিক্ষক, ছাত্র ও শিশু। সুতরাং এই 'খুনি' পাকিস্তান সরকারকে সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানানো হয়; দ্বিতীয়ত, পূর্ব পাকিস্তানের অগণিত মানুষ বাস্তুত্যাগী। বাড়িঘর হারিয়ে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার মধ্যে বসবাস করছেন; তৃতীয়ত, সমগ্র বাংলাদেশই বধ্যভূমি। বিশ্ববাসী যাতে এই নির্যাতনের সংবাদ অবগত হতে না পারে তার জন্য বিদেশি সাংবাদিকদের আগেই দেশ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। আন্তর্জাতিক কোনো সাহায্য সংস্থাকেও সেখানে ত্রাণকার্য পরিচালনা করার অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। এককথায় বিশ্ব থেকে বাংলাদেশকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে পাকিস্তানি সামরিক জান্তা। এ অবস্থায় দুর্গত মানুষের সেবা ও তাদের মধ্যে ত্রাণকার্য পরিচালনা করার জন্য বিদেশি সাহায্য সংস্থাগুলিকে যেন বাংলাদেশে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করা হয় তার জন্য পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ প্রয়োগ করার দাবি জানানো হয়; চতুর্থত, বাংলাদেশে একটি জাতিসংঘ মিশন প্রেরণ এবং এর মাধ্যমে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে অবহিত হওয়ারও আবেদন অন্তর্ভুক্ত ছিল; এবং সর্বোপরি, বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আবেদন জানানো হয়।[৯৭]

যুক্তরাষ্ট্রে বিভিন্ন স্থানে গড়ে ওঠা অসংখ্য বাঙালি সংগঠন বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা, পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর তাণ্ডব, মুক্তিবাহিনীর তৎপরতা ইত্যাদি সংবাদ সংগ্রহ করে প্রবাসী বাঙালি, যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংগঠন, জনগণ এবং প্রচারমাধ্যমকে গোচরীভূত করতে থাকে। ২৬শে এপ্রিল ইস্ট পাকিস্তান লীগের পক্ষ থেকে যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী সকল বাঙালির উদ্দেশ্যে একটি সার্কুলার বিলি করা হয়। প্রচারিত একই সার্কুলারে প্রথমে প্রবাসীদের অবহিত করা হয় যে, মুজিবনগরস্থ প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে ইস্ট পাকিস্তান লীগের যোগাযোগ হয়েছে। মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ লীগের করণীয় সম্পর্কে কিছু দিক-নির্দেশনাও দিয়েছেন। প্রথমত, মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য তহবিল সংগ্রহ; দ্বিতীয়ত, বাংলাদেশের পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা। পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী কর্তৃক গণহত্যা, নারী নির্যাতন ও হাজারো গ্রামের অগ্নিদগ্ধ বাড়ি-ঘর ইত্যাদির খতিয়ান তুলে ধরা হয়। এই অসহায় 'মানুষকে বাঁচাতে হবে'। মানবতার এই আহ্বানকে বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা, সেবামূলক সংগঠন, দানশীল প্রতিষ্ঠান, ক্লাব, ব্যক্তি, গির্জা সবার কাছে পৌঁছে দিতে হবে। প্রকৃত অবস্থা অবহিত করে তাদের নিকট থেকে আর্থিক ও নৈতিক সমর্থন আদায়ে সচেষ্ট হওয়ার উদাত্ত আহ্বানও ছিল। সমস্ত সাহায্য বাংলাদেশ তহবিলের নামে সংগৃহীত হবে।[৯৮] বাংলাদেশ সরকারের কলকাতা মিশনের ঠিকানাও দেওয়া হয় পত্রে।

২৭শে এপ্রিল একটি দীর্ঘ আবেদন পাঠানো হয় যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন কংগ্রেস সদস্যের প্রতি। 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা, ওয়াশিংটন'-এর পক্ষ থেকে সংগঠনের সভাপতি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বাক্ষরিত এক আবেদনে কংগ্রেস সদস্যদের প্রতি আকুল আবেদন জানিয়ে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো নিয়ে নিক্সন সরকারকে যেন বাধ্য করেন। বিষয়গুলো হলো; ১. বাংলাদেশ সরকারকে কূটনৈতিক সমর্থন দিতে; ২. পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত গণহত্যা বন্ধ না হওয়া এবং বাংলার জনগণ যতোদিন মুক্ত না হয় ততদিন পর্যন্ত পাকিস্তানে সামরিক এবং অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ রাখতে তৎপরতা চালনো; ৩. জাতিসংঘ, বিভিন্ন সাহায্য সংস্থা এবং অন্যান্য দেশের সাথে সহযোগিতার মাধ্যমে বাংলাদেশে খাদ্য, কাপড় ও ঔষধসামগ্রী প্রেরণের ব্যবস্থা গ্রহণ এবং একইভাবে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাঙালিদের সহায়তা দান; ৪. পাকিস্তান সরকার যাতে বাংলাদেশে অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ করে তার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর কূটনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং চাপ প্রয়োগ।

৩রা মে, 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইন নিউইয়র্ক' প্রকাশ করে আরো একটি প্রচারপত্র। সংগঠনের সভাপতি কাজী শামসুদ্দিন আহমেদ যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী সকল বাঙালির প্রতি বক্তব্য তুলে ধরেন এই প্রচারপত্রের মাধ্যমে। ঠিক এর আগের দিন নিউইয়র্কের ১৪৫ ব্লিকার স্ট্রিটে বাংলাদেশ লীগের এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন মাহবুব হোসেন যিনি সম্প্রতি কলকাতা থেকে ঘুরে এসেছেন। এ সভাতেই জানানো হয় যে, নিউইয়র্কে নিযুক্ত পাকিস্তানি ভাইস কনসাল এ.এইচ. মাহমুদ আলীকে বাংলাদেশ মিশন প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব দিয়েছে বাংলাদেশ সরকার। মাহমুদ আলীও মিশন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছেন। পরের দিন এসব বক্তব্যকে একটি ফ্লায়ার হিসেবে ছেপে বিতরণ করা হয় বাঙালি কমিউনিটিতে। একই দিনে লীগের কার্যালয় থেকে আরও একটি প্রচারপত্র প্রকাশিত হয় লীগের সম্পাদক ফয়জুর রহমানের নামে। লীগের সাধারণ সভা অনুষ্ঠান সংক্রান্ত প্রচারপত্রে দুটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বলা হয়, উক্ত সংগঠনের সাধারণ সভার একটি প্রস্তাবে এর নাম পরিবর্তন করে 'বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইন নিউইয়র্ক' করা হয়েছে। তবে সিদ্ধান্ত হয় ব্যাংক হিসাব, নথিপত্র ইত্যাদি আইনগতভাবে পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের নামই ব্যবহার করা হবে।

মে মাসেই গ্লেন ডেইল ক্যালিফোর্নিয়া থেকে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের প্রতি একটি আবেদন জানায়। 'বাংলাদেশে গণহত্যা' শিরোনামে প্রচারিত এই আবেদনে বলা হয়, "মার্কিন সরকার প্রদত্ত অস্ত্র দ্বারা পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কসাইরা বাংলাদেশে দু'লাখ নিরস্ত্র লোককে হত্যা করেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ট্যাংক দ্বারা ধ্বংস করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। এই বর্বররা পুড়িয়ে দিয়েছে বাংলার গ্রামের পর গ্রাম। বোমা মেরে ধ্বংস করে দিয়েছে শহর বন্দর নগর।' পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর পাশবিক তাণ্ডবলীলার বর্ণনা শেষে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের কাছে আকুল আবেদন জানানো হয় যেন তারা: ১. বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক নির্যাতনের প্রতিবাদ করেন; ২. পাকিস্তানি সামরিক স্বৈরশাসককে যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তা দানের বিরুদ্ধে প্রতিবাদমুখর হন; ৩. বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষকে সহায়তা করেন। এই আবেদনপত্রের শেষ বাক্য ছিল "আপনার সামান্য সাহায্যই একজন দুর্গতকে বাঁচাতে পারে।"[৯৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব আবেদন-নিবেদনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হয় ইতিবাচক। যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে যেসব বাঙালি বসবাস করছিলেন তাঁরা সবাই সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন স্থানে সংগঠিতভাবে নানা ধরনের কর্মসূচি পালন করতে থাকেন। অন্যদিকে, যুক্তরাষ্ট্রের জনগণও সহায়তা করেন অর্থ, বস্ত্র, ঔষধপত্র এবং প্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রী দিয়ে।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের অগ্রগতি, বিশ্ববাসীর ভূমিকা এবং পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাযজ্ঞের বিবরণ প্রবাসী বাঙালিদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন নগর থেকে পত্রিকাও প্রকাশিত হয়। টেক্সাস রাজ্যের কলেজ স্টেশন থেকে প্রকাশিত একটি বাংলা পত্রিকার নাম বাংলাদেশ পত্র। ১৪ই মে এর যাত্রা শুরু হয়। 'স্বাধীনতার ডাক' শিরোনাম দিয়ে একটি দীর্ঘ প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। পূর্ব বাংলার স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তুলে ধরা হয়। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী কর্তৃক দেশব্যাপী পরিচালিত তাণ্ডবলীলার এক নিখুঁত চিত্রও ফুটে উঠেছিল পাঠকের চোখে। বাঙালির বিজয় অবশ্যম্ভাবী বলে আশাবাদ ব্যক্ত করে শেষ করা হয় দীর্ঘ প্রতিবেদন।

১৪ই মে অবাধ নির্বাচনের মাধ্যমে 'বাংলাদেশ সংগ্রামী ছাত্র সংস্থা' নামে একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২৫শে মার্চের পর থেকে মধ্য মে পর্যন্ত পরিচালিত কার্যক্রমের মধ্যে ১. জাতিসংঘ সেক্রেটারি জেনারেল, শতাধিক মার্কিন সিনেটর এবং বৃহৎ দেশের রাষ্ট্র কিংবা সরকার প্রধানদের নিকট কয়েক দফায় তারবার্তা প্রেরণ উল্লেখযোগ্য; ২. বাংলাদেশের দুর্গত মানুষের সাহায্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্ন ভিন্ন শহরের মার্কিন নাগরিকদের নিকট থেকে ১ হাজার ৫ শত আবেদনপত্র সংগ্রহ করে ১১ জন প্রভাবশালী সিনেটরের বরাবরে পাঠানো; ৩. বাংলাদেশ প্রত্যাগত শিক্ষকদের সহায়তায় বাংলাদেশের প্রকৃত চিত্র টেক্সাস এ.এন্ড.এম বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের অবহিত করা হয়। দল বেঁধে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্টের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের ছাত্রদের জন্য সাহায্যের আশ্বাস আদায় করা হয়; ৪. মার্কিন টিভি, রেডিও এবং সংবাদপত্রে সাক্ষাৎকার প্রদান করে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা; ৫. প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী হ্যারল্ড উইলসন এবং পাকিস্তানে প্রাক্তন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ইউজিন লকের সাথে সাক্ষাৎ করে উদ্বেগ প্রকাশ; ৬. হার্ভার্ডের প্রখ্যাত তিনজন অর্থনীতিবিদদের লেখা Conflict in East Pakistan: Background and Prospect পুস্তকখানি বিভিন্ন শহরে প্রচার করা : ৭. ছাত্র সিনেটে বাংলাদেশের মানুষের বিরুদ্ধে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক মার্কিন সরবরাহকৃত অস্ত্র ব্যবহারে নিন্দা করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকা ইন নিউইয়র্ককে কেন্দ্রীয় সংস্থা হিসেবে গ্রহণ করা এবং কলেজ স্টেশনকে একটি উপকেন্দ্র হিসেবে বিবেচনা হয়। সে উপকেন্দ্র থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নয়টি রাজ্যে যোগাযোগ এবং কার্যকর কর্মসূচি পালনের দায়িত্ব গ্রহণ করা হয়। রাজ্যগুলি ছিল টেক্সাস, নিউমেক্সিকো, লুইজিয়ানা, ওকলাহোমা, আলবামা, জর্জিয়া, আরাকানসাস, মিসিসিপি ও ফ্লোরিডা। ঐ সব রাজ্যে বসবাসরত বাঙালি ছাত্র বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাকুরিজীবীদের কলেজ স্টেশন কিংবা সরাসরি নিউইর্য়কস্থ কেন্দ্রীয় সংস্থার সাথে যোগাযোগ করার পরামর্শ দেওয়া হয়।

বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার উদ্যোগে আগস্ট মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে বিভিন্ন পত্রিকার সম্পাদকদের কাছে চিঠি লেখা হয় যেন ঐ প্রহসনের বিচার কাজ বাতিল করে তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়।

১০. জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশন স্থলে কূটনৈতিক তৎপরতা:

সেপ্টেম্বরে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে একটি প্রতিনিধিদল প্রেরিত হয়। ১৬ সদস্যবিশিষ্ট এই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব দেন বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী।[১০০] অন্য সদস্যরা হলেন- আবদুস সামাদ আজাদ (এম.এন.এ), এম.আর. সিদ্দিকী (এম.এন.এ), সৈয়দ আবদুস সুলতান (এম.এন.এ), ড. মফিজ চৌধুরী (এম.এন.এ), সিরাজুল হক (এম.এন.এ), ড. আসহাবুল হক (এম.পি.এ), ফণীভূষণ মজুমদার (এম.পি.এ), ফকির শাহাবুদ্দিন (এম.পি.এ), অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ (ন্যাপ নেতা), ড. আজিজুর রহমান মল্লিক (ভাইস চ্যান্সেলর, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়), অধ্যাপক রেহমান সোবহান, রাষ্ট্রদূত এ.এফ.এম. আবুল ফতেহ, রাষ্ট্রদূত খুররম খান পন্নী এবং কূটনীতিক সৈয়দ আনোয়ারুল করিম। ওয়াশিংটনে অবস্থানরত এ.এম.এ. মুহিত ও এ.এইচ. মাহমুদ আলী এই দলকে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করেন।

প্রতিনিধিদলটি প্রতিদিন জাতিসংঘ ভবনে গিয়ে বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধিদের সাথে সাক্ষাৎ করতেন। বাংলাদেশের প্রকৃত অবস্থা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর গণহত্যা, মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতি, ভারতের সাথে সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয় বিশদভাবে তুলে ধরতেন। ১৬ জনের দলটিকে বিভিন্ন গ্রুপে ভাগ করে কয়েকটি ছোটো ছোটো দল তৈরি করা হয়। আলাদা আলাদা ভাগে বিভক্ত হয়ে তাঁরা যেতেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতের কাছে। আবু সাঈদ চৌধুরী, সৈয়দ আবদুস সুলতান এম.এন.এ. এবং কূটনীতিক এ.এইচ. মাহমুদ আলীর সমন্বয়ে গঠিত গ্রুপটি যেতেন জাতিসংঘ ভবনে। এছাড়াও বিভিন্ন টেলিভিশন এবং পত্রিকায় সাক্ষাৎকার দিয়েছেন প্রতিনিধি দলের সদস্যরা। সহযোগিতা নিয়েছেন জাতিসংঘের ভারতীয় কূটনীতিবিদ ও সাংবাদিকদের সাংবাদিক সম্মেলন করেছেন। এভাবে তাঁরা সারা দুনিয়ার সামনে পাকিস্তানিদের নৃশংস অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরতে সমর্থ হন।[১০২]

মার্কিন সিনেটর, কংগ্রেসম্যান, বিভিন্ন মানবাধিকার সংস্থার কর্মকর্তাসহ প্রভাবশালী লোকজনের সাথে প্রতিনিধিদল সাক্ষাৎ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি তাদের সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছেন। অনেক মুসলিম রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূতের সাথে সাক্ষাৎ করে সাম্প্রতিক ঘটনাবলি ব্যাখ্যা করেন। বিচারপতি চৌধুরী সৌদি আরবের রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠনের কারণ ব্যাখ্যা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রোকেয়া হলে পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী কর্তৃক নারী নির্যাতনের সংবাদ দেখান, তা পড়ে সৌদি রাষ্ট্রদূত দুঃখ প্রকাশ করেন। তিনি জানান, তিন দিন পর সৌদি বাদশাহ্ ফয়সাল যুক্তরাষ্ট্র আসবেন এবং তখন তিনি তাঁকে তা জানাবেন। এছাড়াও ফোর্ড ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সাথে বিচারপতি চৌধুরী দেখা করেন এবং ফাউন্ডেশনের বৃত্তি নিয়ে অধ্যয়নরত বাঙালি ছাত্রদের বৃত্তির অর্থ উত্তোলনের সুরাহা করেন।[১০৩]

ওয়াশিংটনে বাংলাদেশ ইনফরমেশন সেন্টার প্রতিষ্ঠা করা হয়। কয়েকজন স্বেচ্ছাসেবক যাদের মধ্যে– এম. সিদ্দিকী, এম. ইউনুস, এফ. ফয়সাল, ডব্লিউ গ্রিনো, ডি. নেলিন, এ. টেইনার প্রমুখের কাজ উল্লেখ্যযোগ্য।[১০৪]

১১. যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে বাঙালি প্রবাসীদের ভূমিকা

১১.১ কানাডায় বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিদের ভূমিকা

মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই কানাডার রাজধানী অটোয়া নগরীতে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন গড়ে ওঠে।[১০৫] এসোসিয়েশনের কতগুলো সাধারণ লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলো মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য যথাসাধ্য সহায়তা করা, শেখ মুজিবের মুক্তি, বাস্তুহারা দুর্গতদের জন্য অর্থ সংগ্রহ করা, জনমত সৃষ্টি ও পাকিস্তানের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার পক্ষে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক লবি চালিয়ে যাওয়া। তহবিল সংগ্রহের প্রথম উদ্যোগ হিসেবে প্রত্যেক বাঙালি নিজের আয়ের শতকরা ৫ ভাগ হিসেবে প্রতি মাসে জমা দেবেন। অনেক কানাডিয়ানও স্বতঃস্ফূর্তভাবে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন। সেই অর্থ অবশেষে অক্সফামের মাধ্যমে মুজিবনগর সরকারের কাছে প্রেরিত হয়। অটোয়া থেকে প্রেরিত অর্থের পরিমাণ প্রায় ২৫ হাজার ডলার বলে সংগঠক অধ্যাপক ড. মিজান রহমান উল্লেখ করেছেন।[১০৬] তিনি বলেন ড. মোয়াজ্জেম হোসেনের কানাডিয়ান ব্রডকাস্টিং করপোরেশন টেলিভিশনের সাক্ষাৎকার প্রচারিত হওয়ার ফলে বাঙালিরা উজ্জীবিত হয়।

কানাডিয়ানদের সাহায্যও যোগ হয়। গুরুত্বপূর্ণ ছিল বাংলাদেশে পরিচালিত পাকিস্তানিদের শাসন ও শোষণ, তাদের অত্যাচার-নির্যাতনের কাহিনি কানাডার জনগণ, সরকার এবং অন্যান্য সংস্থার কাছে তুলে ধরা। এ বিষয়গুলো কানাডার প্রচারমাধ্যমে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উত্থাপনেরও প্রচেষ্টা চালানো হয়। কানাডা থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ বন্ধ এবং পাকিস্তানি জাহাজ থেকে নেমে কানাডায় আশ্রয়প্রার্থীদের আশ্রয়দানের জন্যও কাজ করতে হয়েছে এখানে। এই কাজের বর্ণনা দিয়ে 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা' একটি প্রচারপত্র বের করে।[১০৭]

কানাডায় অল্পসংখ্যক বাঙালি যখন স্বাধীনতার পক্ষে জোর তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন, তখন কানাডা থেকে একটি সংসদীয় প্রতিনিধিদল উপমহাদেশে সফর করেন। ভারত-পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তান সংসদীয় প্রতিনিধি দল ঘুরে আসার পরপরই বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা (টরেন্টো) একটি সেমিনারের আয়োজন করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'ক্রাইসিস ইন বাংলাদেশ' শিরোনামে আয়োজিত সেমিনারটি অনুষ্ঠিত হয় ৫ই আগস্ট টরেন্টোর মেডিকেল সাইন্স বিল্ডিং অডিটোরিয়ামে।

এতে সভাপতিত্ব করেছিলেন স্ট্যানলি বারকি এবং মূল বক্তা সংসদীয় প্রতিনিধিদলের সদস্য হিসেবে উপমহাদেশ সফর করে আসা কানাডিয়ান পার্লামেন্ট সদস্য এন্ড্রু ব্রুইন। এছাড়াও প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে বক্তব্য পেশ করেন টরেন্টো টেলিগ্রাম পত্রিকার সাংবাদিক ফ্রেডারিক কনসাল, অক্সফামের লেসসি স্মিথ এবং ইউনিসেফের পল ইগনিটিফ। তাঁরা শরণার্থী সমস্যা এবং সেখানকার রাজনৈতিক সমস্যা নিয়েও আলোচনা করেন। 'বাংলাদেশ' নামক এসোসিয়েশনের মুখপত্রে এসব তথ্য প্রকাশিত হয়।

পাকিস্তানে অস্ত্র এবং অন্যান্য খাতে সাহায্য স্থগিত করা, শেখ মুজিবের বিচার প্রহসন ও বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ করতে পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবিতে অটোয়ায় একটি ব্যাপক কর্মসূচি নেওয়া হয়। টরেন্টো, মন্ট্রিয়াল, হ্যামিল্টন, কিংস্টনসহ বিভিন্ন শহর থেকে লোকজন তাতে অংশগ্রহণ করে।

ঐদিন অটোয়াস্থ পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শনকালে পাকিস্তানের পতাকা পোড়ানো হয়। পাকিস্তানের অন্ধসমর্থক যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের দূতাবাসের সামনেও এই কর্মসূচি পালিত হয়।[১০৮] কানাডিয়ান পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করে বাংলাদেশের পক্ষে সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করা হয়। এনিডিপির এন্ড্রু ব্রুইন, লিবারেলের জর্জ ল্যাশান্স ও কনজারভেটিভ পার্টির হিথ ম্যাকুয়ারি প্রমুখ ছিলেন বাঙালির সংগ্রামের প্রতি সহানুভূতিশীল।

জুলাই মাসে অটোয়ায় আসেন অর্থনীতিবিদ ও বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি অধ্যাপক রেহমান সোবহান। সেখানে একটি বড় সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি বক্তব্য পেশ করেন। কানাডিয়ান কয়েকজন পার্লামেন্ট মেম্বারের সাথেও তিনি মধ্যাহ্নভোজে শরিক হন। সভাপতিত্ব করেন বিরোধী দলীয় ছায়া-বিদেশমন্ত্রী। পরে গোপনে বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, সন্ধ্যায় যোগদান করেন বাঙালিদের এক বিরাট সমাবেশে। রেহমান সোবহান নিজেই বলেছেন, তাঁর এই ক্যাম্পেইনের মধ্যে এ 'দিনটিই ছিল বেশি কার্যকর দিবস।'

পাকিস্তানের পক্ষে প্রচারণায় বেরিয়েছিলেন মাহমুদ আলী এবং হামিদুল হক চৌধুরীসহ একটি দল। এঁরা দুজন আসেন কানাডায়। ১৮ই জুলাই তাঁরা টরেন্টোতে একটি সভায় মিলিত হন। পাকিস্তানিদের এ সভার প্রতিবাদে বাঙালিরাও কর্মসূচি গ্রহণ করেন। তাঁদের সভাস্থলের বাইরে বাঙালিরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। সেই সাথে বিতরণ করে প্রচারপত্র। এতে বাঙালির উপর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আক্রমণের কথা ছাড়াও এই দু'জনের অতীত ইতিহাসও তুলে ধরা হয়। এরা যখন ২২শে জুলাই অটোয়াতে সভা করতে যান তখন সেখানেও প্রতিবাদ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়।[১০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০শে জুলাই একটি কর্মসূচি পালিত হয়। প্রচুর বাঙালি জমায়েত হয়ে মার্কিন কনস্যুলেটের সামনে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও মিছিল করে। এর আগে ২২ জুলাই ভ্যানকুবারস্থ মার্কিন কনস্যুলারকে একটি চিঠি দিয়ে বলা হয়, যেন পাকিস্তানে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে এবং বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব খাটানোর অনুরোধ জানিয়ে সিনেটরদের কাছে লেখা চিঠির উত্তরে অনেকেই তাঁদের যথাসাধ্য চেষ্টার প্রতিশ্রুতি দেন। 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অফ কানাডা' শেখ মুজিবের বিচারের বিপক্ষে প্রচারণা চালায়। তারা বলেন যে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী একটা গোপন বিচার চালাচ্ছে সামরিক কৌশলে, যার ফলে আরো রক্তপাত হবে। ১৬শে আগস্ট সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এম.এম. রহমান স্বাক্ষরিত এই রকম প্রতিবাদে অসংখ্য চিঠি পাঠানো হয়।[১১০]

কানাডাস্থ বিভিন্ন বাঙালিদের সংগঠন প্রচার ও অর্থ সংগ্রহ করে স্থানীয় মানুষের সাহায্য নিয়ে একটি প্রচারপত্র বিলি করে প্রচারপত্রের শিরোনামে লেখা হয়, 'আপনি কি করতে পারেন?' প্রবাসীদের বিলি করা এই প্রচারপত্রে লেখা হয়, "আমরা বাংলাদেশের আন্দোলনে সহায়তা করতে পারি সেখানে চলমান গেরিলা কর্মকাণ্ডকে সাহায্য করে।"[১১১] কানাডার টরেন্টোতে তহবিল সংগ্রহের লক্ষ্যে অন্যান্য পদক্ষেপের মতো চলচ্চিত্র প্রদর্শীনও অনুষ্ঠিত হয়। ২৬শে আগস্ট বৃহস্পতিবার অডিয়ন হলে সত্যজিৎ রায়ের 'তিন কন্যার' চারটি প্রদর্শনী হয় বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে। যৌথ ব্যবস্থাপনায় ছিল বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ও.আই.সি.এ। বিশিষ্ট সাংবাদিক স্টানলি বারকি টরেন্টোতে গঠন করেন 'সাউথ এশিয়া ক্রাইসিস কমিটি'। এই ব্যানারে দেশব্যাপী বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণাও চালান। অক্সফাম আহ্বান করে দক্ষিণ এশিয়াবিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন।

মুক্তিযুদ্ধের সময় কমনওয়েলথের সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন আরনল্ড স্মিথ। তিনি কানাডার নাগরিক এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে কাজ করেন। কানাডার প্রধানমন্ত্রী পিয়েরে ট্রুডো ১৩ আগস্ট ইয়াহিয়ার কাছে লিখিত এক পত্রে শেখ মুজিবের জীবন রক্ষার জন্য তাঁর মানবিক দায়িত্ববোধের কথা স্মরণ করিয়ে দেন। মে মাসের প্রথম সপ্তাহে মন্ট্রিলে অনুষ্ঠিত এক মিছিলে অনেক কানাডিয়ান অংশগ্রহণ করেন। অন্যান্য দেশেরও বহু লোক তাতে শরিক হন। জুলাই মাসে সংসদীয় প্রতিনিধিদের সফরকালে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের পক্ষ থেকে একটি স্মারকলিপি দিয়ে কানাডা সরকারের কাছে দাবি জানানো হয়, দাবিগুলো হলো: ১. অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান; ২. শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল রাজনৈতিক বন্দির মুক্তির জন্য ইসলামাবাদ সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ; ৩. স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার জন্য বাংলাদেশকে সব রকম সাহায্য প্রদান; ৪. পাকিস্তানে সর্বপ্রকার সাহায্য বন্ধ; ৫. পাকিস্তানের সাথে সকল বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করণ; এবং ৬. গণহত্যা এবং নারী নির্যাতনের ঘটনা তদন্তের জন্য আন্তর্জাতিক জুরিস্ট কমিশন গঠন এবং দায়ীদের শাস্তি বিধান করা।[১১২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২শে আগস্ট টরেন্টোতে অনুষ্ঠিত হয় দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন। সম্মেলনে যোগদান দেন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত এম. আর. সিদ্দিকী। সম্মেলন ছাড়াও বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাথে সভায় মিলিত হন। একই সাথে আসেন কূটনীতিকের চাকরি ত্যাগ করে বাংলাদেশের পক্ষে প্রচারণায় লিপ্ত এ.এম.এ. মুহিত। তাঁরা কুইবেক প্রদেশেও যান এবং সেখানকার বাংলাদেশ এসোসিয়েশন আয়োজিত মন্ট্রিলের এক সভায় যোগদান করেন।

মুজিবনগর সরকারের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদ জাতিসংঘ প্রতিনিধিদলের অন্যতম সদস্য হিসেবে জাতিসংঘের কর্মসূচি শেষে দেশে যাওয়ার পথে টরেন্টো সফর করেন। তিনি ৭ই অক্টোবর সেখানে বসবাসকারী বাঙালিদের উদ্দেশ্যে সভায় বক্তৃতা দেন। অন্যদিকে, ক্যারিবিয়ান স্টুডেন্ট অর্গানাইজেশন এবং বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি ৬ই অক্টোবর যৌথভাবে একটি সিম্পোজিয়ামের আয়োজন করে। এতে জাতীয় পরিষদ সদস্য এডভোকেট সৈয়দ আবদুস সুলতান ও জাতীয় পরিষদ সদস্য ড. মফিজ চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন। পরদিন ম্যাকমাস্টার ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ এসোসিয়েশনের সাথে এবং সন্ধ্যায় টরেন্টো এসোসিয়েশনের অফিসে সভায় মিলিত হন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি দাবি

আগস্ট মাসে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের বিচার নিয়ে প্রহসন শুরু করলে কানাডায় বাঙালিদের দ্বারা গণস্বাক্ষর কর্মসূচি গৃহীত হয়। কানাডা সরকার যাতে এই অবিবেচনাপ্রসূত বিচার প্রহসন বন্ধ করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে সে লক্ষ্যে এই স্বাক্ষর-সংগ্রহ অভিযান চালানো হয়। এতে বাঙালি ছাড়াও বহু কানাডিয়ান স্বাক্ষর করেন।

১১.২ ফ্রান্সে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালি

১–১০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ ফ্রান্সে আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি ইউনিয়নের বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে বিভিন্ন দেশের প্রায় ৭শ প্রতিনিধি যোগদান করেন। সংশ্লিষ্ট দেশের স্পিকার প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব করেন। সম্মেলনে যোগাদানকারী পার্লামেন্ট সদস্যদের বাংলাদেশের সংগঠিত পাকিস্তানি বর্বরতা সম্পর্কে অবহিত করার জন্য ব্রিটেন থেকে 'বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি'র একটি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। ছাত্র প্রতিনিধিরা নানা দেশের পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি এবং মুক্তি আন্দোলনের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করেন। প্রতিনিধিদলের সদস্যরা হলেন নজরুল ইসলাম, এম.এইচ.এ. প্রামাণিক, ওয়ালি আশরাফ, খন্দকার মোশাররফ হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুর।[১১৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১.৩ নরওয়ে

১লা সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী লন্ডন থেকে রাজিউল হাসান রঞ্জুকে নিয়ে নরওয়ের রাজধানী অসলো পৌঁছান। বিমানবন্দরে ময়মনসিংহ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হামিদুল ইসলাম এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক রফিকুজ্জামানসহ অর্ধডজন বাঙালি তাঁদের অভ্যর্থনা জানান। অসলোবাসী বাঙালিদের কর্মতৎপরতার ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন নরওয়ের বিভিন্ন মহলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। তাঁদের প্রচেষ্টার ফলে স্থানীয় টিভি বিচারপতি চৌধুরীর দীর্ঘ সাক্ষাৎকার প্রচার করে। এই সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে তিনি নরওয়ের অধিবাসীদের নিকট স্বাধীনতা আন্দোলনের সারমর্ম ব্যখ্যা করার সুযোগ লাভ করেন।[১১৪]

২রা সেপ্টেম্বর বিচারপতি চৌধুরী বেলা ১১টার সময় নরওয়ের প্রধান বিচারপতি স্পিয়ের অল্ড-এর সঙ্গে কফি পানের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। তাঁরা জানতে চান, বাংলাদেশ কেন পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করতে চায়? বিচারপতি চৌধুরী সংক্ষেপে বাঙালির স্বাধীনতা সম্পর্কিত মূল কারণগুলি বিশ্লেষণ করেন। তাঁরা বাঙালিদের প্রতি সহানুভূতি জানিয়ে আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেন। ৩রা সেপ্টেম্বর সকালে বিচারপতি চৌধুরী অসলোর মেয়রের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনকে সমর্থন জানান। বিচারপতি চৌধুরীকে তিনি অসলো শহরের বিভিন্ন আলোকচিত্রসংবলিত বই উপহার দেন। বইটি প্রথম পৃষ্ঠায় তাঁকে বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি বলে উল্লেখ করেন। নরওয়ে কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার আগেই অসলো মেয়র বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দেন।[১১৫]

নরওয়ে পররাষ্ট্রদপ্তরের প্রতিমন্ত্রী স্টলটেনবার্গ বিচারপতি চৌধুরীকে আনুষ্ঠানিকভাবে সাদর অভ্যর্থনা জানান। প্রায় দেড়-ঘন্টা যাবৎ আলোচনার পর স্টলটেনবার্গ বলেন, স্ক্যান্ডিনেভিয়ার দেশসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের আসন্ন সম্মেলনে নরওয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন জানিয়ে বিবৃতি পেশ করবে। সম্মেলনের সরকারি বিবরণীতে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থনের কথা প্রকাশ করা হবে বলে তিনি আশ্বাস দেন। ৬ই সেপ্টেম্বর সকালে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বিচারপতি চৌধুরী বাংলাদেশের সংগ্রামের উদ্দেশ্য, বর্তমান পরিস্থিতি এবং সংগ্রামের অগ্রগতি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য পেশ করেন। পরদিন নরওয়ের সবগুলি সংবাদপত্রে তাঁর বক্তব্য গুরুত্ব সহকারে প্রকাশ করা হয়। উল্লিখিত তারিখে সন্ধ্যা ৭ টার সময় অসলো বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে এক বিরাট ছাত্র সমাবেশের আয়োজন করা হয়। ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট বুল ছিলেন বাংলাদেশ আন্দোলনের উৎসাহী সমর্থক। তাঁর উদ্যোগে ছাত্র সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। নির্দিষ্ট সময়ের কয়েক মিনিট আগে হামিদুল ইসলাম, আলী ইউসুফ, রফিকুজ্জামান এবং আরও কয়েকজন বাঙালি ছাত্রের সঙ্গে বিচারপতি চৌধুরী মিলনায়তনে উপস্থিত হন। নরওয়ের ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাঞ্চল্যের কারণ হিসেবে তিনি লক্ষ্য করেন নরওয়ের একজন বিখ্যাত শিল্পী কর্তৃক অঙ্কিত একটি ব্যঙ্গচিত্র যা ছাত্র ইউনিয়ন পোস্টার হিসেবে ব্যবহার করে। এই ব্যঙ্গচিত্রে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে নরহত্যাকারী দানব রূপে দেখানো হয়। কয়েকজন পাকিস্তানি ছাত্র প্রবেশদ্বারের নিকট সেঁটে দেওয়া পোস্টারটি ছিঁড়ে ফেলে। সে কারণে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। বিচারপতি চৌধুরী পাকিস্তানি ছাত্রদের এরূপ আচরণকে তীব্রভাবে তুলে ধরেন।

১১.৪ আয়ারল্যান্ড ও মিশর

স্বাধীনতা ও গণআন্দোলনের দেশ আয়ারল্যান্ডের দলীয় নেতা কর্মম্যাক রেসলিং এবং দলের সদস্য রিচার্ড গোগ্যান ও বিম্যাক শেরি বাংলাদেশের ছাত্র প্রতিনিধিদের পূর্ণ সমর্থনের আশ্বাস দেন। মিশরীয় প্রতিনিধিদলের নেতা প্রথমে বাংলাদেশের ছাত্রনেতাদের বলেন যে, মিশর ত্যাগের পূর্বে তিনি পাকিস্তান দূতাবাসের কাছ থেকে জানতে পেরেছেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন একটি মুসলিম রাষ্ট্রকে দ্বিখণ্ডিত করার অপচেষ্টা মাত্র। কিন্তু আলোচনার পরে তিনি 'বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই' এ ধরনের মন্তব্য করেন। এছাড়া বিভিন্ন সময়ে পত্র পত্রিকার সম্পাদকীয় ও অন্যান্য প্রতিবেদন পাঠের পর বাংলাদেশের আন্দোলনের প্রতি তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে এবং তাঁরা শেষ পর্যন্ত প্রীতিপূর্ণ ও ভ্রাতৃসুলভ ব্যবহার করেন।

১১.৫ জাপান

১৯৭১ সালের দিকে টোকিওতে ছিল প্রায় ২৫জন বাঙালি। তাঁদের সবাই ছিলেন হয় ছাত্র, না হয় প্রশিক্ষণার্থী। সংখ্যায় কম হলেও স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁদের অবদান প্রশংসনীয়। জাপানে অবস্থানকারী শুধু পূর্ব বাংলার জনগণই নয় সকল ভারতীয় বাংলাদেশ আন্দোলনের প্রতি তাদের পূর্ণ সমর্থন জানায়। এসোসিয়েশন শুধু ফান্ড সংগ্রহেই তার কার্যক্রম সীমিত রাখেনি, এটাকে একটা রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক ধারায় রূপান্তরিত করে। জাপানে নব নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত মোতাহের হোসেন দেশত্যাগী বাঙালিদের কর্মকাণ্ডের চিত্র তুলে ধরে জাপান সরকারের কাছে এক সরকারি অভিযোগে তিনি বলেন যে, বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসা পূর্ব পাকিস্তানের ছাত্ররা যেসব রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে অরাজকতার সৃষ্টি করছে তা বৃত্তির নীতি বহির্ভূত। তিনি আরো বলেন, মোমবুশো বৃত্তি নিয়ে পড়তে আসা বাঙালি ছাত্ররা বাংলাদেশের পক্ষে বাংলাদেশ সলিডারিটি লীগ গঠন করেছে। ইস্কান্দার আহমেদ চৌধুরী লীগের চেয়ারম্যান ছিলেন এবং জি.এস. ছিলেন আমিনুল ইসলাম। আগস্টে ওসাকায় প্রফেসর সুরুশিমার নেতৃত্বে একত্রিত হয়ে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন।[১১৬] প্রতিষ্ঠানটি বিভিন্ন দেশের ৮০টিরও বেশি সংবাদপত্রের সাথে তাদের পত্র-যোগাযোগ রক্ষা করে এবং আশাব্যঞ্জক সাড়া পায়। তারা যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সনকে চাপ দেওয়ার জন্য ১০০জনেরও বেশি সিনেট এবং কংগ্রেস সদস্যের কাছে আপিল করে। লীগের পত্রের জবাবে সিনেটর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রাংক চার্চ ও বীর্চ বে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। বাংলাদেশ সরকারের পরিচিতি তুলে ধরার জন্য ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত এবং আরো ৫০টি দেশের প্রধানের কাছে আপিল করেন। টোকিওতে ভারতীয় দূতাবাসের মাধ্যমে ঐ পত্রের এক কপি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নিকট পাঠানো হয়। ভারতের শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায় এবং রাজনৈতিক নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ যখন টোকিও ভ্রমণ করেন তখন জাপানের বাঙালি সম্প্রদায় তাঁদের সাথে সাক্ষাৎ করেন এবং বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকারকে অনুরোধ করেন।[১১৭] পাকিস্তানি কূটনীতিক মাসুদ কে. রহিম এবং পাকিস্তান দূতাবাসের আরো ৫জন বাঙালি ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। মাসুদ কে. রহিমের সরকারি বাসভবন বেসরকারি বাংলাদেশ মিশনে পরিণত হয়। তারা চাঁদা প্রদানের মাধ্যমে ফান্ড গঠন করেন এবং ফান্ডের টাকা মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য গরম কাপড় ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়ের কাজে ব্যয় করেন।

১৯৭১ সালের ২০শে সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর প্রধান কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী উক্ত সমিতি কর্তৃক সহায়তার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে সমিতিপ্রধানের কাছে একটি পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে তিনি লেখেন ইলেকট্রনিক যন্ত্রাদি, ওয়ার এন্টিনা এবং ট্রান্সরিসিভারসহ অন্যান্য সরঞ্জাম মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ডে সহায়তা করবে।[১১৮] বাংলাদেশ সমিতি মুজিবনগর সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে।[১১৯] জাপানে বসবাসকারী বাঙালিরা ডায়েট সদস্যদের সমর্থন আদায়ের জন্য প্রতিনিয়তই চাপ প্রয়োগ করে এসেছেন। ডিসেম্বরে তারা সরাসরি ডায়েট সদস্যদের আবেদন জানিয়ে বলেন যে, টোকিওর ১১জন বাঙালি পূর্ব বাংলার ৭৫ মিলিয়ন বাঙালির স্বাধীনতাকে সমর্থনের জন্য অনুরোধ করছে। পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী অন্যায়ভাবে পূর্ব বাংলার জনগণের ওপর অত্যাচার চালাচ্ছে তার চিত্র জাপানিদের তুলে ধরে বলেন যে, বাংলার জনগণ স্বাধীনভাবে ও সম্মানের সাথে বেঁচে থাকার জন্য তাদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।[১২০] এভাবেই জাপানে বসবাসকারী বাঙালিরা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের জন্য তাদের ঐকমত্য ও সমর্থন প্রকাশ করে।

১১.৬ ইন্দোনেশিয়া

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে মাত্র তিন চার ঘর বাঙালির অবস্থান জাকার্তায়। এদের মধ্যে বেশির ভাগ পাকিস্তান দূতাবাসে কর্মরত ছিলেন। ১৯৭১ সালে ২২ জানুয়ারি আবুল ফজল শামসুজ্জামান পাকিস্তানি অ্যামবাসিতে (কর্মাশিয়াল) ফাস্ট সেক্রেটারি হিসেবে যোগদান করেন।[১২১] ২৬শে মার্চ ইন্দোনেশিয়া অবজারভার-এর মাধ্যমে জাকার্তাস্থ বাঙালিরা জানতে পারেন বার্মার বিপ্লব দিবস উপলক্ষে বার্মিজ দূতাবাসে এক পার্টির আয়োজন করা হয়েছে। আবুল ফজল শামসুজ্জামান অতিথি হিসেবে সেখানে উপস্থিত হন। অন্যান্য দেশের কূটনীতিক অনেকে এবং স্থানীয় বহু পদস্থ ব্যক্তি পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ভারত, পূর্ব ও পশ্চিম ইউরোপের অনেক কূটনীতিকদের সাথে তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে আলাপ করেন। কূটনীতিকগণ পাকিস্তানের পরিস্থিতি ভালোভাবে বুঝেছিলেন এবং ভীষণ একটা কিছু ঘটতে যাচ্ছে এ ব্যাপারে তারা নিঃসন্দেহ ছিলেন। ২৮শে মার্চ আবুল ফজল শামসুজ্জামানের বাড়িতে তাঁর সেকশনের সিদ্দিক আহমেদ ও একরাম আলী, প্রেস সেকশনের নূরুল ইসলাম, ডিফেন্স সেকশনের রুহুল আমিন, আইপেকের সানাউল্লাহ এবং প্রেস কাউন্সিলার আবেদনী একত্রিত হও। আবেদনী-এর অভিমত ছিলো, "আমেরিকা, চীন, পাকিস্তানকে সমর্থন দেবে। মৌখিক সমর্থন দিলেও রাশিয়া সক্রিয় সাহায্য করবে না। বাঙালির জন্য এ যুদ্ধ আত্মঘাতী হবে।" আবুল ফজল শামসুজ্জামান বলেন যে, যেহেতু যুদ্ধ শুরু হয়েছে, এখন আপোষ সম্ভব নয়। পেছালে জাতি হিসেবে ধ্বংস অনিবার্য। বাঁচতে চাইলে সংগ্রাম করতে হবে। জাতি হিসেবে সসম্মানে বেঁচে থাকার সমস্যা অগ্রাহ্য করা অনুচিত হবে। আবুল ফজল শামসুজ্জামানের বক্তব্য শুনে সানাউল্লাহ, নুরুল ইসলাম ও রুহুল আমিন সমর্থন জানান। পরে এদের নিয়ে আবুল ফজল শামসুজ্জামানের নেতৃত্বে 'আমরা দল' গঠন করা হয়।[১২২]

২৮শে মার্চ সন্ধ্যায় আবুল ফজল শামসুজ্জামান ও সানাউল্লাহ মিলে ডিকটেশন তৈরি করেন। আবুল ফজল শামসুজ্জামানের সহায়তায় সানাউল্লাহ লেখার কাজটি সম্পন্ন করেছিলেন। Is Islam Dead? শিরোনামের এই লেখাটি ১৫ই এপ্রিলের জাকার্তা টাইমস্ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয় পাকিস্তান সরকারের কার্যকলাপ কেবল বর্বর নয়, অনৈসলামিক।[১২৩]

আর্থিক সংকট মেটানোর জন্য জাকার্তাস্থ বাঙালিরা একটি ফান্ড গঠন করেন। সবাই যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী এই ফান্ডে চাঁদা দিতেন। মোট চাঁদা সংগৃহীত হয়েছিল ৬১০ ডলার। এই ফান্ড থেকে কিছু টাকা কলকাতাস্থ মিশনে প্রেরণ করা হয়। এছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য ১৪০ ডলার দিয়ে ৯০ টি নতুন গরম কাপড় ক্রয় করে প্রেরণ করা হয়।[১২৪]

১১.৭ সিঙ্গাপুর

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রের পরই সিঙ্গাপুরে বসবাসকারী প্রবাসী বাঙালির অবস্থান ও সংখ্যায় ছিল বেশি। তাদের সংখ্যা প্রায় চার হাজার। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে এবং পঞ্চাশের দশকে সিঙ্গাপুরে পঞ্চশ / ষাট হাজার বাঙালি বসবাস করতেন। এরা প্রধানত জাহাজি। কিন্তু ১৯৫৭ সালে মালয়ের স্বাধীনতা এবং ১৯৫৯ সালে সিঙ্গাপুর স্বায়ত্তশাসন লাভ করলে সেখানে চীনা উগ্র জাতীয়তাবাদী আন্দোলন শুরু হয় এবং এতে প্রবাসীদের চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে আরম্ভ করে। তাই অনেক জাহাজি যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্র পাড়ি দিতে থাকেন। ১৯৬৫ সালে সিঙ্গাপুর মালয়েশীয়া থেকে বেরিয়ে এসে পূর্ণ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রবাসীদের পক্ষে সেখানে থাকা জটিল হয়ে পড়ে। তাদের সংখ্যা হ্রাস পেয়ে ১৯৭১ সালে প্রায় চার হাজার দাঁড়ায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাসী বাঙালিরা এখানে ছিলেন সুসংগঠিত, সত্যিকারের শ্রমজীবী প্রবাসী। তাদের নিজস্ব প্রতিষ্ঠান 'সিঙ্গাপুর পাকিস্তান সোসাইটি।' বাংলাদেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হলে সিঙ্গপুরে প্রবাসীরা তাদের সংস্থার নাম পরিবর্তন করে 'সিঙ্গাপুর বাংলাদেশ সোসাইটি' নামকরণ করেন এবং বাংলাদেশে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর অত্যাচার এবং মুক্তিযুদ্ধ সম্বন্ধে সিঙ্গাপুরে ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জনমত সৃষ্টি করার জন্য জোর প্রচেষ্টা চালান। সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ সোসাইটির চেয়ারম্যান ছিলেন মনিরুদ্দিন মাস্টার এবং সেক্রেটারি ছিলেন নূরুল হক ওরফে বাদশা মিয়া।[১২৫] ২৭ মার্চ তারা দলে দলে গিয়ে হাজির হন সিঙ্গাপুরে অবস্থিত পাকিস্তান হাই কমিশনে এবং পাকিস্তানবিরোধী বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কয়েক ঘন্টা বিক্ষোভ শেষে পুলিশের হস্তক্ষেপে তারা ফিরে আসেন। দীর্ঘ নয় মাস স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় তারা বহু সভা-সমিতি করেন। পত্র পত্রিকায় পাকিস্তানি বর্বর বাহিনীর অত্যাচারের ঘটনা প্রচার করেন। পার্লামেন্ট সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। প্রধানমন্ত্রী লী কুয়ান ইউর নিকটও তারা স্মারকলিপি পেশ করেন। সিঙ্গাপুর সরকার বাংলাদেশের মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন এবং স্থানীয় পত্র-পত্রিকাও ছিল সংবেদনশীল। বিশেষকরে সাংবাদিক এস. এম. আলীর প্রচেষ্টায় সিঙ্গাপুরে দৈনিক ও সাময়িকীগুলোতে বাংলাদেশে গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের উপর বেশ কিছু প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি জনমত গঠিত হয়। ভারতের ত্রাণ শিবিরে বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের জন্য তারা চাঁদা উঠিয়ে প্রায় পাঁচলক্ষ টাকার কাপড় জাহাজযোগে মুজিবনগর সরকারের নিকট পাঠান।

১১.৯ সৌদি আরব

মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস সৌদি আরব পাকিস্তানের পক্ষে এবং বাঙালির বিরুদ্ধে ভূমিকা রেখেছে। প্রায় এক কোটি বাঙালির ভারতে শরণার্থী হিসেবে অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশাও সৌদি সরকারকে রেখাপাত করেনি। তবে নিজেদের সীমিত সামর্থ্যের মধ্যেও সৌদি আরবে বসবাসরত বাঙালি ও প্রবাসী বাঙালিদের প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ শিক্ষা কেন্দ্র (সৌদি আরব)' বাংলাদেশ সরকারকে ৪০২.৩৭ পাউন্ড দান করেছে। অন্যদিকে, ৮টি মুসলিম দেশে বসবাসরত বাঙালিরা সম্মিলিতভাবে শরণার্থীদের জন্য ভারত সরকারকে ৫ লক্ষ ৭৪ হাজার ১৬২ ডলার সাহায্য দেয়। এসব দেশের মধ্যে ইরাক, ইরান, লিবিয়া, মিশর, ওমান উল্লেখ্য।[১২৬]

১২. প্রবাসী বাঙালিদের কূটনীতি:

সাংস্কৃতিক কূটনীতি বর্তমান বিশ্ব পরিসরে কূটনীতির এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে বিবেচিত। এই সাংস্কৃতিক কূটনৈতিক তৎপরতা অনানুষ্ঠানিকভাবে বিভিন্ন পেশাদার অভিনেতা ও অভিনেত্রী, শিল্পী, সংস্কৃতিক সংগঠন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গঠনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। যুক্তরাজ্যে ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ ১৯৭১ সালে ৫ই মে বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি'- স্বাধীন রাষ্ট্রের জাতীয় সংগীত মুদ্রণ করে ব্যাপকভাবে যুক্তরাজ্যে প্রচার করে। ১৯৭১ সালে ৮ই মে ব্রিটেনের ম্যাঞ্চেস্টারে আয়োজিত জনসভায় ব্রিটেনের কর্মরত এক সাধারণ শ্রমিক বিরাট জনসভায় একটি গান পরিবেশন করেন। শ্রমিকের নাম আব্দুর রহমান খান। গানটি বাংলাদেশে এ্যাসোসিয়েশন কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রকাশনে বলা হয়, "বাংলার এ দুর্দিনে যার অপার উৎসাহে এই ক্ষুদ্র কবিগান লেখা সম্ভব হলো, তিনি আর কেউ নন- তিনি আমার প্রতিবেশী ও পরম শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধুবর মাষ্টার এ, আজিজ। তারই সহযোগিতায় কবিগানটি উৎসর্গ করলাম রকেট যুগের অগ্নিপুরুষ, বঙ্গ জননীর বীর সন্তান, স্বাধীন বাংলার স্রষ্টা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাহেবকে, যিনি বলেছেন, "আমাকে বন্দি করো, আমাকে হত্যা করো, এতে আমার দুঃখ নেই; কিন্তু আমার দেশবাসীর উপর অত্যাচার কোরো না।" ১৭৪ লাইনের এই কবিতায় ১৯৪৭ সাল থেকে বাঙালি জাতির উপরে শাসন, শোষণ, লুণ্ঠন, নিপীড়ন এবং বাঙালি জাতির আন্দোলন সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো উল্লিখিত হয়েছে। শেষ লাইনে বলেছেন, "গানটি আমার রক্তলেখা, ঊর্ধ্বে তোল জয়পতাকা/মায়ের অঙ্গে রক্ত মাখা, বাংলা ভাষাতে/বলছে কথা এ রহমান, এবার মোদের শেষ রক্তদান/জয় বাংলার জয় গান, গাওরে খুশিতে।"[১২৭]

১৯৭১ সালে জুন মাসে ইংল্যান্ডে গঠিত হয় বাংলাদেশ গণ-সংস্কৃতি সংসদ। এই সংসদের উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সৃষ্টির উদ্দেশ্যে বিভিন্ন স্থানে সংগীতানুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।[১২৮]

একাত্তরে ল্যাটিন আমেরিকার আর্জেন্টিনায় বাংলাদেশের সংহতি আন্দোলনের সামনে ছিলেন লেখক, শিল্পী ও ধর্মীয় নেতারা। ১৯৭১ সালে ১১ই জুন একটি প্রতিনিধিদল আর্জেন্টিনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে দেওয়া এক স্মারকলিপিতে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের জন্য সাহায্য পাঠানোর দাবি জানান। এই দাবিনামায় যাঁরা স্বাক্ষর করেন, তাঁদের মধ্যে প্রথমেই ছিলেন আশি-ঊর্ধ্ব ভিক্টোরিয়া ওকাম্পোর নাম। তাঁর সঙ্গে ছিলেন খ্যাতনামা সাহিত্যিক হোর্হে লুইস বোর্হেসসহ আর্জেন্টিনার সেরা লেখক ও শিল্পীদের অনেকে।

বিশ্বসাহিত্যের অন্যতম ব্যক্তিত্ব ফ্রান্সের আঁদ্রে মালরো বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সময় গর্জে উঠেছিলেন প্রবল বিক্রমে, বাংলাদেশের জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে যোগদানের অঙ্গীকার ঘোষণা করেন। সেই ঘোর অমানিশার দিনে তাঁর দুঃসাহসী কণ্ঠস্বর বিপুল প্রেরণা জুগিয়েছে।

বিট বংশের উদ্যোক্তা কবি অ্যালেন গিন্সবার্গকে বাংলাদেশের একাত্তরের ট্র্যাজেডি গভীরভাবে আলোড়িত করে। বাংলাদেশে লাখো-কোটি মানুষের দুর্দশা স্বচক্ষে দেখতে তিনি ভারতে আসেন। লেখেন 'একাত্তরের সেপ্টেম্বর' নামের দীর্ঘ কবিতা। তার একটি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশ এ রকম: "লক্ষ শিশু দেখছে আকাশ অন্ধকার/উদর স্ফীত, বিস্ফারিত চোখের ধার/যশোর রোডে বিষণ্ন সব বাঁশের ঘর/ধুঁকছে শুধু, কঠিন মাটি নিরুত্তর।" অ্যালেন গিন্সবার্গ তাঁর এই কবিতাটিতে সুর দিয়েছিলেন। হারমোনিয়াম বাজিয়ে নিজে গেয়েছেন বহুবার। এই কবিতা, এই গান গিন্সবার্গের খুব প্রিয় ছিল। উদ্দীপ্ত করেছিলো লক্ষ লক্ষ মুক্তিকামী মানুষকে।

একাত্তরে বাংলাদেশ নিয়ে গায়ক-শিল্পীদের সবচেয়ে বিশাল সংগঠিত আয়োজন ছিল নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে ১লা আগস্টে অনুষ্ঠিত অবিস্মরণীয় সংগীতসন্ধ্যা।[১২৯] এই অনুষ্ঠানের মূল উদ্যোক্তা ছিলেন বিশ্ববিখ্যাত সেতারবাদক পণ্ডিত রবিশঙ্কর; বাংলাদেশের জনগণের সাহায্যার্থে তিনি প্রথম যোগাযোগ করেন জনপ্রিয় 'বিটলস'- এর অন্যতম সদস্য জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে। হ্যারিসন এগিয়ে আসেন এবং উদ্যোগী হয়ে অন্যান্য শিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ৪০ হাজার শ্রোতা-দর্শক এই অনুষ্ঠানে সমবেত হন। 'দ্য কনসার্ট ফর বাংলাদেশ' নামের এই অনুষ্ঠান থেকে উদ্যোক্তারা ২,৪৩,৪১৮.৫০ ডলার সংগ্রহ করে ইউনিসেফের বাংলাদেশ শিশু সাহায্য তহবিলে প্রদান করেন। ৪০টি মাইক্রোফোনে অনুষ্ঠানের গান ও কথা রেকর্ড করে তিনটি লং প্লেইং নিয়ে একটি বড় অ্যালবাম প্রকাশ করা হয়। সঙ্গে ছিল বহু রঙে মুদ্রিত সেই অনুষ্ঠানের একটি সুদৃশ্য সচিত্র পুস্তিকা। সেদিন ম্যাডিসন স্কয়ারের অনুষ্ঠানের অন্যতম আকর্ষণ ছিল প্রতিবাদী গানের রাজা বব ডিলান। তিনি গেয়েছেন ছয়টি গান, 'মি. ট্যাম্বুরিনম্যান' থেকে শুরু করে তাঁর লেখা ও সুরারোপিত ৫০ লাইনের বিখ্যাত গান 'এ হার্ড রেইন ইজ গোননা ফল'। সেদিন বব ডিলানের সঙ্গে গিটার বাজিয়েছিলেন জর্জ হ্যারিসন, ব্যাস লিওন রাসেল ও ট্যাম্বুরিন রিঙ্গো ষ্টার। সে অনুষ্ঠানে বিটলস-এর অন্যতম সদস্য রিঙ্গো স্টার, লিওন রাসেল, এরিক ক্ল্যাপটন, বিলি প্রেষ্টন, ডন প্রেষ্টন প্রমুখ গান গেয়েছেন, গিটার বাজিয়েছেন। এই অনুষ্ঠানের জন্য জর্জ হ্যারিসন লেখেন নতুন গান: "এল একদিন বন্ধু আমার/চোখভরা তার ধু-ধু হাহাকার/ বলে গেল, চাই শুধু সহায়তা/ দেশ তার আজ ধুঁকে ধুঁকে মরে/ বেশি কিছু আমি জানতে চাই না।" এটি ছিল অনুষ্ঠানের শেষ গান। আধুনিক বাদ্যযন্ত্রের সম্মিলিত চড়া সুরের মধ্যে আর্তনাদের মতো করুণ অথচ দৃঢ় কণ্ঠে জর্জ হ্যারিসনের এই গান আর তাঁর মহতি উদ্যোগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে সংহতি প্রকাশের বহু স্মরণীয় কার্যক্রমের মধ্যে এক সমুজ্জ্বল অধ্যায় হিসেবে বিবেচিত হওয়ার দাবি রাখে। পুরো অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা ও পরিচালনা ছাড়াও জর্জ হ্যারিসন একাই ছয়টি গান গেয়েছিলেন। এই অনুষ্ঠান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্বজনমত গঠনে কার্যকর ভূমিকা পালন করেছে। নিউইয়র্কের ম্যাডিসন স্কয়ার গার্ডেনে সেদিনের সংগীতসন্ধ্যায় যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে পরিচিত কণ্ঠশিল্পী জোয়ান বায়েজ অংশ নিতে পারেননি। সেদিন তাঁর অন্য একটি পূর্বনির্ধারিত অনুষ্ঠান ছিল। মানবতাবাদী এই শিল্পী বব ডিলান ও জর্জ হ্যারিসনের সঙ্গে সেই সন্ধ্যায় অনুষ্ঠানে অংশ নিতে না পারলেও পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নিদারুণ হত্যাযজ্ঞ নিয়ে লেখেন এক হৃদয় নিংড়ানো সংগীতালেখ্য। গানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কয়েকটি রচনা এ রকম: "বাংলাদেশ, বাংলাদেশ/ অস্তাচলে যেখানে দিন শেষ/ লাখো প্রাণের রক্তে রাঙা দেশ.../সবাই এসো, দাঁড়াও হাতে হাত/ মরছে দ্যাখো মানুষ দিনরাত/ কিশোরী মা'র দু-চোখ ভেসে যায়/ শিশুটি তাঁর ধুঁকছে অসহায়/বৃষ্টি আর ভীষণ কলেরায়।" 'বাংলাদেশ' গানটির সুরকার ছিলেন জোয়ান বায়েজ নিজেই। গানটি গেয়েছেনও তিনি। বাংলাদেশ লীগ অব আমেরিকার উদ্যোগে ২২শে আগস্ট মুক্তিযুদ্ধের শরণার্থীদের সাহায্যার্থে জেফারসন হাইস্কুল অডিটরিয়ামে এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।[১৩০] ১৯৭১ সালে ২০শে নভেম্বর সন্ধ্যা সাতটায় নিউইয়র্কে সেন্ট জর্জ চার্চে বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টির লক্ষ্যে সে সময় বিভক্ত বিশ্বের দুই প্রধান কবি যুক্তরাষ্ট্রের অ্যালেন গিন্সবার্গ ও রাশিয়ার আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি প্রথমবারের মতো একই মঞ্চে কবিতা পড়েছিলেন। এ রকম একটি দৃশ্য ভাবতে মুক্তিকামী মানুষের মনে শিহরন জাগায়। তাঁদের সঙ্গে আরও ছিলেন গ্রেগরি করসো, পিটার অরলভস্কি, কেনেথ কচ, এড স্যান্ডার্স প্রমুখ কবি। এই কবিতাপাঠের অনুষ্ঠানটির আয়োজন করেছিল 'আমেরিকানস্ ফর বাংলাদেশ'। তারা বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সৃষ্টি ও অর্থ সংগ্রহের কাজ করেছে।[১৩১]

১৩. প্রবাসী বাঙালিদের উদ্যোগে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ

মুক্তিযুদ্ধকালে প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা কিছু পত্র-পত্রিকা বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় প্রকাশিত হয়। যেমন:[১৩২]

ক. ব্রিটেন: 'Bangladesh News Letter', 'Bangladesh Today', 'বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা', 'জনমত'।

খ. যুক্তরাষ্ট্র: 'Bangladesh News Letter', 'Bangladesh News Bulletin', 'Bangladesh News Letter (Chicago)', 'বাংলাদেশ পত্র', 'শিখা'।

গ. কানাডা: 'Bangladesh', 'স্ফূলিঙ্গ'।

ঘ. মুজিবনগর সরকারের ওয়াশিংটনস্থ বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত - 'Bangladesh'.

এসব পত্র-পত্রিকা কেবল প্রবাসী বাঙালিদেরই উদ্বুদ্ধ করেনি, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে বিশ্ব জনমত সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। এসব পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ও প্রবন্ধ শিরোনামের একটি সংক্ষিপ্ত সংকলন পরিশিষ্ট ৩.গ-এ দেওয়া হলো।

১৪. পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণে প্রতিরোধ

প্রবাসী বাঙালিদের অন্যতম কূটনৈতিক পদক্ষেপ ছিল বিদেশ থেকে পাকিস্তান যেন সামরিক সাহায্য ও যুদ্ধসরঞ্জাম না পায়। এ সম্পর্কে দেশি-বিদেশি গণমাধ্যমে ফলাও করে প্রচারিত হয়েছিল-পাকিস্তানকে প্রদত্ত অস্ত্র-সরঞ্জাম ব্যবহৃত হচ্ছে একটি জাতিকে ধ্বংস করার কাজে। প্রবাসী বাঙালিরা পাকিস্তানে সামরিক সাহায্যের ভয়াবহ পরিণতি সম্পর্কে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সরকার প্রধানদের নিকট বার্তা প্রেরণ করেন। বাংলাদেশের গণহত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ ও রক্তাক্ত পটভূমিকায় বিশ্বের শান্তিকামী, মানবতাবাদী মানুষ বিবেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দংশিত হয়ে পাকিস্তানকে অস্ত্র ও অর্থ প্রেরণে নৈতিক, মানবিক ও আইনি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন, যার প্রচণ্ড অভিঘাতে যে জনমত সৃষ্টি হয় তা যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন প্রশাসন এড়িয়ে যেতে পারেনি। প্রবাসী বাঙালিরা স্ব স্ব অবস্থান থেকে যে সকল কার্যক্রম পরিচালনা করেন তা একদিকে যেমন কূটনৈতিক বলয়কে আলোড়িত করেছে, অন্যদিকে জনপ্রতিনিধিদের গভীরভাবে উদ্বেলিত করেছে। যুক্তরাজ্যের সিনেটর জন এফ. কেনেডি, স্যাক্সবি, ফ্রাংক চার্চ প্রমুখ প্রত্যেকে বাংলাদেশ ইস্যুকে বার বার সিনেটে উত্থাপন করেছেন।[১৩৩] এসব কারণে নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশ প্রশ্নে নেতিবাচক অবস্থান নিলেও জনমত গড়ে ওঠে বাংলাদেশের পক্ষে।

২৫শে মার্চ, ১৯৭১ থেকেই যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করলেও গোপনে সিয়েটো-সেন্টো চুক্তির অজুহাতে অস্ত্র পাঠোনোর চেষ্টা করে। এ সময়ে মার্কিন প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যবৃন্দ ও সিনেটরগণ পাকিস্তানে সামরিক সাহায্য ও যে কোনো ধরনের যুদ্ধসরঞ্জাম বন্ধের জন্য দাবি তোলেন। এমনকি 'পদ্মা' ও 'সুন্দরবন' অস্ত্রবাহী পাকিস্তানি জাহাজে মার্কিন সরকারের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও অস্ত্র প্রেরণ করা হচ্ছে, এ সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্য ও প্রমাণ সিনেট কমিটিতে উপস্থিত করেন এবং তদন্তের দাবি জানানো হয়। সিনেট সদস্য ফ্র্যাংক চার্চ ২২শে জুন ১৯৭১ সাল মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট পত্র লিখে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণে বিদ্যমান নিষেধাজ্ঞা কার্যকর করার উপর জোর দেন। পাকিস্তানের পূর্বাংশে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানে যুদ্ধাস্ত্র প্রেরণের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবল জনমত গড়ে ওঠে। এই জনমত গড়ে তোলার কার্যক্রমে গণমাধ্যম, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মার্কিন নাগরিক, জনপ্রতিনিধি ও প্রবাসী বাঙালিদের বিশেষ ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। জনমতের চাপে নিক্সন প্রশাসন প্রকাশ্যে পাকিস্তানে সামরিক অস্ত্র সরবরাহে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন।[১৩৪] পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্রে অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা বলবতে আইন পরিবর্তন করতে হয়।

ওয়াশিংটন স্টার, বাল্টিমোর সান প্রভৃতি পত্রিকায় পাকিস্তানি জাহাজ 'পদ্মা', 'সুন্দরবন' এবং 'আল আহমেদী' বাল্টিমোর বন্দর থেকে অস্ত্র বোঝাই করা হচ্ছে এ মর্মে তাৎক্ষণিকভাবে স্থানীয় সংবাদপত্র, রেডিও ও টেলিভিশনসহ সকল প্রচারমাধ্যমে প্রচারিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের ডেলাওয়ার ভ্যালিতে প্রবাসী বাঙালিদের সংগঠন 'বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ডেলাওয়ার ভ্যালি'র সদস্য সংখ্যা ছিলো ৩০টি পরিবার। তারা একদিকে অর্থ সংগ্রহ করেন এবং একইসাথে মার্কিন নাগরিক রিচার্ড কে. টেইলর-এর নেতৃত্বে গঠিত 'দি ফ্রেন্ডস অব ঈস্ট বেঙ্গল' এর সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন। পাকিস্তান থেকে আগত বা পাকিস্তান অভিমুখি জাহাজগুলোর সংবাদ রাখার দায়িত্ব পালন করে ঐ সংগঠনটি। মূলত জাহাজ কোম্পানির এজেন্সি হতে কোনো জাহাজে সামরিক যুদ্ধাস্ত্র যাচ্ছে কী না সংগঠনটি এর খবরাখবর রাখতেন। এসব জাহাজে যাতে অস্ত্র প্রেরিত হতে না পারে সে লক্ষ্যে অবরোধ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, যা ছিল ঐতিহাসিক। যুক্তরাষ্ট্রের সমুদ্রবন্দরগুলোতে যে অবরোধ সৃষ্টি করা হয়েছিল তা ছিল অভাবনীয় ও বিশ্ব জনমতকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবিত করার সাফল্যজনক কৌশল। জুলাই মাসে বস্টন, নিউইয়র্ক ও ওয়াশিংটন থেকে প্রবাসী বাঙালি বন্দরে সমবেত হন মার্কিন বন্ধুদের সঙ্গে। বিভিন্ন শহরের প্রতিনিধিরা মিলিত হয়ে সেখানে একটা সভা করেন। সভায় 'অহিংসভাবে' আন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গৃহীত হয়। পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রস্তুতি পুর্বে তাঁরা সংগ্রহ করেন ডিঙি নৌকা, রাবার বোট এবং সিলমাছের চামড়ায় আবৃত ক্ষুদ্র কাঠের নৌকা। পুলিশের নিষেধাজ্ঞাকে প্রত্যাখ্যান করে বন্দরের সমুদ্র সৈকতে ভাসিয়ে দেয় এসব নৌকা। সে সময় বন্দরনগরী বাল্টিমোর এবং তার পার্শ্ববর্তী এলাকাসমূহের স্থানীয় লোকজন সৈকতে সমবেত হয় খাদ্য ও পানীয় নিয়ে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগত ছাত্ররা তাদের সঙ্গে করে নিয়ে আসা নৌকা ভাসিয়ে দেয় সাগরে। এভাবে প্রতিটি এলাকা থেকে ছাত্রদের নিয়ে আসা অসংখ্য রাবার বোটও যুক্ত হয় মূল বহরের সাথে। যুদ্ধসাজের মতো সজ্জিত নৌকাবহর 'পদ্মা' জাহাজে মালামাল বোঝাইয়ের বিরুদ্ধে গড়ে ওঠে এক অপ্রতিরোধ্য প্রতিরোধ। মালামাল শূন্য হয়ে পাকিস্তানি জাহাজ 'আল আহমেদী' বাল্টিমোর বন্দর ত্যাগ করতে বাধ্য হয়। বাল্টিমোর থেকে সরে যাওয়া 'আল আহমেদী' জাহাজ নোঙর করে ফিলাডেলফিয়ায়। সে সংবাদও পৌঁছে যায়। প্রতিরোধ কর্মীরা সমুদ্রবন্দর পৌঁছে যান। তাদের দৃষ্টিতে জাহাজগুলো 'দু-কোটি' মানুষের মৃত্যু' ও 'শয়তানের প্রতীক'। 'অবরোধ' সময়ে কয়েকজন গ্রেফতার হন। এ জাহাজে তেরজন বাঙালি নাবিক ছিলেন। তাঁরা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন বন্দরে নেমে যাওয়ার চেষ্টা করলেও সফল হননি। কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় জাহাজ থেকে পালিয়ে আসেন মোফাজ্জেল আহমদ, আবু আহমেদ, সালেহ আহমেদ, মোত্তালেব, জহুরুল ও রমজান আলী।

করাচি থেকে রওয়ানা হবার পর নানাভাবে তাঁদের হয়রানি, অপমানিত এমনকি শারীরিক নির্যাতন করা হয়। অফিসাদের মুখপাত্র এ. কে. এম. নুরুল হুদা পাকিস্তানে ফিরে গেলে তাদের শারীরিক নির্যাতন কিংবা হত্যা করা হবে বলে আশঙ্কা করেন। পার্লামেন্ট সদস্য এ্যালফ্রেড এভান্সের সহায়তায় বাঙালি খালাসি ও অফিসারদের রাজনৈতিক আশ্রয়ের প্রার্থনা মঞ্জুর করাতে সক্ষম হন।

২৪শে জুলাই বাংলাদেশের ইনফরমেশন সেন্টার থেকে প্রকাশিত এক বুলেটিনে বলা হয়, ইন্টার ন্যাশনাল 'লংশোর মেনস' (জাহাজ শ্রমিক) ইউনিয়নের সদস্যরা পাকিস্তানমুখী জাহাজে অস্ত্র বোঝাই করবেন না বলে ইউনিয়েনের প্রেসিডেন্ট টমাস জানিয়েছেন। আগস্ট মাসে পাকিস্তানি জাহাজ 'বাগে ঢাকা' লন্ডন আসার পথে করাচিতে জাহাজের বাঙালি সেকেন্ড অফিসার আবদুর বশীরকে করাচিতে নামিয়ে রাখে। জাহাজে আরো তিনজন বাঙালি আবুল কালাম আবদুল সিদিকুল্লা ও নূরুল হক লন্ডনে নেমে যান।

যুক্তরাষ্ট্রের গোপন দলিলপত্রে দেখা যাচ্ছে, ১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জাতিংসংঘে নিযুক্ত চীনের স্থায়ী প্রতিনিধি ওয়াং হুয়ার সঙ্গে এক বৈঠকে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জার বলেন, "আমাদের পক্ষে এই মুহূর্তে অস্ত্র সরবরাহ সম্ভব নয়। আইন আমাদের হাত পা বেঁধে ফেলেছে।"[১৩৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫. মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসীদের আর্থিক সহায়তা

প্রবাসী বাঙালিদের অনন্য সাধারণ অবদানের মধ্যে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় তাঁরা যে আর্থিক সাহায্য ও সহযোগিতা করেন তা ছিল খুবই উল্লেখ্যযোগ্য। পূর্ব পাকিস্তানের আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৩ সালের শেষার্ধে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে লন্ডনে বলেছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান স্বাধীনতা ঘোষণা করলে, এখানকার প্রবাসীরাই অর্থের সংস্থান করবে। বঙ্গবন্ধু দূরদৃষ্টিসম্পন্ন বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণিত হয় প্রবাসীদের মুক্তিযুদ্ধে আর্থিক সহায়তা দানে। সে সময় তাঁরা বিভিন্ন দেশে স্ব স্ব সংগঠনের মাধ্যমে ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রচারণা, জনমত গঠন, মিটিং-মিছিলে লক্ষ লক্ষ বৈদেশিক মুদ্রা ব্যয় করেছেন। এছাড়া বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত বাংলাদেশ ফাণ্ডে চাঁদা দান করেন ৪,০৬,৮৫৬ পাউন্ড। 'বাংলাদেশ ফান্ডে' গৃহীত চাঁদার মধ্যে যুক্তরাজ্য প্রবাসী বাঙালিরা দান করেন শতকরা ৯৫ ভাগ। বাকি ৫ ভাগ আসে তখন যে অল্পসংখ্যক বাঙালি মধ্যপ্রাচ্যে থাকতেন তাদের কাছ থেকে। এই অর্থ হতে প্রবাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের সমন্বয় সাধনের জন্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত স্টিয়ারিং কমিটির মাধ্যমে খরচ হয় ৩৩,২১২ পাউন্ড।

যুদ্ধশেষে বিচারপতি চৌধুরী যখন দেশে ফিরে আসেন তখন 'বাংলাদেশ ফান্ড' হতে তিনি সাথে করে নিয়ে আসেন ৩,৭৬,৫৬৮ পাউন্ড এবং তা বাংলাদেশ সরকারের তহবিলে জমা করেন। প্রাপ্ত তহবিলের আয় ও ব্যয়ের হিসাব পরিশিষ্ট (৩. ঘ দ্রষ্টব্য)। এ ছাড়াও যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপান, সিঙ্গাপুর, জাকার্তা প্রভৃতি দেশ থেকেও প্রবাসী বাঙালি নিজেদের মধ্যে ও বিদেশি বন্ধুদের নিকট হতে চাঁদা সংগ্রহ করে মুজিবনগর সরকার ও শরণার্থীদের জন্য বিভিন্ন সংস্থাকে প্রদান করেন। এছাড়া টেকনিক্যাল যন্ত্রপাতি ও শীতবস্ত্র ক্রয় করে মুজিবনগর সরকারের নিকট প্রেরণ করেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষে বিদেশ থেকে অর্থ ও অন্যান্য সহযোগিতার জন্য আবেদন করা হয়েছিল। প্রেরণের ঠিকানাও দেওয়া হয়।

১৬. উপসংহার

প্রবাসে স্থিত বাঙালিরা বিভিন্ন সংগঠন, সংস্থা ও সমিতির মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে প্রতিনিয়ত মিটিং-মিছিল, স্মারকলিপি প্রেরণ, সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে নির্মম হত্যাযজ্ঞ, নিরীহ মানুষের উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণ, লক্ষ লক্ষ ছিন্নমূল মানুষের আর্তনাদ তুলে ধরে জনমত গঠন করেছেন। বিভিন্ন দলের জনপ্রতিনিধিদের নিকট বাংলাদেশের গ্রাম-গঞ্জে সীমাহীন নিষ্ঠুরতা, ধর্ষণ ও বাঙালি জাতিসত্তাকে নিশ্চিহ্ন করার ব্লু-প্রিন্ট তুলে ধরে বাংলাদেশকে সমর্থন ও স্বীকৃতি আদায়ের লক্ষ্যে নানা প্রকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। তাদের এসব সামগ্রিক কার্যক্রম জনমনে যেমন, কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। যে প্রতিক্রিয়ার অভিঘাত সমগ্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এশিয়া, দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া, সমগ্র ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রিটেন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল।

মুজিবনগর সরকারের প্রত্যক্ষ সমর্থন ও কূটনৈতিক দিক নির্দেশনায় প্রবাসী বাঙালিরা প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন পর্যায়, আইন সভায় বা বরেণ্য ব্যক্তিবর্গের নিকট কখন দলবদ্ধ, কখন গোষ্ঠীক বা ব্যক্তিক পর্যায়ে যোগাযোগ স্থাপন করে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক তৎপরতার ঘাটতি পূরণ করতে উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। যার ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন বাংলাদেশের পক্ষে জনমত সংগঠিত হয়েছে, অন্য দিকে তেমনি কূটনৈতিক মহলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছে। ব্রিটেনে প্রবাসী বাঙালিদের কর্মকাণ্ড, গণমাধ্যম ও জনমত প্রবলভাবে বাংলাদেশের বাস্তব ঘটনাবলি ও হৃদয়বিদারক চিত্র তুলে ধরার ফলে ক্ষমতাসীন সরকার পাকিস্তান সরকারকে প্রত্যক্ষ সমর্থন না দিয়ে অনেকাংশে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের নিক্সন সরকার পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থেকেছে সর্বদাই। কিন্তু স্বদেশ ও বিশ্ব জনমতের চাপ মাথায় নিয়ে তাকে চলতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসরত প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন স্থানে সংগঠনের মাধ্যমে অথবা স্ব স্ব অবস্থান থেকে জনমত সৃষ্টি, সিনেট ও প্রতিনিধি পরিষদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন নানাভাবে। দেশের মুক্তিযুদ্ধের অনিবার্যতা এবং স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে বিভিন্ন দূতাবাসে বহুমাত্রিক তৎপরতার সক্রিয় উদ্যোগ কূটনৈতিক ইতিহাসে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। বিশ্ব পরিসরে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্রবাসী বাঙালিরা নিরলস তৎপরতার মাধ্যমে বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের পক্ষে অঘোষিত কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘে বাংলাদেশের উপস্থিতি দৃশ্যমান থেকেছে। প্রবাসী বাঙালিদের এই অবদান কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যুদ্ধে লিপ্ত একটি দেশের জন্য অনন্য দৃষ্টান্ত হিসেবেই ইতিহাসে লিপিবদ্ধ থাকবে।

পরিশিষ্ট ৩. ক

ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডায় অবস্থিত বাঙালিরা যে সকল সংগঠন ও সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে নানাভাবে মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নেয়ার তৎপরতা চালায় সে সব সংগঠনের মধ্যে উল্লেখ্য সংগঠনের নাম, ঠিকানা ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম:

সংগঠনের নাম	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম
স্ট্রিয়ারিং কমিটি অব দি অ্যাকশন কমিটি, ১১ গোরিং স্ট্রিট ইস্ট, লন্ডন	উপদেষ্টা : বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী, আহ্বায়ক: আজিজুল হক ভূইয়া, সদস্য: শেখ আব্দুল মান্নান, কবীর চৌধুরী, শামসুর রহমান, মনোয়ার হোসেন
বাংলাদেশ স্টুডেন্টস অ্যাকশন কমিটি ইন ইউ.কে. ৩৫, গামাগেস বিল্ডিং, ১২০ হলবর্ন, লন্ডন ইসিআই	আহ্বায়ক: এ. জেড. এম. মুহাম্মাদ হোসাইন, খন্দকার মোশাররফ হোসেন, এ. কে. নজরুল ইসলাম, সদস্য: শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক, শফিকুদ্দিন আহমদ বুলবুল, জিয়াউদ্দিন মাহমুদ, লুৎফর রহমান শাহজাহান, আফরোজ আফগান চৌধুরী, এ.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগঠনের নাম	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম
	টি. এম. ওয়ালি আশরাফ, সুলতান মাহমুদ শরিফ
বাংলাদেশ উইমেনস্ অ্যাসোসিয়েশন ইন ইউকে	মিসেস জেবুন্নেসা বখ্‌ত, মিসেস আনোয়ারা জাহান, মিসেস মুন্নি রহমান, মিসেস জেবুন্নেসা খায়ের, মিসেস ফেরদৌসি রহমান, মিসেস লুলু বিলকিস বানু
বাংলাদেশ পিপলস কালচার সোসাইটি, ৫৯, সাইমুর হাউস, টাভিস্টক প্লেস, লন্ডন, ডব্লিউ. সি. আই.	প্রেসিডেন্ট : ড. এম. এনামুল হক, সেক্রেটারি : মুন্নি রহমান, সদস্য : মিসেস মনজু হাফিজ, এম. এ. রউফ, মিসেস রুনি চৌধুরী।
বাংলাদেশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন ইন ইউ. কে.	এম. এ. হাকিম, ডা. মনজুর মোরশেদ তালুকদার, ডা. এ. টি. এম. জাফরুল্লাহ চৌধুরী, ডা. মোশাররফ হোসাইন
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি, ৫২, ওয়ার্ডসওয়ার্থ রোড, স্মল হেলথ, বার্মিহাম-১০	প্রেসিডেন্ট : জগলুল পাশা, সেক্রেটারি : এম. আজিজুল হক ভূঁইয়া, সদস্য : আফরোজ মিয়া, ইস্রাইল মিয়া, এম. ইউ. আহমদ, হাবিবুর রহমান, আবুল হোসাইন
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি, ৬, ব্রিটানিয়া আর ডি, প্রোটসমাউথ	প্রেসিডেন্ট : এম. এ. রাজ্জাক খান, ভি. পি. - গিয়াস উদ্দিন সেক্রেটারি : সাজেদুর রহমান চৌধুরী, সদস্য : টি. এ. তালুকদার, নিসার আহমদ
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন ইন স্কটল্যান্ড, ৫, এলডন স্ট্রিট, গ্লাসগো সি-৩।	ড. মোজ্জামেল হক, ড. রফিউদ্দিন আহমেদ, কাজি ইসামুল হক
বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট, ১০, লিসটার গরভ, লিডস-৭	প্রেসিডেন্ট : মিয়া মো. মোস্তাফিজুর রহমান, সদস্য : খায়রুল বাসার, মোঃ নুরুদ্দোহা, ড. ফজলুল করিম
অ্যাকশন কমিটি (লন্ডন) ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ. কে. ৫৮, বারউইক স্ট্রিট, লন্ডন- ডব্লিউ.আই	গাউস খান, সাখাওয়াত হোসাইন, তৈয়বুর রহমান, আতাউর রহমান খান, ইসহাক, আমির আলী
অ্যাকশন কমিটি ফর বাংলাদেশ ইন নর্থ এন্ড নর্থ-ওয়েস্ট লন্ডন। ৩৩, ড্যাগমার রোড,লন্ডন এন-২২	প্রেসিডেন্ট : এ. এম. আইউব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগঠনের নাম	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি ইন গ্রেট ব্রিটেন। ৬৮ এ, স্ট্রিটথ্যেম রোড, লন্ডন-এস. ডব্লিউ. ১৬	ডব. এইচ. তালুকদার, আহমেদ হোসাইন জোয়ারদার
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি ওয়েস্টমিনিস্টার, ২৩, মিনফোর্ড গার্ডেনস, লন্ডন- ডব্লিউ-১	এ. রহিম চৌধুরী, যুগ্ম আহ্বায়ক শরীফুল ইসলাম
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি (ক্যামব্রিজ, এস্যাক্স, স্যাফ্লোক এন্ড নরউইক) ৭০, এ হাই স্ট্রিট, কলচেষ্টার এস্যাক্স	এম. লোকমান
ইসলিংটন কমিটি ফর বাংলাদেশ, ১৮৯, ক্যালেডোনিয়ান রোড, লন্ডন- এন. ১	জেনারেল সেক্রেটারি : ই. রহমান
সাউথহল বাংলাদেশ সংগ্রাম পরিষদ	প্রেসিডেন্ট : আবদুস সালাম চৌধুরী, জেনারেল সেক্রেটারি : এম. ইউ. আহসান, ভি. পি. : আকবর আলী, ভি. পি. : সাদিক আলী, ট্রেজারার: সাজ্জাদুর রহমান, অর্গানাইজিং সেক্রেটারি: নূর হোসাইন
ইউনাইটেড অ্যাকশন বাংলাদেশ, ৯১, কমার্সিয়াল রোড, লন্ডন-ই. ১	এম. এ. সামাদ খান, আর. ইউ. আহমেদ, এ. এইচ. জোয়ারদার, এ. মুতালিব, মো. আবদুর রউব
বাংলাদেশ রিলিফ ফান্ড	জেনারেল সেক্রেটারি : মো. আবদুস সালাম খান,
বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন। ল্যানক্যাশিয়ার এন্ড এ্যাডজাস্যান্ট কাউন্টিস, ৩৩৬, স্কটপোর্ট রোড, ম্যানচেস্টার-১৩	প্রেসিডেন্ট : এম. এ. মতিন, জেনারেল সেক্রেটারি : এম. লতিফ আহমেদ, সদস্য : এম. জহিরুল এইচ. চৌধুরী
অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপালিক অব বাংলাদেশ। বায়াসওয়াটার ব্রাঞ্চ, লন্ডন	প্রেসিডেন্ট : মনজুর মোরশেদ তালুকদার, সেক্রেটারি : কাজী মুজিবুর রহমান, সদস্য : আবদুর রাজ্জাক, সাখাওয়াত হোসাইন
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি, কিড্ডেরমিনিস্টার ৭২, কভেনট্রি স্ট্রিট. কিড্ডেরমিনিস্টার, ওরচেস্টার	প্রেসিডেন্ট : সৈয়দ মুজতবা হোসাইন
অ্যাকশন কমিটি ফর পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ. লুটন,	প্রেসিডেন্ট : দাবির উদ্দিন, সেক্রেটারি : মো. বুরহান উদ্দিন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংগঠনের নাম	নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের নাম
৫, কেনিলওয়ার্থ রোড, লুটন, বেডস	
বাংলাদেশ ফ্রিডম মুভমেন্ট ওভারসীজ। গ্যাঞ্জেজ রেস্টুরেন্ট। ৪০, জিরাল্ড স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ -১	রেভ. ডেভিড ম্যাশন, তসাদ্দুক আহমেদ
ইন্টারন্যাশনাল ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ	লেডি গিফোর্ড, জন প্লেটাস মিলস কিউ. সি.
বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি। নর্থহাম্পটন ২১, ক্যাসটিলটেন স্ট্রিট, ক্যাসটিলটেন, নর্থহাম্পটন	প্রেসিডেন্ট : এ. এইচ. চৌধুরী, সেক্রেটারি : বি. মিয়া, সদস্য : ইস্রাইল আলী, ইসহাক হোসাইন, আবদুল আহাদ
ইস্ট লন্ডন অ্যাকশন কমিটি	তৈয়বুর রহমান, শামসুর রহমান, মতিউর রহমান চৌধুরী, হাজী নেসার আহমেদ, মেম্বার আলী, জিল্লুর রহমান, সিরাজুল হক, আতাউর রহমান।
সাউথ লন্ডন অ্যাকশন কমিটি	বি. এইচ. তালুকদার, নুরুল হক চৌধুরী, নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ, মোহাম্মদ রফিক
কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ ইন ইউ.কে. (কমিটি ডিসলভ্ড আফ্টার কনভেনট্রি কনফারেন্স)	প্রেসিডেন্ট : গাউস খান, সেক্রেটারি : শেখ আবদুল মান্নান, ট্রেজারার : আবদুল হামিদ, সদস্য : সাখাওয়াত হোসাইন, আমীর আলী, জাকারিয়া খান চৌধুরী, সামছুল হুদা হারুন
লন্ডন অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ	প্রেসিডেন্ট : গাউস খান, সেক্রেটারি : সাখাওয়াত হোসাইন, সদস্য : আমীর আলী
সাউথ-ওয়েস্ট লন্ডন অ্যাকশন কমিটি	সৈয়দ আবু আহসান, কায়সারুল ইসলাম
হেন্ডন অ্যাকশন কমিটি	প্রেসিডেন্ট : আবদুল মান্নান, সেক্রেটারি : হারুন-অর-রশিদ
কনভেনট্রি অ্যাকশন কমিটি	সামসুল হুদা চৌধুরী, মোতসিম আলী
বাংলাদেশ ওয়ার ক্রস সোসাইটি	প্রেসিডেন্ট : এস. এ. এম এরশাদ, সেক্রেটারি : আবদুল্লাহ ফারুক, সদস্য : ড. মোকলেসুর রহমান, ড. এ. সোবাহান, ড. সুফিয়া কামাল
বাংলাদেশ কালচারাল অ্যাসোসিয়েশন	মোহাম্মদ আলী
অ্যাকশন কমিটি ফর দি পিপলস্	আবদুল মুছাব্বির তরফদার, শারাফাত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ৩. খ

মুক্তিযুদ্ধকালে বিশ্বজোড়া যে সকল বাঙালি কূটনীতিক পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করে মুজিবনগর সরকারের প্রতি আনুগত্য ঘোষণা করেন তাঁদের তালিকা:

১। কে.এম. শেহাবুদ্দিন	দ্বিতীয় সচিব, দিল্লি: ৬ এপ্রিল
২। আমজাদুল হক	সহকারী প্রেস এটাশি, দিল্লি: ৬ এপ্রিল
৩। এম. হোসেন আলী	ডেপুটি হাই কমিশনার কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৪। রফিকুল ইসলাম	প্রথম সচিব, কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৫। আনওয়ারুল করিম চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৬। কাজী নজরুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব, কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৭। মাকসুদ আলী	তৃতীয় সচিব, কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৮। সাইদুর রহমান	সুপারিনটেন্ডেন্ট, কলকাতা: ১৮ এপ্রিল
৯। এ.এইচ. মাহমুদ আলী	ভাইস কনসাল, নিউইয়র্ক: ২৬ এপ্রিল
১০। হাবিবুর রহমান	শিক্ষা অফিসার, লন্ডন, ২৭ এপ্রিল
১১। আব্দুর রাজ্জাক খান	সহকারী শিক্ষা এটাশি, ওয়াশিংটন: ১৭ মে
১২। আবুল মাল আব্দুল মুহিত	অর্থনৈতিক কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন: ৩০ জুন
১৩। মহিউদ্দিন আহমেদ	দ্বিতীয় সচিব, লন্ডন: ১ আগস্ট
১৪। এস আনওয়ারুল করিম	উপস্থায়ী প্রতিনিধি, নিউইয়র্ক: ৪ আগস্ট
১৫। এনায়েত করিম	মিনিস্টার, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
১৬। শাহ এ.এম. শামসুল কিবরিয়া	কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
১৭। আবু রুশদ মতিন উদ্দিন	শিক্ষা কাউন্সেলর, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
১৮। আতাউর রহমান চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, হিসাব, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
১৯। সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী	তৃতীয় সচিব, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
২০। এ.এম. শরফুল আলম	সহকারী প্রশাসন এটাশি, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
২১। শেখ রুস্তম আলী	সহকারী তথ্য এটাশি, ওয়াশিংটন: ৪ আগস্ট
২২। লুৎফল মতিন	তৃতীয় সচিব, হিসাব, লন্ডন: ৫ আগস্ট
২৩। আব্দুর রউফ	সহকারী তথ্য এটাশি, লন্ডন: ৮ আগস্ট
২৪। ফজলুল হক চৌধুরী	সহকারী শ্রম এটাশি, লন্ডন: ১১ আগস্ট
২৫। মহিউদ্দিন আহমদ	অস্থায়ী ট্রেড কমিশনার, হংকং: ১৮ আগস্ট
২৬। এ.এফ.এম. আবুল ফতেহ	রাষ্ট্রদূত, ইরাক: ২৯ আগস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৭। খুররম খান পন্নী	রাষ্ট্রদূত, ফিলিপাইনস: ১৩ সেপ্টেম্বর
২৮। মুহিউদ্দিন আহমদ জায়গীরদার	তৃতীয় সচিব, লেগোস: ১৩ সেপ্টেম্বর
২৯। এম. মুস্তাফিজুর রহমান	দ্বিতীয় সচিব, কাঠমান্ডু: ৩ অক্টোবর
৩০। হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী	কাউন্সেলর, দিল্লি: ৪ অক্টোবর
৩১। এম. রেজাউল করিম	প্রথম সচিব, লন্ডন: ৭ অক্টোবর
৩২। আব্দুল মোমিন	রাষ্ট্রদূত, বুয়েনস আইরেস: ১১ অক্টোবর
৩৩। ফজলুল করিম	তৃতীয় সচিব, কায়রো: ২৬ অক্টোবর
৩৪। এস.এম. মাসুদ	তথ্য সচিব, টোকিও: ২ নভেম্বর
৩৫। কিউ.এ.এম.এ রহিম	তৃতীয় সচিব, টোকিও: ২ নভেম্বর
৩৬। ওয়ালিউর রহমান	দ্বিতীয় সচিব, জেনেভা: ২ নভেম্বর
৩৭। সৈয়দ আমিরুল ইসলাম	তৃতীয় সচিব, তিউনিস: ১১ নভেম্বর
৩৮। আজিজুল হক চৌধুরী	তৃতীয় সচিব, লন্ডন: ৭ ডিসেম্বর

তালিকাটি শুধু কর্মকর্তাদের। উল্লেখ্য, বিভিন্ন দূতাবাসে যে সমস্ত বাঙালি কর্মচারী ছিলেন তাঁদের ভূমিকা মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তাদেঁর সংখ্যা শতাধিক।[১৩৬]

পরিশিষ্ট ৩.গ

ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা থেকে প্রবাসী বাঙালিদের দ্বারা প্রকাশিত পত্র-পত্রিকার সংবাদ ও প্রবন্ধ শিরোনাম সংকলন।

ক. ব্রিটেনে প্রকাশিত বাংলাদেশি ইংরেজি সংবাদপত্র

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন /সার্কুলার	বিষয়বস্তু
২৬ এপ্রিল ১৯৭১	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন	'পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যতই শক্তিশালী হোক না কেন জনগণ দাসত্বের শৃঙ্খল ভাঙ্গতে কৃতসংকল্প। আমাদের সবকিছুর বিনিময় ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। আমাদের বিজয় অনিবার্য।'
		'হাজার হাজার মানুষ কামানের গোলা, বোমা ও বেপরোয়া গুলিতে পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী হত্যাযজ্ঞের শিকার। ১২৫জন প্রতিনিধি ও ২৫জন পর্যবেক্ষক কনভেনট্রি জাতীয় সম্মেলনে উপস্থিত হয়ে ঘোষণা করেন বাংলাদেশের স্বাধীনতা অনিবার্য। এটা শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র।'
		'মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক থেকে পাঠান এক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন /সার্কুলার	বিষয়বস্তু
		পত্রে উল্লেখ করা হয়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং ল্যাটিন আমেরিকার জনগণ সামরিক ডিক্টেটর ইয়াহিয়া খান কর্তৃক আধুনিক সমরাস্ত্র দ্বারা বাঙালিদের হত্যা করছে এটা মর্মান্তিক ও ভয়ার্ত। জনগণ পূর্ণভাবে পূর্ববঙ্গের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার যা শেখ মুজিব দাবি করেছেন তার প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানাচ্ছে।'
২১ জুন, ১৯৭১	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন	'বাংলাদেশ থেকে প্রাপ্ত রিপোর্ট উল্লেখ করে এই সংখ্যায় বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ আসাম ত্রিপুরা সীমান্তে মুক্তিবাহিনী আক্রমণ চালিয়ে পাকিস্তান সামরিক ঘাটিগুলো ধ্বংস করে চলেছে। মুক্তিবাহিনীর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে জনগণ জানতে পারছে এবং তাদেরকে সাধারণ মানুষ ব্যাপকভাবে সহযোগিতা করছে।'
		'জাপানের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক পত্রিকা নিপ্পন কাইজাইই শিম্বুন এর প্রতিনিধি পাকিস্তান থেকে ঘুরে এসে রিপোর্ট দিয়েছে যে, পাকিস্তানের সামরিক সরকার বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে অবদমিত করতে পারবে না কারণ পাকিস্তানে চরম অর্থনৈতিক সংকটে পরেছে।'
৭ জুলাই, ১৯৭১	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন।	'প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ভাষণের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, অধীকাংশ রাষ্ট্রই পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং পাকিস্তানের সমস্যা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। তার ভাষণে মনে হয়েছে তার কোনো বাস্তব সম্মত পরিকল্পনা নেই। ইয়াহিয়া খানের ভাষণের জবাবে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী বলেন, তিনি মনে করেন বিশ্ব জনমত বাংলাদেশের পক্ষে এবং ইয়াহিয়া খানের চালাকি বিশ্ব ধরে ফেলেছে।'
	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন	'বৈরুত থেকে প্রকাশিত 'আলশাব' পত্রিকায় আরবের বিখ্যাত লেখক মোহাম্মদ নাক্কাশ এর লেখা প্রবন্ধের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ যদি বেঁচে থাকতেন তাহলে তিনি দেখতে পারতেন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা তাঁহার মহান স্বপ্ন, গর্বের বিষয় ছিল কিনা অথবা তিনি যা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন /সার্কুলার	বিষয়বস্তু
		করেছেন তা নিয়ে ব্যথিত হতেন। তাঁর স্বপ্নকে ভেঙে খান খান করে দেয়া হয়েছে।'
	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন।	'পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক উপনিবেশিক সামরিক শাসন কিভাবে জেনারেলদের বুটের তলায় গণতন্ত্রকে পিষ্ট করছে। এক সপ্তাহে পাকিস্তানের তিনটি বোমা বিস্ফোরিত হয়েছে। এক, দাতাগোষ্ঠীরা পাকিস্তানকে সাহায্য বন্ধ করেছে। দুই, প্রতিটি জিনিসের দাম আকাশচুম্বী হয়ে পড়েছে, অর্থনীতি ভেঙে গেছে। তিন, জাতীয়ভাবে গণনীতি ঘোষিত হচ্ছে না, দিগন্তে তিনি সাদা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াচ্ছেন।'
নভেম্বর, ১৯৭১ (তারিখ বিহীন)	বাংলাদেশ নিউজ লেটার, লন্ডন	'মিসেস গান্ধী ঘোষণা করেছেন পূর্ববঙ্গ অবশ্যই স্বাধীন হবে। বাংলাদেশের একমাত্র সমাধান স্বাধীনতা।'
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ টুডে, মুজিব নগর সরকারের লন্ডনস্থ মিশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পাক্ষিক	'২৫ সপ্তাহের ভিতরে ২৫ হাজার পাকিস্তানি সৈন্য বাংলাদেশের মাটিতে নিহত হয়েছে। মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের আক্রমণে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিদ্যুৎ বিতরন ছিন্ন ভিন্ন হয়েছে। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর চলাচলের ব্রিজ-কালভার্ট ৯০ ভাগ ধ্বংস হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনীর আক্রমণ তীব্রতর হচ্ছে। ইয়াহিয়া খানের পূর্ব বাংলায় বেসামরিক প্রশাসন প্রতিষ্ঠা ঘোষণা একটি আই ওয়াশ মাত্র। যাকে গভর্নর নিযুক্ত করা হয়েছে সে শুধু নিজেকেই প্রতিনিধিত্ব করে।'
১৫ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১	বাংলাদেশ টুডে, মুজিবনগর সরকারের লন্ডনস্থ মিশনের প্রচার বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত পাক্ষিক	'বাংলাদেশের পক্ষে বিশ্ব জনমত সংগঠিত হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ইউ.কে. স্টিয়ারিং কমিটির প্রতিনিধিরা বিশ্বের বহু স্থানে বাংলাদেশের পক্ষে ইতিবাচক লবি করেছে। তারা প্যারিসে আন্ত পার্লামেন্টারীর ৫৯তম কনফারেন্সে ৭৭টি দেশে ৭০০ প্রতিনিধিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সমর্থ হয়েছে। অনুরূপভাবে টিইউসি ও ব্রিটিশ লেবার পার্টি কনফারেন্সেও তারা সক্রিয়ভাবে কার্যক্রম চালিয়েছে।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন /সার্কুলার	বিষয়বস্তু
১৫ অক্টোবর, ১৯৭১	বাংলাদেশ টুডে, ঐ, লন্ডন।	'ব্রিটিশ লেবার পার্টি পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বর্বরতাকে নিন্দা জানিয়েছে। কনফারেন্সে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত নেতৃত্ব ও নিরীহ জনগণের উপর সামরিক বাহিনীর শক্তি প্রয়োগ যে অবর্ণনীয় দুঃখ নিয়ে এসেছে তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব পাকিস্তান সরকারের। এসব ঘটনা মানবতা বিরোধী, বিশ্ব শান্তির প্রতি হুমকি এবং শরণার্থী ও দুর্ভিক্ষ ডেকে আনবে।'
১ নভেম্বর,	বাংলাদেশ টুডে, ঐ, লন্ডন।	'ঢাকায় মুক্তিবাহিনীর প্রচন্ড আক্রমণ চলছে। প্রতিনিয়তই রাজাকার ও পাকিস্তান সেনাবাহিনী মৃত্যু বরণ করছে। চার দিন আগে আয়ূব খানের গভর্নর আব্দুল মোনায়েম খান মুক্তিবাহিনীর হাতে নিহত হয়েছে। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলো মুক্তিবাহিনীর দখলে চলে গেছে।'
৩ আগস্ট ১৯৭১	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা (বাংলাদেশ ষ্টিয়ারিং কমিটির অর্ধসাপ্তাহিক পত্রিকা), লন্ডন	'অ্যাকশন বাংলাদেশের উদ্যোগে ১লা আগস্ট ট্রাফালগার স্কোয়ারে প্রায় ৪০ হাজার প্রবাসী বাঙালি ও কয়েক হাজার ব্রিটিশ নাগরিক অনুষ্ঠিত সভায় যোগদান করেন। সভা শেষে শৃঙ্খলাবদ্ধভাবে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী মি. হীথের বাস ভবন, পার্লামেন্ট হাউস ও বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন। বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ, বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি এবং পাকিস্তান সরকারকে সকল আর্থিক ও সামরিক সাহায্য বন্ধের দাবি জানিয়ে উচ্চারিত স্লোগান রাজপথকে কাঁপিয়ে তোলে।'
২৭ আগস্ট ১৯৭১	বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা, ঐ, লন্ডন	'যুক্তরাজ্যে বাংলাদেশ মিশনের উদ্বোধন করেন বাংলাদেশের বিশেষ প্রতিনিধি ও গ্রেট ব্রিটেনে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। মিশনের ঠিকানা: ২৪ পেম্বরিজ গার্ডেনস, লন্ডন ডব্লিউ-২।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন /সার্কুলার	বিষয়বস্তু
৮ সেপ্টেঃ, ১৭ সেপ্টেঃ, ২১ সেপ্টেঃ, ২১ সেপ্টেঃ, ২৬ ও ২৯ অক্টোঃ, ৫ নভেঃ, ১৪ ডিসেঃ ১৯৭১।	পরিক্রমা, ঐ, লন্ডন	'বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন', 'বিভিন্ন বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশর প্রতিনিধিত্ব', 'বিচারপতি চৌধুরীর তৎপরতা', 'জনসভা ও নৃত্যনাট্য', 'ডেলিগেশন গণমিছিল', 'বাংলাদেশ সরকার তৈরি', 'স্বীকৃতির দাবিতে জনসভা'
২১ নভেঃ, ১৯৭১	জনমত কর্তৃক সংবাদের শিরোনাম	সম্পাদকীয়ঃ 'কোন আপোষ নয়', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের সপক্ষে বিভিন্ন তৎপরতা', 'মুক্তিসংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি'

খ) যুক্তরাষ্ট্রে হতে প্রবাসী বাঙালিদের কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা সমূহ।[১৩৭]

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন/ সার্কুলার	শিরোনাম
১৪ মে ১৯৭১	বাংলাদেশ পত্র	সম্পাদকীয়ঃ 'সংগঠন ও সংগ্রামের' 'ইতিহাস ও কর্মসূচী'।
১৭ মে, ২৫ মে, ১০ জুন, ১ জুলাই, ১৫ জুলাই, ৫ আগস্ট, ২০ আগস্ট, ২০ আগস্ট, ১০ সপ্টেঃ, ২৫ সেপ্টেঃ, ১০ অক্টোঃ, ১০ অক্টোঃ, ২৫ অক্টোঃ, ১০ নভেঃ, ২৫ নভেঃ, ১০	বাংলাদেশ নিউজ লেটার শিকাগো, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।	'বাংলাদেশ আন্দোলনঃ সম্পাদকীয় ও খবর', 'সম্পাদকীয় ও ঘোষণা', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর', 'সম্পাদকীয় বাংলাদেশকে সাহায্য করুন', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর', 'কংগ্রেসে পাকিস্তান প্রশ্ন', 'সম্পাদকের কথা', 'ইকনমিক কাউন্সিলর-এর পদত্যাগ বি, ডি, এল, সভাপতির সফর', 'বিভিন্ন বাংলাদেশ দলের খবর', 'সম্পাদকের বক্তব্য ও পরামর্শ', 'বাংলাদেশ দূতের ভাষণ, বি, ডি, এল, সভাপতির সফর', 'বিভিন্ন বাংলাদেশ দলের খবর', 'ওয়ার্ল্ড এয়ার ওয়েজের বিরুদ্ধে সপ্তাহব্যাপী বিক্ষোভ', 'বাংলাদেশ দলসমূহের খবর', 'সম্পাদকের বক্তব্য', 'সম্পাদকীয় ইয়াহিয়ার মোমের প্রাসাদ',

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ) কানাডা হতে প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রকাশিত পত্র-পত্রিকাসমূহ।[১৩৮]

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন/সার্কুলার	শিরোনাম
৩১ জুলা:, ২৫, আগস্ট , ১৫ ও ৩১ অক্টো: ১৯৭১	বাংলাদেশ টরেন্টো, কানাডা।	'পশ্চিম পাকিস্তান যুদ্ধের ডাক', 'সম্পাদকীয়', 'শেখ মুজিবের বিচার এবং বিশ্বপ্রতিক্রিয়া', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর', 'স্থানীয় সংবাদ', 'স্থানীয় সংবাদ'
১ সেপ্টেম্বর ১৯৭১	স্কুলিঙ্গ, কুবেক, কানাডা।	'সম্পাদকীয়: বাংলাদেশে জনযুদ্ধ','পদ্মা'র ঘটনা','বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর'

ঘ) বাংলাদেশ মিশন, ওয়াশিংটন থেকে প্রকাশিত সংবাদ, সার্কুলার, বুলেটিনসমূহ:

তারিখ	পত্রিকা/বুলেটিন/সার্কুলার	শিরোনাম
১ আগস্ট, ৩ সেপ্টে:, ১০ সেপ্টে:, ১৭ সেপ্টে:, ২৪ সেপ্টে:, ১ অক্টো:, ১৫ অক্টো:, ২২ অক্টো:, ২৯ অক্টো:, ১৯ নভে:, ৩ ডিসে:, ১০ ডিসে: , ১৬ ডিসে:, ১৭	বাংলাদেশ মিশন কর্তৃক প্রকাশিত পত্রিকা/সার্কুলার/বুলেটিন	'মুজিবের বিচার ও বিশ্ব প্রতিক্রিয়া', 'বাংলাদেশ আন্দোলনের খবর', 'পশ্চিম পাকিস্তানি সেনা বাহিনীর কাজ', 'পাকিস্তানি ধ্বংসলীলা', 'সিদ্দিকী বাংলাদেশ মিশনের নেতৃত্ব করছেন', 'বাংলাদেশে জাতিসংঘ ত্রাণ সাহায্য', 'বাংলাদেশ পরিস্থিতি বিশ্বশান্তির জন্য', 'বাংলাদেশ মিশন সমূহ', 'বাংলাদেশ মিশনসমূহ', 'বাংলাদেশ সশস্ত্র বাহিনীর দক্ষতা বাড়ছে', 'সম্পাদকীয়: মার্কিনীদেরকে প্রতারণা', 'ইয়াহিয়ার গোপনীয়তার অন্ত রালে', 'পাকিস্তান পরিস্থিতি', 'পাকিস্তান পরিস্থিতি', 'রাজনৈতিক সমাধানের বিশ্বজনীন আহবান', 'সম্পাদকীয়:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডিসে: ১৯৭১।		রাজনৈতিক সমাধান', 'বাংলাদেশের জয় সুনিশ্চিত', 'সম্পাদকীয়: মুক্তিবাহিনী', 'সম্পাদকীয়: ইয়াহিয়ার কৌশল', 'জাতিসংঘ মিশন উঠে যেতে পারে', 'মানব-সৃষ্ট ধ্বংসলীলা', 'বাংলাদেশ আন্দোলন কর্মসূচী', 'সম্পাদকীয়: বাংলাদেশের স্বীকৃতি', 'সম্পাদকীয়: বাংলাদেশ', 'কংগ্রেস সদস্যগণ কর্তৃক বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রস্তাব', 'পর্যালোচনা', 'বাংলাদেশে ঔপনিবেশিক শোষণ'

পরিশিষ্ট ৩. ঘ

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর নেতৃত্বে গঠিত **'বাংলাদেশ ফান্ডের'** আয় ও ব্যয় নিম্নরূপ:

ব্যয়

স্টিয়ারিং কমিটির ব্যয়	২১,৭৮২ পাউন্ড
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা বাবদ ব্যয়	৩,২৫০ "
বিভিন্ন সংস্থাকে সাহায্য	২,২০০ "
বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণ	২,১৯১ "
প্রচার অভিযান	২,৮০৮ "
মুক্তিবাহিনীর জন্য সরঞ্জাম পাঠানো	৩৬৯ "
ব্যাঙ্ক চার্জ	১২ "
মোট =	৩৩,২১২ "

'বাংলাদেশ ফান্ডে' যে ৪,০৬,৮৫৬ পাউন্ড চাঁদা হয় তা সংগ্রহীত বা প্রেরিত হয় অডিটেড হিসাব অনুযায়ী তা নিম্নরূপ:

লন্ডন ও দক্ষিণ পশ্চিম এলাকা	১,৩২,০৫১ পাউন্ড
মিডল্যান্ড এলাকা	১,১৬,৬১৩ "
মাঞ্চেস্টার এলাকা	৪৮,৮৭১ "
ইয়র্কশায়ার এলকা	৪৮,৭৮৯ "
স্টিয়ারিং কমিটির নিকট সরাসরি প্রেরিত চাঁদা	৩৩,৮০৪ "
স্টিয়ারিং কমিটি কর্তৃক সংগৃহীত চাঁদা	২,৪৯৮ "
বিলাতের বাইরের প্রবাসী বাঙালি কর্তৃক প্রেরিত চাঁদা	২৪,২৭০ "
মোট =	৪,০৬,৮৫৬ "

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অডিটেড হিসাব হতে প্রাপ্ত চাঁদাদানকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের নাম ও চাঁদার পরিমান নিম্নরূপ:

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	চাঁদার পরিমাণ (পাউন্ড)
১।	কাউন্সিল ফর দ্য পিপলস 'রিপাবলিক অব বাংলাদেশ'	৫৮ ব্রেকউইক স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ, ১	১৪০৫২
২।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	হীসেল স্ট্রিট, লন্ডন, ই, ১	১১২২৯
৩।	মৌলভীবাজার জনসেবা সমিতি	১৭২ ওয়ারডোর স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ, ১	৫১৩৮
৪।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	ইশলিংটন, লন্ডন, এন, ১	৪৫৭৫
৫।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিট (মতিউর রহমান)	২৪ ওয়াইডগেট, স্ট্রিট, লন্ডন, ই, ১	৪৩৭৩
৬।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	১০৩ লীডব্যুরি রোড, লন্ডন, ডব্লিউ, ১১	৩৬৭৭
৭।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	৫ ফোর্ডহাম স্ট্রিট, লন্ডন, ই, ১	২৮১৫
৮।	স্টিয়ারিং কমিটি	১১, গোরিং স্ট্রিট, লন্ডন	২৪৯৮
৯।	বাংলাদেশ রিলিফ কমিটি	৬৭ ব্রীক লেন, লন্ডন, ই, ১	১৪৯৫
১০।	বাংলাদেশ মিশন	২৪ প্রীমব্রীজড গার্ডেন, লন্ডন, ডব্লিউ, ২	১১২০
১১।	বাংলাদেশ যুব সংঘ	৮৫ ইয়র্ক স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ, ১	৮০০
১২।	নর্থ এ্যান্ড নর্থ-ওয়েস্ট অ্যাকশন কমিটি	৩৩ ডেগমার রোড, লন্ডন, এন, ২২	৭২৯
১৩।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৬৮ স্ট্রেটহাম হাই রোড, লন্ডন, এস, ডব্লিউ, ১৬	২৪৩
১৪।	ডারলেস্টন অ্যাকশন কমিটি	৭৬ স্টোক নিউইংটন রোড, লন্ডন এন, ১৬	২৪৩
১৫।	বাংলাদেশ ওয়ার্কার্স এসোসিয়েশন	১১ গাডস্টোন এভিনিউ, লন্ডন, ই, ১২	১৫০
১৬।	বাংলাদেশ কালচারাল এসোসিয়েশন	টোটেনহাম স্ট্রিট, লন্ডন, ডব্লিউ, ১	১৪০
১৭।	বাংলা ফ্যাসন লন্ডনের পার্শ্ববর্তী ও দক্ষিণ-পশ্চিম এলাকা	ব্রীক লেন, লন্ডন, ই, ১	১০০
১৮।	লুটন অ্যাকশন কমিটি	৫ কিনিল ওর্থ, লন্ডন	২০২৬৬
১৯।	সেন্ট আলবান্স এইড কমিটি	৫৬ স্ট্যানহোপ রোড, স্ট্রিট, আলবেনস্	৮৬৮৩
২০।	বাংলাদেশ এসোসিয়েশন ব্লেচলী	ব্লেচলী	৮০৯৯
২১।	এনফিল্ড অ্যাকশন কমিটি	৩৭০ লিংকন রোড, এনফীল্ড	৫৫৩৬
২২।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৫৮ স্টোকস ক্রফ, ব্রিসটল	৩৫৬২
২৩।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	২৬ চীটহাম হিল, কেন্ট	১৫৩১
২৪।	আক্সব্রীজ অ্যাকশন কমিটি	১০ মিল এভিনিউ, ব্রীজ	৭৩৫
২৫।	বাংলাদেশ পিপলস সোসাইটি	৪৫ স্ট্রিট পীটার স্ট্রিট কোরীডন	১১৯
২৬।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৫ ভিক্টর রোড, সুইডেন	১৩৫৫
২৭।	বাংলাদেশ কমিটি	১৫ কুইন্সরোড, ব্রাইটন	২৩৩৫
২৮।	বাংলাদেশ সমিতি	২৭ ফাচিট রোড, সাউথ সী	১৫১৬
২৯।	বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	১২৫ স্ট্রিট হেলেন স্ট্রিট	২৪১৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩০। বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন, লুটন	লোটন	১০৪
৩১। বেঙ্গলী এসোসিয়েশন	৭৪ প্রিন্স অব ওয়েলস রোড, নরউইস	১০৪
৩২। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	১৮ আলেকজেন্ডার রোড বেডফোর্ড	৩৫৮৭
৩৩। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৬০ আউটারফীল্ড রোড, মিডলিক্স	৮৮১
৩৪। বেঙলি এসোসিয়েশন কমিটি	১৭ হীলস রোড, বেডফোর্ড	২৭০০
৩৫। বেডফোর্ড অ্যাকশন কমিটি	৯৮ ফস্টার হীল রোড, বেডফোর্ড	৩২৯৩
৩৬। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	সাউথ ওয়েলস	৬১৭২
৩৭। বাংলাদেশ সারভাইভেল কমিটি	৫ ডেরবি রোড, ওয়েস্ট	৩২০৭
৩৮। বাংলাদেশ অ্যাকশন অ্যান্ড রিলিফ কমিটি	৯৪ পার্ক লেনম টিপটন	৩৮০০
৩৯। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	১ মোরলি স্ট্রিট, লগব্রুচ	৩১০০
৪০। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	উইটনেসব্রুরি	২৩৬৫
৪১। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৫৩ চার্চ স্ট্রিট	১৮৬৬
৪২। বাংলাদশে অ্যাকশন কমিটি	৭৪ ওয়েলডস লেন, ওয়েচেস্টার	১৮০৬
৪৩। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	নটিংহাম	১৭৭০
৪৪। বাংলাদেশ উইমেন্স এসোসিয়েশন	৫২ ওয়ানওরথ রোড, মিডল্যান্ড	৮০০
৪৫। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	২১ ব্রাডের স্ট্রিট মেন্সফিল্ড	৪৫৯
৪৬। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি মাঞ্চেস্টার এলকা	১৫০ নিউ জন স্ট্রিট,	৩১০
৪৭। বাংলাদেশ লিবারেশন ফ্রন্ট	২৫ হোলকের স্ট্রিট, কীগলি	৩৪৫৫
৪৮। বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি	৯ কর্ণওয়েল টেরেস, বেডফোর্ড	২৫৬০
৪৯। বাংলাদশে অ্যাকশন কমিটি	৩৩ স্ট্রিট পেজ লেন,	৮৫২
৫০। বাংলাদেশ মুক্তি সংগ্রাম কমিটি	৪২ ভিক্টরীয়া স্ট্রী টিসাইড	৫৫০
৫১। মুক্তি সংগ্রাম কমিটি মধ্যপ্রাচ্য	৪৫ কিংশীল রোড, হুডারসফিল্ড	৫২৫
৫২। বাংলাদেশ এডুকেশন সেন্টার, কাতার	পি.ও. বক্স ১৫২, ডোহা, কাতার	৩১০০
৫৩। বাংলাদেশ ক্লাব, বাহরাইন	পি.ও. বক্স. ১০ বাহরাইন	১৪৯৭
৫৪। বাংলাদেশ সমিতি, আল-আইন	আল-এইন	১৩৬৯
৫৫। আবুধাবী প্রবাসী বাঙ্গালী	পি.ও. বক্স ১৮১, আবুধাবি	৬৫৫৭
৫৬। দুবাই প্রবাসী বাঙ্গালী	পি.ও. বক্স ৬৪১, বুবাই	৪৭৯১
৫৭। সৌদী আরব প্রবাসী বাঙ্গালী	পি.ও. বক্স ৩৬৩ সৌদি আরব	৪০০২
৫৮। লিবিয়া প্রবাসী বাঙ্গালী	পি.ও. বক্স ৬৫৬, লিবিয়া	২৩৮২
৫৯। ওমান প্রবাসী বাঙ্গালী	পি.ও. বক্স ১৫৫, মস্কো ওমান	১৮৪
৬০। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের প্রবাসী বাঙ্গালী		৩৮৬

উৎস: নূরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা*, ঢাকা: সিটি আর্ট প্রেস, ১৯৮৯, পৃ.- ১০৪৪-৫১।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ৩. ঙ

বিলাত প্রবাসী বাঙালিদের উদ্দেশ্যে লিখিত তাজউদ্দীন আহমদের পত্র

জয় বাংলা

গণ প্রজাতন্ত্রী বাংলা দেশ
সরকার

মুজিব নগর
২২/৪/৭১

বিলাত প্রবাসী বাঙ্গালী ভাইবোন,

বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের স্বাধীনতার সংগ্রাম আজ এক চরম মুহূর্তে পৌঁছেছে। বর্তমান এই মুক্তিসংগ্রাম প্রসঙ্গে আমি আপনাদের সাথে কিছু আলোচনা করতে আগ্রহী। আপনারা আমাদের মূল প্রেরণা। আপনাদের সহযোগিতা ছাড়া আমাদের সংগ্রাম অসম্পূর্ণ থাকবে। আপনাদের ভাই-বোন, আত্মীয়-স্বজন যাতে আমাদের সংগ্রামকে সঠিকভাবে বুঝতে পারে তার ব্যবস্থা করা আপনাদের কর্তব্য। আমাদের সংগ্রাম ন্যায়ের সংগ্রাম। আমাদের বিশ্বাস আছে যে, ন্যায়ের জয় অবশ্যম্ভাবী।

তাজউদ্দীন আহমদ
২২/৪/৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিশিষ্ট ৩. চ

একাত্তরের অটোয়া

ড. মিজান রহমান*

মুক্তিযুদ্ধ অটোয়ায় ঘটেনি, ঘটেছিল বাংলাদেশে। হানাদার বাহিনীর শানানো তলোয়ারের ঝরেনি আমার রক্ত, স্বাধীনতার নিশান উচিয়ে আমি স্পর্ধাভরে ঝাঁপিয়ে পড়িনি মরণের যঙ্গে–আমি মুক্তিযোদ্ধা নই। হিংস্র পশুগুলো যখন নির্মম থাবা মেলে ধাওয়া করেছিল অসহায় মানুষকে, আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল সারা দেশটাতে, আমি তখন নিরাপদ পৃথিবীর নিশ্চিন্ত অধিবাসী। মুক্তির ভাবনাতে আমি যদিও নিমজ্জিত, কিন্তু যুদ্ধের প্রাঙ্গণ থেকে আমি বিদূরিত। নিজেকে মুক্তিযোদ্ধা বলে ঘোষণা করার ধৃষ্টতা আমার নেই।

তবু, ইতিহাসে একটা কৌতূহল নিশ্চয়ই থেকে যাবে, ঐ সময়টাতে প্রবাসের বাঙালি জনগোষ্ঠী কী ভূমিকা পালন করেছিল। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী মুগ্ধ পর্যটকের মতো আমরা কি কেবলি প্রফুল্ল জীবনের উপাসনাতে মগ্ন ছিলাম, না দেশের কান্না আমাদেরও তাড়িত করতে পেরেছিল বৃহত্তর কোনো কর্মসূচিতে। নিহতের বিবর্ণ চোখ আর আহতের আকাশ ফাটা চিৎকার যা ছড়িয়ে পড়েছিল সারা পৃথিবীতে তেজস্ক্রিয় কিরণের মতো, আমরা কি ছিলাম শুধুই তার নিষ্ক্রিয় শ্রোতা আর নির্লিপ্ত দর্শক?

আমি ঐতিহাসিক নই। স্থানকালপাত্র খাতায়-কলমে লিপিবদ্ধ করে রাখিনি আমি, সুতরাং চলচ্চিত্রের মতো নিখুঁত বর্ণনা আমি দিতে পারবো না ঐ কালো সময়টার নানা ঘটনাপুঞ্জের। শুধুমাত্র স্মৃতির ওপর নির্ভর করে কিছু কিছু আলোকচিত্র তুলে ধরবার চেষ্টা করবো এ নিবন্ধে। আশা করবো যে তথ্যাপিপাসু পাঠকের খানিকটা তৃষ্ণা মিটবে এতে। ব্যাপক গবেষণার ফলশ্রুতি নয় আমার এই উদ্যোগ, সুতরাং সবটা মহাদেশের কথা আমি বলতে পারবো না, এমনকি সবটা কানাডার কথাও আমার বলা উচিৎ হবে না। আমি শুধু অটোয়ার কথাই বলবো যেখানে আমি সপরিবারে বাস করেছি উনিশ শ' পঁয়ষট্টি সাল থেকে একটানা।

বাংলাদেশের এলাকা থেকে আগত প্রবাসীর সংখ্যা তখন হাতে গোনার মতোসব মিলিয়ে হয়তো ত্রিশ কি চল্লিশ জন। চারপাঁচ জন ছাত্র ছিল পাকিস্তান সরকার বা অন্য কোনো সংস্থার বৃত্তিভোগী, বাকি সবাই চাকরিজীবী। ছাত্রদের মধ্যে দুটি নাম আমার এখনও মনে আছে–আব্দুল আওয়াল আর মহম্মদ হানিফ। এরা এসেছিল কলম্বো প্ল্যানের বৃত্তি নিয়ে প্রকৌশলী ডিগ্রি করার জন্য। এদের কথা কেন বিশেষভাবে মনে আছে তার কারণ পরে বলবো। চাকরিজীবীদের মধ্যে যাঁরা এখন অটোয়াতে আছেন তাঁরা হলেন ড. নাসিরুদ্দিন

---

* গবেষকের অনুরোধে ড. মিজান রহমান এই স্মৃতিকথাটি লিখে পাঠিয়েছেন (সেপ্টেম্বর, ২০১১)।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমেদ, ড. লুৎফুল কবির, আব্দুর রহিম আর ড. এহসানেস সালেহ। যাঁরা অন্যত্র চলে গেছেন তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ছিলেন আজমত আলী, ড. আহসানুল্লা আর আব্দুস সাত্তার।

অটোয়ার মুক্তিযুদ্ধ বলতে কোনো বস্তুর উদ্ভাবন যদি করতেই হয় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে তার সূচনা হয়েছিল আজমত আলী সাহেবের মেডোল্যান্ডস ড্রাইভের ওপর যে এপার্টমেন্টটা ছিল তার লিভিংরুম থেকে। উনিশ শ' একাত্তরের সাতই মার্চ- সেদিনটার কথা কোনো বাঙালিরই ভোলার কথা নয়। ঢাকা শহরের এক খোলা ময়দান থেকে একটি উদাত্ত কণ্ঠ বেজে উঠেছিল সেদিন যার তরঙ্গে কেঁপে উঠেছিল প্রতিটি মহাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কণ্ঠ। আলী সাহেবের বাসাতে আমরা জড় হয়েছিলাম টেলিভিশনে দেখার জন্য বঙ্গবন্ধুকে। দেখছিলাম যে পাকিস্তানের জঙ্গি বিমানগুলো মহড়া দিচ্ছিল জনসভার ওপর দিয়ে হয়তো বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠস্বরকে যন্ত্রের নিনাদে আচ্ছন্ন করার জন্যে, কিন্তু পারেনি। বিদ্রোহী নেতার বাণী আকাশ চূর্ণ করে ফেটে পড়েছিলো সমস্ত পৃথিবীতে। মুগ্ধ বিস্ময়ে, আনন্দে, গর্বে আপ্লুত হয়ে আমরা প্রত্যক্ষ করছিলাম ইতিহাসের সেই অপূর্ব মুহূর্তটি, আর উপভোগ করছিলাম আলীর স্ত্রী কর্তৃক সাদরে পরিবেশিত মিষ্টান্ন। কথা ছিল যে বক্তৃতা শেষ হলেই মিটিং এ আলোচনা হবে পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের কি কর্মসূচী হওয়া উচিৎ। আমার স্পষ্ট মনে পড়ে, বঙ্গবন্ধু জ্বালাময়ী ভাষণ শুনে আমাদের অনেকের মনেই সেদিন দ্বিধা ছিল পাকিস্তান থেকে ছিন্ন হয়ে পড়াটা একটু অপ্রাপ্তকালিক ব্যাপার কিনা। আমরা ছিলাম পূর্ব পাকিস্তান এসোসিয়েশনের সদস্য, যার সভাপতি ছিলেন আলী সাহেব। সিদ্ধান্ত হলো নামটা বদলে পূর্ববঙ্গ করা হবে, কিন্তু সরাসরি বাংলাদেশ কথাটা প্রকাশ্যে আওড়াতে আমরা তখনও প্রস্তুত ছিলাম না।

পঁচিশে মার্চের পর অবশ্য সবার মন থেকেই সবরকম দ্বিধা চুকে গেল। পত্র-পত্রিকায়, রেডিওতে, টেলিভিশনে প্রতিদিন নানা লোহমর্ষক খবর আসতে লাগলো। কামান দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছে ইকবাল হল, জগন্নাথ হলের হিন্দু ছাত্রগুলোকে হত্যা করে ট্রাক্টারের সাহায্যে পোঁতা হয়েছে, মাটিতে, চামেলি হল থেকে মেয়েগুলোকে ধরে চালান করা হয়েছে সেনানিবাসে। গোবিন্দ দেব, জ্যোর্তিময় গুহঠাকুরতা, মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান–এদেঁর মত পণ্ডিত লোকগুলোর মগজ উড়ে গেছে বন্দুকের গুলিতে। খালি রিক্সার পাটাতনে পড়ে আছে রিক্সওয়ালার দেহ, 'সিটিজেন' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠাতেই তার ভয়াবহ ছবি। শিরোনামে লিখা ছিল: 'গুলিবিদ্ধ হবার জন্যে বাঙালিত্বই যথেষ্ট'। 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় বেরুল এন্থনি মাস্কারেনহাসের বিস্তারিত বিবরণ। 'টাইম', 'নিউজউইক' এগুলোতে নিত্য বেরুতে লাগলো পাকিস্তানি বাহিনীর পৈশাচিক তাণ্ডবলীলার রক্তাক্ত কাহিনি। ইতিমধ্যে চাটগাঁয়ে এক বিদ্রোহী সেনাশিবির থেকে জিয়াউর রহমান সাহেব বঙ্গবন্ধুর পক্ষে ঘোষণা করলেন স্বাধীন বাংলাদেশ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রবাসের বাঙালি জনগোষ্ঠীর কর্তব্য স্থির হয়ে গেল। ভৌগোলিক কারণে সরাসরি মুক্তিযুদ্ধে শরিক হওয়া সম্ভব ছিল না, কিন্তু পরোক্ষে যতরকম সাহায্যের প্রয়োজন আমরা প্রস্তুত হয়ে গেলাম তার জন্যে। স্বাধীনতা ঘোষণার কয়েকদিন পর শেরব্রুকের অধ্যাপক মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব সিবিসি'র খবরের শেষে এক বিশেষ বিবৃতিতে দেশের হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বর্ণনা দিয়ে কানাডিয়ানদের কাছে প্রশ্ন তুললেন, 'এই ক'টা দিনের মধ্যেই বহু সহস্র বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে, বহু লক্ষ হয়েছে বাস্তুহারা। কানাডার বিবেককে নাড়া দেয়ার জন্যে আর কত হাজার বাঙালিকে প্রাণ দিতে হবে?' ঐ বিবৃতিটা কানাডার চেতনাকে সত্যি দারুণভাবে নাড়া দিয়েছিলো। পথেঘাটে, চেনা-অচেনা অনেক কানাডিয়ানদের কাছ থেকেই সহানুভূতিশীল কথা শুনেছি ঐ বিবৃতিকে কেন্দ্র করে। মোয়াজ্জেম সাহেবের সেই সাক্ষাৎকারের সুফল আমরা প্রভূত পরিমাণে উপলব্ধি করেছি আমাদের পরবর্তীকালের সংগ্রামে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে এই নেতৃস্থানীয় লোকটি ইদানিং ইহলোক ত্যাগ করেছেন।

অটোয়াতে আমাদের এ্যাসোসিয়েশনটির নতুন নামকরণ হল: বাংলাদেশে কানাডা-এ্যাসোসিয়েশন। সংবিধান বলতে পাকাপাকিভাবে তেমন কিছু আমরা দাঁড় করাতে পারিনি যদিও, তবু একটা খসড়া দলিল আমরা তৈরি করেছিলাম। তাতে ঠিক হলো যে যারা বাংলাদেশের বাসিন্দা শুধু তারাই হবে সদস্য, যারা কানাডিয়ান তারা ইচ্ছে করলে চাঁদা দিয়ে হবে ভোটাধিকারশূন্য যুগ্মসদস্য। এই পঙ্‌ক্তিতে সবচেয়ে বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন জালালুদ্দিন, যিনি এখনও অটোয়াতে বাস করেন। উনি তখন কানাডিয়ান সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী, উপরতলার অনেক পদস্থের সঙ্গে ছিল তাঁর দহরম-মহরম। তাঁর মাধ্যমে আমরা সরকারি ও বেসরকারি অনেক পদস্থ লোকদের সঙ্গে পরিচিত হই এবং তাঁদের সহায়তা ও সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হই। এ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদের মধ্য থেকে পুরনো কিছু লোকদের নিয়ে গঠন করা হলো একটি কার্যকরী সমিতি। তাতে ছিলেন এই জালাল সাহেব, আর ছিলেন আলী, আহসান, নাসির আর আমি। আমাদের কর্মসূচি মোটামুটি চারভাগে বিভক্ত হল: ১. মুক্তিযুদ্ধের জন্যে সাহায্য পাঠানো; ২. বাস্তুহারা দুর্গতদের জন্যে টাকা তোলা; ৩. কানাডা-আমেরিকাতে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল জনমত সৃষ্টি করা; এবং ৪. রাজনৈতিক স্তরে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লবি করা আর স্বাধীনতার সপক্ষে আন্দোলন চালানো।

প্রথমটির উদ্দেশ্যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হলো যে মে মাস থেকে শুরু করে স্বাধীনতাসিদ্ধির সময় পর্যন্ত আমরা চাকরিজীবীরা প্রতি মাসে বেতনের শতকরা পাঁচভাগ অনুদান করব একটা বিশেষ ফান্ডে। যাদের চাকরি ছিল না তাদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য চাওয়া হয়নি। কিন্তু আওয়াল আর হানিফ নিজের থেকেই গরজ করে বললো যে ওদের মাসিক উপার্জন যত সামান্যই হোক না কেন, ওরাও শতকরা পাঁচভাগ দেশের জন্যে ত্যাগ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করবে। এমনকি আমাদের জালাল, জন্মসূত্রে ভারতাগত হওয়া সত্ত্বেও, অকাতরে দান করতে লাগলেন তাঁর মাসিক বরাদ্দটি। একাত্তরের সংগ্রামী চেতনা আর দেশাত্ববোধ যেভাবে আমাদের সবাইকে জাগিয়ে তুলেছিলো তার তুলনা হয়তো ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না। পঞ্জিকার কয়েকটি জ্বলন্ত মাসের জন্যে বাংলাদেশের আরামপ্রিয় মানুষ আগুনের শিখা হাতে করে বেরিয়ে পড়েছিল যুদ্ধক্ষেত্রে। দেশের মানুষের যেমন বুক থেকে ঝরেছে রক্ত, বিদেশে বাঙালিরও প্রাণ ফেটে বেরিয়েছে কান্না, উজার করে সে দিতে চেয়েছে সর্বস্ব দেশকে বর্বরের থাবা থেকে উদ্ধারের জন্যে। ঐ চেতনার একাংশও যদি বেঁচে থাকতো হৃদয়ে তাহলে হয়তো দেশটা আজ আন্তর্জাতিক লীলাভূমিতে উপহাসের পাত্র হয়ে উঠতো না।

শুধু অটোয়াতে নয়, উত্তর আমেরিকার ছোটো বড়ো প্রতিটি শহরে বাঙালিরা এমনি করে গোপন তহবিল সৃষ্টি করেছিল মুক্তিযুদ্ধের জন্যে। দেশবিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র, ওষুধপত্র, লেপকম্বল কিনে দেশে পাঠানোই ছিল আমাদের মূল উদ্দেশ্য। অটোয়ার গুটিকয়েক লোকের সামান্য ক'টা টাকা দিয়ে হয়তো দশটা কম্বলও কেনা যেত না, তবু অনেক জায়গার ছোটো অঙ্কগুলো যোগ করলে নিশ্চয়ই বেশ বড়ো একটা সংখ্যায় দাঁড়াতে পারতো। দুঃখের বিষয় যে বিশ্বসংগ্রামের সাংগঠনিক দিকটা ঠিক দানা বেঁধে ওঠেনি ছ'সাতমাস পর্যন্ত। এখানে থেকে আমরা নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন আর লন্ডনের খোঁজ খবর নেওয়ার চেষ্টা করেছিলাম টাকাটা কোথায় পাঠানো যায়, কার কাছে এবং কার মাধ্যমে। কোথাও থেকে কোনোরকম সুস্পষ্ট নির্দেশ না পেয়ে আমরা কলকাতায় লিখেছিলাম জনাব হুসেন আলীর কাছে। স্বাধীনতার পর হুসেন আলী সাহেব বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত হয়ে অটোয়াতে এসেছিলেন এবং এখানেই তিনি অকালে মৃত্যবরণ করেন। একাত্তরের সেই চরম দুর্যোগের দিনে তিনি কলকাতার নিরাপদ আশ্রয়ে অবস্থিত থেকে মুক্তিযুদ্ধের বিশ্বব্যাপী কর্মধারার সমন্বয়-প্রচেষ্টায় নিযুক্ত ছিলেন। অভিজ্ঞতার অভাব ও অন্যান্য কারণে সে প্রচেষ্টার পথে ছিল নানারকম বাধাবিপত্তি। ফলে ওঁর কাছ থেকে প্রত্যাশিত সময়ের মধ্যে কোনো দিক নির্দেশ আমরা পাইনি। শেষ পর্যন্ত নভেম্বরের শেষের দিকে অক্সফ্যামের এক কর্মকর্তার সঙ্গে একান্তে বৈঠক করে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে আমাদের মধ্য থেকেই একজনকে সশরীরে পাঠানো হবে ভারত সীমানায় এবং তার জন্যে যাওয়া-আসার ভাড়া চুকোবে অক্সফ্যাম। সাত্তার সাহেব তখন স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে জানালেন যে বড়দিনের ছুটিতে তিনি মিশন নিয়ে দেশে যেতে প্রস্তুত। কিন্তু তার আগেই এসে গেল ষোলই ডিসেম্বর।

যুদ্ধের কারণে দেশের সীমান্ত এলাকাগুলোতে ভিড় জমেছিল অজস্র এতিম শিশু আর বাস্তুহারা পরিবারের তাদের দৈনন্দিন জীবনের মর্মান্তিক কষ্টের ছবি টেলিভিশনের পর্দা থেকে বেরিয়ে এসে রোজ হানা দিচ্ছিলো পশ্চিম গোলার্ধের প্রতিটি লিভিং রুমে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃশ্যগুলো আঘাতের পর হানছিল ওদের মানবতার চেতনার। বাংলাদেশের দুঃস্থ মানবতার জন্যে একটা অসাধারণ সমবেদনা সহানুভূতির আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল সারা পৃথিবীতে। যারা হয়তো জীবন্ত কাউকে কোন অযাচিত সাহায্য দেয়নি তাদের থেকেও অনেকে টেলিফোন করে জানতে চেয়েছে ওদের পক্ষে অর্থমূলক কিছু করা সম্ভব কিনা। এই অনুরূপ পরিস্থিতির সুযোগ নেয়া হয়েছিল সুন্দরভাবে উত্তর আমেরিকায় প্রায় প্রতি শহরে। এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে অটোয়াতেও আমরা একটি রিলিফ ফান্ড খুলেছিলাম- সরকার থেকে পেয়েছিলাম দাতব্য সংস্থা হিসেবে স্বীকৃতি হাজার হাজার খাম আমরা পাঠিয়ে দিয়েছিলাম অটোওয়া ও পার্শ্ববর্তী এলাকার ব্যবসায়ী আর পেশাদার লোকেদের কাছে। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা আমরা তুলেছিলাম মাস চারেকের ভেতর। ঐ টাকাটা শেষ পর্যন্ত দেওয়া হলো অক্সফ্যামের কাছে। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে অক্সফ্যাম যে বিরাট ভূমিকা পাল করেছিল সেটা হয়তো অনেকেরই জানা নেই। একদিকে শরণার্থীর শিবিরে শিবিরে ওদের স্বেচ্ছাসেবকরা যেমন অসাধারণ মমতা ও নিষ্ঠার পরিচয় দিয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ওদের কর্মীরা দেশের ভেতরেই পরোক্ষভাবে মুক্তিযুদ্ধের প্রয়াসে নানাভাবে সাহায্য করেছে।

কানাডার প্রধানমন্ত্রী তখন পিয়ের এলিয়েট ট্রুডো। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর প্রতি তাঁর বা তাঁর লিবারেল পার্টি কোনসময়ই খুব একটা অনুরাগ ছিল না। রাজনৈতিক আর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কীভাবে উপনিবেশ হিসেবে ব্যবহার হচ্ছিল সে সম্পর্কে তাঁরা ভালোভাবেই ওয়াকেফহাল ছিলেন। সুতরাং বাংলাদেশের ওপর যখন পাকিস্তানের সামরিক অভিযান শুরু হলো তখন মুক্তিযুদ্ধের প্রতি এঁদের যে একটা নৈতিক সমর্থন ছিল সেটা উপলব্ধি করতে কষ্ট হলনা। ফলে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টি করার কাজে আমাদের খুব একটা বাধা পেতে হয়নি। পঁচিশে মার্চের পর থেকে দুয়েক মাসের মধ্যেই ক্যানাডার এ-অঞ্চলটাতে বেশ কয়েকটা শোভাযাত্রার ব্যবস্থা হয়েছিল। অটোয়াতে বেশ বড়োসড়ো এটা র‍্যালিতে যোগ দিয়েছিল টরন্টো, হ্যামিলটন, কিংস্টন আর মন্ট্রিয়লের অনেক বাঙালি। পাকিস্তান দূতাবাসের সামনে গিয়ে আমরা পাকিস্তানের পতাকা পুড়িয়েছিলাম, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিলাম কারণ এই দু'টি দেশ তখনও পাকিস্তানের সমর্থক। অটোয়ার স্থানীয় দু'টি দৈনিক পত্রিকা–'জারনাল' আর 'সিটিজেন'–দু'টিতেই আমাদের র‍্যালি, দাবি আর বক্তব্যকে ব্যাপকভাবে প্রচার করা হয়েছিল। টরন্টোর 'গোব এন্ড মেইল' আর মন্ট্রিলের 'গ্যাজেট' আর 'ষ্টার' এ প্রায় রোজই বেরুচ্ছিল হানাদার বাহিনীর পৈশাচিক কীর্তির বিবরণ আর আমাদের প্রতি সহানুভূতিশীল সম্পাদকীয় নিবন্ধ। কানাডার সাধারণ জনগণ চারদিক থেকে পাচ্ছিলো একই রকম বার্তা। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে জোর গলায় কথা বলার মত সাহস কারো ছিল না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে দু'চারটে লেখা যে বের হয়নি তা নয়, তবে একটা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লেখার প্রতিবাদে আমাদের পক্ষ থেকে দশটা চিঠি বেরুত পরের সপ্তাহে। শুধু অটায়াতে নয়, মন্ট্রিল আর টরন্টোতেও আমাদের র‍্যালি হয়েছিল, সেখানেও আমরা গিয়েছিলাম সদলবলে। গলা ফাটিয়ে আমরা চিৎকার করেছি পথে পথে। আমাদের চিৎকার শুনে কেউ বিরক্ত হয়নি, বরঞ্চ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে লোককে উত্তেজিত হয়ে উঠতে দেখেছি। আমাদের র‍্যালিতে বেশ কিছু শ্বেতাঙ্গ কানাডিয়ানও অংশ নিয়েছিল, সাংবাদিকরা দিয়েছিল সাগ্রহ সমর্থন, পুলিশের কাছ থেকে পেয়েছিলাম মার্জিত ব্যবহার।

মৌন সমর্থন থাকলেও কূটনৈতিক কারণে আমাদের পক্ষ নিয়ে প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করার উপায় ছিল না কানাডিয়ান সরকারের বা সরকারের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোনো সংস্থার। তাই রাজনৈতিক লবি বলতে যা বোঝায় তার অনেকখানিই আমাদের চালিয়ে যেতে হয়েছিল কানাডায়, বিশেষকরে এই রাজধানী শহরে। জালাল সাহেবের সহায়তায় আমরা বেশ কিছু পার্লামেন্টারি সদস্যের সঙ্গে করার সুযোগ পেয়েছিলাম। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য ছিলেন এন.ডি.পি.র এনড্রু ব্রম্ননই, লিবারেলের জর্জ লাশান্স, কনজারভেটিভের হিথ ম্যাকুয়ারী। এঁরা তিনজনই আমাদের প্রতি অত্যন্ত সহানুভূতিশীল ছিলেন এবং দেশ স্বাধীন হবার পর সরকার প্রেরিত তথ্যসংগ্রহকারী দল হিসেবে ঢাকায় গিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে রাজনৈতিক স্বীকৃতি দেবার ব্যাপারে এঁদের রিপোর্টের একটা বিশেষ ভূমিকা ছিল বলে অনেকের বিশ্বাস।

সিবিসি'র রাতের খবর পড়তেন তখন স্ট্যানলি বার্ক বলে এক ভদ্রলোক। ভীষণ অমায়িক, সহৃদয় ব্যক্তি, নির্যাতিত মানবতার অকুণ্ঠ পৃষ্ঠপোষক ও মুখপাত্র। বাংলাদেশের প্রতি এমনিতেই তাঁর সহানুভূতির অভাব ছিল না, তার উপর রহমতুল্লাহ নামে টরেন্টোর এক বাঙালির সঙ্গে তাঁর ছিল ব্যক্তিগত পরিচয়। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই আমরা একবার টরন্টো গিয়েছিলাম তাঁর সঙ্গে দেখা করতে– আহসান, জালাল, কবির, নাসির, সাত্তার আর আমি। টরন্টোতে যাবার অবশ্য আরো একটা উদ্দেশ্য ছিল–অক্সফ্যামের কর্মকর্তাদের সঙ্গে একটা চাক্ষুষ যোগাযোগ স্থাপন করা। প্রথমে গেলাম বার্ক সাহেবের বাড়িতে। দুটি দাবি ছিল। প্রথমত, রেহমান সোবহান সাহেবকে এক প্রেস কনফারেন্সে সাংবাদিকদের কাছে পরিচয় করানো। দ্বিতীয়, তাকে নিয়ে সিবিসি তে একটি বিশেষ সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করা। দু'টিতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন। তারপর নিজের খরচায় অটোয়াতে এসে অত্যন্ত সৌজন্যের সঙ্গে আমাদের সবার সঙ্গে বসে কথা বললেন এবং দেশের পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর জানতে চাইলেন সোবহান সাহেবের কাছ থেকে। সোবহান সাহেব তখন অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসাবে বেরিয়েছিলেন স্বাধীনতার বার্তা প্রচার করার জন্যে। উনি আমাদেরই অতিথি হয়ে অটোয়াতে ছিলেন দু'দিন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে, এর কিছুদিন পরই পাকিস্তানের সাফাই গাওয়ার জন্যে কয়েকজন বঙ্গসন্তানকে পাঠানো হয়েছিলো উত্তর আমেরিকায়। তার মধ্যে একজনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা মনে আছে যিনি সশরীরে অটোয়াতে এসে সাংবাদিকদের কাছে পাকিস্তানের বুলি ছাড়ার চেষ্টা করেছিলেন–তাঁর নাম হামিদুল হক চৌধুরী। অনেকেরই হয়তো মনে আছে নামটা। বেচারা বেশ নাস্তানাবুদ হয়েছিলেন এখানে এসে। অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আমরা তুমুল হট্টগোল চালিয়েছিলাম প্রেস বিল্ডিং-এর বাইরে। ভেতরেও সাংবাদিকরা খুব একটা পাত্তা দেয়নি ভদ্রলোককে। চৌধুরীকে শেষ পর্যন্ত পুলিশের আশ্রয়ে বাপ-বাপ করে পালাতে হয়েছিলো- আমাদের মধ্যে দু'একজন প্রস্তুত হয়ে ছিল তাঁর ওপর একপশলা কিলঘুষি চালানোর।

বাংলার মুক্তিসংগ্রামের বড় প্রতিবন্ধক ছিল যুক্তরাষ্ট্রের তদানীন্তন নিক্সন সরকার যার সামরিক আর আর্থিক সাহায্যই ছিলো পাকিস্তানের বড় সম্বল। তাই আমাদের রাজনৈতিক সংগ্রামের প্রধান প্রেক্ষাগার ছিলো ওয়াশিংটন আর নিউইয়র্ক। নিউইয়র্কের জাতিপুঞ্জ প্রাঙ্গণে একবার জমায়েত হয়েছিল বঙ্গ সহস্র বাঙালি-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে শান্তিমুলক পন্থা অবলম্বন ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেবার দাবিতে। মহাদেশের নানা জায়গা থেকে ওরা গিয়েছিলো দল বেঁধে–প্লেনে, ট্রেনে, বাসে বা নিজেদের গাড়িতে। অটোওয়া থেকে আমরা গিয়েছিলাম বাসে করে। প্রকাণ্ড শোভাযাত্রা হয়েছিলো নিউইয়র্কের রাজপথে, যানশকট সব থামিয়ে দেওয়া হয়েছিল মিছিলের জন্যে। যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম নগরে সেদিন ছোটোখাটো একটা ভূমিকম্প সৃষ্টি করেছিলাম।

তারপর আগস্টের দিকে আরেকটা হলো ওয়াশিংটনে। ঐ মাসেই পাকিস্তানকে অস্ত্রসাহায্য দেওয়ার ব্যাপারে একটা গুরুত্বপূর্ণ বিল পাশ হরার কথা। বিলটা যাতে পাশ না হয় সেজন্যে আমরা সব উঠে পড়ে লাগলাম। রাজনৈতিক লবির ব্যাপারে আমাদের কারো অভিজ্ঞতা ছিল না, বিশেষকরে অতটা উচু পর্যায়। কিন্তু প্রাণের ভেতরে নৈতিক শক্তি যার প্রবল তার জন্যে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হয় না। উত্তর আমেরিকার ছোটো-বড়ো প্রতিটি শহর থেকে অন্তত একজন প্রতিনিধি পাঠানো হয়েছিল এই লবির কাজে। পুরো দু'টো দিন ধরে এরা কংগ্রেসের প্রতিটি সদস্যের ঘরে ঘরে গিয়ে বিলটার বিপক্ষে নানা যুক্তি পেশ করেছিল। অনেকেরই হয়তো মনে নেই যে বিলটা শেষ পর্যন্ত পাশ হয়নি।

আমার চেয়ে প্রখর স্মরণ ও ধীরশক্তিসম্পন্ন লোক তখন অটোয়াতে ছিলেন বেশ কিছু। তাঁরা হয়তো বিস্তারিত ও নির্ভুল বিবরণ দিতে পারবেন ঐ সময়টার। উপরের ক'টি ছত্রে আমি ঐটুকুই পেশ করলাম যা আমি চয়ন করতে পেরেছি আমার ক্ষীয়মান স্মৃতি থেকে। কেউ কেউ হয়তো আরো বলতে চাইবেন যে দেশের বৃহত্তর স্বার্থে আমাদের মধ্যে যে একটা একাত্মবোধ গড়ে উঠেছিল তাতে খানিকটা ভাঙনও ধরেছিল শেষের দিকে। আমি সেটা অস্বীকার করছি না, কিন্তু দীর্ঘ তেইশ বছর পরে আমি ওটাকে বড়ো করে দেখতে চাইছি না। বৃহৎ কোনো সংঘবদ্ধ কর্মের উদ্যমে কখনো কখনো মতান্তর ঘটে থাকে, তা থেকে মতান্তরও সৃষ্টি হয় মাঝে মাঝে, কিন্তু বেলাশেষে শুধু একটি জিনিষই মানুষের মনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার কথা, 'ব্যক্তি আর সমষ্টিগতভাবে সে কিছু দিতে পেরেছে কিনা তার দেশকে, সমাজকে।' সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে আমি খানিকটা গর্বের সঙ্গেই বলব, লজ্জায় মাথা নোয়ানোর মতো গর্হিত কোনো কাজ করেনি একাত্তরের বাঙালি সমাজ। আমাদের ক্ষুদ্র সামর্থ্য দিয়ে ক্ষুদ্রভাবে যা কিছু করা সম্ভব ছিল আমাদের পক্ষে, করেছি।

তথ্য সংকেত

১. প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ দাদা ভাই নওরোজী ১৮৯২-৯৫ সালে লিবারেল পার্টির এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি 'লন্ডনে ভারতীয় ন্যাশনাল কংগ্রেস' প্রতিষ্ঠা করেন। শাপুরজী সাকলাতওয়ালা ১৯২২ সালে লেবার পার্টির এবং ১৯২৪ সনে কমুনিস্ট পার্টি হতে এম.পি. নির্বাচিত হন। তিনি ১৯২৩ সালে ভারতীয় সীম্যান ইউনিয়ন এবং ১৯২৬ সনে ওয়ার্কার্স ওয়েলফেয়ার লীগ গঠন করে তাদের দাবি দাওয়ার সঙ্গে ভারতীয় মুক্তিসংগ্রাম জোরদারের প্রয়াস চালান। দেখুন: Mohammad Ali Asghar, *Bangladeshi Community Organisations in East London,* London: Heritage Limited, p. 21.

২. ঐ

৩. মুসলিম লীগের যুক্তরাজ্য শাখার প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারি ও ট্রেজারার পদে যথাক্রমে নিযুক্ত হন আব্বাছ আলী, শাহ আবদুল মজিদ কোরেশী ও আইয়ুব আলী মাস্টার। পাকিস্তান আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেন তাদের পুরোধা ছিলেন ব্যারিস্টার আবদুল গফুর, আইনের ছাত্র আব্বাস আলী, ছাইদুর রহমান, আবদুল হামিদ, আবু সাঈদ চৌধুরী, (এরা সাবাই পরবর্তীকালে ব্যারিস্টারি পাশ করেন) এবং শ্রমজীবীদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে আইয়ুব আলী মাস্টার, আশীদ মাস্টার, আবদুল মান্নান, আবদুল মজিদ কোরেশী, দেওয়ান মনফর আলী, নেছার আলী, ছুরত মিয়া, মুক্তার মিয়া, আ. মতলিব চৌধুরী, আজমান আলী, আব্দুল লতিফ (সোলজার) তাহির আলী জরিফ মিয়া, ইছরাইল মিয়া, সালামত মিয়া, ইছমাইল মিয়া, নূর মিয়া (সার্জন) প্রমুখ। দেখুন: নুরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা,* সিলেট: প্রবাসী পাবলিকেশন, ১৯৮৯, পৃ. ৯৩৩।

৪. Mohammad Ali Asghar, *op.cit*, p. 22

৫. নুরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা,* প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫৭

৬. Mohammad Ali Asghar, *op.cit.*, p. 25.

৭. 'ইস্ট পাকিস্তান হাউস' প্রতিষ্ঠা প্রকল্পে একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন: সভাপতি–কিউ. এম. ই. হক সহসভাপতি– মিনহাজ উদ্দিন ও কোষাধ্যক্ষ–আব্দুর মন্নান ও রিয়াজুল আলম। এছাড়া এই ভবন প্রতিষ্ঠাকল্পে অন্যান্য যারা আর্থিক সাহায্য দিয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে হরমুজ আলী, নেছার আলী, তারা মিয়া, আব্দুর রহমান ওরফে মনাফ মিয়া, আব্দুল মতলিব চৌধুরী, সইফুল্লাহ শামসুল হক, তাহির আলী এবং ছাত্রদের মধ্যে যারা বিশেষ তৎপর ছিলেন তারা হচ্ছেন জাকারিয়া চৌধুরী, আলমগীর কবির, (প্রয়াত চিত্রপ্রযোজক) আবুল খয়ের খান (বর্তমানে ব্যারিস্টার), নুরুল ইসলাম, মেসবাহউদ্দিন ও আমীর আলী প্রমুখ। *ওনরফ.* ঢ়. ২৬.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮. সুলতান মাহমুদ শরীফ, আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার বর্তমান সভাপতির সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ২৯ জুলাই ২০১১

৯. *Diaries of Field Marshal Mohammad Ayub Khan 1966-1972,* Edited and Annotated by Eraig Baxter, 2007. London: The University Press, p. 239.

১০. বঙ্গবন্ধু কন্যা ও বর্তমান বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা ঐ সময় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে লন্ডন যান। এ সম্পর্কে ১৯৯৮ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ কার্যনির্বাহী সংসদের এক সভায় অনুরূপ অভিমত ব্যক্ত করেন। এ ছাড়া ১৯৮৯ সনে এক সাক্ষাৎকারে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক ও কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের তৎকালিন সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক বলেন, 'বঙ্গবন্ধু তাদের বলেছিলেন স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে, সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তিনি একটা ঠিকানা দিয়েছিলেন। জায়গাটির নাম রাজেন্দ্রে রোড, কোলকাতা ২১, সেখানে চিত্ত রঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন।' তৎকালিন আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক তোফায়েল আহমদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, '১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু লণ্ডন গিয়েছিলেন। সফরটি ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং ঐতিহাসিক। সেখানে বসে তিনি এই স্বাধীনতার পরিকল্পনা রচনা করেন। পরিকল্পনা অনুসারে কথা ছিল আমরা মাসে পঁচিশ জন ছেলে রিক্রুট করবো এবং প্রতিবেশী বন্ধু রাষ্ট্রের একটি বিশেষ জায়গায় গেলে ট্রেনিং পাবো। আমরা চারজন রিক্রুটমেন্ট শুরু করি- সিরাজুল আলম খান, শেখ ফজলুল হক মণি, আবদুর রাজ্জাক এবং আমি।' তিনি বলেন,'সত্তরের নির্বাচনের আগেও বঙ্গবন্ধু তাঁর প্রতিনিধিকে ভারতে পাঠিয়েছিলেন। নির্বাচনের পর পাঠান ডাক্তার আবু হেনাকে, প্রাদেশিক আইন সভার সদস্য হয়েছিলেন সিরাজগঞ্জ থেকে। আর আগে যিনি গিয়েছিলেন তিনি আমাদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। একাত্তরের যুদ্ধ শুরু হবার আগেই এই বাড়িটি নেয়া ছিল।' টেপকৃত সাক্ষাৎকার ১৪ এপ্রিল, ১৯৮৯ এবং লেখকের সঙ্গে আলাপচারিতা। আরো দেখুন- মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে'র' এবং সিআইএ*, ঢাকা: ১৯৯০, পৃ. ১৯১-১৯২।

১১. নিম্নলিখিত কর্মর্তাদের নিয়ে এই কমিটি গঠিতঃ গাউস খান-চেয়্যারম্যান, বি. এইচ. তালুকদার, সেক্রেটারি, আব্দুল হামিদ: ট্রেজারার, তৈয়বুর রহমান: জয়েন্ট ট্রেজারার, সুলতান মাহমুদ শরীফ: অফিস সেক্রেটারি। সাংগঠনিক কমিটির মাধ্যমে প্রায় ছয়মাস বিলাতের বিভিন্ন শহরে কর্মতৎপরতার পর ২০ সেপ্টেম্বর (১৯৭০) আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার কার্যনির্বাহক কমিটির কর্মকর্তা পদে নিম্নলিখিত ব্যক্তিবর্গ নির্বাচিত হন: (নির্বাচন অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনার স্বামী ড. ওয়াজেদ মিয়া) গাউস খান প্রেসিডেন্ট (লন্ডন), হাজী নেছার আলী ভাইস-প্রেসিডেন্ট (লণ্ডন), এ. কে. এম. এ. হক ভাইস প্রেসিডেন্ট (বার্মিংহাম), আব্বাছ আলী ভাইস প্রেসিডেন্ট (ওল্ডহাম), তৈয়বুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারি (লন্ডন), বদরুল হাক তালুকদার অর্গেনাইজিং সেক্রেটারি (লন্ডন), আব্দুর রউফ খান পাবিলিসিটি সেক্রেটারি (একোলস, ল্যাঙ্কাশায়ার), সৈয়দ নুরুল হক সোশাল সেক্রেটারি (লন্ডন), আব্দুল হামিদ ট্রেজারার (লন্ডন), এ. বি. এম. ইছহাক অফিস সেক্রেটারি (লন্ডন) ১৯৭০ সালের মাঝামাঝি যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ শেখ মুজিবুর রহমানের সাংগঠনিক কাজে সহায়তা করার জন্য একখানা বড় ল্যান্ড রোভার গাড়ি দেশে পাঠায়। সে সময় দেশে সামরিক শাসন থাকলেও গণঅভ্যুত্থানের ফলে রাজনৈতিক তৎপরতা অনেকটা স্বাভাবিক হওয়ার অনেক প্রবাসী নেতা দেশে ফিরে আসেন এবং সক্রিয়ভাবে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে যোগদান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। অন্যদিকে, বিলাত থেকে প্রবাসী বাঙালিরা প্রতিদিন হাজার হাজার চিঠি পাঠাতে থাকেন আত্মীয়স্বজন ও পোষ্যদের কাছে যাতে তারা আওয়ামী লীগকে নির্বাচনে ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করেন।

১২. আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার বর্তমান সভাপতি সুলতান মাহমুদ শরীফের সঙ্গে গবেষকের সাক্ষাৎকার, ঢাকা, ২৯ জুলাই, ২০১১

১৩. Selim Ahmad, A. Ismail & Dipu (ed.), *Bidrohi Bangla*, Birmingham: East Pakistan Liberation Front, London, ১৯৭১, এবং দেখুন: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-৮

১৪. 'কাউন্সিল ফর দি পিপলস্ রিপাবলিক অব বাংলাদেশ' নামে গঠিত কমিটি যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহরে সংগঠিত এ্যাকশন কমিটিগুলো অনুমোদনের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়।

১৫. রেহমান সোবহান, *বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, পৃ. ১৮

১৬. *The Guardian*, 27.3.1971

১৭. *Ibid*, 29.3.1971

১৮. *Ibid*

১৯. বাংলাদেশ অ্যাকশন কমিটি কর্তৃক প্রচারিত লিফলেট, দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৯

২০. আব্দুল মতিন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা' প্রফেসর সালাহ্উদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩২০

২১. ঐ, পৃ. ৩২১

২২. পিটার শোর এম. পি. কর্তৃক হাউজ অব কমনসে উত্থাপিত বক্তব্য দেখুন, *Silver Jubilee Commemorative Volume of Bangladesh Independence*, UK: 1997, The Committee To Celebrate The Silver Jubilee Of Bangladesh Independence. 39 Fournier Street, London E-1, UK.

২৩. আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৬

২৪. ঐ, পৃ. ৩৭

২৫. স্মারকলিপিতে বলা হয়, "বাঙালিরা অতীতে তাদের সংগ্রামে চীনকে তাদের সমর্থক বলে, বিবেচনা করেছে। কিন্তু বাংলাদেশের প্রতি তাদের বর্তমান নীতির ফলে জনগণ চীনের প্রতি শ্রদ্ধা হারাতে শুরু করেছে।" ওয়ার্কার্স প্রেস, ১৩ এপ্রিল, ৭১ লন্ডন

২৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ১৮

২৭. ঐ, পৃ. ২০

২৮. প্রচারপত্রটির শিরোনাম ছিল: "An appeal to the vice-chancellors"; প্রচারপত্রে উল্লেখ করা হয়:

"The University teachers and students of Bangladesh (formerly East Pakistan) have been the victims of genocide conducted by the West Pakistan Army .... No doubt, as fellow Vice-Chancellors you will have similar feelings and considering the gravity of the situation we feel bound to appeal to you to raise

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

your voice against this organised political killing which aims to wipe out completely the intellectuals of Bengal."

বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড, পৃ. ২৫

২৯. শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালিদের অবদান*, ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃ. ৩২

৩০. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা, ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০, পৃ. ৮৫।

৩১. মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ-তৃতীয় খণ্ড*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫, পৃ. ১১৪

৩২. আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৫-৮৬

৩৩. আবু সাঈদ চৌধুরীর জীবনী দ্রষ্টব্য: সিরাজুল ইসলাম (সম্পাদিত), *বাংলাপিডিয়া*, খণ্ড-১, ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৩, পৃ. ২১০-২১১; তাঁর রচিত গ্রন্থ *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি* (ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯০) মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসতত্ত্বে এক গুরুত্বপূর্ণ সংযোজন।

৩৪ আব্দুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪। ১৫ই মার্চ লিখিত পত্রখানি জেনেভায় অবস্থিত পাকিস্তান দূতাবাসের মাধ্যমে প্রেরিত হয়েছিল। এখানে উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিশনের অধিবেশনে যোগ দেওয়ার জন্য জেনেভায় গমনের উদ্দেশ্যে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী ১৮ই ফেব্রুয়ারি তাঁর স্ত্রী এবং দুই ছেলে মেয়েসহ প্রথমে লন্ডনে যান। সেখানে তাঁর বড় ছেলে কায়সার চৌধুরী পড়াশুনা করছিলেন। স্ত্রী এবং ছেলে মেয়েদের লন্ডনে রেখে বিচারপতি চৌধুরী মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে জেনেভায় যান। দেখুন, ঐ, পৃ. ২৪

৩৫. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১, দ্বিতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ.৬৪

৩৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪ ; টেলেক্সটি পাঠিয়েছিলেন ঢাকাস্থ ব্রিটেনের ডেপুটি হাইকমিশনার ফ্রাঙ্ক সার্জেন্ট। ২৫ মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর আক্রমণ ও নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিবরণসম্বলিত

৩৭. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৩৮. ঐ, পৃ. ৫

৩৯. ঐ, পৃ.৪

৪০. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৭

৪১. মুক্তিযুদ্ধের পুরোটা সময় তিনি রক্ষণশীল দলীয় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন

৪২. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২

৪৩. মুজিবনগর সরকার গঠনের পূর্বে ব্যারিস্টার আমীর-উল-ইসলাম 'রহমত আলী' এবং তাজউদ্দীন আহমদ 'মোহাম্মদ আলী' ছদ্মনাম ব্যবহার করতেন। দেখুন, আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৮; রেহমান সোবহান, ওয়াশিংটনে এক আইনবিদের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় দালানে প্রবেশের জন্য রক্ষিত রেজিস্টারে তাঁর ছদ্মনাম 'মোহনলাল' লিখেছিলেন। অধ্যাপক আনিসুর রহমান ওয়াশিংটনে ছদ্মনাম কখনো আব্দুর রাজ্জাক, কখনো অনিল রায় ইত্যাদি ব্যবহার করেছেন। দেখুন: আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬, পৃ. ৮০

৪৪. সুলতান শরীফ, লেখকের সঙ্গে লন্ডনে সাক্ষাৎকার, ২৮ নভেম্বর, ১৯৯৭। সুলতান মাহমুদ শরীফ মূলত সুলতান শরীফ নামেই পরিচিত। তিনি এ সময় কলকতায় এসেছিলেন। বিচারপতি আবু সাঈদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চৌধুরীকে বিশেষ দূত হিসেবে নিয়োগ দানের বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ও প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন সাহমদের সঙ্গে তাঁর ইতিবাচক আলোচনা হয়। উল্লেখ্য, বিচারপতি চৌধুরীর দলীয় রাজনৈতিক পরিচয় না থাকায় যুক্তরাজ্য আওয়ামী লীগ সভাপতি গাউস খান তার ভূমিকা নিয়ে সংশায়িত ছিলেন।

৪৫. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৩

৪৬. *আব্দুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬

৪৭. তিনি লন্ডনে একটি স্কুলের শিক্ষয়িত্রী ছিলেন। ইংরেজি ও বাংলা ভাষায় অনর্গল বক্তৃতা করতে পারতেন। ২৫ মার্চের পর থেকেই তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করেন। দেখুন: নূরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা*, প্রাগুক্ত

৪৮. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪

৪৯. সুলতান শরীফ চিঠির একটি ফটো কপি গবেষকের প্রদান করেন। মুজিবনগর থেকে চিঠিটি বহন করেছিলেন জনাব রকিব উদ্দিন। তদানীন ন্যাশনাল ফেডারেশন অব পাকিস্তান এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি ও ইন্ডিয়া গ্রীল রেস্টুরেন্ট এর মালিক। প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধে বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদের স্বহস্তে এ চিঠিটি প্রবাসীদের উদ্দেশ্য করে লেখা প্রথম চিঠি। চিঠিটি পরিশিষ্ট ৩৬-তে দেখুন।

৫০. ২৪ এপ্রিল কভেন্ট্রিতে অনুষ্ঠিত সভায় ব্রিটেনে কেন্দ্রীয়ভাবে একটি সমিতি গঠন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং এই সমিতির নামকরণ করা হয় 'Action Committee For the People's Republic of Bangladesh in U.K.'

৫১. এর সদস্য ছিলেন আজিজুল হক ভুঁইয়া, কবির চৌধুরী, মনোয়ার হোসেন, শেখ আব্দুল মান্নান ও শামসুর রহমান। দেখুন : *আফসান চৌধুরী, ঐ, দ্বিতীয় খণ্ড*, পৃ. ৭০; *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৩০; এ্যাকশন কমিটির গঠনতন্ত্র দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ১০৫-১০৭

৫২. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৪-২৫

৫৩. এ প্রসঙ্গে আবু সাঈদ চৌধুরীর বর্ণনামতে:

এগার নম্বর গোরিং ষ্ট্রীটে হারুনুর রশিদের অফিসটির কক্ষ ছিল পাঁচটি। কক্ষগুলি আসবাবপত্র এবং টেলিফোন সজ্জিত। হারুনুর রশিদ বাংলাদেশ থেকে পাট রপ্তানির ব্যবসা করতেন। পঁচিশে মার্চের হত্যাযজ্ঞ শুরু হবার পর তাঁর ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। ঠিক হয় যে, আমরা তাঁর অফিস ও টেলিফোনের ভাড়া দেব। তখনকার বাজার দর অনুসারে ভাড়া কম ছিল। অফিস পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এগার নম্বর গোরিং ষ্ট্রীটের ঠিকানা দিয়ে প্যাড, চিঠির কাগজ ইত্যাদি ছাপানো হয় এবং সবাইকে এর ঠিকানা জানিয়ে দেওয়া হয়। দেখুন: আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭

৫৪. *আব্দুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩

৫৫. ঐ, পৃ. ২৯। বার্মিংহাম ইংল্যান্ডের আঞ্চলিক শহরগুলোর মধ্যে একটি বড় শহর। লন্ডনের পরে এখানেই সবচেয়ে বেশিসংখ্যক বাঙালির বাস

৫৬. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭-৩৮

৫৭. শাহীন মাহমুদ আলীর সঙ্গে লন্ডনে গবেষকের ২৪ জুলাই ১৯৯৯ সালে আলাপচারিতা। শাহীন মাহমুদ এর স্বামী এ. এইচ. মাহমুদ আলী ঐ সময় লন্ডন হাই কমিশনার ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিউইয়র্কে কূটনীতিবিদ হিসেবে কর্তব্যরত ছিলেন। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য জ্ঞাপন করেন। মাহমুদ আলী নিজে গাড়ি চালিয়ে বিচারপতি আবু সাঈদকে নিয়ে বিভিন্ন দূতাবাসে নিয়ে যান।

৫৮. আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

৫৯. ঐ, পৃ. ৫১-৫২

৬০. রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮, পৃ. ১০৫-১০৬

৬১. *আব্দুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৬

৬২. *প্রাগুক্ত*, ঐ, পৃ. ১১৫

৬৩. জহির উদ্দিন, মাহবুবর রহমান, আমীর আলী ও সুনীল কুমার লাহিড়ী প্রমুখ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য

৬৪. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৬০; ২৩শে জুন তিনি লন্ডনে ফিরে আসেন। দেখুন: আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৭।

৬৫. আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯

৬৬. আব্দুল মতিন, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালীর ভূমিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০।

৬৭. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৯।

৬৮. *আব্দুল মতিন, স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪০-১৪১।

৬৯. আবু সাঈদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত পৃ. ১০৮, ১৪১।

৭০. তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭২।

৭১. শেখ আব্দুল মান্নান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯২

৭২. ঐ, পৃ. ৩৪২-৪৩

৭৩. *আব্দুল মতিন*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৪

৭৪. Sukhmar Biswas, *Bangladesh Liberation War: Mujibnagar Government Documents, 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005, p. 366.

৭৫. রেহমান সোবহান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৫-১০৬; এ প্রসঙ্গে মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে World Press Review-তে উল্লেখ করা হয়:

"Foreign aid and military assistance to Pakistan have come to a halt. The only countries U.S.A. and France who were giving arms to Yahya Khan have now declared that there will be no more such arms supply to Pakistan. A country which depends as Pakistan does, on foreign aid and supplies cannot survive when these are cut off. The *Financial Times* of London reports from Paris "the World Bank's Aid-to Paistan consortium is likely to stick to its refusal of assistance to Pakistan during the current financial year." No western country is willing at present to do anything which may be interpreted as providing aid to Pakistan."

আরো দেখুন: Sukumar Biswers, *Mujibnagar Government Documents, op.cit.*, P. 366.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৬. রেহমান সোবহান, *আমার সমালোচক আমার বন্ধু*, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ, পৃ. ৭২-৭৩; রেহমান সোবহানের তৎপরতা সম্পর্কে দ্রষ্টব্য: আবুল মাল আবদুল মুহিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮-৮১, ১৪২

৭৭. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৪-৯৫। হাউজ অব কমন্সের হারকোট্ কক্ষটি নিয়েছিলেন পার্লামেন্ট সদস্য জন স্টোনেহাউজ।

৭৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৯৫৯

৭৯. Mohammad Ali Asghar. *op.cit.*, p. 25.
আবদুল মালেক ১৯৪৪ সনে লন্ডনে আসেন। তিনি বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার এসোসিয়েশনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জুন মাসের তৃতীয় সপ্তাহে প্রচারিত সংবাদ পরিক্রমায় রক্ষণশীল দলের পার্লামেন্ট সদস্য জীল নাইট-এর নেতৃত্বে বৃটেন পার্লামেন্টারি প্রতিনিধিদল পাকিস্তান সফর করেন। সেখানে সামরিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আয়োজিত এক সমাবেশে মুসলিম লীগ নেতা শাহ আজিজুর রহমান দেশে কোনো অশান্তি বা গোলযোগ আছে কিনা তা জীল নাইটকে জিজ্ঞাসা করতে বলেন। জীল নাইট প্রশ্নটি জিজ্ঞাসা করলে সমাবেশের মধ্যে থেকে একজন বলেন, দেশ স্বাভাবিক ও শান্ত। এ পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক ব্যাপক হত্যার কোনো প্রমাণ তিনি পাননি। রেডিও পাকিস্তানের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ব্রিটিশ সংবাদপত্র অত্যধিক পরিমানে 'উড়ো খবর' ও 'এক তরফা' ভারতীয় প্রচারণাই ছাপানো হচ্ছে। এ বিষয়গুলো ব্রিটিশ টেলিভিশনে প্রচার করা হলে তা জনাব আবদুল মালেকের নজরে আসে।

৮০. খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিসিং হাউস, ২০০৮, পৃ. ৮২

৮১. আবদুল মতিন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৪৬। সর্বজনাব নজরুল ইসলাম, এস এইচ এ প্রামাণিক, ওয়ালি আশরাফ, খন্দকার মোশারফ হোসেন ও মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু প্রমুখ ছাত্রনেতা এ প্রতিনিধিদলের সদস্য ছিলেন।

৮২. ঐ, পৃ. ১৪৬

৮৩. *Silver Jubilee Commemorative Volume of Bangladesh Independence, op.cit.*, p. 218. রাশেদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানি পাসপোর্ট ছুঁড়ে ফেলেছিলেন। একমাত্র ভগ্নীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করেন। "I have no doubt in my mind that the brave freedom fighters will succeed in achieving full Independence by rejecting the invading army."

৮৪. বক্তার নাম ও অনুষ্ঠানসূচি দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ১৯৫

৮৫. *মুনতাসীর মামুন, মুক্তিযুদ্ধের কোষ-তৃতীয় খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৭

৮৬. *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান সামরিক জান্তা ২৬ মার্চ বন্দি করে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায় এবং কারাগারে আটক করা হয়। তাঁকে 'পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা' ও পাকিস্তান সরকারের সমান্তরাল সরকার পরিচালনার জন্য রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে সামরিক আদালতে গোপনে বিচার করা হবে বলে ঘোষণা দেয়।*

৮৭. ১৬.৮.১৯৭১ প্রচারিত বাংলাদেশ এ্যাকশন কমিটির বিজ্ঞাপন দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৮. K. M. Shaehab Uddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dhaka: The University Press Ltd, 2006, p. 81.

৮৯. ঐ, পৃ. ৬৭

৯০. গাউস খান আওয়ামী লীগ যুক্তরাজ্য শাখার তৎকালীন সভাপতি। ১৯৭৩ সালে জুলাই মাসে লন্ডনে তাঁর সঙ্গে আলাপচারিতা। ঐ সময়, গবেষক কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে উপ-নেতা হিসেবে যোগদান করেন। প্রতিনিধিদলের নেতা ছিলেন মোল্লা জালাল উদ্দিন, সদস্য ছিলেন মানবেন্দ্র নারায়ন লারমা। প্রতিনিধিদলের সকলেই বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন।

৯০. এ প্রসঙ্গে আবুল মাল আবদুল মুহিতের মূল্যায়ন নিম্নরূপঃ
জনসংযোগের দৃষ্টিকোণ থেকে এ রকম আনুগত্য ঘোষণা ছিল নানাভাবে মূল্যবান। প্রথমত, এতে মুক্তিযুদ্ধে সারা বাঙালি গোষ্ঠীর ব্যাপক সমর্থন প্রকাশ পেতো। দ্বিতীয়ত, এরা বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জনমত গঠনে এবং প্রচারণায় উত্তম ভূমিকা রাখতে পারতেন। তৃতীয়ত, এতে রণাঙ্গনে মুক্তিযোদ্ধা ও বন্দি বাংলাদেশে নিষ্পেষিত জনগণ ভরসা পেতো এবং উদ্বুদ্ধ হতো। দেখুনঃ আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৬ এবং খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২

৯১. প্রবাসীদের কথা, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৩৬

৯২. "We urge you to look into the 1940 Pakistan resolution moved by Mr. A. K. Fazlul Hoq, Which called for two independent Pakistans. This was promised to East Pakistanis, but never fulfilled. Now we demad you to transfer the power to the present National leaders of East Pakistan and establish a separate, indcpendent, sovercign East Pakistan and thereby avoid future enmity, violence, mistrust, hatred, and bloodshed between East Pakistanis and West Pakistanis." *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিল পত্র, চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ২৪০।

৯৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫৫

৯৪. আবুল মাল আবদুল মুহিত, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫-৩৮

৯৫. তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালি সমাজ*, ঢাকাঃ সাহিত্যপ্রকাশ, ২০০১, পৃ. ১৭১; *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৫২

৯৬. তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১-১৭২

৯৭. ঐ, পৃ. ১৭৩

৯৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

৯৯. মুজিবনগর থেকে প্রেরিত টেলিগ্রামে (২১.০৯.৭১) বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীকে লন্ডনে জানানো হয়। 'Foreign minister unable to come. Kindly proceed to newyork to lead delegation'. সূত্রঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৩১।

১০০. Sukumar Biswas (ed.), *Mujibnagar Governments Documents 1971, op.cit*, p. 116.

১০১. *Ibid*, p. 340.

১০২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্রঃ চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৬-৩২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৩. তাজুল মোহাম্মদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৩। অটোয়া ইউনিভার্সিটির প্রফেসর নাসির উদ্দিন আহমেদ ও প্রফেসর ড. মিজান রহমান, কার্লটন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. লুৎফুল কবির, কানাডা সরকারের অধীন চাকরিরত ড. আহসান উল্লাহ, পরিসংখ্যানবিদ আবদুর রহিম, কম্পিউটারবিশেষজ্ঞ আজমত আলী, অর্থনীতিবিদ জালাল উদ্দিন, আবদুল আওয়াল, মুহাম্মদ হানিফ, আবদুস সাত্তার প্রমুখ এ বিষয়ে ছিলেন সক্রিয়। তাঁদের একত্র করার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন আজমত আলী। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সমর্থনে বাংলাদেশ এসোসিয়েশন অব কানাডা যে কার্যক্রম প্রণয়ন করেছিল সে বিষয়ে দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫৫

১০৪. ড. মিজান রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে (৪ সেপ্টেম্বর ২০১১) সাক্ষাৎকার। ড. মিজান আমার অনুরোধ 'একাত্তরের অটোয়া' শিরোনামে একটি স্মৃতিকথা লিখে পাঠিয়েছেন। উক্ত লেখাটি পরিশিষ্ট ৩-চ-তে দেওয়া হলো।

১০৫. তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২২৯।

১০৬. ড. মিজান রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার

১০৭. তাজুল মোহাম্মদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ২৩২

১০৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫৮

১০৯. ঐ, পৃ. ৩৭৩

১১০. ড. মিজান রহমানের সঙ্গে টেলিফোনে সাক্ষাৎকার, ০৩.০৯.২০১১

১১১. আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

১১২. আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী*, প্রাগুক্ত, ঐ, পৃ. ১৪০-১৪১

১১৩. ঐ, পৃ. ১৪১

১১৪. সুকুমার বিশ্বাস, *জাপান এন্ড ইমারজেন্স অফ বাংলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, পৃ. ২৩৬

১১৫. ঐ, পৃ. ২৩৭

১১৬. ঐ, পৃ. ২৩৮। চিঠির অংশবিশেষ নিম্নরূপ, Dear Sir, May I thank you on behalf of the Bangladesh forces (Mukti Bahini) for the following communication equipement which will be of great help : a summer kemp citizen, band two channel Transreceiver=108, b. Pony. Transreceiver CB-36=10, c. Wire Antenna for pony=10, d. Battery's novel long life peatype=64..., Yours Sincerely, sd/M.A.G. Osmany. দেখুন: ঐ।

১১৭. জালাল আহমেদ, পরে ইস্কান্দার আহমেদ চৌধুরী এবং সবশেষে এস. এ. জালাল এই দায়িত্ব পালন করেন। মুস্তাফিজুর রহমানও ব্যক্তিগতভাবে মিশন প্রধান হাসান আলীর সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন ।

১১৮. সুকুমার বিশ্বাস, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৩৯

১১৯. আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা: ত্রিভূজ প্রকাশনী, পৃ. ১৪

১২০. ঐ, পৃ. ৩৪; এই দলের কার্যক্রমের দলিল পত্র দেখুন: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৩৭৯-৪৬২।

১২১. *Bangladesh Documents Vol.- II*, p. ৩৪৫ ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত Is Islam Dead থেকে নিম্নলিখিত অংশটুকু উদ্ধৃত করা হলো:

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"Stop the genocide, Politicians, thinkers, teachers, students, doctors, engineers and even unarmed civilians, including women and children are being wiped out in East Pakistan. Will the Muslim would in general support this? Can Islamic principles justify sppression by a minority of a majority demand for social and economic justice?"

১২২. আবুল ফজল শামসুজ্জামান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

১২৩. সিঙ্গাপুরে প্রবাসী বাঙালির মধ্যে যারা মুক্তি সংগ্রামের সাহায্যার্থে অগ্রণী ভূমিকা পাল করেন তাদের মধ্যে ছিলেন: সৈয়দ আবদুল মজিদ মাস্টার, মখলিছ খান, সাংবাদিক সৈয়দ মোহাম্মদ আলী, অধ্যাপক ড. মাহফুজুল হক, আবদুল খালিক সারং, ইনতাজ আলী সারং, মদছির আলী টেন্ডল, ওয়াহিদুর রহমান, মহিউদ্দিন চৌধুরী, দেওয়ান মোবারক গাজী, ইব্রাহীম আলী, মশাহিদ আলী, আত্তর আলী, আনোয়ার আলী, সুনাত্তর আলী, মৌলভী কালা মিয়া, আইয়ুব উল্যা, আব্দুল জব্বার, ইছরাইল মিয়া, ইদ্রিছ আলী, নুরুল ইসলাম নুরু, সিরাজ উদ্দিন, ওয়াহিদ উল্যা, সাজিদ মিয়া, ইছমাইল আলী, আজিদ উল্যা, কনাইমিয়া, তেরা মিয়া এবং ময়না মিয়া।

১২৪. *সমাজ-নিরীক্ষণ*, সমাজ নিরীক্ষা কেন্দ্র, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৪, পৃ. ২৬

১২৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৬৯৪-৭০০

১২৬. গণসংস্কৃতি সংসদের উদ্দেশ্য ও কার্যাবলি সম্পর্কে প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৭০১; এই সংসদের কর্মকর্তাদের নামের তালিকা দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৭০৪; সংস্কৃতি সংসদের প্রচারিত বাংলা ও ইংরেজি গান দ্রষ্টব্য, ঐ, পৃ. ৭০২-৭০৩।

১২৭. Sukumar Biswas, *Mujibnagar Government Documents, op.cit., p.* 201.

১২৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: চতুর্থ খণ্ড*, পৃ. ৩৩৪।

১২৯. *দৈনিক প্রথম আলো*, ৯ ডিসেম্বর ২০১০।

১৩০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড*, পৃ. ৬৪১-৯১৭

১৩১. "The public and the Congress would react very strongly against the sale of lethal spare parts and ammunition. Release of these items in the face of strong Congressional sentiment could jeopardize the prospects of legislation for future economic assistance to Pakistan. It could also adversely affect congressional attitudes toward some of our military and economic assistance programs for countries other than Pakistan"

See, Enayetur Rahim, Joyce L Rahim, *Bangladesh Liberation War and The Nixon White House 1971*, Secret, June 30, 1971. National Security Council, Military Supply to Pakistan, Dhaka: 2003, Pustaka, p. 163.

১৩২. ঐ, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩

১৩৩. *American Secret Documents- Foreign Relations, 1969-1976, Volume XI, South Asia Crisis, 1971*, p. 419.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩৪. K. M. Shaehab Uddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale, op.cit.*, pp. 198, 211-12.

১৩৫. সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিরোনামগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড*, ঐ, পৃ. ৭৪৯-৮৩৪ পর্যন্ত দেখুন। আরও দেখুন বাংলাদেশ নিউজ বুলেটিন ক্যালিফর্নিয়া শিকাগো, বাংলাদেশ নিউইয়র্ক, শিখা নিউইয়র্ক

১৩৬. সংবাদপত্রে প্রকাশিত শিরোনামগুলোর বিস্তারিত বিবরণ জানতে হলে *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: ষষ্ঠ খণ্ড*, ঐ, পৃ. ৮৩৭-৮৯৩ পর্যন্ত দেখুন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চতুর্থ অধ্যায়
বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে ঘিরে বিশ্ব কূটনীতি

ভূমিকা

২৫শে মার্চ রাতে 'অপারেশন সার্চলাইট' ব্লু-প্রিন্ট অনুসারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বাংলাদেশব্যাপী নির্মম নৃশংস আক্রমণ চালায়। পাকিস্তান সেনাবাহিনী আক্রমণ শুরু করলে বন্দি হবার পূর্বে বঙ্গবন্ধু স্বাধীনতার ঘোষণা দেন। স্বাধীন বাংলাদেশ রক্ষার জন্য, তিনি "যে সেখানে আছ, যার যা কিছু আছে, তাই নিয়ে রুখে দাঁড়াও, সর্বশক্তি দিয়ে হানাদার বাহিনীকে প্রতিরোধ করো। পাকিস্তানি দখলদার বাহিনীর শেষ সৈন্যটিও বাংলার মাটি হইতে বিতাড়িত না করা পর্যন্ত এবং চূড়ান্ত বিজয় অর্জন না করা পর্যন্ত লড়াই চালিয়ে যাও" এই মর্মে নির্দেশ প্রদান করেন।[১]

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে ধানমন্ডির বাসভবন থেকে বন্দি করার পরপরই পাকিস্তান ওয়ারলেসে আর্মি হেডকোয়ার্টারে জানানো হয় 'বড়ো পাখিটাকে খাঁচায় আটকানো হয়েছে।'[২] রাতে বঙ্গবন্ধুকে আদমজী হাইস্কুলে যা ক্যান্টনমেন্টের মধ্যে অবস্থিত সেখানে নেওয়া হয়। পরদিন তাঁকে ফ্লাগ হাউজে স্থানান্তরিত করা হয় এবং তিনদিন পর সেখান থেকে করাচি নেওয়া হয়।[৩] করাচি পৌঁছাবার পর অবিলম্বে বন্দি মুজিবকে লয়ালপুর বর্তমানে পাঞ্জাবের ফয়সালাবাদ কারাগারে নিয়ে যাওয়া হয়।[৪]

মুক্তিযুদ্ধের নয় মাস বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিঃসঙ্গ কারাগারে বন্দি থাকলেও তিনি এমনভাবে বিশ্ব কূটনৈতিক তৎপরতায় উপস্থিত ছিলেন যাঁকে ব্যতীত দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠা ছিল দূরূহ ব্যাপার। তার মুক্তির প্রশ্নটি নিয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা চালাতে হয়। এই কূটনৈতিক তৎপরতায় প্রারম্ভিকভাবে দেখা যাবে বন্দি মুজিবের অবস্থা ও অবস্থান নির্ণয়, নিরাপত্তা বিধান এবং রাজনৈতিক সমঝোতার নেপথ্যে তাঁর মুক্তির কৌশল নির্ধারণ। যুক্তরাষ্ট্র 'নির্দিষ্ট লক্ষ্য' অর্জনে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির প্রশ্নে জোরালো ভূমিকা নিলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা বিষয়ে তার নেতিবাচক অবস্থান কীভাবে ক্রিয়াশীল ছিল তা গবেষকদের দৃষ্টি এড়াতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পারে না। এ ক্ষেত্রগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, দক্ষিণ এশিয়ার শান্তি ও স্থিতিশিলতার লক্ষ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমার্থক হয়ে উঠেছে। এই অধ্যায়ে বন্দি মুজিবকে ঘিরে বিশ্বনেতৃবৃন্দের উদ্বেগ, কৌশল, উদ্যোগ কূটনৈতিক বিশ্বকে কীভাবে আলোড়িত, উৎকণ্ঠিত ও উদ্বেলিত করেছে তারই বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

মুজিবের আটকের খবর প্রচারকে ঘিরে কূটনীতি

২৬শে মার্চ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করা হলেও ১০ই এপ্রিল পর্যন্ত সংবাদটি সাধারণ্যে গোপন থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ২৬শে মার্চের ভাষণ, কিংবা পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের সরকারপ্রধানদের নিকট মার্চ-এপ্রিল মাসে (১৯৭১) প্রেরিত তার পত্রে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গ্রেফতার বা তাঁর অবস্থান সম্পর্কে কোনো কিছু উল্লেখ করা হয়নি।[৫]

পাকিস্তান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর ২৬শে মার্চের (১৯৭১) ভাষণে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে 'পাকিস্তানের শত্রু', 'রাষ্ট্রদ্রোহী' হিসেবে চিহ্নিত করলেও এ কথা কোথাও তার ভাষণে উল্লেখ্য নেই যে, শেখ মুজিবুর রহমানকে গ্রেফতার বা বন্দি করা হয়েছে। এমনকি তিনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিক্সন বরাবর ৩১শে মার্চে লিখিত এক পত্রে শেখ মুজিবুর রহমানের 'অনমনীয় মনোভাবের' দিকটি তুলে ধরেন এবং তাঁর বিরুদ্ধে সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে এক অরাজক অবস্থার সৃষ্টি করার অভিযোগ উত্থাপন করেন। কিন্তু শেখ মুজিবকে আটক, করার বিষয়ে উক্ত পত্রে কিছুই উল্লেখ করেননি। একই দিনে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর দীর্ঘপত্রে আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হওয়ার বিশদ বিবরণ দিলেও বঙ্গবন্ধুর গ্রেফতার বিষয়ে উক্ত পত্রে কিছুই উল্লেখ করেননি।

এর সম্ভাব্য কারণ হতে পারে: এক, ঐ সময় পর্যন্ত বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হয়নি। দুই, গ্রেফতার সম্পর্কে গোপনীয়তা রাখা হয়েছে এই ভেবে যে, বন্দি মুজিবকে উদ্ধারের জন্য যে কোনো সময় ভারতীয় বিমান বাহিনী বা কমান্ড হামলা হতে পারে। তিন, আকাশপথে শেখ মুজিবের বহনকারী বিমানকে 'ইন্টারসেপ্ট' করা হতে পারে।

বন্দি মুজিবের অবস্থান পাকিস্তান সেনা সামরিক জান্তা আড়াল করতে চাইলেও তা বিশ্ব পরাশক্তির নিকট গোপন ছিল না, যা মার্কিন গোপন দলিলপত্র থেকে সহজেই প্রতীয়মান হয়। এখানে কিছু উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে, যেমন:

সিআইএ পরিচালক রিচার্ড হেল্‌মস ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ ওয়াশিংটনে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে তথ্য দেন যে, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়েছেন এবং তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছে।[৬]

৩১শে মার্চ হেনরি এ. কিসিঞ্জার-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা হয়। আলোচনায় উপস্থিত সি.আই.এ. প্রতিনিধি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ডেভিড ব্লি-কে হেনরি কিসিঞ্জার জিজ্ঞেস করেন, 'শেখ মুজিব এখন কোথায়?' 'ব্লি-র উত্তর ছিল, পাকিস্তান তাঁকে গ্রেফতার করেছে। সম্ভবত তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের কোয়েটায় আটক আছেন। কিসিঞ্জার পুনরায় জিজ্ঞেস করেন, 'তাঁকে কি হত্যা করা হবে?' ব্লি-র উত্তর ছিল যে ধরনের রিপোর্ট পাওয়া যাচ্ছে, 'তারা সম্ভবত তাই করবেন।' 'তবে সবচেয়ে ভালো হয়, তাঁকে যদি ভবিষ্যতে সুবিধাজনক সময় ব্যবহারের জন্য গ্রেফতার করে রাখা হয়।' সি.আই.এ. প্রধান লে. জে. আর. ই. কুশান ঐ বৈঠকে বলেন, "ইয়াহিয়া তাকে রাষ্ট্রদ্রোহী হিসেবে অভিযুক্ত করেছেন। সম্ভবত আগেই তাঁকে গুলি করা হয়েছে অথবা অসাবধানতাবশত তাঁকে গুলি করা হবে।"[৭] এই অবস্থায় প্রশ্ন আসতে পারে ইয়াহিয়া চক্রের অধিকাংশ জেনারেল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার পক্ষে অভিমত প্রকাশ করলেও কেন তাকে হত্যা করা হয়নি?

প্রথমত, মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্টসগুলো পর্যালোচনা করে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্র ঐ সময় কোনোভাবেই শেখ মুজিবকে হত্যা করা হোক তা তাদের গ্রহণীয় ছিল না। ২৫শে মার্চ দুপুর পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ঢাকায় অবস্থান করছিলেন। তিনি দুপুরের পর রাওয়ালপিন্ডির উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কী ঘটতে যাচ্ছে এ সম্পর্কে তিনি ওয়াকবহাল ছিলেন বলেই প্রতীয়মান হয়। পরবর্তী ৮ই সেপ্টেম্বরে মার্কিন স্পেশাল অ্যাকশন সভায় বলা হয়, তাদের বলা হয়েছে মুজিব বেঁচে থাকবেন অথচ প্রচার করা হচ্ছে তিনি মৃত। মৃত মুজিবের চেয়ে তাদের কাছে জীবিত মুজিবের অনেক মূল্য।

দ্বিতীয়ত, ঊর্ধ্বতন মহল থেকে কমান্ড বাহিনীর গ্রুপ প্রধান মেজর বিল্লালকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, শেখ মুজিবকে যেন জীবিত বন্দি করা হয়। এ নির্দেশ দিয়েছিলেন জেনারেল মিঠ্ঠি। জেনারেল মিঠ্ঠি ছিলেন কমান্ড বাহিনীর প্রধান।[৮]

তৃতীয়ত, 'অপারেশন সার্চলাইট' পরিকল্পনা পর্যালোচনা করে দেখা যায়, পাকিস্তান সামরিক জান্তার পরিকল্পনা ছিল বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবিত আটক করা।[৯]

চতুর্থত, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশে ফিরে আসার পর তাঁকে কেন ঐ সময় হত্যা করা হয়নি এ সম্পর্কে তাঁর অভিমত সম্পর্কে জানা যায় শেখ শহীদুল ইসলামের নিকট থেকে। তিনি বলেছেন, পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত নেতা হিসেবে তাঁকে ঐ মুহূর্তে হত্যা করা হলে বিশ্ব প্রতিক্রিয়া হতো গুরুতর। সেজন্য তাঁকে বন্দি করে প্রহসনের বিচার মাধ্যমে হত্যার চক্রান্ত হয়। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা অধিকাংশই বঙ্গবন্ধুকে প্রহসনের বিচারের মাধ্যমে হত্যার পক্ষে ছিলেন। মিয়ানওয়ালি জেলখানার মধ্যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করা হয়।[১০]

৮ই এপ্রিল করাচিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূতকে এক সাক্ষাতকারে ইয়াহিয়া বলেন, শেখ মুজিব মহা অপরাধ করেছেন। সামরিক আদালতে তাঁর বিচার হবে। রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া খান আরও বলেন, শেখ মুজিবের বিচার হবে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ। ইয়াহিয়া খান বলেন, তিনি নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক নন, স্বাভাবিক প্রকৃতির লোক। শেখ মুজিবের উপর তার ব্যক্তিগত কোনো আক্রোশ নেই, কিন্তু তিনি সাম্প্রতিক ইতিহাসের ঘটনাবলি অস্বীকার করতে পারেন না।[১১] উক্ত সাক্ষাৎকারের পর ঐ দিনই পাকিস্তানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্টেট ডিপার্টমেন্টকে অবগত করেন যে, মুজিবকে হয়তো পশ্চিম পাকিস্তানের কারাগারে অন্তরীণ রাখা হয়েছে।

৯ই এপ্রিল পাকিস্তান নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার সিরিল পিকার্ড বিশেষ টেলিগ্রামে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর বরাবর এক বার্তায় উল্লেখ করেন, শেখ মুজিবের নিরাপত্তা বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বক্তব্য উদ্ধৃত করে তিনি লেখেন, শেখ মুজিবকে নিরাপদেই রাখা হয়েছে এবং কিছুদিনের মধ্যেই তাঁর ছবি সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য দেওয়া হবে। উপরের আলোচনা থেকে বলা যায় যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের আটক হওয়ার খবর ৯ই এপ্রিল (১৯৭১) পর্যন্ত প্রচারিত না হলেও তাঁকে যে বন্দি করা হয়েছিল এবং তিনি জীবিত ছিলেন তা যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের সরকার প্রধানগণ ও উচ্চ পর্যায়ের কর্মকর্তারা অবহিত ছিলেন।

শেখ মুজিবের আটকের খবর প্রচার করার জন্য পাকিস্তান সরকারকে প্রলুব্ধকরণে ভারত ও ব্রিটেনের কৌশল

বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রকাশ্যে আনার জন্য ভারত কৌশলের আশ্রয় গ্রহণ করে। ৮ই এপ্রিল ভারত সরকার নিয়ন্ত্রিত আকাশবাণী রেডিও থেকে প্রচারিত সংবাদে বলা হয়, "অসমর্থিত খবরে প্রকাশ, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে মুক্তিবাহিনীর নেতৃত্ব দিচ্ছেন।" আকাশবাণীর এ খবরটি জাদুমন্ত্রের মতো কাজ করে।[১২] পাকিস্তান সামরিক সরকার সংবাদটি নিয়ে সংকটে পড়ে। সংবাদটি মেনে নিলে পরোক্ষভাবে সংবাদটি সত্য বলে প্রতীয়মান হবে। এ সময় ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ কর্তৃক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বরাবর প্রেরিত এক বার্তায় উল্লেখ করা হয় :

"৩১শে মার্চ আপনার হাই কমিশনার আমাকে বলেছেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান জেল হাজতে নিরাপদ রয়েছেন। আপনার ব্যক্তিগত ও পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে আমি কি আপনাকে এই পরামর্শ দিতে পারি যে, এই সঙ্কটকালে আপনি যদি জনসম্মুখে তাঁর এবং অন্যান্য আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চয়তা প্রদান করেন তাহলে আন্তর্জাতিকভাবেও আপনি প্রশংসিত হবেন।"[১৩]

এমতাবস্থায় পাকিস্তান সরকারের নির্দেশে পরদিনই ডন (DAWN) পত্রিকা করাচি বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধুর দু'পাশে দু'জন সশস্ত্র প্রহরী দাঁড়ানো অবস্থায় একটি ছবি প্রকাশ করে। এরপর ৫ই মে পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ সরকারিভাবে সাংবাদিকদের অবহিত করেন যে, শেখ মুজিব জীবিত ও সুস্থ আছে।[১৪]

শেখ মুজিবের জীবনরক্ষার তাৎক্ষণিক কূটনীতি

পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ বঙ্গবন্ধুর আটকের খবর প্রচার করলেও তাঁকে যে কোনো সময় যে কোনো অজুহাতে হত্যা করতে পারতো। সে কারণে তাঁর নিরাপত্তার বিষয়টি নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৩ই মে তিনি ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে লেখা চিঠিতে উল্লেখ করেন :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"সকল রাজনৈতিক দলসহ ভারতীয় জনগণ শেখ মুজিবুর রহমানের ব্যক্তিগত নিরাপত্তার ব্যাপারে গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।

এ ব্যাপারে পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের কাছে আপনার পাঠানো যে কোনো বার্তা আমাদের ভরসা দেবে।"[১৫]

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনরক্ষার জন্য পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর প্রভাব বিস্তারের জন্য ২৪টি রাষ্ট্রপ্রধানের কাছে আবেদন জানান। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাঁর আবেদনে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেন যে, শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার উদ্দেশ্যেই বিচারের প্রহসন করা হচ্ছে। এর ফলে পূর্ব বাংলার পরিস্থিতির দারুণ অবনতি ঘটবে। একই ধরনের পত্র তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের নিকট প্রেরণ করেন।

এক সপ্তাহের মধ্যেই শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পত্রের জবাব দেন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ। কিন্তু লক্ষ্যণীয় মার্কিন প্রেসিডেন্ট এ সম্পর্কে কোনো জবাব দিয়েছেন কিনা তার উল্লেখ পাওয়া যায়নি।

২০শে মে ব্রিটিশ প্রধানন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, "তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার অনুরোধ জানিয়েছেন এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়েও তাঁর ভবিষ্যৎ সম্পর্কে উদ্বেগ ব্যক্ত করেছেন।"[১৬] ১১ই আগস্ট মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ওয়াশিংটনে নিযুক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রদূত হিলালীর সঙ্গে টেলিফোনে মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের জনগণের মধ্যে যে উদ্বেগ তা তাকে অবহিত করা হয়। এই বিষয়টি ২৪শে আগস্ট নিক্সনকে দেওয়া কিসিঞ্জারের এক স্মারকে উল্লিখিত হয়েছে। রজার্স পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে বলেন যে শেখ মুজিব যেন পছন্দমত আইনজীবী নিয়োগ করতে পারেন, তাঁর বিচার যাতে সুষ্ঠু হয় এবং বিচার যেন সর্বোচ্চ সতকর্তার সঙ্গে পরিচালনা করা হয়। মার্কিন রাষ্ট্রদূত আরো বলেন, কোনো প্রকার পক্ষপাত অথবা আগাম ধারণার বশবর্তী না হওয়া এবং রায় সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত পৌঁছানো হোক না কেন, তার রেকর্ড যেন অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ ও যথাযথ হয়–তা' নিশ্চিত করতে হবে। এর পূর্বে ২০শে আগস্ট পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করে সবচেয়ে স্পর্শকাতর বিষয় অর্থাৎ শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আলোচনা উত্থাপন করেন। ফারল্যান্ড তাকে বলেন, বিশ্বের প্রায় প্রতিটি রাষ্ট্র শেখ মুজিবের ক্যামেরা ট্রায়াল সম্পর্কে গভীর আগ্রহী ও উদ্বিগ্ন। তিনি বন্ধু হিসেবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পরামর্শ দেন যে তিনি যেন শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা না করেন। তার মতে এটা হবে তার সরকার এবং তার জন্য ভালো। এভাবে বিশ্বনেতৃবৃন্দ মুজিবের নিরাপত্তার বিষয়ে প্রকাশ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে পাকিস্তান সরকারের উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি করা হয়।[১৭] ১৯শে আগস্ট মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে স্যার ডগলাস হিউম একটি পত্র লেখেন। পত্রের শিরোনাম ছিলো: শেখ মুজিবুর রহমান। পত্রে বলা হয়, গত ১৫ই জুলাই লন্ডনে যখন মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘটে তখন শেখ মুজিবুর রহমানের ভাগ্য নিয়ে ব্রিটেনের উদ্বেগের কথা জানানো হয় এবং মালয়েশিয়ার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রীও একমত হয়েছিলেন যে, শেখ মুজিবের বিচার ও তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার জন্য অত্যন্ত বড়ো ধরনের ভুল কাজ হবে।

পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া ও বিচার প্রসঙ্গে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব

১০ই এপ্রিল (১৯৭১) শেখ মুজিবের আটকের ছবি পত্রিকায় প্রকাশিত হলেও তাঁর বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত কোনো সরকারি ভাষ্য জানা যায়নি। তবে বিভিন্ন কূটনৈতিক সংলাপে শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে পাকিস্তানি সরকারের মনোভাব জানা যায়।

২৬শে মে যখন পাকিস্তানে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছে শেখ মুজিব সম্পর্কে তাঁর মনোভাব জানতে চান তখন প্রেসিডেন্ট খুব উত্তেজিত হয়ে পড়েন এবং বলেন, সে বড়ো ধরনের অন্যায় করেছে এবং তাকে এ জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হবে। ফারল্যান্ড জানতে চান, শেখ মুজিবকে সুবিচারের সুযোগ দেওয়া কি সম্ভব? কেননা এরকমটাই সবাই বলছেন এবং এ নিয়ে লেখালেখিও হচ্ছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রশ্নটি এড়িয়ে যান।[১৮] তবে ১৯শে জুলাই (১৯৭১) 'ফিনান্সিয়াল টাইমস' পত্রিকার প্রতিনিধি নেভিল ম্যাক্সওয়েলের সঙ্গে দুই ঘণ্টাব্যাপী এক সাক্ষাৎকারে ইয়াহিয়া খান বলেন যে, মুজিবের বিচার হবে। উক্ত সাক্ষাৎকারে মুজিবের বিচার প্রক্রিয়া সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান বলেন, "তাঁর পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন পাকিস্তানি আইনজীবী থাকবেন, কোনো বিদেশি আইনজীবী নয়। এই বিচার সামরিক আদালতে হবে এবং গোপনে হবে। যেসব অভিযোগ করা হবে তা প্রমাণিত হলে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে।"[১৯]

২০শে আগস্ট পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া খান এক সাক্ষাতকারে বলেন যে, শেখ মুজিবের বিচারে সবচেয়ে ভালো আইনজীবী এ.কে. ব্রোহীকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে, সামরিক ট্রাইবুনালকে বলা হয়েছে সতর্ক ও নিরপেক্ষভাবে বিচার কাজ পরিচালনা করতে এবং গুরুত্বপূর্ণ রেকর্ডসমূহ গোটাটাই রক্ষা করতে। ইয়াহিয়া খান বলেন যে সমস্ত অভিযোগ রয়েছে তাতে সম্ভবত তাঁর মৃত্যুদণ্ড হবে। তবে তার একটি পরিকল্পনা রয়েছে যে মৃত্যু দণ্ডাদেশ হলে শেখের পক্ষ হতে যদি ক্ষমা প্রদর্শনের পিটিশন পেশ করা হয় তাহলে তিনি তা গ্রহণ করবেন। কিন্তু তিনি তা কয়েক মাসের জন্য তা রেখে দেবেন এবং বেসামরিক সরকার আসলে তারা তা দেখবেন। যদি মুজিবের ক্ষমা পিটিশন বেসামরিক সরকারের জন্য সমস্যার সৃষ্টি না করে তাহলে ন্যূনতম সম্ভাবনা নেই মুজিবকে হত্যা করার। ইয়াহিয়া বলেন, তাদের কারো উদ্বেগের কারণ নেই কেননা তিনি কোনো মানুষকে হত্যা করতে চাননা এমনকি সে যদি একজন বিশ্বাসঘাতকও হয়। ইয়াহিয়া খান বলেন, ২১শে সেপ্টেম্বর থেকে মুজিবের বিচার পুনরায় শুরু হবে। ফারল্যান্ড তাকে বলেন যে, পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে বিচার শেষ হয়েছে এবং তা তার সুপারিশের জন্য পেশ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খান বলেন, বিচার চলছে। বিচার শেষ হবার পর বিচার সম্পর্কিত কাগজপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে যাতে জনগণ বুঝতে পারে বিচার কাজ যথাযথভাবে সম্পন্ন হয়েছে। ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানকে জিজ্ঞেস করেন পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে ও আলোচনায় মুজিবকে 'ট্র্যাম্পকার্ড' হিসেবে ব্যবহারের বিষয়টি বিবেচনা করছেন কিনা। ইয়াহিয়া খান ইঙ্গিত দেন এটা তার বিবেচনার ভিতরে আছে কিন্তু তার অসুবিধাটা হচ্ছে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে যে সমস্ত দেশদ্রোহীমূলক কর্মকাণ্ড আছে তা প্রকাশিত হয়ে পড়লে পশ্চিম পাকিস্তানে এমন ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটবে যে তার প্রতিক্রিয়ায় মুজিবের মুক্তি অসম্ভব করে তুলবে।[২০]

বিচার প্রক্রিয়া

২২শে সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের তথ্য মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র বলেন যে, এখনো শেখ মুজিবের বিচার কাজ চলছে। শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে এটাই হলো প্রথম সরকারি মন্তব্য। তিনি বলেছেন, বিচার কাজ চলছে ব্রিটিশ কোর্টের কার্যবিধি অনুযায়ী। সে জন্য বিচারকার্য প্রক্রিয়াগত করণে মুলতুবি হচ্ছে। মুখপাত্র বলেন যে, বিচার কোনো পর্যায়ে রয়েছে তা তিনি বলতে পারছেন না। বিচারের স্থান সম্পর্কে জানা যায়নি। কিন্তু পশ্চিম পাঞ্জাবের লয়ালপুরে আগস্ট থেকে বিশেষ নিরাপত্তা ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে।

২৮শে সেপ্টেম্বর প্রধান সামরিক আইন প্রশাসণের প্রেস নোটে বলা হয়, "পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা ও ঘোষণার জন্য পাকিস্তানের প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক শেখ মুজিবের গোপন বিচারের জন্য বিশেষ মিলিটারি কোর্ট গঠন করেছেন। ১১ই আগস্ট ১৯৭১ থেকে বিচার আরম্ভ হয়। কোর্ট ঐ দিনই মুলতুবি হয়, যাতে শেখ মুজিবের বিচার সুষ্ঠু ও আইনানুগ হতে পারে; যে ক্ষেত্রে শেখ মুজিব স্ব-ইচ্ছায় পছন্দ মতো ডিফেন্স কাউন্সিল নিয়োগ করতে পারেন। ৭ই সেপ্টেম্বর এ. কে. ব্রোহী এবং তিনজন সহকারী মোহাম্মদ গোলাম আলী মেনন, আকবর মীর্জা এবং গোলাম হোসেনকে নিয়োগ দেওয়া হয় এবং সাক্ষীগণের জেরা শুরু হয়। প্রসিকিউশন ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ২০জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করে যার দ্বারা শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে রজু করা অভিযোগ প্রমাণিত হয়। শেখ মুজিবের পক্ষে এ. কে. ব্রোহী আইনজীবী হিসেবে কাজ করেন। যথাসময়ে জনগণকে এই বিচার কার্য সম্পর্কে জানানো হবে এবং বিচার কার্যের কী অগ্রগতি হচ্ছে তাও জানানো হবে। জনসাধারণকে স্বীয় আগ্রহে এই বিচার কাজ সম্পর্কে কোনো প্রকার মন্তব্য, গুজব বা গোপনীয়তা ভঙ্গ না করার জন্য বিরত থাকতে বলা হয়; যাতে বিচার কাজ বা বিচার কার্যে ক্ষতি করতে না পারে।[২১] ঘোষণায় বলা হয়, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার অভিযোগে ৭ই সেপ্টেম্বর থেকে ক্যামেরা ট্রায়াল পুনরায় শুরু হয়েছে।

লায়ালপুর জেলে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার কার্যক্রম শুরু করা হয়। রাওয়ালপিন্ডি থেকে ২৪০ কি.মি. দক্ষিণ-পশ্চিমে পাঞ্জাবের শিল্পনগরী লায়ালপুর। ষোল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফুট উঁচু দেওয়াল দিয়ে ঘেরা লায়ালপুর সেন্ট্রাল জেল। লায়ালপুরের লাল ইটের আদালতভবনটি মূল কারাগারের লাগোয়া হলেও, বন্দিকে লম্বা সরু করিডোর দিয়ে আদালতে প্রবেশ করতে হতো। সেখানে ছিল চারটি ভারি লোহার দরজা। প্রতিটি দরজার পাশে সাব-মেশিনগান হাতে যুদ্ধপোশাক সজ্জিত সৈনিক দাঁড়িয়ে থাকতো। সারি-বাধা বেঞ্চ ও উঁচু প্ল্যাটফর্ম এবং পাকিস্তানি পতাকা সজ্জিত আদালতকক্ষে প্রবেশ করে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করতেন বিচারকার্য।[২২] বিচার সপ্তাহকাল ধরে চলে এবং প্রতিদিন বিকাল চারটা নাগাদ শেখ মুজিব সেলে ফিরে আসতেন। কখনো কখনো অভিযুক্তের পক্ষে নিয়োজিত কৌসুলিকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে দিতে হতো। তবে বন্দি প্রায় কখনোই কোনো কথা বলতেন না। একবার আদালতের কার্যক্রমের বিবরণী তাঁকে দেওয়া হলে তিনি এর ওপরে লেখেন, 'সব মিথ্যা।' আরেকবার লেখেন, "কাকে বলে রাষ্ট্রদ্রোহিতা? আমরা যে নির্যাতিত এটা মনে করাটা কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা?" আগস্টের শেষ সপ্তাহে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যে বিবৃতি দেন তাতে আর সন্দেহ ছিল না যে, এই বিচার ন্যায়য়ানুগ হবে না এবং বিচারের রায় পূর্বেই স্থির করে রেখেছে। আদালত কেবল স্থিরকৃত রায় পাঠ করে দেবে।[২৩]

তাঁর বিচার প্রহসনের সামরিক ও অসামরিক বিচারপতিরা সার্কিট হাউসে থাকতেন। স্থানীয় কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই সার্কিট হাউসটি অবস্থিত ছিল। বিচার প্রক্রিয়ার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের রাখবার জন্য বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কয়েকটি বাড়ি রিকুইজিশন করা হয়। জেলখানায় পাহারার দায়িত্ব ছিল সেনাবাহিনী। জেলখানায় ফটকের ২০০ গজের মধ্যে কোন সাংবাদিককে যেতে দেওয়া হতো না।[২৪]

ট্রায়ালের জন্য ১৯শে আগস্ট শেখ মুজিবকে স্পেশাল মিলিটারি ট্রাইবুনালের নিকট হাজির করা হয়। প্রিজাইডিং বিচারপতি ছিলেন একজন ব্রিগেডিয়ার। কোর্টের অন্যান্য সদস্যের মধ্যে দু'জন ছিলেন সামরিক অফিসার, একজন নেভাল অফিসার এবং পাঞ্জাব থেকে আগত একজন জেলা জজ। তাঁর বিরুদ্ধে ১২টি অভিযোগ উত্থাপন করা হয় যার মধ্যে ছয়টি ছিল মৃত্যুদণ্ডের। সবচেয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করা। যখন মুজিবকে তার ডিফেন্স কাউন্সিল সিলেক্ট করার জন্য বলা হয় তখন তিনি ড. কামাল হোসেনকে আইনজীবী হিসেবে নিয়োগের কথা বলেন। তাকে বলা হলো এটা সম্ভব নয়। তখন শেখ মুজিব এ.কে. ব্রোহীকে নির্বাচন করেন, তিনি ছিলেন সিনিয়র আইনজীবী এবং সংবিধানবিশেষজ্ঞ।

কিন্তু বিচারকার্যের এক পর্যায়ে রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক ২৬শে মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রদত্ত ভাষণে শেখ মুজিবের কার্যক্রম, অসহযোগ আন্দোলন থেকে হরতাল, নির্দেশ ইত্যাদিকে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কাজ বলে অভিযোগ উল্লেখিত হওয়ায় শেখ মুজিব এই ট্রায়ালে অংশগ্রহণে অস্বীকৃতি জানান এবং তার নিয়োজিত আইনজীবী ব্রোহীকে বিদায় করে দেন। কিন্তু বোর্ডের অনুরোধে ব্রোহী রাষ্ট্রপক্ষ হতে প্রতিনিধিত্ব করতে থাকেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিবের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, এটা বিচারের নামে প্রহসন চলছে যা হবে সাজানো মৃত্যুদণ্ড। তিনি নির্বিকার। একের পর এক সাক্ষীগণ আসছেন। পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংসের জন্য দায়ী করে সাক্ষ্য দিচ্ছেন। প্রসিকিউশন ১০৬ জনের সাক্ষ্যতালিকা ট্রাইবুনালে পেশ করেন, কিন্তু তার অর্ধেককে বোর্ডের সামনে উপস্থিত করা হয়নি। যারা কেবল সামরিক অফিসে বা পুলিশের নিকট জবানবন্দি দিয়েছিল কেবলমাত্র তাদেরই হাজির করা হয়। ব্রোহী কোর্টের নিকট আবেদন করেন যারা ক্র্যাকডাউনের পূর্বে ঢাকায় নেগোসিয়েশনে অংশগ্রহণ করেছিলেন কর্নেলিয়াস, পীরজাদা, এম.এম. আহমদ তাদের হাজির করা হোক। তাদের জেরা করার আবেদন জানান। তখন কোর্ট তাঁর আবেদন নাকচ করে দেয়।[২৫] অর্থাৎ বিচার প্রক্রিয়ার শেকড়ে যাবার ক্ষেত্র বন্ধ করে দেওয়া হয়।

শেখ মুজিবের বিচার প্রক্রিয়া প্রভাবান্বিত করার পাকিস্তান সরকারের অপচেষ্টা

যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আলোচনাকালে পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রক্রিয়া স্থগিত করেনি, তবে মাঝে মধ্যে মুলতুবি করেছে যা 'অধিকতর' সাক্ষ্য প্রমাণাদি সংগ্রহের স্বার্থে। বিচারিক কর্তৃপক্ষ নিয়োগ দিয়েছেন স্বয়ং প্রধান সামরিক প্রশাসক ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট। তিনি প্রকাশ্যে বিভিন্ন গণমাধ্যমে বন্দি শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে 'রাষ্ট্রদ্রোহিতা', 'প্রকাশ্য বিদ্রোহ' এবং 'রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহের' বিষয়গুলি ক্রমাগত উপস্থাপন করেন।[২৬] রেডিও অস্ট্রেলিয়া জানিয়েছিল যে, মুজিবকে গ্রেফতারের পর ২৬শে মার্চ রাত ০০১৮ প্রহরে ইয়াহিয়া খান ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় বলেছিলেন, "শেখকে মরতেই হবে।" এমনকি তথাকথিত বিচারানুষ্ঠানের আগেই তাঁকে চুপিসারে মারার ভাবনা তলিয়ে দেখছিলেন ইয়াহিয়া খান। তিনি ভালোভাবেই সচেতন ছিলেন যে, বিপজ্জনক পথ তিনি মাড়াচ্ছেন। সেই সঙ্গে বন্দির যে অচিরেই জীবনাবসান ঘটবে এই প্রত্যাশা চাপা রাখতেও তিনি সমর্থ ছিলেন না। ১৯৭১ সালের জুলাইতে তিনি বলেন, "বাঙালি নেতা পশ্চিম পাকিস্তানের এক কারাগারে সুস্থ ও জীবিত রয়েছেন। তবে আজকের পরে কাল শেখ মুজিবের জীবনে কী ঘটবে সেটা আমি হলফ করে বলতে পারবো না। তাঁর বিচার করা হবে এবং এর মানে এই নয় যে, আগামীকালই আমি তাঁকে গুলি করবো। তাঁর স্বাভাবিক মৃত্যুও ঘটতে পারে।" সামরিক আদালতে শেখ মুজিবের বিচার ও মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থা করার জন্য জেনারেলরা চাপ দিচ্ছেন। আমি সম্মত হয়েছি এবং খুব শিগগিরই বিচার অনুষ্ঠিত হবে।"[২৭] এসবই ছিল ন্যায় বিচারের প্রভাবান্বিত করার অপচেষ্টা। এ বিষয়ে আরো কতিপয় বক্তব্য, মন্তব্য উপস্থাপন করা যেতে পারে।

এসব প্রচারণা ছাড়াও বন্দি শেখ মুজিবের বিচার প্রভাবান্বিত করার লক্ষ্যে অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে এমন কথাও তিনি বলেছেন, যার অর্থ জনগণকে জানানো যে, শেখ মুজিব কী ভয়ঙ্কর দেশদ্রোহী!

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৪শে মে ১৯৭১ করাচিতে সাংবাদিক সম্মেলনে জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেন, ২৬শে মার্চ সামরিক বাহিনী অ্যাকশনে না গেলে তাদের গ্রেফতার করা হতো। প্রেসিডেন্ট বলেন, নিষিদ্ধ ঘোষিত আওয়ামী লীগ ও তার সহযোগীদের পরিকল্পনা ছিল চট্টগ্রাম বন্দর, ঢাকা বিমানবন্দর এবং তাকে ও তার সহকর্মীদের যারা ওখানে ছিলেন তাদের গ্রেফতার করা। তিনি বলেন, কিন্তু শেখ মুজিব ভুলে গিয়েছিল যে, সেনাবাহিনী অতি দ্রুত আঘাত হানতে এবং যাতায়াত করতে সক্ষম। প্রেসিডেন্ট বলেন, শেখ মুজিব দুটো অ্যাসেম্বলি, দুটো শাসনতন্ত্র এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রস্তাব করেছিলেন। শেখ মুজিব তার নিকট পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা দাবি করেছিলেন যাতে তিনি পূর্বাংশ আইনানুগভাবে পৃথক করতে পারেন। "যখন তিনি এ বিষয়ে সফল হলেন না তখন ভায়োলেন্সের মাধ্যমে দাবি আদায় করতে চেয়েছিলেন যা আমি প্রতিরোধ করি।"[২৮] এর সহজ অর্থ হলো, জনগণকে বুঝানো যে, শেখ মুজিব সশস্ত্র আক্রমণকারী, তিনি নন- যা ছিল একেবারেই উল্টো।

৯ই আগস্ট সরকারি প্রেসনোটে বলা হয়, তার বিচার হচ্ছে "পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য।"[২৯] ১লা সেপ্টেম্বর প্যারিসের লা ফিগারো পত্রিকায় প্রধান সামরিক প্রশাসক বলেন, 'শেখ মুজিব পাকিস্তানের জনগণের শত্রু।' বিশ্বস্ত সরকারি সূত্রে বলা হয়েছে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণায় যারা অযোগ্য ঘোষিত হয়েছে তার মধ্যে শেখ মুজিব অন্তর্ভুক্ত হননি। কেননা তার বিচার চলছে।[৩০]

সেপ্টেম্বর ১৯৭১। কো-অর্ডিনেটর অব ইউএস ডিজাস্টার রিলিফ ফর ইস্ট পাকিস্তান, মরিস জে. উইলিয়ামস রিপোর্টে বলেছেন, 'বিষয়টি যখন পুরোপুরি বিচার বিভাগের হাতে, তখন আশা করা যায় মুজিব সুবিচার পারেন,' এই মন্তব্য ইয়াহিয়ার। তিনি বর্ণনা করেছেন, মুজিবের জন্য যথেষ্ট সংখ্যক স্বাধীন আইনজীবী নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ইয়াহিয়া নিজে বিশ্বাস করেন মুজিব দোষী।[৩১] কিন্তু সত্য হলো প্রকৃত অর্থে বন্দি মুজিবের পক্ষে কোন আইনজীবীই ছিল না। ছিল রাষ্ট্রপক্ষের দিক থেকে।

২০শে অক্টোবর প্যারিসের লা মন্ডে পত্রিকার সাক্ষাৎকারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, "আমি একজন বিদ্রোহীর সঙ্গে কথা বলতে পারি না। তাকেই প্রমাণ করতে হবে তিনি নির্দোষ।"[৩২]

প্রধান সামরিক প্রশাসক ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের পক্ষ থেকে এই ধরনের বক্তব্য, মন্তব্য ও সাক্ষাৎকার ছিল প্রকৃত অর্থে বিচারকে প্রভাবান্বিত করার সক্রিয় প্রয়াস।

এই অবস্থায় বিচারের নামে প্রহসনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে শাস্তি দেওয়ার সংবাদে বিশ্বজনমত বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এর নিরসনে পাকিস্তানে জঙ্গিশাহী কূটনৈতিক মিশনগুলোকে নির্দেশ প্রদান করে। এমনকি বিশ্ব জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৩ই অক্টোবর জাতিসংঘে 'শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে' এ কথা অস্বীকার করে আগাশাহী একে অপপ্রচার হিসেবে উল্লেখ করেন।[৩৩]

পূর্ব পাকিস্তানে কী ঘটে চলেছে সেসবের কিছুই বন্দি মুজিব জানতেন না। তবে অনেক কিছু তিনি অনুমান করতে পারতেন। ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যদি পূর্ব পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দখলে নিয়ে আসতে পারে, আওয়ামী লীগ যদি আত্মসমর্পণ করে থাকে, তবে তাঁকে হত্যা করা হবে। জিম্মি হিসেবে যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কোনো কার্যকারিতা ইয়াহিয়া খানের কাছে থাকবে, তাঁকে ততক্ষণ বাঁচিয়ে রাখা হবে। কোনো সংবাদপত্র, বই বা রেডিও তাঁকে দেওয়া হয়নি। তাঁর যেটা একমাত্র বিলাসিতা সেই তামাক তাঁকে দেওয়া হয়েছিল। তিনি দিনের গণনা রাখতেন, পাঠ করতেন কোরান, তাকিয়ে থাকতেন ক্ষুদ্র এক খণ্ড আকাশের দিকে এবং নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন কারাগারের অবিচ্ছিন্ন নীরবতার কাছে।[৩৪]

২১শে অক্টোবর ১৯৭১। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ১৯শে অক্টোবর প্যারিসের 'লি'মন্ডে' পত্রিকার প্রথম পৃষ্ঠায় এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের সাথে কোনোরূপ আপোসের সম্ভাবনা আছে কিনা জিজ্ঞাসিত হলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার হচ্ছে। পাকিস্তানের সেরা আইনজীবী কর্তৃক তাঁর পক্ষ অবলম্বন এবং গোপনে বিচার অনুষ্ঠানের ব্যাপারে আমি সম্মতি দিয়েছি। দেশের অখণ্ডতা হুমকির সম্মুখীন হলে সেক্ষেত্রে এ ধরনের গোপনে বিচার অনুষ্ঠান অস্বাভাবিক নয়। বিচার অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলে এবং পরিস্থিতি অনুকূলে হলে তখন আমি এর সকল বিবরণী খুব শীঘ্রই প্রকাশ করবো। দেশের অখণ্ডতা বজায় রাখার উদ্দেশ্যে তাঁর এবং শেখ মুজিবুর রহমানের মধ্যে আলোচনা হয়েছে বলে গুজব শোনা যাচ্ছে, তা সত্য কিনা জিজ্ঞাসিত হলে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিচার অনুষ্ঠানের ভার প্রদত্ত হয়েছে সামরিক আদালতে; তিনি নির্দোষ প্রমাণিত না হলে আমি একজন বিদ্রোহীর সাথে পুনর্বার আলোচনা করবো না। সর্বোপরি, তিনি যে জাতীয় স্বার্থের বিরুদ্ধে কাজ করেন নি, তা প্রমাণ করার বিষয়টি তাঁর উপরই নির্ভর করছে।[৩৫]

সামরিক জান্তা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষ্যদানের জন্য ঢাকা হতে চারজন সাংবাদিক, বিশ্ববিদ্যালয়ের চারজন শিক্ষক ও দুইজন ব্যাংক কর্মকর্তা এবং কয়েকজন বাঙালি সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তা কর্মচারীদের পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যায়। সেখানে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রদানের জন্য তাদের তালিম দেওয়া হয়।[৩৬]

দক্ষিণ এশিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তির প্রয়োজনীয়তা এবং আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক যোগাযোগ

বঙ্গবন্ধুকে বন্দি করার খবর প্রকাশিত হওয়ার পর থেকেই বিশ্বনেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করেন যে, বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, বিশেষকরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ শুরু হওয়ার ফলে উপমহাদেশে যে রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টি হয়েছে তার সুষ্ঠু সমাধানের জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি পাওয়া আবশ্যক। শেখ মুজিবকে বন্দি করে রেখে মুজিবনগর সরকার তথা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সংগে আলোচনা করা হবে নিষ্ফল প্রচেষ্টা। শেখ মুজিব বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা। তিনি বন্দি থাকলেও মুজিবনগর সরকারের তিনিই ছিলেন রাষ্ট্রপতি। তাঁর নামেই মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হচ্ছিল। সুতরাং তাঁকে ছাড়া, কিংবা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনো আলোচনাই সফল হওয়া সম্ভব ছিল না। বিশ্বনেতৃবৃন্দের বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগে এ সত্যটি প্রকাশ পায়।

৩রা এপ্রিল হেনরি কিসিঞ্জার শেখ মুজিবের বিচারকে জিঘাংসামূলক আচরণ উল্লেখ করে বলেন এটা হচ্ছে এমন একটি মানুষের বিরুদ্ধে যিনি বেপোরোয়া। ৫৮জন কংগ্রেস প্রতিনিধি ও ১১জন সিনেটর শেখ মুজিবের বিচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম রজার্স পাকিস্তান রাষ্ট্রদূতকে তাদের উদ্বেগের কথা জানান। কিন্তু নিক্সন রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের উপরে গুরুতর চাপ সৃষ্টির বিষয়ে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন।[৩৭]

২২শে মে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে আলোচনার পর স্টেট ডিপার্টমেন্টকে প্রেরিত টেলিগ্রামে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানে শান্তিপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতা প্রয়োজন, যার মাধ্যমে পুনর্বাসন, পুনঃনির্মাণ এবং অর্থনৈতিক উন্নয়ন সাধন সম্ভব। কিন্তু এটা করতে গেলে ভয়ভীতি ও সন্ত্রাসের পরিবর্তে আস্থা ও বিশ্বাস স্থাপন করা জরুরি। তাঁর জন্য শেখ মুজিবের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করা হচ্ছে এ বিষয়টি সম্পর্কিত। শেখ মুজিবের অবর্তমানে 'পলিটিক্যাল অ্যাকোমডেশন' সম্ভব নয় বলে ফারল্যান্ড মত প্রকাশ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, শেখ মুজিব ব্যতীত অধিকাংশ আওয়ামী লীগ নেতা রাজনৈতিক সমঝোতায় অসম্মতি জানাবে। তাছাড়া শেখ মুজিবের প্রতি রয়েছে ব্যাপক মাত্রায় আন্তর্জাতিক সহানুভূতি। সুতরাং তাঁকে দণ্ড দেওয়ার মতো একটি বিষয় বিবেচনার ক্ষেত্রে পাকিস্তানের উচিত হবে বিশ্ব জনমতকে গুরুত্ব দেওয়া।

৩রা জুন ভারতের রাষ্ট্রদূত ও হেনরি কিসিঞ্জার-এর মধ্যে আলোচনার সূত্র ধরে প্রণীত রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর রির্পোট থেকে জানা যায়, পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়ার ক্ষেত্রে তিনটি শর্ত আরোপ করা যেতে পারে: ১. পূর্ব পাকিস্তানে হত্যাকাণ্ড বন্ধ করা; ২. শরণার্থীদের ভারতে আগমন বন্ধ করা; এবং ৩. রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়া। রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার জন্য প্রয়োজন শেখ মুজিবের মুক্তি। কিসিঞ্জার একথা বিশ্বাস করতেন যে, পশ্চিম পাকিস্তানিরা শেখ মুজিবের বিষয়ে অনমনীয় কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে তিনি হলেন দেবতাতুল্য। এছাড়াও আরোও দুটি কারণ রয়েছে, প্রথমত, শেখ মুজিব ভারতের সঙ্গে সৎপ্রতিবেশীমূলক সুসম্পর্ক গড়ে তুলতে আগ্রহী। দ্বিতীয়ত, ভারত পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার মধ্যে গভীর সম্পর্ক নিয়ে উদ্বিগ্ন।[৩৮] এসব প্রশ্নে মীমাংসার সূত্রধর হিসেবে শেখ মুজিবের ভূমিকা যে প্রয়োজন তা সকলে উপলব্ধি করেন। ১৪ই জুন দু'জন কর্মকর্তা কিসিঞ্জারকে ধারণা দেন যে, ভারতীয়রা আশা করে, পূর্ব পাকিস্তানে সরকার গঠনে ইয়াহিয়ার উচিত হবে মুজিবকে মুক্তি দেওয়া। মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব পাকিস্তানের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে উদ্বাস্তু প্রত্যাগমনে বিদ্যুৎ গতির প্রভাব পড়বে।[৩৯]

১৭ই জুন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব দি স্টেট উইলিয়াম রজার্স-এর সঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনার এক পর্যায়ে শরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিং এ অভিমত ব্যক্ত করেন যে, শেখ মুজিব কর্তৃক ৬ দফাভিত্তিক নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়, শাসনতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মধ্যে আওয়ামী লীগের পরিচালিত কার্যক্রম এবং স্বায়ত্তশাসনের দাবিকে 'বিচ্ছিন্নতাবাদী' অভিহিত করে ইয়াহিয়া খানের সামরিক অভিযান পরিচালনা বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব করেছে। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সংকট রাজনৈতিকভাবে সমাধান সম্ভব যদি বিশ্বাস পুনরুদ্ধার করা যায়। এর জন্য প্রয়োজন আওয়ামী লীগের ভেতরে বিভক্তি না এনে শেখ মুজিবের প্রতিনিধিত্বে একটি পদ্ধতির দিকে অগ্রসর হওয়া।[৪০]

উক্ত বৈঠকে শরণ সিং রাজনৈতিক সমাধানের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি মন্তব্য করেন যে, ভারত মনে করে যে, একটি সমাধানে পৌঁছাতে পাকিস্তানের ওপর প্রয়োজনীয় প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থ রয়েছে। কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স বলেন, এটা যুক্তরাষ্ট্রের সমস্যা নয়, সুতরাং সমাধানের আশায় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে থাকা ভারতের এক ভ্রান্তি। আলোচনায় উপস্থিত সিসকো ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সংলাপ শুরুর তাগিদ দেন। তিনি বলেন, গেরিলাদের মধ্যে উগ্রপন্থিদের প্রভাবশালী হওয়ার ব্যাপারে ভারতের উদ্বেগ যথার্থ। একই বৈঠকে সিসকো প্রশ্ন রাখেন, মুজিবকে বাদ দিয়ে এ ধরনের একটি আলোচনা করা সম্ভব হলে, তা কি যৌথভাবে ভারত, পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ রক্ষা করবে না? শরণ সিং এর জবাব ছিল, আওয়ামী লীগের শীর্ষস্থানীয় নেতাদের বাদ দিয়ে আলোচনা শুরুর পরিবেশ সৃষ্টি করতে মুজিব গুরুত্বপূর্ণ। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কাউল সে সময় মি. সিসকোকে বলেন, ভারত সরকার যদি এ মর্মে নিশ্চয়তা পায় যে মুজিবের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছে এবং মুজিব কোনো প্রকারের চাপ ছাড়াই ইয়াহিয়ার সঙ্গে সমঝোতার জন্য একজনকে নিয়োগ করেছেন, তাহলে তেমন উদ্যোগের প্রতি ভারত তার সতর্ক সমর্থন ব্যক্ত করবে কী না।[৪১]

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স-এর সঙ্গে আলোচনার পর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে ২১শে জুন এক বৈঠকে মিলিত হন। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বারবারই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে তাগিদ দিয়ে যাচ্ছেন। উক্ত আলোচনায় শরণ সিং বলেন যে, রাজনৈতিক সমাধান পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দুদের মন থেকেও ভয় দূর করতে সক্ষম হবে। শরণ সিং আরও বলেন যে, ভারত মনে করে যে, কেবল পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধিত্বকারীরাই হিন্দু জনগোষ্ঠীর মনে এই আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে দিতে সক্ষম। কিন্তু পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সামরিক শক্তি প্রয়োগ বাঙালির মনকে বিষিয়ে দিয়েছে। সামরিক শক্তি প্রয়োগ করে এই সমস্যার সমাধান হতে পারে না এবং আওয়ামী লীগের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছানো আবশ্যক।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী জানতে চান, পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের অবস্থান কি আগের মতোই শক্ত রয়েছে? শরণ সিং বলেন, এটা শুধু আগের মতো শক্তিশালীই নয় বরং আগের চেয়েও শক্তিশালী হয়েছে। মুজিবের সঙ্গে জনগণের কখনই বিচ্ছিন্নতা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জন্মায়নি, কারণ তাঁর লক্ষ্যে পৌঁছানোর কোনো সুযোগ কখনও তাঁকে দেওয়া হয়নি, ফলে জনসম্পৃক্ততা কখনওই কমেনি বা থেমে যায়নি। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের লোকজন সম্পর্কে অপর এক প্রশ্নের উত্তরে শরণ সিং বলেন, এখানে কয়েকজন ভালো নেতা রয়েছেন সন্দেহ নেই, কিন্তু মুজিবের প্রয়োজন অপরিসীম এবং তার সঙ্গে কথা বলা এখন খুব প্রয়োজনীয়। শরণ সিং একথা দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করেন যে, ভারত সরকার একজন ব্যক্তি হিসেবে মুজিবের জন্য উদ্বিগ্ন নয়, বরং সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের জন্যই মুজিবের একান্ত প্রয়োজন বলে ভারত মনে করে।[৪২]

২৮শে জুন পাকিস্তান সফররত মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উদ্বাস্তু ও অভিবাসন-বিষয়ক বিশেষ সহকারী এল. কিলগকে ইয়াহিয়া খান বলেন, ইন্দিরা গান্ধী মুজিবের সঙ্গে গোপন আঁতাতের মাধ্যমে বর্তমান সংকটের সৃষ্টি করেছেন। তাই তিনি বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানকে এড়িয়ে ভারতের সঙ্গে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব দেন। সেই সময় যুক্তরাষ্ট্র প্রকাশ্যে শেখ মুজিবের মুক্তি এবং মুজিবনগর সরকার সম্পর্কে একটি কৌশলগত অপ্রকাশ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। তার প্রমাণ পাওয়া যায় শেখ মুজিবের মুক্তি ও মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নে। মুজিবনগর সরকার কর্তৃক স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত দুটি পত্র বার্লিন পোস্টঅফিস থেকে ২৬শে মে ও ২২শে জুলাই প্রেরণ করা হয়েছিল। এ সম্পর্কে স্টেট ডিপার্টমেন্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, এক. এই পত্রের স্বীকৃতি তারা দেবে না, তবে তা; দুই. রেকর্ড রুমে সংরক্ষিত করা হবে; তিন. জিজ্ঞাসিত হলে বলা হবে বাংলাদেশের স্বীকৃতি ব্যাপারে তারা কোনো অনুরোধ পাননি; চার. বলা হবে বার্লিন থেকে যে পত্র পাওয়া গেছে তা কোনো ঠিকানায় উত্তর দেওয়া হবে তা লেখা হয়নি; এবং পাঁচ. আমরা মনে করি পূর্ব পাকিস্তান অখণ্ড পাকিস্তানের অংশ।[৪৩] কূটনীতির ক্ষেত্রে এরকম কৌশলগত নীরবতা ও পথচলা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নতুন কিছু নয়।

৭ই জুলাই নয়াদিল্লিতে হেনরি কিসিঞ্জার ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানে শেখ মুজিবকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে কী না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান বিষয়টি সমাধান করবে, এটা ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা নয়, ভারত শরণার্থী সমস্যা ব্যতীত জড়িত নয়।[৪৪] কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর এই উক্তি ছিল ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত। এর কোনো সরলার্থ না থাকলে এটা বুঝতে কারো অসুবিধা হয়নি যে, বাংলাদেশের সমস্যা সমাধানে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে। পরবর্তী যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা সেদিকেই ধাবিত হয়েছে।

১২ই জুলাই ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল প্রণীত পর্যালোচনামূলক এক দলিলে উল্লেখ করা হয় যে, যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়াকে এটা স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, আওয়ামী লীগই পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র দল, যার জনপ্রিয় ভিত্তি রয়েছে এবং মুজিবই একমাত্র গ্রহণযোগ্য নেতা যিনি রাজনৈতিক সমঝোতায় বাঙালিদের রাজি করাতে সক্ষম।[৪৫]

২৩শে জুলাই কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাতে স্টেট ডিপার্টমেন্ট, ডিফেন্স, জেসিএস, সিআইএ, এইড গ্রুপ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অন্যান্য সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ আলোচনার এক পর্যায়ে কিসিঞ্জার তার নিজস্ব অভিমত প্রকাশ করেন। তার অভিমত হলো, ইয়াহিয়া ও তার গ্রুপ কখনো জয়লাভ করতে পারবে না এবং সূক্ষ্মভাবে রাজনৈতিক সমন্বয় করতে অসমর্থ। তারা অনুগত এবং গোয়ার সৈনিক। তাদের প্রকৃত বুদ্ধিজাত সমস্যা এই যে, পূর্ব পাকিস্তান কেন পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে থাকতে চায় না, তারা এটা বুঝতে অক্ষম। যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া খানকে আওয়ামী লীগের দিকে ঠেলে দিতে পারে না। কিসিঞ্জার বলেন, এই মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যা বলতে পারে তা হলো শেখ মুজিবের বিচার যেন না হয়। যা পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত হিলালীর নিকট ব্যক্ত করা হয়েছে।[৪৬] এই সভার পর (২৩শে জুলাই) ওয়াশিংটনে সিনিয়র এক কর্মকর্তা[৪৭] উল্লেখ করেন যে, মুজিবের যাতে বিচার না হয়, সে ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের করণীয় দিকগুলো খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই সূত্র ধরে ১১ই আগস্ট হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সভায় আলোচনা কালে যোশেফ সিসকো বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বলতে পারে, শেখ মুজিবকে যেন বধ না করা হয়।[৪৮]

১১ই আগস্ট নিক্সনের সভাপতিত্বে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের বৈঠকে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী সিসকো অভিমত দেন যে, কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমাধানে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের যে কোনো ব্লু-প্রিন্ট নেই তা জানিয়ে রাখা সম্ভব। তবে একটা সুপারিশ রাখা যেতে পারে যে, পাকিস্তানিরা যেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার দায়ে বিচারাধীন আওয়ামী লীগ নেতা মুজিবুর রহমানের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর না করে। নিক্সনের মন্তব্য ছিল, "যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য বন্ধ করেনি। ইয়াহিয়ার সঙ্গেও রয়েছে ব্যক্তিগত সুসম্পর্ক। সুতরাং তিনি যদি পুরোপুরি ফাঁদে না পড়েন তাহলে এ কথায় তিনি হয়তো সায় দেবেন।" ইয়াহিয়া খান মনে করেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড তার বন্ধু। 'মুজিবকে হত্যা করো না'—এমন সুপারিশ ইয়াহিয়ার কাছে ফারল্যান্ড রাখতে পারেন। নিক্সন আরো মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে, রাজনৈতিক সমঝোতা প্রশ্নে জনসমক্ষে নিরপেক্ষ অবস্থান বজায় রাখা। তবে ঘরোয়াভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বলা যেতে পারে, মুজিবকে হত্যা করা তাঁর উচিত হবে না।

১২ই আগস্ট পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত পামফ্রে ইসলামাবাদ থেকে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডগলাস হিউম বরাবর একটি টেলিগ্রাম পাঠান। টেলিগ্রামে বলা হয়েছে : এক, শেখ মুজিবকে রক্ষার জন্য অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে ও সঠিক ব্যক্তির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক চাপ ফলপ্রসূ করতে হবে; দুই, কোনো তৃতীয় দেশের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের মিলিত চাপ ফলপ্রসূ হতে পারে। এক্ষেত্রে তৃতীয় দেশ হিসেবে ইরানকে প্রথম পছন্দ হিসেবে বেছে নেওয়া যায়, কারণ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এখনও পর্যন্ত শাহ্-র কথা শুনতে রাজি, যদিও ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের বিরোধের ব্যাপারে শাহ্-এর মধ্যস্থতা ব্যর্থ হয়েছে। তুরস্ককেও একটি সম্ভাব্য দেশ হিসেবে ধরা যেতে পারে, একই কথা প্রযোজ্য মালয়েশিয়া এবং কয়েকটি প্রধান আরব রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও। আবুধাবির শেখ জাঈদ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার ঘনিষ্ঠ ব্যক্তি। যদিও 'রাষ্ট্রদ্রোহী'র শাস্তির ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মনে সন্দেহের সৃষ্টি করতে পারে যে উ থান্ট-এর উদ্যোগ ভারত কর্তৃক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রভাবিত। তাই উ/থান্টের এমন কিছুই করা উচিত হবে না, যাতে মনে হতে পারে ভারতের চাপ তাকে তাড়া করছে; এবং তিন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর ব্রিটেনে পাকিস্তানের বন্ধু হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিবর্গ যেমন নেভিল ম্যাক্সওয়েল, জিল নাইট এবং প্রফেসর রাশব্রুক উইলিয়ামের মতো ব্যক্তিবর্গের চাপও এই মুহূর্তে কাজে আসতে পারে, তবে এটা যে ব্যক্তিগত অর্থাৎ এর পেছনে যে কোনও সম্মিলিত উদ্যোগ নেই, সেটা নিশ্চিত করতে হবে এবং এটাও যাতে মনে না হয় যে, এসব ব্যক্তিবর্গ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তানের সামরিক ট্রাইবুনালে ক্যামেরা ট্র্যায়ালের সম্মুখীন করা হচ্ছে এই খবর প্রকাশ হওয়া মাত্র সোভিয়েত সরকার উদ্বেগ প্রকাশ করে। খবরটি ১৩ আগস্ট প্রাভদায় প্রকাশিত হয়।

১৭ই আগস্ট ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এক কর্মকর্তার বক্তব্যে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে দুর্ভিক্ষাবস্থা বিরাজ করছে, যার ফলে ভারতে আরো শরণার্থীদের ঢেউ এসে লাগবে। পলিটিক্যাল অকোমোডেশনে ব্যর্থ হলে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা করা হলে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। ভারত সীমান্তে সামরিক সংঘর্ষ, দুর্ভিক্ষ অথবা শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে সবদিক থেকেই বিপদ ঘনীভূত হবে। উক্ত বৈঠকে উক্ত কর্মকর্তা[৪৯] উল্লেখ করেন যে, মুজিবকে ফাঁসিতে ঝোলানো হলে তা পরিস্থিতিতে বিরাট পরিবর্তন বয়ে আনতে পারে। তিনি বলেন যে, "মুজিবের মৃত্যুদণ্ড কার্যকর হলে যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে উঠবে।"

সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র সে নীতি গ্রহণ করে তা হলো, ভারতকে পাকিস্তান আক্রমণ করা থেকে নিবৃত্ত রাখা, দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তাঁর কার্যকর ব্যবস্থা নিতে জাতিসংঘকে কাজে লাগনো।[৫০]

২০শে আগস্ট পাকিস্তান দূতাবাস থেকে স্টেট ডিপার্টমেন্টে প্রেরিত টেলিগ্রামের বিষয়বস্তু ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কিত। ফারল্যান্ডের ধারণা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার সঙ্গে একাকী কথা বলতে সাচ্ছন্দ্যবোধ করেন। ১৯শে আগস্ট ফারল্যান্ড ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেন।/রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড স্পষ্টভাবে বুঝেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের 'নিশ্চিতভাবে এবং নির্দিষ্টভাবে' মানবিক ও অর্থনৈতিক সার্বিক সাহায্য ইয়াহিয়া খানকে প্রভাবিত করবে। তিনি ইয়াহিয়াকে বলেন, বিশ্বের সব না হলেও অধিকাংশ জাতি অধীর আগ্রহে এবং উদ্বেগের সঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার প্রক্রিয়ার দিকে নজর রাখছে। আর সবাই না হলেও তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই সেই বিচারের ফলাফল সম্পর্কে একটা ধারণা পোষণ করছে এবং তারা সে কারণে উদ্বিগ্ন।

ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে আশ্বস্ত করেন এই বলে যে, "আমি কারো মৃত্যুদণ্ড নিশ্চিত করতে যাচ্ছি না, যদিও তিনি একজন 'বিশ্বাসঘাতক' হয়েও থাকেন।"[৫১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩১শে আগস্ট মুজিবের বিচার প্রশ্নে আরেকটি নির্দিষ্ট টেলিগ্রাম স্টেট ডিপার্টমেন্ট থেকে ভারতীয় মার্কিন দূতাবাসে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয়, 'ভারতীয়রা যেহেতু মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে লিখিত কোনো উত্তর চাইতে পারে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রদূত কিটিং মার্কিন প্রেসিডেন্টের পক্ষে পররাষ্ট্রসচিব কাউলকে মৌখিক বক্তব্য জানিয়ে দিতে পারেন। মার্কিন রাষ্ট্রদূত এক্ষেত্রে নিম্নোক্ত নির্দেশনা অনুসরণ করবেন: এক, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে প্রেরিত বার্তা গ্রহণ করেছেন এবং যত্নের সঙ্গে তা বিবেচনায় নিয়েছেন; দুই, মুজিবের বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের গভীর আগ্রহ রয়েছে; তিন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স মুজিবের সংক্ষিপ্ত বিচার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্রের উদ্বেগ পাকিস্তানকে জানিয়ে দিয়েছেন; এবং চার, ভবিষ্যতের যে কোনো উপযুক্ত সুযোগ উপলক্ষ্যে এই উদ্বেগ জানানো অব্যাহত থাকবে, এটা শুধু মানবিক কারণে নয়, কারণ যুক্তরাষ্ট্র বিশ্বাস করে যে, মুজিবের বিচার এবং তাঁর সম্ভাব্য মৃত্যুদণ্ড দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তর শান্তি ও স্থিতিশীলতার প্রশ্নে গুরুত্বপূর্ণ।[৫২]

যুক্তরাষ্ট্রের এই কৌশলগত অবস্থান ক্রমাগতভাবে অগ্রসর হয়। বিভিন্ন মিটিং-এ তা স্পষ্টতর হতে থাকে। ৮ই সেপ্টেম্বর হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এই মর্মে সিনেটর কেনেডি কর্তৃক উত্থাপিত প্রশ্নের প্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার বলেন, আমি চিন্তাও করতে পারি না শেখ মুজিব মৃত। এইড গ্রুপের উইলিয়াম বলেন, সম্ভবত মাত্র ১৬জন আওয়ামী লীগ এম. এন. এ. ঢাকা আছেন। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ তাঁর জিজ্ঞাসার উত্তরে বলেছেন, মুজিবের বিচার হবে। তাঁর মৃত্যুর আশঙ্কা রয়েছে এবং পূর্ব পাকিস্তানের গেরিলা আক্রমণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিসকো বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতায় যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় রাখার চেষ্টা করছে। যুক্তরাষ্ট্র যে গোপনে বাংলাদেশের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের অনুরোধে আলোচনা করছে এ ব্যাপারে ইয়াহিয়া খান যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করেছে। ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের বৈঠকে কিসিঞ্জার হঠাৎ প্রসঙ্গ ঘুরিয়ে বলেন, সিনেটর কেনেডি আজ তার সঙ্গে দেখা করেন। তার আশঙ্কা মুজিবকে সম্ভবত ইতোমধ্যেই মেরে ফেলা হয়েছে। তাদের কী মনে হয় এটা সম্ভব? মার্কিন কর্মকর্তাগণ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের কথা উল্লেখ করে বলেন, তাদের বলা হয়েছে বিচার চলছে, আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে অথচ তাঁকে ফাঁসি দেওয়া হয়েছে, এটা কী করে হয়। তা যদি হয় তা হলে নিশ্চিত করে বলা যায়, "মৃত মুজিবের চেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জীবিত মুজিবের অনেক মূল্য।"[৫৩]

২১শে সেপ্টেম্বর ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে বঙ্গবন্ধু মুজিবের বিচার প্রশ্নে মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড আবারও কথা বলেন। ফারল্যান্ড সংবাদপত্রের রিপোর্টের বরাত দিয়ে জানতে চান যে, মুজিবের বিচার শেষ হয়েছে কিনা? ট্রাইবুনাল কি ইয়াহিয়ার কাছে সুপারিশ পেশ করেছে? ইয়াহিয়া জবাব দিয়েছেন, বিচার চলছে। তবে তার ইচ্ছা রয়েছে, এই বিচারের পূর্ণ বিবরণ তিনি জনসমক্ষে প্রকাশ করবেন, যাতে মানুষ বুঝতে পারে বিচার অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে। ফারল্যান্ড জানতে চান, বিচারের পরেও পূর্ব পাকিস্তানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য তিনি কি মুজিবকে 'ট্রাম্পকার্ড' হিসেবে আগের মতোই গণ্য করার কথা বিবেচনায় রেখেছেন? ইয়াহিয়া ইঙ্গিত দেন, এই সম্ভাবনার বিষয়ে তার ভাবনার অবকাশ আছে। তবে তিনি এ কথা উল্লেখ করেন যে, মুজিবের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহিতার সাক্ষ্য-প্রমাণ এতই অকাট্য যে, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হলে পশ্চিম পাকিস্তানে তার প্রতিক্রিয়া হতে পারে ভয়ানক।

২রা অক্টোবর, ১৯৭১ মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্স ও ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠকের বিবরণ সম্বলিত এক তরিৎ বার্তায় ইসলামাবাদ, নয়াদিল্লি ও কলকাতার মার্কিন মিশনে প্রেরণ করা হয়। এতে বলা হয়, তাদের ফর্মুলা ছিল শেখ মুজিবুর রহমানের অনুমতি নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় কোনো সমঝোতা হতে পারে কিনা; দুই, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠককালে সহকারী পররাষ্ট্রমন্ত্রী জোসেফ সিসকো ২৭ সেপ্টেম্বর এল.কে. ঝায়ের সঙ্গে আলোচনাকালে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের বৈঠক অনুষ্ঠানকে উৎসাহিত করতে ভারতের সহযোগিতা কামনা করেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং মন্তব্য করেন, বাংলাদেশের ওপর ভারত সরকারের কোনো প্রভাব নেই। তাদের রয়েছে তহবিল সংগ্রহের স্বাধীন উৎস। ভারত কেন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে ব্যর্থ হচ্ছে, সে কারণে বাংলাদেশ নাখোশ। কিন্তু, এর অর্থ এই নয় যে, ভারত সংলাপ চায় না। রজার্স ভারতকে সংলাপের উদ্যোগ নিতে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান। তবে শর্ত দেন যে, ভারত যেন মুজিবের অংশগ্রহণ প্রশ্নে চাপ সৃষ্টি না করে। কারণ, যুক্তরাষ্ট্র কীভাবে একটা সমঝোতায় পৌঁছানো যায় সে নিয়ে আলোচনায় মুজিবকে জড়াতে চায় না। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপসংহার টানেন এই বলে যে, বাংলাদেশ প্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র সম্ভব সব কিছুই করবে।

২রা অক্টোবর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ও যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি রজার্সের ভিতরে এক আলোচনায় দুই নেতাই একমত হন যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিরসনে নিচুপর্যায়ে যে আলোচনা হোক না কেন তাতে কিছু আসে যায় না। মুজিব ব্যতীত কোনো কিছুরই গুরুত্ব নেই।[৫৪]

৭ই অক্টোবর স্টেট ডিপার্টমেন্ট প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের গৃহীত রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে পর্যালোচনা করে। পর্যালোচনায় দেখা যায়, তখন পর্যন্ত ইয়াহিয়া খান কলকাতায় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বের সঙ্গে সমঝোতার বিষয়টি বাইরে রেখেছেন। রাজনৈতিক পর্যালোচনায় বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের আলোচনা শুরু করার পদক্ষেপ গ্রহণ করতে উৎসাহিত করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে, ইয়াহিয়া খান সবসময় হোচট খেয়েছেন এই ভেবে যে বাংলাদেশ নেতৃত্ব আলোচনায় শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে শর্ত হিসেবে জুড়ে দিয়েছে।[৫৫] ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট মনে করে, ভারত বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে একটি সংলাপের ব্যাপারে তাদের প্রভাব খাটাতে তখনই রাজি থাকবে যখন তারা বুঝতে পারবে ইয়াহিয়ার ওপর প্রভাব খাটাতে যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তুত রয়েছে। বলা বাহুল্য, এর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরল অর্থ হচ্ছে যুদ্ধ শুরু হলে 'সিজ্-ফায়ার'-কার্যকর করার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগী হবে।

৭ই অক্টোবর হেনরি কিসিঞ্জারের সভাপতিত্বে ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপ মিটিং-এর এক সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইউ. এ. জনসন বলেন, বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যোগাযোগ রেখেছে এবং বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আলোচনা এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে উৎসাহ প্রদান করে যাচ্ছে। কিন্তু বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জোরাজুরি করা হচ্ছে অবিলম্বে নিঃশর্তভাবে শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বীকৃতি। কিসিঞ্জারের জিজ্ঞাসা ছিল এটি কি তাদের প্রারম্ভিক কথা? জনসনের মন্তব্য হলো, হ্যাঁ এটা তাদের প্রথামিক অবস্থান, কিন্তু মূল চাবিকাঠি শেখ মুজিবুর রহমান। ইয়াহিয়া খান যদি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেন এবং তার সাথে আলোচনায় বসেন তাহলে রাজনৈতিক সমঝোতার সুযোগ সৃষ্টি হবে। ইয়াহিয়া খান সে সময় নেতিবাচক মনোভাব দেখাননি। এ থেকে ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাকিস্তান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে আলোচনা করতে চায়। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতের সঙ্গে আলোচনায় তার অভিমত হলো তারা পাকিস্তানকে শক্তভাবে আঘাত করতে চায় যাতে সব সমস্যা সমাধান হয়। তিনি বলেন, ভারত যদি যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতা করে এবং উভয়ে যদি একসঙ্গে কাজ করে তাহলে শেখ মুজিবের মুক্তিসহ বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন সবকিছুই শতকরা ৯০ ভাগ অর্জন করা সম্ভব।[৫৬]

৭ই অক্টোবর স্পেশাল গ্রুপের উক্ত বৈঠকে সিআইএ পরিচালক সভাকে অবগত করে যে, দেশদ্রোহিতার অভিযোগে মুজিবুর রহমানের গোপন বিচার পূর্ব পাকিস্তানকে বিক্ষুব্ধ করেছে। এমতাবস্থায় মুজিবের মুক্তিই এখনো সমঝোতার চাবি। ইয়াহিয়া যদি তাকে 'মুক্তি দেন' এবং তার সঙ্গেই যদি একটা 'আপোষে আসেন', তা হলে সমঝোতা সম্ভব।"[৫৭]

৮ই অক্টোবর ভারতের রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা-এর সঙ্গে হেনরি কিসিঞ্জারের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। মিঃ ঝা হেনরি কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেন তার এমন অবস্থান রয়েছে কিনা যেখান থেকে তিনি শেখ মুজিবের মুক্তি এবং বাংলাদেশের রাজনৈতিক কার্যক্রম পুনরায় শুরু করার বিষয়টি পাকিস্তানের নিকট আবেদন করতে পারেন কিনা। ঝা তাকে বলেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম দিনে দিনে বাম দিকে ঝুঁকে যাচ্ছে, কলকাতায় ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর উপর হামলা হয়েছে এবং যতই দিন যাবে তা উগ্রপন্থিদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্র উন্মুক্ত করবে। কিসিঞ্জার সম্মতি দিয়ে বলেন, এটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এবং এ বিষয়ে সম্ভাব্য সমঝোতা হওয়া উচিৎ কিন্তু একতরফাভাবে কিছু না করার জন্য সতর্ক করে দেন।[৫৮]

২২শে অক্টোবর ভারত পাকিস্তান অবস্থা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রণীত এক প্রতিবেদনে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান অবহেলিত হওয়ার কারণে ভারত-পাকিস্তান উত্তপ্ত হয়ে উঠছে। যুক্তরাষ্ট্র রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে পরামর্শ দিয়েছে অবিলম্বে ইয়াহিয়া খানকে একটি সমাধানে উপনীত হতে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান যেহেতু বাংলাদেশ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনায় সম্মত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আছেন সেজন্য পূর্বে নির্বাচিত পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় উদ্যোগী হতে পারেন। বাংলাদেশ প্রতিনিধিরা বলেছেন, আলোচনায় বাংলাদেশের পক্ষে শেখ মুজিব নেতৃত্ব দেবেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা মেনে নিতে হবে। আওয়ামী লীগ প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করে সমস্যার নিষ্পত্তি করতে রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডকে এই মর্মে পরামর্শ দেওয়া হয় যে তিনি এই প্রশ্নটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট উত্থাপন করতে পারেন কিনা যে শেখ মুজিব এই নিষ্পত্তিতে ভূমিকা রাখবে।[৫৯]

২রা নভেম্বর মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড-এর রিপোর্টে জানা যায়, ইয়াহিয়া খান আওয়ামী লীগের নেতা নুরুল ইসলাম (আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য যিনি অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষার ব্যাপারে আনুগত্য প্রকাশ করে পাকিস্তানে ছিলেন) ও তার গ্রুপের সঙ্গে শেখ মুজিবের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করবেন এবং বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কীভাবে কার্যকর যোগযোগ করা যায় তা উদ্ভাবন করবেন। ইয়াহিয়া খান ফারল্যান্ডকে বলেন, "মুজিবকে তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগের সুযোগ দেয়া হবে।" ইয়াহিয়া খান স্বীকার করেন শেখ মুজিব হলেন সমস্যার মূল কেন্দ্রবিন্দু, প্রশ্নাতীতভাবে মুজিবের ভাগ্য সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে গেছে।[৬০]

৩রা নভেম্বর এক রিপোর্টে দেখা যায়, রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মধ্যে শেখ মুজিবের বিচার সম্পর্কে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। শেখ মুজিবের বিচারের কাগজপত্র জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে না। ইয়াহিয়া খান আলোচনা সমাপ্ত করেন এই বলে যে, তিনি বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন যারা গঠনমূলক কাজ করার অবস্থানে আছেন। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, উপমহাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করতে রাজি আছেন।[৬১]

৫ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেন। রজার্স বৈঠকের শুরুতে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা নিয়ে ইন্দিরা গান্ধীর দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চান। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির কারণে ভারতীয় নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন। এই হুমকি কেবল ভারতের সীমান্তে পাক-সেনাবাহিনীর উপস্থিতিরি কারণে নয়, এটা ব্যাপকভিত্তিক উদ্বাস্তু স্রোত এবং এটা আরো তীব্র হচ্ছে, যা পাকিস্তান সরকারের দমন-পীড়ন থেকে উদ্ভূত। এটা ভারতের ওপর শুধু অর্থনৈতিক বোঝা সৃষ্টি করেনি, এটা রাজনৈতিক ও সামাজিক সমস্যারও জন্ম দিয়েছে। এমনকি ভারতীয় স্থিতিশীলতা ও অখন্ডতার প্রতি হুমকি সৃষ্টি করেছে। ইন্দিরা গান্ধী উল্লেখ করেন যে, এই সংকট তার ওপর এক বিরাট চাপ বয়ে এনেছে। এমনকি তার মন্ত্রীসভার মধ্যেও এই অনুভূতি রয়েছে যে, দূর্বল নীতি অনুসরণের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী ভারতের নিরাপত্তাকে সংকটাপন্ন করে তুলেছেন।

রজার্স বলেন, ইয়াহিয়া এবং আওয়ামী লীগদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমস্যা নিয়ে সক্রিয় আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র নিয়োজিত রয়েছে। ইয়াহিয়া এই মর্মে সম্মতি জানিয়েছেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, মুজিব কর্তৃক নির্দিষ্ট করে দেওয়া বাংলাদেশের কোনো নেতার সঙ্গে তিনি বৈঠকে বসবেন। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে, এটা একটা উৎসাহব্যঞ্জক ইঙ্গিত। এ রকমের আলোচনার প্রক্রিয়ায় সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার এবং রাজনৈতিক সমঝোতার প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে। এই প্রক্রিয়া যাতে শুরু হয়, সে লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যক্রম অব্যাহত থাকবে। যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়াকে এটা বলতে পারে না যে মুজিবকে মুক্তি দেন। এটা বললেও কাজ হবে না। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, ইয়াহিয়া যদি সত্যি একতরফভাবে সৈন্য প্রত্যাহার কার্যকর করেন তাহলে ভারত যেন সমরূপ সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বিবেচনা করে। ইন্দিরা উত্তরে বলেন, ইয়াহিয়া হয়তো পশ্চিম সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে। কিন্তু ভারতের ওপর প্রচন্ড চাপ পূর্ব পাকিস্তানের। হাকসার এই সময় ব্যাখ্যা করেন যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস স্বপক্ষ ত্যাগের ঘটনায় পাকিস্তান সরকার সীমান্তে নিয়মিত সেনাবাহিনী মোতায়েন করেছে। আর এটা স্পষ্টভাবেই বিধির লঙ্ঘন। এই সৈন্যবাহিনী ক্রমাগতভাবে ভারতীয় ভূখণ্ডে হামলা চালাচ্ছে। কাউল উল্লেখ করেন, পাকিস্তানের ঘাঁটিগুলো সীমান্তের কাছাকাছি এবং সে কারণেই তাদের পক্ষে অধিকতর সহজে প্রত্যাহার করে নেওয়া সম্ভব। রজার্স ও মি. সিসকো ইঙ্গিত দেন যে, সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু ইয়াহিয়ার সঙ্গে বিস্তারিত আলোচনায় যায়নি। তবে ভারত যে প্রশ্ন তুলেছে, তা বোধগম্য। যুক্তরাষ্ট্র আশা করে, ভারতীয়রা এ ব্যাপারে পাকিস্তানের কাছে সহযোগিতা পাবেন। উভয় পক্ষের কাছে গ্রহণযোগ্য প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া নিয়েও আলোচনা হয়। সিসকো ইতি টানেন এই বলে, তারা যে প্রস্তাব রেখেছে ভারতীয়দের যদি তা গ্রহণযোগ্য মনে হয়, তাহলে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে পরে আলোচনা করা যেতে পারে। সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে কাউল অবশ্য উল্লেখ করেন যে, রাজনৈতিক সমঝোতা ছাড়া প্রত্যাহারের ঘটনা ঘটলে এই ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হতে পারে যে, সংকট বুঝি নিয়ন্ত্রণে এসে গেছে। রজার্স উল্লেখ করেন, আসন্ন যুদ্ধের হুমকির মুখে রাজনৈতিক সমঝোতায় পৌঁছা কঠিন। যদি যুদ্ধ শুরু হয়, তাহলে রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব নাও হতে পারে। উপরন্তু রাজনৈতিক সমাধান ছাড়া যুদ্ধের সূচনা ঘটতে পারে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্যরা সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, ইয়াহিয়া আসলেই রাজনৈতিক সমাধান চান কি না? রজার্স ও সিসকো উল্লেখ করেন যে, তাঁদের বিশ্বাস, ইয়াহিয়া এ ধরনের একটি সমাধানে সত্যিই আন্তরিক। এ সময় ইয়াহিয়ার তরফে যে সমাধানের কোনো ইচ্ছা নেই এটা বোঝাতে ভারতীয় প্রতিনিধি দল পূর্ব পকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তারা প্রশ্ন রাখেন, যুক্তরাষ্ট্রের হাতে কি এমন প্রমাণ আছে, যা থেকে বোঝা সম্ভব ইয়াহিয়া সত্যিই রাজনৈতিক সমাধান চান? মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জবাবে বলেন, তাঁরা এটা স্পষ্ট করে বলতে পারেন, এ প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ইতোমধ্যেই যা করার তা সম্পন্ন করেছে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলোচনার শেষ পর্যায়ে উল্লেখ করেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন বিশ্বের বহু স্থানে শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠায় নানা পদক্ষেপ নিয়েছেন। তাঁরা এটা বুঝতে পারছে যে, পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের পরিস্থিতি এবং ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সমস্যার কারণে ভারতের ঘাড়ে বিপদ চেপেছে। যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধের বিপদ এড়াতে সম্ভব সব চেষ্টা করছে। কিন্তু এসব আলোচনার মূল কেন্দ্রের দিকে ধাবিত হয়, যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন বন্দি মুজিব। বিভিন্ন বার্তায় তা যথার্থভাবে প্রমাণিত।

১২ই নভেম্বর ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের বৈঠকে হেনরি কিসিঞ্জার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় স্টেট ডিপার্টমেন্টের সিসকো বলেন, ভারত বারবার এবং অপরিবর্তনীয়ভাবে একটি দাবি করে আসছে সেটি হলো শেখ মুজিবের মুক্তি। শেখ মুজিবই একমাত্র ব্যক্তি যার সঙ্গে ইয়াহিয়া খান আলোচনা করতে পারেন। কিসিঞ্জার বলেন, তারা বলেছিল ইয়াহিয়া খান প্রথমে আওয়ামী লীগ নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং অবশ্যই তিনি মুজিবকে হত্যা করবেন না এবং আলোচনায় একটি সমঝোতা চুক্তি হবার পর ইয়াহিয়া খান অবশ্যই শেখ মুজিবের সঙ্গে কথা বলবেন।[৬২]

১৮ই নভেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে ৪৫ মিনিট যাবৎ ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার আলাপ করেন। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে তাঁর বার্তার জন্য ধন্যবাদ জানান এবং জানান বার্তাটি তিনি গভীর মনোযোগের সঙ্গে পাঠ করেছেন। এরপর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান লন্ডনে অবস্থানরত 'রাষ্ট্রদ্রোহীদের' বক্তব্য ও পদক্ষেপ সম্পর্কে প্রশ্ন তোলেন। তিনি যুক্তি তুলে ধরে বলেন, যুক্তরাজ্যের 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' যদি তার দেশে আশ্রয়-প্রশ্রয় দেন, তাহলে ব্রিটেনের কাছে বিষয়টি কেমন লাগবে? ডেপুটি হাই কমিশনের জবাব ছিল বাকস্বাধীনতাকে সব সময় ব্রিটেন অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে থাকে এবং সে জন্য কারো কণ্ঠরোধ করে না।

এরপর তিনি 'নিউউইক'-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে কিভাবে তাকে 'ভুলভাবে' উপস্থাপন করা হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তা তুলে ধরেন। ওই সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন : ১. যদি তিনি মুজিবকে মুক্তি দেন তাহলে মুজিবের গলা কাটা যেতে পারে; ২. কিন্তু তিনি জাতির মতামতের প্রতীক্ষায় রয়েছেন। জাতি মনে করে না যে, মুজিবকে মুক্তি দেওয়া উচিত।

প্রেসিডেন্ট কঠোরভাবে উচ্চারণ করেন যে, এরকমটি ব্রিটেন বিশ্বাস করতে চায় বলেই তার বিশ্বাস। বিচ্ছিন্নতাবাদী চিন্তার পর্যায়ে মুজিবই পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতিনিধি বলে বিশ্বাস করে প্রথম থেকেই বহির্বিশ্ব মারাত্মক ভুল করেছে। সে তো তা নয়; দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, আওয়ামী লীগের বর্তমান নেতৃবৃন্দ নূরুল আমিনের দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। তিনি মনে করেন পুনঃনির্বাচন সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হওয়ার পরই জনগণের মতামত স্পষ্ট হবে। "অপেক্ষা করুন, দেখবেন পূর্ব পাকিস্তানে একজন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করা হয়েছে। এই পদটি মুজিবেরই হতে পারতো যদি সে চরম বোকামি না করতো।"[৬৩]

ব্রিটেনের জানা মতে, শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার পর্ব ১০ দিন ধরে চলবে এবং মনে হচ্ছে মৃত্যুদণ্ড অবিলম্বে কার্যকর করা হবে না। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উপর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চাপ প্রয়োগ করতে হলে তা সম্মিলিতভাবে এবং ক্রমান্বয়ে করতে হবে। একসঙ্গে সমস্ত গোলাবারুদ নিঃশেষ করা উচিত হবে না। পাকিস্তানি হাই কমিশনার সালমান আলীর সঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়, যে বা যারাই শেখ মুজিবকে রক্ষা করতে চান তাঁদের সকলকেই ইয়াহিয়ার সহজাত ধারণার কথা মনে রাখতে হবে। তিনি রূঢ় নীতি ধারণ করেন।[৬৪]

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ভারতের প্রধানমন্ত্রী প্রেরিত বার্তার উত্তরে বলেন, "শেখ মুজিবের বিচারে ব্রিটেন উদ্বিগ্ন।"

পত্রে বলা হয়,

"১৪ই আগস্ট শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার সম্পর্কে পাঠানো আপনার বার্তাটি ভারতীয় হাই কমিশনারের মাধ্যমে আমার হস্তগত হয়েছে।

শেখ মুজিবের বিচারের ব্যাপারে আপনার মতো আমিও সমভাবে উদ্বিগ্ন। ইতোমধ্যেই আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে পাঠানো আমার বার্তায় যতো দ্রুত সম্ভব পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে পরিষ্কারভাবে বলেছি। শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ডদান সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের মনোভাব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য স্যার আলেক ডগলাস হিউমও লন্ডনে নিযুক্ত পাকিস্তানি হাই কমিশনারের সঙ্গে কথা বলেছেন। হাই কমিশনার আমাদের এই উদ্বেগের কথা তাঁর সরকারকে পৌঁছে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

আমরা ইতোমধ্যেই আমাদের মনোভাব পরিষ্কারভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে তুলে ধরেছি। তথাপি কোনো প্রকার অবিবেচনাপ্রসূত পদক্ষেপ যেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া গ্রহণ না করেন তা নিশ্চিত করার জন্য আরও কি করা যেতে পারে, তা আমরা বিবেচনা করে দেখছি। শুভেচ্ছাসহ, এডওয়ার্ড হীথ।"[৬৫]

উল্লেখিত পত্রের শেষাংশে স্যার ডগলাস হিউম বলেন :

"আপনার মতো একজন প্রবীণ রাজনীতিবিদ এবং পাকিস্তানের একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধুর কাছ থেকে যদি উপদেশ আসে তাহলে সেটা কার্যকর হবে এবং আপনি যদি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের কাছ থেকে মুজিব যে বেঁচে আছে এমন কোনো কথাও আদায় করতে পারেন, তাহলে তা পাকিস্তান ও বিশ্ব-শান্তির জন্য অত্যন্ত বড়ো কাজ হবে। আমি জেনেছি যে, আসছে সেপ্টেম্বরে ইসলামি সম্মেলনে যোগ দিতে আপনি কাবুল যাচ্ছেন। এ সময় যদি আপনি এ বিষয়টি সকলের গোচরে আনেন এবং পুনরায় পাকিস্তানে গিয়ে।"

১৯শে নভেম্বর রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড হেনরি কিসিঞ্জারকে জানান যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন তিনি বিদ্রোহী বাংলাদেশ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করতে সম্মত আছেন। তিনি তাদের পশ্চিম পাকিস্তানের আসা ও যাবার জন্য 'সাদা পতাকা' অনুমোদন দেবেন কিন্তু গুরুতর অভিযোগের সঙ্গে যে সমস্ত প্রতিনিধি যুক্ত তাদের সাথে সাক্ষাৎ করবেন না। ইয়াহিয়া খান আরো বলেন, মুজিব নেগোসিয়েশনের মূল চাবিকাঠি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নন বরং ইন্দিরা গান্ধীর কাছে রয়েছে 'তালা ও চাবি' উভয়ই (both the key and the lock).[৬৬]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত সুলতান খান কিসিঞ্জারকে বলেছেন যে, ২৭শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বেসামরিক সরকারের হাতে ক্ষমতা তুলে দেবেন। এ সময় কিংবা তারপরে পূর্ব পাকিস্তান যদি স্বায়ত্তশাসন দাবি করে তাহলে তাতে কোনো প্রকার বাধা দেওয়া হবে না। এ জন্য মুজিবকে মুক্তি দেওয়া আবশ্যক কিনা পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত জানতে চাইলে কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে যে এটা পরে হতে পারে এবং এই বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়ে ভারত ঝামেলার সৃষ্টি করছে। ইন্দিরা গান্ধীর সাম্প্রতিক যুক্তরাষ্ট্র সফরে একথাই বোঝা গেছে যে, ইয়াহিয়া ক্ষমতা থেকে অপসারিত হলে তিনি খুশি হবেন এবং এর ফলে ভারতের উদ্দেশ্যকেই সফল করা হবে বলে কিসিঞ্জার মনে করেন।[৬৭]

২৫শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের মধ্যে টেলিফোনে দীর্ঘ কথোপকথন হয়। এই কথোপকথনের এক পর্যায়ে প্রধানমন্ত্রী হীথ নিক্সনকে বলেন যে, পাকিস্তান ইচ্ছে করলেই ভালো অবস্থান পেতে পারতো যদি তারা (হীথ-নিক্সন) প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে মুজিবের সঙ্গে কথা বলতে ও অতীত ভুলে যেতে রাজি করানো যেতো। মানুষকে কারাগারে পাঠিয়ে, পরে তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এবং তাদেরকে প্রেসিডেন্ট বানানোসহ অন্য অনেক কিছু করার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা সম্ভবত ব্রিটেন-মার্কিনীদের রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী হীথ নিশ্চিতভাবে বলেন , যদি ইয়াহিয়া খান চাইতেন তাহলে তিনি পরিস্থিতিকে সফল ভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারতেন। কিন্তু নিক্সন বলেন যে, "মাথায় বন্দুক ঠেকানো অবস্থায় ইয়াহিয়া খানের কিছু করার নেই।"[৬৮]

বঙ্গবন্ধুর মুক্তির লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের তৎপরতা

ইতিহাস স্থিরকৃত-সিদ্ধান্তে একথা বলা যায় যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিনাশী নেতৃত্ব অবিসংবাদিত। মুক্তিযুদ্ধের গণযোদ্ধারা তাঁর নামে শপথ নিয়ে যুদ্ধ করেছেন। জীবন উৎসর্গ করেছেন। মুজিবনগর সরকারের রাষ্ট্রপতি হিসেবেই শুধু নয়, তাঁকে বাদ দিয়ে মুজিবনগর সরকার পরিচালনা ছিল অসম্ভব। এ কারণে মুজিবনগর সরকার গঠনের পর বঙ্গবন্ধুর অবস্থান ও গ্রেফতার সম্পর্কে জাতীয় ক্ষেত্রে যেমন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষিতে তেমনি বঙ্গবন্ধু ছিলেন আলোচনার কেন্দ্রীয় ব্যক্তিত্ব। ৬ই জুন গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত এক বেতার ভাষণে রাষ্ট্রপ্রধান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আটক সকল গণপ্রতিনিধিদের মুক্তি দাবি করেন। এই সময় গণমাধ্যমে বঙ্গবন্ধু ও মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন রকম বিভ্রান্তিমূলক খবর প্রকাশিত হতে থাকে। তখন বিশ্বব্যাপী অত্যন্ত জোরের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতার কথা উচ্চারিত হচ্ছিলো। এ সমঝোতার মূল উদ্যোক্তা যুক্তরাষ্ট্র। ঘোলাটে অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে চার-দফা প্রস্তাব দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষিত হয়। চার-দফা প্রস্তাব ছিল: এক, বঙ্গবন্ধুর মুক্তি; দুই, স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান; তিন,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রত্যাহার; এবং চার, বাংলাদেশের যে ক্ষতি সাধিত হয়েছে আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমে তা নির্ণয় ও ক্ষতিপূরণ।[৬৯] ঐ সময় মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান উত্তরবঙ্গ সফরের প্রাক্কালে ১৩ই জুন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট সন্নিকট কুরমাইল যুব ও অপারেশন ক্যাম্পে উপস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধ জোরদার, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতির লক্ষ্যে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।[৭০]

পাকিস্তান সামরিক শাসকগোষ্ঠীর হাতে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রকৃত অর্থেই সমার্থক। আইনানুগভাবে গঠিত সরকার রাষ্ট্রপতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন রক্ষায় বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে বন্দি মুজিবের নিরাপত্তা বিধান, অবৈধ গোপন বিচার বন্ধ এবং তার মুক্তির লক্ষ্যে ব্যাপক তৎপরতা শুরু করেন। প্রথম থেকেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির বিষয়টি মুজিবনগর সরকার দৃঢ়ভাবে উচ্চারণ করলেও পদ্ধতিগতভাবে জুন মাস থেকে ব্যাপক কার্যক্রম শুরু হয়। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মার্শাল ল' কোর্টে 'ক্যামেরা ট্রায়াল' এর মাধ্যমে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বিচার শুরু করার সংবাদ গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে বিশ্বে বৃহৎ শক্তিবর্গ, গণতান্ত্রিক দেশসমূহ, মুসলিম বিশ্বসহ সকল দেশের প্রতি বাংলাদেশের স্বীকৃতি ও "জনগণের অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বিধান ও অবিলম্বে মুক্তির ব্যবস্থা" করার জন্য আহ্বান জানান।[৭১] মুজিবনগর সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপ্রতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ২১শে জুলাই জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট এবং ব্রিটেন, চীন, ভারত, কানাডা ও অস্ট্রেলিয়ায় প্রধানমন্ত্রীদের কাছে টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন।[৭২]

৫ই সেপ্টেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত এক ভাষণে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন বন্দি শেখ মুজিবের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেন যে, "বাংলাদেশের গণ-হত্যায় যে বিশ্ববাসী শিউরে উঠছে, তারাই এখন লক্ষ্য করছে যে, জনগণের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে কারারুদ্ধ করে সামরিক আদালতে গোপন বিচারের আয়োজন করা হয়েছে এবং তাঁর পক্ষসমর্থনের জন্য খলনায়ক ইয়াহিয়া খান সন্দেহজনকভাবে আইনজ্ঞ চাপিয়ে দিয়েছেন। পৃথিবীর মানুষ ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। পাকিস্তানি শাসকচক্রের মিথ্যা ভাষণে এবং তাদের কলঙ্ক-মোচনের কলাকৌশলে কেউ প্রতারিত হবে না।" তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, "সাড়ে সাত কোটি মানুষের 'ভালবাসা মেখে তাদের সুখের স্বপ্ন' যিনি দেখেছিলেন দস্যুদের কবলে পড়ায় তিনি আজ বন্দি জীবন যাপন করছেন। তার বিচারের প্রহসনের বিরুদ্ধে অন্যান্য দেশের সরকার ও জনগণ এবং আইন বিশেষজ্ঞসহ নানা আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানকে সক্রিয় করে তোলার সর্বপ্রকার চেষ্টা করেছে বাংলাদেশের সরকার ও জনসাধারণ। কিন্তু বর্বর চক্রের অন্ধ ঔদ্ধত্যের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপর এর তেমন প্রতিক্রিয়া ঘটেনি।" দেশবাসীকে তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করেন যে, "বিচারের নামে যারা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রাণনাশের ষড়যন্ত্র করছে, পরিণামে শাস্তি পেতে হবে তাদেরকেই। আর ইসলামাবাদের উপর যে সব সরকারের কিছুমাত্র প্রভাব আছে, শেখ মুজিবের মুক্তি সাধনের জন্য তাদের কাছে তিনি আবার আবেদন জানান।"[৭৩] বলাবাহুল্য, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ এক্ষেত্রে 'ইসলামাবাদের উপর যাদের প্রভাব রয়েছে' বলতে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে অঙ্গুলি তুলেছেন। ইতোমধ্যেই যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সমঝোতার লক্ষ্যে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ বিষয়টি অপ্রকাশ্য ছিল না।

১২ই অক্টোবর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এক মুখপাত্র বাংলাদেশের বাস্তবতা অস্বীকার করে ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধের যে উস্কানি দিয়েছেন বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র তার প্রতিক্রিয়ায় দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলেন, শেখ মুজিবের মুক্তি, বাংলার মাটি থেকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ও স্বাধীন সার্বোভৌম বাংলাদেশের স্বীকৃতি ব্যতীত ইয়াহিয়া খানের কোনোরকম 'ছলাকলা' বা 'কলাকৌশল' কাজে আসবে না।

১৫ই অক্টোবর বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর এক পত্রে অবিসংবাদিত নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন সামরিক বিচার ও তাঁকে 'কনডেম সেলে' রাখায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়।

২৩শে নভেম্বর বাংলাদেশের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রী এক পত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর পত্রে উল্লেখ করেন যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা এখন পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে কোনো সমঝোতায় উপনীত হয়নি। এটা শুধু বাংলাদেশের অস্তিত্ব বিপন্নকারী নয় তাদেরও অস্তিত্ব বিনাশের পথ।

২৩ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্ত করার কৌশলগত দিক ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, "আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তাঁকে মুক্ত করার একমাত্র উপায় হচ্ছে বাংলাদেশ থেকে হানাদার সৈন্যদের নিষ্ক্রমণের সকল পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। তা করবার শক্তি আমাদের আছে এবং আমরা তাই করতে যাচ্ছি। জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে আমরা চরম আঘাত হানব আর তখনই জেনারেল ইয়াহিয়া খান ক্রুর সত্যের মুখোমুখি হবেন।"[৭৪]

৭ই ডিসেম্বর অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণে ভারত কর্তৃক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতিতে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানান। একই সঙ্গে তিনি বলেন, "বঙ্গবন্ধুকে ফেরত না পেলে বাংলাদেশের মানুষের কাছে এই স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ সম্ভব নয়। তিনি দৃঢ় কণ্ঠে বলেন, যে হানাদার দস্যুরা বাংলার নয়নমণিকে কারাগারে আজও আবদ্ধ রেখেছেন, তাঁদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির দুর্জয় সাহস আর প্রতিজ্ঞা যেমন অস্ত্রের ভাষায় রুদ্ধ করা যায়নি, তেমনি করে বাংলার অবিসংবাদিত নেতাকে কারাগারে রেখেও তাঁরা নিস্তার পাবেন না।"[৭৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানিয়ে বলেন, বাংলাদেশের স্বপ্ন যখন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বাস্তবে রূপায়িত হলো, তখন সেই স্বপ্নের দ্রষ্টা, বাঙালি জাতির জনক, শেখ মুজিবুর রহমান শত্রুর কারাগারে বন্দি হয়ে আছেন। দেশবাসীর নিকটে অথবা দূরে, যেখানেই থাকুন না কেন, বঙ্গবন্ধু সর্বাদাই জাগরুক রয়েছেন তাদের অন্তরে। যে চেতনা আমাদের অতীতকে রূপান্তরিত করেছে, তিনি সেই চেতনার প্রতীক। "যে রূপকাহিনী ভবিষ্যতে আমাদের জাতিকে যোগাবে ভাব ও চিন্তা, তিনি সেই কাহিনির অংশ।"[৭৬]

স্বাধীনতা, না বঙ্গবন্ধু? চক্রান্তের কূটনৈতিক দাবাখেলা

বন্দি মুজিবকে ঘিরে বিশ্ব কূটনৈতিক দাবাখেলার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে ইতোপূর্বে আলোচিত হয়েছে। সেই দাবাখেলার একটি সময়ে যুক্তরাষ্ট্র বন্দি মুজিব ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে মুজিবনগর সরকারের অভ্যন্তরে কীভাবে খুঁটি বেধেছে তা পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। মুজিবনগর সরকারের জন্য যে-দ্বন্দ্বটি সবচেয়ে বেশি দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে সেটি হচ্ছে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের পক্ষ থেকে মার্কিনিদের সাথে যোগাযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া। ২৫শে মার্চের পূর্ব থেকে খন্দকার মোশতাক আহমেদ ও তার গ্রুপের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ ছিল। ১৭ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর পররাষ্ট্রসচিব মাহবুবুল আলম চাষীকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের নির্দেশ দেন। সে নির্দেশ কতটুকু কার্যকর হয়েছিল এই সম্পর্কে সন্দেহ দেখায় কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. জহিরুল কাইয়ুম ৩০শে জুলাই কলকাতায় মার্কিন কাউন্সিল জেনারেল পলোফ-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান। ঐদিন দেখা না পেয়ে পরদিন ৩১শে জুলাই তার সাথে এক বৈঠকে বসেন। বৈঠকে ১০ই এপ্রিল স্বাধীনতার সনদ যা গণপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত তা সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সমঝোতা সম্ভব বলেন জহিরুল কাইয়ুম উল্লেখ করেন। কাইয়ুম পলোফ-কে আরো বলেন, যদি গেরিলা যুদ্ধ দীর্ঘায়িত হয় তাহলে তা 'উগ্রপন্থিদের' কব্জায় চলে যাবে। এখানে 'উগ্রপন্থি' বলতে জহিরুল কাইয়ুম বাম-কমনিস্টদের বুঝিয়েছেন, তার মতে, যাদের সংখ্যা পূর্ব বাংলায় শতকরা এক ভাগেরও বেশি নয়। তিনি প্রেসিডেন্ট নিক্সন, ইয়াহিয়া খান, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও শেখ মুজিবকে নিয়ে তাসখন্দ সম্মেলনের অনুরূপ বৈঠক করার প্রস্তাব রাখেন। তিনি আরো বলেন, এক্ষেত্রে আওয়ামী লীগ পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি থেকে সরে আসতে সম্মত হবে। এক্ষেত্রে তিনি শেখ মুজিবের নিরাপত্তার বিষয়ে জোর দিয়ে বলেন, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড হলে কোনো কিছু সম্ভব হবে না।[৭৭]

এসময় 'স্বাধীনতা, না বঙ্গবন্ধু'[৭৮] এ সম্পর্কে একটি লিফলেট বিলি হয়েছিল। এই লিফলেটের মর্মার্থ ছিল, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে জীবিত পেতে হলে বাংলাদেশের পূর্ণ স্বাধীনতার চিন্তা ঝেড়ে ফেলতে হবে। এই লিফলেটের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রমাণিত হয়েছে বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী একটি চক্র সরকার ও দলের অভ্যন্তরে সক্রিয়। এ বিষয়টি নিম্নে আলোচিত হলো।

মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের গোপন দলিল থেকে জানা যায় যে, পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের প্রতিনিধি হিসেবে কাজী জহিরুল কাইয়ুম মার্কিন দূতাবাসের সাথে ১৪ই আগস্ট পুনরায় যোগাযোগ করেন। তিনি অভিমত প্রকাশ করেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান যদি কোনো সমঝোতায় পৌছান তাহলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সর্বসম্মতিক্রমে তা মেনে নেবে। তিনি বলেন, শেখ মুজিব জীবিত থাকলে মীমাংসার আশা করা যেতে পারে, যদি তাঁকে হত্যা করা হয় তাহলে কোনো আশাই থাকবে না। তিনি এতদ্‌সঙ্গে উল্লেখ করেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মোজাফ্‌ফর আহমদ আগরতলায় বিষয়টি সিনেটর কেনেডির সঙ্গে উপস্থাপন করার কথা থাকলেও তা করেছেন কিনা তা নিয়ে তার সন্দেহ রয়েছে। তিনি আরো বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রীর মস্কো যাওয়ার পরিকল্পনা থাকলেও তিনি প্রথমে যেতে চান যুক্তরাষ্ট্রে। কুমিল্লা থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. সিরাজুল হককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লিতে পোস্টিং দিতে চান, যেখানে থেকে তিনি মার্কিন দূতাবাসের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে পারেন।[৭৯]

১৯৭১ সালের ১৯শে আগস্ট মার্কিন দূতাবাস কর্মকর্তার সাথে এক বৈঠকে কাইয়ুম বলেন যে, "মুজিবের জীবন স্বাধীনতার চেয়েও মুল্যবান"[৮০] কিন্তু তখন বাংলাদেশের জনগণ শেখ মুজিবের মুক্তি ও স্বাধীনতা ঐক্যবদ্ধভাবে দু'টো আদায়ের ব্যাপারেই বদ্ধপরিকর ছিলেন। জহিরুল কাইয়ুম এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিকে বলেন যে, "মুজিব জীবিত থাকলে সমঝোতার সম্ভাবনা আছে। তাঁকে হত্যা করলে কোনো সম্ভাবনা থাকবে না।"[৮১]

১৪ই সেপ্টেম্বরের বৈঠকে কাইয়ুম বলেছেন, মোশতাক এবং পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে প্রস্তাবিত বৈঠক নিয়ে খন্দকার মোশতাক বাংলাদেশ মন্ত্রীসভার সঙ্গে আলোচনা করেছেন। তখন মন্ত্রীসভা জানতে চেয়েছে, এ ধরনের বৈঠকের উদ্দেশ্য কী? মোশতাক কাইয়ুমকে জিজ্ঞেস করেছেন, এটা খতিয়ে দেখতে যে, কেন মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসার মোশতাকের সঙ্গে বৈঠক করতে চান। জবাবে পলিটিক্যাল অফিসার বলেছেন, তার ওপর নির্দেশ এসেছে, তিনি যেন বাংলাদেশের সর্বশেষ অবস্থান জানতে মোশতাকের সঙ্গে সরাসরি কথা বলেন। এর একটা নিহিত অর্থ হচ্ছে এ ধরনের আলোচনাকালে পলিটিক্যাল অফিসার হয়তো কিছু বিষয় পরারাষ্ট্রমন্ত্রীকে অবহিত করবেন।

১৫ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১০ নম্বর টেলিগ্রামে এই বিবরণ দিয়ে বলা হয়, কাইয়ুম নিজেও এ ধরনের একটি বৈঠক অনুষ্ঠানে আগ্রহী। মোশতাক যদি একান্তই রাজি না হন, তাহলে তাকে বাদ দিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দিন আহমদ অথবা ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট নজরুল ইসলামের সঙ্গে কথা বলার সুপারিশ করবেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ই সেপ্টেম্বর পলিটিক্যাল অফিসার কাইয়ুমের সঙ্গে আবার দেখা করেন। কাইয়ুম এদিন বলেন, একটি ব্যক্তিগত পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা নিয়ে মোশতাকের মন থেকে সন্দেহ ঘোচেনি। তিনি শুধুই জানতে চাইছেন, এই ধরনের বৈঠক করে ফায়দা কী হবে? ১৬ই সেপ্টেম্বর কলকাতা থেকে প্রেরিত ২৫১৩ নম্বর টেলিগ্রামে এ বিষয়ে আরো তথ্য দেয়া হয় যে, পলিটিক্যাল অফিসার এক পর্যায়ে কাইয়ুমকে বলেন, মোশতাক যা কিছুই বলুন না কেন তা-ই তিনি শুনতে প্রস্তুত।

২৩শে সেপ্টেম্বর জহিরুল কাইয়ুম একজন সংবাদ বাহককে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল-এর নিকট প্রেরণ করে বলেন যে, ভারত সরকার এই যোগাযোগ সম্পর্কে জেনেছে এবং এ বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে।[৮২]

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদ ২৮শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ কলকাতাস্থ বাংলাদেশ হাইকমিশন অফিসে যুক্তরাষ্ট্র দূতাবাসের রাজনৈতিক কর্মকর্তা পলোঅফ-এর সাথে ৯০ মিনিটব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। এ বৈঠকের সময় বাংলাদেশের হাই কমিশনার হোসেন আলীকে ঘরের বাইরে রাখা হয়। বৈঠককালে মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানের প্রতি চাপ সৃষ্টি করতে বলেন। আলোচনার এক পর্যায়ে তিনি আরও বলেন যে, "ইয়াহিয়া খানকে ভালো বলে জানি, আমি মনে করি, তিনিও আমাকে ভালো মানুষ হিসেবেই জানেন।"[৮৩] ইয়াহিয়া খানের প্রতি মোশতাকের এ উচ্চ ধারণা স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশের কূটনৈতিক ক্ষেত্রকে জটিল করে তোলে।

যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাকের সাথে আলাপের পর প্রধানমন্ত্রীর সাথেও আলাপ করতে আগ্রহী হয়। তাজউদ্দীন আহমদ মার্কিনীদের সাথে যোগাযোগ করতে রাজি হননি, সৈয়দ নজরুল ইসলাম যোগাযোগের ক্ষেত্রে কৌশল গ্রহণ করে বলেন, মার্কিন পলিটিক্যাল অফিসারের সঙ্গে আলোচনার জন্য তাকে ভারত সরকারের কাছ থেকে অনুমতি লাভ করতে হবে। তিনি বলেন যে 'সমঝোতার' কোনো প্রশ্ন নেই। সামরিক বিজয়ের মাধ্যমে এর জবাব দেওয়া হবে। মার্কিন দলিলেও শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে কোনো সমঝোতা বা আলাপ প্রস্তাবের উল্লেখ নেই।[৮৪]

পাকিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এমন আশঙ্কাও প্রবল ছিল যে, কৌশলগত কূটনৈতিক স্ট্রাটেজিক কারণে ভারত যদি বাংলাদেশকে আকস্মিক স্বীকৃতি দেয় তাহলে পাকিস্তান সরকারের সঙ্গে সমঝোতার প্রয়োজন হবে না। ওয়াশিংটন 'রাজনৈতিক সমঝোতার' বিষয়টি পাকিস্তানকে জানানোর জন্য রাষ্ট্রদূত যোশেফ ফারল্যান্ডকে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে কথাটি উত্থাপন করতে বলেন। আশ্চর্যজনকভাবে সত্য যে, কথাটি উত্থাপিত হলে ইয়াহিয়া খানের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক এবং তিনি বাংলাদেশের সঙ্গে তার সরকারের বৈঠকের ব্যবস্থা করার জন্য অনুরোধ করেন। এমনকি তিনি ফারল্যান্ডের অনুরোধে মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে গোপনে আলোচনায় সম্মত হন।[৮৫]

মুজিবনগর সরকারের প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক নিযুক্ত প্রতিনিধি, এ দু'জনের বক্তব্যের ব্যবধান থেকে এটা উপলব্ধি হয় যে, সরকারের অভ্যন্তরীণ বিরোধ বেশ প্রকট। প্রধানমন্ত্রী যেখানে সমঝোতার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের সব সম্ভাবনাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাতিল করেন, সেখানে ঐ সময়ে পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা মুক্তিযুদ্ধের অগ্রগতির ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে অন্তরায় হিসেবেই বিবেচ্য। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ-এর অজ্ঞাত ছিল না যে উদ্ভূত এ-চক্রান্তের সঙ্গে আওয়ামী লীগের একাংশ জড়িত।[৮৬] এই চক্রান্ত রোধে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল সমঝোতা নয় সামরিক বিজয় অনিবার্য করে তুলতে হবে।

প্রধানমন্ত্রীর এই বক্তব্যের উৎসশক্তি জাতীয়ভাবে বাগডোগরায় অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত, সন্দেহ নেই। ৫ই ও ৬ই জুলাই ১৯৭১ শিলিগুড়ির বাগডোগরায় জনপ্রতিনিধিদের এক গুরুত্বপূর্ণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার উদ্দেশ্য বিরাজমান পরিস্থিতিতে মুজিবনগর সরকার ও এর কার্যক্রমের উপর আস্থা আছে কী না তা যাচাই করা। আলোচনা-সমালোচনার পর সভা মুজিবনগর সরকারের উপর পূর্ণ আস্থা জ্ঞাপন করে। মুক্তিযুদ্ধ তীব্রতর এবং বঙ্গবন্ধুর মুক্তি ত্বরান্বিত করার জোরালো উদ্যোগের ঘোষণা দিয়ে বলা হয়, ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বাংলাদেশ স্বাধীন না হলে মন্ত্রিপরিষদ পদত্যাগ করবে। সশস্ত্র সংগ্রামের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের শপথ নেন এম. এন.এ. এবং এম.পি. এ.বৃন্দ। এই সভার পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উদ্ভূত বিভ্রান্তির অবসান হয় এবং সবাই একযোগে কাজ করার অঙ্গীকার করেন।[৮৭]

কিন্তু তারপরেও লক্ষণীয় যে, স্বাধীনতা এবং বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতে অবস্থান এবং ভারত সরকারের সার্বিক সহযোগিতা পাবার পরেও আওয়ামী লীগের নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসেবে জহিরুল কাইয়ুমের বক্তব্য অন্তর্দলীয় কোন্দলকে উস্কে দেয়। তিনি বলেন, আওয়ামী লীগের উল্লেখযোগ্য অংশ 'ভারতীয়' নির্দেশ মানবে না।[৮৮] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা নিয়ে কারও কোনো সংশয় ছিল না। যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বিশ্বস্ত বন্ধু।[৮৯] এসত্ত্বেও বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বা খন্দকার মোশতাক বা তাঁর প্রতিনিধি যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথেও যোগাযোগ রক্ষার প্রয়াস নেন। জহিরুল কাইয়ুম বলেন যে,[৯০] পাকিস্তানের সাথে একটা আপোষরফা করার ব্যাপারে মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে কাইউম যুক্তরাষ্ট্রের সাহায্য প্রার্থনা করেন।

বগুড়া থেকে নির্বাচিত জাতীয় পরিষদ সদস্য হাবিবুর রহমান জুন মাসের শেষ সপ্তাহে পশ্চিম দিনাজপুরে বালুরঘাট সন্নিকট কুরমাইল অভ্যর্থনা ও অপারেশন ক্যাম্পে উপস্থিত হন। তিনি কলকাতায় আওয়ামীলীগ নেতৃত্বের মধ্যে কোন্দলে হতাশা প্রকাশ করে মন্তব্য করেন, এই দ্বন্দ্বমুখর নেতৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন দুরূহ ব্যাপার। তিনি এ অভিমত পোষণ করেন যে, ভারতে অবস্থান না করে দেশের অভ্যন্তরে গিয়ে জনমত সমুন্নত রাখা ও গেরিলাদের সহযোগিতা করা জরুরি। দেশে ফেরার জন্য তিনি ক্যাম্প-ইন-চার্জ[৯১]-এর নিকট সহযোগিতা চাইলে তাকে ভেতরে যাবার ব্যবস্থা করে দেয়া হয়। ভেতরে গিয়ে তিনি পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট আত্মসমর্পণ করেন। পরবর্তী ২৩শে নভেম্বর ইসলামাবাদে গিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও সামরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইন প্রকাশক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে দেখা করেন। তিনি ভুট্টোর মন্ত্রীসভায় সদস্য হতে অস্বীকৃতি জানান।[৯২] এছাড়াও আওয়ামী লীগের আরো দু'জন নির্বাচিত প্রতিনিধি এ.বি.এম. নূরুল ইসলাম ও এইচ.বি. জামান ইসলামাবাদে গিয়ে আঞ্চলিক বৈষম্যের অবসান ও ৬-দফার ভিত্তিতে অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী মর্মে আনুগত্য প্রকাশ করেন এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে অবস্থান নেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির সঙ্গে তারা এ অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, তারা শেখ মুজিবের সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।[৯৩]

১৯৭১ সালের ২৭শে নভেম্বর মোশতাকের প্রতিনিধি জহিরুল কাইয়ুম আকস্মিকভাবে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল অফিসের এক কর্মকর্তার সাথে সাক্ষাৎ করেন। এ সাক্ষাতে ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতায় কীভাবে কাজ করছে সে সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি ডি.পি. ধরের সাথে মোশতাকের আলাপ-আলোচনার প্রসঙ্গও স্থান পায়। যুক্তরাষ্ট্রের সাথে মোশতাকের যোগাযোগকে ডি.পি. ধর মুক্তিযুদ্ধের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা বলে উলেখ করেন। কিন্তু মোশতাক সব অভিযোগ অস্বীকার করেন, কাইয়ুমের সাক্ষাৎকারে তা পাওয়া যায়। জহিরুল কাইয়ুমের উদ্ধৃতি দিয়ে মার্কিন কনসাল অফিস উল্লেখ করে যে, "তিনি ভারতের নিকট 'দেশ বিক্রির' চেয়ে বরং পাকিস্তানে যাবেন। এ রকম হলে তার ৪৩জন সমর্থক নিয়ে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করবেন বলে সতর্ক করেছেন।."[৯৪] জহিরুল কাইয়ুমের এ বক্তব্যে আরও পরিষ্কার হয় যে, তারা মুক্তিযুদ্ধে ভারত সরকারের সংশিষ্টতার বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা তখন পর্যন্ত ছিল অবাস্তব। ভারতের সাথে পাকিস্তানের বৈরী সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে আদর্শগত ও কৌশলগত মিল ও সুবিধা থাকায় মুজিবনগর সরকার ভারতের সহযোগিতা কামনা করে। কিন্তু খন্দকার মোশতাক, কাইয়ুম ও অন্যান্য কিছু নেতা ভারতে অবস্থান করে ভারতীয় সহায়তার বিরোধীতা করেন। এটা প্রকারান্তরে বাংলাদেশ বিরোধীতার সামিল বলে সরকারের উচ্চ পর্যায় থেকে মনে করা হয়। এ সমস্ত কারণে সরকারের অভ্যন্তরে পারস্পরিক আস্থা বিনষ্ট হয় এবং বিরোধ চরম আকার ধারণ করে। এ পরিপ্রেক্ষিতে প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদকে কূটনৈতিক কার্যক্রমের জটিলতা কাঁধে তুলে নিতে হয়।

খন্দকার মোশতাক যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে সরাসরি যোগাযোগ স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। এ জন্য তিনি কয়েকবার যুক্তরাষ্ট্র গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু মার্কিন সরকার তাকে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের প্রটোকল দিতে অস্বীকৃতি জানায়।[৯৫] যুক্তরাষ্ট্র খন্দকার মোশতাককে লন্ডন বা প্যারিসে গিয়ে পাকিস্তানের সাথে কথা বলার জন্য পরামর্শ দেয়।[৯৬] মোশতাক পাকিস্তানের সাথে সমঝোতার জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি প্রত্যাশী ছিলেন এ কারণে যে, মুজিব ব্যতীত কারো পক্ষেই পরিস্থিতি সামাল দেয়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু অন্য সূত্র বলছে, তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি নিয়ে মাথা ঘামায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খন্দকার মোশতাক জনাব মাহবুবুল আলম চাষীকে পররাষ্ট্র সচিব হিসেবে নিয়োগ দেন। মাহবুবুল আলম পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে কর্মরত বাঙালি অফিসারদের মধ্যে কট্টর পাকিস্তানপন্থি ছিলেন।[৯৭] পাকিস্তানের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে মোশতাক মাহবুবুল আলম চাষীকে সূত্র হিসেবে ব্যবহার করতেন। এজন্য পরবর্তীকালে প্রধানমন্ত্রী তাকে এ পদ থেকে সরিয়ে দিয়ে আব্দুল ফতেহকে পররাষ্ট্রসচিব নিয়োগ দেন। খন্দকার মোশতাক অত্যন্ত চতুরতায় তাঁর মিশনকে সফল করতে অনুগত ব্যক্তিদের মুজিবনগর সরকারের বিভিন্ন স্তরে নিয়োগে অনেকটা সফলকামও হন। কুমিলা অঞ্চল থেকে নির্বাচিত এম.এন.এ. তাহেরউদ্দিন ঠাকুরের নাম এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের বহিপ্রচার বিভাগের উপদেষ্টা হিসেবে দায়িত্ব পান। এ মন্ত্রণালয়ে উপদেষ্টা ছিলেন আব্দুল মান্নান এম.এন.এ.। ১৯৭১ সালের জুন মাসের প্রথমদিকে আব্দুল মান্নান সরকারি কাজে কলকাতার বাইরে গেলে তাহের উদ্দিন ঠাকুর বেতার কেন্দ্রের সামগ্রিক অবস্থা পর্যালোচনার জন্য একটি বৈঠক ডাকেন। তাহের ঠাকুর বেতার স্টুডিওতেই অবস্থান করতেন। আব্দুল মান্নান কলকাতায় ফিরে এসে তার এসব কর্মকাণ্ড পছন্দ করেননি।[৯৮] তখন তাহেরউদ্দিন ঠাকুর পার্কসার্কাসে বাংলাদেশ হাই কমিশন ভবনে মোশতাকের কাছে গিয়ে আশ্রয় নেন।[৯৯] এর কিছু দিন পরই বেতারকর্মীরা বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘটের ডাক দেয়। ৩ দিনের এ ধর্মঘট এক 'গোপন মহলের' প্রচেষ্টায় হয়েছিল বলে এম.আর. আখতার মুকুল উলেখ করেছেন।[১০০] যেখানে বাংলাদেশের মুক্তিকামী মানুষ নিজেদের জীবন দিয়ে দেশ রক্ষার জন্য যুদ্ধ করছিল সেখানে ধর্মঘট করার মত অনভিপ্রেত ও হঠকারী কর্মকাণ্ড মুক্তিযুদ্ধকেই বিপদগ্রস্ত করার নামান্তর হিসেবে পরিলক্ষিত হয়।

উপর্যুক্ত কারণে তাজউদ্দীন আহমদ ও সৈয়দ নজরুল ইসলাম সমগ্র পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে ১৬ই ডিসেম্বরের পূর্বে ও পরে খন্দকার মোশতাককে পাশ কাটিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে দিয়ে বৈদেশিক কর্মকাণ্ড অগ্রসর করে নেন। এতে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব দৃশ্যমান হয়ে ওঠে।

ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্বব্যাপী আবেদন

১১ই আগস্ট ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূত এল.কে.ঝা নিক্সনকে লেখা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি সংক্ষিপ্ত ব্যক্তিগত বার্তা পৌঁছে দেন। বার্তায় বলা হয়:

"বিদেশি আইনজীবীদের কোনো প্রকার সহায়তা ছাড়াই সামরিক আদালাতে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার শুরু করার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া যে ঘোষণা দিয়েছেন তা ভারত সরকার, জনগণ ও সংবাদ-মাধ্যমকে নিদারুণ ভাবে উদ্বিগ্ন করে তুলেছে। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে, এই তথাকথিত বিচার প্রক্রিয়া শেখ মুজিবকে হত্যা করার প্রক্রিয়া হিসেবে ব্যবহৃত হবে। এটা পূর্ব পাকিস্তানে ও ভারতে ভয়ঙ্কর অবস্থার জন্ম দেবে, কেননা আমাদের জনগণ ও সকল রাজনৈতিক দল বিষয়টিকে কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাবেই মেনে নেবে না। তাই আমরা এ ব্যাপারে গভীর উদ্বেগের মধ্যে রয়েছি। এই অঞ্চলে স্থিতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ হিসেবে ইয়াহিয়া খানের ওপর চাপ প্রয়োগের জন্য আপনার সাহায্য প্রার্থনা করছি।"[১০১]

শেখ মুজিবের জীবনরক্ষায় ২৪টি রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আবেদন করেন। আবেদনে শেখ মুজিবের কোনো ক্ষতি বা মৃত্যুদণ্ড হলে তা মারাত্মক ফল বয়ে আনবে বলে তিনি পত্রে উল্লেখ করেন। আবেদনে বলা হয়, স্ব-স্ব রাষ্ট্র যেন পাকিস্তান সরকারের উপরে চাপ সৃষ্টি করেন যাতে পাকিস্তান ও ভারতকে বিপজ্জনক পরিস্থিতিতে পড়তে না হয়।

১৯শে আগস্ট শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বন্দি শেখ মুজিবের ভাগ্য নিয়ে যে উদ্বেগ প্রকাশ করে চিঠি লিখেছেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন তা পড়েছেন বলে চিহ্নিত করা আছে। চিঠিতে শ্রীমতী গান্ধী যে মূল বিষয়গুলো অবতারণা করেছেন তার মূল কথা হলো: এক, পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কার্যকর সম্পর্ক স্থাপনে ভারতের আপত্তি নেই। তবে ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন এটা কোনো ফলদায়ক কিছুই আনবে না। যুক্তরাষ্ট্র যদি পূর্ববঙ্গে একটি বেসামরিক সরকার স্থাপন করে শরণার্থীদের তাদের দেশে ফিরিয়ে নিতে ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে ভারত হাপ ছেড়ে বাঁচবে; দুই, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষণ নিয়োগের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন; তিন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহ বৈঠক করার পর পূর্ব পাকিস্তানে আরো বেশি অত্যাচারের মাত্রা বেড়েছে; যা নাজিদের নৃশংসতা ছাড়িয়ে গেছে, ফলে শরণার্থীরা দেশ ছেড়ে ভারতে চলে আসছে। শেখ মুজিবের মুক্তি এক্ষেত্রে সহায়ক হবে বলে ভারত মনে করে; এবং চার, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে নতুন করে অস্ত্র প্রেরণ উপমহাদেশের জন্য একটি দুঃখের অধ্যায়।[১০২]

২৮শে নভেম্বর পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে শ্রীমতী গান্ধী শেখ মুজিবের মুক্তি ও বাংলাদেশ সম্পর্কে রাজনৈতিক সমাধানের আহবান জানান। পাকিস্তান প্রেসিডেন্টকে তিনি বলেছেন, বাংলাদেশের অবস্থা ভারতের ওপর এক অসহনীয় ভার হয়ে রয়েছে। পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় হাইকমিশনার শ্রী অটলের মারফত মৌখিকভাবে একথাগুলো তুলে দিয়েছেন শ্রীমতী গান্ধী। তিনি সম্প্রতি শলাপরামর্শের জন্য দিল্লিতে এসেছিলেন। শ্রী অটলের মারফত মুখেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া একটা ঈদের বাণী পাঠিয়েছিলেন। একজন সরকারি মুখপাত্র বলেন, একথা সত্য নয় যে প্রধানমন্ত্রী ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে অভিনন্দন বাণী বিনিময় করেননি।

মুখপাত্রটি স্বীকার করেন, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছেন। এ ব্যাপারে মুখপাত্রটি জানান, প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, তিনি পাকিস্তানে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে রাজি, তবে বাংলাদেশ তাঁদের মধ্যে আলোচনার বিষয় হতে পারে না। বাংলাদেশের জনসাধারণকে তিনি কোনো সমাধানে রাজি হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কারণ এ ব্যাপারে তাঁর কোনো অধিকারই নেই।[১০৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ মুজিবের মুক্তির জন্য আন্তর্জাতিক সমাজ, সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রয়াস

শেখ মুজিবের নিরাপত্তার বিষয়ে ৪ঠা আগস্ট ভারতের লোকসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রী জগজীবন রাম এক বিবৃতিতে ঘোষণা করেন যে, "বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য পাকিস্তানের সামরিক জান্তা যে হুমকি দিচ্ছেন, তাতে লোকসভা সদস্যদের ন্যায় ভারত সরকারও গভীরভাবে উদ্বিগ্ন।"[১০৪]

বাংলাদেশ শরণার্থী ও মুক্তি সংগ্রাম সহায়ক সমিতির ডাকে আয়োজিত ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট জনসভায় শেখ মুজিবের বিনা শর্তে মুক্তির জন্য জাতিসংঘের আশু হস্তক্ষেপ দাবি করা হয়। ভারতীয় মহিলা ফেডারেশনের পশ্চিম বাংলা কমিটি মুজিবের বিচার প্রহসন বন্ধ ও তাঁর নিঃশর্ত মুক্তির দাবিতে জাতিসংঘের মহাসচিবের নিকট আবেদন করে এবং আবেদনপত্রের অনুলিপি আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক মহিলা ফেডারেশন ও অন্যান্য সংস্থার কাছেও প্রেরণ করে। ৮ই আগস্ট নয়াদিল্লির কনসটিটিউটসন ক্লাব হল-এ শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির দাবিতে এক বিরাট নাগরিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে কয়েকজন মন্ত্রী ও লোকসভায় সদস্য উপস্থিত ছিলেন। সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবে শেখ মুজিবের বিনা শর্তে মুক্তি দাবি করা হয়। সুপ্রিম কোর্ট বার এসোসিয়েশন বৈঠকে শেখ মুজিবের গোপন বিচারকে বিচারের প্রহসন বলে আখ্যা দেয়।

কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে (২৪শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১) সাবেক কমনওয়েলথ সচিব আর্থার বটমলী ইয়াহিয়া খানকে এই সত্যটি উপলব্ধি করতে বলেছেন যে, একমাত্র শেখ মুজিবুর রহমানই পূর্ব বাংলার জনগণের পক্ষে কথা বলতে পারেন। তিনি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি দাবি করে বলেন জননেতাদের কারাগারে রেখে দুনিয়ার কোনো সমস্যার যে সমাধান করা যায় না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাস থেকে ইয়াহিয়ার শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ। ইয়াহিয়া খান সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করেন যে, ইয়াহিয়া খান রাজনৈতিক নেতা নন। অথচ তাকে মোকাবেলা করতে হচ্ছে নির্ভেজাল রাজনৈতিক সমস্যার।

গায়নার প্রতিনিধি নেভিল জেমস বলেন যে পাকিস্তানকে নিন্দা করার অধিকার কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর আছে, কারণ পাকিস্তান পূর্ব বাংলাকে অবদমিত করে এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে আটক রেখে নীতি ও ন্যায় ধর্মের সকল বিধিলঙ্ঘন করেছে। কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সভার এই অধিবেশনের পাকিস্তানের প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার নেই। কেননা পাকিস্তানের কোনো পার্লামেন্ট নেই। ঐ একই কারণে নাইজেরিয়া ও উগান্ডার প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারেনি।

ব্রিটিশ সংবাদপত্র ইয়র্কশায়ার পোস্ট মন্তব্য করেছে, শেখ মুজিবের গোপন বিচার সম্পর্কে সারা বিশ্বের যে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, পাকিস্তান সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে যে ধিক্কার তুলেছে তার প্রতি জঙ্গীশাহী কর্ণপাত করলে সুবিবেচনারই পরিচয় দিতেন। পত্রিকাটিতে তীব্র প্রশ্ন তুলে বলা হয়েছে, শেখ যদি মানুষ হিসেবে খুব ভয়ঙ্কর ও খারাপ হয় তবে প্রকাশ্য আদালতে বিচার করতে সামরিক কর্তৃপক্ষ কুণ্ঠিত কেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সিনেটর মাস্কি বলেন, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত গণপরিষদ নির্বাচনে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে পূর্ববঙ্গে একটি অস্থায়ী নেতৃত্ব গঠন করতে হবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ কর্তৃক শেখ মুজিবকে মুক্তি দিতে হবে।

২৫শে সেপ্টেম্বর পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের ২৫টি রাষ্ট্রের ৬৫জন প্রতিনিধি নয়াদিল্লিতে আয়োজিত বাংলাদেশ সম্পর্কিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে (১৮-২০শে সেপ্টেম্বর) বাংলাদেশে শতাব্দীর নিষ্ঠুরতম ও জঘন্যতম গণহত্যার বিরুদ্ধে তীব্র ধিক্কার ও ইয়াহিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে সম্মুখ-সমরে অবতীর্ণ হওয়ার ব্যাপারে একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগেড গঠনের আহ্বান জানান হয়।

সম্মেলনে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামে প্রতি সর্বাত্মক সমর্থন প্রকাশ করে বলা হয় যে, সমসাময়িক মানব ইতিহাসে এর চেয়ে জঘন্যতম হত্যাকাণ্ড আর সংঘটিত হয়নি।

সম্মেলনে সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত এক প্রস্তাবে বাংলাদেশের গণজাগৃতির উদ্যোগতা বাঙালি জাতীয়তাবাদের জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে বিনা শর্তে মুক্তি দাবি করা হয়েছে।

৯ই নভেম্বর ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে অবিলম্বে মুক্তি দেওয়ার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ৪২জন বিশিষ্ট ব্যক্তি জেনারেল ইয়াহিয়ার কাছে আবেদন জানিয়েছেন। তারা গত ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের অনুরোধ করেছিলেন। যারা ঐ আবেদনে স্বাক্ষর করেন, রাজনৈতিক নেতা, আইনজীবী, সাংবাদিক, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, লেখক, ছাত্রনেতা ও সমাজসেবী।

৪ঠা নভেম্বর লাহোরে ঐ যুক্ত বিবৃতি প্রকাশ করা হয়। জেনারেল ইয়াহিয়া তিনদিনের সফরে ঐ দিনই রাওয়ালপিন্ডি হতে লাহোর গিয়েছিলেন।

বিবৃতিতে স্বাক্ষরকারীরা বলেন, পাকিস্তানের রাজনৈতিক স্থায়িত্ব বিপন্ন হবার মতো সঙ্কট দেখা দিয়েছে। গণতান্ত্রিক সরকার গঠনই এই সঙ্কট দূর করার সবচেয়ে ভাল উপায়। তারা বলেন যে, শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হলে তা ন্যায় বিচারের প্রাথমিক অনুশাসনের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

যুক্ত আবেদনে স্বাক্ষরকারীদের তালিকায় উল্লেখযোগ্য নামগুলি পার্টির প্রধান এবং পাকিস্তানের বিমান বাহিনীর প্রাক্তন এয়ার মার্শাল আসগর খাঁ, লেনিন শান্তি পুরস্কার বিজয়ী কবি ফয়েজ আহমদ, পাকিস্তান ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সভাপতি মির্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম, পাকিস্তান সোসালিস্ট পার্টির নেতা চৌধুরী আসলাম এবং দৈনিক পাকিস্তান টাইমস এর প্রাক্তন সম্পাদক মাজহার আলী খান। স্বাক্ষরকারীদের অধিকাংশই বামপন্থি বলে পরিচিত। লাহোরে পাক প্রেসিডেন্টের কাছে এই ধরণের আবেদন এই প্রথম। লাহোরকে পাকিস্তানের মুজিববিরোধী সবচেয়ে বড় কেন্দ্র বলে মনে করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বঙ্গবন্ধুর বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর ১৭ই আগস্ট সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন মৌখিকভাবে তার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে শেখ মুজিবুর রহমান যিনি পাকিস্তানের একজন স্বনামধন্য রাজনীতিবিদ তাঁর বিচারে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। বলে দেওয়া হয়, শেখ মুজিবের যদি দণ্ডাদেশ দেয়া হয় তাহলে পাকিস্তানকে কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে।[১০৫]

২৭শে নভেম্বর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন ইয়াহিয়াকে বলেন, তিনি সাহসের সঙ্গে ১৯৭০ সালে পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করতে পারেন। তিনি একথাও বলেন, শেখ মুজিবের নেতৃত্বে অখণ্ড পাকিস্তান শাসিত হোক সোভিয়েত ইউনিয়ন এই অভিমত প্রকাশ করে। অক্টোবরের প্রথম দিকে নিক্সন ভারতের সঙ্গে এবং শ্রীমতী গান্ধীর আসন্ন সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার চেষ্টা করেছিলেন ইয়াহিয়া খান ও আওয়ামী লীগের মধ্যে আলোচনা বৈঠক অনুষ্ঠানের। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর অনমনীয় মনোভাবের জন্য তা সম্ভব হয়নি।[১০৬]

৫ই ডিসেম্বর কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা পরিষদে কিছু উপস্থাপন করা হলে সে ক্ষেত্রে রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করবে, আবার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কোনো প্রস্তাব আসলে চীন সেখানে ভেটো প্রয়োগ করবে। প্রেসিডেন্ট বলেন, এর ভিতর কীভাবে সমন্বয় করা যায়, ভারত বর্তমান কোন পথ ধরেছে। কিসিঞ্জার বলেন, তাদের পরামর্শ হলো যা তারা সর্বদাই বলে আসছে তা হলো শেখ মুজিবের মুক্তি।[১০৭]

১৫ই অক্টোবর আড়াই হাজার বছর ইরানের রাজতন্ত্র পূর্তি উপলক্ষে ইরানের বাদশা উদ্যোগী হয়ে ইয়াহিয়া খান এবং সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগনি-র মধ্যে একটি বৈঠকের ব্যবস্থা করেন। ইয়াহিয়া খান কোন্ অবস্থায় সেনাবাহিনীকে ব্যবস্থা নিতে হয়েছে তা ব্যাখ্যা করেন। পদগনি সেনাবাহিনী কর্তৃক ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পর্কে বলেন, এই ব্যবস্থা নেওয়ার অধিকার সরকারের আছে, কিন্তু সাত কোটি মানুষের নেতা শেখ মুজিবকে কোন্ কারণে গ্রেফতার করা হয়েছে তা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। পদগনি বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে এবং পাকিস্তানের বিভক্তি চায় না। তিনি রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার ব্যাপারে চাপ সৃষ্টি করেন। ইয়াহিয়া বলেন, এটা অসম্ভব। কারণ মুজিব রাষ্ট্রদ্রোহিতার অপরাধ করেছেন।[১০৮]

পাকিস্তানের সাময়িক আদালতে শেখ মুজিবের বিচারের নামে যে প্রহসনের ব্যবস্থা করা হয়েছে কায়রোর আধা-সরকারি 'আল আহ্বান' পত্রিকার সম্পাদকীয় নিবন্ধে তার কঠোর সমালোচনা করা হয়।[১০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘে বন্দি মুজিবকে নিয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা

জাতিসংঘের নথিপত্রে প্রাথমিক পর্যায়ে সরাসরি বন্দি শেখ মুজিব অনুপস্থিত ছিলেন। ২৫শে মার্চ ক্রাকডাউনের পর তিন সপ্তাহের মধ্যে বন্দি মুজিবকে নিয়ে প্রথম উদ্বেগ প্রকাশিত হয় জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট[১১০]-এর সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে। এক্ষেত্রে বলা হয়, শেখ মুজিব অথবা অন্যান্য নেতৃবৃন্দ যদি কোনো অপরাধ সংঘটিত করে থাকে তাহলে তাঁদের আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য সিভিল আদালতে বিচারের সম্মুখীন করা উচিত। ইতোপূর্বে ২রা এপ্রিল এক বিবৃতিতে বলা হয়েছিল, বিশেষ সামরিক ট্রাইবুনালে বেসামরিক ব্যক্তির বিচার গ্রহণীয় হতে পারে না। অনুরূপভাবে ১২ই মে জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের সামাজিক সমিতির আলোচ্যসূচিতে মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদন-এর উপর জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি বক্তব্যে উপরোক্ত কথাই প্রতিধ্বনিত হয়।[১১১]

২রা আগস্ট জাতিসংঘের মহাসচিবের ত্রাণ সম্পর্কিত মেমোরেন্ডাম-এর জবাবে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়, ভারতের যে সকল শরণার্থী আশ্রয় নিয়েছে তারা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে যাবে না যদি না তাদের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে পাকিস্তান সরকার কোনো সমঝোতায় উপনীত না হন।[১১২] জেনেভাস্থ ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বরাবর একটি টেলিগ্রাম প্রেরণ করেন। টেলিগ্রামে শেখ মুজিবের গোপন সামরিক বিচারের প্রতিবাদ জানিয়ে বলা হয়, "বিচারকার্যে গোপনীয়তার কিছু নেই।"[১১৩]

১০ই আগস্ট প্রথমবারের মতো জাতিসংঘ মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি নিয়ে একটি বিবৃতি প্রচার করেন। বিবৃতিতে শেখ মুজিবের ভাগ্য নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং বিষয়টি মানবিক ও রাজনৈতিক কারণে অসাধারণভাবে গুরুত্ব বহন করছে, যা শান্তি ও স্থিতিশিলতা বিপন্ন করতে পারে।[১১৪] জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতির এক পর্যায়ে বিরাজমান পরিস্থিতি উল্লেখপূর্বক বলা হয়, "রাজনৈতিক সমঝোতার প্রাথমিক অংশ হিসেবে অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্ত করে তাঁর সঙ্গে সংলাপে বসা উচিত।[১১৫] ১৩ই অক্টোবর ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘে এক বিবৃতিতে উল্লেখ করেন যে, শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়েছে এই সংবাদে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উদ্বিগ্ন। এটাকে অস্বীকার করলে শুনতে তা ভালোই শোনাবে। কিন্তু কারও পক্ষে কী বলা সম্ভব বিগত ছয় মাসের ভেতরে কেউ তাকে দেখেছে। সবাই জানে ব্রিটিশ আইনজীবীদের দেখা করতে দেওয়া হয়নি, এমনকি ইন্টারন্যাশনাল কোর্টকেও ট্রায়ালের সময় উপস্থিত থাকতে পারেনি। কিন্তু সংবাদপত্র ইঙ্গিত দিচ্ছে তার বিচার শেষ হয়ে গেছে।[১১৬] একইদিনে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগাশাহী ভারতের প্রতিনিধির উত্তরে বলেন, নিউইয়র্ক টাইম্‌স পাকিস্তান মিশনে স্বপক্ষ ত্যাগকারী কূটনীতিবিদের উদ্ধৃতি দিয়ে যে সংবাদ প্রকাশ করা হয়েছে, যেখানে বলা হয়েছে শেখ মুজিবের মৃত্যুদণ্ড দেওয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে সে সম্পর্কে পাকিস্তানের পক্ষ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা হয়, এরূপ কোনো ঘটনাই ঘটেনি।[১১৭] জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে পোল্যান্ড ১৪ই ডিসেম্বর একটি প্রস্তাব উত্থাপন করে এইভাবে যে, আইনানুগভাবে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নেতা হিসেবে অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দেওয়া উচিত, কেননা এর ফলে সংঘর্ষের অবসান হবে।[১১৮] এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় জাতিসংঘের মহাসচিব তেমন জোরালোভাবে বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তির ব্যাপারে প্রাতিষ্ঠানিক বা ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণে অপারগ থেকেছেন।

মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হবে কি না?

১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান বাহিনী আত্মসমর্পণ করার পরও শেখ মুজিবের মুক্তির বিষয়ে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ উদ্বিগ্ন ছিলেন।

১৬ই ডিসেম্বরের পর বাংলাদেশ সরকারের বক্তব্য বিবৃতি

১৬ই ডিসেম্বর রাতে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম পুনরায় পাকিস্তানের কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে অবস্থানের কথা উল্লেখ করে বঙ্গবন্ধুকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে 'শপথের আগুনে ঝলসে উঠার' আহ্বান জানান।[১১৯]

১৭ই ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের পরিসমাপ্তির কথা ঘোষণা করে বলেন, 'এখনও সংগ্রাম শেষ হয়নি, কেননা মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এখনও শত্রুর কারাগারে। পাকিস্তানি শাসকদেরকে তিনি আহ্বান জানিয়ে বলেন, তারা শেষ মুহূর্তে অন্তত শুভবুদ্ধির পরিচয় দেবে, বঙ্গবন্ধু মুক্ত হবেন। এর ইতিবাচক ফল হিসেবে পাকিস্তানকে অবহিত করাও তার বন্ধুদের কর্তব্য।'[১২০]

১৭ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাবের আলোচনা প্রসঙ্গে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, তিনি শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়া হবে কিনা তা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জিজ্ঞেস করেন, কিন্তু এ বিষয়ে তিনি জোর দিচ্ছেন না।[১২১]

১৮ই ডিসেম্বর স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত বিবৃতিতে প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবিলম্বে মুক্তির দাবি করেন।[১২২]

২৩শে ডিসেম্বর মুজিবনগর হতে ঢাকায় উপস্থিতির পর বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দকে প্রাণঢালা বীরোচিত সংবর্ধনা জানানো হয়। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ বলেন, বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে পা দিয়া বারবার মনে পড়ে বাংলার নয়নমণি শেখ মুজিবকে।[১২৩]

২৪শে ডিসেম্বর বাঙালিদের সাহায্য ও সমর্থন জানানোর জন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও ভারতের জনগণকে ধন্যবাদ জানিয়ে জনাব তাজউদ্দীন আহমদ উল্লেখ করেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্ন বাস্তবায়িত হয়েছে। কিন্তু বঙ্গবন্ধু এখন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কোথায়, কেমন আছে, তা কেউ জানে না। তিনি স্পষ্টভাষায় বঙ্গবন্ধুর মুক্তি দাবি করেন।[১২৪]

১লা জানুয়ারি ১৯৭২, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদ রাতে বক্তব্যে বলেন, সোভিয়েট ইউনিয়ন ও অন্যান্য বহু দেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তির জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।[১২৫]

এসব বক্তব্যে, বিবৃতির এক পর্যায়ে ৩রা জানুয়ারি (১৯৭২) ভুট্টো কর্তৃক বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দেওয়ার ঘোষণাটি কূটনৈতিক মহলে জানাজানি হয়।

৪ই জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বাধীনতা লাভের আনন্দ অসম্পূর্ণ। কেননা, বাংলাদেশের মহান নেতা জাতির পিতা, মুক্তির দিশারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এতদিন পর্যন্ত শত্রুর হাতে বন্দি। বাংলাদেশ সরকার নানাভাবে সর্বশক্তি নিয়োগ করে মহান নেতার মুক্তির চেষ্টা চালিয়ে আসছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিনাশর্তে বঙ্গবন্ধুর আশু মুক্তির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপে ইসলামাবাদের একনায়ক সরকার মাথা নত করতে বাধ্য হয়েছে। বাংলাদেশের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা বঙ্গবন্ধুর মুক্তির খবর শোনার সাথে সাথে আনন্দে আত্মহারা। আজ শুধু একান্তভাবে প্রার্থনা, মহান নেতা বাংলাদেশে ফিরে আসুন। রক্তস্নাত বাংলাদেশের মুখে হাসি ফুটে উঠুক। আসুন আমরা অযুত কণ্ঠে বলি, 'জয় শেখ মুজিব'।[১২৬]

জাতিসংঘ থেকে ফেরার পথে লন্ডন বিমান বন্দরে ১৯ ডিসেম্বর ভুট্টোর সঙ্গে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম-এর সাক্ষাত ঘটে। সে সময় ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার আহ্বান জানান। তখন ব্রিটিশ সরকারের অভিমত ছিল এরকম যে, 'the sooner Sheikh Mujib can return to East Pakistan the better...'[১২৭] ২২শে ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট ভুট্টো মার্কিন রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে গমন করেন। সেখানে আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করার অভিমত প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি ৩৫ মিনিট অবস্থান করেন। পাকিস্তান সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্র যেভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা দিয়েছে তা ভুলবার নয়। অন্যান্য কথার মধ্যে ভূট্টো প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক ও প্রেসিডেন্ট থাকা সত্বেও অতি শীঘ্র রাজনৈতিক সরকার প্রতিষ্ঠা, শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাজনৈতিক আবহাওয়া তৈরি করার কথা বলেন। ভূট্টো পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে একটি চুক্তি করার কথা বলেন, যা পশ্চিম পাকিস্তানের স্থানীয় সমস্যার ক্ষেত্রে করতে হবে। তিনি উল্লেখ করেন পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে অবস্থার ভিত্তিতে ব্যবস্থা নেবেন। প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো ফারল্যান্ডকে জানান, শেখ মুজিবুর রহমানকে জেলখানা হতে মুক্তি দিয়ে তাঁকে রেস্টহাউজে বন্দি অবস্থায় রাখা হয়েছে। ফারল্যান্ড বলেন, তিনি খুবই আনন্দিত হবেন যথাসময়ে যদি এই শুভকাজ সম্পাদিত হয়।[১২৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর তিনি ২১শে ডিসেম্বর রাতে জুলফিকার আলী ভুট্টো বিদেশি সাংবাদিকদের বলেন যে, বন্দি মুজিবকে শীঘ্রই জেলখানা থেকে মুক্তি দিয়ে তাঁকে গৃহবন্দি অবস্থায় রাখা হবে। বিদেশি সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে ভুট্টো এ কথা জানাতে অস্বীকৃতি জানান যে, বর্তমানে শেখ মুজিবকে কোথায় বন্দি করে রাখা হয়েছে এবং কোথায় তাঁকে গৃহবন্দি করে রাখা হবে।[১২৯]

২০শে ডিসেম্বর পাকিস্তানি প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণের পর[১৩০] ভুট্টো পরিকল্পনা করেন শেখ মুজিবকে যে ভাবেই হোক রাজি করিয়ে পশ্চিম পাকিস্তান ও স্বাধীন বাংলাদেশের মধ্যে শিথিলতম হলেও একটি কনফেডারেশন গঠনের চেষ্টা করা। সেজন্য ভুট্টো বঙ্গবন্ধুর নিরাপত্তা বিষয়ে সজাগ ছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই ইয়াহিয়া খান বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করতে চেয়েছিল। প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায়, ৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ পাকিস্তানি মিলিটারি ট্রাইবুনাল শেখ মুজিবকে প্রাণদণ্ডাদেশ দেয়। প্রাণদণ্ডাদেশের ফাইল প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের টেবিলে ছিল। নথিতে প্রেসিডেন্ট স্বাক্ষর দিলেই বঙ্গবন্ধু ফাঁসির রায় কার্যকর করা ইয়াহিয়া খানের জন্য সহজ হতো। তাঁর ইঙ্গিতে বিচারের শেষ দিকে বঙ্গবন্ধুকে লায়ালপুর জেল থেকে মিয়ানওয়ালি জেলে হেলিকপ্টার যোগে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রায় ঘোষণার পর মিয়ানওয়ালি কারাগারের সেলের মধ্যে একটা কবর খোঁড়া হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু ডেভিড ফ্রস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাতকারে বলেছেন ভুট্টো একথা বঙ্গবন্ধুকে নিজেই বলেছিলেন। ভুট্টো বলেছিলেন যে, ইয়াহিয়ার দাবি ছিল ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্বেই পিছনের তারিখ দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ফাঁসি দেবে। কিন্তু তাঁর এই প্রস্তাবে ভুট্টো রাজি হননি। ভুট্টো রাজি না হওয়ার কারণও তিনি উল্লেখ করেছেন, যেমন 'বাংলাদেশে তখন পাকিস্তানের এক লাখ তিন হাজার সামরিক বাহিনীর লোক বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনীর হাতে বন্দি ছিল। তাছাড়া পাঁচ থেকে দশ লাখ অবাঙালি বাংলাদেশে আটকে ছিল। এমন অবস্থায় শেখ মুজিবকে হত্যা করলে বন্দি পাকিস্তানিদেরকে বাংলাদেশ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরত আনা কঠিন হতো। ইয়াহিয়া খানের কুচিন্তার কথা বুঝতে পেরে ভুট্টো বঙ্গবন্ধুকে মিয়ানওয়ালি কারাগার থেকে দ্রুত নিরাপদ স্থানে নেওয়ার জন্য কারাগারের প্রিজন গভর্নরকে নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী প্রিজন গভর্নর হাবীব আলী বঙ্গবন্ধুকে একটি ট্রাকের মধ্যে লুকিয়ে 'চশমা ব্যারাজ' নামক তাঁর সরকারি বাসভবনে নিয়ে যান। সেখানে বঙ্গবন্ধুকে দু'দিন রাখা হয়। সেখান থেকে বঙ্গবন্ধুকে রাওয়ালপিণ্ডি থেকে ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী শিহালাতে একটি রেস্টহাউজে (যা ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর রেস্টহাউস ছিল) নেওয়া হয়। সেখানেই পাকিস্তানের প্রেডিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো দু'বার বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাত করতে আসেন।

ভুট্টো যখন আসেন তখন একজন কর্নেল এসে মুজিবকে বলছিল, 'পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আসবে।' তারপরে সেখানে ভুট্টো আসলেন এবং মুজিবকে সালাম দিয়ে বললেন যে, 'নাউ আই অ্যাম দা প্রেসিডেন্ট অব পাকিস্তান অ্যান্ড চিফ মার্শাল 'ল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অ্যাডমিনিস্ট্রেটর।' ঐ অবস্থায় মুজিব হেসে দিলেন। তখন ভুট্টো জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনি হাসছেন কেন?' তখন মুজিব বললেন, 'আমি বুঝতে পারি একজন প্রেসিডেন্ট সিভিলিয়ান হতে পারে। কিন্তু আমি অবাক হই যখন শুনি যে, একজন সিভিলিয়ান প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক!' তখন ভুট্টো বলেছিলেন, 'দ্যাট ইজ পসিবল ইন পাকিস্তান।' তারপরই মুজিবের দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল যে, 'মি. ভুট্টো টেল মি ফার্স্ট, হোয়েদার আই অ্যাম এ ফ্রি ম্যান অর প্রিজনার।' তখন ভুট্টো উত্তর দিয়েছিলেন, 'নাইদার ইউ আর এ প্রিজনার, নর ইউ আর এ ফ্রি ম্যান।' তখন জুলফিকার আলী ভুট্টো বলতে বাধ্য হলেন যে, 'ইউ আর এ ফ্রি ম্যান।' এরপর মুজিব প্রেসিডেন্ট ভুট্টোর সাথে কথা বলতে শুরু করলেন। ভুট্টো অনেক রকমের প্রস্তাব দিলেন। কীভাবে একটা কনফেডারেশন করা যায়, কীভাবে একসাথে থাকা যায়, ইত্যাদি। কিন্তু মুজিব কোনো কথাই বললেন না। চুপ করে থেকে শুধু বললেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত আমি আমার প্রিয় সহকর্মীদের সাথে কথা বলতে না পারবো, ততক্ষণ আমার পক্ষে কিছুই বলা সম্ভবপর নয়।' এরপর মুজিবকে একটা যৌথ ইশতেহার দেওয়া হয়েছিল স্বাক্ষর করার জন্য। মুজিব সেটাও প্রত্যাখ্যান করলেন। পরিশেষে শেখ মুজিব বললেন, 'আমি কি এখন দেশে যেতে পারি?' ভুট্টো বললেন, 'হ্যাঁ, যেতে পারেন। কিন্তু কীভাবে যাবেন? পাকিস্তানের পিআইএ ভারতের উপর দিয়ে যায় না।' তখন মুজিব বললেন, 'সেক্ষেত্রে আমি লন্ডন হয়ে যাবো।' এরপর ৮ জানুয়ারি শেখ মুজিব মুক্তি পেয়ে পিআইএ'র একটি বিশেষ বিমানে লন্ডনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।[১৩১]

ভুট্টো মুজিবের সঙ্গে দুটি বৈঠক করার পাঁচ দিন পর তার প্রতিশ্রুতি রাখলেন। একটি ভাড়া করা পাকিস্তানি বিমানে করে মুজিবকে লন্ডনে পাঠিয়ে দিতে তিনি ইসলামাবাদ বিমানবন্দেরে গেলেন। সর্বোচ্চ গোপনীয়তা রক্ষার জন্য বিমানটি ছাড়লো রাত তিনটায়। মুজিবের এই গোপন ইসলামাবাদ ত্যাগের খবর সাংবাদিকরা পর্যন্ত জানলেন ১০ ঘন্টা পর। তখন মুজিব পৌঁছে গেছেন লন্ডনে।[১৩২]

সার্বভৌম বাংলাদেশ এখন বাস্তব সত্য

লন্ডনে পৌঁছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ৮ই জানুয়ারি লিখিত বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতি বঙ্গবন্ধুর বন্দি জীবনের উল্লেখ হওয়ায় ঐতিহাসিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রাসঙ্গিকভাবে উল্লেখ্য। সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ড. কামাল হোসেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন :

"বাংলার মুক্তি সংগ্রামে আজ আমি স্বাধীনতার অপরিসীম ও অনাবিল আনন্দ অনুভব করছি। এই মুক্তি সংগ্রামের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। আমার জনগণ যখন আমাকে বাংলাদেশের 'রাষ্ট্রপতি' হিসাবে ঘোষণা করেছে তখন আমি 'রাষ্ট্রদ্রোহ'-এর দায়ে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত আসামী হিসাবে একটি নির্জন ও পরিত্যক্ত সেলে বন্দি জীবন কাটাচ্ছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ আমার বিরুদ্ধে বিচারের নামে এক প্রহসন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। শুনানী অর্ধেক সমাপ্ত হওয়ার পর পাক কর্তৃপক্ষ আমার পক্ষ সমর্থনের জন্য একজন আইনজীবী নিয়োগ করে। আমি কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে 'বিশ্বাসঘাতক'-এর কলঙ্ক নিয়ে মৃত্যুদণ্ডের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। কিন্তু সবচেয়ে বিস্ময়কর, আমার বিচারের জন্য যে ট্রাইবুনাল গঠন করা হয়েছিল তার রায় কখনো প্রকাশ করা হবে না। সাবেক প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিচারের নামে প্রহসন অনুষ্ঠান করে আমাকে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলানোর ফন্দি এঁটেছিলেন। কিন্তু ভুট্টো এই মৃত্যুদণ্ড কার্যকরী করতে অস্বীকার করেন।

জনাব ভুট্টো আমাকে না বলা পর্যন্ত স্বাধীনতা সংগ্রামীদের বিজয় সম্পর্কে আমি কিছুই জানতাম না। জেলখানা এলাকায় বিমান আক্রমণের জন্য নিস্প্রদীপ জারী করার পর আমি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের কথা জানতে পারি। জেলখানায় আমাকে এক নিঃসঙ্গ ও নিকৃষ্টতম কামরায় বন্দি করে রাখা হয়েছিল যেখানে আমাকে তারা কোন রেডিও, কোন চিঠিপত্র দেয় নাই। এমনকি বিশ্বের কোথায় কি ঘটছে, তা জানতে দেওয়া হয় নাই।

প্রেসিডেন্ট ভুট্টো আমাকে পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে যে কোনো একটি সম্পর্ক বজায় রাখার ব্যাপারটি বিবেচনা করতে অনুরোধ জানিয়েছেন। আমি তাঁকে বলেছি, আমার দেশবাসীর সাথে আলাপ-আলোচনা না করে আমি কোনো কিছু বলতে পারবো না।

আমি আর এক মুহূর্ত এখানে থাকতে রাজী নই। আমি আমার জনগণের কাছে ফিরে যেতে চাই।"[১৩৩]

অন্ধকার থেকে আলোয় অভিযাত্রা

বঙ্গবন্ধু ঢাকা যাবার পথে কিছুক্ষণ দিল্লিতে যাত্রা বিরতি করেন। ১০ই জানুয়ারি, ১৯৭২ সকালে ব্রিটেনের রাজকীয় বিমান বাহিনীর একটি বিশেষ বিমানে করে বঙ্গবন্ধু নয়াদিল্লির পালাম বিমানবন্দরে পৌঁছেন। বিমানবন্দরে রাষ্টপতি ভি.ভি. গিরি এবং প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নতুন রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান। বিমানবন্দরে বঙ্গবন্ধু ভাষণে বলেন, "এ অভিযাত্রা অন্ধকার থেকে আলোয়, বন্দিদশা থেকে স্বাধীনতায়, নিরাশা থেকে আশায় অভিযাত্রা। অবশেষে আমি নয় মাস পর আমার স্বপ্নের দেশ সোনার বাংলায় ফিরে যাচ্ছি। এ নয় মাসে আমার দেশের মানুষ শতাব্দীর পথ পাড়ি দিয়েছে। আমাকে যখন আমার মানুষদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছিল, তখন তারা কেঁদেছিল; আমাকে যখন বন্দি করে রাখা হয়েছিল, তখন তারা যুদ্ধ করেছিল আর আজ যখন আমি তাদের কাছে ফিরে যাচ্ছি, তখন তারা বিজয়ী। আমি ফিরে যাচ্ছি তাদের নিযুত বিজয়ী হাসির রৌদ্রকরে।"[১৩৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য সংকেত

১. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৫তম সংশোধনী, ৩.৭.২০১১, ষষ্ঠ তফসিল [১৫০ (২) অনুচ্ছেদ] জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক প্রদত্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণা। অনুরূপ একটি ঘোষণায় ২৭শে মার্চ ১৯৭১ সালে গবেষকের নিকট আবদুর রহমান এম.পি.এ. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বাধীনতা সম্পর্কিত একটি টেলিগ্রাফিক কপি পাঠান।

২. পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ২৫শে মার্চ রাতে বাঙালি নিধনযজ্ঞে 'অপারেশন সার্চলাইট' হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। ওয়্যারলেস থেকে তাদের কথোপকথন ধরা পড়ে। "From 99 : Subsequently these were repeated to you starting from Commando Unit headed by Col Sayeeduddin. When they caged the main bird Sheikh Mujib and subsequently the two telephone exchanges, the P.S. at Raman, People's Daily, the Reserve Line, then the action that is still continuing in the area of University plus the houses in Gulshan, correction, houses in Dhanmandi, the occupants of which were not traceable. Over.....

To 99 : 16 has very little resistance in which they killed 4 and wounded about 10 after that they were fully in control House raid (Mujib's Residence)". দেখুন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র*: সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৪৭৮।

৩. 'Mujib's domestic servants were released immediately after identification while he himself was lodged in the Adamjee School for the night. Next day, he was shifted to Flag Staff house from were he was flown to Karachi three days later.' Siddiq Salik, Withness To Surreder, Oxford University Press, Karachi, 1978, p. 76.

৪. "রাওয়ালপিন্ডি থেকে একশ পঞ্চাশ মাইল দক্ষিণে লায়ালপুর কারাগার। কারাগারে বন্দি শেখ মুজিবের 'জগৎ বলতে ছিল চার দেয়াল, একটি বিছানা ও একটি জানালা, সেটাও আবার এত উচুতে যে তিনি কেবল আকাশের এক টুকরো ভাসমান দৃশ্য দেখতে পেতেন।" Ahmad Salim, *Blood Beaten Track: Sheikh Mujib's Nine Months in Pakistani Prison,* আহমদ সালিম, পাকিস্তানের লেখক ও কবি। যিনি শেখ মুজিবের গ্রেফতার, পাকিস্তানে তার আটকদশা, বিচার ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি সম্পর্কে মতামত তুলে ধরেছেন। *'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন'* গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক, সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৮, পৃ. ৩৬ ও ৪৮

৫. ২৬শে মার্চ জাতির উদ্দেশ্যে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সরাসরি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে বলেন, "His obstinacy, obduracy and absolute refusal to talk sense can lead to but one conclusion–the man and his party are enemies of Pakistan and they want East Pakistan to break away completely from the country. He has attacked the solidarity and integrity of this country–this crime will not go

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

unpunished" এবং ৯ই আগস্ট ১৯৭১ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার প্রসঙ্গে যে অফিসিয়াল প্রেসনোট দেওয়া হয় সেখানে বলা হয়, " Sheikh Mujibur Rahman, President of the defunct Awami League, will be tried by a Special Military Court for 'waging war against Pakistan' and other offences, a press Note issued by the Headquarters of the Chief Martial Law Administrator said to day", *Bangladesh Documents, Vol-I,* p. 275 and *Bangladesh Documents, Vol-II,* pp. 23-24

৬. Mirutes of Washington Special Actions Group Meeting/1 (Source: National Archiaves, Nixon Presidental Materials, NSC Files, NSC Instituational Files (H-Files), Box H-115, WSAG Minutes, Originals, 1971. Top Sectet, p. 13-15. PARTICIPATION: **Chaiman**: Henry A. Kissinger, **State:** Mr. U. Alexis Johnson, Mr. Christopher Van Hollen, Defense, Mr. David Packard, Mr. James H. Noyes, **CIA**: Mr. Richard Helms, Mr. David Blee, **JCS**: Lt. Gen. Melvin Zais, Col. Frank W. Rhea, **NSC Staff**: Col. Richard T. Kennedy, Mr. Harold H. Saunders, Mr. Keith Guthrie. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, Vol XI, South Asia Crisis, 1971, p.* 24-25,

৭. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source: National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, Vol XI, South Asia Crisis, 1971,* p. 24-25,

৮. 'I asked my friend Major Billal why he had not finished him (Mujib) off in the heat of action. He said, 'General Mitha had personally ordered me to capture him alive.' Siddiq Salik, *Withness To Surreder, op.cit,* p. 76.

৯. পাকিস্তান সামরিক জান্তা কর্তৃক পরিকল্পিত 'অপারেশন সার্চলাইট' ব্লু-প্রিন্ট, *Ibid,* p. 73.

১০. শেখ শহীদুল ইসলাম (শেখ শহীদ) ছাত্রনেতা, বঙ্গবন্ধুর স্নেহধন্য, আত্মীয় এবং পরবর্তী মন্ত্রী। লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার ২০ জুন ২০১২ ঢাকা।

১১. Telegram From the Consulate General In Karachi To the Depeartment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 249,

১২. আকাশবাণী কলকাতা কেন্দ্র থেকে সংবাদটি পাঠ করেছিলেন ইভা নাগ।

১৩. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র,* ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৭৮-৭৯

১৪. *দৈনিক আনন্দবাজার,* ৬ই মে ১৯৭১

১৫. ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর লিখিত পত্রের অংশবিশেষ। মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৬

১৬. ঐ, পৃ. ১০৭-১০৮

১৭. *দৈনিক আনন্দবাজার,* ২৩ই আগস্ট, ১৯৭১

১৮. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র,* প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯. *দৈনিক আনন্দবাজার*, ২০শে জুলাই, ১৯৭১

২০. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21, *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* pp. 192-193,

২১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* ষষ্ঠ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৩৪৫

২২. Ahmad Salim, *op.cit*, 'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন' গ্রন্থটির বাংলা অনুবাদ করেছেন মফিদুল হক, (ঢাকা: সাহিত্যপ্রকাশ, ১৯৯৮), পৃ. ৪৮ ও ৫০

২৩. রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার*, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ. ৮৯-৯০

২৪. *দৈনিক আনন্দ বাজার*, ২৩ই আগস্ট ১৯৭১।

২৫. বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান উপলব্ধি করেন বিচার প্রহসনে তাকে ফাঁসি দেওয়া হবে। তিনি প্রথমে এ. কে. ব্রোহিকে তার আইনজীবী হিসেবে নিয়োজিত করলেও অবস্থাদৃষ্টে বঙ্গবন্ধু বলেন, আমার পক্ষে কোনো আইনজীবীর প্রয়োজন নেই। আইনজীবী ব্রোহিকে পাকিস্তান রাষ্ট্রপক্ষ নিয়োগ দেয়। কিন্তু তিনি যখন অসহযোগ আন্দোলনের বিশেষ করে ১৭ই মার্চ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত যেসব ব্যক্তি আলোচনা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছেন তাদের জবানবন্দি ও জেরা করার জন্য অগ্রসর হলেন তখন তাকে কোর্ট থেকে কোনো সহায়তা করা হয়নি।

২৬. প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পাকিস্তান টেলিভিশনে ৩রা আগস্ট প্রদত্ত ইন্টারভিউ, "acts of treason, acts of open rebelition" and incited armed rebelion against the State. *The DAWN*, Karachi- August 5, 1971.

২৭. রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার*, নিউইয়র্ক, ১৯৭৩, পৃ. ৯৬-৯৭

২৮. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৬৪-৬৯। "He (Sheikh Mujib) asked me to hand over power to him in East Pakistan so that he could legalise the spearation of the Estern wing." When he did not succeed in that he wanted to do it by violance 'which I stopped'.

২৯. *The Dawn*, Karachi, August 10, 1971

৩০. *AFP* despatch dateline, Karachi, September 21, 1971

৩১. মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ *আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, পৃ. ১০৪

৩২. *The Dawn*, Karachi- October 20, 1971.

৩৩. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, সাধারণ পরিষদ

৩৪. মিজানুর রহমান খান, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৯-৯০

৩৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: সপ্তম খণ্ড*, পৃ. ১৯১; *দৈনিক ইত্তেফাক*

৩৬. *ঐ*, ২১ই আগস্ট ১৯৭১। শেখ শহিদুল ইসলাম এক সাক্ষাৎকারে বলেন, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচারে সাক্ষ্য দেওয়ার জন্য যে সকল বাঙালি রাজনৈতিক, সামরিক-বেসামরিক আমলা, শিক্ষক, সাংবাদিকদের তালিকা প্রস্তুত ও তালিম দেওয়া হয়েছিল তাদের মধ্যে এ.বি.এ. নুরুল ইসলাম, ওবায়দুল্লাহ্ মজুমদার, সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, হাবিবুর রহমান, এস.বি. জামান, ড.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রশিদুজ্জামান, শফিউল আজম, সৈয়দ জিল্লুর রহমান, বিচারপতি নুরুল ইসলাম, এডভোকেট এ.টি. সাদী, ওবায়দুল্লাহ্ (আশকার ইবনে শাইখ), ফয়জুল হক, রইসী বেগম প্রমুখ।

৩৭. Hasan Zahir, *The Separation of East Pakistan the Rise and Realization of Bengali Muslim Naionalisam*, Dhaka: The University Press Limited, 1998, p, 310

৩৮. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 89-91.

৩৯. Memorandum From Harold Saunders and Samuel Hoskinson of the National Sucurity Council Staff to the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger)/1/. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p 96, 98.

৪০. উক্ত বৈঠক-এ শরণ সিং-এর সাথে ছিলেন ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা, মিনিস্টার রাজগোত্র এবং বহিঃপ্রচার বিভাগের ডিরেক্টর এস. কে. সিং এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারির সঙ্গে ছিলেন রাষ্ট্রদূত কিটিং, সহকারী সেক্রেটারি সিসকো, স্টেট ডিপার্টমেন্টের ভ্যান হোলেন ও সিনডার।

৪১. Telegram 1096 From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. মি. কাউল পররাষ্ট্রসচিবের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* P. 263.

৪২. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১৬-১১৮

৪৩. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 104 and 172.

৪৪. National Archives RG 59, Central Files 1970-73. The Meeting was held in the Prime Minister's Office in New Delhi. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 118.

৪৫. *ibid,* p. 132-136.

৪৬. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, Washington. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p.145-152.

৪৭. সিনিয়র রিভিউ গ্রুপের কর্মকর্তা এসিট্যান্ট সেক্রেটারী যোশেফ সিস্‌কো।

৪৮. President Office The Old Excutive Building , White House, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 176.

৪৯. স্পেশাল একশন গ্রুপের মিটিং এ উপস্থিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের জন.এন. আরউইন এ মন্তব্য করেন।।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৫০. Minutes of Washington Specail Actions Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p. 185.

৫১. Memorandum for the Record/1/, PARTICIPANTS: The President: Henry A. Kissinger, Assistant to the President: John Irwin, Under Sectetary of State: Thomas Moorer, Chairman, JCS, Robert Cushman, Deputy Director of Central Intelligence: Maurice Williams, Deputy Administrator, AID: Joseph Sisco, Assistant Secretary of State: Armistead Selden, Deputy Assistant Secretary of Derense, ISA: Harold H. Saunders, NSC Staff. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p.174.

৫২. Telegram 149347 (No- Diauloge Shekh Mojibur Rahaman) From the Department of State to the Embassy in India/1/, Washington, August 31, 1971 . *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p. 200-201.

৫৩. Minutes of Senior Review Group Meeting/1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, White House Situation Room . *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 212-215.

৫৪. Telegram From Mission to the United Nations to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 231.

৫৫. Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, Washington. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 232.

৫৬. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 237.

৫৭. স্পেশাল গ্রুপের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন।

৫৮. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State, Soruce: Telegram 9599 from Islamabad, Sept. 21. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 245.

৫৯. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p. 256.

৬০. Telegram 10927 From Islamabad. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p. 263/266.

৬১. Telegram 1096 From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit,* p. 263.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬২. Analytical Summary Prepared by the National Security Council Staff, White House Setation Room, Washington. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit,* p. 270-272.

৬৩. ঐ, পৃ. ১৭৩-১৭৫।

৬৪. ঐ, পৃ. ১৩৯-১৪১।

৬৫. ঐ, পৃ. ১৪১।

৬৬. National Archives RG 59 Centrel Files 1970-73, POL 32-1,PAK. *American Secret Documents, Foreign Relations 1969-1976, op.cit,* p. 283.

৬৭. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭৬-৭৭

৬৮. ঐ, পৃ. ১৮৪।

৬৯. ৬ই জুন, সৈয়দ নজরুল ইসলাম কর্তৃক জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ

৭০. গবেষক ঐ ক্যাম্পের ক্যাম্প-ইন-চার্জ ছিলেন। মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে সাত শতাধিক প্রশিক্ষণার্থী মুক্তিযোদ্ধা 'গার্ড অব অনার' প্রদান করে। ঐ সময়ে ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। দেখুন: *বাংলাদেশ স্বাধনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, পৃ. ৬০-৬১।

৭১. ১৩ই জুন, ১৯৭১ বেতার ভাষণ, স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র থেকে প্রচারিত

৭২. *দৈনিক আনন্দবাজার*, ২২শে জুলাই, ১৯৭১

৭৩. ৫ই সেপ্টেম্বর তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

৭৪. ২৩শে নভেম্বর তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

৭৫. ৭ই ডিসেম্বরম সৈয়দ নজরুল ইসলামের বেতার ভাষণ।

৭৬. ৮ই ডিসেম্বর তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ।

৭৭. Secret Telegram August 1, 1971, From: American Counsul Calcutta, To: American Embassy New Delhi, Secretary State Washington DC. Qaiyum emphasizet that Sheikh Mujibur Rahaman must play key role in any possible settlement as only Mujib is capable of holding East Bengal people together. If Mujib is tried and executed, all hope for resolution of current impasse will be lost. For this reason Qaiyum asked that US government do everything in its power to ensure Sheikh Mujib's safety. Enayetur Rahim and Joyce L Rahim., *Bangladesh Liberation War and the Nixon White House 1971*, Dhaka: Pustaka, February 2000, p. 219.

৭৮. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ, দলিলপত্র: পঞ্চদশ খণ্ড, পৃ. ১৫৭-১৫৮ দেখুন, "মোশতাক সাহেব তার পরিবার নিয়ে একটি ফ্ল্যাটে থাকতেন। দেখা করার জন্য সেখানে গিয়ে আমাকে অনেকক্ষণ অপেক্ষা করতে হলো। সেখানে আরো কিছু লোক তার সাথে গল্পগুজবে ব্যস্ত ছিলেন। সবাই চলে যাবার পর আমার ডাক পড়লো। মোশতাক ম্যাকব্রাইডের লেখা মতামত না পড়েই একটা মন্তব্য করেন। তার এই বক্তব্য আমি কোনোদিন ভুলতে পারব না। তিনি বলেন, "You must decide, whether you want Sheikh Mujib or Independence. You can't have both," আমি এ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কথা শুনে একেবারে স্তম্ভিত হয়ে পড়ি। সাথে সাথে উত্তর দিলাম, "We want both, Sheikh without Independence or Independence without Sheikh, both are incomplete." আমি বুঝলাম, তার মন্তব্য আকস্মিক নয়। এর পেছনে একটা যোগসূত্র কাজ করছে। শেখ মুজিবকে আনতে হলে স্বাধীনতার প্রশ্নে আমাদের আপোষ প্রয়োজন। এটাও এক ধরণের ব্ল্যাক মেইল বলে আমার কাছে মনে হলো। পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোশতাক প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্যদের অগোচরে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাথে একটি রাজনৈতিক সমঝোতায় আসার চেষ্টা করেন। একই সাথে তিনি দলীয় নেতা, কর্মী ও সংসদ সদস্যদের মধ্যে হতাশা সৃষ্টি করেন।"

৭৯. Secret Telegram 14 August 1971, From: American Consul Calcutta, To: Secretary State Washington DC, Enayetur Rahim Joyce L Rahim, *Bangladesh Liberation War and The Nixon White House 1971, op.cit.*, p. 235. "If Shekh is alive, there is hope for compromise, if he is killed, there is no hope."

৮০. Enayetur Rahim and Joyce L. Rahim, *Bangladesh Liberation War and Nixons White House*, *op.cit*, p. 11.

৮১. *Ibid*, p. 182.

৮২. খন্দকার মোশতাক সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেছেন, "He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contracts between the two governments and the Begali exiles". Henry Kissinger, *White House years*, p. 870.

৮৩. Enayetur Rahim and Joyce L. Rahim, *Bangladesh Liberation War and Nixons White House, 1971*, *op.cit*, p. 224-225. I know Yahya, I know him to be a good man and I think he knows that I am a good man.

৮৪. "Telegram from the Department of State to the Consulate General in Calcutta, Washington, September 21, ১৯৭১ দেখুন, "Printed from an unsigned copy. A week after receiving this instruction, the Consulate General indicated that it was "Stymied" in its efforts to arrange a meeting with Islam. The only channel to Islam remeined through Qaiyum. Qaiyum sent a message that Islam was still keen to talk to a political officer but was seeking permission from the Indian Government to do so. (Telegram 2570 from Calcutta, September 28, ibid.)" দেখুন: *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, op.cit*, p. 225.

৮৫. "Yahya's reaction was surprisingly favorable. Recognizing that he had trepped himself, he was groping for a way out. He welcomed our contracts in Calcutta, asking only to be kept informed. He even accepted Farland's suggestion that we use our good offices to arrange secret contacts between his government and the Bengali exiles." Henry Kissinger, *white House years*, *ibid*-870,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৬. Enayetur Rahim and Joyce L. Rahim, *Bangladesh Liberation War and Nixons White House*, *op.cit.*, p. 15.

৮৭. বাগডোগরায় অনুষ্ঠিত এম.এন.এ. ও এম.পি. পদর যৌথ সভায় পূর্ণ স্বাধীনতা ও বঙ্গবন্ধুর মুক্তির সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গবেষক উক্ত সভায় এম এন.এ. হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

৮৮. "He and many others is the Awami League would walkout from the Bangladesh Government rather than 'Sell out to India.' Furthermore in his anti-Indian vituperation he added, 'We do not want the Indian army in our country any more than we want the Pak army." ১৯৮০ সনে সেপ্টেম্বর থেকে পরবর্তীকালে জহিরুল কাইয়ুম তার শান্তিনগর বাসভবনে ঘরোয়া পরিবেশে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের আবদুর রাজ্জাক, দপ্তর সম্পাদক সৈয়দ আহমদ ও গবেষকের সামনে কথাটির ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন এই ভাবে যে, তিনি বাংলার মাটিতে পাকিস্তান আর্মি যেমন চাননি, তেমনি চাননি ভারতীয় সেনাবাহিনী। *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, op.cit,* p. 157.

৮৯. "One proposal, for example, was all-out support for Yahya. Ges The White House's main plank was to ensure the Security and integrity of Pakistan." দেখুন, Henry Kissinger, *White House Years,* p. 856

৯০. idid.

৯১. ক্যাম্প-ইন-চার্জ এর দায়িত্বে ছিলেন গবেষক। এই ক্যাম্পের মধ্যে প্রায় চার হাজার গেরিলা ট্রেনিং গ্রহণ করেন। কুরমাইল ক্যাম্পটি সম্পর্কে মুজিবনগর সরকারের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ.এইচ.এম. কামারুজ্জামান লিখেছেন। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: তৃতীয় খণ্ড*, On 13.71 "We visited what may be termed the best camp: Kurmail. Present strength 700. Of these about 400 participated in guard of honor and listened to the Misisters inspring speech, drenched in heavey rain. Already 1000 have been sent for training (228+300+400). Trainer EPR. No ration. They procured rice from other side. Operations being conducted from here. Rifles 7-8 hundred. Captain explosives trainer. Major trainer, Active work by Prof. Abu Syeed, camp in Charge.

৯২. Eyayetur Rahim, Joyce L Rahim, *Bangladesh Liberation War and the Nixon White House 1971*, *op.cit.*, Dhaka, p. 17.

৯৩. Secret Telegram, 24 November 1971, From: American Embassy Islamabad To Secretary State Washington DC. এখানে উল্লেখ্য যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচারে সাক্ষ্য দেবার জন্য তারা পাকিস্তান ছিলেন। তারা ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

৯৪. He (Zahirul Qaiyum) and his group in Awami League did not intend to be dictated to by GOI (government of India) and in addition he had threatened to wallkout on BDG (Bangladesh Government) along with some 43 supporters and go to pakistan rather than 'Sell out' to India. Enayetur Rahim an Joyce L. Rahim,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Bangladesh Liberation War and Nixons White House, *op.cit*, p 409-12. "মুজিবনগর সরকারের মধ্যে একাধিক অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটার আন্তর্জাতিক মাত্রাও ছিল। খন্দকার মোশতাক পাকিস্তানের সাথে শর্ত সাপেক্ষে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন এমন প্রামাণ্য দলিল হেনরি কিসিঞ্জারের লিখিত বইতে পরিস্ফুট। জহিরুল কাইয়ুম মার্কিনীদের বলেন, তিনি মোশতাকের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা করতে এসেছেন। পাকিস্তানিদের সাথে আলোচনার বিষয়টি জহিরুল কাইয়ুম সম্ভবত উপস্থাপন করেন এবং সেভাবেই মার্কিনীরা ইয়াহিয়া খানকে জানায়। তিনি যে মোশতাক সমর্থিত একজন, এটা প্রমাণিত। কিন্তু অপর সমর্থক মুজিবনগর সরকারের পররাষ্ট্রসচিব মাহবুবুল আলম ও খন্দকার মোশতাক কখনো শেখ মুজিবকে বাদ দিয়ে স্বাধীনতার কথা বলেছেন, তেমন উল্লেখ নেই। প্রস্তাবের বিষয়বস্তু যাই থাকুক, যোগাযোগ যে করা হয় এবং সেটা যে মুজিবনগর সরকারকে না জানিয়ে করা হয়, সেটার প্রমাণ মার্কিন দলিলে রয়েছে। যেটা মুজিবনগর সরকারের ভেতরের দ্বন্দ্বের বিষয়টি প্রমাণ করে এবং কেউ যদি মনে করে, একে ষড়যন্ত্রের বিবরণ হিসেবেও দেখা যেতে পারে। বাংলাদেশ সরকারের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব, এটা ভারত সরকারের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, পরিকল্পনা ও কৌশলের বাইরে ছিলো না। যারা ভারতীয় রাষ্ট্রের মূলধারার সাথে ছিল তারাই এই দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়। যেমন এল.কে. ঝা-এর পরামর্শে কিসিঞ্জার বাংলাদেশ প্রতিনিধির সঙ্গে যোগাযোগ করার অনুমতি দিয়েছিলেন। এটা প্রকাশ হয়ে পড়লে ভারত সরকারের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। পরবর্তীকালে বলা হয় যা কিছু আলোচনা হোক না কেন, তা ভারত সরকারকে জানিয়ে বা তার মাধ্যমে করতে হবে। এর অভ্যন্তরে যেসব বিষয়াদি ছিল কোনোটাই তৎকালীন প্রধান বাস্তবতার বাইরে ছিলো না। সেই বাস্তবতা ছিলো পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীকে পরাজিত করা, সেটা ঢাকা দখল করা হোক অথবা স্বাধীন দেশ ফিরে পাওয়া হোক–দুটোই ছিল একই বাস্তবতার দুই দিক। এতে ভারত সরকার সফল হয়েছিলো এবং মুজিবনগর সরকারের রাজনীতির এই উদ্দেশ্য সফল হয়।"

৯৫. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976, op.cit*, p. 198,

৯৬. *Ibid*, p. 197,

৯৭. শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫, পৃ. ২৪৪

৯৮. আবদুল মান্নানের সঙ্গে ১৯৯১ সালে তাঁর এলিফ্যান্ট রোডের বাড়িতে গবেষকের সাক্ষাৎকার।

৯৯. এম.আর. আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, পৃ. ১৪২

১০০. ঐ, পৃ. ১৪২

১০১. *Bangladesh Documents*, *op.cit.*; মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯।

১০২. Mermorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976, op.cit*, p. 188.

১০৩. মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭১

১০৪. *দৈনিক আনন্দবাজার*, ৫ই আগস্ট, ১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৫. Hasan Zahir, *op.cit.*, p. 312

১০৬. *Ibid*, p. 320.

১০৭. Transcript of Telephone Converation Between President Nixon and His Assistant for National Security Affiars (Kissanger). *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit*, P. 351.

১০৮. Hasan Zahir, *op.cit.*, p. 312.

১০৯. *দৈনিক আনান্দবাজার*, ১১ই আগস্ট, ১৯৭১

১১০. The international Commission of Jurists, whose headquarters in Geneva, is a non-government organisation having consultative status with the United Nations Economic and Social Councial, UNESCO, and the council of Europe. *জাতিসংঘ ডক্যুমেন্ট*, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১।

১১১. ১২ই মে, ১৯৭১ জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন-এর বিবৃতি

১১২. *জাতিসংঘ ডক্যুমেন্ট*, ২রা আগস্ট, ১৯৭১

১১৩. ঐ, ১০ই আগস্ট, ১৯৭১

১১৪. ঐ, পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘ মহাসচিবের প্রতিবেদন, ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১

১১৫. ঐ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১১৬. ঐ, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের পাকিস্তান প্রতিনিধির বিবৃতির জবাবে জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি মি. সমর সেন-এর বিবৃতি

১১৭. ঐ, ৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। জাতিসংঘে পাকিস্তানের প্রতিনিধি মি. আগাশাহীর বিবৃতি

১১৮. *Draft Resolution by Poland in the Security Council*, S/10453, December 14, 1971.

১১৯. ১৬ই ডিসেম্বর (১৯৭১) সৈয়দ নজরুল ইসলামের বেতার ভাষণ।

১২০. ১৭ই ডিসেম্বর (১৯৭১) তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ।

১২১. Memorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissanger) to President Nixon. *American Secret Documents, Foreing Relations 1969-1976, op.cit*, p. 471.

১২২. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ১৮ই ডিসেম্বর, ১৯৭১

১২৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, ২৩শে ডিসেম্বর তাজউদ্দীন আহমদের বেতার ভাষণ

১২৪. *দৈনিক পূর্বদেশ*, ২৪শে ডিসেম্বর, ১৯৭১

১২৫. ঐ, ১লা জানুয়ারি

১২৬. *দৈনিক বাংলা*, ৪ই জানুয়ারি, ১৯৭১

১২৭. *The Times*, 22 December, 1971.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১২৮. Telegram From the Embassy in Pakistan to the Depertment of State. *American Secret Documents, Foreigm Relations 1969-1976, op.cit,* p. 480.

১২৯. *The Times*, 22 December, 1971.

১৩০. ২০ ডিসেম্বর ছিলো 'জেনারেলদের রাত'। পশ্চিম পাকিস্তানে ভুট্টো ঐদিন যে নাটকীয়ভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেন নিয়াজী তার বইতে তা বিস্তারিত উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান পরাজিত হলে চারিদিকে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে এবং সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা ও নিন্দা প্রকাশিত হতে থাকে। রাস্তায় বিক্ষুব্ধ জনতা নেমে আসে। সেদিন রাতে লে. জে. গুল হাসান, মে. জে. মওকত রেজা, এয়ার মার্শাল রহিম, শাকিল, উল্লাহ দুররানী ও লে. কর্নেল নাছির উল্লাহ গুল হাসানের বাসায় কার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায় তাই নিয়ে সভা করছিলো। দুররানী আজগর খানের হাতে ক্ষমতা দেওয়ার প্রস্তাব করেন, কিন্তু গুল হাসান এবং রহিম তাতে আপত্তি করেন এবং সিদ্ধান্ত নেন ভুট্টোকে ক্ষমতা দেওয়া হবে।

অন্যদিকে, একই সময় জেনারেল ইয়াহিয়া খান, আব্দুল হামিদ খান জে. ওমর এবং জে. মিঠ্ঠা ইয়াহিয়া খানের বাসায় বসে সভা করছিলেন কীভাবে ক্ষমতা ধরে রাখা যায়। কিন্তু গুল হাসানের গ্রুপ শেষ পর্যন্ত অস্ত্রের মুখে ইয়াহিয়া খানকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেন। জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রেসিডেন্ট এবং প্রধান সামরিক প্রশাসকের পদ দখল করেন।

ইয়াহিয়া খানকে বন্দি করা হয়। ঘটনার আকস্মিকতায় ইয়াহিয়ার মুখ ছাইবর্ণ হয়ে যায়। অনবরত কাঁপতে থাকেন তিনি। পরবর্তীকালে জে. (অব.) আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ১৯৭৮ সালে লাহোর হাইকোর্টে এক এফিডেভিট এ বলেন, ভুট্টো এবং তার সমর্থকরা পেশোয়ারে তার বাড়ি-ঘর পুড়িয়ে দেয় এবং তাকে পাকিস্তানের উষর খাড়িয়া এলাকার বান্নির বন বিভাগের রেস্টহাউজে বন্দি রাখে। সে সম্পর্কে ইয়াহিয়া খান বলেন, 'সেখানে আমার সঙ্গী ছিল সাপ, মশা, পোকা-মাকড় ও শিয়াল। প্রচণ্ড গরমে আমার শরীরে ফোসকা পড়ে যেতো।' দেখুন- Abu Rushd (ed.), *Secret Affidavit of Yahya Khan on 1971*, p. 14.

১৩১. ১০ই জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের তিন দিন পরে ১৯৭২ সালের ১৩ জানুয়ারি নিক্সনকে লেখা এক পত্রে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বঙ্গবন্ধুর লন্ডন সফর সম্পর্কে লিখেছেন, "লন্ডনে মুজিবের আগমন ছিল অপ্রত্যাশিত। তাঁকে বহনকারী বিমানটি যখন লন্ডন থেকে মাত্র ১ ঘন্টার দুরত্বে, তখন আমরা ইসলামাবাদ থেকে বার্তা পাই, তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। পরে তিনি (মুজিব) আমাকে বলেছেন, তিনি পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষকে বলেছেন তাঁকে ঢাকায় পাঠাতে অথবা রেডক্রস বা জাতিসংঘের কাছে হস্তান্তর করতে। ভুট্টোর তা মনঃপুত হয়নি। তিনি নিজেই তেহরান যাওয়ার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং শেষ পর্যন্ত লন্ডনে আসতে রাজি হন। আমি ঢাকায় যেতে তার জন্য একটি বিমানের ব্যবস্থা করি। এটা ছিল তাঁরই পছন্দ যে, তাঁকে যেন ভারতীয় বিমানে দিল্লিতে অবতরণ করতে না হয়। মুজিব আমাকে আরো বলেন, বাংলাদেশ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে আনুষ্ঠানিক সম্পর্কের যে কোনোই সুযোগ নেই, তা আমি ভুট্টোকে মুক্তিলাভের আগেই বলেছি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩২. ঢাকা কিংবা অন্য কোনো নিকটতর নিরপেক্ষ জায়গায় না গিয়ে কেন লন্ডন গেলেন, এ বিষয়ে বঙ্গবন্ধু পরবর্তীকালে বলেন, "... আপনারা কি জানেন না যে, আমি একজন বন্দি ছিলাম, এটি পাকিস্তান সরকারের পছন্দ ছিলো, আমার নয়।' মাত্র ২৪ ঘন্টা লন্ডনে ছিলেন মুজিব। রবিবার দিন তিনি ব্রিটিশ রাজকীয় বিমান বাহিনীর জেটে চড়ে নয়াদিল্লি যান, সেখানে থেকে বিজয়ীর বেশে ঢাকায়। দেখুন- টাইমস, ১৭-০১-১৯৭২

১৩৩. *দৈনিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক বাংলা* ও *পূর্বদেশ*; ৯ই জানুয়ারি, ১৯৭২

১৩৪. *টাইমস অব ইন্ডিয়া*, নয়াদিল্লি, ১৩ই জানুয়ারি, ১৯৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পঞ্চম অধ্যায়

মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা মোটাদাগে সরলীকৃত মনে হলেও প্রকৃত অর্থে বিষয়টি জটিল। প্রথাগত কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে ভূ-প্রকৃতি, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জাতীয় নিরাপত্তা, জাতীয় স্বার্থ ও আদর্শকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এই মৌলিক নির্ধারক সূচকগুলো গুরুত্বপূর্ণ মনে হলেও ভারতের গণ-আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত ভাবাবেগ কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণকে জটিল করে তোলে। এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে সামরিক সংঘর্ষ, মানবাধিকার লঙ্ঘনের নৃশংস ঘটনাবলি এবং অভ্যন্তরীণ জনমতের প্রবল চাপ, বৈশ্বিক অবস্থান ও পরিবেশ। অন্যান্য দেশের সঙ্গে ভারতের মৌল কূটনৈতিক নীতিমালা ভূমণ্ডলীয় বৈশিষ্ট্যে বিশেষ ছকে বিচার্য হতে পারে, কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে তা সহজসাধ্য ছিল না। এক্ষেত্রে শুধু আদর্শগত-রণনীতিক দিক যা কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিকে ছায়াবৃত বা সম্প্রসারিত করে থাকে তার ঊর্ধ্বে বিষয়টি ভিন্নতর অবয়বে বিচার্য। রাজনৈতিক, আদর্শগত দিক যাকে বলা হয়ে থাকে 'পদ্ধতিগত চিন্তার বৃত্তে আটকানো পদ্ধতি' যা[১] একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে সত্য, কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে এটাই পূর্ণাঙ্গ রূপকল্প হিসেবে গ্রহণ করা ছিল অপর্যাপ্ততা। এক্ষেত্রে ভারতকে আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করতে গিয়ে মূলত কয়েকটি মৌলিক স্তরকে বিবেচনা করতে হয়েছে। প্রথমত, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের অবস্থান ও বৈশ্বিক পরিবেশ; অন্য একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ সংকটে জড়িয়ে পড়ার যৌক্তিকতা; দ্বিতীয়ত, অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ভারতের জনগণের অদম্য মনোভাব এবং মতামতের প্রভাব; তৃতীয়ত, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তির সক্ষমতা; এবং চতুর্থত, শীর্ষ নেতৃত্বের বিশ্বাস, মূল্যবোধ এবং নিজস্ব ব্যক্তিত্বের কর্মক্ষমতা। এর সঙ্গে প্রবলভাবে যুক্ত ছিল আবেগ। এই সবকিছু মিলেই বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়।[২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্তির প্রক্রিয়ায় বাঙালি মুসলমান ও বাঙালি হিন্দু সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রদায়গত দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল এবং দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে যে ভয়াবহ মতবিরোধ, সংঘর্ষ ও দাঙ্গা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মনোজগৎ থেকে সাম্প্রদায়িকতার সেই রেশ ১৯৭১ সাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ বিদূরিত হয়েছিল এমনটি বলা যাবে না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামে কংগ্রেসের ভূমিকা ছিল সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান এবং মুসলিম লীগের লক্ষ্য ছিল কংগ্রেসের 'অখণ্ড ভারত' থেকে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি। সে কারণেই মূলত বাঙালি মুসলমানদের রাজনৈতিক আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারতীয় কংগ্রেস, যে সংগঠনটি প্রধানত হিন্দু সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতৃত্বের করায়ত্ত ছিল। এই বিরোধের মূল সূত্রপাত ছিল প্রথমদিকে যতটা অর্থনৈতিক; ধর্ম ততটা মুখ্য ছিল না। কিন্তু ১৯৪০-১৯৪৬ সালের মধ্যে অর্থনৈতিক বঞ্চনাকে ছাপিয়ে ধর্ম মুখ্য ভূমিকায় চলে আসে। শেষপর্যায়ে ধর্মই বিরোধের মূল কেন্দ্র হিসেবেই বিবেচিত হয়। এক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা বাঙালি মুসলমান মনোজগতে প্রবলভাবে ক্রিয়াশীল হয়েছে। আবার লক্ষণীয় যে, পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পরপরই পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর ধর্মীয় জিগির ও ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের উপর যে কলোনিয়েল শাসন-শোষণ চাপিয়ে দেওয়া হয় তার বিরুদ্ধে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণি এবং প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ খেটে খাওয়া জনগোষ্ঠীকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে। ফলে ধর্মের স্লোগান দিয়ে যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে রাষ্ট্রের মূল সূত্রকেই পূর্ববঙ্গের সচেতন জনগণ অস্বীকৃতি জানাতে থাকে। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে যেখানে ধারণাগতভাবে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ অথবা সাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তার বিপরীতে পূর্বাপর বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা বিকশিত হতে থাকে। ১৯৪৮ সাল থেকে রাষ্ট্রভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার অশুভ তৎপরতার মধ্য দিয়ে বাঙালি জাতীয়তাবাদের ধারণা স্ফীত হতে থাকে। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পিছু হটার মাধ্যমে বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও আঞ্চলিক শাসন-শোষণের চিত্রটি সামনে চলে আসার ফলাফল হিসেবে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী পূর্ববঙ্গে চরমভাবে পরাজিত হয়। পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠী গণ-আকাঙ্ক্ষার এই সম্মিলিত চরিত্রকে বিশ্লেষণ করতে ব্যর্থ হয়ে একে 'ভারতের চক্রান্ত' হিসেবেই অভিহিত করেছে। পূর্ব বাংলার জনগণ পশ্চিম পাকিস্তানের শাসক গোষ্ঠীর 'ইসলাম বিপন্ন' ও 'কাশ্মীর ইস্যুকে' তেমন প্রাধান্য দেয়নি বরং তাদের কাছে বড়ো হয়ে ওঠে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন। ১৯৫৮ সালের পর বাঙালি রাজনীতিবিদদের কাছে এমন কোনো আশা জাগ্রত ছিল না যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়ে তারা কোনো দিন ক্ষমতাসীন হবেন অথবা শাসন-শোষণের অবসান ঘটাতে সক্ষম হবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে শেখ মুজিবের ছয় দফা আন্দোলন, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা[৩], ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান, প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের বিদায়, প্রধান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের ক্ষমতা গ্রহণ, ১৯৭০ এর নির্বাচন বাঙালি জাতীয় জীবনকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উজ্জীবিত করেছে। পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নির্বাচনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় গণ-মুক্তির প্রকাশ। এই নির্বাচন ছিল পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বঙ্গবন্ধু ও আওয়ামী লীগের প্রতি বাংলাদেশের জনগণের নিরঙ্কুশ গণ-ম্যান্ডেট।

১৯৭০-এর নির্বাচনের পর হতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তার কাঙ্খিত স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে প্রকাশ্যে মাঠে নেমে পড়েন।[৪] অসহযোগ আন্দোলনকে পর্যায়ক্রমিক সশস্ত্রকরণের মাধ্যমে পহেলা মার্চ '৭১ থেকে ২৫শে মার্চ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অতুলনীয় নেতৃত্বে গোটা বাঙালি জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য সশস্ত্র যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়ে। স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্মম আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রবল গণ-প্রতিরোধ ও সশস্ত্র সংগ্রামে যে আবেগ তৈরি হয়, সেই আবেগ পশ্চিম বাংলা ও সর্ব ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়। সেই বিপুল আবেগকে অস্বীকার করার উপায় ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের ছিল না। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে যেখানে নির্মোহ দৃষ্টিতেই সবকিছু বিচার্য, কিন্তু পরিস্থিতি এমন ছিল যে, কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণেও এই ভাবাবেগকে এড়িয়ে যাবার উপায় ছিলো না। বিষয়টি গতানুগাতিক দ্বিপাক্ষিক রাষ্ট্রীয় সম্পর্কের মতো নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে রক্তস্নাত বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য রাষ্ট্রের যে দ্বিপাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক তা থেকে এর পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমিকা ছিল ভিন্নতর। এমনকি, অভ্যন্তরীণভাবে বাংলাদেশকে ঘিরে ভারত সরকার কূটনৈতিক সূত্র নির্ধারণে নানামুখি চাপের সম্মুখীন হয়।

কূটনৈতিক ক্ষেত্রে আদর্শিক সূত্রগুলোর প্রভাব যে নেই একথা বলা চলে না। আন্ত র্জাতিক পরিপ্রেক্ষিতে আদর্শবাদ কখনো ভিত্তি হয়ে থাকে, কখনো বা কৌশলগত পর্যায়ে গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু আদর্শিক ও মৌলিক নির্দেশনা ব্যতীত কোনো রাষ্ট্রই কূটনৈতিক কার্যক্রম এগিয়ে নিতে পারে না; অনেক ক্ষেত্রে কূটনৈতিক পর্যায়ে আদর্শের নিরিখে করণীয় বা বর্জন নীতি গৃহীত হয়।[৫] বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা নির্ধারণে আদর্শিক দিকগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা মুজিবনগর সরকারের ঘোষিত নীতি ভারতের রাষ্ট্রীয় ও কূটনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্য হওয়ায় নীতি নির্ধারণে ভারতকে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ঘোষিত মৌলিক নীতিমালার সঙ্গে ভারতীয় রাষ্ট্র দর্শন ও ক্ষমতাশীন কংগ্রেসের নীতিগত বৈপরীত্য না থাকায় ভারত সরকারের পক্ষে নীতি নির্ধারণে অসুবিধার সৃষ্টি হয়নি।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ভারতের জনগণ ও সরকারের নিকট থেকে যে সর্বাত্মক সাহায্য-সহানুভূতি লাভ করে তার একটা বড়ো কারণ হলো, মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী দল আওয়ামী লীগের দলীয় আদর্শ।[৬] প্রথমত, গণতন্ত্র ও অসাম্প্রদায়িক রাজনীতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগের সঙ্গে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের আদর্শগত সাদৃশ্য। দ্বিতীয়ত, ভারতের রাজনৈতিক দল ও গণমাধ্যমে বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমতের প্রতিফলন ঘটেছে পূর্ণমাত্রায়। তৃতীয়ত, ভারত বিভাগে 'এপার বাংলা, ওপার বাংলা' সংক্রান্ত বিভক্তির মর্মবেদনা ও ঐ সময় জন্মভূমি ত্যাগকারী মানুষের নস্টালজিয়া। চতুর্থত, মুক্তিযুদ্ধের নয়মাস পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নির্বিচারে নির্যাতন, গণহত্যা, ধর্ষণ যে কোনো হৃদয়বান মানুষকে অসহায় ছিন্নমূল বাঙালি জাতির পাশে দাঁড়াতে উদ্বুদ্ধ করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জনগণ ও প্রায় সব প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলগুলো আবেগ ও আদর্শগতভাবে দ্ব্যর্থহীন সমর্থনের নৈতিক ভিত্তি খুঁজে পেয়েছিল। সেজন্য দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন সংগঠন ও সংস্থা মৌলিক নীতি নির্ধারণে ভারত সরকারের উপর প্রায় অভিন্ন চাপ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকেই এমনকি ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে যে একুশ দফাভিত্তিক ম্যানিফেস্টো রচিত হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল ভাষা-সাহিত্য, সাংস্কৃতিক মুক্তি ও সামন্ততন্ত্রের অবশেষসমূহের বিলুপ্তি, স্বশাসন এবং সমাজতান্ত্রিক দাবিগুলো। পরবর্তীকালে বড়ো বড়ো শিল্পের জাতীয়করণের দাবি তোলে কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও আওয়ামী লীগসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং প্রগতিশীল ছাত্রসমাজ। ১৯৬৯ সালে প্রচারিত 'নীতি ও কর্মসূচি'তে আওয়ামী লীগের লক্ষ্য হিসেবে বর্ণিত হয় 'অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠাকল্পে সমাজতন্ত্র কায়েম'। পরবর্তী পর্যায়ে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ১লা মার্চ করাচির *ডন* পত্রিকায় প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান দেশে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠায় দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁর বক্তব্যের স্পষ্ট চিত্রায়ন ছিল, ভারতের সঙ্গে সৎ প্রতিবেশী হিসেবে বসবাস ও ব্যবসা-বাণিজ্যসহ সম্পূরক অর্থনৈতিক সম্পর্ক। যে কারণে ভারতের বামদলসহ উদার রাজনৈতিকদলগুলো মুক্তিযুদ্ধকে সক্রিয়ভাবে সমর্থন জানিয়েছে। শেষ পর্যন্ত 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের' সূত্র হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়নসহ পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। একই পরিপ্রেক্ষিত ইসলামি উম্মাহ এবং পুঁজিবাদের সমর্থক রাষ্ট্রগুলো বাংলাদেশের বিরোধীতা করে। চীন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল, কারণ চীনের সমাজতান্ত্রিক ধারণার সঙ্গে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্বদানকারী বাংলাদেশ সরকারের সমাজতান্ত্রিক ধারণার পার্থক্য ছিল। উপরন্তু, চীন-ভারত দ্বন্দ্ব ও সোভিয়েত-চীন দ্বন্দ্বও এই ক্ষেত্রে সক্রিয় ছিল।

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাতীয় স্বার্থ প্রাধান্য পায় এটা অস্বীকারের উপায় নেই। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ভারতের ভূমিকাকে কেবল জাতীয় স্বার্থের নিরিখে বিচার করা ঠিক হবে না। কারণ ভারতের গণমানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধের ব্যাপক গ্রহণযোগ্যতার পেছনে ভাবাবেগ ও আদর্শিক আবেদন কোনোক্রমেই খাটো করে দেখা যাবে না। এর অর্থ এই নয় যে, কেবল ভাবাদর্শগত কারণে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সর্বাত্মক ভূমিকা রেখেছে। একই সঙ্গে ভারতের জাতীয় স্বার্থের অনুকূলে ছিল এই সিদ্ধান্ত। পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের জন্ম ভারতের দিক থেকে কৌশলগত, অর্থনৈতিক ও নিরাপত্তার দিক থেকে বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বার্থসংশ্লিষ্ট। মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা ছিল একই সঙ্গে মানবিক, আদর্শবাদিতা ও জাতীয় স্বার্থ দ্বারা পরিচালিত। জাতীয় স্বার্থ অর্জন করা প্রতিটি রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য। ভারত জন্মলগ্ন থেকেই প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। পাকিস্তানের আগ্রাসী ভূমিকা ভারতের পররাষ্ট্র পরিমণ্ডলকে সর্বদা ব্যতিব্যস্ত করে রেখেছে। পাকিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলে কাশ্মীর সমস্যা এবং পূর্বাঞ্চলে আসাম[৭] বিদ্রোহ তৎপরতা ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও অখণ্ডতাকে সর্বদাই হুমকির মুখে দাঁড় করিয়ে রেখেছে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাকিস্তান সামরিক গোয়েন্দা বাহিনী পূর্বাঞ্চলকে অস্থিতিশীল রাখার লক্ষ্যে সশস্ত্র সহায়তা প্রদান করেছে। এটা ছিল ভারত রাষ্ট্রের জন্য নিরাপত্তার প্রতি একটি অসহনীয় ঝুঁকির বিষয়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পূর্বাঞ্চলে ভারত বিরোধী সশস্ত্র তৎপরতা বন্ধের এবং বাংলাদেশ স্বাধীন হলে এই ধরনের তৎপরতা ভারত রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও সংহতি বিদূরিত হবে বা বহুলাংশে হ্রাস পাবে.ভারতীয় কূটনৈতিক নিরাপত্তা বিশ্লেষকদের নিকট এই পরিস্থিতি ছিল এক অপূর্ব সুযোগ। একই সঙ্গে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল হাতছাড়া হলে বা স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা যেমন সংহত হবে, তেমনি বৈরী দেশ পাকিস্তানের সরাসরি সশস্ত্র হস্ত ক্ষেপের সম্ভাবনা হ্রাস পাবে। ভারতীয় নীতি নির্ধারকদের কাছে এটা অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হলে একদিকে যেমন পূর্বাঞ্চলে সামরিক-সংহতিমূলক কর্মকাণ্ডে ভারতের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা সুদৃঢ় হবে, অন্যদিকে আর্থিক ক্ষেত্রে বিপুল সামরিক বাহিনী রক্ষাণাবেক্ষণের ব্যয় সাশ্রয় পাবে। এছাড়াও বাংলাদেশ সংকটে ভারতের কূটনৈতিক মূল লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে দুর্বল করে উপমহাদেশে স্বীয় ক্ষমতা ও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা এবং উদীয়মান এশীয় শক্তি হিসেবে নিজেকে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপন করা।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকার অন্বেষায় অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষিত, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের কাঙ্ক্ষিত ভাবনার দৃঢ়তার বহিঃপ্রকাশ ভারত সরকারকে তড়িৎ কার্যকর এবং সফল কূটনৈতিক তৎপরতা গ্রহণে অব্যাহতভাবে ইতিবাচক চাপ সৃষ্টি করেছে। সে সময়কার বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, পরাশক্তির অবস্থান এবং বৃহৎ শক্তিবর্গ কর্তৃক বাংলাদেশ সংকটকে পাস কাটিয়ে যাবার মনোভাবের সঙ্গে ভারত-বাংলাদেশের কোটি কোটি মানুষের আবেগ, আদর্শগত ও জাতীয় স্বার্থের ধারণাগত পরিপ্রেক্ষিত বিবেচনা করতে হবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক আচরণ ও অবস্থান। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ে ভারত সরকার, জনগণ, রাজনৈতিক দল, বুদ্ধিজীবী এবং বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ, গণমাধ্যম ও সংগঠন এত গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে, শেষ পর্যন্ত ভারতকে বিশ্ব পরিসরে সার্বিকভাবে কূটনীতিক যুদ্ধের মনোভাব ও দৃঢ় মানসিকতা নিয়ে সকল প্রতিকূলতা মোকাবিলা করতে হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা-পরিকল্পনা ভারতের অজানা ছিল না।[৮] ২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গণরায়কে নস্যাৎ করার লক্ষ্যে যেভাবে বাংলাদেশের জনগণের উপর আকস্মিক আক্রমণ ও নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞ চালায় ভারত সরকারের কাছে তা ছিল অচিন্তনীয়। অগণিত ছিন্নমূল নিঃস্ব মানুষের নিরবচ্ছিন্ন মিছিল, বাংলাদেশের প্রতিরোধ যুদ্ধ, বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতা ঘোষণাসহ উদ্ভূত পরিস্থিতি ভারতকে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক সংকটের আবর্তে ঠেলে দেয়। এ অবস্থা ভারতের জনগণ, পার্লামেন্ট, জনপ্রতিনিধি ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষকে আবেগ আপ্লুত করে ফেলে। সেই আবেগের প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় ভারতের লোকসভা ও রাজ্যসভায় উপস্থাপিত জনপ্রতিনিধিদের কণ্ঠস্বরে। বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দুঃসহ অবস্থা, মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে অস্ত্র তুলে দেওয়া এবং অবিলম্বে সরাসরি সামরিকবাহিনী প্রেরণ করে পাকিস্তানহানাদার বাহিনীকে পরাজিত করে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান ভারতীয় জনগণের আশু দাবি হিসেবে সরকারকে প্রচণ্ডভাবে ধাক্কা দেয়।

গণতান্ত্রিক সরকার হিসেবে এসব দাবিকে উপেক্ষা করার কোনো পথ খোলা ছিল না। বরং পার্লামেন্টে ও রাজনৈতিক দলসমূহে এবং বিভিন্ন শ্রেণি পেশা বিশেষজ্ঞদের অভ্যন্তরীণ এসব দাবিকে সরকার বহির্বিশ্বে কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও কূটনীতি পরিচালনার ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। অভ্যন্তরীণ গণ-আকাঙ্ক্ষা, কূটনৈতিকভাবে বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরার ক্ষেত্র নির্ণয়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী সার্থকভাবে ইস্যুগুলোকে কাজে লাগিয়ে সমগ্র ভারতের জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করতে সমর্থ হন। সেজন্য বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের কূটনৈতিক ভিত্তির গতিধারা বিচিত্র ধারায় পরিচালিত হয়েছে মনে হলেও কূটনীতি ভিত্তি নির্মিত হয়েছে অর্ধ-শতকোটি মানুষের মূর্ত-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে।

এ অধ্যায়ে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন পার্লামেন্ট, রাজনৈতিক দল ও বিভিন্ন শ্রেণি পেশার মানুষ যেভাবে সরকারের উপর ঐক্যবদ্ধ ও নিরবিচ্ছিন্নভাবে চাপ প্রয়োগ করেছে, কূটনৈতিক ভূমিকার বিশ্লেষণে সেসব ঘটনাপ্রবাহ ও কার্যক্রম অপরিহার্যভাবে চলে এসেছে। সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক বিষয় এই যে, অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও সামগ্রিক পরিস্থিতি একটি দেশের কূটনীতিকে কীভাবে অবয়ব দিয়েছে এবং সুনির্দিষ্টভাবে পরিণতির দিকে নিয়ে গেছে বিশ্লেষণে তার যথার্থ উপযোগিতা খুঁজে পাওয়া যাবে। এ কারণে পর্ব বিভক্তি প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের প্রথম পর্বে বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে সর্বস্তরের গণ-আকাঙ্ক্ষার প্রবল আবেগ এবং আবেগকে ঘিরে কূটনৈতিক ভিত্তি গড়ে ওঠার পশ্চাদভূমির (Hinter land) সার সংক্ষেপ বর্ণিত হয়েছে এবং দ্বিতীয় পর্বে প্রথম পর্বে আবর্তিত দাবিগুলোর কূটনৈতিক রূপায়ণ ও বাস্তবায়ন কীভাবে পরিচালিত হয়েছে তার বর্ণনা ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রথম পর্ব

কূটনীতির প্রথম ধাপ: পূর্ববঙ্গ নামকরণ

ভারতীয় রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রথম ধাপেই পাকিস্তান রাষ্ট্রের দু'অংশের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের নাম পরিবর্তন করে বাংলাদেশ রাষ্ট্রকে পৃথক সত্তা হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠনের পর এবং ১৭ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের শপথ গ্রহণের পূর্বেই ১৫ই এপ্রিল ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তান নাম ব্যবহার না করা এবং এর স্থলে 'পূর্ববঙ্গ' নামটি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত নেয়।[৯] পূর্ব পাকিস্তান নামের স্থলে সরকারিভাবে পূর্ববঙ্গ নাম ব্যবহার করার সিদ্ধান্তের মাধ্যমে ভারত সরকার বিশ্ববাসীকে এই বার্তা পাঠিয়ে দেয় যে, বর্তমান অবস্থায় পূর্ব পাকিস্তান একটি পৃথক রাষ্ট্রীয় সত্তা যা পূর্ববঙ্গ নামে তারা অভিহিত করবে। এখানে কৌশলগত কূটনৈতিক কারণে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের স্থলে 'পূর্ববঙ্গ' নাম ব্যবহার করলেও বাংলাদেশ নাম ব্যবহার থেকে বিরত থাকে।

১. কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে অভ্যন্তরীণ চাপ

বাংলাদেশের ঘটনাবলিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ অনেক দেশই পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে। সরকারগুলোর পক্ষ থেকে বিশেষকরে চীন দ্ব্যর্থহীনভাবে ঘোষণা করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু ভারতীয় জনমত, গণসংগঠন এবং সভ্যসমাজ মনে করে যে, বাংলাদেশের নিষ্ঠুর অমানবিক কর্মকাণ্ড যা বিশ্ব ইতিহাসে নজিরবিহীন ট্রাজেডি, তার মোকাবেলায় ভারতকে 'এক্ষুণি' ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। বাংলাদেশকে সামরিক অভিযানের মাধ্যমে দখল করতে হবে এবং স্বীকৃতি দিতে হবে। এই মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে ভারতীয় পার্লামেন্টে; লোকসভায় আবেগ আপ্লুত সদস্যদের কণ্ঠস্বরে, জনসভায় উত্তেলিত স্লোগানে, রাজপথে দীর্ঘ মিছিলের অবয়বে, গণমাধ্যমের নিরবিচ্ছিন্ন প্রচার-প্রচারণা কিংবা সংগীতের বিদ্রোহী সুরবাণীতে বা জয়বাংলার অহোরাত্রির জয়ধ্বনিতে। এই সম্মিলিত গণশক্তির অন্তর্নিহিত প্রচণ্ড প্রভাবকে কোনো গণতান্ত্রিক সরকারই উপেক্ষা করার ক্ষমতা রাখে না। যার ফলে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কণ্ঠে ঘোষিত হয় যে, "ভারত কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে না, কিন্তু পূর্ববঙ্গে যা ঘটছে তা প্রকৃতপক্ষে অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে ধরে নেওয়া যায় না।"[১০]

ক. ভারতীয় লোকসভায় আলোচনা

২৬শে মার্চ, ১৯৭১ সাল দুপুর ২টা ৪ মিনিটে ভারতের লোকসভা অধিবেশন চলছিল। স্পিকারের আসনে ছিলেন আর.ডি. ভান্ডারি। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা, প্রতিরোধ সংগ্রাম ও স্বাধীন বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনাবলি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার শুরুতেই ভারতীয় লোকসভার সদস্য সমর গুহ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর নৃসংশতা, নিরীহ জনগণের উপর নিষ্ঠুর আক্রমণ,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গণহত্যা এবং মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের ঘটনাবলি উপস্থাপন করেন। পাশাপাশি পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ, বিক্ষিপ্ত যুদ্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যা অথবা বন্দি করার প্রসঙ্গ বিশ্বপরিসরে তুলে ধরার আহ্বান জানান। তার বক্তব্যে প্রতিফলিত হয় যে, পাকিস্তান জনগণ ও সামরিক সরকারকে জানিয়ে দেওয়া দরকার যে, ইয়াহিয়া খান যে ঘৃণ্য পন্থা অবলম্বন করেছে তার বিরুদ্ধে সমগ্র ভারতবাসী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে। এরই সাথে সুর মিলিয়ে ইসহাক সম্ভলী বলেন, "আজ পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যরা বাংলাদেশে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, অনতিবিলম্বে এই সমস্যা রাষ্ট্রসংঘে তোলা উচিত।"[১১]

বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ২৭শে মার্চ ভারতীয় রাজ্যসভায় বিতর্ককালে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বাংলাদেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পদদলিত করে পাকিস্তান সামরিক জান্তা আলোকিত পথ থেকে অন্ধকারে, গণতন্ত্রের পরিবর্তে রক্তস্নাত ট্র্যাজেডি, আস্থা ও বিশ্বাসের পথ থেকে বিপর্যয়ের পথে সমগ্র জাতিকে ঠেলে দিয়েছে বলে উল্লেখ করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য ছিল, "এটা বাংলাদেশের জন্য শুধু বিপজ্জনক নয় অথবা ভারতের একটি অংশের জন্যও নয় বরং গোটা ভারতের জন্য বিপদ ডেকে এনেছে। শেখ মুজিবুর রহমান গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতান্ত্রিক মূল্যবোধে বিশ্বাসী এবং সমগ্র জনগণ তাঁর পেছনে বিস্ময়করভাবে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। বাংলাদেশের জনগণের সীমাহীন দুঃখ বেদনার সঙ্গে আমরা শুধু সহমর্মিতা প্রকাশ করছি না, তাঁদের এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্ত করার বিষয়টি আমাদের নিরাপত্তার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট।"

২৭শে মার্চ বিকাল ৪ টায় বাংলাদেশের সংঘটিত ঘটনাবলি নিয়ে ভারতের লোকসভায় পুনরায় আলোচনা শুরু হলে স্পিকার বলেন, পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং প্রধানমন্ত্রীর বিবৃতির পর আর কোনো আলোচনা চলতে পারে না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী স্পিকারকে অনুরোধ করে বলেন যে, ব্যতিক্রম হলেও এই হাউজে সদস্যদের গভীর অনুভূতি প্রকাশের সুযোগ দেওয়া উচিত। এ পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র এবং নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে ১৯৬৯ সালের ২৮শে নভেম্বর যে ঘোষণা দিয়েছিলেন সে বিষয়ে সরকার অবগত। কিন্তু নির্বাচন পরবর্তী সময়ে ঘটনা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হয়। শান্তিপূর্ণ অবস্থা থেকে সংঘর্ষের পথে ধাবিত হয়। তিনি বলেন যে, শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশগুলোর সাহায্য কামনা করেছেন, "এই সংগ্রাম যদি অব্যাহত থাকে" তাহলে অবশ্যই বাংলাদেশের স্বাধীনতা সমর্থনে আমাদের সম্ভাব্য প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকবে।[১২]

এই বক্তব্যের মাধ্যমে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে দুটি বিষয় পার্লামেন্ট সদস্যদের নিকট থেকে স্পষ্টভাবে অবহিত হতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চেয়েছেন। তার প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের চলমান 'স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত থাকবে' কিনা এ বিষয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। কেননা তখন পর্যন্ত বাংলাদেশের কোনো গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়নি বা বাংলাদেশের ঘটনা প্রবাহ সম্পূর্ণরূপে তিনি অবগত হতে পারেননি। বাংলাদেশের অভ্যন্তরে তখন বিক্ষিপ্ত, বিচ্ছিন্নভাবে প্রতিরোধ সংগ্রাম চলছিল। এই অবস্থায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে 'এই সংগ্রাম যদি অব্যাহত থাকে' এ ধরনের মন্তব্য করাটাই স্বাভাবিক। বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকেফহাল না হওয়া পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশের সংগ্রাম সম্পর্কে যে সংশয় প্রকাশ করেছেন তার যৌক্তিকতা অস্বীকার করা যায় না।[১৩]

অবস্থা ছায়াবৃত থাকার পরেও লোকসভায় সসদ্যগণ বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক বক্তব্য রাখেন। এ.কে. গোপালন বলেন, "বাংলাদেশে প্রকৃত অর্থেই গৃহযুদ্ধ চলছে, যে যুদ্ধ সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে গণতন্ত্রকামী মানুষের ইচ্ছা ও আকাঙ্ক্ষা বাস্তবায়নের যুদ্ধ।" বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি মার্চের শেষ দিক হতে শুরু করে ক্রমাগতভাবে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে পরিণত হয়। ২৭শে মার্চেই লোকসভার কিছু সংখ্যক সদস্য বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের দাবি জানান। সমর গুহ তাৎক্ষণিক স্বীকৃতির দাবি সমর্থন করে বলেন, প্রকৃত গণতন্ত্রের মর্মবাণী অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আছে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণার এবং আন্তর্জাতিক আইনানুযায়ী ভারতেরও অধিকার আছে স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের।[১৪] সাবেক প্রভাবশালী কেন্দ্রীয়মন্ত্রী ভি. কে. কৃষ্ণ মেনন মন্তব্য করেন, "ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতিদানের বিষয়টি সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে খুব একটা দূরে নয়। বাংলাদেশের নবীন সরকার যদি আবেদন করে বা অনুরোধ জানায় তাহলে কোনো কিছুর লেশমাত্র পরোয়া না করে ঐ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের ঝুঁকি নিতে হবে।"[১৫] হরি প্রসাদ শর্মা স্বীকৃতি বিষয়ে বলেন, এ বিষয়ে যথাসময়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হলে, ভারত যে কেবল প্রতিবেশীর স্বার্থের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করার নজির স্থাপন করবে তাই নয় বরং ভারতের নিজস্ব মৌল আদর্শের সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করা হবে। আলোচনায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে এস. এ. শামীম বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিরোধীতা করেন। তিনি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করেছেন বিচ্ছিন্নতাবাদ হিসেবে। পরবর্তী বাংলাদেশ বিষয়ক যে কোনো সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্বীকৃতিদানের বিষয়কে সামনে নিয়ে আসে রাজনৈতিক দলগুলো।

আলোচনার শেষ পর্যায়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "যারা নিপীড়িত, নির্যাতিত তাঁদের অধিকার আদায়ে ভারতের কণ্ঠ সর্বদা সোচ্চার থাকবে। কিন্তু বর্তমান গুরুতর এই পরিস্থিতিতে সরকারের পক্ষে এই মুহূর্তে 'কমকথা' বলা ভালো।"[১৬] প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব গ্রহণে তিনি বিরোধী দলের সঙ্গে বসবেন।[১৭] ৩১শে মার্চ ভারতের লোকসভায় বাংলাদেশের উপর পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সৈন্যের আক্রমণে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয় এবং সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক বিজয়, সংগ্রাম ও আত্মত্যাগের প্রতি ভারতের জনগণের সমর্থন জানিয়ে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। অবিলম্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা, মানবিক কারণে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি সৈন্য যে হত্যাযজ্ঞ চালাচ্ছে, নিরস্ত্র জনগণের উপরে যে গণহত্যা চালাচ্ছে তা বন্ধ করার দাবি প্রস্তাবে উপস্থাপিত হয়।[১৮]

লোকসভায় ইন্দরা গান্ধী বাংলাদেশ সম্পর্কে প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবের প্রথম অংশে গণতান্ত্রিক সরকার প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সামরিক বাহিনীর নিষ্ঠুর আক্রমণের কথা বলা হয়েছে। প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের সাম্প্রতিক ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা প্রকাশ করা হয়। বলা হয় যে, পূর্ববঙ্গের সমগ্র জনগণের কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেওয়ার জন্য তাঁদের আশা আকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনী সর্বাত্মক আক্রমণ চালিয়েছে। বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি তুলে ধরে বলা হয়, ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে জনগণ নির্ভুলভাবে তাদের ম্যান্ডেড প্রদান করেছে, কিন্তু পাকিস্তান সরকার তা বানচালের পন্থা অবলম্বন করেছে। পাকিস্তান সরকার জনগণের রায় অনুযায়ী আইনানুগভাবে জনপ্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে, সংসদ অধিবেশন স্থগিত করে জনগণের ম্যান্ডেড ও সার্বভৌমত্বকে অস্বীকার করেছে। একই সঙ্গে নগ্নভাবে শক্তি প্রয়োগ, গ্রেনেড, মেশিনগান, ট্যাংক, আর্টিলারি, এয়ারক্র্যাফ্ট ব্যবহার করেছে তাদের স্তব্ধ করার জন্য। ভারত সরকারের অবস্থান সম্পর্কে প্রস্তাবে বলা হয়, "সরকার এবং ভারতীয় জনগণ সবসময় জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী, শান্তিপূর্ণভাবে পাকিস্তানের সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক রাখতে চায়। একই ধরনের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির বন্ধনে আবদ্ধ থাকলেও পড়শি দেশে অবর্ণনীয় বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটছে এতে ভারত উদাসীন থাকতে পারে না। দেশের সর্বস্তরের জনগণ নৃশংস ঘটনাবলি যা নিরস্ত্র জনগণের উপর চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে তার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে। এই প্রস্তাবে পূর্ববঙ্গের জনগণের গণতান্ত্রিক জীবন নির্মাণের লক্ষ্যে যে সংগ্রাম চলছে তার প্রতি গভীর সমবেদনা ও সমর্থন প্রকাশ করছে। ভারত সরকার ও জনগণ সব সময় "পাকিস্তানের সাথে একটি শান্তিপূর্ণ, স্বাভাবিক ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছে এবং সেই লক্ষ্যে কাজ করেছে।" প্রস্তাবে ভারতের নীতি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "শান্তি রক্ষায় ভারতের স্থায়ী স্বার্থ এবং মানবাধিকার সংরক্ষণে আমাদের দৃঢ় প্রতিশ্রুতি শিরোধার্য করে এই সভা অরক্ষিত জনগণের নিধনযজ্ঞ থেকে সামরিক বাহিনীকে বিরত থাকার দাবি জানাচ্ছে। পাকিস্তান সরকারের ওপরে চাপ সৃষ্টির মাধ্যমে অবিলম্বে এই পরিকল্পিত গণহত্যা বন্ধ করার জন্য বিশ্বের সমস্ত রাষ্ট্রের জনগণ ও সরকারের প্রতিও এই সভা আহ্বান জানাচ্ছে। একইসঙ্গে প্রস্তাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্পর্কে আশাবাদ ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, "পূর্ববঙ্গের সাড়ে সাত কোটি মানুষের ঐতিহাসিক জাগরণ যে শেষ পর্যন্ত সাফল্য অর্জন করবে, এই সভা সে ব্যাপারে তার দৃঢ় আশাবাদ নথিভুক্ত করছে। এই সভা এই মর্মে তাদেরকে নিশ্চয়তা প্রদান করছে যে, তাদের সংগ্রাম ও ত্যাগে তারা সব সময় ভারতের জনগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সহযোগিতা লাভ করবে।"[১৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলাবাহুল্য, ভারতের লোকসভার এই প্রস্তাব বাংলাদেশের জনগণকে মুক্তিসংগ্রামে উদ্দীপ্ত করেছে এবং সরকার গঠনের লক্ষ্যে ভারত সরকারের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রে যে সংশয় ছিল তা তিরোহিত হয়েছে। ফলে নয়াদিল্লির পথে তাজউদ্দীন আহমদকে দ্রুত যোগাযোগ স্থাপনে উৎসাহিত করেছে।[২০]

ভারত পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র পরিচালনায় বিশেষকরে বাংলাদেশের সমস্যা সংকট সম্পর্কে সরকারকে প্রতিনিয়ত পার্লামেন্টে জবাবদিহি করতে হয়েছে। সে জবাবদিহিতার নানামুখী বিতর্ক পর্যালোচনায় গবেষক মাত্রই লক্ষ্য করবেন। লোকসভা এবং রাজ্যসভার কার্যবিবরণীতে বিভিন্ন মতাদর্শের প্রতিফলন ঘটেছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে এটি স্বাভাবিক। কিন্তু জাতীয় চরম সংকটকালে বিশেষকরে যেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বাংলাদেশকে নিয়ে জটিল দাবা খেলা চলছে, সেক্ষেত্রে কূটনৈতিক গোপনীয়তা সবসময় পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হবে বা হওয়া সমীচীন নয়। নীতি-নির্ধারকগণ বিশেষকরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর মতো দক্ষ, অভিজ্ঞ রাষ্ট্র-নেতাদের পক্ষে সেক্ষেত্রে কৌশল অবলম্বন করাই স্বাভাবিক। সেজন্য ভারতীয় পার্লামেন্টের বিশাল কার্যবিবরণী থেকে ভারতের কৌশলগত কূটনৈতিক তৎপরতা ও গভীরতা খুঁজে বের করা কঠিন বিষয় হলে অপ্রাপ্য নয়। তারপরেও বিভিন্ন তারিখে পার্লামেন্টের অধিবেশনসমূহে সংসদ সদস্যগণ যেভাবে সরকারকে বাংলাদেশের স্বীকৃতি, বাংলাদেশ-সমস্যা সংকট, বিশ্ব রাজনীতি, পরিস্থিতি, সামরিক অবস্থান ও বিদেশ থেকে পাকিস্তানকে প্রদত্ত অস্ত্র সরবরাহ, শান্তিপূর্ণ উপায়ে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সংকট থেকে উত্তরণের উপায় উদ্ভাবন, শরণার্থী সমস্যাকে মানবিক সমস্যায় রূপদান এবং তা আন্তর্জাতিকীকরণ, বাংলাদেশের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের সঙ্গে পাকিস্তানের সরকারের রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে চাপ সৃষ্টিতে কৌশলগত কূটনৈতিক তৎপরতা এবং বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ও বাংলাদেশের স্বীকৃতিকে সমার্থক করে তোলার কৌশল ভারতীয় পার্লামেন্টকে সর্বদা জীবন্ত, সজিব এবং সক্রিয় করে রেখেছিল।

প্রকারান্তে এইসব আলোচনা-বিতর্ক ভারতের কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণ ও বিশ্ব পরিমণ্ডলে কার্যকর করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবদান রেখেছে সন্দেহ নেই। বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে, শরণার্থী বিষয়ে পৃথক এজেন্ডায় সরাসরি তিন বার ব্যাপক আলোচনা অনুষ্ঠিত হলেও প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে শারণার্থীদের মানবিক ট্র্যাজেডির কথা উল্লেখিত হয়েছে। যেমন ২৪শে মে, ভারতে বাংলাদেশ থেকে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর আগমনের ফলে সৃষ্ট অস্বাভাবিক পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে শ্রম ও পুনর্বাসন মন্ত্রীর বিবৃতিতে উল্লেখ্য রয়েছে যে, বিপুল শরণার্থী ভারতে আগমন করেছে তার অর্ধেক মাত্র শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় গ্রহণ করতে পেরেছে, বাকিরা আত্মীয়স্বজন কিংবা বিভিন্ন জায়গায় আশ্রয় নিয়েছে। শরণার্থীদের জন্য ব্যয়ের প্রসঙ্গ তুলে ভারতীয় দূতাবাসগুলোকে এ সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট তাদের দায়িত্বের বিষয়টি তুলে ধরার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ২৪শে মে এ প্রসঙ্গে লোকসভায় আসাম, ত্রিপুরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং পশ্চিমবাংলার সীমান্ত এলাকা পরিদর্শনের (১৫-১৬ই মে) অভিজ্ঞতা বর্ণনাকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, প্রতিদিন এখনও গড়ে ৬০ হাজার শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করছে। এর মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান সব ধরনের লোক বিদ্যমান।[২১] এদের মধ্যে অনেকেই যুদ্ধাহত। তাদের পর্যাপ্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা নেই। স্বাস্থ্যব্যবস্থা ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছে। বিগত ২৩ বছর ভারত কখনো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেনি। যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে বলা হচ্ছে তা ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যায় পরিণত হয়েছে। ভারতের মাটিতে অগণিত শরণার্থী পাঠিয়ে পাকিস্তান তার সমস্যা সমাধান করতে চাচ্ছে, যা ভারত কোনোভাবে মেনে নেবে না। প্রধানমন্ত্রী "ভারত ঐতিহ্যগতভাবে সহ্যশক্তি নিয়ে গর্বের কথা বোধ করে। ভারত জাতিসংঘ ও বিশ্ব সম্প্রদায়কে বলেছে রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। বিশ্ব জনমত বিরাট শক্তি। যা কেউ উপেক্ষা করতে পারবে না। বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব রয়েছে উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনে এগিয়ে আসা। মানবাধিকার লঙ্ঘন, নিষ্পেষণ ও ছিন্নমূল মানুষের জন্য ভারত সবকিছুই করবে। তিনি অভিমত ব্যক্ত করেন, "এটি একটি জাতীয় সমস্যা হলেও মূলত এটি হলো আন্তর্জাতিক সমস্যার অংশ।"[২২]

২৬শে মে লোকসভায় বিভিন্ন সদস্যবর্গ শরণার্থী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে বক্তব্য পেশ করেন। তাঁদের বক্তব্যের মর্মার্থ বিশ্লেষণ করলে বেরিয়ে আসবে, বিশ্বে গণতন্ত্রের কথা বলা হলেও এমনকি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ গণতন্ত্র রক্ষার দাবি করা হলেও ভারতবাসী দেখতে পাচ্ছে, পাকিস্তানে গণতন্ত্র যেক্ষেত্রে নির্মমভাবে ধ্বংস করা হচ্ছে, গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত প্রতিনিধি ও গণতন্ত্রমনা জনগণের উপরে নির্মম ও নির্দয়ভাবে আক্রমণ ও ধ্বংস করা হচ্ছে, সেক্ষেত্রে স্বতস্ফূর্তভাবে গণতন্ত্র রক্ষার জন্য পৃথিবীর কোনো রাষ্ট্রই সোচ্চার নয় কিংবা কেউই তা প্রতিরোধে এগিয়ে আসছে না। উপরন্ত দোষারোপ করা হচ্ছে ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে, দেশটিকে ভেঙে ফেলছে। অথচ বিশ্ব নেতৃবৃন্দকে বুঝতে হবে পাকিস্তান সামরিক জান্তা নিজেরাই দেশটিকে ভেঙে ফেলেছে। পরিণতিতে ভারতের উপর অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামাজিকভাবে নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বলেন যে, "এ সময় ভারত শুধু নিজেদের জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তার কথাই ভাবছে না, স্বাভাবিকভাবেই ভারতকে ভাবতে হচ্ছে বাংলাদেশের সংগ্রামী জনতার কথা। সেজন্য এই ভয়ঙ্কর অবস্থায় ভারতকে স্থিরভাবে লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে যেতে হবে।" প্রধানমন্ত্রী এরূপ মন্তব্য করেন যে, তিনি সংযত ভাষায় কথা বলছেন এই কারণে, ভয়ংকর অবস্থাকে মোকাবেলা করা তখনই সম্ভব যখন ভারত প্রস্তুত হবে। এ কথার মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সুস্পষ্টভাবে একটি বার্তা প্রদান করেন যে, ভারত বাংলাদেশ সংকট মোকাবেলায় পূর্ণ ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে সামরিক ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে প্রস্তুত নয়। ভারতের অভ্যন্তরীণ সমস্যার ক্ষেত্রে শরণার্থীদের নিয়ে সাম্প্রদায়িক মনোভাব মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার প্রবণতাকে প্রথমেই চাপা দেয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রকাশ্য ঘোষণা দেন। এই প্রথমবারের মতো ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে আস্থা প্রকাশ করে বলেন, কোনো মহৎ কাজই আত্মত্যাগ ব্যতীত অর্জিত হয় না, বাংলাদেশের সাহসী জনগণের অঙ্গীকারবদ্ধ সংকল্পের উপর সকলের আস্থা রাখা উচিত। কেননা তারা ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করছে। তাঁদের উপর সেই বিশ্বাস অব্যাহত থাকবে।[২৩]

১৫ই জুন ভারতীয় পার্লামেন্টের কার্যপ্রণালি ধারা ১৭৬ অনুযায়ী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে শরণার্থীদের সমস্যা মোকাবিলা করার ক্ষেত্রে সরকারের যে সীমাবদ্ধতা রয়েছে এ কথা স্বীকার করার পরেও বলেন, "তার অর্থ এই নয় আকস্মিকভাবে আগত লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের সমস্যা সহজেই সমাধান করা সম্ভব। এই বিপুল শরণার্থী এসেছে ভয়াবহ সন্ত্রাসের রাজত্ব থেকে, এসেছে আহত হয়ে। তাঁরা রোগাক্রান্ত, অসুস্থ, ক্ষুধার্ত ও ক্লান্ত। এদের সঙ্গে ভারতের দারিদ্র্যপীড়িত জনগণের কথা ভাবতে হবে। তারাও ক্ষুধার্ত ও বিপর্যস্ত। কিন্তু একটি আত্মমর্যাদাশীল জাতি হিসেবে 'সানকি' হাতে বিশ্বের দুয়ারে দুয়ারে ভারত ভিক্ষা চাইতে পারে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কর্তব্য ও দায়িত্ব তাঁদের পালন করতে হবে।"[২৪]

পার্লামেন্টে শরণার্থী সমস্যার নানা দিক নিয়ে বিশদ আলোচনার ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র, আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিবেকবান গণসম্প্রদায় শরণার্থীদের সম্পর্কে একদিকে যেমন সাহায্যের হাত প্রসারিত করে, অন্যদিকে তেমনি শরণার্থী সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে তৎপর হয়ে ওঠে। শরণার্থী সমস্যাকে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে ক্রমান্বয়ে জড়িয়ে ফেলার যে বাস্তব কৌশল গ্রহণ করে তা হতে বোঝা যায় প্রথম থেকে এটি ছিল ভারত সরকার নীতি নির্ধারক গোষ্ঠীর লক্ষ্য।

খ. শরণার্থীদের সম্পর্কে নীতি : ভারতের জাতীয় রাজনীতিতে শরণার্থী সমস্যা নানা ধরনের সংকট তৈরি করে। পাশাপাশি স্থানীয় পর্যায়েও বহু জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়। ৫ই জুন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতা রাজভবনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী, উপমুখ্যমন্ত্রী, মন্ত্রীসভার সদস্য এবং সামরিক-বেসামরিক কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠকে বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনাকালে বলেন, পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী আগমনের ফলে অতি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে যার পরিণতি দেশের জন্য গুরুতর হতে পারে। এই পরিস্থিতির মোকালোর জন্য সুস্থির পদক্ষেপ, ঠিক সময়ে, ঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা জরুরি। বাংলাদেশের ব্যাপারে সমস্যার ব্যাপকতা অনুযায়ী আন্তর্জাতিক সমর্থন মেলেনি। প্রধানমন্ত্রী বৈঠকে জানান, শরণার্থীদের রাজ্যের বাইরে কেন্দ্রীয় সরকারের যে জমি আছে, সেসব জমিতে শিবির করে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করা হচ্ছে। কিন্তু সমস্ত ব্যবস্থাই হচ্ছে অস্থায়ী ভিত্তিতে; কারণ শরণার্থীদের দেশে ফিরে যেতে হবে এবং স্বদেশে ফিরে যাবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কোনোক্রমে যেন আইন-শৃঙ্খলার পরিবেশ বিঘ্ন না হয় সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।[২৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তানের সংকট বিষয়ক স্পেসাল ব্যুরোর পরিচালক জে. এন. দীক্ষিত শরণার্থী প্রসঙ্গে সাক্ষাৎকারে বলেন, শরণার্থী সমস্যা ভারতের ওপর দুই ধরনের প্রভাব ফেলেছিল। প্রথমত, আমাদের স্পর্শকাতর রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, মণিপুর, আসাম এসব এলাকার ওপর ভৌগোলিক ও অর্থনৈতিক চাপ বাড়ছিল এবং আমরা সামাজিক অস্থিরতা সম্পর্কে ভীত ছিলাম। দ্বিতীয়ত, শরণার্থীদের দেশে ফেরত পাঠানোটা সহজ কাজ ছিল না। শরণার্থীদের মধ্যে অর্ধেকের বেশি ছিল মুসলমান।[২৬]

ভারতে ব্যাপকসংখ্যক শরণার্থীর আগমনের জন্য রাজনৈতিক দলগুলো সাধারণভাবে ভারত সরকারকে দায়ী করে। তাদের বক্তব্য হলো মার্চের শেষ দিকে কিংবা এপ্রিলের দ্বিতীয় সপ্তাহে মুজিবনগর সরকার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান করলে, দলে দলে শরণার্থী ভারতে আসতো না।[২৭] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক সি. রাজেশ্বর রাও সংবাদ সম্মেলনে ১২ই জুন কেন্দ্রীয় সরকারের সমালোচনা করে মন্তব্য করেন, মনে হচ্ছে কেন্দ্র এখনও শরণার্থী সমস্যার গুরুত্ব পুরোপুরি উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে এবং সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলোকে শরণার্থীর চাপে মাত্রাতিরিক্তভাবে ভারাক্রান্ত করে তুলছে।[২৮] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (মার্কসবাদী) ১৫-১৯শে জুন কোয়েম্বাটোরে অনুষ্ঠিত পরিটব্যুরোর সভায় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণ করে। শরণার্থী বিষয়ে বলা হয় যে, "অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতি ও সমস্ত সাহায্য দিতে এই ব্যর্থতা বাংলাদেশের জনগণের সংগ্রামকে দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে এবং এরই ফলে বাংলাদেশ থেকে ৫০ লাখের উপর মানুষকে ভারতে এসে শরণার্থী হতে হয়েছে। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতা।"[২৯]

লোকসভা ও রাজ্যসভায় শরণার্থী সমস্যার বিভিন্ন দিক নিয়ে নানা ধরনের প্রশ্ন-উত্তর পর্ব, আলোচনা এবং বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এ আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান বা ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের মাধ্যমে শরণার্থী সমস্যার সমাধান। রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে শরণার্থী সমস্যার বিষয়টি জোরেসোরে উত্থাপিত হয়নি। কোনো কোনো গবেষক[৩০] এই অভিমত উত্থাপন করার প্রয়াস নিয়েছেন যে, এই সব দাবি তারা তুলেছিল কংগ্রেস সরকারকে রাজনৈতিকভাবে পর্যদুস্থ করার জন্য। কিন্তু সার্বিক পর্যালোচনায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দক্ষ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করার ফলে জনমত এমনভাবে সংগঠিত হয়েছিল যেক্ষেত্রে জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও হিন্দু মহাসভার মতো ভারতের দক্ষিণপন্থি ও সাম্প্রদায়িক দলগুলো ঘোলা জলে মাছ শিকারের সুযোগ পায়নি।

১৮ই জুন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রসঙ্গে ভারতীয় লোকসভায় ব্যাপক বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। জনসংঘের নেতা এ. বি. বাজপেয়ী লোকসভায় বলেন, যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা আলোচনা করা হচ্ছে তার অর্থ বাংলাদেশে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের শাসন ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হবে, বাংলাদেশ উপনিবেশ থাকবে না, যত শরণার্থী এসেছে তারা ফিরে যাবে, জানমালের নিরাপত্তা থাকবে। কিন্তু সরকারের এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

'পবিত্র ইচ্ছা'র স্বপক্ষে বিশ্ব রাষ্ট্রসমূহ যে সাহায্য করবে তার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তিনি ভারতের নীতি নির্ধারণ সম্পর্কে বলেন, "নীতি একটাই হতে পারে এবং সেটি হচ্ছে একটি প্রতিজ্ঞা–আজকের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে কোনো আপস নেই। বাংলাদেশে সেই পরিস্থিতির সৃষ্টি করতে হবে যাতে উদ্বাস্তুরা ফিরে যেতে পারে। তথা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। সেজন্য যুদ্ধ ছাড়া যদি কোনো উপায় না থাকে তবে ভারতের যুদ্ধ করার জন্যও তৈরি থাকতে হবে।"[৩১] শরণার্থী সমস্যার শুরু থেকেই জনসংঘ একটি বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করেছে, বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান নয়াদিল্লিকে করতে হবে। অন্য কেউ করে দেবে না এবং শেষবাক্যে তিনি এমনটি সংশয়াশ্রিত আশা প্রকাশ করেন যে, "নয়াদিল্লি সাহসের সঙ্গে চললে এক নতুন ইতিহাস লেখা যেতে পারে।"[৩২]

গ. বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্বের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া: ২৭শে মার্চ কলকাতার সর্বস্তরের মানুষ পূর্ববাংলায় মুক্তিসংগ্রামের সমর্থনে সভা-সমিতি, বিক্ষোভ-মিছিলে পূর্ববাংলার প্রধান নেতা শেখ মুজিবুর রহমানকে সমর্থন জানান। ঐদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যায়ের সিনেটের এক সভায় প্রস্তাব গ্রহণ করা হয় যে, অবিলম্বে বাংলাদেশে গণহত্যা বন্ধ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তা বিধানের জন্য ভারত সরকারের প্রতি জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়। দলমত নির্বিশেষে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, ছাত্র-শিক্ষক-যুবক এবং শিক্ষাবিদগণ জাতীয়তাবাদী-নায়ক শেখ মুজিবের নেতৃত্বে পূর্ব বাংলার মুক্তিসংগ্রামকে সমর্থন এবং সেখানে জঙ্গীশাহীর গণহত্যা বন্ধের দাবি জানিয়ে প্রস্তাবে বলা হয়, স্বাধীন বাংলাদেশকে পূর্ণ রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় স্বীকৃতি দিতে হবে। ঐদিন সমগ্র পশ্চিম বাংলায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয় এবং ১৪৪ ধারা অমান্য করা হয়।[৩৩]

২৮শে মার্চ বাংলাদেশে গণহত্যার প্রতিবাদে পশ্চিম বাংলার লেখক-বুদ্ধিজীবীবৃন্দ এক বিবৃতি প্রদান করেন। বিবৃতির একাংশে বলা হয়, "পৃথিবীতে আজ বহু দেশ আছে, বহু জাতি আছে যারা নিজেদের সুসভ্য বলে দাবি করে। সে দাবি অনেকাংশে স্বীকার্য। তাঁদের বিবেক কি আজ সাড়া দেবে না? আমরা পশ্চিমবঙ্গের সংস্কৃতিকর্মীরা বিশেষ করে আবেদন জানাই পৃথিবীর সব দেশের শিল্পস্রষ্টা ও জ্ঞানতপস্বীদের কাছে। আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্রে এই বীভৎস বিরাট নরহত্যার সংবাদ তাঁরা পেয়েছেন নিশ্চয়ই। তাঁদের সকলের তীব্র প্রতিবাদ ঘোষিত হোক, তাঁদের সরকারকে তাঁরা উদ্বুদ্ধ করুন এই অর্থহীন নৃশংসতার নিন্দা করতে, প্রতিবাদ করতে, এ বিষয়ে তাঁদের যথোচিত কর্তব্য পালন করতে। আমাদের সরকার কবে স্বাধীন বাংলাদেশ-এর রাষ্ট্রিক মর্যাদা স্বীকার করবেন, ঐ দেশের সংগ্রামী নিপীড়িত মানুষকে সর্বপ্রকার অসামরিক সাহায্য দানে উদ্যোগী হবেন।[৩৪] একটি বিক্ষোভ মিছিলে হাজার হাজার ছাত্র-জনতা সমবেত হয়ে পাকিস্তান দূতাবাস ভবনের গেটে স্বাধীন বাংলার পতাকা টাঙ্গিয়ে দেয়।[৩৫]

৮ই এপ্রিল কলকাতার শিল্পী, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী সমিতি বাংলাদেশের সাহায্যে সকলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে বিবৃতি প্রকাশ করে। বিবৃতিতে মুক্তিযুদ্ধকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এগিয়ে নেওয়ার জন্য সর্বপ্রকার সাহায্যের লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ সহায়ক শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমিতি' গঠন করেন।[৩৬] ১৯শে এপ্রিল ভারতের মুসলিম বুদ্ধিজীবীরা বাংলাদেশের স্বীকৃতির জন্য ভারত সরকারের নিকট আবেদন করেন এবং বিশ্বকে অনুরূপভাবে স্বীকৃতির জন্য এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।[৩৭]

বাংলাদেশের বিপর্যস্ত মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসতে ভারতের প্রখ্যাত ৪৪জন অধ্যাপক, লেখক ও বুদ্ধিজীবীগণ এক আবেদনে বলেন যে, এখন পর্যন্ত মানবজাতির নৈতিক মূল্যবোধ ক্ষেত্রবিশেষে বিপন্ন হলেও বিশ্বের অগণিত মানুষ এই মূল্যবোধকে সমুন্নত করে রেখেছে। পূর্ববঙ্গে নিঃশেষ ক্রন্দন শোনার দাবি জানাই এবং তাদের কাছে আবেদন জানাই গণতান্ত্রিক অধিকারের প্রতি সম্মান জানাই এবং সামরিক জান্তার বিকারগ্রস্তকে আটকানোর দাবি জানাই।[৩৮]

ঘ. বিভিন্ন সংস্থা: ২৫শে এপ্রিল হরিশ মহীন্দ্র এবং মেহবুব নসরুল্লাহকে যথাক্রমে চেয়ারম্যান ও সেক্রেটারি করে বোম্বের বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি গঠিত হয়। এই কমিটিতে বিশিষ্ট অভিনেত্রী ওয়াহিদা রহমান এবং শর্মিলা ঠাকুর সদস্য ছিলেন। কমিটির উদ্দেশ্য হলো, বাংলাদেশের নির্যাতিত মানুষদের সাহায্য করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের সাহায্যের জন্য পাঁচ লক্ষ পতাকা তৈরি করা, যার মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হয়। শুধু তাই নয়, এই সংস্থার মাধ্যমে চ্যারিটি শোর আয়োজন করা হয়।[৩৯]

২৯শে এপ্রিল গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশন কর্তৃক বাংলাদেশের সমর্থনে রাষ্ট্র সংঘ ও বিভিন্ন দেশে প্রতিনিধিদল প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। গান্ধী শান্তি ফাউন্ডেশনের সম্পাদক রাজা কৃষ্ণ এক বিবৃতিতে বলেন যে, বাংলাদেশ সম্পর্কে অবিলম্বে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন আহ্বানের প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। একই সাথে সানফ্রান্সিস্কো-মস্কো অভিযান অথবা দিল্লি-পিকিং অভিযানের মতো একটি আন্তর্জাতিক শান্তি অভিযান শুরু করার জন্য ভারতের শান্তি সংস্থাগুলি প্রস্তাব করে। এ লক্ষ্যে যুদ্ধ-প্রতিরোধকারী লীগ, আমেরিকান ফ্রেন্ডস সার্ভিস কমিটি এবং আন্তর্জাতিক নিরস্ত্রীকরণ ও শান্তি কনফেডারেশনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়।[৪০]

২রা মে, ভারত-বাংলাদেশ ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে স্বীকার করে নেয়ার জন্য সকল দেশের প্রতি আহ্বান জানান। এ সংস্থার পূর্বের নাম ভারত-পাকিস্তান ফ্রেন্ডশিপ সোসাইটি পরিবর্তন করে বাংলাদেশ-ভারত করা হয়।[৪১] ৬ই মে বাংলাদেশ জাতীয় সমন্বয় কমিটির সমাবেশে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান ভারত সরকারের অপরিহার্য কর্তব্য বলে দাবি করা হয়। সভায় বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। সভাপতির ভাষণে রমেশ মজুমদার বলেন, বাংলাদেশের সমস্যাটি হলো মনুষ্যত্বের প্রশ্ন। এর একটি প্রতিবিধান হওয়া উচিত। হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রভুল্ল সেন বলেন, "গণতান্ত্রিক আন্দোলন জয়যুক্ত করার জন্য প্রয়োজন হলে সৈন্য পাঠিয়ে যুদ্ধ করতে হবে।"[৪২]

৭ই মে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সম্প্রদায় পূর্ববাংলার বৌদ্ধদের উপর পাকিস্তান বাহিনীর হত্যা নির্যাতনের প্রতিবাদে স্মারকলিপি প্রেরণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেন। তাঁরা বাঙালি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের উপরে যে নির্যাতন হয়েছে জাতিসংঘ মহাসচিব উ থান্টকে তারবার্তার মাধ্যমে তা জানিয়ে দেন।[৪৩]

২০শে মে নয়াদিল্লিতে এম.সি চাগলা, ভি.কে. কৃষ্ণমেননসহ কয়েকজন বিশিষ্ট আইনজ্ঞ ও শিক্ষাবিদ অবিলম্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়ে জোরালো যুক্তি উপস্থাপন করেন। চাগলা যুক্তি দিয়ে বলেন, নৈতিক, আইনগত, রাজনৈতিক অপরাপর দিক থেকে ভারতের উচিত শীঘ্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া। প্রাক্তন প্রতিরক্ষামন্ত্রী কৃষ্ণমেনন বলেন, স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি আইনসম্মত কি না তা নিয়ে বিতর্ক করার বিষয় নয়। এখন বিপ্লবের সময়, আইন বা বিধির প্রশ্ন নয়, তাহলে ফরাসি শাসন থেকে আলজেরিয়া মুক্ত হতে পারতো না।[৪৪]

৩১শে জুলাই ভারতের সাবেক সেনাবাহিনীর প্রধান জেনারেল কাউল বাংলাদেশ প্রশ্নে সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থতার জন্য সরকারি নীতির সমালোচনা করেন। তিনি বলেন, ২৫শে মার্চ-এর পরে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিলো ভারতকে তখনই বাংলাদেশের পক্ষে পাকিস্তানকে আঘাত করা। কিন্তু তা করা হয়নি। আর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের দোদুল্যমানতার জন্য ১৯৬২ সালে চীনের সঙ্গে যুদ্ধে যে বিপর্যয় হয়েছে তার দায়-দায়িত্ব সামরিক বহিনীর নয়, রাজনৈতিক নেতৃত্বের। এখনও ভারতের যে সামর্থ আছে তা দিয়েই চীন এবং পাকিস্তানকে ভারত প্রতিহত করতে পারে। এখন পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে এবং তাঁদের চারদিকে সব সৈন্য মোতায়েন আছে। মার্চ-এপ্রিলে যুদ্ধ পরিস্থিতি ছিল ভারতের পক্ষে এবং সে সময়ই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে স্বাধীন করা উচিত ছিল।[৪৫]

ঙ. আন্তর্জাতিক সম্মেলন, বাংলাদেশকে সমর্থন: ১৯শে সেপ্টেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ২৪টি দেশের প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের চলমান ঘটনায় দুঃখ ও ক্ষোভ প্রকাশ এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবের শর্তহীন মুক্তির জোর দাবি জানান। দিল্লির এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ১৪০জন প্রতিনিধি ছিলেন, তার মধ্যে ৭০জন ছিলেন বিদেশ থেকে আগত এবং যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য থেকেও অনেক প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।[৪৬] ১৮-২০ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ গান্ধী পিস ফাউন্ডেশন নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বিষয়ে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। বিশ্বের ২৪টি দেশের ১৫০জন প্রতিনিধি অংশ নেন সেমিনারে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী, সংসদ সদস্য, নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীবী ও সাংবাদিক ছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ-এর সভাপতিত্বে সেমিনারে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন করে বিভিন্ন প্রস্তাব গৃহীত হয়। সেমিনার থেকে জাতিসংঘের কাছে আহ্বান জানানো হয় যে, "...to place the Bangladesh problem before all organs of the international body as a violation of human rights and as a threat to world peace."[৪৭] সম্মেলন আয়োজনে ও বিদেশি প্রতিনিধি আমন্ত্রণে ভারত সরকারের সহযোগিতা পেয়েছে উদ্যোক্তারা।[৪৮] তিনদিনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের উদ্বোধনী দিনে মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পাকিস্তানবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই-এর জন্য একটি সশস্ত্র আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী গড়ে তোলার প্রস্তাব করা হয়। সম্মেলনে বলা হয়, প্রস্তাব দিলেই বাংলাদেশে স্বাধীনতা আসবে না, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ব্যর্থ হলে বিশ্বের এই অংশের সমস্ত মানুষের মুক্তিসংগ্রাম ব্যর্থ হবে। সভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবে শেখ মুজিবের গোপন বিচারের নিন্দা করা এবং তাঁর মুক্তির জন্য বিশ্বের রাষ্ট্রগোষ্ঠীর উপর চাপ সৃষ্টির আহ্বান জানানো হয়। শেষদিনে এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে শেখ মুজিবের মুক্তি, বাংলাদেশের মুক্তির জন্য একটি বিশ্ব ব্রিগেড গঠনের আহ্বান জানানো হয় এবং একই সাথে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানানো হয়।[৪৯]

এ সম্পর্কে ২৪শে সেপ্টেম্বর আনন্দবাজার পত্রিকায় বলা হয় : "সাধারণ পরিষদের বৈঠকের মাত্র কয়দিন আগে ভারতের রাজধানীতে একটি বিশ্ব বৈঠক বসেছিল। সেখানে হাজির ছিলেন ২৪টি দেশের প্রতিনিধি। বৈঠকটি অবশ্য রাষ্ট্রপুঞ্জের বৈঠকের মতো সরকারি শিলমোহরাঙ্কিত নয়,–একান্তভাবেই বে-সরকারি। কিন্তু নির্দ্বিধায় বলা যায়, অনেক বেশি প্রতিনিধিত্বমূলক। কেননা, যাকে বলে প্রকৃত জনমত তারই যথার্থ প্রকাশ দেখা গেছে দিল্লি-সম্মেলনে। নানা দেশের সংবাদপত্রে যে সব দাবিমুখরিত, কূটনৈতিক ভাষায় যেসব দাবির কথা কোনো কোনো সরকারের কাছেও স্বীকৃতি বলে কথিত–দিল্লিতে তারই সহজ স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি শোনা গেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের মতোই এই জনমতের ভিত্তি নৈতিকতায় দৃঢ়। বস্তুত রাষ্ট্রীয় আচরণে যে দ্বিধা, কপটতা, এবং স্বার্থপরতা তার বিরুদ্ধে এই অকপট ভূমিকা বিশ্বমানবতার লাঞ্ছিত পতাকাকে আবার তুলে ধরল। সম্মেলন 'আন্তর্জাতিক বিগ্রেড' শেষ পর্যন্ত অবশ্য গড়েনি, কিন্তু তারা কথা তুলেছে–এটাও সামান্য কথা নয়। ওমেগা-অভিযাত্রীদের অভিযান যেমন প্রতীকী, তেমনই রীতিমতো তাৎপর্যপূর্ণ দিল্লি সম্মেলনের কথোপকথন। বিশ্বের লুপ্তপ্রায় নৈতিকতা আবার একবার ঝিলিক দিল। কে জানে, এই সব সূত্র ধরে একদিন হয়তো রাষ্ট্রপুঞ্জের পাশাপাশি আর এক রাষ্ট্রপুঞ্জ গড়ে উঠবে। একটি দরবারি, অন্যটি জনতার আদালত। এসব অবশ্য ক্ষোভের কথা।

রাষ্ট্রপুঞ্জের বিরুদ্ধে ক্ষোভের হেতু যে আছে, তাও বোধহয় অস্বীকার করার উপায় নেই। আশার কথা শুধু এই, কোনো দেশ রাষ্ট্রপুঞ্জের অনুমতি নিয়ে স্বাধীনতার লড়াই করে না। সে লড়াইয়ে যা সবচেয়ে মূল্যবান সেই গণ-সমর্থন যে ইয়াহিয়া খানের পিছনে নেই, বাংলাদেশের বীর যোদ্ধাদের পেছনে; বিশ্বের মানুষ ক্রমাগত তা জানিয়ে দিচ্ছেন। নিউইয়র্কে কাঁচের মিনারে কী ঘটল, তার চেয়েও বাংলাদেশের পক্ষে আজ জরুরি সমাচার-দিল্লিতে সমবেত প্রতিনিধিবৃন্দের মুখে তার জয়-জয়কার।"[৫০]

২৩শে সেপ্টেম্বর দিল্লির আন্তর্জাতিক সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী প্রতিনিধি দল, বাংলাদেশে প্রবেশ করে পাকিস্তান কর্তৃক পরিচালিত অবৈধ সামরিক অভিযানের প্রতিবাদ জানানোর প্রস্তাব উঠলেও বিভিন্ন সমস্যার কথা বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত তা বাতিল করা হয়। তবে কেউ ব্যক্তিগতভাবে যেতে চাইলে তাতে কোনো বাধা থাকবে না এরকম মতপ্রকাশ করা হয়।[৫১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানবাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের বিপরীতে বাঙালির মুক্তিসংগ্রামের অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক চেতনার আদর্শিক আবেদন ছিল অনেক তীব্র। যা অনুপ্রাণিত করে ভারতের সাধারণ জনগণ, সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন ও বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে ও শরণার্থীদের মধ্যে আহার-বাসস্থানের সংস্থান করতে সাধারণ জনগণ ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর ভূমিকা ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, শিক্ষাবিদ, শিল্পীদের মধ্যে অধিকাংশই সম্পৃক্ত হয়ে পড়েন মুক্তিযুদ্ধ। ভারতব্যাপী গড়ে উঠতে থাকে নানা সংগঠন এবং মুক্তিযুদ্ধে যাদের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। সম্ভবত মুক্তিযুদ্ধের উত্তাপ পশ্চিমবঙ্গে লেগে থাকবে বেশি যে কারণে বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উচ্ছ্বাস ছিল চোখে পড়ার মতো। বাংলাদেশকে 'কার্যকর সহায়তা' দেবার দাবি জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৫২]

বিভিন্ন দল, শ্রমিকসংগঠন ও কলকাতার বিখ্যাত নাগরিকদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তার জন্য একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এছাড়া 'বাংলাদেশ সেবা সংঘ' নামে আরেকটি সংগঠন কলকাতায় কাজ করে বাংলাদেশের পক্ষে। 'স্বাধীন বাংলা সংগ্রাম সহায়ক কমিটি' কলকাতায় মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বাংলাদেশ আন্দোলনের পক্ষে জনসমর্থন সৃষ্টিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অনন্য ভূমিকা পালন করে। ২৭শে মার্চ, ১৯৭১ কলকাতা বিশ্বাবিদ্যালয়ের সিনেট অধিবেশন ছিল বাজেট বিষয়ে। এই অধিবেশন প্রস্তাব গ্রহণ করে যে, "বাংলাদেশ সম্পর্কে সুনির্দিষ্টভাবে করণীয় রয়েছে।"[৫৩] কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর এস. এ. সেনকে সভাপতি করে "কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' গঠন করা হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়, মুক্তিবাহিনী ও ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা দেওয়া।[৫৪] বুদ্ধিজীবীদের সহায়তা, ভারত ও ভারতের বাইরে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে সমিতি ইংরেজিতে ছয়টি ও বাংলায় পাঁচটি মনোগ্রাফ প্রকাশ করে। সারাবিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, নেতৃস্থানীয় রাজনীতিবিদ, রোটারিয়ানদের ঠিকানায় ইংরেজি প্রকাশনাসমূহ প্রেরণ করে সমিতি। সমিতির বিভিন্ন কর্মকাণ্ড সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে অবহিত রাখা হতো।[৫৫]

ভারতের অনেক শহরেই জনসাধারণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিভিন্ন সংগঠন গড়ে তোলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা দেবার জন্য। এপ্রিল মাসের প্রথম সপ্তাহে নয়াদিল্লিতে 'বাংলাদেশ সহায়ক সমিতি' নামে একটি কেন্দ্রীয় সংস্থা গঠন করা হয়। ভারতের প্রাক্তন এটর্নী জেনারেল এম.সি. শীতলবাদ ছিলেন সমিতির চেয়ারম্যান। এই সমিতির অন্যতম সদস্য ড. ত্রিগুণা সেন জানান যে, বাংলাদেশের জনগণ যে সাহায্যেই চাইবে, তা তাঁরা দেবেন। যে সাহায্যের মধ্যে... প্রাথমিক পর্যায়ে ঔষধপত্র, খাদ্য ও বস্ত্র দেবেন।[৫৬] যদিও কৌশলগতভাবে এটি ছিল একটি বেসরকারি সংগঠন, তথাপি ভারত সরকারের মৌন অনুমোদন ছিল।[৫৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বোম্বাইয়ে বিশিষ্ট নাগরিকরা 'বাংলাদেশ সহায়ক কমিটি' গড়ে তোলেন ২৪শে এপ্রিল, ১৯৭১। হরিশ মহীন্দ্রকে চেয়ারম্যান করে কমিটি গঠন করা হয়।[৫৮] সম্পাদক ছিলেন বেগম মহবুব নসরুল্লা, যুগ্মসম্পাদক খলিল ঘোষ। ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করেন বিশিষ্ট চলচ্চিত্রতারকা ওয়াহিদা রহমান ও শর্মিলা ঠাকুর। বিখ্যাত উর্দু কবি আলি সর্দার জাফরী, কায়ফী আজমি, জনপ্রিয় কাওয়ালী শিল্পী ইউসুফ আজাদ, রশিদা খাতুনের সক্রিয় সহযোগিতা পায় এই কমিটি, যা ভারতীয় মুসলমানদের বাংলাদেশের পক্ষে এগিয়ে আসতে অনুপ্রাণিত করে। এ প্রসঙ্গে *আনন্দবাজার* পত্রিকায় লিখেছে "সারা ভারতবর্ষ যেন বাংলাদেশ-এ পরিণত হয়েছে। ভাবা যায় না। সাম্প্রদায়িক মনোভাবের ঊর্ধ্বে উঠে এদেশের হিন্দু-মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে এই সম্প্রীতির মনোভাব অন্য উপলক্ষ্যে কখনও ঘটেনি।"[৫৯] বাংলাদেশের সহায়তার জন্য হায়দ্রাবাদে গঠন করা হয় 'আন্দ্রা প্রদেশ বাংলা সেবা সমিতি।' হায়দ্রাবাদের এই সমিতির সভাপতি ছিলেন অবসরপ্রাপ্ত ভারতীয় কূটনীতিক বদরুদ্দিন তায়েবজী এবং সম্পাদক ছিলেন প্রাক্তন সংসদ সদস্য কে. হানারধন। সাবেক কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী সি. এল. নান্দাকে প্রধান করে চন্ডীগড়ে আরেকটি সহায়ক সমিতি গঠন করা হয়।[৬০] এমনি সহায়ক সমিতি ভারতের অন্যান্য অংশেও গড়ে ওঠে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে এই সমিতিগুলোর ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সমিতিগুলোর কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে তিনটি বিষয় পরিষ্কারভাবে বেরিয়ে আসবে। এক, শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য; দুই, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য সহায়তা প্রদান; এবং তিন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি।

'ডেমোক্রেসি এণ্ড মিলিটারিজম অব ইনকমপেটিবল' শীর্ষক এক সংস্থার প্রশ্নের জবাবে আচার্য বিনোভাভাবে বলেন, তোমরা শুধু ভারত নয়, বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে যাও, জানিয়ে দাও পাকিস্তানি সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানে কীভাবে গণহত্যা করছে। মার্কিন জনগণকে বলে দাও, তাদের অস্ত্র নিয়ে কী নিষ্ঠুরভাবে হত্যাযজ্ঞ চালানো হচ্ছে। সরকারগুলোর উপর চাপ সৃষ্টি করো। ভারত সরকারকে এই সমস্যার সমাধানে ত্বরিৎ এগিয়ে আসতে বলো।[৬১]

বিভিন্ন শ্রেণি-পেশা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব ও সংস্থাগুলোর ভূমিকা ছিল একদিকে বাংলাদেশ থেকে আগত ছিন্নমূল মানুষদের সহায়তা, এবং অন্যদিকে বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে দেশে ও বিশ্ব পরিসরে জনমত গঠন। ভারতের বিশ্বনন্দিত বুদ্ধিজীবী ও শ্রেণি-পেশার মানুষ বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দেওয়ার প্রশ্নে দিল্লির উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। বিশ্ব কূটনৈতিক ক্ষেত্রেও তাদের ভূমিকা ভারত সরকারের কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে ও পরিচালনায় সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে।

বুদাপেস্ট: ১৩ই মে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেষ্টে বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের তিন-দিনব্যাপী অধিবেশন শুরু হয়েছে। অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন সমর্থন জানানোর জন্য ভারতের বক্তব্য অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন। বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকেও একজন প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮০টি দেশের প্রায় ৭০০জন প্রতিনিধির সামনে প্রকাশ্য অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বার্তাটি পড়ে শোনানো হয়। তাতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, ভারতের অবস্থান পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলি উদাসীন থাকা কঠিন। প্রধানমন্ত্রী ওই বার্তায় বলেছেন, প্রায় ২০ লক্ষ উদ্বাস্তু ভারতে চলে এসেছেন– ফলে আমাদের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়েছে। এই উদ্বাস্তুরা যাতে নিরাপদে মর্যাদার সঙ্গে দেশে ফিরে যেতে পারেন– তেমন অবস্থা সৃষ্টি করার জন্য পাকিস্তানকে অবশ্যই বাধ্য করতে হবে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, আশা করি, বিশ্বের শান্তিপ্রিয় মানবসমাজ মানবিক অধিকার রক্ষার জন্য উঠে দাঁড়াবেন। পূর্ববঙ্গের জনসাধারণের ন্যায্য দাবি, তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিরাই তাঁদের দেশ শাসন করবেন। বিশ্বের মানুষ, আশা করি, এই দাবি সমর্থন করবেন এবং তাঁদের ওই অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য সচেষ্ট হবেন। এই গুরুত্বের পরিস্থিতি এবং লক্ষ লক্ষ নির্দোষ মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশায় আমার মন ভারাক্রান্ত। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সদস্য অমৃত নাহাতা বার্তাটি পড়ে শোনান। তাঁকে প্রবল হর্ষধ্বনি জানিয়ে সদস্যরা অভিনন্দন জানান। ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা শ্রীকৃষ্ণ মেনন বলেন, পূর্ববঙ্গে গৃহযুদ্ধ নয়, গুলি চালিয়ে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন করা হচ্ছে। তিনি হিটলারি অত্যাচারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘটনার তুলনা করেন। মেনন আরও বলেন, পূর্ববঙ্গ বিশ্বের অষ্টম বৃহত্তম জাতীয় এলাকা এবং হাঙ্গেরির চেয়ে তার জনসংখ্যা ১০গুণের বেশি।[৬২]

ভারতীয় প্রতিনিধি দলের নেতা কৃষ্ণ মেনন হিটলারি অত্যাচারের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ঘটনার তুলনা করে বলেন, অত্যাচার নির্যাতন কামান দিয়ে স্বাধীনতাকামীদের দমানো যাবে না।[৬৩] ভারত সরকার নিজে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের প্রতিনিধি প্রেরণ করা ছাড়াও বাংলাদেশ সরকারকেও বহির্বিশ্বে তার অবস্থান তুলে ধরতে সহায়তা দেয়, বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন দেশ সফর করেন আব্দুস সামাদ আজাদ। বুদাপেস্টে ১৩-১৬ই মে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে (World Peace Assembly) পাকিস্তান বাহিনীর নজিরবিহীন অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ তুলে ধরেন আব্দুস সামাদ আজাদ।

চ. গণমাধ্যমের ভূমিকা: বাংলাদেশের জ্বলন্ত সংকট আকস্মিকভাবে ভারত সরকার ও সর্বস্তরের গণ-মানুষকে বিস্ময় বিমূঢ় ও বিরামহীন উদ্বেগ সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে ওঠে। অগ্নিদগ্ধ রক্তস্নাত বাংলাদেশ প্রতিবেশী ভারতের মানুষের বিবেককে ধাক্কা দেয়, হৃদয়কে বেদনাহত এবং মানসিকতাকে উদ্দীপ্ত করে অমানবিকতার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে ও অভ্যন্তরীণ এ অবস্থায় বাংলাদেশ-সংকট ভারতীয় সংবাদপত্র ও গণমাধ্যমে ব্যাপকভাবে প্রচারিত, প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিদিন বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতীয় জনমতের প্রতিফলন, বাংলাদেশ অভ্যন্তরে মুক্তিযোদ্ধাদের বীরত্বপূর্ণ সশস্ত্র সংগ্রামের বর্ণনা এবং বিশ্ব পরিসরে বাংলাদেশের ঘটনাবলি নিয়ে বক্তব্য, মন্তব্য ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেদন নানা পত্রিকায় ও গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে। ভারতীয় গণমাধ্যম প্রথম থেকেই পূর্ব পাকিস্তানকে 'পূর্ববঙ্গ' বা 'বাংলাদেশ' নামে উল্লেখ করেছে যা পরবর্তীকালে সরকারি ভাষ্যে উচ্চারিত হয়েছে। মূলত বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের বিভিন্ন দিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্পর্কে ভারতীয় গণমাধ্যম যে কষ্টসাধ্য আগ্রহ ও আন্তরিকতা নিয়ে সংবাদ প্রচার করেছে যার ফলে একদিকে যেমন জনমত সংগঠিত হয়েছে, অন্যদিকে তেমনি ভারত সরকারের উপর বাংলাদেশ-সংকট সমাধানে চাপ সৃষ্টি হয়েছে। যেকোনো গবেষকদের কাছেই বাংলাদেশের সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রামের তথ্য, উপাত্ত ও রাজনৈতিক গতিধারা নির্ধারণে ভারতীয় গণমাধ্যম সর্বদাই উৎসের প্রেরণা হিসেবে জীবন্ত থাকবে। এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে যে, কোথাও কোথাও গণমাধ্যমের সংবাদগুলো অতিরঞ্জিত এবং উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

প্রতিবেশি দেশ হিসেবে পূর্বপাকিস্তানের নির্বাচনী তৎপরতা থেকে উত্তাল অসহযোগ আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গের পত্রিকাগুলোকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করেছে। যে কারণে শেষ সময় পর্যন্ত সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন ও মুক্তিযোদ্ধাদের গেরিলা যুদ্ধের কর্মকাণ্ড তুলে ধরতে গণমাধ্যম ও সংবাদকর্মীরা ছিলেন ক্লান্তিহীন। পাকিস্তানি সামরিক জান্তা ২৬শে মার্চ পূর্ব পাকিস্তান থেকে বিদেশি সাংবাদিকদের জোরপূর্বক বহিস্কৃত করলে[৬৪] বিদেশি সাংবাদিকদের সংবাদ সংগ্রহের ক্ষেত্র হিসেবে ভারতের মাটিকে বেছে নেওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ভারতীয় সাংবাদিকগণ এই সুযোগে বিদেশি সাংবাদিকদের সহায়তা করার সুযোগটি হাতছাড়া করেনি। ফলে সংবাদ সংগ্রহের মূল কেন্দ্র হিসেবে দিল্লি, কলকাতা, আগরতলা ও অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদ ভারতীয় মিডিয়ার সহযোগিতায় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমগুলো অনায়াসে সংবাদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হয়। ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারত সরকারের কর্মকাণ্ড বিশ্ব পরিসরে অতিদ্রুত ইতিবাচক হিসেবে প্রতিফলিত হতে থাকে। বিবিসি, রয়টার্স, ভয়েস অব আমেরিকা ইত্যাদি সংবাদমাধ্যম আকাশবাণী কিংবা ভারতীয় পত্র-পত্রিকার উদ্ধৃতি দিয়ে সংবাদ প্রকাশ করেছে। যেমনটি দেখা যায়, *আনন্দবাজার, অমৃতবাজার* পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ কিংবা ভারতীয় সংবাদ প্রতিষ্ঠানের উদ্ধৃতি দিয়ে বিবিসি সংবাদ প্রচার করে।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্পর্কে বা মুক্তিযোদ্ধাদের যুদ্ধ-প্রতিরোধ নিয়ে ভারত সরকারের সংশ্লিষ্টতার মূল কারণ ছিল সামরিক জান্তা কর্তৃক গণহত্যার ব্যাপকতা ও বিপুল সংখ্যক ছিন্নমূল মানুষের বিরামহীন মিছিল এবং একই সঙ্গে ট্যাংকের নিচে গণতন্ত্র হত্যার কারণসমূহ। যা ভারতীয় ও বিশ্ব বিবেককে প্রচণ্ডভাবে আঘাত করেছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারত সরকারের কর্মকাণ্ড যখন শুধু 'মৌন সমর্থন'-এর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল তখন প্রভাবশালী দৈনিকগুলোতে সরকারের তীব্র সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিল না। পত্রিকাগুলো প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভিসি শুক্লা'র সমালোচনা করে এমন কথাও লিখেছে যে, প্রতিরক্ষা বাজেট বৃদ্ধি করে কোনো লাভ হবে না যদি না তা অবিলম্বে পাকিস্তানের জঘন্য ও অমানবিক বর্বরতার জবাব দিতে ভারত সরকার অনীহা প্রকাশ করে, তারা প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীরও সমালোচনা শুরু করেন। এ সময় "আনন্দবাজার, অমৃতবাজার, কম্পাস, নিউ এজ, কালান্তর, যুগান্তর, দি স্টেটসম্যান, ফ্রন্টিয়ার, হিন্দুস্তান টাইমস, টাইমস অব ইন্ডিয়া, হিন্দুস্তান স্টান্ডার্ড, ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইত্যাদির ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই সব পত্রিকা প্রতিদিন বিভিন্ন শিরোনামে, সম্পাদকীয়তে ও প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধের কলমসৈনিক হিসেবে যুদ্ধারত ছিল। প্রতিনিয়ত গণআকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটিয়ে গণমাধ্যমগুলো রণাঙ্গনের কর্মকাণ্ড প্রচারের ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে তা অবিস্মরণীয়।

এ প্রসঙ্গে আকাশাবাণীর ভূমিকা সেদিন যুদ্ধরত প্রতিটি মানুষকে করেছিল অনুপ্রাণিত। সরকারনিয়ন্ত্রিত মাধ্যম হলেও আকাশবাণী জনগণের কণ্ঠস্বর হিসেবে কাজ করেছে, জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে, সংগীতে, কবিতায়, কথিকায় ও সুরের মুর্ছনায় এমন একটি আবহ তৈরি করেছে যার ফলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রতিনিয়ত দৃশ্যমান হয়ে উঠেছে।

বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে সবাই একমত, তবু সরকার নীরব কেন?' সমর গুহ, এমপি'র একটি লিখিত প্রবন্ধে এ প্রশ্নটি উত্থাপন করেন। প্রবন্ধের এক অংশে বলেন, নীতিগতভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের বিরোধী নন ভারত সরকার। তবে, ভারত সরকার মনে করেন যে, এখন স্বীকৃতি দিলে বাংলাদেশের পক্ষে সহায়ক হবে না, ক্ষতি করা হবে। অর্থাৎ সরকারি ভাষায়, "হেল্পফুল হবে না, হার্মফুল হবে।" এদিকে বাংলাদেশের সরকার এবং সকল রাজনৈতিক জাতীয় দল বারবার বিশ্বের কাছে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের আবেদন জানিয়েছে। বাংলাদেশের পক্ষে কোনটা স্বার্থসম্মত এবং কোনো কাজ ক্ষতিকর সেই বিচারের প্রধান যোগ্যতা এবং অধিকার যে বাংলাদেশের সরকারের, এই মূল কথাটি স্বীকার করে নিয়ে ভারত সরকারের বরং স্পষ্ট করে বলা উচিত যে, ভারতের স্বার্থে ভারত সরকারের পক্ষে এখন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সম্ভব নয়–যদিও, ভারতীয় জনমত মনে করে যে, বাংলাদেশকে আশু স্বীকৃতি দেওয়াই ভারতের পক্ষে স্বার্থসম্মত।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সম্বন্ধে বলেছেন, 'রাইট টাইমে রাইট ডিসিশন' নেওয়া হবে। এই সঠিক সিদ্ধান্তের ঠিক সময়টি কখন আসবে? ঠিক সময় ও ঠিক সিদ্ধান্তের নিয়ামক বা নির্ণায়ক অথবা পারিপার্শ্বিকতার সূচকই বা কি?[৬৫]

ছ. নানামুখী চাপ: ২৫শে মে, রাজ্যসভার অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিংহ বাংলাদেশের স্বীকৃতির দাবিতে উত্থাপিত বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।[৬৬] ১৮ই জুন, বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া প্রসঙ্গে লোকসভায় বিরোধীদলের সদস্যরা জোর দাবি করেন। লোকসভায় বাংলাদেশে সংগঠিত গণহত্যার বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপন করে বিশ্ব-সমর্থন আদায়ের জন্য সরকারকে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করতে বলা হয়।[৬৭] ২রা জুলাই, লোকসভার অধিবেশনে বাংলাদেশের স্বীকৃতি প্রসঙ্গে সকল দলের সদস্যরা ব্যাপক আলোচনা করেন। অধিকাংশ সদস্য স্বীকৃতির প্রশ্নে সরকারের গড়িমসির কড়া সমালোচনা করেন।[৬৮] ২১শে জুলাই (৬২৭-৬২৮) ৩১শে জুলাই, স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি জানিয়ে রাজ্যসভায় একটি প্রস্তাব উত্থাপিত হয় এবং তার ওপর ব্যাপক আলোচনা হয়।[৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯ই আগস্ট। মুক্তিযুদ্ধকালে ভারতের বেশ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল সরকারের কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যর্থতা এবং বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলে বিভিন্ন রকম প্রশ্ন উত্থাপন করে। এমনকি কতিপয় রাজনৈতিক দল বিশেষকরে বাংলাদেশের স্বীকৃতির ব্যাপারে সত্যাগ্রহ করার স্লোগান দিচ্ছেন তাঁদের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমরা কখনো বলিনি যে, বাংলাদেশকে আমরা স্বীকৃতি দেব না। কিন্তু সবদিক বিবেচনা করেই বাংলাদেশ সমস্যা সমাধান ও আমাদের জাতীয় শক্তি বৃদ্ধি করেই আমাদেরকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্বীকৃতি দেওয়ার মধ্যেই শুধু সাহসিকতা প্রদর্শিত হয় না, কিন্তু আমাদের বিবেচনা করতে হচ্ছে, ভারতের কোটি কোটি মানুষ ও বাংলাদেশের দুর্দশাগ্রস্ত জনগণের কথা। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে নয়াদিল্লির ইন্ডিয়া গেটে আয়োজিত এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এই সভার অন্যতম একটি লক্ষ্য হলো সারা পৃথিবীকে দেখিয়ে দেয়া ভারতবাসী ঐক্যবদ্ধ এবং সরকারের পেছনে তাঁরা শক্তভাবে দাঁড়িয়ে আছে। যেকোনো ত্যাগ স্বীকারে তারা প্রস্তুত। আমাদের এই শক্তি বাংলাদেশের জনগণকে প্রেরণা দিবে এবং বিশ্ব দেখতে পাবে ভারত ও ভারত সরকার দুর্বল নয় এবং যেকোনো হুমকির মোকাবেলায় আমরা প্রস্তুত।[৭০]

২. বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনসমূহের ভূমিকা

ভারতের অধিকাংশ রাজনৈতিক দল এবং জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে তাঁদের আন্তরিক সহযোগিতা, সহানুভূতি এবং সক্রিয় সমর্থন দৃঢ়ভাবে প্রকাশ করেন। তবে ভারতের রাজনৈতিক দল, সংগঠন বা গণআকাঙ্ক্ষা এবং প্রতিক্রিয়া একই সমান্তরাল শক্তিতে ও ব্যাপকতায় প্রকাশিত হয়নি।

ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে বিভিন্ন সময়ে নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করেছে তার সঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর নীতিগত বিরোধীতা ছিল না, ছিল মাত্রাগত। কারণ বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারত সরকার বিভিন্ন ইস্যুতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক দলগুলোর কর্মকাণ্ড ও দাবি-দাওয়ার দ্বারা বহুলাংশে প্রভাবিত ছিল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধসংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ইস্যুতে রাজনৈতিক দলের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনার জন্য ১৯৭১ সালে লোকসভায় প্রতিনিধিত্বকারী রাজনৈতিক দলসমূহ যে মতামত প্রদান করেন তা গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়েছিল। আন্তর্জাতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়টিকে ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে অধিক মাত্রায় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে জাতিগত সম্মান, মর্যাদা ও বীরত্ব প্রকাশের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে। সেই বিবেচনায় বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠন তাদের দলীয় অবস্থান থেকে মুক্তিযুদ্ধে তাদের করণীয় নির্ধারণ করেছে।

একাত্তরে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের বিরোধী রাজনৈতিকদলগুলোর বক্তৃতা, বিবৃতি, সভা-সমাবেশে বাংলাদেশকে 'স্বীকৃতি ইস্যু' আধিপত্য বিস্তার করে। ভারতের সব বিরোধী দল স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে বারবার সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছে। সরকারি দল কংগ্রেসও বাংলাদেশকে স্বীকৃতির প্রশ্নে ইতিবাচক ভূমিকা নিয়েছে। ভারত সরকার বরাবরই বলেছে যে, তাদের বিবেচনায় 'উপযুক্ত সময়ে' স্বীকৃতি প্রদান করবে।

বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৭ই মে, ১৯৭১ এক স্মারকলিপি প্রদান করে 'বিলম্ব হলে সংগ্রামরত বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদেরই শুধু যে বিপদগ্রস্ত করা হবে তাই নয় ভারতেরও মারাত্মক ক্ষতি করা হবে।'[৭১] সংসদের বিরোধীদলীয় নেতাদের সঙ্গে ৭ই মে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করেন। বিরোধী নেতাদের স্বীকৃতিদানের দাবির জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, স্বীকৃতি বিষয়ে ভারতের বন্ধুভাবাপন্ন দেশগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে তবে বর্তমান অবস্থায় কোনো রাষ্ট্রই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের পক্ষপাতী নয়। তিনি বলেন, এখনই স্বীকৃতি না দিলেও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে সার্বিক সহায়তা দেবে ভারত। মুসলিম লীগ ও বিকানীর মহারাজা করণ সিং ছাড়া কমিউনিস্ট পার্টি, ডিএমকে, সিপিএম, পিএসসি, আরএসপি ও জনসংঘের নেতারা স্বীকৃতিদানের পক্ষে বক্তব্য রাখেন।[৭২] ৮ই মে পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভা 'বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিন' শিরোনামে সর্বসম্মতিক্রমে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৭৩] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির জাতীয় পরিষদের আহ্বানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সার্বিক সহায়তা প্রদানের উদ্দেশ্যে সারা ভারতব্যাপী ১৫ই মে 'বাংলাদেশ দিবস' পালন করা হয়। এই কর্মসূচির অংশ হিসেবে কলকাতায় অনুষ্ঠিত জনসমাবেশে কমিউনিস্ট নেতা অধ্যাপক হীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বলেন, "বাংলাদেশ সরকারের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে পূর্ণ স্বীকৃতি না দিলে সার্বিক সাহায্য দেওয়া সম্ভব নয়।"[৭৪] রাজ্যসভায় বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্নে বিরোধীদলীয় নেতাদের বক্তব্যের উত্তরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরকারি অবস্থান ব্যাখ্যা করে বলেন যে, "জাতিসংঘ যাকে একটি দেশ বলে স্বীকার করে সে দেশের একটি অংশকে স্বীকৃতি প্রদানের ক্ষেত্রে খুব সতর্কতা প্রয়োজন। এটাও বিবেচনা করতে হবে যে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের ক্ষেত্রে এটা কী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। কারণ তাদের সঙ্গে রয়েছে আমাদের দীর্ঘ সীমান্ত। এ ধরনের ইস্যুর ক্ষেত্রে একজন আবেগপ্রবণ হয়ে যেতে পারেন যদিও গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়গুলোকে হালকাভাবে একপাশে রেখে দেওয়া যায় না।"[৭৫] বাংলাদেশ সম্পর্কে আট ঘন্টার লোকসভা বিতর্কের জবাব দানকালে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আমরা বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের প্রশ্নটি প্রতিনিয়ত ভেবে দেখছি। এ ব্যাপারে বা অন্য বিষয়ে আমরা যে সিদ্ধান্তগ্রহণ করি না কেন তা স্বাধীনভাবেই বিচার বিবেচনা করে গ্রহণ করবো। আমাদের বৃহত্তর স্বার্থের কথা মাথায় রেখে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবো।[৭৬]

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির পলিটব্যুরো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানে কেন্দ্রের বিলম্বের সমালোচনা করে এক প্রস্তাব গ্রহণ করে। বলা হয়, "অস্থায়ী সরকারকে স্বীকৃতিদানসহ সব ধরনের বস্তুগত সহায়তা প্রদানের ব্যর্থতার ফলে বাংলাদেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জনগণের সংগ্রাম ভীষণভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এবং এর ফলে বাংলাদেশের পাঁচ মিলিয়নের অধিক লোক ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে।"[৭৭]

২রা জুলাই সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ দিল্লিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি প্রদানের দাবি জানান। এমনকি এর ফলে যদি পাকিস্তানের সঙ্গে দীর্ঘ যুদ্ধের জন্ম হয় তবুও তাঁর মতে, অন্য দেশের মনোভাব জানার অপেক্ষায় না থেকে ভারতের উচিত এ বিষয়ে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেওয়া।[৭৮]

সিমলায় অনুষ্ঠিত সর্ব ভারতীয় কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ এই নয় যে, যেমন অন্যরা বলে থাকেন ভারত বাংলাদেশ প্রশ্নে আপোষ করছে; সেক্ষেত্রে স্পষ্ট করে সমালোচকদের বলা উচিত বাংলাদেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা পাকিস্তান সামরিক জান্তার সঙ্গে যে মীমাংসায় উপনীত হবেন আমরা তাই বুঝাতে চাচ্ছি। এই সমাধানের ভিত্তি হবে স্বাধীনতা বা বৃহত্তর স্বায়ত্তশাসন যা বাংলাদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে।[৭৯]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারতের রাজনৈতিক দলের ভূমিকা ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সামগ্রিক বিচারে ইতিবাচক। ১৯৪৭ সালে ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ন্যায় সুদূরপ্রসারী তাৎপর্যময় ইস্যু দেখা দেয়নি। বলার অপেক্ষা রাখে না রাজনৈতিক দলগুলো স্ব-স্ব আদর্শ-কর্মসূচি ও লাভ-ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তাদের করণীয় স্থির করেছে। দক্ষিণপন্থি দলগুলোর কাছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল সাতচল্লিশ, পূর্ব ভারতে ফিরে যাবার পথে প্রথম সোপান। অন্যদিকে, বামপন্থিদলগুলো বাংলাদেশ সমস্যাকে বিবেচনা করেছে বাঙালির 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' হিসেবে। একাত্তরের মাঝামাঝি ভারতের রাজনীতিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ জাতীয় ইস্যুতে পরিণত হয়। ভারতের পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনেও মুক্তিযুদ্ধের ইস্যু জনমত প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যে কারণে প্রতিটি রাজনৈতিক দলের কর্মসূচিতে মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত ইস্যু অগ্রাধিকার পায়। বলা যায়, রাজনৈতিক দলগুলোর দাবি-দাওয়া; মতামতের আলোকেই ভারত সরকার বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ প্রশ্নে করণীয় স্থির করেছে।

ক. রাজনৈতিক দলগুলোর দৃষ্টিভঙ্গি ও মতপার্থক্য: পূর্ববঙ্গের জনগণের দীর্ঘ সংগ্রাম, ত্যাগ আর আদর্শিক প্রেরণা বামদল ও উদারনৈতিক রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে বড় হয়ে দেখা দেয়। ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার শত্রুতাপূর্ণ সম্পর্কের আলোকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে বিবেচনা করেনি বরং জনগণের সার্বিক মুক্তির লক্ষ্যে শেষ পর্যন্ত 'জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের পর্যায়' পর্যন্ত দৃষ্টিবদ্ধ করেছে।[৮০] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও আগস্ট মাসের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিমবঙ্গের বালুর ঘাট কুরমাইল ক্যাম্প পরিদর্শনে আসেন। এই ক্যাম্পে অবস্থিত প্রশিক্ষণার্থীদের সামনে যে বক্তব্য পেশ করেন তার সোজাসাপটা অর্থ ছিল বাংলাদেশের জনগণের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তির লক্ষ্যে তার দল মুক্তিযুদ্ধকে সমর্থন প্রদান করছে। আন্তর্জাতিক অঙ্গনে বিশেষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যে শান্তি, সৌহার্দ্য ও বন্ধুত্বমূলক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বক্তৃতায় তিনি দৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেন যে, "সাম্রাজ্যবাদী শক্তি যতই কৌশল গ্রহণ করুক না কেন বাংলাদেশ স্বাধীন হবেই।" এই লক্ষ্যে তিনি অবিলম্বে সরকারকে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান।[৮১] প্রজা সোস্যালিস্ট পার্টির মুখপত্র 'জনতা'য় দলীয় অবস্থান সম্পর্কে লেখা হয় যে, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতাসহ মৌলিক আদর্শগত বিষয়ে আওয়ামী লীগ এবং ভারত নীতিগতভাবে ঐক্যমত থাকায় ভারতীয় জনগণ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে স্বতঃস্ফূর্ত সমর্থন জ্ঞাপন করেছে।[৮২] ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির (মার্ক্সীয়) দৃষ্টিতে বাংলাদেশ আন্দোলন পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যেকার দ্বন্দ্ব ছিল না, বরং এটা ক্ষুদ্র শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জনতার ন্যায্য দাবি আদায়ের সংগ্রাম যা পাকিস্তানের উভয় অংশ এবং ভারতের জনসাধারণের সমর্থন করা উচিত।[৮৩] ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও আওয়ামী লীগের মধ্যে নীতিগত অবস্থানের দিক থেকে আদর্শগত সাদৃশ্য, বিশেষত গণতন্ত্র এবং অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির কথা বারবার উল্লিখিত হয়। নীতিগত প্রশ্নে ভারতের শাসক দল কংগ্রেস এবং ভারত সরকারের মধ্যে মতানৈক্য না থাকায় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর পক্ষে বাংলাদেশকে জোরগলায় সমর্থন প্রদান সহজ হয়ে যায়। যদিও লোকসভায় মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বিভিন্ন বিতর্কে শাসকদলের অনেক সদস্য সরকারি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়।[৮৪] তবে সামগ্রিক বিচারে কংগ্রেস এবং ভারত সরকারের নীতি ছিল সামঞ্জস্যপূর্ণ। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সর্বাত্মক সংহতি প্রকাশ করে। তাঁদের দুঃখ-দুর্দশা লাঘবে করণীয় যা কিছু করবে।[৮৫] বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইস্যুতে সামগ্রিক বিচারে ভারতের রাজনৈতিক দলগুলোর ভূমিকা ছিল ইতিবাচক। অর্থাৎ বাংলাদেশের পক্ষে দৃঢ়ভাবে অবস্থান নিয়েছিলো। তবে রাজনৈতিক দলগুলো দলীয় আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে মুক্তিযুদ্ধে তাদের করণীয় স্থির করেছে। যে কারণে দক্ষিণপন্থি দলের সঙ্গে বামপন্থি দলের দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। শাসকগোষ্ঠীর গৃহীত রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে ভিন্ন অবস্থান গ্রহণ করলেও তাদের মূল সূত্র ও লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন।

৭ই মে সকালে বিরোধী নেতাদের সঙ্গে নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ নিয়ে আলোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বৈঠকে বসেন। প্রায় সকল নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশ সরকারকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানান। বিকানীরের মহারাজা ড. করণ সিং এবং মুসলিম লীগ নেতা মহম্মদ ইসমাইল দু'জনের বক্তব্যে অবশ্য কিছু পার্থক্য ছিল। অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের দাবির বিরোধীতা করেন বিকানীরের মহারাজা ড. করণ সিং। তিনি লোকসভায় কয়েকটি ছোটো গ্রুপ ও কয়েকজন নির্দল সদস্যের নেতা। সেই গ্রুপ ও ব্যক্তিরা আগে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। ড. করণ সিং-এর বক্তব্যের মূল কথা ছিল, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে বাঙালিদের বিদ্রোহ। ভারতের এ ধরনের ব্যাপার ঘটলে সরকার কি করতেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাশ্মীরের কথাও ভাবা দরকার। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী তাঁর জবাবে এ কথা বলেন যে, কাশ্মীরে যারা হাঙ্গামা করতে চায় তারা জনসাধারণ থেকে বিচ্ছিন্ন। পক্ষান্তরে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামীদের পেছনে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসমর্থন রয়েছে। বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অভিমত ও অভিপ্রায়কে পাকিস্তান অস্ত্র দ্বারা দাবিয়ে রাখতে চাইছে। মুসলিম লীগ নেতা মুহম্মদ ইসমাইলের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ হলো, এমন কিছু করা ঠিক হবে না যাতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় বা কোনো সংকট গুরুতর হয়। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে ঐ ধরনের সংকট দেখা দিতে পারে। তবে সরকার এ ব্যাপারে যে কোনো ব্যবস্থাই নিন না কেন তার প্রতি তাঁদের দলের সমর্থন থাকবে। মুসলিম লীগ ব্যতীত রাজা গোপালাচারির স্বতন্ত্র পার্টি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করেন এবং ভারত-পাকিস্তান স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নীতি গ্রহণ করার পক্ষে মতামত পেশ করেন। এই অবস্থানের প্রধান কারণ হলো সম্ভাব্য চৈনিক হস্তক্ষেপের ভীতি। তাছাড়া শরণার্থীর ভরণপোষণ যুদ্ধের চেয়ে কম ব্যয়বহুল এই যুক্তিতে ভারতের যুদ্ধে জড়িয়ে পরাকে স্বতন্ত্র পার্টি সমর্থন করে না। বরং যুদ্ধের কারণে ভারতে শরণার্থীর সংখ্যা বেড়ে যাবার আশঙ্কা যেমন প্রবল, তেমনি পশ্চিমা সরকারগুলোর কাছ থেকে পাকিস্তানের সাহায্য প্রাপ্তির সম্ভবনাও বৃদ্ধি পাবে। উপরন্তু মুক্তিযুদ্ধে বিপুল শরণার্থীর আগমন ও ভারতের সক্রিয় ভূমিকা ভারতের অভ্যন্তরে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার সঞ্চার করতে পারে। "The Hindu-Muslim relations within the country might also become strained if India became deeply involved in the Bangladesh problem."[৮৬] স্বতন্ত্র পার্টি মুক্তিযুদ্ধকে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে যেমন দেখেছে তেমনি চীনের সম্ভাব্য হস্তক্ষেপের বিষয়ও বিবেচনা করেছে। শেষপর্যন্ত দলীয় অবস্থান ছিল পূর্ব পাকিস্তান ইস্যুতে নিজের স্বার্থে ভারতের নিরপেক্ষ থাকা বাঞ্চনীয়।

আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে ভারতের রাজনৈতিক নেতৃত্বের চিন্তাধারা স্পষ্টত দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। প্রথম ভাগ পর্যালোচনায় একথাটি বেরিয়ে আসবে যে, মূলধারার রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে ঐক্যমত্য পোষণ করলেও তাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল ভিন্ন ভিন্ন। ভারতের হিন্দু জাতীয়তাবাদী ও ডানপন্থি দলগুলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে মূল্যায়ন করেছে অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে সামনে রেখে। জনসংঘ, উগ্রপন্থি দলগুলো, স্বতন্ত্র ও হিন্দু মহাসভার তৎপরতা সে রকমই সাক্ষ্য দেয়। তবে সকল রাজনৈতিক সংগঠন দক্ষিণ এশিয়ায় ভারতের একক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা হিসেবে গ্রহণ করেছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে। এই দক্ষিণপন্থি দলগুলোর কাছে মুক্তিযুদ্ধের আদর্শিক কোনো গুরুত্ব ছিল না। মুসলিম লীগ এবং মুসলিম নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অভ্যুদয়কে বিশেষকরে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতীয় সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা ছিল নেতিবাচক। এমনকি অধিকাংশ মুসলিম জনগোষ্ঠী পাকিস্তান ভেঙে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার বিষয়টি মনে প্রাণে মেনে নিতে পারেনি।[৮৭]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসব কিছু বিবেচনায় নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন যে, "বাংলাদেশের ব্যাপারকে কেন্দ্র করে কিছু লোক সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি করতে চাইছে। সকলকে এ বিষয়ে সতর্ক হতে হবে।"[৮৮] অধিকাংশ বিরোধী নেতা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের জন্য জোর দাবি জানান। পরিস্থিতি সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর বিশ্লেষণ তাঁরা মেনে নেননি। তাঁরা বলেন যে, বাংলাদেশ এখন একটি বাস্তব সত্য। স্বীকৃতি দিয়ে সরকার শুধু সেই সত্যটিকে মেনে নেবেন। ফলে মুক্তিযুদ্ধ জোরদার হবে। ভারত এ বিষয়ে বিলম্ব করলে ভারতেরই ক্ষতি হতে পারে। এই দাবি জানান, সি পিএম; সিপিআই; ডি এম কে; আদি কংগ্রেস; পি.এস.এস; পি.এস.পি; ফরোয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি। সি পি আই-এর সদস্য ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত পশ্চিমবঙ্গ কমিটির পক্ষ থেকে প্রধানমন্ত্রীকে যে স্মারকলিপি দেন সেখানে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি ছিল অন্যতম। সি পি এম-এর সদস্য এ কে গোপালন স্পষ্ট করে বলেন যে, পাকিস্তানকে ভয় না করে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের সব রকমের সাহায্য দেয়া উচিত। ডি এম কে-এর কে. মনোহারণ, জনসংঘ-এর অটলবিহারী বাজপেয়ী, ফরোয়ার্ড ব্লক-এর চিত্ত বসু, আর এসপি-এর ত্রিদিব চৌধুরী, পিএসপি-এর এন জি গোরে ও আদি কংগ্রেসের এস এন মিশ্র একইভাবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতির দাবি উত্থাপন করেন।

শ্রীমতী গান্ধীর প্রাথমিক এবং তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া ছিল, স্বাধীন বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দান এবং মুক্তিযুদ্ধকে সম্পূর্ণভাবে সামরিক সহায়তা প্রদান।[৮৯] কিন্তু পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং প্রধানমন্ত্রীর এই মনোভাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ভিন্নভাবে তাঁকে পরামর্শ দেন যে, এই মুহূর্তে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বৃহৎ শক্তিবর্গের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হতে হবে এবং অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপের অভিযোগ এবং প্রতিবেশী দেশের অখণ্ডতা ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত করার জন্য একতরফাভাবে ভারতকে দায়ী হতে হবে। ডি.পি.ধর. প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য সমর্থন করে অবিলম্বে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষে মতামত দেন। প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম এবং সেনাপ্রধানদের সঙ্গে আলোচনার পর অবিলম্বে সামরিক অভিযান থেকে প্রধানমন্ত্রী বিরত থাকেন এবং সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ করেন। এই উপলক্ষে বিরোধীদলের বৈঠক আহ্বান করেন। সভায় সকলের কথা শোনার পর প্রধানমন্ত্রী যা বলেন তার মর্মার্থ হলো, বাংলাদেশের মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত পূর্ণ সমর্থন জানাবে। কিন্তু বাংলাদেশকে এখনই কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেওয়া ঐ দেশেরই স্বার্থের পরিপন্থি হবে। সারা বিশ্বে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি প্রচুর সহানুভূতি থাকলেও স্বীকৃতির ব্যাপারে সক্রিয় ভাবনার পর্যায় অতিক্রম করেনি।

এ সময় চারদিকে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, আন্তর্জাতিক চাপের মুখে ভারত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করবে না। এমনকি এ প্রচারও চালানো হচ্ছিলো যে, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে যে সরকার গঠিত হয়েছে তাঁরা মুক্তিযুদ্ধকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যৌক্তিক পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে পারবে না। এই সময় এমন পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, প্রতিরোধ যুদ্ধের উন্মাদনা হ্রাস পেয়েছে ও নতুন উদ্যোমে মুক্তিযুদ্ধ নব শক্তিতে উজ্জীবিত হচ্ছে তার কোনো ক্রিয়া-কারন দৃশ্যমান ছিল না। প্রচার করা হচ্ছিলো তাজউদ্দীন সরকার ক্ষমতাসীন থাকলে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ব্যর্থ হবে এবং ভারত কোনোভাবেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে না। ভারত সরকার থেকে মুজিবনগর সরকারকে তখন পর্যন্ত অস্ত্র প্রশিক্ষণ ও সামরিক সাহায্যের ব্যাপারে কোনো প্রকার নির্দেশ দিয়েছে কিনা জানা যায়নি। অবশ্য এই গুজবের তেমন কোনো ভিত্তি ছিল না এই কারণে যে, মে মাস থেকেই লক্ষণীয় হয় যে, ভারত সরকার মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র প্রদান ভারতীয় সামরিক বাহিনীর উপর ন্যস্ত করে। যদিও প্রথমদিকে স্পষ্টভাবে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "কোন অবস্থাতেই ভারত ভীত নয়।" পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে নানা উস্কানিমূলক কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে এবং ভারতকে নানাভাবে সরাসরি বাংলাদেশের ব্যাপারে জড়াতে চাচ্ছে। কিন্তু ভারত যা ঠিক মনে করবে, তা করতে ভীত নয়। ইন্দিরা গান্ধী আরও বলেন যে, "বাংলাদেশে আগে দুই ডিভিশন পাকিস্তান ফৌজ ছিল। এখন আছে চার ডিভিশন। শহরগুলির অধিকাংশ পাকফৌজের দখলে আছে। গ্রামাঞ্চলের বহু এলাকাই এখনও মুক্তিফৌজের নিয়ন্ত্রণে। গেরিলা তৎপরতা চালিয়ে তারা পাকিস্তানফৌজের আক্রমণকে সাফল্যের সঙ্গে মোকাবিলা করছেন।"

বাংলাদেশ স্বীকৃতির প্রশ্নে বিভিন্ন গণমাধ্যমে, পত্রিকায় ও সম্পাদকীয়তে বিভিন্ন ধরনের মতামত প্রকাশিত হয়। একটি দৈনিক পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়, "সেই পুরাতন স্বীকৃতির প্রশ্নটা মাঝে মাঝে চকিতে আশার রেখা দেখিয়ে যেন মরীচিকার মতো মিলে যাচ্ছে।" কেন্দ্রীয় সরকারে উপর চাপ প্রবল, প্রায় সমস্ত বিরোধী দল একবাক্যে বলছেন, 'বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দিন।' এই দাবি নানা রাজনৈতিক দলের কণ্ঠে, এমনকি একাধিক রাজ্যের বিধানসভাতেও ধ্বনিত হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভায় সর্বসম্মত প্রস্তাবটি নানা দিক হতে ঐতিহাসিক। এর মর্মবস্তু বাংলাদেশের সার্বভৌম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতি সৌভ্রাতৃত্বের নিদর্শন, সেই সঙ্গে উচ্চরিত হয়েছে আন্তরিক সমর্থন। স্পষ্ট করে বলা হয়েছে, প্রতিবেশী দেশের এই সংকটে তার কী প্রত্যাশা এবং কী প্রয়োজন। বলিষ্ঠ ভাষায় বলা হয়েছে, গেরিলাদের অস্ত্র জোগান দিতে হবে। মুক্তি আন্দোলনের প্রতি ভারত পূর্ণ সমর্থন জানাবে, অথচ কূটনৈতিক স্বীকৃতি দেবে না, পরস্পরবিরোধী এই পদক্ষেপ ভারতকে দুর্বল করবে। প্রশ্ন করেছে কেন্দ্রের নিকট স্বীকৃতির জন্য অপেক্ষা আর কতকাল?

লোকসভার সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ লিখিতভাবে যা বলেছেন যে, "একথা আজ সুস্পষ্ট যে রুশ-মার্কিন, ব্রিটেন বা ফ্রান্স পাকিস্তানের বিখণ্ডন চায় না, পাকিস্তানের সংহতি রক্ষায় এই রাষ্ট্রগুলোর উদগ্রীব।"[১০] এ কথার অর্থ দাড়ায় ভারত বাংলাদেশ সংকটকে নিয়ে একাকী হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে কখনো বিচ্ছিন্নতাবাদ বা কখনো পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো পাশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাটিয়ে যাচ্ছে। এমনকি শতাব্দির ভয়াবহ ট্রাজেডি যেখানে দৃশ্যমান, সেক্ষেত্রে কোনো দেশই তা জাতিসংঘে উত্থাপন করেনি। যেভাবে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কূটনৈতিক তৎপরতা চালাচ্ছে তাতে প্রতীয়মান হয় পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার দায়িত্ব যেন তারাই নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে। তাঁদের কূট তৎপরতায় একটি কথায় বেরিয়ে এসেছে যে, বাংলাদেশের জন্য অধিকতর স্বায়ত্তশাসন যেন জন-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। রাজনৈতিক সমাধান বলতে সেসব বৃহৎ রাষ্ট্র পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় বাংলাদেশের 'শিথিল স্বাধীনতা'কে এভাবে দেখতে চায়। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে বাংলাদেশের একটি শিথিল কনফেডারেশন গঠন করে পাকিস্তানের সংহতি রক্ষা করা। এর প্রতিকূলে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিবেশী দেশ হিসেবে বাংলাদেশকে ভারত স্বীকতি না দিলে অন্য রাষ্ট্র স্বীকৃতি দিতে এগিয়ে আসার কারন নেই।

বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাওয়ার ক্ষেত্রে সকল শর্তই পূরণ করে এবং যোগ্যতা অর্জন করেছে। বাংলাদেশের নিজস্ব নাম, স্বাধীন পতাকা, জাতীয় সংগীত, ভাষা-সংস্কৃতি ও নিজস্ব ভূখণ্ড রয়েছে। একটি নির্বাচিত আইনানুগ সরকার মুক্তিসংগ্রাম পরিচালনা করছেন। রাষ্ট্রীয় কাঠামো, প্রশাসন ব্যবস্থা, রাষ্ট্রযন্ত্রের বিভিন্ন কার্যক্রম, নিজস্ব সামরিক ও পুলিশ বাহিনী বিদ্যমান। নিজস্ব অর্থে বাজেট পরিচালিত হচ্ছে এবং রাষ্ট্রকার্য সম্পাদিত হচ্ছে। এমন অবস্থায় স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দান জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী নৈতিক দায়িত্ব। ভারত সরকারের পক্ষে বাংলাদেশকে স্বীকৃতিদানের পক্ষে বিশেষ কোনো যুক্তিযুক্ত বাধা নেই।

মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টির অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানে কেন্দ্রের বিলম্বের সমালোচনা করা হয়। সমালোচনার সারসংক্ষেপ হলো, মুজিবনগর সরকারকে স্বীকৃতি প্রদান না করা, বস্তুগত সাহায্য না করায় বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে এবং ৫০ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আগমন করার ফলে ভারতে বিশেষকরে সীমান্ত রাজ্যগুলোতে ব্যাপক অসুবিধা সৃষ্টি হয়েছে। এ সবই হচ্ছে ভারত সরকার কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার ফলশ্রুতি। বাংলাদেশকে অবিলম্বে স্বীকৃতি দেয়ার জন্য মার্কসবাদী কমিউনিস্ট পার্টি একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে।[৯১]

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির পশ্চিম অঙ্গরাজ্য পরিষদ ১৬ ও ১৭ই জুন দু'দিনব্যাপী অধিবেশনে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার দাবি জানায়। একইসাথে 'বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র ও সামরিক শিক্ষাসহ' সর্বপ্রকার সাহায্য দেওয়ার জন্য ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি প্রস্তাব গ্রহণ করে। কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য পরিষদ মনে করে, বাংলাদেশের এই সমস্যাকে জাতীয় সমস্যা হিসেবে দেখাতে হবে। রাজ্য পরিষদ বাংলাদেশের শরণার্থী গ্রহণের বিষয়ে উড়িষ্যা সরকারের মনোভাব এবং মেঘালয়ে দাঙ্গার বিষয়ে গভীর ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। বাংলাদেশ প্রসঙ্গে একটি জাতীয় সংহতিমূলক দৃষ্টিভঙ্গি অবলম্বন এবং সীমান্ত রাজ্যগুলির স্কন্ধভার ভাগ করে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সকল রাজ্যগুলিকে সচেতন করার উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্রীসমূহের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মেলন আহ্বানের জন্য পার্টি প্রধানমন্ত্রীর কাছে আবেদন জানিয়েছেন। এর কারণস্বরূপ বলা হয়েছে যে, যদি বাংলাদেশের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় তাহলে ভারতের গণতান্ত্রিক ধর্মনিরপেক্ষ শক্তিগুলি সাম্প্রদায়িকতা ও প্রতিক্রিয়ার জোয়ারে ভেসে যাবে।[৯২]

খ. মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে: ভিন্ন পথের দিশারি: বাংলাদেশের স্বাধীনতা দীর্ঘস্থায়ী করার রাজনৈতিক কৌশলে ভারতের সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হবে। গ্রামে গ্রামে মুক্তিবাহিনী দীর্ঘস্থায়ী লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। লক্ষ লক্ষ তরুণ যুবকের হাতে অস্ত্র চলে যাচ্ছে। নতুন নেতৃত্ব তৈরির সম্ভাবনা উড়িয়ে দেয় না। মুক্তিফৌজের যে সমস্ত নেতারা হাতে হাতিয়ার নিয়ে লড়াই করছেন তাঁদের সম্পর্কে বলা হয়, তারা নতুন নেতৃত্বের প্রতি তেমনটি আস্থাশীল নন। অল্প কিছুদিন পূর্বে জাতীয় আওয়ামী পার্টির মওলানা ভাসানী এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন যে, অন্য বামপন্থি দলগুলি গ্রামে গ্রামে সর্বদলীয় কর্ম পরিষদ গড়ছে। উদ্দেশ্য হলো পাকিস্তানের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য গণপ্রস্তুতি।

তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হলে কী নতুন নেতৃত্বের উদ্ভব হবে না? উত্তরে তিনি একটি গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন, বাঘ কখনও মানুষের রক্তের স্বাদ ভুলতে পারে না। বাংলাদেশে শিক্ষিত বেকারের সংখ্যা ১৩ লক্ষ। হাতে হাতিয়ার পেলে মানুষের চাল-চলন, ধ্যান-ধারণা ও আচার-ব্যবহার সবই বদলে যায়। অধ্যাপক মোজাফ্ফর আহমেদের জাতীয় আওয়ামী পার্টি, পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (মস্কোপন্থি) ও অন্য কমিউনিস্ট গোষ্ঠী (যারা এককালে মাও নীতি ঘেঁসা ছিল) এ-সমস্ত দলের নেতাদের ধারনা বিপ্লব কষ্টসাধ্য ও দীর্ঘায়িত হবে। এর জন্য প্রয়োজন সশস্ত্র মোকাবেলার উপযুক্ত রণকৌশল ও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে জনগণের রাজনৈতিক প্রতিরোধের কার্যক্রম। বৈপ্লবিক দলগুলির মধ্যে পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি যার নেতা মতিন-আলাউদ্দিন ও কমিউনিস্ট গ্রুপ যার নেতা কাজী জাফর ও রাশেদ খান মেনন। তৃতীয়টি হলো পূর্ব বাংলা কমিউনিস্ট পার্টি (এম.এল.) এর নেতা মুহম্মদ তোয়াহা। এ দলটি পিকিংপন্থির কাছ ঘেঁষেই চলে। বর্তমান বিপ্লব সম্পর্কে এদের নীতি দ্বিধাগ্রস্ত ও অস্পষ্ট। পাকিস্তানি জঙ্গি বাহিনীর হাতে এদের মার খেতে হয়েছে।[৯৩] সোশালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টির চতুর্থ কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিক ভারত শাখার সম্মেলনে বলা হয়, বাংলাদেশ সম্পর্কে ভারতে প্রথমে যে স্বস্তিবোধ ছিল তা ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। ধর্মীয় রাষ্ট্র পাকিস্তানের অমানবিক আচরণে ভারতবাসী ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল এবং উগ্র জাতীয়তাবাদের মধ্যে বাংলাদেশ সমস্যাকে দেখতে চেয়েছেন। কিছু লোক হিন্দু সাম্প্রদায়িক মনোভাব নিয়ে বাংলাদেশকে বিচার করেছে। পুজিবাদীরা দেখেছে বাজার সম্প্রসারণ ক্ষেত্র হিসেবে। বিপ্লব দীর্ঘস্থায়ী হলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দিকে বাংলাদেশের ঘটনাবলি মোড় নিবে। কেননা, বাংলাদেশের বিপ্লব এক অভূতপূর্ব গণতান্ত্রিক বিপ্লব। "চীন বিপ্লবের পর এটাই এশিয়ার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। যদি এই বিপ্লবকে সফল করতে হয় তবে একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত করতে হবে। আর সেকাজের নেতা হবে বাংলাদেশের শ্রমিক শ্রেণি।"[৯৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২৯শে জুন কংগ্রেস পার্লামেন্টারি পার্টির এক সভায় লোকসভার সদস্যদের মধ্যে অনেকেই প্রশ্ন তুলেন যে, কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত তেমন কার্যকর কিছু করতে পারছে না, যা নৈরাশ্যজনক। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এর জবাবে বলেন, ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা ভারতের নিরাপত্তা ও আর্থিক সক্ষমতার প্রশ্নটি বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো বুঝতে সক্ষম হয়েছে। নৈরাশ্যজনক ছবি উপস্থাপনের কোনো কারণ নেই। তবে তিনি বলেন, বাংলাদেশ প্রশ্নে কোনো হটকারী নীতি নয়, এরকম একটি সূক্ষ্ম সমস্যায় কোনো সরকারই অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে না।[৯৫]

গ. আওয়ামী নেতৃত্বের মূল্যায়ন: ১০ই এপ্রিল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠিত হয়। গৃহীত হয় স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রাষ্ট্রপতি ও সর্বাধিনায়ক, তার অবর্তমানে ভারপ্রাপ্ত রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম, প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ, এম. মনসুর আলী, কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাককে (পরে মন্ত্রীত্ব অকেজো করে রাখা হয়) নিয়ে ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল তারা মুজিবনগরে শপথ গ্রহণ করেন। নবগঠিত বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২৪শে এপ্রিল স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বরাবর বাংলাদেশের স্বীকৃতি এবং দুটি ভ্রাতৃপ্রতীম স্বাধীন দেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য দুটি পত্র প্রেরণ করা হয়।[৯৬]

ভারতের বামদল, তার অনুসারী নেতা-কর্মী-সমর্থক এবং কতিপয় সংবাদপত্র এ বিষয়ে একমত যে, আওয়ামী লীগ মধ্যপন্থি জাতীয়তাবাদী দল। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত গেরিলা যুদ্ধে রূপান্তরিত হলে বর্তমানে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্বের যোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারবে কিনা সন্দেহ রয়েছে। গেরিলা যুদ্ধের নেতৃত্বের প্রধান উৎস হলো বৈপ্লবিক রাজনৈতিক মানসিকতা। আওয়ামী লীগ বৈপ্লবিক দল হিসেবে নিজেদের রূপান্তরিত করতে পারবে কিনা এই নিয়ে যথেষ্ট সন্দেহের অবকাশ আছে। আওয়ামী লীগের মানসিক গঠন ও সশস্ত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি ও প্রশিক্ষণ অনুপস্থিত। একটি গণতান্ত্রিক দল হিসেবে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করে গণঅভ্যুত্থানের মাধ্যমে বা গণ-ম্যান্ডেটের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসীন হওয়া এক কথা; কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে রণনীতি ও রণকৌশল গ্রহণ করে দীর্ঘস্থায়ী একটি বৈপ্লবিক গেরিলা যুদ্ধ পরিচালনা অবশ্যই কঠিন ও ভিন্ন বিষয়। সে অবস্থায় পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিমবঙ্গে বাম বৈপ্লবিক দলগুলো বর্তমান বাংলাদেশের ক্ষমতাসীনদের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সমান্তরালভাবে যুদ্ধ পরিচালনার দীর্ঘস্থায়ী সুযোগ পেলে বর্তমান নেতৃত্ব পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে উঠবে।

যদিও এসব বিষয় বিবেচনা করেই ভারত সরকার বাংলাদেশের নিয়মিত বাহিনীর পাশাপাশি তরুণ নেতৃত্ব নিয়ে একটি শক্তিশালী বাহিনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।[৯৭] কিন্তু বাংলাদেশের বর্তমান প্রথাবদ্ধ সামরিক বাহিনীর সঙ্গে এইসব বৈপ্লবিক চেতনা সম্পন্ন প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গেরিলাদের সমন্বয় সাধনে ব্যর্থ হলে বাংলাদেশের স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লক্ষ্য অর্জন আরো জটিল হয়ে পড়বে। সে কারণে অনেক রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমরবিদ বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক সরকারের অধীনে পরিচালিত ন্যায়সঙ্গত মুক্তিযুদ্ধকে সার্বিকভাবে আশু সাহায্য ও সহযোগিতা করার অপরিহার্যতাকে তুলে ধরেছেন এবং একইসাথে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিয়ে সামরিক হস্তক্ষেপের পক্ষে অভিমত প্রদান করেন। সরকারি দল হিসেবে কংগ্রেসের ভূমিকা সূচনালগ্নে ছিল অনেকটা সতর্কমূলক এবং রক্ষণশীল। অন্যদিকে অধিকাংশ রাজনৈতিক দলের প্রতিক্রিয়া ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং উৎসাহব্যঞ্জক। বাংলাদেশের প্রতি ভারতীয় জনগণের তাৎক্ষণিক সমর্থন ও সক্রিয় সহানুভূতি অধিকাংশ ভারতীয় রাজনৈতিক দলের নীতি ও কর্মকাণ্ডে প্রতিফলিত হয়েছে। বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বিশেষভাবে ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি (মার্ক্সীয়), সোশ্যালিস্ট পার্টি, ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি এবং জনসংঘ সরকারের কাছে দাবি জানায় বাংলাদেশকে কার্যকর সাহায্য প্রদানের জন্য, যাতে করে বাংলাদেশের মানুষ তাদের সংগ্রামে সফল হয়। রাজনৈতিক দলগুলোর মূলদাবি ছিল বাংলাদেশকে প্রত্যক্ষভাবে অস্ত্র প্রদান করা নতুবা কাগুজে সহানুভূতির বাণী মুক্তিযোদ্ধাদের সংগ্রামকে শেষপর্যন্ত ব্যর্থ করে দেবে। মুক্তিযুদ্ধের পুরো সময়টাই রাজনৈতিকদলগুলো বাংলাদেশ বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুতে সরকারিনীতির সমালোচনায় মুখর ছিল, এর ফলে বাংলাদেশ সমস্যা ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে জনমত প্রভাবিত করার গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পরিণত হয়।"[৯৮]

এ প্রসঙ্গে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে গঠিত সরকারের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্ব ছিল তা ভারত সরকারের দৃষ্টি এড়ায়নি। তাজউদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত সরকার শেষপর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধকে এগিয়ে নিতে পারবে কিনা এ সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়। মার্কিন প্রশাসনকে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে স্থিত একটি শক্তিশালী লবি এই মর্মে বার্তা পাঠিয়েছিল বর্তমান নেতৃত্ব দ্বারা বাংলাদেশ স্বাধীন হবে না, তাদের উপর জনপ্রতিনিধিদের আস্থা নেই। যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে তা বামপন্থিদের হাতে ক্ষমতা চলে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের যোগাযোগ মুজিবনগর সরকারের সঙ্গে গোপনীয়ভাবে অব্যাহত ছিল। সি.আই.এ'র মাধ্যমে বাংলাদেশের প্রবাসী সরকারের পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষী, যিনি দীর্ঘদিন ধরে সি.আই.এ'র নেটওয়ার্কের সঙ্গে যুক্ত, তিনি এবং জহিরুল কাইয়ুম এর মাধ্যমে পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদকে দিয়ে স্বাধীনতার চেয়ে কম অর্থাৎ কনফেডারেশন গঠনের ফর্মুলায় সম্মত করাতে সচেষ্ট ছিলেন। বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে 'স্বাধীনতা চাও-না বঙ্গবন্ধুকে চাও'-এই স্লোগান ও লিফলেট দিয়ে স্বাধীনতার মূলশক্তি মুজিবপন্থিদের বিভক্ত করে স্বাধীনতার মূলে কুঠারাঘাত করার সি.আই.এ'র কার্যক্রম পরিচালনা করে। এই ঘটনা ভারতীয় কর্তৃপক্ষের নজরে এলে খন্দকার মোশতাককে পররাষ্ট্রমন্ত্রী হতে অবসর না দিলেও তার ভূমিকা ও কর্তৃত্বকে খর্ব করা হয়। মাহবুব আলম চাষীকে সচিব পদ হতে সরিয়ে দেওয়া হয়। এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভারত সরকারকে মুজিবনগর সরকারের উপর জনপ্রতিনিধিদের আস্থা আছে কি না তা যাচাই করে নেওয়া ছিল অবধারিত এক সংশয় মুক্ত উপায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশ সরকারের মন্ত্রীপরিষদের অভ্যন্তরে নড়বড়ে অবস্থা- সেনাকাঠামোয় অন্তর্দ্বন্দ্ব, পাকিস্তান সরকার কর্তৃক শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের পদক্ষেপ এবং আওয়ামী নেতৃত্বের উপদলীয় কোন্দল, বাঙালি সশস্ত্র কতিপয় সদস্যের পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন ও আত্মসমর্পণ ভারত সরকারের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি করে।

প্রশাসনিক সূত্রে দিল্লিতে এ খবরও আসছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান হতে ১৯৭০ এর নির্বাচিত জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের শূন্য আসনে নির্বাচন অনুষ্ঠান হতে যাচ্ছে। ভারত সরকারের নিকট এমনও প্রমাণ ছিল যে, সামরিক বাহিনীর, এমনকি জাতীয় ও প্রাদেশিক পরিষদের কিছু সদস্য পূর্ব পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তনে আগ্রহী। কনফেডারেশন গঠনের কূটনৈতিক তৎপরতা তখনও অব্যাহত ছিল। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বাংলাদেশের সরকারকে কার্যকর সামরিক ও রাজনৈতিক সাহায্য 'প্রদানের ক্ষেত্রে ভারতকে সবদিক নতুন করে ঝালাই করে নিতে হয়। ২০শে জুন ভারতের পররাষ্ট্র দফতরের যুগ্মসচিব অশোক রায় 'যতদূর সম্ভব শীঘ্র' বাংলাদেশের নির্বাচিত এম.এন.এ. ও এম.পি. দের যৌথ বৈঠক আহ্বানের জন্য বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী জনাব তাজউদ্দীন আহমদকে অনুরোধ করেন।

এই অধিবেশন ৫ ও ৬ই জুলাই শিলিগুড়ির বাগডোগরাতে অনুষ্ঠিত হয়। মন্ত্রী পরিষদে অন্তর্দ্বন্দ্ব, বিভিন্ন উপদলীয় কোন্দল এবং পারস্পরিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের মধ্যেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাসে এই বৈঠক ছিল নানাদিক থেকেই তাৎপর্যপূর্ণ। যে সকল গণপ্রতিনিধিবৃন্দ বিভিন্ন সেক্টরে প্রত্যক্ষ রণাঙ্গনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাদের কাছে কলকাতার তথাকথিত কোন্দল ও চক্রান্ত তেমন কোনো প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সেদিন অত্যন্ত জোরালোভাবেই গণপরিষদ সদস্যগণ বাংলাদেশ সরকার, পূর্ণ স্বাধীনতা এবং সশস্ত্র যুদ্ধ ত্বরান্বিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বৈঠকটির তাৎপর্য ছিল সকল দ্বিধাদ্বন্দ্ব ঝেড়ে ফেলে নতুন উদ্যম ও প্রেরণায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা করার অঙ্গীকারদৃপ্ত শপথ। অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, ডিসেম্বরের ভিতরে দেশ স্বাধীন না হলে আপনারা নতুন নেতা নির্বাচন করবেন।[৯৯]

বাংলাদেশের আশু স্বীকৃতি ব্যাপারে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিরোধীদের দাবির প্রেক্ষিতে বলেন, ভারতের মিত্রদের বিশেষকরে সোভিয়েত রাশিয়ার অভিমত হলো, অবিলম্বে বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়া সমীচীন হবে না। যদিও ভারতের জনগণ এবং জনমত এখনই স্বীকৃতি দেবার পক্ষে। এই গুরুতর বিষয়টি নিয়ে আবেগ তাড়িত না

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ নিতে হবে। বিশ্বের গণতান্ত্রিক দেশে ও জনমতকে পক্ষে আনতে হবে।[১০০]

দ্বিতীয় পর্ব

এ পর্যন্ত আলোচনায় অভ্যন্তরীণভাবে কূটনৈতিক ক্ষেত্র গ্রহণের প্রেক্ষিত ও ইস্যুসমূহ আলোচিত হয়েছে। আলোচনায় স্পষ্ট যে, অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জনমতের প্রতিফলনে রাজনৈতিক সংগঠন, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়, গণমাধ্যম, সর্বোপরি পার্লামেন্টে বাংলাদেশ-সংকট নিয়ে আলোচনায় যেসব গুরুত্ব ইস্যুসমূহ বেরিয়ে আসে বিশ্ব পরিসরে কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে ভারত সরকার তা বাস্তবায়নে এগিয়ে যায়।

৩. কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভারত সরকারের প্রক্রিয়া

১৯৬৯ সালে ক্ষমতাসীন কংগ্রেস বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সরকারকে ছোটো ছোটো বিরোধী দলের সমর্থন নিয়ে রাষ্ট্র পরিচালনা করতে হয়। এটা ছিল সংকটময় সময়। এরূপ বিড়ম্বিত অবস্থায় ১৯৭১ সালে সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করলে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃতাধীন কংগ্রেস পার্টি লোকসভায় দুই-তৃতীয়াংশ আসন লাভ করে। বিজয়ী প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ইন্দিরা গান্ধী নেহেরু যুগের নির্জোট পররাষ্ট্রনীতির আলোকে আঞ্চলিক সহযোগিতার উন্নয়নে কাজ করতে থাকেন যদিও মার্চ মাস থেকে পূর্ববঙ্গের ঘটনাগুলি তার উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে। এসময় ইন্দিরা গান্ধীকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জটিল বিষয়সমূহে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। ইন্দিরা গান্ধী প্রাথমিকভাবে তার প্রাইভেট সেক্রেটারি পি. এন. হাসকার এবং যার সঙ্গে ছিলেন জি. রাম চন্দ্র, এম মালহোত্রা, শারুদা প্রসাদ এবং ভি. এন. টেন্ডনকে নিয়ে কাজ করতে হয়। এই গ্রুপের সঙ্গে জি. পার্থ সারথি (যিনি কর্মকর্তা ছিলেন না, কিন্তু ইন্দিরা গান্ধীর ঘনিষ্ঠ ছিলেন) এবং ডি. পি. ধর (যিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রদূত ছিলেন।) তিনি ১৯৭১ সালে বিদেশ মন্ত্রণালয়ের পলিসি প্যানেলের প্রধান নিযুক্ত হন। যারা প্রায় প্রতিদিনই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করতেন।

১৯৭১ সালের মার্চ মাস থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত আনুষ্ঠানিক পরামর্শক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গঠিত পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স কমিটিতে (প্যাক) পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং, প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম, অর্থমন্ত্রী ওয়াই ভি চ্যাবন, অন্যান্য মন্ত্রী ও সচিব (যখন যাদের প্রয়োজন হতো) সংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনা করতেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী নিজেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। কিন্তু দু'জন প্রতিমন্ত্রী কেসি পান্ট ও আর এন মৃধাকে নিয়োগ দান করেন। পান্ট ছিলেন পশ্চিমবাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে। যার জন্য প্রায় তাদেরকে প্যাকের মিটিং-এ উপস্থিত থেকে ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করতে হতো। পান্ট যেহেতু প্রধানমন্ত্রীর ঘনিষ্ট এবং পূর্ব পাকিস্তানের দায়িত্বে ছিলেন সেজন্য শীর্ষ পর্যায়ে ক্যাবিনেট মিনিস্টারদের সঙ্গে তাকে সক্রিয়ভাবে তৎপর থাকতে হতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শীর্ষ আমলাতান্ত্রিক পর্যায়ে প্রশাসনে আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়। কমিটিতে মন্ত্রীপরিষদ সচিব ভি ডব্লিউ. স্বামীনাথন, পি এন হাসকার, প্রধানমন্ত্রীর সচিব পি. এন. ধর, প্রতিরক্ষাসচিব কে. বি. লাল, অর্থনৈতিক বিষয়ক সচিব আই. জি. প্যাটেল, পররাষ্ট্রসচিব টি এন কাউল এবং শীর্ষ পর্যায়ের আমলা যাদের যখন প্রয়োজন হত তারা সেই বিষয়ে প্রয়োজনীয় মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান করা হতো। এই কমিটি পূর্ববঙ্গের নীতি নির্ধারণে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন যারা সরাসরি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একটি চ্যানেলে যোগাযোগ রাখতেন। অন্য একটি আন্তঃমন্ত্রণালয় কমিটি গঠিত হয়েছিল পূর্ববঙ্গের থেকে আসা শরণার্থীদের সমস্যা বিষয়ে।

১৯৬২ সালে চীন-ভারত যুদ্ধের সময় সামরিক নেতৃত্ব বিশেষকরে তিন বাহিনীর প্রধানগণ বিদেশনীতির ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষার ভূমিকা কী হওয়া উচিত সে সম্পর্কে ক্রমাগতভাবে আসন গেড়ে বসে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ১৯৭১ সালে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অধীনে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত প্রতিরক্ষা সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য যে কমিটি ছিল তা অকেজো করে রাখেন।[১০১] অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে সেনাবাহিনীর প্রধানগণ পলিটিক্যাল এ্যাফেয়ার্স কমিটিতে তাদের প্রয়োজনীয় মতামত রাখতে পারতেন। সেনা প্রধান জেনারেল এস. এফ. এইচ. জে. (স্যাম) মানেকশ স্টাফ কমিটির প্রধানরূপে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন এবং বৈদেশিক এ্যাফেয়ার্স সেক্রেটারিয়েটের ডি. পি. ধরের সঙ্গে কখনো কখনো পলিসি প্রভাবিত করার চেষ্টা করতেন। কিন্তু সেনাপ্রধানদের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে হতো এবং তার নিকট মতামত পেশ করতে হতো। জগজীবন রাম সামরিক চ্যানেলের বিশ্বাসযোগ্যতা পুরোপুরি বিবেচনা করতেন না। গোয়েন্দা সংস্থাসমূহ বহু শাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে জয়েন্ট ইন্টেলিজেন্স কমিটি রিসার্চ এন্ড এনালাইসিচ উইং (RAW), তিন বাহিনীর গোয়েন্দা ডিরেক্টর মাধ্যমে তথ্য প্রদান করতেন, যেক্ষেত্রে উপ-প্রধান সেনাপতি প্রধান দায়িত্বে ছিলেন।

১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গের সংকট নিয়ে অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে এভাবে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক সেল ও সংস্থাগুলো কাজ করেছে। সাধারণত মন্ত্রী পরিষদে সব বিষয় আলোচিত হতো না; কেবল তাদের অবহিত ও প্রয়োজনবোধে তাদের কাছ থেকে অনুমোদন নেওয়া হতো। এমনিভাবে লোকসভার বৈদেশিক পরামর্শক কমিটিতে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে খুব বেশি আলোচনা হয়নি। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পার্লামেন্টে গুরুত্বপূর্ণ নীতি ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হতো অথবা সংসদে আলোচনা-সমালোচনার দুয়ার খোলা রাখা থাকত। লোকসভায় প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় এইসব আলোচনা তার জন্য বাধ্যবাধকতা সৃষ্টি করেনি। অন্যদিকে, প্রশাসনিক ক্ষেত্রে টি.এন.কাউল, ডি.পি.ধর, হাসকার, পি.এন.ধর এদের শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে ঘনিষ্টতা থাকায় বাংলাদেশ সংকট নিয়ে নীতি-নির্ধারণের ক্ষেত্রে তেমন বেগ পেতে হয়নি। বিদেশ মন্ত্রণালয়কে সংকটকালীন সময়ে পূর্বে যে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ সংকটে সেক্ষেত্রে গুরুত্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তেমনটি ছিল না। কিন্তু পাকিস্তানে কর্তব্যরত বাঙালি কূটনীতিবিদদের সঙ্গে যোগাযোগ, পক্ষত্যাগ, তাঁদের আশ্রয় এবং কর্মকাণ্ড পরিচালনায় বিদেশ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সরকারকে ব্যাপকভাবে সহায়তা দিয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীকে ঘিরে একটি কার্যকর গোষ্ঠী অনানুষ্ঠানিকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রাধান্য বিস্তার করে। ভারতীয় কূটনৈতিক পরিকল্পনা ও উদ্যোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই গ্রুপটি একত্রিত হয়ে কাজ করেছে এবং মৌলিক নীতিমালা নির্ধারণে তাদের মধ্যে মতপার্থক্য কম ছিল। কিন্তু বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু মতদ্বৈততা লক্ষণীয়।

এরপরে যে কথাটি বলা প্রয়োজন, রাজনৈতিক নেতৃত্ব অনেক সময় কূটনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রধানতম ব্যক্তিত্বের ভূমিকা পালন করে থাকে। ভারত বিভক্তি হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ভারতীয় বিদেশনীতি ও কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করেন। সেজন্য ১৯৪৭-১৯৬৪ সাল পর্যন্ত ভারতের কূটনীতি প্রধানত 'নেহেরু ডকট্রিন' হিসেবে পরিচয় লাভ করে।

১৯৭১ সালে কূটনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দলের নিকট থেকে পরামর্শ গ্রহণ করলেও কূটনৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল অপ্রতিরোধ্য ক্ষমতা। ভারতীয় রাজনৈতিক দলগুলো বাংলাদেশের সংকট নিয়ে সোচ্চার ছিলেন, কিন্তু সুনির্দিষ্ট নীতি বা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব সরকারের নিকট তুলে ধরতে সক্ষম হয়নি। কতিপয় কংগ্রেস সদস্য ও নেতা প্রথম দিকে পার্লামেন্টে পাকিস্তানের উপরে চাপ সৃষ্টির জন্য কঠোর মনোভাব তুলে ধরেন। কিন্তু মে মাসের শেষদিকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পরিষ্কার করে বলেন যে, বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে তার সরকার সম্পূর্ণ সজাগ এবং যথা সময়ে যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। বিরোধী দল সরকারের সমালোচনায় বারবার বলেছেন, এই মুহূর্তে মুজিবনগর সরকারের সমর্থনে সরাসরি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান করা উচিত। তারপরেও পর্যালোচনা করে দেখা যায়, বিরোধী দল যতই সমালোচনা করুক না কেন তা শেষপর্যন্ত তারা সরকারের নীতিকেই সমর্থন করেছে।[১০২]

৪. ধ্রুপদী পররাষ্ট্রনীতি ও প্রাসঙ্গিক বিবেচনা

'ঠান্ডা লড়াই'-বিভক্ত বিশ্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর শাসনামলে পরাশক্তি এবং তার বলয়ে অনেক ক্ষুদ্র ও বৃহৎ রাষ্ট্র সামরিক শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে অস্ত্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিলো। এসময় আফ্রো-এশীয় দেশের নব স্বাধীনতালব্ধ রাষ্ট্রগুলি নিরাপত্তা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার জন্য ব্যগ্র। কমিউনিস্ট চীনের অভ্যুত্থান পাশ্চাত্য রাষ্ট্রগুলিকে উদ্বিগ্ন করেছে এবং পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে বিশেষত কাশ্মীরকে কেন্দ্র করে পাশ্চাত্যের মদতে অশান্তি সৃষ্টি অব্যাহত ছিলো। এই পরিপ্রেক্ষিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নেহেরু, মিশরের নাসের ও যুগোস্লাভিয়ার মার্শাল টিটো নির্জোট নীতিতে নেতৃত্ব দানের সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। যার লক্ষ্য ছিল তৃতীয় বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো পরাশক্তির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বন্দ্বে জড়িয়ে না পড়ে। স্বতন্ত্র নীতি অনুসরণ করতে সক্ষম হবে এবং ঔপনিবেশিক শৃঙ্খল মোচনে আফ্রো-এশীয় জনগণের মুক্তি আন্দোলনের শরিক হতে পারবে।

নির্জোট আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও বর্ণ, জাতিবিদ্বেষবিরোধী। জোটনিরপেক্ষ নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই পরাশক্তির প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে দুই শিবিরে বিভক্ত বিশ্ব পরিস্থিতির ফলশ্রুতি। অতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ হতে ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য এই নীতির দিকে পথ নির্দেশ করেছিল। নেহেরু বলেছিলেন যে, "এ সম্পর্কে আমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস আছে যে ভারতে যে কেউ ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম করবে না।"

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিবৃন্দ পরস্পরের সীমানা অতিক্রম করে আক্রমণ করবে না ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে চুক্তিবদ্ধ। পারস্পরিক সাহায্য, সহাবস্থান ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করা পঞ্চশীলের অঙ্গ। ভারত সহাবস্থান নীতিতে বিশ্বাসী। ভারতের কূটনৈতিক মূলনীতির অন্যতম দিক হলো উপনিবেশ বিরোধীতা।

১৯৭১ সালে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে নেহেরু নির্দেশিত পররাষ্ট্রনীতির আলোকে পথ চলতে হয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশ-সংকট ছিল ভিন্ন প্রকৃতি। সে প্রকৃতির দৃশ্যমান দিক হলো মানবাধিকার সমস্যার ভয়ঙ্কর দিকগুলো এবং পাশাপাশি দুই পরাশক্তি প্রভাবান্বিত দেশগুলো বাংলাদেশ সংকটকে পাশ কাটিয়ে থাকার প্রবণতা এবং নিষ্ঠুর নির্লিপ্ততা। বৃহৎ রাষ্ট্রগুলি এ ধারণা পোষণ করতেন যে, বাংলাদেশ সমস্যা মূলত ভারত-পাকিস্তান সমস্যা। মুসলিম বিশ্ব মনে করেছে হিন্দু-ভারত মুসলমানদের দেশ পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলতে চায় পুরনো শত্রুতা থেকে। সেজন্য পর্যবেক্ষকমাত্রই লক্ষ্য করেন ডিসেম্বর মাসের পূর্ব পর্যন্ত জাতিসংঘে বাংলাদেশের নামটি পর্যন্ত উচ্চারিত হয়নি। কিন্তু নাম অনুল্লেখ রেখে আলোচনা হয়েছে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে। এই অবস্থায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে বিশ্ব-পরিসরে কূটনীতি কার্যকর পরিচালনা ছিল দুঃষহ ব্যাপার।

৫. আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক সমর্থন আদায়ে বিবেচ্য বিষয়

মে মাসের শেষভাগ পর্যন্ত নয়াদিল্লির কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে আওয়ামী লীগ ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে একটি সমঝোতা সৃষ্টির ক্ষেত্র নির্মাণে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যেন রাওয়ালপিন্ডির উপর চাপ সৃষ্টি করে। কিন্তু ভারত সরকারের মধ্যে একটি অসন্তুষ্টির ভাব পরিলক্ষিত এই ভাবে যে, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানের উপরে কার্যকর চাপ সৃষ্টি করে তাদের নীতি পরিবর্তন করতে পারছে না। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় তখন পর্যন্ত বলে আসছিল যে, বাংলাদেশে ২৫শে মার্চ যে ক্রাকডাউন হয়েছে তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ভারতের প্রাথমিক কূটনৈতিক টার্গেটের ক্ষেত্র হয়ে দাড়ায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্র। যে ক্ষেত্রে *নিউইয়র্ক টাইমস* ২১শে জুন সংখ্যায় প্রকাশিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, এপ্রিল মাসে পাকিস্তানে সামরিক সহায়তা বন্ধ করা হয়েছে, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা অব্যাহত রয়েছে। ভারতের সামনে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিকাও পরিষ্কার ছিল না বরং বিষয়টিকে তারা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছে এবং ইউরোপিয়ান দেশগুলো ও জোটনিরপেক্ষ শক্তিসমূহ কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি।

নয়াদিল্লির দৃষ্টিকোণ থেকে এই অবস্থা দৃষ্টে তাদের নীতি ও বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে পরিবর্তন জরুরি হয়ে পড়ে, যেক্ষেত্রে শরণার্থীদের বিপুল সংখ্যা ভারতে ঢুকে পড়ছিল। নয়াদিল্লি এই সময় বাংলাদেশ প্রতিরোধ শক্তির প্রতি তাদের সমর্থন বিস্তৃত করে এবং সরাসরি ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের সম্ভবনা সামনে চলে আসে। এই সময় ভারত সরকার প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি পাকিস্তান সরকারের নীতি সম্পর্কে পরিষ্কার বিবৃতি প্রকাশিত করে। ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম এক বিবৃতিতে বলেন, 'আমাদের উপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।' বিদেশমন্ত্রি সরদার শরণ সিং ২৪শে জুন কংগ্রেস পার্লামেন্টের পার্টির সভায় বলেন, যদি কোনো রাজনৈতিক সমঝোতা আওয়ামী লীগের নিকট গ্রহণযোগ্য না হয় তাহলে ভারত নিজেই ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হবে। এই বিবৃতিগুলোর পাশাপাশি ভারতীয় সেনাবাহিনী এমনকি গোলান্দাজ বাহিনীও সীমান্তের দিকে এগিয়ে যায় এবং মুক্তিবাহিনীর অপারেশনে সাহায্য করে।[১০৩]

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ব পাকিস্তান সম্পর্কে যে উপদেষ্টাগোষ্ঠী ইন্দিরা গান্ধীর চারপাশে ছিল তারা কতিপয় নীতি এবং কাঠামোর বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ করেন। প্রথমত, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো বাঙালি হিন্দুসহ সকল শরণার্থীদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন যেক্ষেত্রে কোনো শান্তিপূর্ণ সমাধান নেই; দ্বিতীয়ত, মধ্যপন্থি আওয়ামী লীগ নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর যেটা হতে পারে শিথিল কনফেডারেশন অথবা নতুন রাষ্ট্র সৃষ্টি, যদি সেক্ষেত্রে শরণার্থীরা ফিরে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করে; এবং তৃতীয়ত, প্রাথমিকভাবে অপ্রত্যক্ষভাবে মুক্তিবাহিনীর প্রতি সমর্থন জোরদার করা, যদি তা ফলপ্রসূ না হয় যথা সময়ে ভারতীয় সৈন্য সরাসরি হস্তক্ষেপ। এই গোষ্ঠীর গুরুত্বপূর্ণ চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ছিল ব্যাপকভাবে পাকিস্তানের গৃহযুদ্ধের বিষয়টি আন্তর্জাতিক অঙ্গনে তুলে ধরা এবং ভারতের লক্ষ্য সম্পর্কে সমর্থন আদায় করা। এই বিষয়ে তারা নানা ধরনের বিকল্প পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন।

আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতার অংশ ছিল পাকিস্তান যেন অর্থনৈতিক এবং সামরিক ক্ষেত্রে সাহায্য না পায়। ১৭ই মে ইউনেস্কোতে এভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে শান্তিপূর্ণ সমাধান, মানবাধিকার পুনরুদ্ধার এবং পূর্ব বাংলার শরণার্থী এবং তাদের পুনর্বাসনের জন্য উদ্যোগ গ্রহণ জরুরি যতদিন পর্যন্ত এইসব শরণার্থী ভারতে অবস্থান করবে। একইসাথে ২৪শে মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেন, "If the world does not take heed, we shall be constrained to take all measures as may be necessary to ensure our own security and the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

preservation and devlopments of the structure of our social and economic life"- the first discreet official threat to use force if the 'Great Powers, [who had] a speacial responsibility' to act on this issue failed to do so."[১০৪]

ক. বিদেশ তৎপরতা: শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভাকে জানান যে, ভারত পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতায় উৎসাহী নয়। বাংলাদেশে যে অশান্তি, তা পাকিস্তানের নিজেদেরই সৃষ্ট। কিন্তু "ঐসব ঘটনা সম্পর্কে আমরা উদাসীন থাকতে পারি না। কারণ আমরা ভারতের শান্তি ও স্থিতিশীলতায় আগ্রহী। ভারতের শান্তি ও স্থিতি বিঘ্নিত করে এমন যে কোনোও ঘটনাই আমাদের স্বার্থের সঙ্গে জড়িত। বস্তুত আমরা মনে করি, ভারতে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পাকিস্তানের উপরেও একটা নিয়ামক প্রভাব বিস্তার করবে।"[১০৫]

৫ই জুন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কলকাতায় বলেন, পূর্ব বাংলা থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থীর আগমনের ফলে অতি গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে এবং এর পরিণতি দেশের পক্ষে গুরুতর হতে পারে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ঠেলে দিয়ে পাকিস্তান সরকার ভারতের উপর 'অপ্রত্যক্ষ যুদ্ধ' চাপিয়ে দিয়েছে। 'কিন্তু আমরা যেন তাতে শঙ্কিত না হই। আমাদের সুস্থিরভাবে এই পরিস্থিতির মোকাবেলা করতে হবে যাতে ঠিক সময়ে ঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারি।' শ্রীমতী গান্ধী মন্ত্রীসভাকে জানান যে, ভারত পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা উৎসাহী নয়। বাংলাদেশে যে অশান্তি, তা পাকিস্তানের নিজেদেরই সৃষ্ট।

আন্তর্জাতিক জনমতকে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে আনার ক্ষেত্রে ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। যুক্তরাষ্ট্র, চীন ও মুসলিম বিশ্বের জোরালো সমর্থন ছিল পাকিস্তানের পক্ষে, এমনকি অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নও জুন-জুলাই মাস পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে স্পষ্ট অবস্থান নেয়নি। এমনি পরিপ্রেক্ষিতে ভারত বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে সরকারি, বেসরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে। মুজিবনগর সরকারকেও সহায়তা দেয় বিভিন্ন দেশে তাঁদের প্রতিনিধি পাঠানোর জন্য। বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রীবর্গ এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্রসমূহ সফর করেন। উপরন্তু, নয়াদিল্লিতে বাংলাদেশ বিষয়ে আন্তর্জাতিক সেমিনার আয়োজন করে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী, মানবাধিকার কর্মীদের আমন্ত্রণ জানায়, বিদেশি প্রতিনিধিদলের শরণার্থী শিবির পরিদর্শন ও বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে বৈঠকের ব্যবস্থা করে। একাত্তর সালব্যাপী ভারতের কূটনৈতিক প্রচেষ্টার লক্ষ্য ছিল ভারতের গৃহীত পদক্ষেপের যৌক্তিকতা তুলে ধরা। অন্যদিকে, পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতনের বিবরণ প্রকাশ করে বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল জনমত গড়ে তোলা। ইন্দিরা গান্ধী অভ্যন্তরীণ রাজনীতির ক্ষেত্রে নিরাপদ হলেও পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনকারী যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা শক্তিসমূহের চাপ তার জন্য ক্রমশ অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমা শক্তিবর্গকে পাকিস্তানের পর্যায়ক্রমিক অপপ্রচারের বিরুদ্ধাচরণ করা এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা অনন্যসাধারণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। এক্ষেত্রে ভারতীয় কৌশল সম্পর্কে ইতিহাসবিদ সৈয়দ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনোয়ার হোসেনের মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "প্রথম থেকেই ভারত তার প্রচার মাধ্যমগুলোর সাহায্যে যে বক্তব্য তুলে ধরার চেষ্টা করে তা ছিল যে, অভ্যন্তরীণ সমস্যা সমাধানের অজুহাতে বাংলাদেশে যে গণহত্যা শুরু হয়েছিল তা প্রতিহত করা বাইরের পৃথিবীর নৈতিক দায়িত্ব।"[১০৬] ভারত বারবার এই নৈতিক দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো মূল সমস্যাকে পাশ কাটানোর বিষয়টি তুলে ধরে। মূল সমস্যা হলো বাংলাদেশের সংকট মোচনে রাজনৈতিক সমঝোতা, যা বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিকট গ্রহণযোগ্য হতে হবে।

মিশর: পাকিস্তানের ওপর প্রভাব খাটানোর আহ্বান জানিয়ে মিসরের প্রেসিডেন্ট সাদাতের প্রতি প্রধানমন্ত্রী এক পত্র লেখেন। তিনি পূর্ববঙ্গের ঘটনাবলি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গে যেভাবে গণহত্যা, ধর্ষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন চালিয়ে যাচ্ছে তা উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী এগুলো বন্ধ করার জন্য মিসরের প্রেসিডেন্টকে ওয়াকিবহাল করেন। তিনি পূর্ববঙ্গে পাকিস্তান সামরিক জান্তা যেভাবে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে যার ফলে অগণিত মানুষ ভারতে শরণার্থী হয়ে আশ্রয় নিচ্ছে তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে প্রেসিডেন্ট সাদাতকে পাকিস্তানের সরকারের উপর প্রভাব বিস্তারের আহ্বান জানান।[১০৭]

মস্কো: মস্কো সফরের সময় প্রধানমন্ত্রী গান্ধী পরিষ্কার ভাষায় দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, বর্ষা শেষে তিনি বাংলাদেশ সংকটের সমাধান চান। কিন্তু সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন সামরিক সমাধানের পরিবর্তে রাজনৈতিক সমঝোতার উপর জোর দেন। কিন্তু শ্রীমতী গান্ধী এ সফরে হার্ডলাইন গ্রহণ করলে মস্কো উপলব্ধি করে যে অন্য কোনোভাবে ইন্দিরা গান্ধীকে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে না।

২৯শে সেপ্টেম্বর মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক অভিভাষণে বলেন, যখন লক্ষ লক্ষ লোককে ভিন্ন দেশে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে, স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হচ্ছে, নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন তখন শান্তি বিঘ্নিত হতে পারত। সংশ্লিষ্ট জনগণ কর্তৃক রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণ করার মাধ্যমে বর্তমান সংকটের মূল কারণ দূর করা সম্ভব। বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব রয়েছে অবিলম্বে এমন একটি পরিবেশ তৈরি করা যেখানে নিরাপত্তা ও সম্মানের সঙ্গে শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরতে পারে।[১০৮] এখানে উল্লেখ্য যে, ১লা অক্টোবর আকস্মিকভাবে প্রেসিডেন্ট পদগনি হ্যানয় যাওয়ার পথে নয়াদিল্লিতে যাত্রাবিরতি করেন এবং কোসিগিনের মতামত পুনর্ব্যক্ত করেন। ৯ই অক্টোবর সোভিয়েত-আলজেরিয়া যৌথ বিবৃতিতে তাসখন্ডের স্পিরিটে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যার সমাধানের উপর গুরুত্ব দেন। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মস্কোর সঙ্গে 'ঠান্ডা' প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। এ অবস্থায় মস্কো উপলব্ধি করে যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক অভিযানে অগ্রসর হবে। বিষয়টি নিয়ে দুই সপ্তাহ চিন্তাভাবনার পর মধ্য অক্টোবরে সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিকোলাই মোরুবিন চুক্তির নবম ধাপ সম্পর্কে 'আলোচনা'র জন্য নয়াদিল্লি আসেন। পশ্চিম ইউরোপ এবং যুক্তরাষ্ট্র সাক্ষাতের জন্য ২২শে অক্টোবর দিল্লিতে আসে। সেপ্টেম্বর মাসে ইন্দিরা গান্ধী সোভিয়েত ইউনিয়নের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিকট যুদ্ধাস্ত্রের অনুরোধ করেন। সে সময় এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহের কথা বলা হলে তা নির্দিষ্ট ছিল না। কিন্তু এ সময় সোভিয়েত প্রতিনিধি সুনির্দিষ্টভাবে ভারতকে অস্ত্র সরবরাহে সম্মত হয়। ৩০শে অক্টোবর সোভিয়েত ইয়ার মার্শাল পি.এস.কৌটাভ্ নয়াদিল্লি আসেন এবং ভারতকে জরুরিভাবে অস্ত্র সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। তিন জাহাজ বোঝাই অস্ত্র ও বিমানের মাধ্যমে অস্ত্র সরবরাহের মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিকভাবে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানে স্থির সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।[১০৯]

যুক্তরাজ্যঃ মার্চ মাস থেকে শুরু করে ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে যুক্তরাজ্য প্রকাশ্যে সমর্থন না দিলেও বিভিন্ন গোপন দলিলপত্রে এ কথা প্রমাণ হয় যে, প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ, পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেক ডগলাস-হিউম, বিরোধী দলের এম.পি এমনকি সরকারি দলের প্রতিনিধিরাও বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে সক্রিয় ছিলেন। সেদিক থেকে প্রধানমন্ত্রী হীথ বাংলাদেশের পক্ষে অবস্থান গ্রহণের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন। যদিও ব্রিটেন এবং পাকিস্তানের মধ্যে অস্ত্র বিক্রির চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল এবং ১৯৭১ সালে সামরিক অস্ত্র সরবরাহের কথা থাকলেও তা থেকে ব্রিটেন বিরত থেকেছে, কালক্ষেপণ করেছে এবং বাংলাদেশ স্বাধীন না হওয়া পর্যন্ত অস্ত্র বিক্রির অর্ডার বাস্তবায়িত করেনি।[১১০] পূর্ব পাকিস্তানে মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিষয়ে ব্রিটেন প্রকাশ্যে সমর্থন দিয়েছে যার পিছনে ব্রিটিশ জনগণের অখণ্ড সমর্থন ছিল। ব্রিটিশ সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনবলিকে যদিও সবসময় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীন ব্যাপার বলে অবহিত করেছে কিন্তু বিভিন্ন বক্তৃতা-বিবৃতি এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একথাও বলেছে যে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পূর্ব পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা করাই হবে বর্তমান সমস্যা সমাধানের উৎকৃষ্ট উপায়। গবেষকমাত্রই পর্যবেক্ষণ করবেন যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হত্যার বিচার বন্ধ, তার প্রাণ রক্ষা এবং মৃত্যুদণ্ড না দেয়ার জন্য ব্রিটিশ সরকার যে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন তা প্রণিধানযোগ্য। এক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে লেখা পত্র, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর পত্রের উত্তরে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের বিচলিত মনোভাব এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টকে লেখা পত্রগুলো বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। মুক্তিযুদ্ধের সময়কালীন ভারত ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে আদান-প্রদানকৃত পত্র পর্যালোচনা করলে আরো একটি কথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীকে এই ধারণা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, পাকিস্তান ভেঙে দুই টুকরো করা ভারতের উদ্দেশ্য নয়। ভারতের মূল উদ্দেশ্য হলো, অধিকার, বঞ্চিত জনগণের পাশে দাঁড়ানো, পূর্ববঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর এবং সে লক্ষ্যে রাজনৈতিক সমঝোতা জরুরি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১৩ই মে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বরাবর যে পত্র লেখেন সেখানে বলা হয়েছে, "যুক্তরাজ্য তার ক্ষমতা ও সম্মানকে ব্যবহার করে পাকিস্তানের সামরিক শাসককে এও বোঝাতে সমর্থ হবে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা নিরসনে পাকিস্তান যে পথ অবলম্বন করেছে তা অবাস্তব ও অজ্ঞানতাপ্রসূত।" ৭ই জুন ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রীকে লেখা এক পত্রে এডওয়ার্ড হীথ বলেন, "নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা তুলে দিয়ে সমস্যার সমাধান আশু প্রয়োজন, না হলে তা উগ্রপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।" ৩১শে অক্টোবর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে চেকার্সে (ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অবকাশ-নিকেতন) বৈঠক করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আলোচনার এক পর্যায়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, তার আশঙ্কা হচ্ছে শেষ পর্যন্ত পাকিস্তান একটি যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে এবং তা হবে দীর্ঘস্থায়ী। তাই যদি হয় তাহলে তার দখল চলে যাবে বামপন্থিদের হাতে। ইন্দিরা গান্ধী একথা বলেন যে, ভারতের উগ্রপন্থিরা মনে করে যে, প্রথমেই ভারতের যুদ্ধ শুরু করা উচিত ছিল। তাতে জনগণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সকলকে বিষয়টি বোঝানো সহজ হত। এখন পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে গেছে। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক জনমত গঠনে ভারতের সমস্যা ও সমাধানের বিষয়টি তুলে ধরার বিষয়ে মতামত প্রকাশ করলে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে একমত হন। ১৬ই নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বরাবর এক পত্রে যুক্তরাজ্যের বিশাল অভিজ্ঞতা, প্রজ্ঞা ও সম্মানকে ব্যবহার করে পূর্ববাংলার জনগণ ও তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি সমাধান খুঁজে বের করা সম্ভব হবে। ২৫শে নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বরাবর লেখা এক পত্রে ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ লেখেন, "পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছার প্রকাশ ঘটিয়ে একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আমার আবেদন ব্যক্ত করে আমি ইয়াহিয়া খানকে পুনরায় চিঠি দিয়েছি। আমি তাঁকে বলেছি বাংলাদেশ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসা পাকিস্তান সরকারের জন্য অত্যন্ত জরুরি।"

সূত্রে প্রকাশিত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী আলোচনায় দু'টি শর্ত দৃঢ়তার সঙ্গে উত্থাপন করেন। প্রথমটি হলো ভারতে যে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী এসেছে তাঁদের স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের জন্য প্রয়োজন নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা। এই সমঝোতায় উপনীত হতে হলে অপরিহার্য শেখ মুজিবের মুক্তি। দ্বিতীয় শর্তে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যা বলেছেন তার অর্থ হলো বাংলাদেশের স্বাধীনতা এবং এক্ষেত্রে তার অনমনীয় দৃঢ়তা প্রকাশ পেয়েছে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ও শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী একমত হয়েছেন যে, বাংলাদেশ সংকট সমাধানে পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনা করতে হবে, ভারতের সঙ্গে নয়। প্রধানমন্ত্রী ব্রিটেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী স্যার অ্যালেকের ডগলাস হিউম-এর সঙ্গে ঘন্টাধিক আলোচনা করেন।[১১১]

যুক্তরাষ্ট্র: ১৭ই জুন ওয়াশিংটনে ন্যাশনাল প্রেসক্লাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বর্তমান সমস্যার সমাধানে মৌলিক দু'টি পূর্ব শর্তের উল্লেখ করেন। প্রথমত, অতিদ্রুত রাজনৈতিক সমাধান, যার মাধ্যমে শরণার্থীরা নিরাপত্তা ও আশ্বস্ত হয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পারেন। দ্বিতীয়ত, পূর্ববঙ্গে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের ইচ্ছানুযায়ী কার্যকর ও স্থায়ী রাজনৈতিক সমাধান পাওয়া যেতে পারে। তিনি একইসাথে মনে করেন, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রয়োজন শেখ মুজিবের মুক্তি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই সাংবাদিক সম্মেলনে পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করা হয়, পূর্ব পাকিস্তানকে তিনি পূর্ববঙ্গ বলছেন কেন? এতে ভবিষ্যতে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ এক হয়ে যাবে কিনা? বিদেশমন্ত্রী শ্রী শরণ সিং বলেন, পূর্ববঙ্গ বলছি এই কারণে যে, প্রথম থেকেই এটা ছিল পূর্ববঙ্গ। বৃহত্তর বঙ্গকে ভেঙ্গে পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গ করা হয়েছে। আমরা পূর্ববঙ্গ বলছি এই কারণে সাড়ে সাত কোটি মানুষ যারা পাকিস্তানের সামরিক নির্যাতন ও নির্মম আধিপত্য থেকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে নিজেদের পৃথক হওয়ার যে ধারণা লালন করছেন ও সংগ্রাম করেছে সে সম্পর্কে তাঁদের মনে আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা যায়। পূর্ববঙ্গ বলার মাধ্যমে আমরা এই ধারণা মনে করি না যে, পূর্ববঙ্গ স্বাধীন হয়ে গেলেও পশ্চিমবঙ্গ যা ভারত ইউনিয়নের একটি রাজ্য তা পূর্ববঙ্গের সঙ্গে চলে যাবে। পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসিরা ভারতে রাজনৈতিকভাবে অর্থনৈতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সেজন্য পশ্চিমবঙ্গ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে মিশে যাবে এমনটি ভাবার কারণ নেই। পশ্চিমবঙ্গ ভারতের একটি রাজ্য, ভারতের সঙ্গে থাকার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন এবং তারা কোনোদিনও পাকিস্তান সরকারের মতো নির্যাতনের সম্মুখীন হয়নি।[১১২]

২৬শে জুন ভারতের বিদেশমন্ত্রী একটি বিবৃতিতে পূর্বে উল্লেখিত ধারণা ও শর্তাদি পুনরুল্লেখ করে এবং বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ও রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে কেবল সে দেশের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সম্মতির মাধ্যমে। তিনি ৬ই জুন থেকে ২২শে জুন মস্কো, বন, প্যারিস, অটোয়া, নিউইয়র্ক, ওয়াশিংটন ও লন্ডন সফর করেন। তাঁর এই ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতায় তিনি 'সমঝোতা সীমানা' নির্ধারণে তিনটি শর্ত তুলে ধরেন। বিশ্বব্যাপী তাঁর সফরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল: এক, বাংলাদেশে অবিলম্বে সামরিক কার্যক্রম বন্ধ এবং সামরিক সমাধানের কার্যক্রম বন্ধ করা এবং রাজনৈতিক সমাধানের মাধ্যমে সংকট নিরসন; দুই, বাংলাদেশ থেকে যে অগণিত শরণার্থী আসছে অবিলম্বে তা রোধ করা। তার জন্য বাংলাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ এমনভাবে সৃষ্টি করা যাতে শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে যেতে আশ্বস্ত হয়; এবং তিন, অবনতিশীল পরিস্থিতি রোধ এবং এই উপমহাদেশে শান্তি ও নিরাপত্তা মারাত্মকভাবে ঝুঁকির সম্মুখীন এড়াতে জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে সমস্যার মীমাংসা করা।[১১৩]

৬. যুক্তরাষ্ট্রে ইন্দিরা গান্ধীর কূটনৈতিক তৎপরতা

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলোচনা ব্যর্থ হয়। ওয়াশিংটন থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বলেন, যখন একটি জনগোষ্ঠী ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে সেখানে কি শান্তি থাকে? জনগণের বিরুদ্ধে সামরিক জান্তা যেখানে যুদ্ধ শুরু করে হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করছে ও বসতবাড়ি থেকে উচ্ছেদ করছে সেখানে জনগণের বিরুদ্ধে একটি যুদ্ধ চলছে বিশ্ব সেখানে উদ্বিগ্ন নয়।[১১৪]

ওয়াশিংটনে প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রদত্ত ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে বলেন, ভারত একটি অনিশ্চিত অর্থনীতি ও নিরাপত্তা সম্পর্কে গুরুতর হুমকির সম্মুখীন। ভৌগোলিক কারণেই লক্ষ লক্ষ অসহায় মানুষ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যযুগের বর্বরতার শিকার হয়ে ভারতে চলে আসছে এবং ভারত গণতান্ত্রিক নিয়মরীতি মেনে চলছে।[১১৫] তবে অপর পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মৈত্রী চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে ভারত বৈশ্বিক রাজনীতিতে এক ধরনের ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয়। তথাপি আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "The International response has fallen short of the scale which a grim tragedy of this magnitude demands."[১১৬]

ভারতরে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী কয়েকটি পাশ্চাত্য দেশ সফর করেন এবং ১৯৭১ সালের নভেম্বরের ৪ ও ৫ তারিখে ওয়াশিংটনে গমন করেন। নিক্সন সংঘর্ষ এড়ানোর শেষ চেষ্টা হিসেবে ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে সম্মত হন। ৪ এবং ৫ই নভেম্বর ইন্দিরা গান্ধী ও নিক্সনের সঙ্গে দু'দফা বৈঠক হয়। ৪ঠা নভেম্বর সকালে ওভাল অফিসে বৈঠক বসে। তারা দক্ষিণ এশিয়ার উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করতে সম্মত হন এবং দ্বিতীয় দিনে চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। সকালের বৈঠকে উত্তেজনা পরিহারের কোনো সহজ উপায় বের করা সম্ভব হয়নি। নিক্সন জোর দিয়ে বলেন, ভারত-পাকিস্তানের ভেতরে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য শরণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত সহযোগিতা দিয়েছেন যারা উভয় দেশের সীমান্তে সমবেত হয়েছে। নিক্সন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, স্বল্প মেয়াদী ভাবে সামরিক ব্যবস্থা ভারতকে লাভবান করতে পারে, কিন্তু কালিক পরিক্রমায় রাজনৈতিক স্বার্থে তা ভারতের বিরুদ্ধে যাবে। শুধু তাই নয় যুদ্ধ বিশ্বশান্তি ব্যবস্থায় ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনবে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী এই যুক্তিকে উপেক্ষা করে বলেন, পাকিস্তানের বিদ্বেষের ফলে ১৯৪৭ ও ১৯৬৫ সালে যুদ্ধ হয়েছে। তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন, পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র প্রেরণ ভারতের জনগণকে ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। পাকিস্তান নিজেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে যা এই অঞ্চলকে অস্থিতিশীল করে তুলেছে। প্রধানমন্ত্রী আরো মন্তব্য করেন, পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তান একত্রে থাকার এখন আর কোনো আশা নাই।[১১৭] নিক্সন প্রধানমন্ত্রীর নিকট জানতে চান, কীভাবে সমঝোতা অর্জন করা যায়। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারতের মুখ্য উদ্বিগ্নতা হলো ভারতীয় অবস্থা সম্পর্কিত। দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধ বিশ্ব শান্তিকে বিপন্ন করবে এ সম্পর্কে নিক্সনের উক্তিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পাস কাটিয়ে যান এবং বলেন, তিনি শুধু ভারতের সমস্যা দেখছেন এবং দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধ সম্ভবত ঠান্ডা যুদ্ধের বিপদে রূপান্তরিত হবে না। নিক্সনের কথায় গুরুত্ব না দেওয়া এবং আন্তর্জাতিক হুমকির বিষয়ে উদাসীন থাকায় নিক্সন ক্ষুব্ধ হন। তার প্রকাশ ঘটে ৫ই নভেম্বর বৈঠকে। ৫ই নভেম্বরের বৈঠকে কোনো কারণ ছাড়াই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ৪৫ মিনিট নিজেকে অদৃশ্য করে রাখেন এবং ইন্দিরা গান্ধীকে 'কুক্কুরী' বলে গালাগাল করতে থাকেন। ঐদিন সকালে কিসিঞ্জার বলেন, ভারতের লক্ষ্য পাকিস্তানকে ধ্বংস করা। তাদের কাছে পূর্ব পাকিস্তান এখন কোনো ইস্যু নয়। নিক্সন আরো বলেছেন, 'বুড়ি ডাইনি'কে অযথাই মাত্রাতিরিক্ত প্রশ্রয় দিয়েছি।[১১৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'দিনের আলোচনা শেষে ইন্দিরা গান্ধী সাংবাদিকের নিকট বলেন, "তিন/চার হাজার মাইল দূর থেকে শুধুমাত্র বর্ণগৌরবে কোনো দেশ ভারতকে তাদের ইচ্ছে মতো আদেশ দেয়ার ক্ষমতার দিন শেষ হয়ে গেছে।"[১১৯] এরপর থেকে নিক্সন প্রশাসন পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি অবস্থান নেয়। যদিও সে সময় কংগ্রেস, গণমাধ্যম, সিভিলসমাজ প্রায় সকলেই ভারতের পক্ষে সোচ্চার ছিল। বাংলাদেশ-সংকটে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকাকে সমর্থন করে যাচ্ছিলো।

৫ই ডিসেম্বর নিক্সনের অনুমোদন নিয়ে কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ইউলি ভোরোন্টসোভকে বলেন, মস্কো যদি অন্যদেশকে নিরস্ত্র করতে চায় তাহলে মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক বিপন্ন হবে। তিনি বলেন, ভারতীয় সামরিক আক্রমণকে সোভিয়েত সাহায্য করবে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও সুসম্পর্ক রাখবে; প্রেসিডেন্ট নিক্সন এর কারণ খুঁজে পাচ্ছেন না। সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত আশা করেন আসন্ন সোভিয়েত-মার্কিন সামিট স্থগিত হবে না। পরদিন নিক্সন প্রশাসন পর্যবেক্ষণ করে সোভিয়েতের সাহায্যে ভারতের যে বিজয় অর্জিত হতে চলেছে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য পরাজয়। যদিও রাশিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ পূর্বেই করা হয়েছিল।

বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে ভারতের নিকট আন্তর্জাতিক জনমত গঠন, জাতিসংঘের সমর্থন আদায় এবং বিপুল শরণার্থীদের মানবিক ট্রাজেডির বিষয়টি বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরা ভারতীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলে নীতি নির্ধারকদের সক্রিয়ভাবে বিবেচনা করেছেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বক্তব্য, লোকসভার কার্যবিধি এবং ভারতীয় জনমত ও দলগুলোর ক্রমবর্ধমান সমর্থন বাংলাদেশের অনুকূলে ঝুঁকে থাকায় ভারত সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সম্মিলিত কূটনৈতিক তৎপরতার নতুন ভিত্তি নির্ধারণ করতে খুব বেশি একটা বেগ পেতে হয়নি। নীতি নির্ধারনের ক্ষেত্রে কয়েকটি মৌলিক বিষয় নিয়ে ভারত সরকার আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়: এক, বিগত নির্বাচনের মাধ্যমে পূর্ববঙ্গের জনগণের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক যে ন্যায্য আকাঙ্ক্ষা প্রতিফলিত হয়েছে, সেই গণরায়ের প্রতি যদি পাকিস্তান সরকার সম্মান প্রদর্শন করে তাহলে পূর্ববঙ্গের সংকট সমাধান সম্ভব হতে পারে। দুই. এই লক্ষ্য পূরণের জন্য পাকিস্তান সামরিক জান্তা অবিলম্বে শেখ মুজিবুর রহমানকে পাকিস্তান কারাগার থেকে মুক্ত করে ঢাকায় রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হতে পারে; তিন, সম্মান, নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদানপূর্বক শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নেওয়ার নিরাপদ নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করতে হবে; চার, পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে অবিলম্বে জনগণের উপর আক্রমণ বন্ধ করতে হবে এবং সেনাবাহিনীকে ব্যারাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে; পাঁচ, শান্তি পূর্ণভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধানের লক্ষ্যে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে হবে, সেটা হতে পারে দ্বিপাক্ষিক অথবা জাতিসংঘের মাধ্যমে; এবং ছয়, লক্ষ লক্ষ শরণার্থী যারা ক্ষুধার্ত ও আশ্রয়হীন যাঁদের পাকিস্তান সেনাবাহিনী ভারতে ঠেলে দিয়েছে সেই সব শরণার্থীদের আর্থিক ও সাহায্যের মাধ্যমে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ণভাবে পুর্নবাসন করতে হবে এবং পূর্ববঙ্গে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই সবগুলোই করতে হবে জাতিসংঘ ও তার বিশেষায়িত সংস্থাগুলোর মাধ্যমে।[১২০]

এই নীতিমালার আলোকে ২রা এপ্রিল জাতিসংঘে নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন জাতিসংঘের সেক্রেটারি জেনারেল উ থান্টের নিকট প্রেরিত এক পত্রে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতার সমালোচনা করে বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বাংলাদেশের মানুষের ওপর যে হারে নির্যাতন শুরু করেছে, তা বর্তমানে এমন এক স্তরে এসে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিশ্চেষ্ট থাকার আর সময় নেই। আন্তর্জাতিক মানবগোষ্ঠী কর্তৃক একটি উপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা অত্যাবশক হয়ে উঠেছে।"[১২১] পত্রে আরো উল্লেখ করা হয়, মানব দুর্গতি এই মুহূর্তে নিষ্ক্রিয়তা ও নীরবতাকে দুর্গত জনসাধারণ বহির্বিশ্বের উদাসীনতা বলে ভাববে। পত্রটি জাতিসংঘের ইস্তেহার আকারে প্রকাশ করা হয়।[১২২]

এসময় নানা ধরনের বিবৃতি ও প্রচার-প্রচারণার মাধ্যমে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক লড়াই চলতে থাকে। ১৬ই এপ্রিল ভারতের পররাষ্ট্রদপ্তর কর্তৃক পাকিস্তানের অপপ্রচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদলিপিতে বলা হয়, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামে ভারত কোনো না কোনোভাবে জড়িত আছে বলে পাকিস্তান যে মিথ্যাপ্রচার চালিয়ে যাচ্ছে ভারত তার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আরো বলা হয়, ভারতের বিরুদ্ধে মিথ্যা অভিযোগ ও প্রচার চালিয়ে পাকিস্তান জঙ্গিশাহী বাংলাদেশে যে বর্বর ও অমানুষিক গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে তা কিছুতেই ঢাকতে পারবে না। কেউ কেউ এই প্রতিবাদকে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্ব-সূচনা বলে মনে করেছেন। একজন বিদেশি সাংবাদিক এ-সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে সরকারি মুখপাত্র এর সরাসরি উত্তর না দিয়ে বলেন, যখন যে-অবস্থা দেখা দেবে তখন তা সেভাবে মোকাবেলা করা হবে, এই হলো ভারত সরকারের নীতি।[১২৩]

জাতিসংঘের 'সোস্যাল কমিটি অব দি ইকোনোমিক এন্ড সোস্যাল কাউন্সিল'-এ ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন ১২ই মে প্রদত্ত ভাষণে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদসহ এ-সংক্রান্ত অন্যান্য আন্তর্জাতিক ঘোষণা ও সনদের ধারা উল্লেখ করে বলেন, পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের ওপর হামলা চালিয়ে এসব ধারার সুস্পষ্ট লঙ্ঘন করেছে; যদিও পাকিস্তান মানবাধিকার-সংক্রান্ত এসব ঘোষণা ও চার্টারে স্বাক্ষরদানকারী দেশ। সমর সেন তার ভাষণে শরণার্থীদের সংখ্যা ও তাঁদের দুর্গতির চিত্র তুলে ধরে সুপরিকল্পিত ও সমন্বিত আন্তর্জাতিক ত্রাণ কার্যক্রম গ্রহণের জন্যে জাতিসংঘের প্রতি আহ্বান জানান। সেই সাথে পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্যে জোরালো দাবি জানানো হয়।[১২৪]

সপ্তম অধ্যায়ে জাতিসংঘে কূটনৈতিক তৎপরতার ব্যাপকতা নানা দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করা হয়েছে।

৭. বহির্বিশ্বে ভারতে কূটনৈতিক প্রতিনিধি প্রেরণ

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সঙ্গে আন্তর্জাতিক রাজনীতির সংশ্লিষ্টতা ও ভারতীয় ভূমিকার যথার্থতা ব্যাখ্যা করার জন্য ৬৭টি রাষ্ট্রে ১৮টি সরকারি প্রতিনিধি দল প্রেরণ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত সরকার। এর মধ্যে চারটি প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী সরদার শরণ সিং। এই বিদেশ ভ্রমণে ভারত সরকারকে বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হয়।[১২৫] ওয়াশিংটনের ন্যাশনাল প্রেস ক্লাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং বিশ্ব সম্প্রদায়ের নিকট জোর দাবি জানান। বিশেষকরে যারা পাকিস্তানের উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারে এমন রাষ্ট্রেগুলোর প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন, পাকিস্তান সরকার যেন রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়।[১২৬] মুক্তিযুদ্ধকালে মুসলিম উম্মাহ্‌র নামে পাকিস্তানের পক্ষে শক্ত অবস্থান নেয় মুসলিম দেশগুলো। মুসলিম বিশ্বের জনমতকে কিছুটা নমনীয় করবার উদ্যোগের অংশ হিসেবে ভারতের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রী ইন্দোনেশিয়া সফর করেন। সফর শেষে প্রকাশিত যৌথ বিবৃতিতে বিপুল সংখ্যক শরণার্থীর কারণে সৃষ্ট সংকটে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলা হয় জরুরি ভিত্তিতে অনুকূলে পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে যাতে শরণার্থীরা তাদের দেশে ফিরে যেতে পারে।[১২৭] ধারণা দেওয়া হয়েছিল, "ইসলামি রাষ্ট্রগুলোর দৃষ্টিতে এ-মুক্তিযুদ্ধ ইসলামবিরোধী অপপ্রয়াস এবং ইসলামি সংহতির প্রতি হুমকি হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছিল। ১৯৭১-এ ২২ সদস্যবিশিষ্ট ইসলামি সম্মেলন সংস্থার (OIC) জেদ্দা অধিবেশন 'জাতীয় সংহতি ও আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষায়' পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান।"[১২৮]

মুসলিম বিশ্বে কূটনৈতিক তৎপরতা সম্পর্কে ষষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

ভারতীয় কূটনৈতিক তৎপরতা ব্যাপকভাবে বিশ্বপরিসরে বৃদ্ধি পায়। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন রাষ্ট্রে বাংলাদেশের পরিস্থিতি, সংকট, কার্যকরণ এবং সম্ভাব্য সমাধান সম্পর্কে অবগত করানোর জন্য বিশেষ দূত প্রেরণ করে। শিক্ষামন্ত্রী সিদ্ধার্থ শংকর রায় বাংলাদেশ সম্পর্কিত বিষয়ে বিশেষভাবে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি থাইল্যান্ড, সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া, হংকং, জাপান এবং অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে সফর করে। তিনি সর্বত্র আন্তরিক সমবেদনা ও পর্যবেক্ষণ করেন সমর্থন এবং বাংলাদেশ সম্পর্কে জনমত গঠনে ব্যাপক সাড়া পান।

প্রতিনিধিদল নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিত্বশীল দল আওয়ামী লীগের নির্বাচিত নেতৃত্বের সঙ্গে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক সমঝোতার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের যৌক্তিকতা ব্যাখ্যা করেন। এই বার্তাটি সর্বত্রই সমাদৃত হলেও পাকিস্তান সরকারের উপর চাপ সৃষ্টির ক্ষেত্রে রাষ্ট্রগুলো দ্বিধান্বিত ছিল। পাকিস্তানের নীতি পরিবর্তের ক্ষেত্রে তারা চাপ সৃষ্টি করতে ব্যর্থ হয়। কিন্তু প্রথম থেকেই ভারতীয় নীতি নির্ধারণগণ দেখতে পেলেন সফরগুলো বিশ্বজনমত সৃষ্টিতে সফল হয়েছে। কিন্তু রাষ্ট্র বা সংস্থাগুলো উদ্যোগ গ্রহণে অগ্রসর হচ্ছে না। এর ফলে জনগণের মতামত, গণমাধ্যমগুলোর ইতিবাচক প্রচারে ক্ষমতাসীন সরকার বেকায়দা, বিব্রত ও অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে পড়ে।

দ্বিতীয়বারের মতো ভারতীয় কর্তৃপক্ষ আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকার দেশসমূহে প্রতিনিধি প্রেরণ করে যার লক্ষ্য ছিল আসন্ন জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমস্যা সম্পর্কে অবগত করানো, সংকট নিরসনে পন্থা উদ্ভাবন এবং শান্তির অন্বেষায় ব্যর্থ হলে বিপুল বিপন্ন মানুষের জন্য প্রয়োজনে সামরিক শক্তি ব্যবহার করা হবে তার ইঙ্গিত প্রদান।[১২৯]

কেন্দ্রীয় শিল্পমন্ত্রী মইনুল হক চৌধুরী প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে ইউরোপের অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, সুইডেন, হল্যান্ড এবং ইতালি সফর করেন। তার এই সফরের উদ্দেশ্য ছিল বাংলাদেশে কী ঘটছে সে সম্পর্কে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ ও সেদেশের জনগণকে অবহিত করা।[১৩০]

ভারতের কৃষিমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমেদ বৈরুত ও পশ্চিম এশিয়ার চারটি দেশ সফর করে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও ভারতের অবস্থান তুলে ধরেন। ভারতের বিমান ও পর্যটক মন্ত্রী ড. করণ সিং বার্লিনে পরিষ্কারভাবে বলেন যে, শরণার্থীদের বিপুল চাপ ভারতের পক্ষে এককভাবে বহন করা সম্ভব নয়। তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিশেষ দূত হিসেবে পূর্ব জার্মানির প্রধানমন্ত্রী ও উইলি স্টফন ও বিদেশমন্ত্রী ওট্টো উইনজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে এ কথা বলেন।[১৩১]

৫ই সেপ্টেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নেপাল সফরকালে প্রকাশিত যৌথ ইশতেহারে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্যে প্রয়োজনীয় পরিবেশ তৈরির আহ্বান জানান।

৮. বেসরকারি কূটনৈতিক তৎপরতা:-জয়প্রকাশ

বাংলাদেশে সংঘঠিত অবর্ণনীয় মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণহত্যা ও বিশাল মানবিক ট্রাজেডি বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরার জন্য শুধু সরকারি উদ্যোগে নয় বেসরকারিভাবে কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়। বাংলাদেশে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষে বিশ্বজনমত গড়ে তোলার লক্ষ্যে ভারতের সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ ১৬ই মে থেকে ২৭শে জুন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, রাশিয়া, জার্মানি, প্যারিস, সুইডেন, ফিনল্যান্ড, জাপান, সিঙ্গাপুর, মিশর, থাইল্যান্ড, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি দেশের বিভিন্ন শহর সফর করেন। তিনি বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধান, কর্মকর্তাবৃন্দ, রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের সাথে সাক্ষাৎ করে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতি তুলে ধরেন। তিনি শরণার্থী সমস্যা এবং পাকিস্তান বাহিনীর নির্যাতনসহ ভারতের ওপর প্রবল আর্থ-সামাজিক চাপের প্রসঙ্গ তুলে ধরে বাঙালির ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের প্রতি বিশ্ববাসীর সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ তাঁর সফরকালে বিদেশে বাংলাদেশের সমর্থনে গঠিত বিভিন্ন সমিতির আয়োজিত অনুষ্ঠানেও বক্তৃতা করেন।[১৩২]

মিশর: কায়রোতে সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীদের সমাবেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, বাংলাদেশ সংকট অবিলম্বে সমাধান করা বিশ্ব সম্প্রদায়ের দায়িত্ব। 'বিলম্ব হলে পূর্ববঙ্গ ভিয়েতনাম হবে'। ১৯শে মে কায়রোতে তিনি আরো বলেন, পূর্ববঙ্গে রক্তপাত বন্ধ করে সেখানে সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের জন্য সংযুক্ত আরব ও মিত্র মুসলিম দেশগুলি ইয়াহিয়ার উপর চাপ দেবে বলে ভারত আশা করেছিল। আরব দুনিয়ার বন্ধু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবেই ভারত এই আশা করতে পারে। সর্বোদয় নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ মিশরের একদল সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবীর কাছে এ কথা বলেন। তিনি বলেন, দ্রুত পূর্ববঙ্গ সংকটের সন্তোষজনক সমাধান না হলে চীনের জড়িয়ে পড়ার বিপদ রয়েছে। অনিশ্চয়তা চলতেই থাকবে। বৃহৎ শক্তি নাক গলাবে। সেখানে অবস্থা ভালোর দিকে না গেলে পূর্ববঙ্গ দ্বিতীয় ভিয়েতনামে পরিণত হবে।[১৩৩]

লন্ডন: ৪ঠা জুন জয়প্রকাশ নারায়ণ গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতার সঙ্গে বৈঠকে মিলিত হন। প্রথমেই তিনি দেখা করেন কমনওয়েলথ রিলেশনস অফিসের এন্থনী কেরশার সঙ্গে। কেরশা ভারত-পাকিস্তান সমস্যা সম্বন্ধে বিশেষভাবে ওয়াকিবহাল। নারায়ণ বলেছেন, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গণহত্যার ফলে বাংলাদেশ থেকে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে চলে আসায় যে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেই ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের যথেষ্ট সহানুভূতি রয়েছে। কেরশা ভারতের এই সমস্যায় ব্রিটিশ সরকারের অকুণ্ঠ সহানুভূতি প্রকাশ করেন। নারায়ণের মতে, পশ্চিম পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য বন্ধ করার ব্যাপারে পশ্চিমা শক্তিগুলোর অনিচ্ছার কারণ আছে দু'টো। একটি হলো পশ্চিমা শক্তিগুলো মনে করছে সাহায্য বন্ধ করলে পাকিস্তানের কাছে পূর্বের পাওনা টাকা হয়তো ফেরৎ পাওয়া যাবে না। দ্বিতীয়ত, প্রয়োজনীয় আর্থিক সাহায্য না পেলে পাকিস্তান সাহায্য লাভের জন্য হয়তো চীনের দ্বারস্থ হবে। নারায়ণ এর আগে কায়রো, রোম, বেলগ্রেড, মস্কো, হেলসিঙ্কি, বন এবং প্যারিস ঘুরে এসেছেন। লন্ডন থেকে ওয়াশিংটন এবং অটোয়া সফরে যাবেন। তার সফরের উদ্দেশ্য বাংলাদেশের সমস্যা বিষয়ে আন্তর্জাতিক সহানুভূতি প্রতিষ্ঠা এবং বাংলাদেশের জনগণের জন্য গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন করার দাবি তুলে ধরা।

বাংলাদেশের ঘটনায় বিশ্ব সক্রিয় না হলে ভারত কড়া ব্যবস্থা নেবে ৬ই জুন লন্ডনে জয়প্রকাশ নারায়ণ দ্ব্যর্থহীনভাবে একথা ঘোষণা দিয়ে বলেন, বিশ্বকে অতি দ্রুত বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা উপলব্ধি করতে হবে। না হলে ভারত একাই তার স্বার্থে ব্যবস্থা নেবে। ইতিমধ্যেই জনগণ, রাজনৈতিক দল এবং পরিস্থিতি প্রধানমন্ত্রীর ওপর চাপ বাড়াতে শুরু করেছে। তিনি বলেন, কেউ কেউ মনে করেন আরো দুর্গতি ও সন্ত্রাসের মধ্যে দিয়ে চলতে থাকলে মুক্তিসংগ্রাম স্তব্ধ হয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের অবস্থা আবার স্বাভাবিক হবে। কিন্তু এটা সম্পূর্ণ ভুল। পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ দপ্তরের আন্ডার সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎকালে নারায়ণ তাঁকে বলেন, বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদসহ নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করে তাঁর এই ধারনা হয়েছে যে তাঁদের স্বাধীনতা ছাড়া আর অন্য কিছু মেনে নেবার কোনো সম্ভাবনা নেই। এটা মেনে নিতে ব্রিটিশ সরকার কীভাবে পাকিস্তানকে বাধ্য করবে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, সব রকম সাহায্য বন্ধ করলেই এটা হবে। কেন না এখন যে সমস্ত সাহায্য করা হবে তা যুদ্ধের কাজে ব্যবহৃত হবে এবং স্বভাবতই সাহায্যকারী দেশ বাংলাদেশের ঘটনাবলির জন্য দায়ী হবেন।[১৩৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলসিঙ্কি: মে মাসের শেষে ও জুন মাসের প্রথম সপ্তাহে জয়প্রকাশ নারায়ণ হেলসিঙ্কি সফরে যান। সেখানে আন্তর্জাতিকভাবে সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সেখানে বহুদেশের সমাজতন্ত্রী নেতাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন। তিনি পশ্চিম জার্মানির চ্যান্সেলার উইলি ব্রান্ট, ব্রিটেনের বিরোধী দলের নেতা হ্যারলল্ড উইলসন, নরওয়ে ও সুইডেনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয় এবং ফ্রান্স, বেলজিয়াম ও নেদারল্যান্ডের সমাজতন্ত্রী দলের নেতৃবর্গের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্পর্কে আলোচনা করেন।

ব্রান্ট বাংলাদেশের সমস্যা সম্পর্কে যথেষ্ট সহানুভূতিশীল হওয়া সত্ত্বেও তিনি জানিয়েছেন পশ্চিম জার্মানি পাকিস্তানের উপর রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করতে অক্ষম। সম্মেলনের পর তিনি বনে যান। সেখানে পার্লামেন্ট সদস্য এবং ক্রিশ্চান ডেমোক্র্যাট পার্টির সদস্যদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি জানতে পারেন ভারতে আগত শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য পশ্চিম জার্মানির পার্লামেন্টে শীঘ্রই একটি বাড়তি বাজেট পেশ করা হবে। জয়প্রকাশ নারায়ণ এরপর ফ্রান্সে যান। তাঁকে ফরাসি সরকারি সূত্র থেকে জানানো হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কোনো অস্ত্র সাহায্য দেওয়া হচ্ছে না। তবে ফরাসি বেসরকারি অস্ত্র ব্যবসায়ীদের পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়নি।[১৩৫]

নিউইয়র্ক: ১৩ই জুন জাতিসংঘের সামনে এক সমাবেশে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানপূর্বক শান্তি পুনঃপ্রতিষ্ঠা না করতে পারলে উপমহাদেশে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে এবং এর পরিণতি বিশ্বকে এক অনিশ্চয়তার দিকে ঠেলে দেবে। সমস্যার মূল বিশ্লেষণ করে তিনি বলেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ গণহত্যার শিকার হয়েছে। এ পর্যন্ত ৬০ লক্ষ মানুষ ভারতে শরণার্থী। পাশ্চাত্য ও ইউরোপে সামান্য প্রতিক্রিয়া হয়েছে, এতে করে প্রতীয়মান হয় 'বিশ্ব বিবেক মৃত।' 'মুক্ত দুনিয়া'র নেতৃত্ব কেন নীরব। ফ্রীওর্য়াল্ড আজ বন্দি-বিশ্ব। প্রেসিডেন্ট নিক্সন, এডোয়ার্ড হীথ কেউ প্রকাশ্যে বলেছেন না, পাকিস্তানে যে সাহায্য যাবে তা মিলিটারিরা খেয়ে ফেলবে এবং তা হবে গণহত্যাকে সাহায্য। তাদের উচিত ইয়াহিয়া খানকে চাপ দেওয়া যাতে সে রাজনৈতিক সমাধান মেনে নেয়।[১৩৬]

সিঙ্গাপুর: ২৪শে জুন সিঙ্গাপুরে জয়প্রকাশ নারায়ণ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, বিপর্যয়ের হাত হতে রক্ষার জন্য অবিলম্বে বৃহৎশক্তিবর্গের উচিত ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ সৃষ্টি করা যাতে রাজনৈতিক সমাধানে আসতে পারে। বাংলাদেশ মুক্ত হবে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাংলাদেশের স্ট্রাটেজিক অবস্থান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম সফল না হলে মাওবাদী চীন সে শূন্যস্থান পূরণ করবে। সেজন্য অবিলম্বে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করা জাতীয় আন্তর্জাতিকভাবে আশু করণীয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।[১৩৭]

বিদেশ সফরশেষে সংবাদপত্রে প্রদত্ত জয়প্রকাশ নারায়ণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে এক বিবৃতিতে বলেন, অনেক রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারকগণ আশ্বস্ত হতে পারছেন না যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সঙ্গে পেরে উঠবে। তারা মনে করেন, বাংলাদেশ সমস্যা ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসবে। সেজন্য বর্তমান সংকট তীব্র হবে কিনা এ সম্পর্কে তাঁদের সন্দেহ রয়েছে। তবে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন, ভারতের স্বার্থে পাকিস্তান ভেঙ্গে যাচ্ছে না, বরং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ও তাঁর উপদেষ্টাগণ পাকিস্তান রাষ্ট্রকে ভেঙ্গে ফেলেছে। প্রশ্নটি হলো, কতদিন বলপূর্বক তারা বাংলাদেশ দখলে রাখতে পারবে। তিনি বলেন, আমি পরিষ্কার যে, স্বীকৃতির বিলম্ব হলে ও বাংলাদেশের সাহায্যে ভারত এগিয়ে না আসলে তা হবে জাতীয় বিশ্বাসঘাতকতা।[১৩৮]

অবিলম্বে বাংলাদেশ সরকারকে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য বিহারে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশ সম্মেলন সমিতির এক ভাষণে জয়প্রকাশ নারায়ণ বলেন যে, বাংলাদেশে যে যুদ্ধ চলছে, তাকে বাইরে থেকে মনে হবে গৃহযুদ্ধ। কিন্তু বাস্তবে এ যুদ্ধ গৃহযুদ্ধ নয়। এ যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী একটা জাতির সঙ্গে একটি মুক্তিকামী উপনিবেশিক রাষ্ট্রের জনগণের যুদ্ধ হিসেবে গণ্য করা উচিত হবে। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের বার্তা বহন করে তিনি এটা উপলব্ধি করেছেন যে, বাংলাদেশের ব্যাপারে বিদেশে পাকিস্তানি সামরিক চক্রের ভারতবিরোধী প্রচারকার্য ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান বিদেশে এরকম একটা ধারণা সৃষ্টি করতে চেয়েছিল যে পাকিস্তানে বাংলাদেশকে নিয়ে যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছে তার মূলে আছে ভারত। তবে বাংলাদেশের সমস্যাবলি নিয়ে বিশ্বের দুটি রাষ্ট্র অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স অদ্ভুত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছে। যুক্তরাষ্ট্র সরকার ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং তাঁকে এই মর্মে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে পাকিস্তানকে আর অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করা হবে না। কিন্তু পরবর্তীকালে দেখা গেল, যুক্তরাষ্ট্র সরকার পাকিস্তানে আরও ছ'সাত জাহাজ বোঝাই অস্ত্রশস্ত্র পাঠিয়েছে। ফ্রান্স সরাসরি পাকিস্তানকে অস্ত্রশস্ত্র না পাঠালেও, সেখানে খোলা বাজারে পাকিস্তানে জনগণের কাছে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা হচ্ছে। আন্তর্জাতিক (Aid-Pakistan) কমিটি সাহায্য দেওয়া বন্ধ রাখলেও, দ্বিপাক্ষিক চুক্তি বলে পাকিস্তান সাহায্য পেতে থাকবেই।[১৩৯]

৯. মুজিবনগর সরকারের প্রস্তাব

ভারতের কাছে মুজিবনগর সরকার কতিপয় প্রস্তাব উত্থাপন করেন: ১. বাংলাদেশকে ভারত স্বাধীন সার্বভৌম দেশ হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হবে; ২. পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ পরিচালনার জন্য ভারতের সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী সমন্বয়ে যৌথ কমান্ড গঠন করতে হবে; এবং ৩. বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বে জাতিসংঘে উত্থাপিত যে কোনো ধরনের প্রস্তাব বাধাগ্রস্থ করতে হবে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন থেকে ফিরে এসে এ প্রস্তাবগুলোর সঙ্গে একমত পোষণ করেন। ইন্দিরা গান্ধীর নিকট অজানা ছিল না যে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন কর্তৃক বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম বাধাগ্রস্ত করার জন্য তার মিত্র দেশগুলোর নিকট বার্তাপ্রেরণ করেছেন।[১৪০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. পাকিস্তানের কূটনৈতিক চাল

মূল সমস্যা নিরসনে না গিয়ে পাকিস্তান বিশ্বব্যাপী ধাপ্পা দিতে চেয়েছে এভাবে যে, শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেবার ক্ষেত্রে তারা আন্তরিক। পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান নতুন নিয়োগপ্রাপ্ত আন্তসার্ভিস গোয়েন্দা প্রধান জেনারেল জিলানীর নিকট থেকে এই মর্মে রিপোর্ট পান যে, ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ সীমান্তের দিকে অগ্রসর হচ্ছে এবং পাশাপাশি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারী অস্ত্রশস্ত্র সমুদ্রপথে ভারতে প্রেরণ করছে। ইয়াহিয়া খান ত্বড়িৎ গতিতে গোপনে একটি শান্তি পরিকল্পনা ইসলামাবাদে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত জয়কুমার অটলার হাতে পৌঁছে দেন। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এ বিষয়টি বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে এই সবই ইয়াহিয়া খানের ধাপ্পাবাজি। একই সাথে ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানের নুরুল আমিনকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেন এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী দুটি মন্ত্রণালয়ে দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ করেন। ভুট্টো নুরুল আমিনের অধীনে উপ-প্রধানমন্ত্রী হতে অস্বীকৃতি জানান, কিন্তু পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব নেন।

ভারতীয় কূটনীতিক তৎপরতার বিপরীতে ইয়াহিয়া খান ২১শে মে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের ফর্মুলা ঘোষণা করেন এবং এর সম্পর্কে তিনি ২৫শে মে, ১লা জুন, ১০ই জুন, ১৮ই জুন এবং ২৮শে জুন শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন নিয়ে জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। বিশ্লেষকরা বলেছেন, শরণার্থী সমস্যা নিয়ে ভারতের কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালা সম্পর্কে কর্মকর্তাগণ জ্ঞাত ছিলেন না। কিন্তু প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, শরণার্থী সম্পর্কে মধ্য-এপ্রিলে সরকারের সিদ্ধান্ত হলো তাঁদের জন্য আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা এবং প্রয়োজনমতে তাঁদের ক্যাম্পের বাইরে থাকার ব্যবস্থা করা। এ সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ৪ঠা মে বলেন, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত শরণার্থীদের স্থায়ীভাবে ভারত জায়গা দিবে না।[১৪১] যা প্যাকের মিটিং-এ আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এখানে লক্ষণীয় যে, অনেক শরণার্থী তাঁদের পূর্ব কোনো আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে, যাঁদেরকে সীমান্ত প্রহরীরা ক্যাম্পে নিয়ে যেতে সমর্থ হয়নি। সে কারণে প্যাকের সিদ্ধান্ত মোতাবেক শরণার্থীদের ক্যাম্পের অবস্থানের বিষয় নিশ্চিত করা সম্ভব হয়নি।[১৪২]

এই পরিপ্রেক্ষিতে ২৮শে জুন ইয়াহিয়া খান ডা. এম. এ. মালিককে প্রেসিডেন্টের বিশেষ সহকারি হিসেবে ছিন্নমূল ও শরণার্থীদের বিষয়টি দেখাশুনার জন্যে নিয়োগ দেন। কিন্তু এই আবেদন ও কার্যক্রম অকার্যকর হয়ে পড়ে। শরণার্থীরা পূর্ববঙ্গে ফিরে আসেননি। নয়াদিল্লি স্পষ্টত উপলব্ধি করে শরণার্থী সমস্যা সমাধানে আওয়ামী লীগের সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের সমঝোতা হতে হবে। তাহলে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন সম্ভব হবে। জাতিসংঘের পর্যবেক্ষকদের তত্ত্বাবধানে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের প্রস্তাব ভারত নাকচ করে দেয়।

ক. উপনির্বাচন ঘোষণা: আরেক প্রহসন: নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে উপনীত হওয়ার ভারতীয় চাপের মুখে পাকিস্তান সামরিক জান্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৭০ সালের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মধ্যে জাতীয় পরিষদের ৮০জনের সদস্যপদ বাতিল করে। তদ্‌স্থলে উপনির্বাচনের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের দালালদের মনোনয়নের ব্যবস্থা করে সংসদ গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। এই নির্বাচন ছিল কূটনৈতিক কৌশলের জঘন্যতম ধাপ্পাবাজি।

নয়াদিল্লি আরো উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ২৮শে জুন তাঁর ভাষণে ইয়াহিয়া খান দ্ব্যর্থহীনভাবে বলেন, তিনি নতুন নির্বাচন দেবেন না এবং পূর্বের অবস্থায় ফিরে যাবেন না। তিনি নিষিদ্ধ আওয়ামী লীগের কথা পূণর্ব্যক্ত করে বলেন, আওয়ামী লীগ বিচ্ছিন্নতাবাদী দল এবং শেখ মুজিব দেশদ্রোহী। তিনি দেশকে বিভক্ত করার জন্য পরিকল্পনা করেছিলেন যা বানচাল করে দেওয়া হয়েছে। ইয়াহিয়া খান ঘোষণা দেন শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগ ভারতের সঙ্গে যোগসাজশে এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তিনি আরো বলেন, প্রতিবেশী ভারত পাকিস্তানকে দুর্বল ও ভঙ্গুর করার এই সুযোগ হাতছাড়া করেনি। তারা বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জনবল এবং বস্তুগত সাহায্য দিয়ে পরিস্থিতিকে জ্বলন্ত করেছে। এগুলো ছিল পূর্ব পরিকল্পিত।[১৪৩] এসব অন্ধকারের পরিকল্পনা প্রকাশিত হয়ে পড়ে যখন সামরিক বাহিনী এগিয়ে যায়।[১৪৪]

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক সমঝোতার পরিকল্পনা ছিল: এক, আওয়ামী লীগের বিদ্রোহী বিচ্ছিন্নতাবাদী যারা পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে ধ্বংস করতে চায় তাদেরকে নির্মূল করে ফেলা; দুই, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার মাধ্যমে আওয়ামী লীগের ভেতরে বিভক্ত সৃষ্টি; তিন, সামরিক প্রশাসক হিসেবে কমিটি অব এক্সপার্ট গঠন করে খসড়া শাসনতন্ত্র রচনা করা এবং তিনি নিজেই এই খসড়া শাসনতন্ত্র অনুসারে জাতির সামনে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং জনমতের প্রতিফলন ঘটিয়ে প্রধান সামরিক শাসক হিসেবে পাকিস্তানের জন্য শাসনতন্ত্র চাপিয়ে দেবেন; এবং চার, রাজনৈতিক দলগুলোর রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা এবং আঞ্চলিক সুনির্দিষ্ট বিষয় ছাড়া অন্য কোনো বিষয় নিয়ে সামনে এগুতে পারবে না সেক্ষেত্রে দলগুলোকে বাতিল করা যাবে। জুলাই মাসে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা রাজনৈতিক সমঝোতাকে দ্বিতীয় সূচিতে অন্তর্ভুক্ত করেন।

১১. কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মোড়

এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান সফরে যান। পাকিস্তান সরকার গোপনে সেখান থেকে চীনে যাওয়ার সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করে। দিল্লি সফরকালে কিসিঞ্জার দেখতে পান ভারত তিক্ত, শত্রুতাপূর্ণ এবং যুদ্ধংদেহী। কিসিঞ্জার ভারত থেকে পরিষ্কার ধারনা পেয়েছেন সম্ভবত ভারত-পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে সেজন্য তিনি ভারতকে এই বিষয়ে কঠোরভাবে সতর্ক করে দেন। তিনি এও উপলব্ধি করেছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটে পাকিস্তানের প্রতি নিক্সন যে নীতি গ্রহণ করেছে তাতে তাদের মধ্যে অসন্তুষ্টি বিরাজ করছিল, যার সুযোগ ভারত নেবে এবং পাকিস্তানে আক্রমণ করবে। নিক্সনের চীন সফরকালে চীনের নিকট এই মনোভাব পেয়েছিলেন যে,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারত যদি আক্রমণ করে তাহলে চীন নীরব দর্শক হয়ে বসে থাকবে না। এই হুমকিতে হয়তো ভারত পাকিস্তানে আক্রমণ করবে না।[১৪৫] কিন্তু সি.আই.এ. রিপোর্টে ভারত পূর্ব পাকিস্তানের কিছু অংশ দখল করে সেখানে বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিষ্ঠা করবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, পূর্ব পাকিস্তানের কোনো অংশ যদি ভারত দখল করে তাহলে পরিপূর্ণভাবে যুদ্ধ শুরু হবে। ইয়াহিয়া খান আরো ঘোষণা করেন, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য মিলিটারি কোর্টে শেখ মুজিবের গোপন বিচার হবে। ইয়াহিয়া খানের এই ঘোষণায় ভারতের নীতিনির্ধারকরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, পাকিস্তান কোনোক্রমে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসবে না এবং শেখ মুজিবকে হত্যা করা হলে আওয়ামী লীগের ভিতরে সংহতি বিপন্ন হবে এবং কোন্দল মাথা চাড়া দিবে। এই কথা বিবেচনায় রেখে ৯ই আগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত শান্তি ও মৈত্রী চুক্তি সম্পাদন করে। পাশাপাশি ইয়াহিয়া খান ১১ই আগস্ট ঘোষণা করেন যে, শেখ মুজিবুর রহমানের ক্যামেরা ট্র্যায়াল অনুষ্ঠিত হচ্ছে এবং ৭ই সেপ্টেম্বর প্রেসরিলিজের মাধ্যমে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই বিচার কার্য ২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এবং এর জন্য বিশজন স্বাক্ষীকে তলব করা হয়েছে। কিন্তু ভারত ও পাকিস্তানের সংঘর্ষময় পরিস্থিতি এবং ৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ বেঁধে যাওয়ায় বিচার কার্যের ঘোষণা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

ক. আওয়ামী লীগ বিভক্তকরণের পাকিস্তানি চক্রান্ত : এই সময় আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করার জন্য সামরিক, বেসামরিক, গোয়েন্দা সংস্থা এবং প্রশাসন তৎপর হয়ে ওঠে এবং আওয়ামী লীগের নির্বাচিত জাতীয় সদস্যদের ভিতর থেকে কাদের যোগ্য বা অযোগ্য ঘোষণা করা হবে সে সম্পর্কে তালিকা করে ইয়াহিয়াখানের নিকট পেশ করা হয়। আগস্ট মাসের প্রথম দিকে নির্বাচিত ১৬০জন জাতীয় পরিষদ সদস্যের মধ্যে ৭৯জনকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। এর মধ্যে ৩০জনকে রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়। ২২৮জন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্যের মধ্যে ১৯৫জন সদস্যকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। যারা যোগ্য ঘোষিত হয় তারা আওয়ামী লীগের সদস্য হিসেবে সংসদে বসতে পারবে না। অযোগ্য ঘোষিত জাতীয় পরিষদের ৭৮টি আসন এবং ১০৫টি প্রাদেশিক পরিষদের আসন ২৫শে নভেম্বর ও ৯ই ডিসেম্বর নির্বাচনের জন্য নির্ধারিত হয়। বাকি শূন্য আসনগুলো পরবর্তীকালে সুনির্দিষ্ট সময়ে অনুষ্ঠিত হবে বলে ঘোষণা করা হয়।[১৪৬]

১২ই অক্টোবর ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করেন, ২০শে ডিসেম্বরের মধ্যে শাসনতন্ত্র জনসম্মুখে প্রকাশ করা হবে, ২৩শে ডিসেম্বরের মধ্যে নির্বাচন শেষ হবে এবং জাতীয় পরিষদ ২৭শে ডিসেম্বর অধিবেশনে বসবে। এই ঘোষণায় মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম ও প্রতিরোধ বেগবান হয়ে উঠে এবং ভারত সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক শক্তি প্রয়োগ বৃদ্ধি পায়। এই অবস্থায় পাকিস্তান সরকার অনুধাবন করে নির্বাচন করা সম্ভব নয়। ফলে সরকার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জনপ্রতিনিধি নির্বাচনের কৌশল গ্রহণ করে। ২৬শে অক্টোবর নুরুল আমিন ছয়টি আওয়ামী বিরোধী দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় পরিষদের ৭৮আসনে ও প্রাদেশিক পরিষদে ১৭৮আসন ভাগাভাগি হয়।[১৪৭] ৭ই ডিসেম্বর সরকার ঘোষণা করে, অসমাপ্ত নির্বাচন অনির্দিষ্ট কালের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। ইয়াহিয়া খানের এই পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের সম্মতিক্রমে গ্রহণ করা হয়েছিল এই লক্ষ্য নিয়ে, ভারত কর্তৃক রাজনৈতিক সমাধান উপনির্বাচনে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের মাধ্যমে সংসদ তৈরি করা এবং তার মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনা অনুযায়ী সংবিধান গ্রহণ ও রাজনৈতিক সমঝোতার উপনীত হওয়ার উপায় হিসেবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের প্রকাশ্য উক্তি ছিল ৭০-এর নির্বাচন যথাযথ হয়নি, যদিও পূর্বে তিনি ঘোষণা দিয়েছিলেন এ নির্বাচন নিরপেক্ষ, সুষ্ঠু ও সর্বজন গ্রহণযোগ্য, তা বিশ্ব গ্রহণ করেছে। বর্তমান অবস্থায় পূর্বের মত পাল্টিয়ে তিনি বক্তব্য প্রকাশ করেন যে, অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এসব জাতীয় সংসদ সদস্য এখন আর জনমতকে ধারণ করছেন না। আসলে এসবই ছিল ভারতীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপ মোকাবেলার ব্যর্থ কৌশল।

খ. আওয়ামী লীগকে বিভক্ত করার মার্কিন ষড়যন্ত্র : জুন মাসে ভারতের বিদেশমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং মার্কিন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ট্রাজেডি সম্পর্কে অবহিত এবং পাকিস্তানে সামরিক সহযোগিতা প্রেরণ বন্ধ করার লক্ষ্যে আলোচনা করতে গেলে কার্যকর কোনো ফল বয়ে আনতে পারেনি। সবকিছু অবগত থেকে যুক্তরাষ্ট্র "tilt in favour of Pakistan" এই নীতিতে অটল ছিল এবং যে কোনোভাবে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ যাতে অব্যাহত থাকে তার ব্যবস্থার জন্য কৌশল গ্রহণ করে। এই সময় কলকাতায় খন্দকার মোশতাক এবং জহিরুল কাইয়ুমের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিল জেনারেল গ্রিফিং-এর সঙ্গে কলকাতায় বৈঠক করে মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ধূর্ত কৌশল গ্রহণ করে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই রাজনৈতিক সমাধানের প্রচেষ্টা চালানোর প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[১৪৮]

স্বাধীনতার পরিবর্তে কনফেডারেশন করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য জহিরুল কাইয়ুম, খন্দকার মোশতাক, মাহবুবুল আলম চাষী প্রমুখের সঙ্গে কলকাতার মার্কিন কাউন্সিল অফিসের কর্মকর্তাগণ কমপক্ষে ১৩বার বৈঠক করেন এবং নির্বাচিত সংসদ সদস্যদের মধ্যে বিভ্রান্তি ও ভাঙন সৃষ্টির অপচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। বিষয়টি ভারত সরকারের অবিদিত ছিল না।

সেপ্টেম্বরের শেষ সপ্তাহে বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ডি.পি. ধর-এর সঙ্গে পরামর্শ করে এই সর্বনাশা পদক্ষেপ বানচাল করে দেয় এবং বলতে গেলে তখন থেকেই খন্দকার মোশাককে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব থেকে সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেও অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের হস্তক্ষেপে নামমাত্র খন্দকার মোশাককে ঐ পদে অকেজোভাবে বহাল রাখা হয়। মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব হেনরি কিসিঞ্জার লিখিত White House years' বইটিতে এই বিষয়ে বিশদ বিবরণ রয়েছে। পাকিস্তানের গোপন কূটনৈতিক ষড়যন্ত্র ও 'মার্কিন কভারড্' কূটনৈতিক উদ্যোগ জাতিসংঘে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য দানের মাধ্যমে বানচাল করে দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের বিদেশমন্ত্রী শরণ সিং জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিষয়টি যেভাবে তুলে ধরেছিলেন খন্দকার মোশাক-এর কার্যকলাপ ছিল তার বিপরীত। সেজন্য শেষ মুহূর্তে তাকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের পক্ষ থেকে জাতিসংঘে প্রতিনিধিত্ব করতে দেওয়া হয়নি। সেপ্টেম্বর মাসের ২৭ তারিখে সর্দার শরণ সিং জাতিসংঘে বাংলাদেশের ঘটনাবলি বিশদভাবে তুলে ধরেন। তিনি বলেন, ভারতে শরণার্থীদের আগমনের স্রোতোধারা কখনই থেমে যাবে না অথবা তারা স্বদেশের মাটিতে ফেরত যাবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি দিয়ে তাঁর সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হওয়া যাবে। কারণ তিনি বাঙালিদের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। কেবল পূর্ব বাংলার পক্ষে তাঁরই একমাত্র কথা বলার অধিকার রয়েছে।

১২. বন্দি শেখ মুজিবের বিচার

৪, ৯ ও ১২ই আগস্ট, লোকসভায় পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক শেখ মুজিবের হত্যার হুমকি প্রসঙ্গে তিন দিনব্যাপী ব্যাপক আলোচনা হয়।[১৪৯] ১২ই আগস্ট, পাক-প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান কর্তৃক শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার এবং প্রাণদণ্ডের হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্যসভায় আলোচনা অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।[১৫০] এ প্রসঙ্গে চতুর্থ অধ্যায়ে বিস্তারিত আলোচনা উপস্থাপন করা হয়েছে।

১৩. সমর কূটনীতি: মার্কিন গোপন নথিতে পাকিস্তানের আক্রমণ

নিক্সন প্রেসিডেন্টসিয়াল ম্যাটেরিয়ালস্, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফাইল থেকে আরো জানা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান সর্বাত্মকভাবে ভারতকে আক্রমণ করেছে। ৫:৩০ মিনিটে পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ভারতের ৬টি বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে। পাকিস্তানের আর্টিলারি বাহিনী সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর উপর কামান দাগছে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, "Had no option but to adopt a war footing." ঐ রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তান অভিযোগ করেছে ভারতের যুদ্ধবিমান তিন-চারদিন হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণাত্মক হানা দিচ্ছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩:৩০ মিনিটে এবং ৪টায় রহিম ইয়ার খান-এর দক্ষিণে কাশ্মীর এলাকায় হানা দিয়েছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী তার পাল্টা জবাব দিয়েছে। সি.আই.এ. রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনো পক্ষ আগে আক্রমণের সূচনা করেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[১৫১] কিন্তু প্রেসিডেন্ট নিকসন ও হেনরি কিসিঞ্জার ভারতকে প্রথম আক্রমণকারী দেশ হিসেবে উল্লেখ করেছে।

১৪. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে কূটনৈতিক সহায়তা

বিশ্বব্যাপী মুজিবনগর সরকার স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশকে উপস্থিত করেছে প্রবাসী বাঙালিদের কার্যক্রম ও পাকিস্তান থেকে পদত্যাগ করে আগত কূটনৈতিকবৃন্দের সাহসী পদক্ষেপ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত সরকারের বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রচার বিভাগ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে পুস্তক, পত্রিকা, দলিল, প্রামাণ্য চিত্র, চলচ্চিত্র তৈরি করে ভারতীয় দূতাবাসের সাহায্যে মুজিবনগর সরকার ও বিভিন্ন সংস্থা সারাবিশ্বে ব্যাপক প্রচার করে। এসব পুস্তক-পত্রিকায় পাকিস্তান বাহিনীর অত্যাচার-নির্যাতন ও শরণার্থী সমস্যার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। এক্ষেত্রে ভারতের তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়ের ভূমিকাও ছিল উল্লেখযোগ্য।[১৫২] কেবল সরকারি প্রচার বিভাগ নয় বেসরকারি গণমাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধের সংবাদ প্রাধান্য পায়। ভারতীয় গণমাধ্যমের ভূমিকা আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনে সহায়ক হয়েছিল।

কূটনীতিকদের বাংলাদেশের পক্ষাবলম্বনের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব ছিল অপরিসীম। পাকিস্তানের পক্ষত্যাগকারী কূটনীতিকদের সঙ্গে বাংলাদেশ সরকারের যোগোযোগ প্রতিষ্ঠা, নিরাপত্তাসহ বিভিন্ন বিষয়ে ভারত প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ সহায়তা প্রদান করে। এই কূটনীতিকদের দিয়েই বাংলাদেশ সরকার কলকাতা, দিল্লি, লন্ডন, নিউইর্য়ক, ওয়াশিংটন এবং হংকংয়ে কূটনৈতিক তৎপরতা চালায়।[১৫৩] কূটনৈতিক এসব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো দ্বিতীয় অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে।

ভারতীয় কূটনীতির ভিন্ন একটি আইনটি কৌশল ছিল প্রবাসী বাঙালিদের সাহায্যে মুক্তিযুদ্ধের প্রচার কাজ ও তৎপরতা পরিচালনা করে। ভারতের সাহায্যে মুজিবনগর সরকার বিদেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধিদল প্রেরণ করে। পৃথিবীর সর্বত্র ভারতীয় কূটনৈতিক মিশনগুলো সাহায্য গ্রহণ করে।

বেসামরিক জনগণের ওপর আক্রমণকে 'gravest and the most tragic development' বলে আখ্যায়িত করা হয়।[১৫৪] বাংলাদেশ ও ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতায় প্রাধান্য দেওয়া হয় ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রকে, বিশেষভাবে জাতিসংঘকে কেন্দ্র করে দু'টি দেশ পরিকল্পিত প্রচারণা চালায়। এক্ষেত্রে ভারতীয় দূতাবাসসহ প্রবাসী ভারতীয় নাগরিকগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। বাংলাদেশ সরকারের বিশেষ প্রতিনিধি হিসেবে লন্ডনে এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহ থেকেই মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনমত সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী। বাংলাদেশের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রে প্রচারণার ক্ষেত্রেও বিচারপতি চৌধুরী গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।[১৫৫] বিশেষভাবে ১৯৭১ সালে সেপ্টেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত জাতিংঘের সাধারণ অধিবেশনে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের নেতা হিসেবে বিশ্বের অন্যান্য রাষ্ট্রের প্রতিনিধির কাছে বাংলাদেশের সংগ্রামের যৌক্তিকতা বর্ণনা করেন। বিশ্বজনমত সংগঠনে জাতিসংঘ সাংবাদিক সমিতির সভাপতি ভারতীয় বাঙালি ড. যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলকে বিশেষ সহায়তা দেন।[১৫৬]

১৫. কতিপয় মৌলিক প্রশ্নে ইন্দিরা গান্ধী মুক্তিবাহিনী হাতে অস্ত্র প্রসঙ্গেঃ সিডনি এইচ. শ্যনবার্গের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে এক প্রশ্নের জবাবে বাংলাদেশের অস্ত্রপ্রাপ্তি সম্পর্কে যেখানে পূর্বে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর অস্ত্র সম্পর্কে বলতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিধান্বিত ছিলেন; কিন্তু অনুরূপ প্রশ্নের জবাবে ১৯শে অক্টোবর নিউইয়র্কে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশ সরকারের বিশ্বব্যাপী নেটওর্য়াক রয়েছে, বিশ্বব্যাপী তাদের জনগণ এবং তাঁদের জন্য বহু দরজা খোলা হয়েছে। যাই হোক না কেন, অস্ত্র থাক বা না থাক কেউ তাঁদের স্বাধীনতাকে স্তব্ধ করে দিতে পারবে না। শ্যানবার্গ লিখেছেন, ৫৩ বছর বয়সী প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে শান্তি-সংলাপ প্রত্যাখ্যান করে বলেন, পাকিস্তানকে প্রথম বাংলাদেশের সংকট সেদেশের জনপ্রতিনিধিদের সাথে সমাধান করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি সম্পর্কে তিনি বলেন, তাঁদের নীতি দীর্ঘ দৃষ্টিভঙ্গি সুদূরপ্রসারী নয়। তিনি আরোও বলেন, মার্কিন প্রশাসনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক অবনতি ঘটলেও মার্কিন জনগণের সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব অটুট রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র শুধু কমিউনিজম ঠেকানোর জন্য নয়, তারা উপমহাদেশে যা ভারতকে বলা হয়েছে এবং যতদূর জানা যাচ্ছে তা হলো, পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্য দিয়ে ভারসাম্য রক্ষা করছে। সেক্ষেত্রে বর্তমানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের ভালো বোঝাপড়া রয়েছে।[১৫৭]

ক. পর্যবেক্ষক নিয়োগ প্রসঙ্গে: ২৭শে অক্টোবর অস্ট্রীয় বেতারে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে প্রশ্ন করা হয়েছিল জাতিসংঘ কর্তৃক উভয় সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগে পাকিস্তান সম্মত হলেও ভারত বিরোধীতা করছে কেন? এই প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য ছিল, ভারতে ইতোমধ্যে জাতিসংঘের দশজন পর্যবেক্ষক রয়েছে। তারা সীমান্ত পরিদর্শন করছেন। প্রতিদিন ৩২-৪২ হাজার শরণার্থী ভারতে আসছে। কারণ গণহত্যা, নির্যাতন, অত্যাচার থামেনি। যদি কেউ নতুন করে পর্যবেক্ষক পাঠাতে আগ্রহী হয় তাহলে প্রথমেই অগণিত শরণার্থীদের আসা বন্ধ করতে হবে, তারপরে অন্য বিষয় ভেবে দেখা যাবে।[১৫৮]

খ. জোটনিরপেক্ষ নীতির ব্যাখ্যা: ব্রিটিশ পত্রিকা '*অবজারভার*' ইন্দিরা গান্ধীকে 'তীক্ষ্ণ নখরযুক্ত শান্তির পায়রা' (dove with sharp claws) অভিহিত করলেও পরিস্থিতি আরো অবনতি হলে তিনি কী করবেন এই প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী 'তার গৃহীত নীতির পুনরুল্লেখ করেন, সমস্যা সমাধানে আমরা যুদ্ধে বিশ্বাস করি না।' কিন্তু ভারত অবশ্যই জাতীয় স্বার্থে নিরাপত্তা বিধান করবে। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, বিশ্ব শান্তি ও জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা করে আন্তর্জাতিক ঘটনার প্রতিটি বিষয়ে নিজস্ব স্বাধীন বিচার বিবেচনা ও কার্যক্রম পরিচালনা করার লক্ষ্যে জোটনিরপেক্ষ নীতি প্রণীত। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে চুক্তি করে ভারত সেই নীতি থেকে সরে আসেনি।[১৫৯]

গ. ভারত-সোভিয়েত চুক্তি: ৭ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের এন.বি.সি. টেলিভিশনে 'মিট দ্য প্রেস' অনুষ্ঠানে সাংবাদিক ফ্রেডরিকের এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, সমস্যাটি ভারত ও পাকিস্তানের নয়, বিষয়টি হলো পাকিস্তানের সামরিক জান্তা ও বাংলাদেশের জনগণ এবং তাঁদের নির্বাচিত নেতৃত্বের। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারত ডিফেন্স প্যাক্ট করেনি। এটা শুধু শান্তি, সহযোগিতা, বন্ধুত্বের চুক্তি মাত্র। এটা কোনো সামরিক চুক্তি নয়।[১৬০]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘ. মৌলিক সমাধান প্রয়োজন: ৮ই নভেম্বর প্যারিসের রাষ্ট্রীয় ভোজসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভারত সর্বাত্মক আত্মসংযম করে আছে। কিন্তু সন্দেহ নেই ভারতের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা হুমকির সম্মুখীন। শুধু তাই নয়, এটা সমগ্র অঞ্চলের জন্যই শান্তির প্রতি হুমকি। বর্তমান সংকটের মৌলিক সমাধান প্রয়োজন। কার্যকর রাজনৈতিক সমাধান দরকার যা বাংলাদেশের জনগণ ও তাদের প্রতিনিধিরা গ্রহণ করে।[১৬১]

ঙ. তৃতীয় পার্টির মাধ্যমে অস্ত্র বিক্রয়: তিন সপ্তাহের সফর শেষে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী দিল্লি ফিরে এসে বলেন, 'বিশ্ব এখন বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে আগের চেয়ে বেশি সচেতন'। ভারত পাকিস্তানের যুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিষয়টি নিয়ে বিশ্বের নেতৃবৃন্দ ভাবছেন যেমনটি আমিও ভাবছি। তিনি সীমান্ত সমস্যার বিষয়টি ওয়াকিবহাল আছেন। তিনি আরো বলেন, তার কাছে এটা পরিষ্কার নয় যে অস্ত্র বিক্রয়ের ক্ষেত্রে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তৃতীয় পার্টির মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র বিক্রয় করবে কিনা। তিনি এই বিষয়ে অনিশ্চিত যে, যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট উইলিয়াম রজার্স বিবৃতিতে বলেছেন যে, পাকিস্তান-ভারত সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্র দূরে থাকবে।[১৬২] কিন্তু প্রকৃত পক্ষে মুসলিম দেশগুলোর মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানে যুদ্ধ বিমান ও অস্ত্র প্রেরণ করে।[১৬৩]

চ. কূটনৈতিক ফর্মুলা: ১৫ই নভেম্বর, বেলজিয়াম, অস্ট্রিয়া, লন্ডন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং জার্মানি সফরশেষে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোকসভায় একটি বিবৃতি প্রদান করেন।[১৬৪] ১৫ই নভেম্বর অটলবিহারী বাজপেয়ী সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন করেন যে, ইয়াহিয়া খান পূর্ব পাকিস্তানে একটি প্রহসন নির্বাচন করছেন। আওয়ামী লীগের সঙ্গে যারা নির্বাচনে হেরে গিয়েছেন তাঁদের জনপ্রতিনিধি বানানো হচ্ছে। সেক্ষেত্রে গোপনে প্রতিনিধি নির্বাচন করে নতুন লোক নিয়ে আসা হবে এবং একটি পুতুল সরকার গঠন করা হবে। তখন রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নটি কীভাবে সমাধান করা হবে। তখন তাঁদের সঙ্গে ইয়াহিয়া খান একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছতে সক্ষম হবে এবং বিশ্বকে দেখাতে পারবে যে, জনপ্রতিনিধির হাতেই তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন, যারা স্বাধীন বাংলাদেশ চায় না। চায় একটি শিথিল কনফেডারেশন জাতীয় রাষ্ট্র। বিশ্ব ইতিহাসে এরূপ নজির মেলে।[১৬৫] এ প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যথাসময়ে সঠিক সিদ্ধান্তগ্রহণে ভারত পিছপা হবে না।

জ. ভারত চোখ বন্ধ করেনি: ১৫ই নভেম্বর *নিউজউইক*-এ প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, মোটামুটিভাবে আমি বলতে পারি ভারতের জনগণ যুদ্ধ চায় না। কিছু সোচ্চার কণ্ঠ এবং উগ্রদল যুদ্ধের স্বপক্ষে কথা বলছে। আমি আশা করি, যুদ্ধ হবে না এবং যুদ্ধ যাতে না হয় তার জন্য সবকিছুই করছি। যুদ্ধের হুমকি সম্ভবত কম এই কারণে যে, আমরা পশ্চিম পাকিস্তান সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়েছি, কিন্তু পূর্ব দিকে অবস্থা এমন যে সেখানে যুদ্ধের হুমকি বিরাজ করছে। ভারতের পূর্বাঞ্চলে প্রতিদিনই ক্রমাগত বিপদ বৃদ্ধি পাচ্ছে।[১৬৬] এ বিষয়ে ভারত চোখ বন্ধ করে রাখেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঝ. অসুখের চিকিৎসা করতে হবে উপসর্গকে নয়: বি.বি.সি.'তে ১৬ই নভেম্বর প্রচারিত এক সাক্ষাৎকারে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এটা খুবই দুঃখজনক যে, যুক্তরাষ্ট্র শুধু শরণার্থীদের বিষয়টি প্রাধান্য দিয়েছে, কিন্তু সমস্যার মূল কারণ অনুসন্ধান করে তা সমাধানের পথে অগ্রসর হননি। সাংবাদিক মার্ক টালির এক প্রশ্নের জবাবে প্রধানমন্ত্রী বলেন, এটা পূর্ববঙ্গের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কীভাবে সমস্যার সমাধান করবে তারাই জানেন, যেখানে এখন পর্যন্ত রক্ত ঝরছে এবং বুদ্ধিজীবী, সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ও তরুণদের হত্যা করা হচ্ছে। মার্ক টালি তাকে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, শত শত পর্যবেক্ষক আসলেও কিছুই হবে না। তারা কিছুই করতে পারবে না। জাতিসংঘ দুই দেশকে এক পাল্লায় মাপতে পারে না। গেরিলাদের আশ্রয় ও সাহায্যের জন্য ভারতকে দায়ী করা হচ্ছে এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এটা ঠিক যে, বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সীমান্ত লাগোয়া সেজন্য জনগণের আসা-যাওয়া রোধ করা সম্ভব নয়। সাহায্যের ব্যাপারে আমি বলতে পারি, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশে প্রচুর পূর্ববঙ্গের প্রবাসী বসবাস করে। যারা এই সংগ্রামকে সমর্থন করেছে। তাছাড়া গেরিলারা সমগ্র বাংলাদেশে তৎপর, শুধু ভারতের সীমান্তের কাছাকাছি না। তাছাড়া তাদের রয়েছে আধা সামরিক বাহিনী এবং সামরিক বাহিনী যাদের কাছে পূর্ব থেকেই অস্ত্র ছিল। অন্য এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন, এটা সীমান্ত সমস্যা নয়, এখানে মৌলিক প্রশ্ন রয়েছে, আপনাকে অসুখের চিকিৎসা করতে হবে উপসর্গকে নয়। মার্ক টালি তাকে প্রশ্ন করেন যে, বর্তমান অবস্থা কি যুদ্ধের দিকে চলে যাচ্ছে? উত্তরে প্রধানমন্ত্রী বলেন, যুদ্ধ খুবই খারাপ বিষয়। ভারত সবসময় যুদ্ধের বিরুদ্ধে, যেখানে তা ঘটুক না কেন। কিন্তু কতগুলো বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ, যেমন আমরা শুধু ভারতের জনগণের জন্য অনুভব করি না, আমরা এশিয়া ও বিশ্বের শান্তি, স্থিতিশীলতা, সংহতি এবং ভারতের নিরাপত্তার বিষয়টি মৌলিক গুরুত্বপূর্ণ। আমি মনে করি না এই বিষয়গুলো থেকে বিশ্ব তাঁদের মনোযোগ অন্যদিকে তাড়িত করতে পারবে। মার্ক টালি তাকে প্রশ্ন করেন, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট তার সঙ্গে আলোচনা করতে চাইলে তিনি তা অস্বীকার করেছিলেন কেন? ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তার সাথে কথা এবং কী জন্য। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান সর্বত্র বলে বেড়াচ্ছেন বাংলাদেশের পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। তাই যদি হয় তার অর্থই দাঁড়ায় তিনি বাস্তব কথা বলছেন না অথবা অসত্য কথা বলছেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, বিশ্বের কিছু রাষ্ট্র পাকিস্তানকে কিংবা পাকিস্তানের জনগণকে সহায়তা করছেন বরং তারা সামরিক জান্তাকে সাহায্য করছে যা জনগণের কল্যাণে আসবে না।[১৬৭]

ঞ. বিশ্ববাসী বাংলাদেশ সম্পর্কে আরো সচেতন হয়েছে : ২৩শে নভেম্বর, বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের তৃতীয় কমিটিতে চীন কর্তৃক পাকিস্তানের পক্ষাবলম্বনের ভূমিকা গ্রহণের বিষয় নিয়ে রাজ্যসভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।[১৬৮] ৩০শে নভেম্বর, তিন সপ্তাহব্যাপী ইউরোপের কয়েকটি দেশ সফরশেষে দেশে ফিরে এর যে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন তার ওপর প্রধানমন্ত্রীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।[১৬৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ট. জাতিসংঘ অচলাবস্থা: জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ও নিরাপত্তা পরিষদে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারে যেসব প্রস্তাব নিয়ে আসা হয়েছিল সোভিয়েত রাশিয়া সে প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে। ফলে পাকিস্তানের প্রতি ঝুঁকে থাকা যুক্তরাষ্ট্রের কৌশলগত প্রস্তাবগুলো অকেজো হয়ে পড়ে। জাতিসংঘের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে স্ট্যাটিক হয়ে আছে। জাপান এবং বেলজিয়াম-এর স্থায়ী প্রতিনিধির নিকট থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে থমকে আছে। বর্তমান মুহূর্তে সেভিয়েত এবং ভারত চুপ করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মনে করে অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক হওয়া উচিত। তিনি বলেছেন, পাকিস্তান যদি প্রত্যাশা করে তাহলে চীন তাদের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করবে। অন্যদিকে, এটাও প্রতীয়মান হয়েছে ভারত চাইলে সোভিয়েত তাদের পক্ষে ভেটো দেবে। মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্ট থেকে জানা যায়, ৩রা ডিসেম্বর হংকঙের চায়না ওয়াচার এই মর্মে রিপোর্ট দিয়েছে যে, চীনের মিডিয়াগুলো ১০ দিন ব্যাপকভাবে ভারতবিরোধী প্রচার চালিয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রতিবেদন, বর্ণনা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতকে সামরিক আক্রমণকারী '(armed aggression)' উস্কানীদাতা হিসেবে দোষারোপ করেছে। হঠাৎ করেই সোভিয়েত রাশিয়ার ভারত সংশ্লেষকে (ভারত-সোভিয়েত চুক্তি) তারা সরাসরি আক্রমণ করেছে। চীনা জনগণ সাধারণভাবে পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র প্রাথমিকভাবে ভারতকে সামরিক সাহায্য বন্ধ করে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়া জানিয়েছে। ভারতের পররাষ্ট্রসচিব কাউল এ ঘটনাকে স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করে বলেছে, যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা রয়েছে। তিনি বন্ধুসুলভভাবে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিংকে বলেছেন, ভারতকে কেউ এখন পর্যন্ত কোনো দেশই চাপ প্রয়োগ করেনি। তিনি কিটিংকে আরো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের এটা ভুলে যাওয়া ঠিক হবে না যে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্র একই ধরনের মূল্যবোধ এবং গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাস করে। তারপরও যুক্তরাষ্ট্র চীনকে বারবার প্ররোচিত করেছে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে। শেষ পর্যায় পর্যন্ত চীন দৃঢ়ভাবে পাকিস্তানের পক্ষে জাতিসংঘে কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেছে।

১৬. ভারতের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত: ধারাবাহিক প্রস্তুতি

অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে সমর্থনযোগ্য ছিল না। ভারত প্রথম থেকেই এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, আন্তর্জাতিক মৌলিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে কেউ সমর্থন দেবে না। এমতাবস্থায় ভারত সরকার মধ্য-মে মাসে প্যাকের সঙ্গে আলোচনা করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মূলত ৪টি বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সমর্থন দিতে হয় : ১. গেরিলা যুদ্ধ জোরদার করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাদের প্রশিক্ষণের জন্য সামরিক বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ প্রদান; ২. ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান;

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩. অবিলম্বে বিদেশে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশা বিশ্ব পরিসরে তুলে ধরা এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব জনমত গঠন; এবং ৪. সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ এবং তাঁর মুক্তি এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে উপমহাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির নিরসন। এর পূর্বেই ডি.পি. ধর ভারতের বিশেষজ্ঞদের নিকট একটি পজিশন-পেপার তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। পজিশন পেপার বিশ্লেষণে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে আস্থাশীল নয়। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা স্থাপন করতে সক্ষম হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানকে সমর্থন করবে। ভারত সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র এবং গণতান্ত্রিক দেশসমূহ এবং চীন ভারতকে বাধা দেবে না, কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে পাকিস্তানকে তারা সমর্থন যোগাবে। ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ বেধে গেলে পাকিস্তান তার মিত্ররা অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের ব্যবস্থা নেবে। মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সাহায্য প্রদান করবে। এমনকি জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেবে। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্র শক্তি ভারতের পক্ষে থাকবে। এসব বিষয় মাথায় রেখেই বিদেশে বাংলাদেশ পরিস্থিতি ও ভারতের অবস্থান ব্যাখ্যা করার জন্য প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। এমন কি, ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বব্যাপী ঝটিকা সফরে বের হন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর ভূমিকা কী হবে তা অজানা ছিল না। ইন্দিরা গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র সফর থেকে এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে, আলোচনার মাধ্যমে সকল সমঝোতার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাকে কঠিন সিদ্ধান্ত নিতে হবে। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম. এ. জি. ওসমানী ভারতের সামরিক কর্মকর্তাদের এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, শক্তিশালী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে সকল গেরিলা গ্রুপগুলো কাজ করছে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত তাদের আশা ক্রমশ অপসৃত হচ্ছে। সেজন্য তিনি যথাশীঘ্র ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[১৭০]

১৭. কূটনীতিক যুদ্ধের শেষ প্রান্ত

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সফর সমাপ্ত হবার পর যুক্তরাষ্ট্রের বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, ঐ জেদি, সাহসী ও অনমনীয় নারীর বাংলাদেশ সংকট নিরসনে যুদ্ধের মাধ্যমে হলেও ঝুঁকি নেবেন। সামরিক পথেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান করবেন।

যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলে স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপের সিদ্ধান্ত মোতাবেক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর নিকট এই মর্মে গোপন নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তারা যে কোনো আক্রমণের পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি গ্রহণ করে এবং বিশ্বজনমত তাঁদর পক্ষে আনার জন্য যেন কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। এ অবস্থাকে সামনে রেখে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ভারতের সীমান্তের চারদিকে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ প্রস্তুতির সিগন্যাল প্রদান করেন। ২২শে নভেম্বর থেকে প্রকৃতপক্ষে বয়রা সীমান্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংঘর্ষের মাধ্যমে পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ সূচনা হয়। এবং ২৮ থেকে ৩০শে নভেম্বরের মধ্যে মুজিবনগর সরকার বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য পূর্বের যে প্রস্তাবগুলো দিয়েছিল ইন্দিরা গান্ধী তা অনুমোদন করেন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ১লা ডিসেম্বর থেকে ৩রা ডিসেম্বর পর্যন্ত গৃহীত পরিকল্পনা কার্যকর করার জন্য ব্যস্ত থাকেন। ঐ সময় তিনি মুজিবনগর সরকারের প্রেসিডেন্ট এবং প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। ভারতীয় সামরিক কর্তৃপক্ষের অনীহা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ডি.পি. ধর সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করেন এবং বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর আগ্রহে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত ভারতের শীর্ষ সামরিক কমান্ডকে জয়েন্ট কমান্ড স্ট্রাকচারে এম.এ.জি. ওসমানীকে যৌথ মিত্র বাহিনীতে কাউন্টার-পার্ট হিসেবে জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ইন চিফ হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন। এই সমঝোতা ডিসেম্বরের ১ থেকে ৩ তারিখের ভেতরে সম্পন্ন হয়।[১৭১]

২রা ডিসেম্বর ওয়াশিংটন পোস্ট রিপোর্ট থেকে জানা যায় ভারতীয় বাহিনী এবং গেরিলা যোদ্ধারা একত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করেছে। সৈন্যবল এবং সরবরাহের অপ্রতুলতায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অবস্থান থেকে সরে গেছে। আরো লক্ষণীয় ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলারা বিভিন্ন এলাকা মুক্ত করে ফেলেছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বাংকারে ঠেলে দিয়েছে। অনেক শহরে, এমনকি ঢাকা থেকে ১৭ মাইলের ভেতরে গেরিলা যোদ্ধারা চলে এসেছে এবং বহু জায়গায় বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করেছে। ভারত তার নৌবাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর নাবিকদের যুক্ত করে পাকিস্তানি নৌপথকে ব্লক করে দিয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর গান্ধী যখন কলকাতায় বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন তখনই চিরকুট পেলেন ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ভারতের বিমান ঘাঁটি অমৃতশ্বর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, যোধপুর, আমবালা, আগ্রা, জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে। একই সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সোলায়মানকি, খেমকারান, পুঞ্চ এবং অন্যান্য সেক্টরে আক্রমণ চালায়। এ সম্পর্কে গান্ধীর মন্তব্য ছিলো– "The fool has done exactly what one had expected."[১৭২] এর পূর্বে ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "In ten days, I might not be here in Rawalpindi. I will be fighting a war."[১৭৩] ৩রা ডিসেম্বর থেকেই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়।

১৮. সমর কূটনীতি: ধারাবাহিক প্রস্তুতি

২৪শে এপ্রিল কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রাম এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন যে, ভারতীয় এলাকায় পাকিস্তানের কোনো সামরিক অভিযানই বরদাস্ত করবে না। পশ্চিমবঙ্গে বনগাঁর অনতিদূরে ভারতীয় সীমান্তে পাকিস্তানি গোলাবর্ষণের সংবাদ পেয়ে ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই হুশিয়ারি দেন। প্রসঙ্গত জগজীবন রাম বলেন, ভারতকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বক্ষণ সজাগ-সতর্ক এবং ভারতের মাটিতে যে কোনো আক্রমণ প্রতিহত করবার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। ভারত-তিব্বত সীমান্ত বাহিনীর সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিতে গিয়ে প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই কথাগুলো বলেন। তিনি 'ভারতের মাটিতে গোলা ফেলা বন্ধ কর নতুবা পরিণামের জন্য দায়ী হবে', পাকিস্তানের প্রতি সতর্কবাণী উচ্চারণ করেন। ভারতীয় সীমান্ত বনগাঁর কাছে সকালে পাকিস্তানি গোলা এসে পড়ে। তাছাড়া এক কোম্পানি পাকিস্তান ফৌজ সীমান্ত সীমার পাঁচ কিলোমিটার ভেতরে এসে, পেটরাপোলের রেল লাইনের কাছে অবস্থান নিয়ে, এক ঘন্টা ধরে ভারতীয় গ্রামগুলোর উপর গুলি চালায়। পরে তারা বেনাপোলে হটে যায়। নয়াদিল্লি থেকে এর বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়। দাবি করা হয়েছে যে, পাকিস্তানকে কথা দিতে হবে যে, এ ধরনের ব্যাপার আর ঘটবে না, আর না হলে সম্ভাব্য পরিণাম যা ঘটবে তার জন্য পাকিস্তানি দায়ী হবে। বহিঃবিষয়ক মন্ত্রণালয় পাক হাইকমিশনকে ওই ঘটনাগুলোর প্রতিবাদে যে নোট পাঠিয়েছে, তা রীতিমতো কড়া ধাঁচের। এ ছাড়া অন্য একটি নোটে পাকিস্তানকে জানানো হয়েছে যে, ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর লোকেরা কখনই পাকিস্তানে প্রবেশ করেননি। এ বিষয়ে পাকিস্তানের ১৪ই এপ্রিলের অভিযোগ একবারেই ভিত্তিহীন উল্লেখ করে ভারত পাকিস্তানকে দুটি নোট পাঠিয়েছে।[১৭৪]

ভারতের পার্লামেন্টের উভয় কক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম হতেই সামরিক হস্তক্ষেপের যে জোরালো দাবি উত্থাপিত হয় তা পার্লামেন্টে কার্য-বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যায়। ২৪শে মে, লোকসভায় পূর্বসীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর আক্রমণাত্মক তৎপরতা সম্পর্কে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। এক্ষেত্রে সদস্যদের দাবি ছিল এই ধরনের আক্রমণাত্মক ঘটনা আন্তর্জাতিক রীতি-নীতির বরখেলাপ এবং ভারতীয় সার্বভৌম সত্ত্বার অবমাননা। এ ব্যাপারে ভারত সরকার পাল্টা কী ব্যবস্থা নিয়েছে তার জবাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী শ্রীজগজীবন রামের মন্তব্য ছিল, পূর্ববাংলা বা বাংলাদেশে যা ঘটছে এই ঘটনাবলীকে এর বাইরে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক হবে না। বাংলাদেশের সাহসী জনগণ স্বাধীনতার জন্য লড়াই করছে। জনগণ ঐক্যবদ্ধভাবে তাঁদের সংকল্প বাস্তবায়নে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। ইস্ট পাকিস্তান রাইফেল, ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট এবং সংগ্রামী দেশপ্রেমিক জনগণ সশস্ত্র প্রতিরোধ গড়ে তুলেছে। তারা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করছে। সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্যরা যেভাবে আক্রমণ করেছে তার যথাযথ মোকাবেলা করা হবে। অটল বিহারী বাজপেয়ীর প্রশ্নের জবাবে প্রতিরক্ষামন্ত্রী সীমান্ত রক্ষী বাহিনীকে যে নির্দেশ দিয়েছেন তা পাঠ করে শোনান।[১৭৫]

পার্লামেন্টে কল এটেনশনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৭শে মে সীমান্তে পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক পূর্বাঞ্চলে শেল নিক্ষেপের প্রেক্ষিতে সরকারি পক্ষ থেকে স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানিরা গ্রাউন্ড রুলস্-এর কোনো তোয়াক্কা করছে না। কিন্তু ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী কোনো প্রকার দুর্বলতা দেখাবে না। সমর গুহ প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, গ্রাউন্ড রুল বলতে আমরা কী বুঝবো? শুধু কি একতরফাভাবেই ভারত গ্রাউন্ড রুলস্ মেনে চলবে? কেন সরকার পক্ষ থেকে দৃঢ় ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিমন্ত্রী তার জবাবে বলেন, পুনরায় যদি পরিস্থিতি এরূপ হয় তাহলে ভারতের পক্ষে পদ্ধতিগত বিষয় বাধা হবে না। পরিস্থিতি যাই হোক না কেন ভারত তা মোকাবেলা করবে।[১৭৬] ২১শে জুলাই পার্লামেন্টে জরুরি বিষয়ে কল এটেনশনে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান কর্তৃক ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার যে হুমকি দেন, সে সম্পর্কে আলোচনায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বিবৃতি এবং সদস্যদের প্রশ্ন এবং বক্তব্য নিয়ে পার্লামেন্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের সারমর্ম ছিল, কূটনৈতিকভাবে পাকিস্তান বিশ্বকে জানাতে চায় বাংলাদেশ সমস্যা বলে কিছু নেই এটি সম্পূর্ণ ভারত ও পাকিস্তানের সমস্যা। এ বিষয়ে সরকারের সুস্পষ্ট বক্তব্য হলো, বাংলাদেশের জনগণের উপর পাকিস্তান যে বর্বর আক্রমণ করেছে যার ফলে এই পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। পাকিস্তান সরকারকেই বাংলাদেশের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করে রাজনৈতিক সমঝোতায় আসতে হবে। যে পর্যন্ত পাকিস্তানের সরকার এটি না করবে সে পর্যন্ত মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ চালিয়ে যাবে এবং বাংলাদেশের মাটিকে মুক্ত করবে। মুক্তিবাহিনী আক্রমণকে অজুহাত হিসেবে ধরে পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে ভারত নিজেকে রক্ষা করার ক্ষমতা রাখে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বিশ্বকে বিভ্রান্ত করতে চায় এভাবে যে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের একটি অংশ দখল করে সে জায়গায় বাংলাদেশ সরকারকে পুনর্বাসিত করতে চায়।[১৭৭] পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তানের অংশ দখল করার কোনো ইচ্ছা ভারতের নেই। আলোচনায় জনৈক সদস্য (এন. জি. গোরে) পরিষ্কারভাবে ইয়াহিয়া খানের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "তিনি যুদ্ধ ঘোষণা করবেন এবং তিনি একা নন।" বাংলাদেশ থেকে অস্ত্রের মুখে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী পাঠানোর অর্থই হলো এক ধরনের সামাজিক আক্রমণ (civil invasion)। এর উপরে যদি পাকিস্তান সত্যি আক্রমণ করে বসে তাহলে ভারত কি ভূমিকা নেবে? পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ভারতের জাতীয় স্বার্থে এসব সূক্ষ্ম বিষয়ে পার্লামেন্টে খোলামেলা সবকিছু আলোচনা না করার জন্য আবেদন জানান।[১৭৮] ১৫ই নভেম্বর ভারত সীমান্তে পাকিস্তানের সৈন্য সমাবেশ সম্পর্কে প্রতিরক্ষামন্ত্রীকে কল এটেনশনের জবাবে বলতে হয়, পাকিস্তানের সামরিক জান্তা 'ক্র্যাশ ইন্ডিয়া', 'কনকার ইন্ডিয়া' এবং 'জিহাদের স্লোগান' পাকিস্তানের সর্বত্র ছড়িয়ে দিয়েছে। এর অর্থ হলো, ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার মানসিক প্রস্তুতি। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী উভয় সীমান্তে যুদ্ধের জন্য সমবেত হয়েছে। তাঁদের বিমান আকাশ সীমা লঙ্ঘন করেছে। এমতাবস্থায় ভারত সশস্ত্র বাহিনীকে উভয় সীমান্তে সতর্কতামূলকভাবে মোতায়েন করা হয়েছে। ভারত তার আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ চালিয়ে যেতে প্রস্তুত এবং শত্রুকে তাঁদের মাটিতে হটিয়ে দিতে সক্ষম। এই উত্তেজক পরিস্থিতির মূল জেনেসিস হলো, "বাংলাদেশ-পাকিস্তানের যুদ্ধকে পাকিস্তান সামরিক জান্তা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে রূপান্তরিত করতে চায়।"

মুক্তিবাহিনী প্রসঙ্গে তিনি সংসদকে জানান, বিপুল সংখ্যক প্রবাসী বাঙালি যারা ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে আছে তারা মুক্তিবাহিনীর জন্য নৌ, বিমান এবং যুদ্ধ সরঞ্জাম সরবরাহ করছে। এ সময় অটলবিহারী বাজপেয়ী পার্লামেন্টে পাল্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, শরণার্থী ঠেলে দেওয়া, আকাশসীমা লঙ্ঘন, প্রতিদিন গুলিবর্ষণ এগুলো যদি হামলা না হয় তাহলে হামলা কোনটি? তিনি আরো বলেন, আগে বলা হয়েছিল পাকিস্তান বিমান গুলি করে ফেলে দেওয়া হবে, এখন বলা হচ্ছে তাড়িয়ে দেয়া হবে। এ যাবৎ একটি বিমানও ফেলা হয়নি, যদিও পাকিস্তান ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করেছে।[১৭৯] ১৮ই নভেম্বর, পূর্ব সীমান্তে পাকিস্তানের সেনাবাহিনী কর্তৃক ভারতের প্রতি অব্যাহত শত্রুতামূলক কার্যকলাপের ফলে সৃষ্ট মারাত্মক পরিস্থিতির ওপর রাজ্যসভায় আলোচনা হয়। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী সংসদে সরকার পক্ষ থেকে পূর্বে যা বলা হয়েছে তারই পুনরুক্তি করে বলেন, সীমান্তে সশস্ত্র বাহিনীকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত অবস্থায় প্রেরণ করা হয়েছে, যেক্ষেত্রে তারা যেকোনো পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য তৈরি। সংসদকে আরো জানানো হয়, পাকিস্তানের হাই কমিশনে ৬৭জন কর্মমর্তা-কর্মচারী একটি বিদেশি বিমানে নয়াদিল্লি ত্যাগ করেছেন। সামরিক প্রস্তুতি সম্পর্কে আরো আলোচনা শুরু হলে প্রতিমন্ত্রী বিনয়ের সঙ্গে হাউসকে বলেন, বিস্তারিত বলা সমীচীন হবে না।[১৮০]

২৩শে নভেম্বর, লোকসভায় অটলবিহারী বাজপেয়ী দৃষ্টি আকর্ষণ প্রস্তাবে পাকিস্তান-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি এবং ভারত সীমান্তের ভেতরে পাকিস্তানি জঙ্গিবিমানের অনুপ্রবেশের ওপর আলোচনা শুরু করেন। বাজপেয়ীর বক্তব্যের মূল কথা ছিল প্রতিরক্ষা বিষয়ে কিংবা যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রী যদি সংসদে কথা বলতে না চান তাহলে বিবৃতি দিতে পারেন। কিন্তু এসব বিষয়ে সরকারের নিশ্চুপ থাকা সংসদের মর্যাদার সঙ্গে অনুকূল নয়। যেসব ঘটনা ঘটছে বা ঘটবে এ সম্পর্কে সংসদ সদস্যদের জানার অধিকার আছে। সংসদকে সামনে রেখেই কথা বলতে হবে, সদস্যদের সঙ্গে যোগাযোগ থাকতে হবে, সংবাদপত্রসমূহের সঙ্গে নয়। প্রতিরক্ষা প্রতিমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা বলেন, পাকিস্তান জাতিসংঘ এবং সর্বত্র বাংলাদেশ সংকটকে সামনে রেখে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হিসেবে বিশ্ব পরিসরে এটাকে চালিয়ে দেওয়ার জন্য কূটনৈতিক কৌশল গ্রহণ করেছে। সংসদে কারো এমন কথা বলা ঠিক হবে না, যেটা পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক প্রচারের উপাদান হয়ে পড়ে।[১৮১]

ভারতের সামরিক কূটনীতির একটি সুস্পষ্ট লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে আক্রমণকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত হওয়ার সুযোগ দেওয়া। সেজন্য দেখা যায় পাকিস্তান জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেও ভারত তা করেনি। কিংবা পাকিস্তান যেমন পেশোয়ার সীমান্ত এলাকায় নিস্প্রদীপ মহড়া দিয়েছে ভারত তা করেনি। কারণ ভারত এসব উল্লেখ করে বিশ্ব ফোরামে প্রমাণ করতে চেয়েছে কারা প্রথম যুদ্ধ প্রস্তুতি নিয়েছে। সে মোতাবেক আক্রমণ করেছে।

২৪শে নভেম্বর, লোকসভার অধিবেশনে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, পাকিস্তান জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে বিশ্ববাসীর মনোযোগ অন্যত্র সরিয়ে দিতে চাচ্ছে এবং প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সৃষ্ট কর্মের ভার ভারতের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে। বাংলাদেশে বর্ষা চলে গেছে। মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত আক্রমণ পাকিস্তানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামরিক জান্তার পরিকল্পনাকে হতবিহ্বল করে তুলেছে। সমগ্র জনগোষ্ঠীর সহায়তা নিয়ে বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছে, তাঁদের হটিয়ে দিচ্ছে এবং বিরাট অঞ্চল মুক্ত করেছে। পাকিস্তান ২১ ও ২২শে নভেম্বর পদাতিক বাহিনীর সঙ্গে ট্যাংক নামিয়েছে। যুদ্ধ বিমান দিয়ে ভারতের বিভিন্ন অবস্থানে আক্রমণ করেছে। তিনটি স্যাবর জেট ধ্বংস করেছে। দু'জন পাকিস্তানি পাইলট বন্দি হয়েছে। তারপরেও পাকিস্তানি আক্রমণের মুখে আমরা জরুরি অবস্থা ঘোষণা থেকে বিরত আছি। তবে পাকিস্তান অধিকতর আক্রমণ করে জাতীয় নিরাপত্তা ও সংহতির উপর আঘাত করে আমাদের বাধ্য না করলে জরুরি অবস্থা জারি থেকে বিরত থাকবো। পাকিস্তান সামরিক জান্তার উপলব্ধি করা উচিত শান্তির পথ হলো আলোচনা ও সমঝোতা। যা যুদ্ধের চেয়ে উত্তম এবং যা কোনোক্রমেই স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্রকে দমন করে রাখে না।[১৮২]

৪ঠা ডিসেম্বর, ভারতের ওপর পাকিস্তানের যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ায় রাজ্যসভায় প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম একটি বিবৃতি দেন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, দৃঢ়তা ও সংকল্প নিয়ে আমাদের আরোপিত যুদ্ধের মোকাবিলা করতে হবে। তিনি বলেন, আমরা শান্তির জন্য দাঁড়িয়েছি, কিন্তু শান্তিকে রক্ষা করতে হয়। আমাদের জাতীয় সম্মান, সংহতি, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, নিরাপত্তার জন্য যুদ্ধ করছি, যুদ্ধ করছি মুক্তি ও আদর্শকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী বলেন, মুক্তিবাহিনীর কার্যকর ক্রমাগত বিজয় অর্জনের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্যরা বেপোরোয়া হয়ে গেছে। মুক্তিবাহিনী যুদ্ধ করছে আদর্শ ও মূল্যবোধের জন্য, তাঁদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সেনাবাহিনী যুদ্ধ করতে তুলনামূলকভাবে অক্ষম। ভারতের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। সেনাবাহিনী যুদ্ধ করার সাহসের নেপথ্যে রয়েছে কৃষক, শ্রমিক, কারিগর এবং ব্যবসায়ীদের আত্মত্যাগের দৃষ্টান্ত। ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের সামাজিক দায়িত্ব হলো অধিক মুনাফা থেকে বিরত থাকা। শিল্পী, সাহিত্যিক, লেখক, ছাত্র এবং সমগ্র জাতি ভারতীয় আদর্শ, মর্যাদা এবং নৈতিকতা সমুন্নত রাখতে সচেষ্ট। প্রত্যেকের সম্মিলিত আত্মত্যাগ হলো আমাদের শক্তি। রাজ্যসভার এই অধিবেশনে বিরোধীদলের নেতা এম. এস. গুরুপাধ্যয় স্বামী বলেন, এখন ভুল ধরার সময় নয়, দ্বিধা নয়, বিরোধ নয়, এখন দেশকে আমরা কী দিতে পারি এই ভয়াবহ মুহূর্তে সেটি বড় কথা। এটা এমন এক যুদ্ধ, যে যুদ্ধে আমাদের লক্ষ্য অর্জিত হবে, উপমহাদেশে চিরদিনের মতো সকল সংঘর্ষের বিলুপ্ত হবে। আমি সরকারের সঙ্গে সম্পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করছি। আমি নিশ্চিত, সকল দল আজ সর্বসম্মতিক্রমভাবে এই সংকট থেকে মুক্তির লক্ষ্যে সরকারকে সাহায্য করবে। তবে তিনি সতর্ক করে দিয়ে বলেন, আর কোনো আপোষ নয়, আবার যেন আরেকটি তাসখন্দ না হয়।[১৮৩]

৪ঠা ডিসেম্বর, পাকিস্তান কর্তৃক ভারতের ওপর যুদ্ধের হুমকি এবং বাংলাদেশে মুক্তিবাহিনীর অব্যাহত সাফল্যে বিশ্ববাসীর দৃষ্টি অন্যদিকে সরানোর জন্যে এবং এই ভূখণ্ডে আন্তর্জাতিক শক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করে ভারতের নিরাপত্তা, অখণ্ডতা ও স্বাধীনতার

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী পার্লামেন্টে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তান সরকার ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। ৩রা ডিসেম্বর পশ্চিম পাকিস্তান এয়ারফোর্স ভারতের আকাশসীমা লঙ্ঘন করে ভারতের বহু বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে। পাকিস্তানের প্রচারমাধ্যম ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করেছে এগুলো যে প্রচার করছে তা সবৈব মিথ্যা। কলকাতা থেকে ফিরে আসার মুহূর্তে তিনি সংবাদটি পান। ফিরে এসে সহকর্মীদের সঙ্গে বিরোধীদলসমূহের সঙ্গে অবিলম্বে বৈঠক করা হয়। ভারতের সকলে একচিত্ত, জাতির স্বাধীনতা রক্ষার জন্য ঐক্যবদ্ধ এবং আক্রমণকারীকে তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য সকলে সর্বসম্মত। "আমি নিশ্চিত এই ধরনের সংহতির মনোভাব এই দুর্দিনে এবং সামনেও প্রতিফলিত হবে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে।"[১৮৪]

ক. সামরিক কূটনীতি নিয়ে বিতর্ক

কয়েকজন ব্যক্তি বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ বিতর্ক উপস্থাপন করেন। তন্মধ্যে দি ইনিস্টিটিউট অব ডিফেন্স স্টাডিস অ্যন্ড অ্যানালাইসিস এর ডাইরেক্টর কে. সুব্রামানিয়াম ছিলেন সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তি। ৩১শে মার্চ তিনি পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি নিয়ে কাউন্সিল অব ওয়ার্ল্ড অ্যাফেয়ার্স সেমিনারে ভারতের সমঝোতা নীতির সমালোচনা করেন। ৫ই এপ্রিলে *ন্যাশনাল হেরাল্ড* পত্রিকায় (যে পত্রিকা নেহেরু পরিবার ও ইন্দিরা গান্ধীর সমর্থক) একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন যেখানে তিনি লেখেন পূর্ব পাকিস্তানের সংকট ভারতের জন্য এমন এক সুযোগ নিয়ে এসেছে যা আর কখনো আসবে না।[১৮৫] তার এই বাক্যটি পাকিস্তান সরকার, পাকিস্তানের গণমাধ্যম এবং বুদ্ধিজীবীগণ প্রমাণ করার চেষ্টা করে যে, ভারত-পাকিস্তানে আক্রমণের জন্য সিদ্ধান্ত নিয়েছে, অথচ প্রকৃত ঘটনা হলো, তার মতে তিনি সরকার বা সরকারি কমকর্তাদের সঙ্গে কোনো আলোচনা না করেই এই প্রবন্ধটি লিখেছেন। পরবর্তীকালে তার এই ধরনের লেখা উক্ত পত্রিকায় ছাপাতে অস্বীকার করলে তিনি জনসংঘ সমর্থিত পত্রিকায় তার এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে থাকেন। এই সময় প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে এই ধরনের প্রবন্ধ প্রকাশ না করার বিষয়ে 'উপদেশ' দেওয়া হয়। পরবর্তীতে *লন্ডন টাইমস* বিশাল আকারে তার মতামত প্রকাশ করে।[১৮৬] এই থেকে প্রতীয়মান হয় যে, সুব্রামানিয়াম যে মতামত প্রকাশ করেছেন তা তার নিজস্ব এবং ভারত সরকারের মুখপাত্র হিসেবে তিনি কিছুই করেননি। ১৯৪৭-১৯৫০ সাল পর্যন্ত ভারতের গর্ভনর জেনারেল সি. রাজা গোপালাচারি এবং ভারতের সেনাবাহিনীর সাবেক প্রধান জেনালের কারিআপ্পা ও তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এম. করুনানিধি ভারত সরকারকে এই বলে পরামর্শ দেন যে, পূর্ব পাকিস্তানে অধিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা করা দরকার, তার অতিরিক্ত কিছু না। কতিপয় বুদ্ধিজীবীগোষ্ঠী এ কথা সরকারকে অবগত করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ভারতেও ছড়িয়ে পড়তে পারে। এমনকি পূর্ববাংলা এবং পশ্চিমবাংলা মিলে অখণ্ড বাংলার আন্দোলন শুরু হতে পারে। কতিপয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা একথাও মনে করতেন যে, পূর্ব পাকিস্তান পৃথক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলে তা হবে দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম রাষ্ট্র যা ভারতের জন্য সুখকর হবে না।

এসব বিষয় বিবেচনায় রেখে নয়াদিল্লিকে বাংলাদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়েছে। সিদ্ধান্তগ্রহণের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারকগণ মার্চ-এপ্রিলে সামরিক শক্তির বিষয়টি বিশ্লেষণ করে দেখেছেন সরাসরি পূর্ব পাকিস্তান দখল করার মতো পর্যাপ্ত লজিস্টিক সামরিক সরঞ্জামের অপ্রতুলতা রয়েছে; একই সাথে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও মিশ্র পরিবেশ বিরাজ করছে। তখন পর্যন্ত বিদেশে পাকিস্তান যথার্থভাবেই প্রচার করেছিল যে, পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং ভারতের মনোভাবও অনুরূপ ছিল। প্রথমদিকে ভারত বাংলাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতিকে জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি সমর সেন মহাসচিব বরাবর যে 'নোট' প্রদান করেন সেখানে বিষয়টি পাকিস্তানের 'ডমিস্টিক বিষয়' হিসেবে উল্লেখ করেন। এমনকি প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রীর নিকট ৩রা এপ্রিলের পূর্ব পর্যন্ত বিশেষ করে ২৭শে মার্চ যে বিবৃতি প্রদান করেন সেক্ষেত্রে বোধগম্য ধারণায় পূর্ব পাকিস্তানের সংকটকে পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' হিসেবে প্রতীতি জন্মেছে। বাংলাদেশের নেতা তাজউদ্দীন আহমদ ও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৪ঠা এপ্রিল সর্বভারতীয় কংগ্রেস কমিটির সভা পূর্ববঙ্গের ঘটনা পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' এই ধারণাটি প্রত্যাখ্যান করে।[১৮৭] বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রথম দিকে ভারতের সরাসরি আক্রমণ বা হস্তক্ষেপ আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশেষকরে ভারতের মিত্ররা পছন্দ করেনি।[১৮৮] সেজন্য প্রাথমিক পর্যায়ে ভারতের কূটনৈতিক ক্ষেত্রের কার্য-পরিধি ছিল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ, যার উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি এবং ভারতে আগত শরণার্থীদের ফেরত পাঠানো। মার্চ থেকে মে মাস পর্যন্ত ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা নয়াদিল্লির শর্তানুসারে পৃথিবীর রাষ্ট্রসমূহ যাতে অনুধাবন ও আগ্রহী হয়ে ওঠে সে ধরনের তৎপরতা চালানো হয়। কিন্তু জনপ্রতিনিধিদের ও সর্বস্তরের নাগরিক ও ব্যাপক ট্রাজেডি, গণহত্যা, লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের ভারতে আগমন ভারত সরকারের ধারণাকে উল্টে দেয়।

একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে সশস্ত্র প্রতিরোধে ভারতীয় জনগণের নিরবিচ্ছিন্ন আকাঙ্ক্ষা এবং গণ ঐক্যের প্রচণ্ড প্রবাহকে নয়াদিল্লির পক্ষে উপেক্ষা করা ছিল রাজনৈতিক দিক থেকে দুরূহ বিষয়। এছাড়া মধ্য-মে থেকে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ লক্ষ্য করে যে, পূর্ববঙ্গে সশস্ত্র গেরিলাদের কার্যক্রম নিবিড় ও ব্যাপকতা লাভ করেছে। সে লক্ষ্যে ভারত সরকার পূর্ববঙ্গের সশস্ত্র শক্তিকে সহযোগিতা ও উৎসাহ যোগায় এ কারণে যে, এর ফলে ইয়াহিয়া সরকারের সঙ্গে সমঝোতা অথবা দর-কষাকষিতে সহায়ক হবে। এ সময় নয়াদিল্লি মে মাসের শেষ প্রান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, প্রয়োজনে ভারতের সরাসরিভাবে হস্তক্ষেপের বাইরে মুক্তিবাহিনীকে জীইয়ে রাখা এবং তাদের শক্তিশালী করার মধ্যে বিকল্প সহায়ক শক্তি গড়ে উঠবে যা প্রয়োজনে কাজে লাগবে।

মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদান এবং প্রয়োজনে সামরিক হস্ত ক্ষেপের জন্য ভারত সরকারের ওপর বিভিন্ন মহলের দাবি ও চাপ অব্যাহত ছিল; তবুও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত-সরকার খুব সাবধানতার সাথে এসকল বিষয়ে সতর্ক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। যে কোনো প্রকার যুদ্ধের বিপক্ষে রাজনৈতিক সমঝোতা ও মানবিক সমস্যার বিষয়টি নিয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে তার কূটনৈতিক ভূমিকা জোরদার করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের ব্যাপারে ভারত কৌশলগত প্রস্তুতিমূলক নীতি গ্রহণ করে। প্রথমে শরণার্থী সমস্যাকে বিশ্বব্যাপী মানবিক সমস্যায় রূপান্তর এবং বাংলাদেশ সংকট উত্তরণে রাজনৈতিক সমঝোতাকে সামনে নিয়ে এসেছে। কিন্তু রণকৌশলগত দিক নির্দেশনা নীতি-নির্ধারকদের কাছে অস্পষ্ট ছিল না। যদি কেউ কেউ অভিমত প্রকাশ করেছেন শুরু থেকেই ভারত যুদ্ধের ব্যাপারে ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।[১৮৯] কথাটি সত্য হলেও প্রকাশ্যে ভারতের কূটনৈতিক ভাবভঙ্গি ছিল সামরিক নয়, রাজনৈতিক সমাধান। মানবিক ও রাজনৈতিক সমাধানের কথা কূটনৈতিক মহলে পুনঃপুন উচ্চারিত হলেও বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে ভারত কেবল কৌশলগত কারণে সময়ক্ষেপণ করছিল। কিন্তু ভেতরে ভেতরে সর্বাত্মক যুদ্ধের জন্য ভারত কূটনৈতিক ও সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ করেছে। অন্যপক্ষের মতে, ভারত সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার বিপক্ষে ছিল। তবে চেষ্টা হয়েছিল চাপ সৃষ্টি করে ১৯৭০ সালে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও শরণার্থীদের ফিরিয়ে নিতে পাকিস্তানকে বাধ্য করতে। ভারতের নীতি-নির্ধারকদের পলিসি ছিল ভারত যুদ্ধ চায় না, কিন্তু কীভাবে যুদ্ধ এড়িয়ে যাবে তা ভারতের জানা নেই।[১৯০] তবে ভারতের অভ্যন্তরীণ নীতি যাই থাকুক না কেন, বিভিন্ন মহলের চাপ সত্ত্বেও ভারত-সরকার প্রকাশ্যে সবসময় যুদ্ধের বিপক্ষে বক্তব্য রেখেছে। পাশাপাশি একথাও বলেছে যে, পাকিস্তান যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেয় তবে ভারত তার উপযুক্ত জবাব দেবে।

ভারতের সরাসরি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া সম্পর্কে ভারতের ডিফেন্স ইন্সস্টিটিউটের তৎকালীন পরিচালক ও প্রতিরক্ষা-বিষয়ক গবেষককে সুব্রামানিয়াম সাক্ষাৎকারে সে সময়ে তার নিজস্ব অবস্থান ও তৎপরতা বিষয়ে বলেন, "সে সময় আমি প্রায় একা ছিলাম... আমি বলেছি, আমি যুদ্ধ চাই না, আমি সবসময় সহিংসতার বিপক্ষে। কিন্তু এটি এড়ানো সম্ভব না। তখন একটা বিশ্বাস প্রচলিত ছিল যে, মুক্তিবাহিনী নিজেরাই যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারবে। আমি বলেছি, মুক্তিবাহিনী তাদের পক্ষে সম্ভব সবকিছুই করবে। কিন্তু তারা জয়লাভ করতে পারে না। এজন্য ভারতীয় বাহিনীকে এগিয়ে যেতে হবে। আমার এ ধরনের লেখালেখিকে ভারত সরকার কখনই অনুমোদন করেনি এবং এজন্যে আমাকে ধমক খেতে হয়েছে। কিন্তু, যা হোক, আমি বলেছি ভারত ও বাংলাদেশের মানবাধিকার রক্ষায় আমি যা সঠিক মনে করছি তা আমি বলে যাব।"[১৯১]

জনসংঘের নেতা অটলবিহারী বাজপেয়ী লোকসভায় ভারত সরকারের দুর্বল বাংলাদেশ নীতির সমালোচনা করে বলেন যে, পাকিস্তানের গণহত্যার ফলে ভারতে আগত শরণার্থী স্রোত অর্থনৈতিক বিপর্যয় সৃষ্টি করেছে। তার মতে শরণার্থীদের পেছনে যে-ব্যয় হচ্ছে তা যুদ্ধের চেয়ে কম নয়। বাংলাদেশের সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান সরকারের 'পবিত্র ইচ্ছার' বেশি কিছু নয়। বাজপেয়ী বলেন, শরণার্থী সমস্যার শুরু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেই কেবল যুদ্ধের মাধ্যমেই এই সমস্যার সমাধান নিহিত রয়েছে এই বলে ক্রমাগত যুদ্ধের উস্কানি দিয়েছে জনসংঘ। একই সুরে কথা বলেছে ভারতের স্বতন্ত্র দল।[১৯২]

মুক্তিযুদ্ধকালে ভারত-সরকারের বিভিন্ন বক্তব্য ও বিবৃতিতেও তাদের সতর্ক মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে। ২০শে জুন জলাঙ্গরে সেনাবাহিনীর অফিসার ও জোয়ানদের উদ্দেশ্যে এক ভাষণে প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম বলেন, পাকিস্তান পূর্বাঞ্চলে ভারতের সীমান্ত লঙ্ঘন করেছে। "আমরা শান্তিকামী, যুদ্ধ চাই না। কিন্তু আমাদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়ার মতো পরিস্থিতি পাকিস্তানই তৈরি করছে।"[১৯৩]

১৭ই অক্টোবর প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রাম পাকিস্তানকে সতর্ক করে দিয়ে বলেন যে, 'ভারতের ওপর যদি যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হয়, তাহলে যা ঘটুক না কেন, ভারতীয় সৈন্যবাহিনী পাকিস্তানের যে অঞ্চল দখল করবে সেখান থেকে তারা সরে আসবে না। আমরা সেখান থেকে সৈন্যবাহিনী অপসারণ করব না। রাম আরো উল্লেখ করেন, ভারতের আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে পাকিস্তানের যেকোনো দুরভিসন্ধির উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য বর্তমান প্রস্তুতি অব্যাহত থাকবে।[১৯৪] প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের এই বক্তব্য হেনরি কিসিঞ্জার ও যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের নীতি নির্ধারকগণ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করে। মার্কিন গোপন নথিতে বিষয়টি নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়। নিক্সন-কিসিঞ্জার একমত হন যে, ভারত পাকিস্তানের পশ্চিম অংশের বিরাট এলাকা ও কাশ্মীর দখল করে নেবে। যুক্তরাষ্ট্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যেভাবে হোক ভারতকে এই সর্বনাশা পদক্ষেপ থেকে বিরত থাকতে হবে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মাধ্যমে ভারতের উপর প্রচন্ড চাপ সৃষ্টি করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র এরূপ হলে বিশ্বযুদ্ধের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত বলে সিদ্ধান্ত নেয়।

২১শে অক্টোবর নয়াদিল্লিতে প্রতিরক্ষা উৎপাদন দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বিদ্যাচরণ শুক্লা বলেন, ভারতের সমর প্রস্তুতি পুরোদমে চলছে এবং সামরিক বাহিনী সম্পূর্ণ সজাগ। আমরা আক্রান্ত হলে পাকিস্তানকে পাল্টা আঘাত হানতে দুই মিনিটের বেশি সময় লাগবে না।[১৯৫]

২৫শে অক্টোবর প্রতিরক্ষামন্ত্রী জনজীবন রাম ন্যাশনাল ডিফেন্স কলেজে বক্তৃতাকালে বলেন যে, ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন কোনো ব্যবস্থা নেবে না, যাকে আক্রমণাত্মক কাজ বলা যেতে পারে। কিন্তু ভারতের বিরুদ্ধে যে-কোনো আক্রমণ পূর্ণ শক্তি দিয়ে প্রতিহত করা হবে। তিনি বলেন, ভারত আক্রান্ত হলে, সরকার শুধু সীমান্তরক্ষার ব্যবস্থা করেই তুষ্ট হবে না; শত্রুকে তাদের এলাকাতেই হটিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। ভারতের মাটিতে নয়, লড়াই যাতে শত্রুভূমিতেই হয়–ভারত সেই ব্যবস্থা করবে। তিনি আরো বলেন, সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য আন্তর্জাতিক চাপ দেওয়া হলে ভারত দাবি জানাবে যে, এক কোটি শরণার্থীকে বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার দায়িত্ব ওইসব রাষ্ট্রকে নিতে হবে। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ থেকে ভারতে শরণার্থী আগমন অবিলম্বে বন্ধ করতে হবে এবং ভারত থেকে শরণার্থীদের বাংলাদেশে ফেরার কাজও শুরু করতে হবে। সেই অবস্থায় সৈন্য প্রত্যাহারের কথা ভারত বিবেচনা করবে।[১৯৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একাত্তর সালে পূর্ব পাকিস্তানের সংকট বিষয়ক স্পেশাল ব্যুরোর ডাইরেক্টর জে. এন. দীক্ষিত এক সাক্ষাৎকারে সে সময়কার ভারতীয় নীতি-নির্ধারকদের ভাবনা সম্পর্কে বলেছেন, ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সরদার শরণ সিং ক্যাবিনেটে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে সতর্ক করেছিলেন যে, বাংলাদেশকে সরাসরি সমর্থন করা ও পাকিস্তানকে আক্রমণ করা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কারো জন্যই ভালো হবে না। সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, ১৯৭১ সালের মার্চ থেকে আগস্টের শেষ অবধি ভারতের নীতি ছিল প্রধানত দুটি : প্রথমত, ভারত হতে শরণার্থীদের নিরাপদে ও সসম্মানে দেশে ফেরার ব্যবস্থা করা, এবং দ্বিতীয়ত, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মাধ্যমে পাকিস্তানের সামরিক সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করে ১৯৭০ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে মেনে নিয়ে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যবস্থা করা। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধে ভারত মুক্তিযোদ্ধাদের প্রধানত লজিস্টিক সাহায্য দিচ্ছিল। একটি মত অনুযায়ী ভারতের সরাসরি যুদ্ধে জড়ানোর কোনো পরিকল্পনা আগস্ট পর্যন্ত ছিল না, যতোক্ষণ পর্যন্ত না সরকার পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারে যে, রাজনৈতিক সমাধানের পথ ব্যর্থ হয়েছে। ইয়াহিয়া সরকারের শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদানের কোনো পরিকল্পনা নেই, উপরন্তু, শেখ মুজিবকে হত্যা করার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এ বিষয়ে অন্য মতটি হল, ভারত প্রথম থেকেই নিশ্চিত ছিল বাংলাদেশকে সামরিক আক্রমণে সহায়তা করবে এবং প্রয়োজনে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হবে, শুধু কূটনৈতিক প্রচারণার মাধ্যমে বিশ্বজনমত গঠন ও সর্বাত্মক সামরিক প্রস্তুতি গড়ে তোলার জন্য সময় নিচ্ছিলো। পরিপূর্ণভাবে প্রস্তুত হবার জন্য এবং বিশেষত ভারত অপেক্ষায় ছিল শীতকালের জন্য। কেননা পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধে যাওয়া মানেই হলো ভারতকে প্রধানত দুই সীমান্তে অর্থাৎ চীনের সাথে যুদ্ধে জড়ানো, বিশেষত চীনের পাকিস্তানকে সাহায্যে এগিয়ে আসার বিষয়টিও পরিকল্পনায় রাখতে হয়। চীনের যুদ্ধে জড়ানো মানেই ভারতকে উত্তর-পূর্ব সীমান্তে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে এই যুদ্ধ যদি শীতকাল পর্যন্ত ঠেকিয়ে রাখা যায়, তাহলে চীনের পক্ষে শিয়াচিং পর্বতমালা (Glacier) পার হয়ে ভারত আক্রমণ করা কঠিন বিষয় হবে।[১৯৭] ভারত কূটনৈতিক কৌশলের মাধ্যমে সেই সময়টি পর্যন্ত দৌড়ঝাপ করেছিল।

ভারতের প্রতিরক্ষা সচিব কে. বি. লাল যুদ্ধে জড়িয়ে যাওয়ার ব্যাপারে চীন কতোটা প্রভাব ফেলেছিল সে বিষয়ে সাক্ষাৎকারে বলেন, গোয়েন্দা রিপোর্ট অনুযায়ী, পাকিস্তান ভরসায় ছিল চীন তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসবে। ভারতও ঠিক নিশ্চিত ছিল না যে চীন হস্তক্ষেপ করবে কিনা। কাজেই ভারত কিছুটা স্বস্তি বোধ করে, যখন নভেম্বর পর্যন্ত কোনো সংঘর্ষ বাধেনি। রাশিয়ার ভূমিকা সম্পর্কে কে.বি. লাল বলেন যে, "ভারত এতোটা বোকা ছিল না যে, বিশ্বাস করে বসে থাকবে যে, রাশিয়া এগিয়ে এসে ভারতকে রক্ষা করবে বা পাকিস্তানকে আক্রমণ করবে অথবা চীনের উপর প্রভাব খাটাবে। ভারত এটিও বিশ্বাস করিনি, যেমন পূর্ব পাকিস্তানিরা বিশ্বাস করেছিল যে চীন হস্তক্ষেপ করবে। তবে চীন আক্রমণ করবে না–এই ধারণার উপর ভিত্তি করে ভারত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তুতি নেয়নি বা ভীত ছিল। ভারত যৌক্তিকভাবে নিশ্চিত ছিল যে, রাশিয়া, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্র তাদের কাজ এবং সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জানে। তারা তাদের সৈন্য নিয়ে ভারত বা পাকিস্তানের হয়ে যুদ্ধ করতে আসবে না"।[১৯৮]

ভারতীয় কূটনীতিক এবং তৎকালে পোল্যান্ডে ভারতের অ্যামবাসেডর নটবর সিংও চীনের ভূমিকা নিয়ে একই ধরনের মন্তব্য করেন। 'চীন নিষ্ক্রিয় বসে থাকবে না' বলে কিসিঞ্জারের হুমকি সম্পর্কে সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, "আমি মনে করি, সে সময় চীন প্রয়োজনীয় চেঁচামেচি করেছে, কিন্তু তারা সরাসরি জড়িত হয়নি এবং সব কিছুই খুব দ্রুত হয়েছিল।"[১৯৯]

কয়েকটি বিশেষ কারণে এই সময় গান্ধী যুদ্ধের দিকে এগিয়ে যেতে আগ্রহ বোধ করেছিলেন। যেমন, ক্রমবর্ধমান শরণার্থী সমস্যা, রাজনৈতিক সমাধান-সংক্রান্ত পদক্ষেপের অনিশ্চয়তা, রুশ-ভারত চুক্তির ফলে ভারতের নতুন আত্মবিশ্বাস এবং চীনের পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের আশঙ্কা নিরসন ইত্যাদি। তবে ৩রা ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধ পাকিস্তানি আক্রমণের ফলেই ত্বরান্বিত হয়েছিল। ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান বিমানবাহিনী ভারতের উত্তর ও পশ্চিম বিমানঘাঁটি আক্রমণ করে। ফলে ভারত যুদ্ধের অজুহাত পেয়ে যায়। অবশ্য এটা তখন অবধারিত পরিণতি এবং ঘটনা ছিল।[২০০]

খ. পাকিস্তানকে অস্ত্র প্রেরণে প্রতিবন্ধকতা: কূটনৈতিক তৎপরতা: ভারতীয় সমর কূটনীতির একটি বিরাট উদ্যোগ ছিল পাকিস্তান যেন পরাশক্তি বা বৃহৎ শক্তিবর্গের উপর নিকট থেকে ঢালাওভাবে অস্ত্র সংগ্রহ না করতে পারে। এভাবে রূপ দেবার চেষ্টা করা হয়েছে 'একটি গুলি দেবার অর্থই হলো একজন নিরীহ মানুষের মৃত্যু নিশ্চিত করা।' এ মনোভাব বিশ্ববিবেককে জাগ্রত করেছে। পাকিস্তান যাতে অস্ত্র না পায় তার জন্য দেশে দেশে মিটিং, মিছিল অব্যাহত ছিল।[২০১]

১লা জুন, পাকিস্তান সামরিক জান্তা সৃষ্ট বাংলাদেশের সংকটময় পরিস্থিতিতে পাকিস্তানকে অস্ত্র সরবরাহ থেকে বিরত থাকার জন্য যুক্তরাজ্যকে ভারত অনুরোধ করলে যুক্তরাজ্য তা প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে, বাণিজ্যিক কারণে তারা শুধু হালকা অস্ত্র দিচ্ছে। একই সঙ্গে পূর্বের অন্যান্য অর্ডার সরবরাহে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করে। এর-উপর পররাষ্ট্রমন্ত্রীর একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়।[২০২] ২৪শে জুন, মার্চে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে জাহাজ বোঝাই অস্ত্র-প্রেরণ সম্পর্কে পররাষ্ট্রমন্ত্রী জগজীবন রামের বিবৃতির ওপর লোকসভায় আলোচনা হয়।[২০৩] ঐদিন রাজ্যসভার কার্যবিবরণীতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে সম্প্রতি অস্ত্র সরবরাহের রিপোর্টের ওপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।[২০৪] ১২ই জুলাই, যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানকে সাড়ে তিনকোটি ডলার মূল্যের অস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে লোকসভায় আলোচনা হয়। সেখানে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র শরণার্থীদের জন্য ভারতের কাছে সাহায্য দিচ্ছে আর পাকিস্তানকে দিচ্ছে অস্ত্র। এক আমেরিকার দুই রূপ![২০৫] ১৯শে জুলাই, পাকিস্তান মার্কিন অস্ত্রের অব্যাহত সরবরাহ এবং তা ফলশ্রুতিতে পূর্ব পাকিস্তানে সংগঠিত ঘটনার ভয়াবহতা বৃদ্ধি এবং ভারতের ওপর তার প্রভাব নিয়ে রাজ্যসভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়।[২০৬]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু বিশ্ব জনমত ও মার্কিনী জনগণের চাবা ও প্রতিরোধে অস্ত্রবোঝাই জাহাজগুলো আটকে দেয়। মার্কিন সরকার মার্চ মাসেই অস্ত্র সরবরাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে।

১৯. কূটনীতির মূলনীতি থেকে সরে আসা না আসা

প্রথমত, কতিপয় ইস্যু নিয়ে ভারতকে কূটনৈতিক বৈপরীত্যের সম্মুখীন হতে হয়, যা কূটনৈতিকভাবে ভারতকে মোকাবিলা করতে হয়। উপমহাদেশের ঘটনাবলি বিশেষ করে বাংলাদেশ সংকট, গণহত্যা, বর্বর নির্যাতন, হত্যাকাণ্ডের বিষয়গুলি আন্তর্জাতিককরণ করতে গিয়ে ভারত উপলব্ধি করে যে, মূল বাংলাদেশ নিয়ে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক তৎপরতায় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হচ্ছে। বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ সর্বদাই মনে করছে বাংলাদেশ সংকট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বর্বর, নির্মম আক্রমণ ও নির্যাতনের মাধ্যমে অগণিত শরণার্থীদের ভারতে ঠেলে দেওয়াকে ভারত 'অপ্রত্যক্ষ আক্রমণ' (Indirect aggression) হিসেবে উল্লেখ করে। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বিষয়টি স্পষ্ট করে বলেন, এটা সাধারণভাবে কোনো গৃহযুদ্ধ নয় বরং এটা হলো গণতান্ত্রিক আদর্শে বিশ্বাসী নাগরিক যারা ভোট দিয়েছিল তাদেরকে গণহত্যার লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। ভারত মনে করে এটা নতুন ধরনের আক্রমণ যা ভারতের উপর অবর্ণনীয় অর্থনৈতিক বোঝা চাপিয়ে দিয়েছে। রাজনৈতিক, সামরিক এবং সামাজিক উদ্বেগ সৃষ্টি করে নিরাপত্তার প্রতি হুমকির দিকে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। সেজন্য এটা শুধু অভ্যন্তরীণ বিষয় হতে পারে না।[২০৭] ভারত বাংলাদেশ সংকটকে পাকিস্তানের নিজস্ব সংকট হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, গণতন্ত্রকে নস্যাৎ করাই হলো এর মূল কারণ।

দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান উভয় দেশের সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন, ভারত-পাকিস্তান দ্বিপাক্ষিক আলোচনা এবং সেনাবাহিনী প্রত্যাহার ইত্যাদি প্রস্তাব এনেছে আপতদৃষ্টিতে বিশ্বের কাছে তা সুগ্রাহ্য বলে মনে হতে পারে। কিন্তু ভারতের কূটনৈতিক কৌশল বিশ্লেষণে পরিলক্ষিত হয়েছে এগুলোকে মূল সমস্যা থেকে ভিন্ন দিকে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়ার জন্য এই প্রস্তাবগুলো উপস্থাপন করেছে বলে চিহ্নিত করেছে। ভারতের কূটনৈতিক কৌশল হলো তারা সবসময় অস্বীকার করেছে যে, এটা পাকিস্তান-ভারতের সমস্যা নয়।। ভারতের কূটনৈতিক কৌশল ছিল ভারতের সঙ্গে নয়, বাংলাদেশের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান কিংবা তার মনোনীত নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গেই কেবল পাকিস্তান কথা বলতে পারে।

তৃতীয়ত, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারত মূলনীতি থেকে সরে আসেনি। জোট নিরপেক্ষতার অর্থই হলো চুপ করে থাকা নয় বা সমস্যা উপেক্ষা বা পাশ কাটিয়ে যাওয়া নয়। এর অর্থ হলো কোনো সামরিক ব্লকের প্রভাবে নয় বরং সকল আন্তর্জাতিক সমস্যা ন্যায়সঙ্গত বিচারে পরিমাপ করা হয়। সেটা আমেরিকা বা সোভিয়েত ইউনিয়ন কিংবা যে কেউ হোক না কেন। জোটনিরপেক্ষতার অর্থ হলো অন্যায়কে মেনে নেওয়া নয় বরং ন্যায়ের পক্ষে থাকা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন, উভয় সীমান্তে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ভারতের কৌশলগত ধারণা ছিল জাতিসংঘ সীমান্তে পর্যবেক্ষক নিয়োগের নেপথ্যে ভারতীয় সৈন্যের অবস্থান, চলাফেরা, মুক্তিবাহিনীর প্রশিক্ষণ ও অপারেশন, অস্ত্র সরবরাহ ইত্যাদির উপর নজরদারি করতে পারে। সেজন্য ভারত সরকার শরণার্থী শিবিরে সকল বিদেশি বেসরকারি সংস্থাসমূহকে প্রত্যাহার করার আদেশ জারি করেন। পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের মনোভাব ছিল ইতিবাচক। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বেশ শক্ত অথচ বিনয়ী ভাষায় জাতিসংঘের মহাসচিবকে লেখেন, "There is what must be kept in mind instead of the present attempt and to convert it into an *Indo-Pakistani dispute* can only aggravate tensions." U Thant was urged to focus his attention on a political settlement in "East Bengal which meets the declared wishes of the people."[২০৮]

২০. সামরিক কূটনীতির পূর্বাপর

পঞ্চাশ দশকে কমিউনিজম ঠেকাতে পাকিস্তান মার্কিন সামরিক জোট সিয়াটো ও সেন্টোর সঙ্গে যুক্ত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং চীন পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত বলে দূরে ঠেলে রাখে। পক্ষান্তরে, জোটনিরপেক্ষ নীতির কারণে ভারত কমিউনিস্ট ও পাশ্চাত্যের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। ১৯৬২ সালে চীন-ভারতের যুদ্ধের পর পাকিস্তান চীনের কাছাকাছি চলে আসে। এরপর পরই ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় চীন পাকিস্তানকে সমর্থন করে যদিও পাকিস্তান ছিল কমিউনিস্ট বিরোধী রাষ্ট্র। এই যুদ্ধের ফলে সোভিয়েত রাশিয়াকে উভয় দেশের মধ্যে অনুঘটকের সুযোগ এনে দেয় এবং এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধ বন্ধে সোভিয়েতের ভূমিকাকে অপ্রকাশ্য সমর্থন প্রদান করে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী লালবাহাদুর শাস্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মধ্যে তাসখন্দে একটি বৈঠকে মিলিত হতে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি উভয় দেশের মাঝে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনে কোসিগিন দক্ষতার সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে বুঝাতে সক্ষম হন যে, কয়েকটি বিষয়ে ভারতকে ছাড় দিতে হবে। যেমন যুদ্ধের সময় ভারতের সেনাবাহিনী কাশ্মীরে হাজী পীর পাস যা ভারত দখল করেছিল তা ছেড়ে দেয়। তাসখন্দ চুক্তির ফলে সোভিয়েত রাশিয়া ভারত উপমহাদেশে এবং একইসাথে দক্ষিণ এশিয়ায় একটি শক্তিশালী ফ্যাক্টর হিসেবে বিবেচিত হতে থাকে। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানকে অস্ত্র দেওয়া শুরু করে যার ফলে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রভাব অনেক হ্রাস পায়। ভারত এসময় এই বলে সতর্ক প্রতিবাদ জানায় যে, যে সমস্ত অস্ত্র পাকিস্তানকে দেওয়া হচ্ছে যার ফলে পাকিস্তান নতুন করে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে উৎসাহিত হবে। একইসাথে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত দক্ষ কূটনৈতিক হিসেবে একথা ঘোষণা করে যে, এর ফলে রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের নীতিগত অবস্থানের পরিবর্তন হবে না। যেকোনো দেশের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্য দেশের সহযোগিতা করার স্বাধীনতা রয়েছে। এ বিষয়ে তাদের হস্তক্ষেপ করার কিছু নেই।

ইতোমধ্যে চীন এবং রাশিয়ার ভিতরে সিনকিয়াং অঞ্চল ও অন্যান্য বিষয়ে মতপার্থক্য প্রকাশ্যে চলে আসে এবং এসময়ও দু'দেশ থেকে পাকিস্তান সামরিক সাহায্য পেতে থাকে। এছাড়া সামরিক চুক্তির শর্তানুযায়ী, পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে অস্ত্র পেতে থাকে। এসময় সামরিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত পিছিয়ে পড়ে। এই অবস্থায় সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের প্রতি যে উষ্ণ মনোভাব ছিল তা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং সামরিক সরঞ্জাম প্রেরণ কমে আসে। ফলে পাকিস্তান পুনরায় চীনের দিকে জোরেশোরে ঝুঁকে পড়ে।

১৯৬৯ সালের জানুয়ারি মাসে নিক্সন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে কতিপয় বিরাজমান অবস্থা তার সামনে চলে আসে। প্রথমত, ভিয়েতনাম থেকে মার্কিন সৈন্য অপসারণ। এক্ষেত্রে তার কাছে দু'টো পথ খোলা ছিল। সেটা হলো সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মিলে চীনকে বাগে আনা, অপরটি হলো সরাসরি চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করা। মস্কো প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি আলোচনায় ভিয়েতকং-এর পক্ষে ভূমিকা নেয় এবং নর্থ ভিয়েতনামে সমুদ্র পথে সামরিক সাহায্য পাঠাতে থাকে যে কারণে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাশিয়ার উপর অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। নিক্সনের কাছে প্রতীয়মান হয় মস্কো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্র প্রভাব হ্রাসের একটি বৃত্ত রচনা করছে। এই লক্ষ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ষাট দশকে নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারত মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগর অঞ্চলে এমনকি মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত নৌ-শক্তি বৃদ্ধি করে। মিসরের সুয়েজ খালকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত যুদ্ধে সোভিয়েত নৌ-শক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে এর অর্থ হলো ভিয়েতনাম সমস্যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে না। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র মনে করে চীনের সঙ্গে তার সম্পর্ক পুনঃস্থাপন করা যথাপোযুক্ত। সেজন্য নিক্সন প্রেসিডেন্ট হয়েই ১৯৬৯ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিল মিটিং-এ চীন নীতি ঘোষণা করেন।[২০৯]

পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নিক্সনের নয়া নীতি চীনের জন্য অনুকূল বলে বিবেচিত হয়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের 'বিশৃঙ্খলা' তখন শেষ হয়েছে এবং অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসছে। সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাঁচ হাজার মাইল সীমান্ত নিয়ে চীন হুমকির সম্মুখীন ছিল এবং জাপান তাইওয়ানের সঙ্গে সম্পর্ক জোরদার করেছিল। এই মুহূর্তে চীনের একঘরে হওয়া থেকে নিষ্কৃতির জন্য জাতিসংঘের সদস্য পদ লাভ এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন জরুরি বলে বিবেচিত হয়। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে নিক্সনের প্রতিনিধির কাছে চীনের প্রধানমন্ত্রী চীন-যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্ক বিষয়টি খতিয়ে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করেন।[২১০] কয়েকদিন আগে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক ক্র্যাকডাউনের পর পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার প্রতি সমর্থন ও ভারতের হুমকির বিরুদ্ধে পিকিং পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রকাশ্যে সমর্থন দান করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এর ফলে পাকিস্তান ভারতবিরোধী ভূমিকা জোরদার করে।

হেনরি কিসিঞ্জার ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে গোপনে পাকিস্তান হয়ে পিকিং গমন করেন এবং সে পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট নিক্সন চূড়ান্তভাবে চীনের প্রেসিডেন্ট মাও এবং প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর সঙ্গে সাক্ষাতের ঘোষণা দেন। এই ঘোষণা এমন সময় আসে যখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ চলছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগে লিপ্ত এবং যখন অগণিত মানুষ প্রাণভয়ে ভারতে আশ্রয়ের জন্য ছুটে চলেছে। এসময় নিক্সনের সিদ্ধান্ত এমনটি ছিল যে, চীনের সঙ্গে আতাঁত করার জন্য পাকিস্তানের মধ্যস্থতা তার অপরিহার্য। চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের মাধ্যমে ভিয়েতনাম থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি বিশেষভাবে গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে উপমহাদেশে সংকট সম্পর্কে তিনি অতটা উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। এ কারণে বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর গণতান্ত্রিক দেশের নেতা হিসেবে নিক্সন একটি ক্ষুদ্র মিলিটারি ডিক্টেটরের সঙ্গে হাত মেলাতে দ্বিধা করেননি এবং তাঁর ঘোষিত কর্মসূচি বাস্তবায়নে নিক্সন ছিলেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

নিক্সনের নয়া চীন নীতি রাশিয়াকে বিস্মিত করে। এসময় রাশিয়া ভারত ও পাকিস্তানকে সামরিক, অর্থনৈতিক, কারিগরি সহায়তা দিয়ে আসছিল। এই অবস্থায় ভারত পাকিস্তানের সামরিক জান্তা কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণের ঘটনায় বেকায়দায় পড়ে যায়। বিশ্ব সম্প্রদায় বাংলাদেশ সংকট উপলব্ধি করতে আগ্রহী ছিল না। ওয়াশিংটন বাংলাদেশ সমস্যা সম্পর্কে অনিচ্ছুক এবং ইয়াহিয়া খানকে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক সমাধানে এগিয়ে আসতে চাপ সৃষ্টি করেনি। জুলাই মাসে পিকিং থেকে কিসিঞ্জার ফিরে এসে তার সফরকে 'কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ' হিসেবে উল্লেখ করলে[২১১] ভারতকে নতুন করে সমগ্র কূটনৈতিক পরিস্থিতি মূল্যায়ন করতে হয়। ভারত একথা উপলব্ধি করে যে, যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসবে না। অন্যদিকে, পাকিস্তান পিকিং এবং ওয়াশিংটনের সাহায্য পেয়ে বাংলাদেশের সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানে না এসে সামরিক সমাধানের দিকে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে। ভারত অবশ্য প্রাথমিকভাবে যুদ্ধ চায়নি, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি ছিল না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী দৃঢ়তার সঙ্গে বাংলাদেশ-সংকটে রাজনৈতিক সমাধান ও শরণার্থী সমস্যা সমাধান চেয়েছেন যাতে তারা সম্মান ও নিরাপত্তা নিয়ে স্বদেশে ফিরে যেতে পারে।

কূটনৈতিক বিচ্ছিন্নতার মধ্যে যদি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় তাহলে ভারতকে অবশ্যই বৈশ্বিক অবস্থানগত দুর্বলতা নিয়ে মোকাবিলা করতে হতো। এ দুঃসময়ের প্রয়োজন হলো শক্ত সমর্থকের। এসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের বিরুদ্ধে যে নিরাপত্তা-বেষ্টনী গড়ে তোলার প্রচেষ্টায় লিপ্ত ছিল পাকিস্তান তার বিপরীতে অবস্থান নেয়। নিক্সনের নয়া চীন নীতি এবং পাকিস্তানের কার্যকর সহযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়নকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন করে ভাবিত করে। এর ফলশ্রুতিতে ১৯৭১ সালের ৯ই আগস্ট সোভিয়েত-ভারত শান্তি, মৈত্রী এবং বন্ধুত্ব চুক্তি স্বাক্ষর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে। দু'দেশের প্রয়োজনে চুক্তিটি ছিল অপরিহার্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের নিকট কূটনৈতিক ক্ষেত্রে চুক্তিটি ছিল চীন-আমেরিকার বিরুদ্ধে এবং ভারতের কাছে ছিল পাকিস্তান এবং চীনের আগ্রাসন হতে নিরাপত্তা। এই চুক্তির ফলে এতোদিন যে রাজনৈতিক সমাধানের কথা বলা হচ্ছিল তার একটি ভিত্তি রচিত হয়। এর ফলে পাকিস্তানের উপরে চাপ সৃষ্টি হয়। কিন্তু ইয়াহিয়া খান রাজনীতিবিদ ছিলেন না অথবা বাস্তব অবস্থার অনুধাবন করতে অক্ষম ছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন একজন সৈনিক মাত্র। যেখানে এতদিন ভারত বিচ্ছিন্নকরণ অবস্থায় ছিলেন এই চুক্তির ফলে পাকিস্তান বিচ্ছিন্নকরণের মুখোমুখি দাঁড়ায়, যদিও ইয়াহিয়া খান ভাবছিলেন তিনি যুক্তরাষ্ট্র, মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলো এবং চীন থেকে বন্ধুর মতো উদার সাহায্য সহযোগিতা পাবেন।

১৮ই আগস্ট পাকিস্তান জাতিসংঘে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে মহাসচিবের হস্তক্ষেপ দাবি করেন এবং জাতিসংঘ সৈন্য প্রেরণের প্রস্তাব দেন যা ভারত কর্তৃক নাকচ হয়ে যায়। ২৮শে সেপ্টেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে প্রদত্ত মধ্যাহ্নভোজে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসেগিন বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানে ইয়াহিয়া খানকে আহ্বান জানান। ৫ই অক্টোবর পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে বিরাজমান সংকট সমাধানে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকের প্রস্তাব দিলে নয়াদিল্লি স্পষ্টভাবে বলে দেয় যে, বাংলাদেশ সমস্যা সম্পূর্ণভাবে পাকিস্তানের তৈরি। এ সময় একদিকে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সৈন্য যাতায়াতের ক্ষেত্রে সিংহল তার বিমান ও নৌবন্দর ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। এই সময় পাকিস্তান আসাম ও ত্রিপুরার বিভিন্ন স্থানে কামানের ঘোলা নিক্ষেপ করে সরাসরি যুদ্ধাবস্থা তৈরি করে।

অক্টোবর মাসে পাকিস্তান সীমান্ত এলাকায় সামরিক বাহিনীকে প্রেরণ করে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নেন। এই সময় সীমান্তে ভারতও তাদের সৈন্য প্রেরণ করে। ২০শে অক্টোবর জাতিসংঘ মহাসচিব ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে লেখেন, 'পরিস্থিতি বাস্তবিক অর্থে ভয়াবহ।' উত্তরে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মহাসচিব উ থান্টকে লেখেন, 'সামরিক সংঘর্ষের ভারতের কোনো ইচ্ছা নেই, আমরা শুধু দেশের নিরাপত্তার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নিয়েছি।' তিনি আরো লেখেন, 'মহাসচিব পূর্ববঙ্গের জনগণের গণ-আকাঙ্ক্ষা পূরণে রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নিলে ভারত তাঁকে সর্বত্রভাবে সাহায্য করবে।' নভেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী তার কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করেন এবং ইউরোপ এবং আমেরিকার বিভিন্ন দেশে গিয়ে ভারতের অবস্থান, শরণার্থী পরিস্থিতি, রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দেন এবং বলেন, বর্তমান সমস্যা সমাধান হতে পারে কেবল পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত রাজনৈতিক নেতৃত্বের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের মীমাংসার উপর।

"This is possible only if Pakistan's friends or world opinion can make Gen Yahya Khan seek a settlement with the elected leaders of East Bengal.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

If they fail to do so, we might have to take all necessary steps in the interests of our own economy and security. Let no one say afterwards 'we were not warned'. In any case we shall not strike first to precipitate matters."[২১২]

অর্থাৎ নভেম্বর মাসে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ সম্পর্কে কৌশলগত ইঙ্গিত প্রদান করেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তানে জরুরি অবস্থা জারি করেন এবং ১০ দিনের মধ্যে তিনি যুদ্ধে যাবেন বলে আল্টিমেটাম ঘোষণা করেন। এই সময় যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশে শরণার্থী সমস্যা নিয়ে একটি কমিশন পাঠানোর ঘোষণা দেন। ভারত এতে অসম্মতি জানান। ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাজ্যসভায় বলেন, শরণার্থী বিষয়ে অনুসন্ধানের লক্ষ্যে যে কোনো দেশই কমিশন গঠনকে ভারত কোনোভাবেই স্বীকার করবে না।[২১৩] এই সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন তার রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে ফ্রান্স এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই সংঘর্ষ এড়ানোর বিষয়ে আলোচনা করেন।

এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের *টাইম* ও *নিউজউইক* ম্যাগাজিনের প্রকাশিত খবরে জানা যায়, পশ্চিম পাকিস্তানে সামরিক জেনারেলগণ পূর্ববঙ্গের সঙ্গে রাজনৈতিক সমঝোতা করতে বিরোধীতা করছেন। শুধু তাই নয় জেনারেলগণ চাচ্ছিলেন রাষ্ট্রদ্রোহিতার বিচার সমাপ্ত হওয়ার আগেই শেখ মুজিবকে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা। *টাইম* ম্যাগাজিন পশ্চিমা এক কূটনৈতিকের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন, "Mujib may never get back to Bengal alive." কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ও সিদ্ধান্ত হলো যে কোনোভাবেই শেখ মুজিবকে জীবিত রাখা। কেননা তাদের কাছে "মৃত মুজিবের চেয়ে জীবন্ত মুজিব বেশি গুরুত্বপূর্ণ।" ২৭শে নভেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারত-পাকিস্তান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন বরাবর একটি বার্তা পাঠিয়ে সীমান্তে উত্তেজনা নিরসনের উদ্যোগ গ্রহণের আহ্বান জানান। ভারতে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মি. কিনেথ কিটিং ২৯শে নভেম্বর সকালে পত্র হস্তান্তরকালে গান্ধীকে সীমান্ত থেকে সৈন্য প্রত্যাহারপূর্বক উত্তেজনা নিরসনের অনুরোধ জানান। এর একদিন পূর্বে জয়পুরে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এ পর্যন্ত শুধু মুখের কথা বা সহানুভূতি জানিয়ে এসেছেন, কিন্তু মূল সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হয়েছেন। তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, 'বিশ্ব চাক বা না চাক আমরা যা ভালো মনে করব, আমরা তাই করব।' এর ভিত্তিতে নিউইয়র্কে কিটিং একটি রিপোর্ট পাঠান। রিপোর্টটি পহেলা ডিসেম্বর কিসিঞ্জারের হাতে এসে পৌঁছায়। যেখানে বলা হয়েছে, "-India has great admiration for the US but every country must first look to its national interest. It was her duty to see what as in the interests of her country." যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি ভারতের অনেক সম্মান রয়েছে, কিন্তু প্রত্যেক দেশে তার জাতীয় স্বার্থ রক্ষায় প্রাথমিক কর্তব্য রয়েছে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, পাকিস্তান প্রথমে সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করে, কিন্তু কেউ তখন প্রত্যাহারের কথা বলেনি। যখন ভারত সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়েছে কেবল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখনই সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব উঠানো হয়েছে। ইয়াহিয়া খানের সমস্যা তার নিজ সৃষ্ট। ভারত তা সহজ করে দেবে এমন অবস্থায় নেই। সে কারণে ভারত সৈন্য প্রত্যাহার করতে পারেনা। প্রধানমন্ত্রী বলেন, তিনি যেভাবে যুদ্ধে বিরোধীতা করেছে যা ভারতের কেউ করেনি, কিন্তু এই যুদ্ধ ও এই অবস্থা আমরা সৃষ্টি করিনি। তার অপকর্মকে ভারত সমর্থন করে না।[২১৪]

রাষ্ট্রদূত কিটিং-এর সঙ্গে আলোচনায় এ সময় প্রধানমন্ত্রী গান্ধী বলেন, আমরা এমন উপদেশ গ্রহণ করতে পারি না যা ভারতকে দুর্বল করবে। রাষ্ট্রদূত কিটিং আলোচনার পর্যবেক্ষণে লেখেন, বড়ো ধরনের রাজনৈতিক সমঝোতা না হলে মুক্তিবাহিনীর কার্যক্রম বাংলাদেশকে স্বাধীন করবে, যা ব্যর্থ হবার নয়। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, 'আমরা কাউকে হুমকি দিচ্ছি না এবং কারো হুমকিতে আমরা ভীত নই।'[২১৫]

এই ঘোষণার পরপরই প্যাক (পলিটিক্যাল অ্যাফেয়ার্স কমিটি) বৈঠক করে। কমিটি প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রীর নিকট হতে নিরাপত্তা প্রস্তুতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হন। অল্প সময়ের বৈঠকে ক্যাবিনেট সেক্রেটারি, বিদেশ, প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিবদের মিটিং-এ আহ্বান করা হয়। এর সঙ্গে আহ্বান করা হয় তিন বাহিনীর প্রধানদের। বৈঠকে পলিসি প্লানিং বোর্ডের চেয়ারম্যান ডি.পি. ধর উপস্থিত ছিলেন। মিটিং-এ ইয়াহিয়া খানের সাম্প্রতিক বক্তব্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা হয় এবং এ বিষয়ে সবাই একমত হন যে, রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপারে ইয়াহিয়া খানের কোনো ইচ্ছাই নেই। কমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, বাংলাদেশ ইস্যুকে আন্তর্জাতিকীকরণের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপন করা প্রয়োজন। কমিটি এই অবস্থান গ্রহণ করে, যে পর্যন্ত পাকিস্তানের সামরিক জান্তা বাংলাদেশের বাস্তব অবস্থা অনুধাবন না করবে সে পর্যন্ত তারা মূল সমস্যাকে সামনের দিকে নিয়ে আসবে।

২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘ মহাসচিবকে অনুরোধ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সীমান্তে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের জন্য অনুরোধ জানান। যা পূর্বেই ভারত নাকচ করে দিয়েছে। অন্যদিকে, ইয়াহিয়া খান ইসরাইল টাইপের আকস্মিক আক্রমণের জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহন করেন।

প্যাকের নীতি-নির্ধারণী সিদ্ধান্ত মুজিবনগর সরকারকে জানানো হয়। মুজিবনগর সরকারের একজন প্রতিনিধি পরিষদে বক্তৃতা করবেন স্থির হয়। নিরাপত্তা পরিষদে সভাপতি করছিলেন সিয়েরো লিয়েনোর প্রতিনিধি। মিটিং-এর দু'ঘণ্টা আগে বাংলাদেশ মিশনের পক্ষ থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বিচারপতি আবু সাইদ চৌধুরী লিখিত অনুমতি গ্রহন করেন। মিটিং শুরু হলে ভারত বাংলাদেশের পক্ষে বক্তব্য রাখার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে, আলোচ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্তির দাবি জানান। ভারতের বক্তব্য হলো, এটা ভারত-পাকিস্তানের বিষয় নয় অথবা ভারত-পাকিস্তানের ভিতরে যে ক্রমাগত যুদ্ধাবস্থা সৃষ্টি হচ্ছে মূল বিষয়টি তাও না। এই বৈরিতা অবসানের জন্য জরুরিভাবে অপরিহার্য হলো পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমাধান। পাকিস্তান বাংলাদেশের প্রতিনিধির আলোচনার বিষয়ে ঘোরতর আপত্তি উত্থাপন করে। বিষয়টি সমর সেন উত্থাপন করে বলেন, পাকিস্তানের প্রতিনিধি আগা হিলালি যে বক্তব্য দিয়েছেন তা হলো অর্ধেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের কথা। অন্য অর্ধেক অংশের প্রতিনিধি বক্তব্য প্রদানের জন্য জাতিসংঘের লবিং-এ অপেক্ষা করছেন। ভারত পাকিস্তান ভাঙেনি। পাকিস্তান নিজেই তার দেশটিকে ভেঙে ফেলেছে এবং জনগণের নির্বাচিত নেতাকে জেলে আটকে রেখেছে। তিনি সিকিউরিটি কাউন্সিলে জোরালো বক্তব্য উত্থাপন করে বলেন, ভারত কী যুদ্ধবিরতি মেনে নেবে যাতে পাকিস্তানের সৈন্যরা আরো বেশি করে বেসরকারি লোককে হত্যা করতে পারে, শিশুদের নিধন করতে পারে কিংবা মহিলা এবং যুবতীদের ধর্ষণ করতে পারে? এটা ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয় নয়, এটা হলো পূর্ববঙ্গের জনগণ ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধবিরতির বিষয়। তিনি আরো বলেন, পূর্ববঙ্গকে দাবিয়ে রাখা হবে এমন কোনো সমাধান ভারত মেনে নেবে না। পাকিস্তান এই আক্রমণ করার সাহস পেয়েছে বৃহৎ শক্তিবর্গের উৎসাহের কারণে।

এই সময় পাকিস্তান প্রচারণা শুরু করে যে, ভারতের নৌবাহিনী মিসাইল বোটে রাশিয়ার দক্ষ নৌসেনা যুদ্ধে অংশ নিয়েছে। এবং তারাই মূলত পাকিস্তানের নৌ জাহাজকে আঘাত করে চলেছে। পাকিস্তানের এই প্রচারণার উদ্দেশ্য ছিল সেন্টো এবং সিয়াটো চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র যেন পাকিস্তানকে অস্ত্র সাহায্যে এগিয়ে আসে। ১২ই ডিসেম্বর এই অপপ্রচারের প্রতি ইঙ্গিত করে নয়াদিল্লিতে এক বিশাল জনসভায় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী উল্লেখ করেন যে, ইতোপূর্বের পাকিস্তান সামরিক চুক্তির কারণে ভারতকে হুমকি দিচ্ছে। ইতোপূর্বে যাই চুক্তি হোক না কেন আমি জানি তা হয়েছিল কমিউনিজমের বিরুদ্ধে একটি প্যাক্ট। কিন্তু এটা গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্যাক্ট ছিল না, এটা ন্যায়ের কণ্ঠের বিরুদ্ধে ছিল না, এটা অসহায় দরিদ্র মানুষকে ধ্বংসের জন্য ছিল না। এটা যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে বিশ্বের কাছে তা মিথ্যা কথা বলা হচ্ছে।

অন্যদিকে, নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি জর্জ বুশ ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে কতিপয় প্রশ্ন উত্থাপন করেন। এর জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং বলেন, "ভারত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধির উত্থাপিত প্রশ্ন সম্পর্কে কথা বলা থেকে বিরত থেকেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র থেকে হাজার মাইল দূরে সৈন্য পাঠিয়ে যে সংঘর্ষ সৃষ্টি করেছে যার ফলে বছরের পর বছর রক্ত ঝরছে এ বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদে যে আহ্বান জানানো হয়েছিল তা প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। বিদেশি সৈন্যের বিরুদ্ধে সেখানে যে প্রতিরোধ গড়ে উঠেছে এই সম্পর্কে ভারত কোনো প্রশ্ন উত্থাপন করতে যাচ্ছে না।"

নিরাপত্তা পরিষদের এই আলোচনার সময় নিক্সন প্রশাসন 'গান-বোট ডিপ্লোমেসি' (Gun-boat diplomecy) পরিচালনা করার নির্দেশ প্রদান করে। একই সঙ্গে জর্ডানসহ বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যুদ্ধ বিমান পাঠানোর নির্দেশ প্রদান করে যা এন্ডারসন পেপারে লক্ষণীয়।[২১৬]

২১. গান-বোট ডিপ্লোমেসি

১৪ই ডিসেম্বর ভারত মহাসাগরে যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহরের তৎপরতা নিয়ে ভারতের লোকসভায় জ্যোতির্ময় বসুর মুলতুবি নোটিশের পরিপ্রেক্ষিতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি এই বিষয়ে হাউজ মুলতবি করে বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে আলোচনার জন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্পিকারের নিকট আবেদন জানান। তর্ক-বিতর্কের এক পর্যায়ে লোকসভার সদস্য এইচ. এম. মুখার্জি বলেন, ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহরের উপস্থিতি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মুখপাত্র অস্বীকার করছেন না, বরং বলা হচ্ছে, ঢাকায় যে সমস্ত মার্কিন নাগরিক রয়েছে তাঁদেরকে উদ্ধারের জন্য এই ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে, এটা অতীতের ন্যায় গান-বোট পলিসি যার মাধ্যমে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি ও ব্ল্যাকমেইল করার জন্য। তিনি এই সম্পর্কে সরকারকে পরিষ্কারভাবে দেশবাসীকে জানানোর আহ্বান জানান। পার্লামেন্ট সদস্যগণ জাতির প্রতিনিধিত্ব করছেন এবং দেশের অবস্থানকে শক্ত করছে। কোনো হুমকি সদস্যদের নতো করতে পারবে না। যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনাম থেকে কাপুরুষোচিতভাবে উচ্ছেদ হচ্ছে এবং চীনের দিকে হামাগুড়ি দিচ্ছে, ভারতকে হুমকি ও যুদ্ধের উস্কানি দিচ্ছে। এক্ষেত্রে হতবল হওয়া ভয়ঙ্কর ব্যাপার। যুক্তরাষ্ট্র অভদ্র ও জেদি মনোভাব নিয়ে একটি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে। ভারত সরকারের প্রতি তার আস্থা রয়েছে এই চ্যালেঞ্জ সরকার যথাযথ মোকাবিলা করতে পারবে। জ্যোতির্ময় বসু বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন অসৎ ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে নিউক্লিয়ার সজ্জিত বিমানবহনকারী এন্টারপ্রাইজ মালাক্কা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে ভারত মহাসাগরের দিকে পাঠাচ্ছে। এটা শুধু নিউক্লিয়ার সজ্জিত নৌবহর নয়, এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে অনেকগুলো এমফেবিয়ান শিপ (উভোচর জাহাজ) এবং বহুসংখ্যক ডেস্ট্রয়ার। এন্টারপ্রাইজ নামক এই নৌ জাহাজে ৯৯ হাজার টন ভেসেল যুক্ত, যা যুক্তরাষ্ট্রের এয়ারক্রাফ্ট বহনকারী যুদ্ধ জাহাজগুলোর বৃহত্তম। এই নৌবহর ১০০টি যুদ্ধ বোমারু বিমান বহন করতে সক্ষম। যুদ্ধ বিমান, গোয়েন্দা বিমান, ফাইটার এবং হেলিকপ্টার এর সঙ্গে যুক্ত। যা ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি স্বরূপ। এস. এম. ব্যানার্জি তার বক্তব্যে বলেন, পাকিস্তান রেডিও বিশেষকরে লাহোর রেডিও তাঁদের সৈন্য ও অফিসারদের এই বার্তা দিয়েছে যে, ভারতীয় সৈন্যদের বিরুদ্ধে সপ্তম নৌবহর আসছে তাঁদের পক্ষে। এটা ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি। দেশবাসীর জানা আছে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও সরকার এতে ভীত হবে না। যদি সপ্তম নৌবহর ভারতের মাটি স্পর্শ করে তাহলে তাঁদের নর্থ কোরিয়া ও ভিয়েতনামের মতো ভাগ্যবরণ করতে হবে।

এমনি পরিস্থিতি বিবেচনায় সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবে ভেটো প্রয়োগ করে। ভেটো প্রয়োগের কয়েক ঘন্টা পূর্বেই যুক্তরাষ্ট্র আণবিক শক্তি সজ্জিত সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে প্রেরণের নির্দেশ দেন। রেডিও পাকিস্তানের খবর অনুসারে, ১৫ই ডিসেম্বর সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরে পৌছাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের ঐ অংশে একটি ঘাঁটি তৈরি করবে। যুক্তরাষ্ট্র থেকে বলা হয়েছে, বাংলাদেশে যে সমস্ত মার্কিন নাগরিক রয়েছে তাদের এবং পাকিস্তানের সামরিক অফিসার ও বেসামরিক লোকদের উদ্ধারের জন্য সপ্তম নৌবহরকে পাঠানো হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতের রাষ্ট্রদূত লক্ষীকান্ত ঝা যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের সহকারী সচিব সিসকোর সঙ্গে এ বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নেওয়ার জন্য বারবার চেষ্টা করেন, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে নিস্তব্ধতা খুঁজে পান। এটা ছিল বিব্রতকর অবস্থা। বাংলাদেশে তখন ৪৭জন মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাগরিক ছিল তা মধ্যে ৩০ জন ছিল মিশনারিজ। সেজন্য এটা সহজেই বোধগম্য যে, যুক্তরাষ্ট্র যা বলেছিল তার নেপথ্যে ভিন্ন উদ্দেশ্য থাকাও বিচিত্র নয়।

১৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েত ইউনিয়ন মিসাইলসজ্জিত যুদ্ধজাহাজ ভারত মহাসাগরে প্রেরণ করে। জাপান এবং কোরিয়া এলাকা ত্যাগ করে নৌবাহিনী ভারত মহাসাগরের অভিমুখে যাত্রা শুরু করে, যেখানে সপ্তম নৌবহর পৌঁছে গিয়েছিল। সাধারণভাবে এটা বিশ্বাসযোগ্য যে, যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর প্রতিরোধে এটা ছিল সোভিয়েত রাশিয়ার অনমনীয় সিদ্ধান্ত, যা বিশ্ব যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল। এই সময় অবশ্য যুক্তরাষ্ট্র অস্বীকার করে যে, 'পূর্ব পাকিস্তানে "বিচ্ছিন্নতাবাদ' ঠেকাতে তারা সপ্তম নৌবহর পাঠায়নি।" পর্যবেক্ষকগণ বিশ্বাস করেন, সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজের আগমনের ফলে মার্কিন নৌবহরকে থেমে যেতে হয়েছিল। অনেকেই এই অভিমত পোষণ করেন যে, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে সাহায্যের জন্য সপ্তম নৌবহর পাঠানো হয়নি, বরং চীনকে দেখানো যে, তারা রাশিয়ার বিপক্ষে। প্রকৃত পক্ষে এই সময় বাংলাদেশের পূর্ব আঞ্চলিক কমান্ডার লেফট্যানেন্ট জেনারেল নিয়াজী যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছে এবং আত্মসমর্পণ করেছে। কিন্তু মার্কিন যুদ্ধজাহাজ বঙ্গোপসাগরের চট্টগ্রাম বন্দরে আসতে দু'দিন মাত্র সময় লাগত। আত্মসমর্পণের ফলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে বলতে পেরেছে 'আমাদের সাহায্যের আগেই তোমরা আত্মসমর্পন করে বসে আছো।'[২১৭] তারপরেও যুক্তরাষ্ট্র এই কৃতিত্ব নিয়েছে যে, তাঁদের কার্যক্রম বিশেষকরে সপ্তম নৌবহর পাঠানোর ফলে পশ্চিম পাকিস্তান রক্ষা পেয়েছে।

যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ভারত মহাসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠানো নিয়ে দু'ধরনের মতামত বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। একটি হলো ভারতকে বুঝানো যে, সংঘর্ষ বন্ধ করতে হবে; দ্বিতীয়ত, পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করতে হবে, কারণ যুক্তরাষ্ট্র মনে করেছে যে, ভারত সুযোগ পেলে গোটা পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে এবং দখল নেবে; তৃতীয়ত, চীনকে বোঝানো যে, রাশিয়ার বিরুদ্ধে তারা অবস্থান নিয়েছে। অন্য মতামত এভাবে বলা যায়, আরো কয়েকদিন যুদ্ধ চললে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন সক্রিয়ভাবে চলমান যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করত। এই মতামত এভাবে উপলব্ধি করা যায়, ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধ শেষ করার জন্য বারবার তাগাদা দিচ্ছিলো যেন দশ দিনের ভেতরে যুদ্ধ শেষ হয়। সোভিয়েত রাশিয়া অবশ্য এই অঙ্গিকারও করেছিল, চীন যদি হিমালয় অতিক্রম করে ভারতকে আক্রমণ করে, তাহলে রাশিয়া প্রকাশ্যে সিংকিয়াং আক্রমণ করে দখলে যাবে। সোভিয়েতের অঙ্গিকার ছিল যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনে যারা পাকিস্তানের পক্ষ নিয়েছিল তাঁদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো। এই বিষয়গুলো সোভিয়েত রাশিয়ার মুখপাত্র *প্রাভদা* ও *রেড স্টার*-এ প্রকাশিত হয়েছে। *প্রাভদা* মন্তব্যকারী প্রশ্ন তুলেছেন 'মার্কিন নৌবহরের এমনকি কাজ ছিল যে তারা ভারত মহাসাগরে এসেছিল।[২১৮] এই অঞ্চলে পরিস্থিতিকে জটিল করার জন্যই যুক্তরাষ্ট্র গান-বোট কূটনীতি পরিচালনা করেছে। *রেড স্টার*-এর এক প্রবন্ধে মন্তব্য করা হয়, 'ভারত মহাসাগর আমেরিকার লেক নয়'।[২১৯] এতে বলা হয়েছে, মার্কিন ফ্লিট যদি ভারত মহাসাগরে আসতে পারে তাহলে অন্যরাও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আসতে পারে। *টাইমস অব ইন্ডিয়া*-র গিরিলাল জৈন লিখেছেন, বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রেসিডেন্ট নিক্সন ঠেকিয়ে দিতেন যদি তিনি দেখতে না পেতেন যে, এতে সরাসরি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষ বেধে যাবে। ২১শে ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে যে প্রস্তাব গৃহীত হয় সেখানে বাংলাদেশের নাম উল্লেখ না থাকলেও প্রস্তাবে বলা হয়েছিল 'সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য' শব্দগুলো যুক্ত করার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাংলাদেশকেও ঐ প্রস্তাবের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যার সঙ্গে বাংলাদেশ সরকার ও মুক্তিবাহিনীকে বুঝানো হয়েছে।[২২০]

উপসংহার

প্রথম পর্বে বিশ্লেষণ করা হয়েছে, ভারতের জনগণ, শ্রেণি-পেশার মানুষ, বিভিন্ন সংস্থা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, গণমাধ্যম, রাজনৈতিক দল এবং জনপ্রতিনিধিবর্গ বাংলাদেশ সংকট নিয়ে এমনভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন যেক্ষেত্রে ভারত সরকার জনমতকে কোনোভাবেই অবমূল্যায়ন করতে পারেনি। বাংলাদেশ সংকটকে ভারত ও বিশ্ব জনমত এমনভাবে প্রবাহিত হয়েছিল যেক্ষেত্রে কূটনৈতিক নীতি নির্ধারণে ভারত সরকারকে খুব একটি বেকায়দায় পড়তে হয়নি। অভ্যন্তরীণ জনমত কূটনৈতিক ক্ষেত্রকে এমনভাবে প্রসারিত করেছিল যেখানে মানবিক মূল্যবোধ এবং স্বাধীন বাংলার গণ-আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে সরকারকে এগিয়ে যেতে হয়েছে। অভ্যন্তরীণ গণ-আকাঙ্ক্ষার মূল্যায়ন করতে গিয়ে ভারত সরকারকে জুন-জুলাই পর্যন্ত মিত্রহীন অবস্থায় কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একাকী লড়াই করতে হয়েছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সর্বাত্মক উদ্যোগে পরিচালিত কূটনৈতিক নীতি ও ব্যবস্থা দিয়ে একটি সুসমন্বিত কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছিল। যার ফলে বাংলাদেশ প্রশ্নে ভারতের কূটনৈতিক ভূমিকা ছিল সুনির্দিষ্ট, সুস্থির এবং লক্ষ্যাভিসারী। কোনোক্রমেই ভারতকে তার কূটনৈতিক লক্ষ্য থেকে অদৃশ্য করা সম্ভব হয়নি। সাময়িকভাবে কৌশলগত কারণে পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে আপোষমূলক আচরণ লক্ষ্য করা গেলেও তা ছিল ঘুরেফিরে পুনরায় মূল লক্ষ্যের দিকেই অনুবর্তন। প্রথম পর্বে বাংলাদেশের স্বীকৃতির বিষয়টি বারবার বিভিন্নভাবে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে উচ্চারিত হয়েছে। কূটনৈতিক পরিভাষায় কোনো রাষ্ট্রকে স্বীকৃতি দেওয়ার পূর্বশর্ত হিসেবে যে সকল উপাদান ও বস্তুগত সংশ্লেষ অপরিহার্য প্রথম পর্বে সে কথা উল্লেখিত হয়েছে। স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সার্বিক শর্ত পূরণ সত্ত্বেও সহসাই বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দেওয়ার প্রতিবন্ধকতা দ্বিতীয় পর্বে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত হয়েছে। রাজনৈতিক কূটনীতিকে অত্যন্ত আন্তরিকতা ও চাতুর্যের সঙ্গে ভারত সরকার সামরিক কূটনীতিতে রূপান্তরিত করেছিল যা ছিল অনন্যসাধারণ। বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব সকল প্রতিকূলতা অতিক্রম করে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে কাঙ্খিত পরিণতির দিকে যেভাবে এগিয়ে নিয়ে গেছে কূটনৈতিক ইতিহাসে তা দৃষ্টান্ত হিসেবে উল্লেখিত থাকবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য সংকেত

১. 'an all-encompassing and closed system of thought'. Stephen D. Tansey, *Politics The Basics*, London and New York: Routledge, 2000, p. 72.

২. "All these levels simultaneously affect decision's, but their relative weight usally depends on the issuse and circumstansces at the time of decission". Charles W. Kegley, Jr., *World Politics: Trend and transformation,* UK and USA: Thomson, p. 64.

৩. প্রকৃত অর্থেই শেখ মুজিবুর রহমান ভারতের আগরতলায় গিয়েছিলেন পূর্ববঙ্গের স্বাধীনতায় ভারতের সাহায্যের পরিমাপ নির্ণয় করার জন্যে।

৪. লেখক ১৯৭০ সালের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে প্রার্থী হিসেবে সাধারণ মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জনগণের ভিতরে সাম্প্রদায়িক প্রবণতা লক্ষ্য করেছেন। ভোটের ফলাফলে দেখা যায়, প্রদত্ত ভোটের মধ্যে শতকরা ২৫.১ ভাগ মানুষ আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। আবার যারা ভোট দিয়েছেন তারা সবাই যে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতি বিশ্বাস করে ভোট দিয়েছে এমনটি বলা যাবে না।

৫. "Without idcology a nation does not exactly perish, but it can hardly know what to approve and disapprove." (F. S. northedge, 'The Nature of Foreign Policy' in F.S. Northedge (ed.) *The Foreign Policies of Power*, London: 1968, p. 13.

৬. "In fact, idcologically, the Al leadership had never subscribed to the doctrine of social change through violence ... Always upholding the principle of liberal democracy and which (AL) would establish a new exploitationless society based on nationalist feeling." Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971,* Dhaka: 1990, pp. 166-171, Md. Abdul Wadud Bhuiyan, *The Emergence of Bangladesh and Role of the Awami League,* New Delhi: 1982.

৭. "The Assam Jatiya Mahasabha declares on 1 January 1948 that Assam should become an independent country." Mahfuz Ullah, *Ulfa & The Insuregency In Assam*, Dhaka: Adorn publication, 2012, p. 293.

৮. "১৯৬৯ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রসঙ্গে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে লন্ডনে ইন্দিরা গান্ধীর বিশেষ দূতের সঙ্গে আলোচনা হয়েছিল যা মুজিবনগর সরকারের অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে; তাছাড়া বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৭১ সালের ১৮ই ফেব্রুয়ারি শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, আবদুর রাজ্জাক ও তোফায়েল আহমেদকে নিয়ে ৩২নং ধানমন্ডিতে বৈঠক করেন। বঙ্গবন্ধু তাদের কলকাতার ২১ রাজেন্দ্র রোড, নর্দান পার্ক, ভবানিপুর ঠিকানাটি মুখস্ত করিয়ে বলেছিলেন, পাকিস্তানিরা ক্ষমতা দিবে না, আক্রমণ করবে ঐখানে তোমাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা আছে। আক্রান্ত হলে এখান থেকেই মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করো।" লেখকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং তোফায়েল আহমদ লিখিত প্রবন্ধ, দৈনিক *প্রথম আলো*, ৩রা নভেম্বর, ২০১২।

৯. ভারতীয় এলাকার মধ্যে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর গুলিবর্ষণ এবং কর্তব্যরত সিপাইদের অপহরণ করার প্রতিবাদলিপিতে এই নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের, ১৯৮১, পৃ. ৩

১০. "We should not interfere in the internal matters of other countries, what was happening in East Bengal could not be described as purely internal affairs of Pakistan." সূত্র: *প্রথম আলো*, ১৪ই এপ্রিল, ১৯৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১১. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* প্রাগুক্ত, পৃ. ১।
১২. "Events have taken a different and tragic turn instead of peaceful evolutions there is now a bloody conflict." "Our hearts go out in sympathy to the poeple who are undergoing great suffering."
১৩. ৩রা এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন, বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে আলাপ-আলোচনা করেন। তাজউদ্দীন আহমদকে আশ্বস্ত করা হয়েছিলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা করবে এবং মুজিবনগর সরকার ভারতে বসে তার কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারবে। ১০ই এপ্রিল মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় এবং ১৭ই এপ্রিল এই সরকার শপথ গ্রহণ করে। সরকার গঠনের পূর্বে তিনি এই সংশয় প্রকাশ করেছিলেন।
১৪. *Lok Sabha Debate*, vol. 1, March 27, 1971, p.27.
১৫. *Ibid*, p.25.
১৬. "I can assure the House that we shall keep in close touch with the situation and also we shall keep in close touch with the leaders of the Opposition so that they can continue to give us their suggestions and we can also give them what ever knowledge we are able to."
১৭. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৪
১৮. "This House records its profound conviction that the historic upsurge of the 75 million people of East Bengal will triumph. The House wishes to assure them that their struggle and sacrifices will receive the whole hearted sympathy and support of the people of India." *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ১
১৯. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্*, গভর্মেন্ট অব ইন্ডিয়া, পৃ. ৬৭২।
২০. গবেষকের সঙ্গে ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের সাক্ষাৎকার। যিনি তাজউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নিয়ে দিল্লি গমন করেন।
২১. "পাকিস্তান প্রচার চালাচ্ছিলো যে কেবল হিন্দুরাই ভারতে শরণার্থী হিসেবে অবস্থান করছে। অথচ সংখ্যানুপাতে দেখা যায়, শরণার্থীদের সম্প্রদায়গত অনুপাত ছিলো হিন্দু ৪৮% ও মুসলমান ৫২%।" J. N. Dixit, *Liberation and Beyond Indo-Bangladesh Relations.*
২২. "They are national problems, Inded the basic problem is an international one." *Bangladesh Documents*, Ministry of External Affairs, New Delhi, p. 672-676.
২৩. *Bangladesh Documents, op.cit.* p 680-682.
২৪. *Ibid.* p 683-686.
২৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩
২৬. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, গ্রন্থের 'সাক্ষাৎকার' অধ্যায়ে জে. এন. দীক্ষিতের সাক্ষাৎকার।
২৭. *The Statesman,* 6.11.1971.
২৮. পিটিআই
২৯. *স্টেট্‌সম্যান*, ১৮ই জুন, ১৯৭১
৩০. মঈদুল হাসান, মূলধারা,'৭১ পৃ. ২০-২১, ও মোহাম্মদ সেলিম, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৫
৩১. ভারতীয় লোকসভার বিবরণ, ১৮ই জুন, ১৯৭১
৩২. ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭
৩৪. বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন, তারাশংকর বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যজিৎ রায়, মৈত্রেয়ী দেবী, আবু সয়ীদ আইয়ুব, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে, শম্ভু মিত্র, যুশোভন সরকার, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, তৃপ্তি মিত্র, প্রবোধচন্দ্র সেন, তারাপদ মুখোপাধ্যায়, অম্লান দত্ত, গৌরকিশোর ঘোষ, সন্তোষ কুমার ঘোষ, নীরেন্দ্র নাথ চক্রবর্তী।
৩৫. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৭-৩০০
৩৬. ঐ, পৃ. ৩১৬
৩৭. ঐ, পৃ. ৩৩১
৩৮. প্রখ্যাত এসব বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ১৬জন ছিলেন মুসলিম, যারা ভাইস চ্যান্সেলর হতে প্রফেসর এবং শিক্ষা বিভাগ ও সংস্থার শীর্ষ কর্মকর্তা ছিলেন। বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রচারিত হয় এবং এ ফলাফল বিশ্ব পরিসরে বিদ্বজ্জনের মধ্যে জনমত গঠনে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।
৩৯. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৩।
৪০. দৈনিক *যুগান্তর*, ২৯শে এপ্রিল, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫
৪১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০
৪২. ঐ, পৃ. ৩৪২
৪৩. ঐ, পৃ. ৩৪৭
৪৪. ঐ, পৃ. ৩৭৫
৪৫. ঐ, পৃ. ৪৩৯-৪০
৪৬. ঐ, পৃ. ৪৬৯
৪৭. *Hindustan Standard*, 21.9.1971
৪৮. *Asian Recorder*, October 8-14, 1971, pp. 10396-10398
৪৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৪৭৩-৪৭৯
৫০. মুনতাসীর মামুন, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ৮ম খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮, পৃ. ২৩৩-৩৪
৫১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮২
৫২. *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮.৫.১৯৭১ ও *Times of India*, New Delhi, 8.5.1971.
৫৩. *A Nation is Born*, Calcutta University, Bangladcs Sahayak Samiti, 1972, p.4.
৫৪. গবেষকের ভ্রাতা তৎকালীন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ড. আবু সালেহ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হোটেলে আশ্রয় পেয়েছিলেন এবং ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের সহায়ক সমিতির নিকট হতে তাকে মাসোহারা দেওয়া হতো। কলকাতায় তার সঙ্গে সাক্ষাতে এ কথা তিনি গবেষককে বলেছিলেন। তিনি একজন কিশোর শরণার্থীকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় গেটের পাশে পানের দোকান চালানোর জন্য সাহায্য করেছিলেন।
৫৫. বিস্তারিত বিবরণের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৯৭২ সালের এপ্রিলে 'বাংলাদেশের' ওপর অনুষ্ঠিত সেমিনারে দিলীপ চক্রবর্তীর স্বাগত ভাষণ দ্রষ্টব্য। *A Nation is Born*, Calcutta University, Bangladcs Sahayak Samiti, 1972, পৃ. ৩-৯
৫৬. *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৮.৪.১৯৭১
৫৭. *The New York Times*, 11.4.1971.
৫৮. *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৫.৪.১৯৭১।
৫৯. ঐ, ৬.৫.১৯৭১।
৬০. *The Times of India*, 11.5.1971.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬১. *স্টেটস্‌ম্যান*, ১লা মে, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৯

৬২. *দৈনিক 'আনন্দবাজার'*, ৫ই মে, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১।

৬৩. *ঐ*, ৫ই মে, ১৯৭১। হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, তথ্য মন্ত্রণালয়, পৃ. ২১।

৬৪. সিদ্দিক সালিক তার লিখিত *'Witness to Dnrrender'* বইতে ২৫শে মার্চের পর বিদেশী সাংবাদিকদের সঙ্গে পাকিস্তান সামরিক জান্তা যেভাবে জোরপূর্বক বের করে দিয়েছে তার বর্ণনা দিয়েছেন। সাংবাদিকদের হোটেল ইস্টার কন্টিনেন্টাল ..... রাখা দুব্যবহারপূর্বক বলপ্রয়োগে বিমান তুলে পূর্ব পাকিস্তান ত্যাগে বাধ্য করেছিলো তার বিবরণ পাওয়া যায়।

৬৫. *আনন্দবাজার*, ১২ই জুলাই, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪২৮-২৯

৬৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩৭

৬৭. ঐ, পৃ. ৮৩০

৬৮. ঐ, পৃ. ৮৬৩

৬৯. ঐ, পৃ. ৬৪৭

৭০. ভারতের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয় প্রকাশিত *'দি ইয়ার্স অফ এভিভার'*, ৯ই আগস্ট, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৮

৭১. *কালান্তর*, ৮.৫.১৯৭১

৭২. *ঐ*,, ৮.৫.১৯৭১

৭৩. পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার কার্যবিবরণী, উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৭

৭৪. *কালান্তর*, ১৬.৫.১৯৭১

৭৫. রাজ্যসভার কার্যবিবরণী, ২৫.৫.১৯৭১ উদ্ধৃত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪০-৫৪১

৭৬. *কালান্তর*, ২৭.৫.১৯৭১

৭৭. *The Statesman*, 18.6.1971

৭৮. *The Hindustan Standard*, ৩.৭.১৯৭১।

৭৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ৮ই অক্টোবর, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র*, দ্বাদশ খন্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৬।

৮০. *New Age*, Vol. XIV, No. 18, May 2, 1971, p. 1

৮১. গবেষক পরিচালিত পশ্চিম দিনাজপুর বালুর ঘাটের কুরমাইল ক্যাম্পটি কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক রাজেশ্বর রাও পরিদর্শন করেন এবং ভাষণ দেন।

৮২. *Janata*, Vol. XXVI, No. 11, April 4, 1971, p. 2.

৮৩. *Peoples democracy*, Vol. 7, no. 14, April 18, 1971, p. 3.

৮৪. মো. ইসমাইল, লোকসভা বিতর্ক।

৮৫. "The working committee expresses its solidarity with the people of East Bengal and solemnly pledges itself to do whtaever lies within its power to mitigate their sufferings." M. Zaidi and S. G. Zaidi, *The Encyclopaedia of the Indian National Congress*, Vol. 21, 1970-1971, New Delhi: 1984, p. 363.

৮৬. *Swarajya*, Vol. XV, No. 42, Arpil 17, 1971, p. 21.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৭. পশ্চিম বাংলার মুসলিম অধ্যুষিত মালদা-মুর্শিদাবাদ এলাকা অতিক্রমের সময় আমাদের সতর্ক থাকতে হয়েছে। এসব এলাকার মুসলমানরা ঘোরতরভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছিল। এমন কি ট্রেনে যাতায়ানের সময় তাঁরা ঢিল, পাথর ছুঁড়ে মারত।

৮৮. *দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকা*, ৩১শে মার্চ, ১৯৭১।

৮৯. "Mrs. Gandhi's intial and instinctive reaction was to give immediate recognition to a free Bangladesh and to back up the liberation struggle and the resistance movement with full military support." J.N. Dixit, *Liberation And Beyond Indo Bangladesh Relations,* Dhaka: The University Press Limited, 1999, p.50.

৯০. ভারতের লোকসভার সদস্য অধ্যাপক সমর গুহ কর্তৃক লিখিত নিবন্ধ, ২৩শে মে, ১৯৭১

৯১. প্রস্তাবের শেষাংশে বলা হয়, "Thus it is the Government of India that is responsible for this situation by its failure to recognize the Provisional Government and render all material assistance to it". *স্টেটসম্যান,* ১৮ই জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৮

৯২. *কালান্তর,* ২৬শে জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১২-৪১৩

৯৩. পিকিংপন্থি দলগুলো মুক্তিযুদ্ধকে 'দুই কুকুড়ের লড়াই' বলে চিহ্নিত করেছে। এরা মুক্তিবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়াই করে।

৯৪. *পুস্তিকা,* জুলাই, ১৯৭১। সূত্র: *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র:* দ্বাদশ খণ্ড, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৭-২০।

৯৫. *'কালান্তর'*, ৩০শে জুন, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ৫৬

৯৬. *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস্ গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া।*

৯৭. মুজিববাহিনীকে দীর্ঘস্থায়ী গেরিলাযুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। ভারতীয় পক্ষে জেনারেল উবান মুজিববাহিনীকে সংগঠিত ও তত্ত্বাবধানের দায়িত্বে ছিলেন।

৯৮. মোহাম্মদ সেলিম, *মুক্তিযুদ্ধে ভারতের ভূমিকা,* পৃ. ২৯

৯৯. গবেষক নিজে গণপরিষদ সদস্য হিসেবে বাগডোগরার উক্ত অধিবেশনে উপস্থিত ছিলেন।

১০০. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond Indo Bangladesh Relations,* Dhaka: The University Press Limited, 1999.

১০১. "A National Defence Council had also been established by Nehru after the 1962 war to associate the chief ministers of the state governments with defense and foreign policy decision making. While the council had not been formally abolished, it was never summoned by Mrs. Gandhi during the 1971 crisis", Richard Sisson & Leo E Rose, *War And Secession Pakistan, India, and the creation of Bangladesh*, New Delhi: Vistaar Publications, 1990, p.172.

১০২. "Mrs. Gandhi met with opposition party leaders on 27 March and infromed them that her government would not support the secessionist movement in East Pakistan at that time, as this would have "international repercussions" (*The Statesman,* 28 March 1971). The public response of most of the opposition parties was to urge the government to extend diplomatic recognition to Bangladesh, but reportedly their *private* response was to accept the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

government's position (interviews, India, 1978; see also *Mother land,* 28 March 1971, and *Time of India,* 8 April 1971, Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid,* p.172.

১০৩. গবেষকের ক্যাম্পে বিএসএফ-এর একজন কর্মকর্তা মুখার্জী নামে প্রশিক্ষক ছিলেন। মধ্য মে থেকে ভারতীয় সেনাবাহিনীররাজপুত রেজিসেটের ক্যাপ্টেন ডেসেরা নামে একজন প্রশিক্ষক আসেন।

১০৪. Indira Gandhi, *India and Bangladesh,* p. 18

১০৫. *দৈনিক কালান্তর,* ৬ই জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩১-৩২।

১০৬. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা'* দ্র. সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য, *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস ১৯৪৭-১৯৭১,* ঢাকা: ১৯৯৭, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

১০৭. *দৈনিক 'হিন্দুস্তান স্ট্যাণ্ডার্ড',* ২৪শে মে, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৩০।

১০৮. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৮০

১০৯. Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid,* p. 243.

১১০. পাকিস্তানের কাছে অস্ত্র বিক্রয় প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর কাছে স্যার ডগলাস-হিউমের বক্তব্য। ১৭ই এপ্রিল, ১৯৭১। মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র,* ঢাকা: জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৩, পৃ. ৯৩-৯৪

১১১. *পিটিআইম ইউএনআই,* ২রা নভেম্বর, ১৯৭১

১১২. ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকাশিত পুস্তিকা, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত।*

১১৩. দৈনিক *'হিন্দুস্থান স্টাণ্ডার্ড',* ২৬শে জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত,* পৃ. ৫৪-৫৫।

১১৪. "Is there any peace when a whole people are massacred? Will the world be concerned only if people die because of war between two countries and not if hundreds of thousands are butchered and expelled by a military regime waging war against the people". Stanley Wolpert, *A New History of India,* pp. 402-403.

১১৫. "If today we are best with economic uncertainty and faced with the grave threat to our stability and security, it is because our democratic code and geographic proximity have made us the inevitable refuge of millions of helpless victims of medieval tyranny." *Bangladesh Documents,* Dhaka: vol. 2, 1999, p. 263.

১১৬. *Bangladesh Documents,* Dhaka: vol. 2, 1999, p. 238.

১১৭. "It was no longer realistic to expect East and West Pakistan to remain together", Robert Dallek, *Nixon and Kissenger Partners In Power,* Allen Lane, Penguin Books Ltd, Penguin Group (USA) Inc..,375, Hudson Street, New Yourk, USA, p. 339.

১১৮. "He showed up forty-five minutes late for their second meeting without an explanation. In private, he called her a 'bitch' and much worse. 'Nixson's

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

comments after meeting with her,' Kissinger says, 'were not always printable', Robert Dallek, *Ibid.* p. 340.

১১৯. "As an aftermath to the talks, she told a journalist that 'the times have passed when any nation sitting 3 or 4 thousend miles away could give orders to Indians on the basis of their color superionity to do as they wished', Robert Dallek, *Ibid.* p. 340.

১২০. J.N. Dixit, *Ibid.* pp. 51-52.

১২১. *দৈনিক যুগান্তর*, ২.৪.১৯৭১

১২২. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ২

১২৩. ঐ, পৃ. ৭

১২৪. ঐ, পৃ. ১৫

১২৫. বৈদেশিক মুদ্রায় ৩,৭৪,১৬৮.৭১ রুপি এবং ভারতীয় মুদ্রায় ১,৭১,৮৭৫.৩৩

১২৬. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৫

১২৭. *Bangladesh Documents*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৫৮

১২৮. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, ঢাকা, ১৯৮৫, পৃ.২৭

১২৯. Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.188.

১৩০. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৬

১৩১. *হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড*, ২৫শে জুন, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ৪১০-৪১১

১৩২. ঐ, পৃ. ৪১৪-৪১৬

১৩৩. *দৈনিক আনন্দবাজার*, ২০শে মে, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭৬।

১৩৪. *'যুগান্তর'*, ৭ই জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৯৩।

১৩৫. *দৈনিক যুগান্তর*, ৫ই জুন, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ৩৮৯-৯০

১৩৬. *টাইমস অব ইণ্ডিয়া*, ১৪ই জুন, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ৪০৪-৪০৫

১৩৭. *হিন্দুস্থান স্ট্যাণ্ডার্ড*, ২৫শে জুন, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ৪১০-৪১১

১৩৮. বিবৃতি, ২১শে জুন, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪১৪

১৩৯. *কম্পাস*, ১৭ই জুলাই, ১৯৭১, ঐ, পৃ. ৪৩০-৩১

১৪০. ঐ, পৃ. ৪১৪, পৃ. ৮৫

১৪১. *India News* 11:7, 14 May 1971.

১৪২. "Many of them had family ties in India and moved directly into their homes, since, under the circumstances, it was impossible for the Border Security Force or the police to channel the massive flow across the border entirely into camps". Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৪৩. পূর্ব থেকেই ভারতের সঙ্গে সমঝোতা ছিলো।

১৪৪. "This was all pre-planned. As the toops moved forward and fanned out, the whole dark plan of collusion between the Awami League extermists, rebels and our hostile neighbor gradually unfolded itself." Reprinted in *Pakistan Horizon 24* (Third Quarter 1971): 111-23. "This statement coincided with a massage from President Yahya to President Nixon stressing the importance of clarifying

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

the attitude of Pakistan's principal aid donors. toward future economic assistance to Pakistan and seeking Nixon's help in the matter (U.S. Department of State, memorandum for Mr. Henry A. Kissinger, 1 July 1971)" Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৪৫. Kissinger is also reported to have suggested that it would be helpful if India were to recive a signal from China that it was strongly committed to maintaining the unity of Pakistan and that in the case of hositilites between Pakistan and India, China would "not remain a silent spectator." Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৪৬. *New York Times*, 8, 19 and 20 August 1971. As of late August no "cleansed" member had come out publicly in support of the government, which resulted in a pessimistic view on the part of the U.S. State Department concerning prospects for a political settlement (DOS, *Sitrep*, 25 August 1971). By mid September, after the appointment of Malik as government and the appointment of two Awami Leaguers as members of his Council of Advisers, only fifteen Awami League MPAs had reportedly come forward to support the government (DOS, *Siterp*, 22 September 1971. Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.174.

১৪৭. *Radio Pakistan*, newscast, 27 October, 1971.

১৪৮. Dr. Henry A. Kessinger, *The White House Years*, pp. 869-873.

১৪৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯০৩

১৫০. ঐ, পৃ. ৬৯৯

১৫১. *মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্ট*

১৫২. *Rajya Sabha Debate*, 26.11.1971, col. 108-109

১৫৩. S. R. Chowdhury, *The Genesis of Bangladesh*, London, 1972, pp. 170-171

১৫৪. *The Times of India*, 16.5.1971

১৫৫. আশাফাক হোসেন, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, ঢাকা: ২০০২, পৃ. ৮৮

১৫৬. K. M. Shchabuddin, *There and Back Again, A Diplomate's Tale*, Dhaka: 2006, pp. 331-335

১৫৭. দৈনিক *'নিউইয়র্ক টাইমস'*, ১৯শে অক্টোবর, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯২-৯৩

১৫৮. অস্ট্রীয় বেতারে জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক।

১৫৯. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ২৭শে অক্টোবর, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১১০-১১১

১৬০. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ৭ই নভেম্বর, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ১৪৯-১৫৫

১৬১. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ৮ই নভেম্বর, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ১৫৬-১৫৭

১৬২. দি *স্টেটম্যান*, ১৪ নভেম্বর, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ১৫৮

১৬৩. "জ্যাক এন্ডারসন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গোপনে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়টি প্রকাশ করলে কতিপয় কংগ্রেস সদস্য এবং সংবাদপত্র অভিমত প্রকাশ করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত যুদ্ধে নিরপেক্ষ এবং এন্ডারশনের এই তথ্য সঠিক নয়। তার উত্তরে এন্ডারসন বলেন, "one does not like to say the President lied, but there is no other word for it." Major Jodh Singh & P.N. Khra, *Indira's India*, An Issd Publication, 1972, p. 287.

১৬৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩১

১৬৫. ঐ, পৃ. ৯১৯-৯২৯

১৬৬. পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ভারত সরকার, ১৫ই নভেম্বর, ১৯৭১। ঐ, পৃ. ১৬০

১৬৭. *'দি ইয়ার্স অফ এণ্ডীভার'*, ১৬ নভেম্বর, ১৯৭১। *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ১২২-১৩০।

১৬৮. ঐ, পৃ. ৭২৭

১৭০. ঐ, পৃ. ৭৩৮

১৭১. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond*, p. 85

১৭২. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond*, p. 85

১৭৩. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond*, p. 82

১৭৪. *Bangladesh Documents*, Vol. 2.

১৭৫. পাকিস্তান ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে ভারতীয় বাহিনী পাকিস্তানের অভ্যন্তরে মুক্তিবাহিনীর ছদ্মবেশে যুদ্ধ চালাচ্ছে।

১৭৬. "Our security forces have instructions to take appropriate action against Pakistani intrusions." *বা.স্বা.যু.দ:* দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৮০৭-৮১০।

১৭৭. "ডালু সেক্টরের একটি চেকপোস্টের ফাঁড়িতে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীর ১১জন সদস্যের পক্ষে পাকিস্তানের সৈন্যদের হামলা ঠেকানো সম্ভব হয়নি। তবুও তারা বীরত্বের সঙ্গে যুদ্ধ করেছে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে হঠিয়ে দিয়েছে।" *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮২৫-৮২৯।

১৭৮. হেনরি কিসিঞ্জার নিজেও এরকম ধারণা দিয়েছেন।

১৭৯. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, ৬২৩-৬২৭

১৮০. ঐ, পৃ. ৯১৯

১৮১. ঐ, পৃ. ৭১৮

১৮২. ঐ, পৃ. ৯৩৫-৩৮

১৮৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৯৩৯-৪০

১৮৪. ঐ, পৃ. ৭৪২-৪৪

১৮৫. ঐ, পৃ. ৯৪১

১৮৬. "The East Pakistan crisis presented India with 'an opportunity the like of which will never come again.'

১৮৭. Peter Hazelhurst, *The Times (*London), 13 July 1971, **Sourch:** Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৮৮. "It should be noted, however, that there was some inconsistency on this matter in public statements by Indian officals. Samar Sen, India's representative to the United Nations, termed the developments in East Pakistan a 'domestic affair' in a note to the U.N. secretary-general dated 29 March, which presumably had New Delhi's approval (*Times of India*, 31 March 1971). Mrs Gandhi and

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Foreign Minister Swaran Singh also made statements to the Lok Sabha on 27 March that, implicitly at least, reached the same conclusion. On 4 April, however, Mrs. Gandhi reportedly told the All-India Congress Committee that she rejected Pakistan's contention that East Pakistan was an internal matter (*Hindustan Times,* 5 April 1971). There was, thus, some confusion on this question within the Government of India, but its tendency during the first couple of months was to downplay any Indian involvement in the Pkistani civil war," Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৮৯. "An interventionist policy in the spring of 1971 would have been condemned by most of the international community, including some of India's friends". Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid*, p.172.

১৯০. মারেক/ইন্দিরা

১৯১. জুলাই মাসে মার্কিন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকে পি এন হাসকের উক্তি, "We donot want war, but donot know how to avoid war".

১৯২. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, তৃতীয় খণ্ড, গ্রন্থের 'সাক্ষাৎকার' অধ্যায়ে কে সুব্রামানিয়ামের সাক্ষাৎকার।

১৯৩. "War is a costly affair, but in the situation that we find ourselves in, war is not that costly". মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতে রাজনৈতিক দল*, ইউপিএল, ২০০৪, পৃ. ৫৬।

১৯৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪৯।

১৯৫. ঐ, পৃ. ৯০।

১৯৬. ঐ, পৃ. ১০২

১৯৭. ঐ, পৃ. ১০৭

১৯৮. আফসান চৌধুরী, *বাংলাদেশ ১৯৭১*, তৃতীয় খন্ড গ্রন্থের 'সাক্ষাৎকার' অধ্যায়ে জে. এন. দীক্ষিতের সাক্ষাৎকার।

১৯৯. ঐ, তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থের 'সাক্ষাৎকার' অধ্যায়ে কে. বি. লালের সাক্ষাৎকার।

২০০. ঐ, তৃতীয় খণ্ড গ্রন্থের 'সাক্ষাৎকার' অধ্যায়ে নটবর সিং-এর সাক্ষাৎকার।

২০১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৮।

২০২. Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & p. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Indira's India,* An Issd Publication, 1972, p. 304.

২০৩. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৫৪৫।

২০৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র, প্রাগুক্ত*, পৃ. ৮৪৭।

২০৫. ঐ, পৃ. ৫৬৬।

২০৬. ঐ, পৃ. ৮৯৬।

২০৭. ঐ, পৃ. ৬০৪।

২০৮. "This is not a purely internal matter of one country, because the overflow of the political, economic and security consequences are affecting another

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

country, that is, India. This is not an international dispute. certainly not an Indo-Pakistani dispute, for the traditional international istruments to be invoked." Prime Minister of India Mrs. Indria Gandhi at the National Press Club, Washington on 5th November 1971.

২০৯. *New York Times,* 19 November 1971; *India News,* 3 December 1971, 10:36.

২১০. Compiled and Selected by Roedad Khan, *The American Papers*, Secret and Confidential, Documents 1965-1973, Dhaka: The University Press, 1999, p.289

২১১. "It was an authoritative personal message to Richard Nixon from Chou En-lai, who emphasized that he spoke not only for himself but also for Chairman Mao and Vice Chairman Lin Piao. China, Chou declared, 'has always been willing and has always tired to negotiate by peaceful means.... In order to discuss the subject to the vacation of Chinese territories called Taiwan, a special envoy of President Nixon's will be most welcome in Peking." Henry Kissinger, *Ibid,* p.701.

২১২. "We both (Nixon and Kissinger) recognized that we had opened up new opportunities for our diplomacy." Henry Kissinger, *Ibid*, p.757.

২১৩. Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & P. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Ibid,* p. 257.

২১৪. "we do not recognize the authority of any Government to constitute a commission to inquire into the issue".

২১৫. Pakistan had been the first to move its troops to the border and no one had asked them to withdraw. It was only after India moved its troops to the border that proposals were make for withdrawals. Yahya's problems had been self-created and 'we are not in a position to make this easier for him.' That was one of the reasons why India could not withdraw its troops. India was being asked to allow the misdeeds of Yahya to stand and "we are not going to allow that."

২১৬. "No one in all of India was more opposed to war than she was. 'I wouldn't like to take this country to war', but, added, 'that war and this situation are not of our making.' Memorandum From the President's Assistant for National Security Affairs (Kissinger) to President Nixon/1/, /1/ Source: Library of Congress, Manuscript Division, Kissinger Papers, Geopolitical File, Box CL 210, South Asia. Chron File, Nov-Dec 1971, Secret; Nodis. Sent for information. A stamp on the memorandum indicates the president saw it. *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976,* Vol. XI, South Asian Crisis, 1971, p. 315.

২১৭. Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & P. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Ibid,* p. 286.

২১৮. "The US could now tell Pakistan "well, we have done our damnest best help-if

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

only your forces in Dacca had held on a little longer." Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & P. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Ibid,* p. 285.

২১৯. "What business has an American naval squardron in the Inidan Ocean?" Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & P. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Ibid,* p. 289.

২২০. "The Indian Ocean is not an American lake." *Ibid,*, p. 289.

২২১. "Though Bangladesh was not mentioned in the resolution the Concil's call to "all those concerned" to take all measures necessary to preserve human life and for observance of the Geneva Conventions cannot be responded to without bringing the Bangla Desh Government and the Mukti Bahini into the picture. 'In safety and dignity to their homes.' *Ibid,* p. 290.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ষষ্ঠ অধ্যায়
মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর কূটনৈতিক তৎপরতা

ভূমিকা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমগ্র বিশ্বকে আলোড়িত করেছে। এর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া ছিল সর্বব্যাপী। ১৯৭১ সালে বিশ্বে মুসলিম জনসংখ্যা প্রায় ৮০ কোটি।[১] পূর্ব পাকিস্তানের সাড়ে সাত কোটি জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানের সংখ্যা ছিলো শতকরা প্রায় ৮৮%। তৎকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তান ছিল অন্যতম বৃহত্তম মুসলিম অঞ্চল। বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষ যার সিংহভাগ মুসলমান সেই জনগণের উপর যখন পাকিস্তান বর্বর বাহিনী হত্যা, ধর্ষণ এবং ধ্বংসলীলায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন কোনো মুসলিম দেশ পূর্ব পাকিস্তানের নিরীহ বাঙালি মুসলমানদের নির্বিচার গণহত্যা ও নির্মম মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে এগিয়ে আসেনি। বরং বৃহত্তর মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ও মুসলিম ভ্রাতৃত্বের দোহাই দিয়ে মুসলিম দেশগুলো পশ্চিম পাকিস্তানের সামরিক শাসকদের আর্থিক-নৈতিক এবং সামরিক সাহায্য দিয়েছে। মুসলিম দেশগুলো সবসময় ভেবে এসেছে পাকিস্তান শুধু দক্ষিণ এশিয় দেশ নয় এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো দক্ষিণ-পশ্চিম এশীয় অঞ্চলের একটি দেশ।[২] সে কারণে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই দেশটি মধ্যপ্রাচ্য ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলোর সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও আর্থ-সামাজিক সামঞ্জস্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ খুঁজে পায়। এমনকি সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গেছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর যেসকল মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেসব রাষ্ট্রগুলোর কাছে পশ্চিম পাকিস্তানকে পাকিস্তান রাষ্ট্র হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে, পূর্ব বাংলা নয়। সে কারণে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালি মুসলমানদের উপর পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর আক্রমণকে তারা ইসলাম রক্ষা এবং বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারতীয়দের ষড়যন্ত্র' হিসেবে বিবেচনা করেছে। সাড়ে সাত কোটি বাঙালি মুসলমানের উপর নির্বিচারে গণহত্যার রক্তস্রোত, নিরীহ মা-বোনের ধর্ষণ, নিষ্করুণ আর্তনাদ তাদের হৃদয় বিদীর্ণ করেনি, সহানুভূতি জাগায়নি; এমনকি ইসলামবিরোধী সকল জঘন্য কর্মকাণ্ড ও দৃষ্টান্ত তাদের নিকট নিন্দনীয় হয়ে ওঠেনি। অথচ মুসলিম প্রধান দেশ হিসেবে এই দেশের নিরীহ জনগণ মুক্তিযুদ্ধের সময় সবসময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আশা করেছিল মুসলিম দেশগুলো ঐক্যবদ্ধভাবে অথবা শক্তিশালী কোনো একক মুসলিম দেশ পাকিস্তানের আক্রমণ থেকে তাদের রক্ষা ও উদ্ধারে এগিয়ে আসবে।

মুজিবনগর সরকার প্রতিটি মুসলিম দেশে ও ইসলামিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ওআইসি-র নিকট বারবার অনুরোধ করা সত্ত্বেও তারা পাকিস্তানের সার্বিক স্বার্থ রক্ষায় এগিয়ে গেছে। এর ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক ও আদর্শিক কার্যকরণ বিশ্লেষণ করলে লক্ষ করা যাবে যে, তাদের মুখে যতই ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কথা উচ্চারিত হোক না কেন বাস্তবতা হলো তারা স্ব-স্ব রাষ্ট্র ও আন্তঃরাষ্ট্রের স্বার্থকেই প্রাধান্য দিয়েছে, ধর্ম বা ইসলামি ন্যায়-নীতিকে নয়। মুসলিম দেশগুলো বিশেষকরে মুসলিম বিশ্ব সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপরীতে ভূমিকা রেখেছে কখনো সরাসরি, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে। কোনো কোনো রাষ্ট্র নিরপেক্ষ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে, মুক্তিযুদ্ধের সময় শাসকগোষ্ঠী পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করলেও সে দেশের কতিপয় গণমাধ্যম, সিভিলসমাজ, সংগঠন ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন। বিশ্লেষণে একটি অন্যতম সূত্র স্পষ্ট যে স্নায়ু যুদ্ধের ঐযুগে কিছু কিছু মুসলিম দেশ পরাশক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশ তালিম করেছে।

বর্তমান অধ্যায়ে মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম দেশগুলোর ভূমিকা নির্ণয়ে কয়েকটি বিষয় প্রধান বিবেচ্য হয়ে দাঁড়ায়। আলোচনার ক্ষেত্রে এক, মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান; দুই, পাকিস্তানের সঙ্গে মুসলিম দেশগুলোর সম্পর্ক অন্বেষণ; তিন, বিশ্বের প্রথম ধর্মভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংগঠন ইসলামিক সম্মেলন সংস্থার পাকিস্তানের নীতি গ্রহণের কারণ; চার, মুসলিম দেশসমূহের প্রতি মুজিবনগর সরকারের ভূমিকা; ও পাঁচ, বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া।

মুক্তিযুদ্ধ-পূর্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর অবস্থান

প্রতিটি রাষ্ট্রের কূটনৈতিক মৌল ভিত্তিগুলো হলো সে দেশের ভূ-প্রকৃতি, কৌশলগত অবস্থান, ইতিহাস-ঐতিহ্য, জন-আকাঙ্ক্ষা, অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রব্যবস্থা ও আন্তঃরাষ্ট্র কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য ও পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয়সমূহ। মুসলিম বিশ্বের বিশেষকরে মধ্যপ্রাচ্যের কূটনৈতিক পরিস্থিতি অনুধাবন করতে গেলে আন্তঃরাষ্ট্রিক ও বহিঃশক্তির সঙ্গে সম্পর্কের ধারাটি সামনে চলে আসে। ১৯৪৫ সালের ২৫ মার্চ কায়রোতে ৭টি[৩] আরব রাষ্ট্র আরব লীগ প্যাক্টে স্বাক্ষর করে। কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে রাজনৈতিকভাবে আরব লীগ দুটি বিষয়কে প্রাধান্য দেয়। প্রথমত, প্যালেস্টাইনদের সমস্যা, ও দ্বিতীয়ত, বিদেশিদের হাত থেকে আরব জনগণের মুক্তি।[৪] পরবর্তীকালে ষাট-এর দশকে আরব লীগ পারস্পরিকভাবে রাজনৈতিক ও মনস্তাত্ত্বিকভাবে উদ্যোমহীন হয়ে পড়ে। আরব 'ঐক্য আন্দোলন' বিভিন্ন সময় যেমন, হাসেমাইট আমল, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের কিংবা সৌদি বাদশাহ ফয়সালের আমলে ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ায় মাথা তুলে দাঁড়ালেও সামগ্রিকভাবে এই অঞ্চলে রাজনৈতিক গতিধারাকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কার্যকরভাবে প্রভাবিত করতে ব্যর্থ হন। বহিঃশক্তি কর্তৃক তেলসম্পদ নিয়ন্ত্রণ করার প্রচেষ্টা এবং স্ব-জাত্য জাতীয়তাবাদ এই দু'য়ের মধ্যে দ্বন্দ্ব থাকলেও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে ইহুদি-রাষ্ট্র ইসরাইলের সঙ্গে আরবদের বিরোধীতা মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিকে ঘূর্ণাবর্তে নিয়ে যায়। মধ্যপ্রাচ্যে আরব জাতীয়তাবাদ প্রবল হয়ে উঠলেও পাশ্চাত্য রাষ্ট্র বিশেষকরে ব্রিটেন ও ফ্রান্স মধ্যপ্রাচ্যের তেলসম্পদ করায়ত্ত করার প্রবল আকাঙ্ক্ষায় জাতীয়তাবাদী শক্তিকে তোয়াক্কা করেনি। অন্যদিকে, মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতিতে সোভিয়েত রাশিয়ার হস্তক্ষেপের সম্ভাবনা বাস্তব হয়ে উঠলে পাশ্চাত্য গোষ্ঠী এ অঞ্চলকে ঠান্ডা লড়াইয়ের কেন্দ্রে পরিণত করে। তুরস্ক ও গ্রিসকে নব উত্থিত শক্তি সোভিয়েত রাশিয়ার হাত থেকে রক্ষা এবং সোভিয়েতবিরোধী ঘাটি তৈরির জন্য ট্রুম্যান নীতি ও মার্শাল পরিকল্পনার আওতায় নিয়ে আসা হয়।

১৯৫৪ সালের ২রা এপ্রিল মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান তুরস্কের সঙ্গে সামরিক সমঝোতা চুক্তি করে। ঐ বছরই ৮ই সেপ্টেম্বর পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিয়াটো চুক্তি করে। ১৯৫৫ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারি ইরাক ও তুর্কির মধ্যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদন করে। ১৯৬৪ সালের ২১শে জুলাই ইরানের শাহেনশাহ রেজা শাহ পাহলভী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান তুরস্কের প্রেসিডেন্ট কিমেল গুরশেল আঞ্চলিক সহযোগিতার চুক্তি (আর.সি.ডি.) সম্পাদন করেন।

১৯৫৫ সালে পাকিস্তান, ইরাক, ইরান, তুরস্কের সঙ্গে এবং পর্যায়ক্রমে দ্বিপাক্ষিক বা যৌথভাবে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক চুক্তি সম্পাদিত হলে মধ্যপ্রাচ্যে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক জটিলতা বৃদ্ধি পায়। অধিকাংশ আরব রাষ্ট্র বিষয়গুলো নিয়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যে রাজনীতি বলয়ে প্রথম আঘাত আসে ইরানে ব্রিটিশ তেল কোম্পানিগুলো জাতীয়করণের ফলে। দ্বিতীয় আঘাত আসে মিশর কর্তৃক সুয়েজ খাল জাতীয়করণ করা হলে। ১৯৫৭ সালের মার্চ মাসে মার্কিন প্রেসিডেন্ট আইজেন আওয়ার ঘোষণা করেন যে, মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্র কোনো বহিঃশক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না। কিন্তু পরবছরে মার্কিন নৌ-সেনা লেবাননে অবতীর্ণ হয়। তারপর থেকেই মধ্যপ্রাচ্যে যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রহ ও হস্তক্ষেপ দৃঢ় হয়ে উঠে। তার প্রমাণ ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ইসরাইলকে সামরিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতাপ্রদান করে।

১৯৪৭ সালে ইহুদি জনসাধারণ ফিলিস্তানের মোট জনসংখ্যার শতকরা এক তৃতীয়াংশের বেশি ছিল না। আরবগণ প্রধানত ন্যায়-নীতির দৃষ্টিকোণ হতে ফিলিস্তিন বিভক্তির বিরোধীতা করে কিন্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ন্যায়-নীতিকে উপেক্ষা করা হয়। ইহুদি রাষ্ট্রের জন্ম ঘোষণার দিনই মিসর, সিরিয়া, লেবানন, জর্ডান ও ইরাকের সৈনিকরা ফিলিস্তিনে প্রবেশ করে। আরবদের সামরিক সুবিধার সময় জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করে। ৪ সপ্তাহ যুদ্ধবিরতির সময়ে ইসরাইলকে যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপক অস্ত্র সরবরাহ করে। যুদ্ধে আরব দেশগুলির পরাজয় আরব মানসিকতার উপর প্রচণ্ড আঘাত হানে। পরাজয়ের কারণ বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, অধিকাংশ রাষ্ট্র ছিল হয় সদ্য স্বাধীন, না হয় বিদেশি নিয়ন্ত্রণাধীন। সিরিয়া-লেবানন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দু'বছর আগে স্বাধীন হয়। মিশর ও ইরাকে তখন পর্যন্ত ব্রিটেনের সেনাবাহিনীর প্রভাবাধীন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী উইলিয়াম রজার্স ১৯৭০ সালের জুন মাসে ইসরাইল কর্তৃক দখলকৃত এলাকা প্রত্যার্পণ, পারস্পরিক শত্রুতার অবসান এবং প্রতিটি রাষ্ট্রের সীমারেখা নির্দিষ্টকরণ। ১৯৬৭ সালে জাতিসংঘের প্রস্তাবের অন্যান্য শর্তাবলি মিশর ও জর্ডান এই পরিকল্পনায় সম্মতি প্রদান করে।

১৯৭০ সালের ৭ই আগস্ট যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি রজার্স পরিকল্পনায় মিশর, ইসরাইল এবং অন্য সাতটি রাষ্ট্রের মধ্যে ৯০ দিনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি সম্পাদিত হয়। অন্যদিকে, সোভিয়েত রাশিয়া ছিল আরব-ইসরাইল যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং আরব জাতীয়তাবাদী শক্তিকে সমর্থন করে।

আরব জগতে দু'টি ধারার প্রভাব যেকোনা বিশ্লেষকের নিকটই ধরা পড়বে। একটি মৌলবাদী কট্টর সংকীর্ণতা ও রক্ষণশীলতা। অন্যটি, প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী এবং সমাজতান্ত্রিক আদর্শের। প্রথম ধারাটি সৌদি আরব, কুয়েত এবং ইরান এবং দ্বিতীয়টি নাসেরের নেতৃত্বে সংঘটিত সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র, সিরিয়া, আলজিরিয়া, সুদান, লিবিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্ত। প্রগতি ও রক্ষণশীলতার এই দ্বন্দ্বে যুক্তরাষ্ট্র শেষোক্ত শক্তির সমর্থক। ১৯৬৭ ও ১৯৭৩ সালের পর হইতে মধ্যপ্রাচ্যের সংকট অগ্নিগর্ভ। ১৯৪৮ সালে যে অঞ্চল নিয়ে ইসরাইল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বর্তমানে প্রায় বিশগুণ অধিক এলাকা তার কুক্ষিগত। মার্কিন পশ্চিমী এশীয়া নীতিতে এই দু'দিক থেকেই কূটনৈতিক তৎপরতা চালিয়েছে। একদিকে শক্তিশালী ইহুদী প্রভাব, অপরদিকে তৈলস্বার্থ। ইহুদী স্বার্থের প্রভাবে ইসরাইল অস্ত্র সাহায্য ও সমর্থন লাভ করেছে। তৈলস্বার্থে আরববিরোধী নীতি গ্রহনে তারা এগিয়ে আসতে পারেনি।

এক্ষেত্রে সৌদি আরব দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে মিত্র শক্তির পক্ষে থাকায় যুক্তরাষ্ট্র সৌদি আরব থেকে জ্বালানি সম্পদ আহরণের চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌহার্দ্য স্থাপন করেন। কিন্তু মিশরে নাসেরের অভ্যুত্থানের ফলে সৌদি আরবের মধ্যপ্রাচ্যের একচ্ছত্র নেতৃত্ব বাধার সম্মুখীন হয়। ফলে সৌদি আরবের সঙ্গে মিশর ও অন্যান্য প্রগতিশীল আরব রাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। কিন্তু ১৯৬৭ সালে ইসরাইলের সঙ্গে যুদ্ধে আরব ঐক্য সংহত হলে আরব ও মিশর সম্পর্কের উন্নতি হয়। তারপরেও আরব রাষ্ট্রগুলির পররাষ্ট্রনীতি কূটনৈতিক তৎপরতা তাদের স্ব-স্ব ইতিহাস ভূ-রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং স্ব-স্বার্থ দ্বারা প্রভাবিত।

পাকিস্তানের বিদেশনীতি ও মুসলিম বিশ্ব

পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিদেশনীতি বিশ্লেষণ করলে কয়েকটি স্তর প্রত্যক্ষ করা যায়। ১৯৪৭ সাল থেকে ১৯৫৩ সাল পর্যন্ত বিদেশনীতি পর্যায় ক্রমিক লক্ষ্য ছিল জাতীতত্ত্ব এবং প্যান ইসলামিক এবং ভারত এবং আফগানিস্তানের সাথে বৈরিতা। এ সময় পাকিস্তানের কূটনৈতিক প্রচার ছিল পাকিস্তানের অভ্যুদয় মুসলিম আদর্শভিত্তিক, যার জন্ম ছিল অভিনব এবং যা মানবজাতির ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা।[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের বিদেশনীতির মূল বিষয়

পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতির মূল বিষয় ইসলাম, মুসলমান ও মুসলিম বিশ্বকে প্রাধান্য প্রদান। পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নীতির মূল কথাই ছিল ক. ইসলামিক আদর্শে রাষ্ট্র নির্মাণ; খ. মুসলিম জাতীয়তাবাদ; গ. ইসলামিক গণতন্ত্র; ঘ. ইসলামিক অনুশাসনে সামাজিক ন্যায় বিচার; ও ঙ. উপমহাদেশে মুসলমানদের জন্য মাতৃভূমি স্থাপন।[৬]

পাকিস্তান নেতৃত্ব মনে করতেন, পাকিস্তানের অস্তিত্ব আল্লাহ প্রদত্ত (স্বর্গীয়) এবং ইসলামের উপর ভিত্তি করে সাম্য, সামাজিক ন্যায়-বিচার অনুযায়ী বিশ্বের শ্রেষ্ঠতম একটা সামাজিক মডেল হিসেবে দাঁড় করানো। ইসলামকে বিকশিত করার লক্ষ্যে একটি ন্যায়-পরায়ন রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলা।

ভারত বিভাগের অবিশ্বাস ও বৈরিতা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দু'টি রাষ্ট্রকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে দু'দিকে অগ্রসর হয়েছে। পাকিস্তান বিশ্বাস করতো ভারত কখনো শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং যেকোনো সুযোগ পেলে ধ্বংস করে দেবে। ভারত মনে করতো পাকিস্তান সুযোগ পেলে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং আক্রমণ করবে।[৭]

মুসলিম বিশ্বের এমনি অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানকে মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে তার কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তুলতে হয়। মধ্যপ্রাচ্যের ঘটনাবলি সামনে রেখে পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের আন্তঃরাষ্ট্রীয় অনৈক্য ও বিভেদকে পাশ কাটিয়ে অথবা মধ্যপ্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক কলহের মধ্যে নিজেকে মুসলিম জাহানের অগ্রপথিক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে অগ্রসর হয়। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ মধ্যপ্রাচ্যে বিশেষ দূত হিসেবে ফিরোজ খান নুনকে প্রেরণ করেন। ফিরোজ খান নুন অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পাকিস্তানের বিঘোষিত নীতি ইসলামি প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গিকার, দুনিয়ার সকল মুসলমান রক্তের ভাই (Blood Brother) এবং ভারতের প্রতি বৈরিতা ও শত্রুতাপূর্ণ আচরনের বিশদ বর্ণনা তুলে ধরতে সক্ষম হন। সে সময় পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জাফরউল্লাহ খানের বিজ্ঞ কূটনৈতিক পরিচালনায় মধ্যপ্রাচ্যে অতি দ্রুততার সঙ্গে পাকিস্তান একটি শক্ত অবস্থান গড়ে তুলতে সমর্থ হয়।[৮]

ঘোষিত আদর্শের কথা বাদ দিলেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা জোরদার করা তার বিদেশনীতির অন্যতম লক্ষ্য বলে নির্দিষ্ট হয়।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পাকিস্তানের অভ্যুদয় সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলামের অগ্রণী ঝান্ডা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার মনোভাব পোষণ করেন।[৯] এই লক্ষ্যে পাকিস্তান শক্তি সঞ্চয়ের লক্ষ্যে মুসলিম বিশ্বের বহু দেশের সঙ্গে নানা চুক্তি সম্পাদন করেন।[১০]

পাকিস্তান বিশ্বাস করতো, ভারত পাকিস্তানকে কখনো শান্তিতে থাকতে দেবে না এবং যে কোনো সুবিধাজনক সময় পাকিস্তানকে ধ্বংস করে দেবে। একই সাথে ভারতও মনে করতো পাকিস্তানও সুযোগ পেলে ভারতের বিরুদ্ধে দাঁড়াবে এবং ভারতকে আক্রমণ করবে।[১১]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে কাশ্মীর নিয়ে সংঘর্ষ শুরু হলে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহারলাল নেহেরু মনে করতেন যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে পাকিস্তান রাষ্ট্র অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়বে। তিনি মনে করতেন, একদিন না একদিন ভারত এবং পাকিস্তান এক হয়ে যাবে এটা হতে পারে চার, পাঁচ, দশ বছর বা তারও বেশি[১২] পাকিস্তানের বিদেশনীতির অন্যতম অগ্রাধিকার দিক ভারতবিরোধীতা। প্রথম সংকট শুরু হয় কাশ্মীরকে নিয়ে। রাজ্যটি ভারত চীন ও রাশিয়ার রাজ্য সীমার সংযোগ স্থলে অবস্থিত। সামরিক দিক থেকে এর গুরুত্ব সমধিক![১৩] ১৯৪৭ সালের ২৭শে অক্টোবর ভারতের সৈন্য কাশ্মীরে প্রবেশ করলে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের ৩০শে ডিসেম্বর ভারত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের নিকট কাশ্মীর প্রশ্ন উত্থাপন করে। জাতিসংঘের নির্দেশে কাশ্মীরে যুদ্ধবিরতি রেখা নির্ধারিত হয়।[১৪]

ভারতের ভৌগোলিক অবস্থান ও অভ্যন্তরীণ আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৈদেশিক নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে। শান্তিপূর্ণ পররাষ্ট্রনীতিতে আস্থাশীল ভারত জোটনিরপেক্ষ নীতিতে বিশ্বাসী। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনে প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো-এ আন্দোলন সামরাজ্যবাদ, জাতি বিদ্বেষ ও বর্ণবাদবিরোধী। ভারত ও পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বাসী। পরস্পরের সীমানা অতিক্রম না করা অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা, পারস্পরিক সহাবস্থান ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান পঞ্চশিলার অঙ্গ। অন্যদিকে, পাকিস্তানের বিদেশনীতি ছিল ভারত বিরোধীতা এবং মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুদৃঢ় বন্ধন এবং ধর্মকে নিয়ে প্যান ইসলামিক পরিকল্পনায় সমর্থন ও শক্তি সঞ্চয়। একদিকে আদর্শগত বৈরিতা, পারস্পরিক সন্দেহে বিশ্বাস, দু'দেশের পররাষ্ট্রনীতিকে দৃঢ়ভাবে প্রভাবিত করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে কূটনৈতিক ভূমিকায় মুসলিম বিশ্ব এই নীতি ও আদর্শ দ্বারা তাড়িত হয়েছে।

ধনী আরব রাষ্ট্রগুলোর সহযোগিতা অর্জন ছিল পাকিস্তান কূটনীতির প্রথম ধাপ। এই লক্ষ্যে প্রথম থেকেই তার প্রচেষ্টা ছিলো প্রধান মুসলিম হিসেবে মুসলিম বিশ্বে রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা। পাকিস্তান সৃষ্টির দু'বছরের মাথায় ১৯৪৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে বিশ্ব ইসলামিক কংগ্রেস গঠনে এগিয়ে যায়। করাচিতে অনুষ্ঠিত এ সম্মেলনে ১৯টি মুসলিম দেশের প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করে এবং এর ইতিবাচক প্রক্রিয়া মুসলিম বিশ্বের তেমন সাড়া জাগায়নি। ১৯৫১ সালে পুনরায় করাচিতে ওয়ার্ল্ড মুসলিম কংগ্রেসে চতুর্থ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় এবং এই উদ্যোগের ফলে পাকিস্তান বিশেষ ভাবমূর্তি তৈরিতে সক্ষম হয়।

বিদেশনীতির দ্বিতীয় পর্যায়

১৯৫৪ সালের দিকে পাকিস্তানের দ্বিতীয় পর্যায়ে কূটনীতির তৎপরতায় পশ্চিমা দেশ ও মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে সামরিক সমঝোতার দিকে ঝুকে পড়ে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী উদ্‌বিগ্ন করে তোলে কাশ্মীর সমস্যা এবং ভারতের নদীপ্রবাহে বাঁধ দেয়ার ফলে পাকিস্তানের অস্তিত্ব হুমকির মধ্যে পরে। এই পরিস্থিতিতে পাকিস্তান অটুট বন্ধুত্ব স্থাপনে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিতে জড়িয়ে পরে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দ্বিতীয়ত, ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তান পশ্চিমা প্রভাবিত আরব স্বার্থবিরোধী বাগদাদ প্যাক্ট, সিয়াটো, সেন্টোর সদস্য হয়। যে কারণে, পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের বিরাগভাজন হয়। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধে সৌদি আরব, ইরান, তুরস্ক, জর্ডান, ইন্দোনেশিয়া বাদে মুসলিম দেশগুলো নিরপেক্ষ থাকে। মুসলিম বিশ্বের এই ভূমিকার কারণে যুদ্ধের পর পাকিস্তান তাদের সঙ্গে ঘনিষ্ট হওয়ার প্রয়োজন অনুভব করে। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধ তাকে সে সুযোগ এনে দেয়। এই যুদ্ধে পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বের কাছাকাছি আসে এবং পশ্চিমা জোট থেকেই আরব স্বার্থকে প্রাধান্য দেয়। সৌদি আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ইরাক, ইরানসহ কয়েকটি আরব দেশের সৈন্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার দায়িত্ব পায়। এ সময় থেকে আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও পাকিস্তান আরব বিশ্বের মুখপাত্রে পরিণত হয়।

কমিউনিস্ট দেশগুলির প্রতি পাকিস্তানের নীতি

সোভিয়েত রাশিয়া কাশ্মীর প্রশ্নে সরাসরি ভারতকে এবং পাখতুনিস্থান প্রশ্নে সরাসরি আফগানিস্তানকে সমর্থন করে। নেহেরু কাশ্মীর থেকে মার্কিন সামরিক পর্যবেক্ষকদের প্রত্যাহারে দাবি জানান। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে গণভোটের মাধ্যমে রাজনৈতিক মীমাংসার অস্বীকৃতি জানায়। অন্যদিকে, এসময় পাকিস্তান-মার্কিন সামরিক চুক্তির ফলে আরব বিশ্বের বহুদেশ পাকিস্তানের থেকে সরে দাঁড়ায়, পাকিস্তান তখন এই অভিমত প্রকাশ করে যে তারা কাশ্মীর প্রসঙ্গে মুসলিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে হিন্দু ভারতকে সমর্থন দিচ্ছে। এভাবে পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি প্রাথমিক উদ্যোগ প্যান-ইসলামি ভেস্তে যায়।

১৯৪৯ সালের ১লা অক্টোবর চাইনিজ বিপ্লব সফল হলে মুসলিম বিশ্বের মধ্যে পাকিস্তান নন কমিউনিস্ট ব্লকের মধ্যে তৃতীয় দেশ হিসেবে পাকিস্তান ১৯৫০ সালের ৫ই জানুয়ারি পিপল্‌স রিপাবলিক অব চায়নাকে স্বীকৃতি প্রদান করে। যার বিশ দিন পূর্বে বার্মা, ছয়দিন পরে ভারত, একদিন পরে ব্রিটেন স্বীকৃতি দেয়। ১৯৫১ সালের মে মাসে পিকিং করাচির মধ্যে আনুষ্ঠানিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়। কোরীয় যুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকা কমিউনিস্টবিরোধী স্ট্যান্ড এবং প্রাচ্য-মুখীনীতির কারণে পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের কূটনৈতিক টানপোড়েন চলতে থাকে। সে সময় চীন ভারতের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও চৌ এন লাই[১৫] কাশ্মীর প্রসঙ্গে চীন ভারতকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় সমর্থন করেনি। ১৯৬১ সালে পিকিং এবং মস্কোর মধ্যে দূরত্ব শুরু হলে এবং ভারত পাকিস্তানের যৌথ প্রতিরক্ষা চুক্তি নয়াদিল্লি প্রত্যাখ্যান করলে পাকিস্তান চীন সম্পর্কের নতুন মোড় পরিলক্ষিত হয়।[১৬] ১৯৬৬ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার মাধ্যমে তাসখান্দ ঘোষণায় যে শান্তিপূর্ণ সহবস্থানের উল্লেখ করা হয়েছিল, পরবর্তীকালে সেই কূটনৈতিক অবস্থান অব্যাহত থাকে। যার ফলে লক্ষ্য করা যায়, ১৯৬৭-৬৮ কালপর্বে পাকিস্তান মস্কোর সান্নিধ্যে চলে আসে। ফলে পাকিস্তানের ও চীনের বন্ধুত্ব শীতল হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৯৬৯ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান মার্কিন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্টের বার্তা নিয়ে ওয়াশিংটন ও চীনের মধ্যে দূতিয়ালি করেন, তারপর হতে পাকিস্তান ও চীনের সম্পর্কের উন্নতি ঘটে।

১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খান যখন চীন সফর করেন তখন চীন পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা আন্দোলন সম্পর্কে তাকে সতর্ক করে দেয়।[১৭]

মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন জোট গঠন

প্রথম থেকেই মুসলিম বিশ্বের রাজনীতিতে দুটি ধারা লক্ষণীয়। সৌদি আরবের বাদশা ফয়সাল মুসলিম বিশ্বের প্যান-ইসলামিজম আদর্শ প্রচার করে। অন্যদিকে, মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসের প্যান-অ্যারাবিজম প্রচার করে আরব জাতীয়তাবাদী ধারাকে সমুন্নত করার প্রচেষ্টা চালায়। পাকিস্তান সৌদি আরবের প্যান-ইসলামিজম মতবাদকে স্বাগত জানায়। মিশরের প্রেসিডেন্ট গামাল আবদুল নাসেরের জাতীয়তাবাদী ধারা আরব বিশ্বে জনপ্রিয়তা লাভ করলেও এ ক্ষেত্রে পাকিস্তানের কূটনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পাকিস্তান আরব ভূখণ্ডের কোনো রাষ্ট্র নয়। সেজন্য সৌদির বাদশাহ ফয়সালের প্যান-ইসলামিজমকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন প্রদান তার পক্ষে সহজ হয়েছে। ১৯৬২ সালে সৌদি আরবের উদ্যোগে মক্কাতে একটি ইসলামিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং গঠিত হয় রাবেতা আল আলম ইসলামি। মূলত মুসলিম বিশ্বের ভেতরে মানবিক সাহায্য সহযোগিতা করার জন্য সংস্থাটি গঠিত হয়। ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে এর দ্বিতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে অনুভূত হয় যে মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের লক্ষ্যে একটি ঐক্যবদ্ধ প্ল্যাটফর্ম প্রয়োজন। এই উপলব্ধি থেকে সৌদি আরবের বাদশাহ একটি ঐক্যবদ্ধ মুসলিম সংস্থা গঠনের লক্ষ্যে ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে ইরান এবং ১৯৬৬ সালের এপ্রিল, আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে যথাক্রমে পাকিস্তান, তুরস্ক, মরক্কো, গোয়েনা এবং সেপ্টেম্বরে তিউনেশিয়া সফর করেন।

১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে সৌদি আরবের বাদশাহর পাকিস্তান সফর ছিল বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই সফরকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট সৌদি আরবের এই উদ্যোগকে সমর্থন জানিয়ে বলেন, "পাকিস্তান মুসলিম বিশ্বকে এক মঞ্চে দেখতে চায়।" কিন্তু আইয়ুব খানের এই প্রত্যাশা ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় প্রতিফলিত হয়নি। সেজন্য মুসলিম বিশ্বের অনেক রাষ্ট্র ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে পাকিস্তানকে সমর্থন জোগালেও পরবর্তীকালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান যুদ্ধের পরবর্তী সময়ে যে মন্তব্য করেন তা ছিল একটি ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া। ১৯৬৭ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান আর.সি.ডি. সম্মেলনে এভাবে মন্তব্য করেন যে, "পাকিস্তান আরব বিশ্বকে সমর্থন করে এটা নতুন কিছু নয়। ১৯৪৮ সাল থেকে প্যালেস্টাইন ইস্যুতে আমরা সমর্থন করে যাচ্ছি। আমরা সব সময় মুসলিম স্বার্থকে সমর্থন করছি সেটা যেভাবে যে স্থানেই হোক না কেন। আমরা বলকান যুদ্ধ থেকে তুরস্ককে পর্যন্ত সমর্থন করেছি। রাশিয়া কর্তৃক আজারবাইজান দখলের নিন্দা করেছি। আরো মুঘারের জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামকে সমর্থন করেছি। আমরা আদর্শিক রাষ্ট্র (ideological

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

state)। মুসলিম জাহানকে সমর্থন করা আমাদের বিশ্বাস। এটা এক তরফা নয়। ১৯৬৫ সালে ভারত যখন আমাদের আক্রমণ করে তখন ইরান, তুরস্ক, সৌদি আরব ও ইন্দোনেশিয়া উল্লেখযোগ্য সমর্থন দানের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। তিনি তার ভাষণে আরো বলেন, আমরা মিশরের নাসেরকে প্রিয় পাত্র মনে করি না, যেমন অনেকেই তার বিরুদ্ধে তবুও আমরা তার পেছনে দাড়িয়েছিলাম। কারণ আরব জনগণ নিশ্চিহ্ন হোক তা চাইনি।[১৮]

১৯৬৪ সালের ২১ জুলাই আঙ্কারায় ত্রিদেশীয় উন্নয়নের লক্ষ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা দশটি দিক চিহ্নিত করেন। দশম ধারায় 'কারিগরি ও প্রযুক্তিগত পারস্পরিক সহযোগিতা, প্রশিক্ষণ এবং বিশেষজ্ঞ তৈরির যে সিদ্ধান্তে গৃহীত হয়েছিল সেই সমঝোতা ও সহযোগিতা ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ ও ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় পর্যন্ত গোপনে কার্যকর ছিল।[১৯]

ওআইসির সংগঠিত রূপ ১৯৬৭ সালের আরব-ইসলাইল যুদ্ধ এবং আরবদের পরাজয় সৌদি পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সুযোগ এনে দেয়। বৃহত্তর মুসলিম ঐক্যের লক্ষ্যে প্রায় সকল মুসলিম দেশ মানসিকভাবে প্রস্তুতি নেয়। এই সাফল্যের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬৯ সালের ২৬শে আগস্ট কায়রোতে আরব লীগের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের জরুরি বৈঠকে একটি ইসলামিক সংস্থা গঠনের ঐক্যমত্যে পৌঁছে এবং এ বিষয়ে মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। ৩১শে আগস্ট সৌদি বাদশাহ ও মরক্কোর পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ লারাকির মধ্যে বৈঠকে একটি ইসলামি সম্মেলন সংস্থা গঠনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এরই ধারাবাহিকতায় মরক্কোর দূত তিউনিশিয়া, আলজেরিয়া, লিবিয়া, ইরান সফর করেন এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের সঙ্গে রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে যোগাযোগ করেন।

এভাবে বৃহত্তর মুসলিম সংহতির লক্ষ্যে ধর্মনিরপেক্ষ, আরব জাতীয়তাবাদ, প্যান ইসলামিক মতবাদ ও ধর্মভিত্তিক দেশগুলোর সমন্বয়ে এই সংগঠন গড়ে ওঠে। বিচিত্র অবয়বের মধ্যে রাজতন্ত্র, সামরিক/আধা সামরিক, আধা গণতান্ত্রিক ও বৈপ্লবিক সরকারের অস্তিত্ব যা আবার পরস্পর স্বার্থ-সংঘাতে জড়িত।[২০]

সারণি : ১

রাজতন্ত্র	সমাজতন্ত্র	গণতন্ত্র	সামরিক একনায়কতন্ত্র
সৌদি আরব, জর্ডান, সংযুক্ত আমিরাত, কুয়েত, ওমান, কাতার, ইয়েমেন, তিউনিশিয়া ও মরক্কো	ইরাক, সিরিয়া, লিবিয়া, আলজেরিয়া	মিশর, লেবানন, জিবুতি	মৌরতানিয়া, সুদান, সোমালিয়া

১৯৬৭ সালে আরব-ইসরাইল যুদ্ধ সমস্ত আরব জগতকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিকভাবে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়। এ পরিপ্রেক্ষিতে মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃবৃন্দ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৬৯ সালে ওআইসি প্রতিষ্ঠা করেন। এ সময়ে সেক্রেটারি জেনারেল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন মালয়েশিয়ার টুংকু আব্দুল রহমান। রাবাতে ইসলামি সম্মেলন সংস্থার প্রথম সম্মেলনের প্রাক্কালে যা অনুষ্ঠিত হয় ৮-৯ই সেপ্টেম্বর। সে সময় মরক্কো, সৌদি আরব, সোমালিয়া, নাইজার, মালয়েশিয়া, ইরানসহ পাকিস্তানকেও ওই প্রস্তুতি কমিটিতে সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।[২১]

দেশে বিরাজমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। ২২-২৫শে সেপ্টেম্বর সম্মেলনে ৩৫টি দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হলেও ২৫টি দেশ এতে অংশ নেয়।[২২] সনদ অনুসারে ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো ও অনুষ্ঠানে যোগদানে পাকিস্তানের ঘোড় অসঙ্গতি ছিল সনদে বলা। সনদে বলা হয়, ৪ ধরনের রাষ্ট্র ওআইসির সদস্য হতে পারবে : ১. যে সকল দেশের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান ও রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান; ২. জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ মুসলমান কিন্তু রাষ্ট্র প্রধান অমুসলিম; ৩. যে সকল দেশের রাষ্ট্রপ্রধান মুসলমান কিন্তু জনসংখ্যার বড় অংশ অমুসলিম; ৪. যে সকল দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক মুসলমান অর্ধেক অমুসলমান।[২৩] এই শর্ত অনুযায়ী ভারত সদস্য হতে না পারলেও পর্যবেক্ষক হওয়ার যোগ্য বিবেচিত হয়। কারণ ভারতের তৃতীয় বৃহত্তম মুসলিম সম্প্রদায়ের বাস। ভারত প্রথম থেকেই ওআইসির সদস্য হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করে এবং ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী রাবাতে সম্মেলনে ভারতকে আমন্ত্রণের দাবি জানান। যদিও সম্মেলন প্রস্তুতি কমিটি ভারতকে আমন্ত্রণ জানায়নি। ভারত এর প্রতিবাদ জানায় এবং ভারতের শিল্পমন্ত্রী ফখরুদ্দিন আলী আহমদ ওআইসির সিদ্ধান্ত পুনঃবিবেচনার আহ্বান জানান। ভারতের পক্ষে মিশর ও মালয়েশিয়ার কূটনৈতিক তৎপরতার ফলে শেষপর্যন্ত সম্মেলনে ভারতের অংশগ্রহণ অনুমোদিত হয়। সম্মেলনের দ্বিতীয় দিন ২৩শে সেপ্টেম্বর ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তবে শর্ত জুড়ে দেওয়া হয় অবশ্যই একজন মুসলমানকে এতে অংশ নিতে হবে এবং সেক্ষেত্রে মুসলিম প্রতিনিধির পৌঁছার আগে পর্যন্ত অস্থায়ী প্রতিনিধি হিসেবে রাবাতে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত গুর্বাচান সিংহ তার দেশের নেতৃত্ব দেন।[২৪] এ সিদ্ধান্ত পাকিস্তানকে সন্তুষ্ট করতে পারেনি। বাদশাহ্ ফয়সালের অনুরোধে জেনারেল ইয়াহিয়া ভারতের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানাতে রাজি হলেও ভারতের একজন অমুসলমান প্রতিনিধিকে সংখ্যালঘু মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে গ্রহণে তিনি অস্বীকার করেন।[২৫]

সম্মেলন দুই শিবিরে বিভক্তি

তিনি প্রশ্ন তোলেন যদি ভারতকে আমন্ত্রণ জানানো হয় তবে একই যোগ্যতাবলে কেন সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, আলবেনিয়া, কিংবা ইসরাইলকে আমন্ত্রণ জানানো হবে না।[২৬] অথচ এসব দেশ সম্মেলনে অংশগ্রহণ আগ্রহ প্রকাশ করেনি। সম্মেলনের পুরো সময় পাকিস্তানের কট্টর ভারতবিরোধী মনোভাবের ফলে সম্মেলনে অচলাবস্থা সৃষ্টি হয়। পাকিস্তানের সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের বিরোধের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে পাকিস্তান সম্মেলনকে ভারতবিরোধী প্লাটফর্মে পরিণত করার প্রয়াস পায়। এক পর্যায়ে ভারতের সাম্প্রাদায়িক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঙ্গা ও মুসলিম হত্যার প্রতিবাদে পাকিস্তান অধিবেশন বর্জন করে। এক, জর্ডানের বাদশাহ, ইরানের শাহ, তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী জেনারেল ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেন। ইরানের শাহ সম্মেলনের সভাপতি মরক্কোর বাদশাহ হাসানকে জানিয়ে দেন ভারতের প্রতিনিধি সম্মেলনে যোগ দিলে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনিও সম্মেলন বর্জন করবেন। দুই, পাকিস্তান ও তাঁর কট্টরপন্থি মিত্রদের তৎপরতা সত্ত্বেও আরব আমিরাত, আলজেরিয়া, সুদান, লিবিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন ভারতের পক্ষে মত দেয়। ফখরুদ্দিন আলী আহমদের উপস্থিতির পরও পাকিস্তান তার মনোভাব অটল থাকে এবং স্বয়ং সৌদি বাদশাহর অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে। পাকিস্তানের সম্মেলন বর্জনের কারণে ২৪শে সেপ্টেম্বর সকালের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়নি। সংস্থার ভাঙনরোধ ও অচলাবস্থা নিরসনের জন্য মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টেংকু আবদুল রহমানের মধ্যস্থতায় ভারতীয় প্রতিনিধি স্বেচ্ছায় অধিবেশনে অনুপস্থিত থাকায় ২৪শে সেপ্টেম্বর বৈকালিক অধিবেশনে ইয়াহিয়া খান যোগ দিলে সম্মেলনের কাজ পুনরায় চালু হয়।[২৭] এসময় আফগানিস্তানের প্রতিনিধি পাকিস্তানের ভূমিকার তীব্র প্রতিবাদ জানায়। আফগানিস্তান ১৯৪৭ সালে জাতিসংঘে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির বিরোধীতা করে এবং পাখতুনিস্তানকে তার নিজস্ব এলাকা বলে দাবি করে এজন্য ১৯৪৮-১৯৫১ কালপর্ব পর্যন্ত দু'পক্ষের সংঘর্ষ চলে। ১৯৫৫ সালে পুনরায় বৈরিতা শুরু হলে মিশর এবং সৌদি আরবে এ বৈরিতা নিরসনের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়। দু'দেশের রাষ্ট্রীয় প্রধানগণ পারস্পরিক সফর বিনিময় হলেও কূটনৈতিক সম্পর্ক নাজুক অবস্থা থেকেই যায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের আমলে সম্পর্কের কিছুটা উন্নতি হলেও ১৯৭০ সালে অবস্থার গুরুতর অবনতি ঘটে, যা মুসলিম আন্তর্জাতিক ইসলামিক ঐক্য সংস্থায় ছায়া ফেলে। ২৫ তারিখ ১ দিন সম্মেলনের সময়সীমা বাড়ানো হয়। এরপর সম্মেলনে পাকিস্তানের মতামত গুরুত্বসহ বিবেচনা করা হয় এবং পাকিস্তানের আগ্রহের কারণেই ভারতের আহমেদাবাদে দাঙ্গায় উদ্‌বেগ প্রকাশ এবং ঘটনার নিন্দা জানানো হয়।[২৮] ইয়াহিয়া তাঁর বক্তৃতায় অধিকৃত আরব এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার, জেরুজালেমকে ইহুদি কবল থেকে পুনরুদ্ধারে দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেন যা মুসলিম বিশ্বে প্রশংসা অর্জন করে। আরব বিশ্বের সদস্য না হয়েও পাকিস্তান আরব বিশ্বের অপরিহার্য অংশে পরিণত হয়। পাকিস্তানের এই গুরুত্বের স্বীকৃতিস্বরূপ ১৯৭০ সালে সংস্থার পররাষ্ট্রমন্ত্রী করাচিতে অনুষ্ঠিত হয়।

১৯৭০ সালের ২৬-২৮শে ডিসেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে পাকিস্তানের প্রতিনিধিত্ব করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডা. আবদুল মালেক মুত্তালিব।[২৯] তিনি সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া আরব বিশ্বের সংহতি ও ইসলাইলের হাত থেকে আরব ভূখণ্ড মুক্ত করার আহ্বান জানান।[৩০]

মুসলিম বিশ্বের প্রতি মুজিবনগর সরকারের আহ্বান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ ১৩ই জুন আরব বিশ্বের প্রতি আবেদন জানিয়ে বলেন, যেসব রাষ্ট্র এখনো কোনো অবস্থান নেননি অথবা দোদুল্যমান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিংবা বিরোধীতা করছেন, তাদের আশ্বস্ত করে বলতে চাই, সাড়ে সাত কোটি মানুষের প্রত্যয়দৃপ্ত আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন বাংলাদেশ বিশ্বের মানচিত্রে উড্ডীন হয়েছে তা সমুন্নত থাকবে। তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, "এত বিশাল মানবগোষ্ঠীকে উপেক্ষা করা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষে যোক্তিক কি না?"[৩১] তিনি মুসলিম রাষ্ট্র ও আরব বিশ্বের প্রতি বিশেষভাবে আহ্বান জানিয়ে বলেন, এই ব্যাপক গণহত্যার নিন্দা করা হয়নি। তিনি বলেন, "এটা হবে একটি ট্রাজিক ভ্রান্তি যেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খানের এই যুদ্ধকে তারা ইসলামের ন্যায়ভিত্তিক বলে মনে করবেন। দাসত্ব ও বর্বরতাকে না দেখার ভান করেও নীরব রয়েছেন। তারা তাদের নৈতিকতাকে অবরুদ্ধ করে রেখেছেন। ইসলামাবাদকে বস্তুগত সাহায্য দিয়ে তারা যেমন স্বৈরতন্ত্রের পক্ষ নিয়েছেন অন্যদিকে প্রতিষ্ঠিত প্রামাণ্য হত্যা, খুন, লুণ্ঠন, ধর্ষণের পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন। তিনি বলেন, আমি আরব দেশগুলোকে মনে করিয়ে দিতে চাই, তারা তুর্কি মুসলিম কলোনিয়েল শাসকদের হাত থেকে নিজেদের স্বাধীন করার জন্য সংগ্রাম করেছিলেন। তিনি বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের কলোনিয়েল শাসনের বিরুদ্ধে আমাদের সংগ্রাম তুর্কীদের বিরুদ্ধে যেভাবে সংগ্রাম করেছিল তারই অনুরূপ।"[৩২]

সম্মেলন চলাকালে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলামের সংস্থার কাছে প্রেরিত তারবার্তায় পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর নৃশংস হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে প্রভাব বিস্তারের জন্য সদস্যদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বলেন: "বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের শতকরা ৮০ ভাগ মুসলমান। ইয়াহিয়া সরকার জনগণের নির্বাচিত রায়কে অগ্রাহ্য করে বিশ্বাসঘাতকের মতো অন্যায় যুদ্ধ শুরু করেছে বলেই বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার ঘোষণা করেছেন। তারা দশ লাখের বেশি লোককে হত্যা করেছে। ৬০ লাখের বেশি লোক গৃহহারা হয়ে দেশ ত্যাগ করে ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পশ্চিম পাকিস্তানি হানাদাররা মসজিদসমূহ ধ্বংস করেছে, মসজিদের ইমামদের এবং নামাজরত মুসলমানদের গুলি করে হত্যা করেছে। আর তারা এই করেছে ইসলামের নামেই।"[৩৩]

এছাড়া সম্মেলনকালে ২৬ষে জুন নয়াদিল্লিস্থ বাংলাদেশের কূটনীতিক কে.এম. শিহাবুদ্দিন জেদ্দা সম্মেলনের সদস্যদের বাংলাদেশের বাস্তবতা মেনে নিয়ে বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের আহ্বান জানান। বাঙালির উপর পাকিস্তানি সামরিক জান্তার গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞের বিবরণ তুলে ধরে তিনি বলেন :

"The question of living together with Pakistan butchers, who have shed the blood of millions of our innocent people and who have disrupted our economy, does not arise. I emphasize again that Pakistan is dead and buried under the bodies of martyrs."[৩৪]

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারণা চালালেও মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রতি দৃঢ় আস্থা জ্ঞাপন করে পাকিস্তানের বিদেশ মিশনে কর্মরত বিভিন্ন দেশে কূটনৈতিকবৃন্দ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের প্রতি আনুগত্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পোষণ করে। পাকিস্তানের কূটনৈতিক মিশনে যে সকল বাঙালি কূটনৈতিক কর্মরত ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে তারা পাকিস্তানের পক্ষ পরিত্যাগ করেন। বাগদাদ থেকে রাষ্ট্রদূত এ.এফ.এম. আবদুল ফতেহ অত্যন্ত সাহসিকতার সঙ্গে শুধু পাকিস্তানের পক্ষই ত্যাগ করেননি পাকিস্তান দূতাবাসের ট্রেজারি হতে চৌত্রিশ হাজার ইরাকি ডলার উত্তোলন করেন। তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন যে, এ সকল অর্থ বাংলাদেশের জনগণের এবং তা তিনি মুজিবনগর সরকারের নিকট পাঠিয়ে দেন। বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার কার্যক্রম সমর্থনে এক বিবৃতিতে বলেন, জনাব ফতেহ সময়োচিতভাবে শুধু বাংলাদেশ সরকারের আদেশ যথার্থভাবে পালন করেছেন। এটা বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত শেয়ারের একটি অংশ মাত্র। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, এই অর্থ বাংলাদেশ সরকারের এবং তা মুক্তিযুদ্ধে শক্তি বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই বক্তব্য বিভিন্ন দেশে প্রেরণ করা হয়। এভাবে রাষ্ট্রদূত এইচ.কে. পন্নিকে দামেস্কো থেকে দিল্লি কনসাল জেনারেল এ.এইচ. খানকে ইস্তাম্বুল থেকে বৈরুতে, আজাহারুল আনোয়ার চৌধুরিকে দুবাই থেকে বৈরুতে, কনসোলার মঞ্জুর চৌধুরীকে দুবাই থেকে বৈরুত, মাহবুবুল হককে তেহরান থেকে দিল্লি, ফজলুল করিমকে কায়রো থেকে বৈরুত, আহমেদ তারিক করিমকে তেহরান থেকে বৈরুত, মোহাম্মদ জামিরকে কায়রো থেকে বৈরুত, আফসারুল কাদেরকে আনকারা থেকে বৈরুত, খাজা সারজিল হাসানকে আঙ্কারা থেকে বৈরুত, আবদুল মোমেন চৌধুরীকে দামেস্কো থেকে বৈরুতে যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়।[৩৫] মুজিবনগর সরকার মুসলিম দেশগুলোতে মুক্তিযুদ্ধের বাস্তব অবস্থা তুলে ধরার জন্য কয়েকটি প্রতিনিধিদল প্রেরণ করেন। জাতীয় পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি ফকির সাহাবুদ্দিনকে ৭ই আগস্ট কুয়ালামপুরসহ কয়েকটি দেশে প্রেরণ করা হয়। অনুরূপভাবে জাতীয় পরিষদ সদস্য মোল্লা জালালউদ্দিন ও ড. মাহমুদ শাহ কোরেশীকে বৈরুত, কায়রো এবং এডেন-এ বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের যৌক্তিকতা তুলে ধরার জন্য প্রেরণ করা হয়। মোল্লা জালাল উদ্দিন বৈরুতে মধ্যস্তরে নেতৃবৃন্দের সঙ্গে সাফল্যজনকভাবে যোগাযোগ করেন এবং সেখানে একটি ছোটো অফিস স্থাপনের সরকারি অনুমোদন লাভ করেন। তিনি গণমাধ্যমের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। সেখানে তিনি নাবিল বারাদি নামের একজন স্থানীয় প্যালেস্টাইনের সাংবাদিকের সহায়তা লাভ করেন।[৩৬]

মুক্তিযুদ্ধ ও ইসলামি সম্মেলন সংস্থা

করাচি সম্মেলনের মাত্র তিন মাসের মধ্যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ শুরু হলে ওআইসিতে পাকিস্তানের গুরুত্ব ও পাকিস্তান কর্তৃক পরিচালিত মুক্তিযুদ্ধবিরোধী তৎপরতার সঙ্গে সংস্থা দ্বিমত পোষণ করেনি। প্রথম থেকেই পাকিস্তান ওআইসির সদস্যদের সমর্থনের জন্য মুক্তিযুদ্ধকে পরিকল্পিতভাবে ভারত ও ইসরাইলের প্ররোচণায় 'মুসলিম সংহতি' বিনষ্টের প্রচেষ্টা হিসেবে চিহ্নিত করে।

মূলত, নব প্রতিষ্ঠিত সংস্থার ভাঙনরোধ, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে পর্যাপ্ত তথ্যের অভাব, ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সমর্থন তাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সন্দিহান করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার তিন দিনের মধ্যে ২৯শে মার্চ সংস্থার মহাসচিব টেংকু আবদুর রহমান এক বিবৃতিতে 'পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে' পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ সমস্যা' বলে মন্তব্য করেন। ভারতকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেন, আমি মনে করি বাইরের কোনো দেশের এতে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়।[৩৭] এই বিবৃতির পর পর ৩০শে মার্চ ওআইসির সদস্য সংযুক্ত আরব আমিরাত, ৩শে এপ্রিল তুরস্ক ও মালয়েশিয়া, ৭ই এপ্রিল লিবিয়া, ১২ই এপ্রিল ইয়েমেন এবং ২৮শে এপ্রিল সৌদি আরব অনুরূপ মতামত ব্যক্ত করেন।

সারণি-২

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ওআইসি'র সদস্যদের ভূমিকা

ভূমিকার প্রকৃতি	দেশের নাম
১. অস্ত্র ও প্রত্যক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা	সৌদি আরব, ইরান, লিবিয়া, জর্ডান ও তুরস্ক
২. নৈতিক ও পরোক্ষভাবে পাকিস্তানকে সহযোগিতা	কুয়েত, সংযুক্ত আরব আমিরাত, মরোক্ক।
৩. নিরপক্ষে ভূমিকা	ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর, সুদান, আলজেরিয়া, আফগান্তিান
৪. মৌন ভূমিকা	সোমালিয়া, উত্তর ইয়েমেন, লেবানন, দক্ষিণ ইয়েমেন, চাদ, তিউনেশিয়া, নাইজেরিয়া, গোয়েনা, মৌরিতানিয়া, সেনেগাল ও মালি

Pakistan Horizon, Cronology, Vol. XXIV, No. 2-4, 1971.

ওআইসি সবচেয়ে বেশি বৈঠক হয় ১৯৭১ সালে। এপ্রিলে ইরানে ইসলামিক সংবাদ সংস্থা বৈঠক, জুনের প্রথম দিকে মরক্কোতে ইসলামিক সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের বৈঠক এবং জুনের শেষ নাগাদ জেদ্দায় ওআইসি সম্মেলনের চার্টারে খসড়া সংক্রান্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেপ্টেম্বর মাসে কাবুলে তৃতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সম্মেলন হওয়ার কথা থাকলেও আফগান্তিানের দুর্ভিক্ষের কারণে তা অনুষ্ঠিত হয়নি। পাকিস্তানের তৎপরতার সাফল্য বয়ে আনে জুনের শেষ দিকে সৌদি আরবে অনুষ্ঠিত জেদ্দা সম্মেলনে[৩৮]। এই সম্মেলনে ওআইসির সনদ চূড়ান্ত হয়। সম্মেলনের প্রাক্কালে মহাসচিব তাঁর ২৯শে মার্চে দেওয়া বিবৃতির পুনরাবৃত্তি করেন এবং পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করেন। মুসলিম বিশ্বের কাছে পাকিস্তান সাহায্যের আবেদন জানান।[৩৯] অবশ্য এখানে তিনি পাকিস্তান জনগণ বলতে পাকিস্তানপন্থি না বাংলাদেশপন্থিদের বোঝাতে চেয়েছেন তা স্পষ্ট ছিল না। তবে ওআইসির কর্মকাণ্ড থেকে মনে হয় মহাসচিব পাকিস্তানের জন্যই সাহায্য চেয়েছেন।

জেদ্দা ইসলামিক সম্মেলনে প্রকারান্তে ভারতকে হুমকি দেওয়া হয়েছে। বৈদেশিক হস্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্ষেপ বলতে ভারতকেই বোঝানো হয়েছে। অন্যদিকে সংকটকালে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ানোর আহ্বানও ভারতকে ভয় দেখানোর জন্য বলা হয়েছে। ভারত তেল সরবরাহসহ বিভিন্ন দিক দিয়ে ধনী আরব রাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল থাকায় এ হুমকি দেওয়া হয়। পাকিস্তানের গণমাধ্যমে যুক্ত ইশতেহারকে ভারতের 'কূটনৈতিক পরাজয়' হিসেবে আখ্যা দেয়। অন্যদিকে একে পাকিস্তানের 'কূটনৈতিক বিজয়' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। কারণ হিসেবে বলা হয় : ১. ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে পৃথিবীব্যাপী যে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে এ ঘোষণার মাধ্যমে মুসলিম বিশ্বে ভারত একঘরে হয়ে যাবে; ২. ভারতকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে; ৩. কোনো কোনো দেশ পাকিস্তানকে সরাসরি সহযোগিতা আশ্বাস দিয়েছে।[৪০] এর ফলে পাকিস্তান যে একা নয়, সংকটকালে সাহায্য ও সহযোগিতা পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা পায়। ফলে মে মাস পর্যন্ত মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশ বিক্ষিপ্তভাবে পাকিস্তানের অখণ্ডতার জন্য বিবৃতি দিলেও ইসলামি সম্মেলনের পর মুসলিম বিশ্ব একযোগে পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার সুযোগ পায়।

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক অরগনাইজেশন সেক্রেটারি জেনারেল এইচ. এইচ. মারজুকি জাতিস ভারতে পূর্ব পাকিস্তানের শারণার্থীদের জন্য রিলিফ পাঠানোর জন্য ইন্দোনেশিয়া সরকারের প্রতি আহ্বান জানান। ৯ই জুন ১৯৭১ সালে জাকার্তায় এক বিবৃতিতে বলেন, কলেরায় আক্রান্ত শরণার্থীদের জন্য আশু ঔষুধ জরুরি। তিনি বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিকত ইসলামিক সংস্থার নিকট বিশেষ করে ইন্দোনেশিয়া ন্যাশনাল গ্রুপকে পরামর্শ দেন তারা যেন বিভিন্ন মুসলিম দেশকে শরণার্থীদের বস্তুগত সাহায্য ও সহযোগিতায় এগিয়ে আসতে বলেন।[৪১]

ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক সংস্থার মহাসচিব এইচ.এইচ. মারজুকি জাতিম ৯ই জুন জাকার্তায় এক বিবৃতিতে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের জন্য মুসলিম দেশগুলোকে সাহায্য প্রেরণের আবেদন জানান। তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তান থেকে আগত শরণার্থীদের অনেকেই কলেরা আক্রান্ত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন দেশে ইসলামিক সংস্থাগুলোকে অভিলম্বে তাদের স্ব-স্ব দেশ হতে ব্যাপকভাবে শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য আহ্বান জানান।[৪২]

যদিও বাংলাদেশের এসব উদ্যোগ ও আহ্বান মুসলিম বিশ্বের নেতাদের মধ্যে কোনো সহানুভূতি সৃষ্টি করেনি। তারা মুসলিম উম্মাহর সংহতি রক্ষায় পাকিস্তানকে বিব্রত না করার নীতি গ্রহণ করেন। বাংলাদেশের প্রকৃত ঘটনা উদ্‌ঘাটনের কোনো চেষ্টা না করেই পাকিস্তানের প্রতি একতরফা সমর্থন অব্যাহত রাখে। সম্মেলন শেষে ১লা জুলাই প্রকাশিত যুক্ত ইশতেহারে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশি হস্তক্ষেপের নিন্দা এবং পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার ন্যায়সঙ্গত প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানান।[৪৩] অধিকাংশ সদস্য পাকিস্তানকে সহযোগিতার মত ব্যক্ত করে। ইরান সংকটকালে সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে যুদ্ধ করার ইচ্ছে ব্যক্ত করে, কারণ ইসলামি সংহতি রক্ষার জন্য তা জেহাদের মতো নৈতিক কর্তব্য।[৪৪]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ প্রসঙ্গে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মৌলিক নীতিমালা ধর্মনিরপেক্ষ ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ঘোষণা মুসলিম বিশ্বের বিশেষকরে ওআইসি-র নীতিমালার সঙ্গে ছিল সাংঘর্ষিক। এ সময়ে ইসরাইল কর্তৃক বাংলাদেশের গণহত্যা, শরণার্থী সমস্যা, মানবতাবিরোধী অপরাধ এবং ধ্বংসযজ্ঞের বিরুদ্ধে ইসরাইল পার্লামেন্টে (Knesset) আলোচনা হয় এবং বাংলাদেশের সাহায্যের জন্য সংসদে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ২৩শে জুন ১৯৭১ সালে পার্লামেন্টে এক বিবৃতিতে পূর্ববঙ্গের জনগণের দুঃখ-দুর্দশা ও বেদনাদায়ক ঘটনাবলিতে গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করে ভাষায় প্রকাশ অসম্ভব কিন্তু এটা নিঃসন্দেহে বলা যায় বর্তমান বিশ্বে এমন মর্মান্তিক ও নৃশংস ঘটনা আর ঘটেনি। ইয়াহিয়া খানের সরকার বিদেশি সাংবাদিকদের জনগণের অবস্থা ও প্রকৃত ঘটনা তুলে ধরার জন্য সেদেশে যেতে দেয়নি। মৃত্যু, ধ্বংস, অত্যাচার এমন এক নিষ্ঠুর অন্ধকার সৃষ্টি করেছে যার হাত থেকে নর-নারী, যুব, শিশু, বৃদ্ধ কেউই নিষ্কৃতি পাচ্ছে না।

এসব দুঃখজনক ঘটনাবলির দীর্ঘ পটভূমি বর্ণনা না করে বলা যেতে পারে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর হতেই পূর্বাংশের জনগণের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করা হয়। এসব তিক্ত অনুভূতি, অভিজ্ঞতা ও বৈষম্যের ফলাফল... নির্বাচন প্রতিফলিত নেতার দাবিসমূহ অগ্রাহ্য করে। এই অবস্থায় আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করে। আজকে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামো থাকবে কি থাকবে না সেটা বড়ো নয় বড়ো হলো বিশ্ব এমন নিষ্ঠুর হত্যা, সন্ত্রাস ও ধ্বংসের মুখে নীরবতা। ইসরাইলের কাজ হবে এ সম্পর্কে বিশ্ব বিবেককে জাগ্রত করা এবং এমন পদক্ষেপ গ্রহণ যা দুঃখ দুর্দশা হ্রাস করবে।[৪৫]

ভৌগোলিক বিশ্লেষণে পাকিস্তানকে দক্ষিণ এশিয়ার দেশ না বলে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের অংশ হিসেবে বিবেচিত।[৪৬]

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরপরই পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্র ওমানের সঙ্গে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলে। পাকিস্তানের মাক্রান ডিভিশনের গোয়াদার শহরটি সর্বশেষ সমুদ্র সংলগ্ন এবং ওমান আশি দশক পর্যন্ত পাকিস্তান থেকে সামরিক বাহিনীর লোকদের সুলতানের সেনাবাহিনী হিসেবে নিয়োগ দান করেছেন।

পাকিস্তান, সৌদি আরব, কুয়েত এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতের সঙ্গে প্রাথমিকভাবে আদর্শিক ও সাংস্কৃতিকভাবে জড়িত এবং এসব দেশগুলোর সঙ্গে পাকিস্তানের বাণিজ্য ও মানবসম্পদ রপ্তানির বিরাট বাধা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে।

মুক্তিযুদ্ধে মুসলিম বিশ্ব

পাকিস্তান সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে পশ্চিম পাকিস্তান শাসকচক্র পূর্ব বাংলার মানুষকে খাঁটি মুসলমান হিসেবে অনুধাবন করেননি। ১৯৪৭ সালের পর হতে পূর্ববঙ্গের মুসলিম নেতা এ কে ফজলুল হক, মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী ও হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে খাঁটি পাকিস্তানি নেতা হিসেবে মেনে নেয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নেতৃত্ব যখনই সুযোগ পেয়েছে তখনই এসব জননন্দিত নেতৃবৃন্দকে 'ভারতীয় চর', 'ইসলামের দুশমন' কখনও বা 'খতরে পাকিস্তান' হিসেবে চিহ্নিত করার অপপ্রয়াস চালিয়েছে। এমনকি তাদেরকে বিরুদ্ধে নানা ধরনের মামলা ও কারাগারে যেতে হয়েছে। পূর্ববঙ্গের বাঙালি মুসলমানরা যে 'খাঁটি মুসলমান' নয় একথা পাকিস্তানের শাসকবৃন্দ দেশে-বিদেশে সর্বত্র প্রচার করেছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট 'প্রভু নয় বন্ধু' গ্রন্থতেও এ মনোভাব প্রকাশিত হয়েছে।

স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে এধরনের প্রচার-প্রচারণা প্রবলভাবে মুসলিম বিশ্বের নিকট উপস্থাপন করা হয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তানের দু'অংশের ইসলামি সংহতিবিরোধী রুশ-ভারতীয় ষড়যন্ত্র হিসেবে প্রতীয়মান হয়েছে। পাকিস্তান সরকার মুক্তিযুদ্ধকে 'ভারতীয় ষড়যন্ত্র' এবং মুক্তিযোদ্ধাদের 'ভারতীয় চর' 'কাফের' আখ্যা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ধর্ম যুদ্ধের পর্যায়ে নিয়ে যেতে চেষ্টা করে।[৪৭] মুজিবনগর সরকারের মন্ত্রী ও কর্মকর্তাদের বক্তৃতায় সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা মুসলিম বিশ্বের কাছে এ ধারণা দিয়েছে স্বাধীনতার পর দেশটি হবে কমিউনিস্ট ও ধর্মহীন একটি রাষ্ট্র। আর দেশটি হবে হিন্দুশাসিত ভারতের মিত্র রাষ্ট্র যা পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকিস্বরূপ।

দ্বিতীয়ত, ওআইসির পাকিস্তানপন্থি নীতি গ্রহণের প্রধান কারণ হিসেবে অনেকে মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশের প্রতি ইসরাইলের সমর্থনকে দায়ী করেন। মূলত ওআইসি গঠিত হয়েছিল ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে। ২রা জুলাই মাসে ইসরাইলি সংসদ (Knesset) বাংলাদেশের ওপর পাকিস্তানি সামরিক চক্রের 'পাশবিক ও বেপরোয়া ধ্বংসলীলাকে' নিন্দা করে একটি প্রস্তাব পাশ করে। এছাড়া বাঙালি জাতির প্রতি মুক্তিসংগ্রামের সংহতি প্রকাশ এবং ভারতে আশ্রয়গ্রহণকারী শরণার্থীদের দুঃখ দুর্দশার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ করে।[৪৮] ইসরাইল সংসদ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও শরণার্থীদের জন্য ইসরাইলি রেডক্রসের মাধ্যমে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ ঔষুধ, খাদ্য, কাপড় পাঠানোর ঘোষণাও দেয়। প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এ সাহায্য সহানুভূতি প্রত্যাখান করে।[৪৯] আরব বিশ্ব যেখানে সক্রিয়ভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য দিয়েছে সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের পক্ষে ইসরাইলি সহযোগিতা গ্রহণ খুবই স্বাভাবিক ছিল। অথচ বাংলাদেশ সরকার সাহায্য প্রত্যাখ্যান করলেও বাংলাদেশের সঙ্গে ইসরাইলি যোগাযোগের অপপ্রচার থেমে থাকেনি। সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তান সরকার মাহমুদ কাশেম নামে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের এক দূতের জেরুজালেমে উপস্থিতি এবং ইসরাইল সরকার কর্তৃক গোলাবারুদ, মেশিনগান, বিমানবিধ্বংসী কামান, ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র সহায়তার[৫০] গুজব ছড়িয়ে দেয়। মুক্তিযুদ্ধে পাকিস্তানপন্থি দল জামায়াতের মুখপাত্র 'দৈনিক সংগ্রাম' ২রা আগস্ট একটি দীর্ঘ প্রতিবেদনে মুক্তিযুদ্ধকে প্রকৃতপক্ষে ভারত-ইসরাইলের পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হিসেবে চিহ্নিত করে। উল্লেখিত কারণে ওআইসি প্রথম থেকেই পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা, সংহতিতে প্রাধান্য দেয়। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতা করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম বিশ্বের নেতৃবৃন্দ, সিভিল সমাজ ও গণমাধ্যম

যদিও সম্মেলনের পরই ইসলামি সম্মেলন সংস্থার মহাসচিব কুয়েত, ইরান, জর্ডানের প্রতিনিধির সমন্বয়ে ওআইসির মহাসচিবের যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশ, পাকিস্তান ও ভারত সফরের সিদ্ধান্ত ঘোষিত হয়। জুলাইয়ে এই প্রতিনিধিরা ঢাকা সফর করেন। সফরকালে তারা বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শন ছাড়াও গভর্নর টিক্কা খানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানে জর্ডানের রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামেল-আল-শারিফ ২৫শে জুলাই পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খানের সঙ্গে কুমিল্লা, ফেনী, নোয়াখালী সফর শেষে বলেন তার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ একটি অখণ্ড শক্তিশালী পাকিস্তান হিসেবেই থাকতে চায়। তিনি কুমিল্লায় বিভিন্ন স্তরে জনগণের সঙ্গে কথা বলে অনুধাবন করেছেন যে, তারা নিরাপত্তা এবং উন্নতির জন্য শান্তিপূর্ণ অবস্থায় পাকিস্তানে বসবাস করতে চায়। তিনি বলেন, সারাদিনের সফররত অবস্থায় তিনি কুমিল্লা, ফেনী ও নোয়াখালীতে দেখেছেন কৃষকরা মাঠে কাজ করছে, শ্রমিকরা কাজ করছে এবং এই সীমান্ত অঞ্চলে জনজীবন স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তিনি আনন্দিত এই কারণে যে, জনগণ মিথ্যা অপপ্রচারে কান দিচ্ছে না বরং অর্থনীতি, কষ্টলাঘবের জন্য কাজ করছেন। সরকার শান্তিপূর্ণ অবস্থা ও শক্তিশালী পাকিস্তান নির্মাণের জন্য কাজ করছে। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, বৈরী প্রচার ও প্রচারণা এবং অভ্যন্তরীণ হস্তক্ষেপের ফলে ঘটনমূলক পরিকল্পনা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে ফলে জনগণের জীবনযাত্রা কঠিন হয়ে পড়েছে। তিনি গুনাইবতি রেলওয়ে ব্রিজ ধ্বংস দেখে মন্তব্য করেন এগুলো প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ বিশেষজ্ঞদের কাজ ('Highly trained expertise')। এদিনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে আলাপ করে অনুধাবন করেন ইসলামিক আদর্শে উচ্চমানের নৈতিকতা নিয়ে তারা মিশনারি উৎসাহ নিয়ে কাজ করছে।[৫১]

তুরস্কের সংসদীয় কমিটির সদস্য কাসিম গুলেক দুই সদস্যের প্রতিনিধি সহকারে ইসলামাবাদ এয়ারপোর্টে সাংবাদিকদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সম্পর্কে বলেন, কোনো স্বাধীন আত্ম-মর্যাদাশীল জাতি বিচ্ছিন্নতাবাদীর প্রচেষ্টাকে নিন্দা করবেন। তিনি শরণার্থীদের সংখ্যা অতিরঞ্জিত বলে মনে করেন। তিনি জাতিসংঘের মহাসচিবের প্রস্তাব অনুযায়ী উভয় দেশের সীমান্তে নিরাপত্তা পর্যবেক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের সম্মতিতে প্রমাণিত হয় যে, পাকিস্তান বাধাহীনভাবে শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরিয়ে নিতে চায়। কিন্তু ভারত এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে। যেহেতু শরণার্থী সমস্যা পাকিস্তানের সেজন্য পাকিস্তানের এককভাবে এই সমস্যাটিকে নিয়ে এগিয়ে যাওয়া দরকার। তিনি পাকিস্তানকে অর্থ সাহায্য বন্ধ করে দেওয়ার ব্যাপারে মন্তব্য করেন যে, উন্নয়নে সহযোগিতার অর্থ এই নয় যে এটা দয়া-দাক্ষিণ্য। বরং এটা শান্তির জন্য বিনিয়োগ। তিনি বলেন, অর্থনীতিক সাহায্য কোনোভাবেই উন্নয়নশীল দেশের জন্য চাপ সৃষ্টির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা শুধু পাকিস্তানের জন্য নয় সমস্ত উন্নয়নশীল দেশের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।[৫২]

সুদানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে এক বিবৃতিতে বলেন, ভারত এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের ভেতরে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ, সেনা প্রত্যাহার এবং সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের পারস্পরিক মর্যাদা এবং সংঘাতের শান্তিপূর্ণ সমাধান দেশ ও জনগণের জন্য প্রয়োজন। বিবৃতিতে বলা হয়, পাকিস্তানের ঐক্য, জনগণের সার্বভৌমত্ব, ভৌগোলিক অখণ্ডতা এবং সেদেশের অভ্যন্তরে যা কিছু ঘটুক না কেন সেগুলো তার অভ্যন্তরীণ এবং পাকিস্তানের জনগণের বিষয়। সুদান গণতন্ত্র জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্যদের নিকট দাবি করে যে, তারা যেন তাদের সর্বশক্তি নিয়োগ করে এই সশস্ত্র সংঘাত বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন।[৫৩]

যদিও তারা বাঙালি হত্যা বন্ধে কোন ভূমিকা রাখেননি। ওআইসির এই মিশনের দু'জন সদস্য কুয়েতের সুলায়মান আবু দাউস ও ইরানের রেজা তাখওয়াইকে ভারত সফরে অনুমতি না দেওয়ায় মহাসচিব ৩১শে জুলাই এক ঘোষণার দ্বারা তাঁর ভারত সফর বাতিল করেন। মহাসচিব পরিষ্কার জানিয়ে দেন যেহেতু তিনি সংস্থার মহাসচিব হিসেবে এই সফর করেছেন ব্যক্তিগতভাবে কোনো দেশের প্রতিনিধি হিসেবে নয় তাই অন্যান্য সদস্য ছাড়া তাঁর সফরের প্রশ্নই ওঠে না।[৫৪] তিনি শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ভারতের আন্তরিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেন এবং বলেন পাকিস্তান নয়, ভারতের কারণেই শরণার্থী সমস্যা সমাধান হচ্ছে না।[৫৫] তিনি পাকিস্তানের মতো শরণার্থীদের সংখ্যা ভারতের ঘোষিত সংখ্যার চেয়ে অনেক কম মন্তব্য করেন। তিনি পরিষ্কার বলেন, ভারত শরণার্থীদের সংখ্যা ৭.২ মিলিয়ন বললেও প্রকৃতপক্ষে তা ৪ মিলিয়নের বেশি হবে না।[৫৬] অবশ্য ভারত সরকার মহাসচিবের বক্তব্য উড়িয়ে দেয় এবং স্পষ্ট জানিয়ে দেয় যে, দুটি কারণে ভারত ইসলামি সংস্থার প্রতিনিধিদের গ্রহণ করতে পারে না : ১. ভারতে ৭০ মিলিয়ন মুসলমানের বসবাস হওয়া সত্ত্বেও এ সংস্থা কখনো ভারতের প্রতিনিধিকে গ্রহণ করেনি; ২. ওআইসি বরাবর সাম্প্রদায়িক মনোভাব পোষণ করেছে।[৫৭] সাংবাদিকদের টেংকু আবদুর রহমান জানান ওআইসি শরণার্থীদের সহায়তা করতে চায় এবং বৈঠকে তা আলোচিত হলেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী কোনো প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেননি।[৫৮] মহাসচিবের এসব একপেশে বক্তব্য থেকে মনে হয় তিনি পাকিস্তানের পথ ধরেই এগুচ্ছিলেন।

কাবুল সরকার ৬ই আগস্ট সংস্থাকে জানিয়ে দেয় আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যার কারণে তারা সম্মেলনের আয়োজন করতে পারবে না।

অনুষ্ঠানে চূড়ান্ত ইশতেহার তৈরির জন্য একটি কমিটি গঠিত হয়। সেনেগালের প্রতিনিধি যিনি সম্মেলনের সঞ্চালক নির্বাচিত হয়েছেন তিনি সংবাদ সম্মেলনে ২২শে জুন বলেছেন, মুসলিম বিশ্বের মধ্যে সহযোগিতার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করাই এই সম্মেলনের লক্ষ্য। এ বক্তব্য সৌদি আরবিয়ান রেডিও প্রচার করে। তিনি এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সৌদি আরবের প্রচেষ্টা হলো মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করা।

কনফারেন্সের সেক্রেটারি প্রিন্স আবদুল রহমান মুসলিম বিশ্ব এ পর্যন্ত দুটি সভা করেছে, একটি রাবাতে এবং অন্যটি করাচিও। তিনি বলেন এই সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ইসলামিক সংহতি এবং সেক্রেটারিয়েট জেনারেল চার্টার বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। এই চার্টার ইসলামিক পররাষ্ট্র বৈঠকে পেশ হবে।[৫৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২ জাতির ইসলামিক কনফারেন্সের এক যৌথ বিবৃতিতে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপে নিন্দা জ্ঞাপন করা হয়। উক্ত কনফারেন্সে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতার নিরাপত্তা বিধানে পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করা হয়।[৬০] উক্ত ২২ জাতির কনফারেন্সের পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত কমোডর আবদুল হামিদ পাকিস্তানের পক্ষে নেতৃত্ব করেন। যৌথ বিবৃতিতে আরো বলা হয়, পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষায় যেকোনো বৈদেশিক রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের নিন্দা করা হয়।[৬১]

আফগানিস্তান: আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহ-র সম্মানে যুগোশ্লোভিয়ার প্রেসিডেন্ট মার্শাল টিটোর ভোজসভায় প্রদত্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে বাদশাহ যুদ্ধাবস্থার (ভারত-পাকিস্তান) গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, "The danger it represents for the security of our region and for peace in the world."[৬২]

লিবিয়া: লিবীয় নেতা কর্ণেল মুয়াম্মর গাদাফি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে গভীর দুঃখ প্রকাশ করে বলেন যে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্ধে বিলম্ব উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। ভারত উপমহাদেশে পরাশক্তি ঔপনিবেশিক স্বার্থে অনুপ্রবেশের সুযোগ পাবে।[৬৩]

মিশর থেকে ত্রিশ মাইল দূরে মানওয়াদহ-এ পাকিস্তান নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল মোজাফ্‌ফর হাসান-এর সঙ্গে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন যাই হোক না কেন পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষায় আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে (President Anwar Sadaat of Egypt has reiterated his support for Pakistan saying, "Whatever happens, we shall continue to support the integrity of Pakistan")। এই সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ইকবাল আহমদ আখন্দ, মিশরের নৌবাহিনীর প্রধান অ্যাডমিরাল মোহাম্মদ ফাহ্‌মী উপস্থিত ছিলেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তার দু'বার সাক্ষাতের কথা স্বরণ করে তিনি বলেন, রাবাত এবং কায়রোতে ঐ সাক্ষাৎ দুটির মাধ্যমে দু'দেশের যে সহযোগিতা ব্যক্ত হয়েছে তা অব্যাহত থাকবে। পাকিস্তান বিরাজমান অবস্থারন পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক পরিকল্পনা ঘোষণায় তিনি খুশি হয়েছেন।[৬৪]

উগান্ডার প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইদি আমিন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বরাবর এক পত্রে বলেন, তার দেশ সর্বদাই অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে। তিনি জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী পাকিস্তানের সঙ্গে যে পার্থক্য রয়েছে তার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আবেদন জানান।[৬৫]

পাকিস্তান সশস্ত্রবাহিনী প্রতিটি মুসলমানের জন্য গর্বের উৎস। জর্ডান রাষ্ট্রদূত সৈয়দ কামেল আল শারীদ যখন তিনি বাদশাহ্ হোসেন কর্তৃক পাকিস্তান বিমান বাহিনীর কর্মকর্তাদের মেডেল উপহার দিচ্ছেলেন। জর্ডানের রাষ্ট্রদূত তার বাসভবনে দুপুরের ভোজসভায় আরো বলেন, পাকিস্তানের সশস্ত্র বাহিনী ইসলামের আদর্শ ও ঐতিহ্য সমৃদ্ধ যারা অপ্রতিদ্বন্দ্বী শক্তি। জর্ডান-পাকিস্তান সম্পর্ক পারস্পরিক মর্যাদা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহযোগিতাপূর্ণ যা দুদেশের সশস্ত্র বাহিনীর সম্প্রীতির ভিত্তি। তিনি আরো বলেন, দুদেশের বন্ধুত্বের অনুপ্রেরণা মুসলিম দেশসমূহের সম্পর্কের ক্ষেত্রে দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে।[৬৬]

মুক্তিযুদ্ধের সময় ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট সুহার্তো ৭ই ডিসেম্বর ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষের বিষয়ে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেন। ৬ই ডিসেম্বর মন্ত্রী পরিষদ সভাশেষে ভারত-পাকিস্তান সম্পর্কে বিনাগ্রাহা প্রাসাদ থেকে এই সংকট সম্পর্কে বিবৃতি প্রদান করেন। যেহেতু ইন্দোনেশিয়া ভারত ও পাকিস্তানের উভয়ের বন্ধু, সেহেতু বর্তমানে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্ক নিয়ে সে উদ্‌বিগ্ন। বিবৃতিতে প্রেসিডেন্ট সুহার্তো বলেন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে প্রকাশ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয় তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন। ইন্দোনেশিয়া তার উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এই ধরনের বিদ্রোহ ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন মোকাবেলা করেছে সেজন্য সে সহজেই উপলব্ধি করেন শুধু যুদ্ধ সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় নয়। যুদ্ধ অবশ্যই ধ্বংস ডেকে আনে এবং জনগণের দুর্দশা বৃদ্ধি করে ফেলে। সেজন্য ইন্দোনেশিয়ার সরকার আশা করেন যুদ্ধমান দুটো দেশ বুঝতে সক্ষম হবে যে, যুদ্ধের ফলাফল কী হতে পারে এবং শান্তিপূর্ণ সমাধানের পথে তারা প্রচেষ্টা চালাবে বলে তিনি আশা করেন।[৬৭]

মালয়েশিয়া: মালোয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী টুংকু আবদুল রাজ্জাক ৮ই ডিসেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মানবিক কারণে অবিলম্বে বৈরিতা পরিহারে যুদ্ধবিরতির আবেদন জানান। তিনি শান্তিপূর্ণ উপায়ে দুদেশের পার্থক্য নিরসনের আশা প্রকাশ করেন।[৬৮]

সুশীলসমাজ

ইন্দোনেশিয়া: ইন্দোনেশিয়ার সাবেক রাষ্ট্রদূত যিনি ব্রাজিল ও ইটালিতে নিয়োজিত ছিলেন তিনি 'একটি দেশের ট্রাজেটি' শীর্ষক প্রবন্ধে লেখেন, 'বিশ্ব ইতিহাসে দেখা যায় নেতৃত্বের উচ্চাভিলাষ ও কর্তৃত্ব জনগণকে দুর্যোগের পথে নিয়ে যায়। জেনারেল ইয়াহিয়া খানের রাজনৈতিক অজ্ঞতা ভূট্টোর সঙ্গে চক্রান্ত এবং পাঞ্জাবি জেনারেলদের নিষ্ঠুর দমন প্রক্রিয়া পূর্ব পাকিস্তানের ভূমিকে রক্তাক্ত করেছে। পাকিস্তানকে ইসলামীক রাষ্ট্র বলা হলেও পাকিস্তান শাসকবৃন্দ তার নিজস্ব জনগণের প্রতি ইসলামের ন্যূনতম সম্মান প্রদর্শন করেনি।[৬৯]

দামেস্ক: ঘটনাবলির প্রবণতায় দুদেশের (ভারত-পাকিস্তান) মধ্যে যুদ্ধ শরণার্থীদের আগত প্রবাহকে থামিয়ে দেবে না কিংবা রাজনৈতিক সমঝোতার দুয়ার খুলে দেবে না বরং সামরিক সমাধানে বাড়তি চেষ্টা হবে না মানুষের দুর্ভোগকে বাড়িয়ে দেবে। লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের বাচাতে সর্বাত্মক উদ্যোগ নিতে হবে।[৭০]

পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষায় পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করিয়া নাইজেরিয়া ও পশ্চিম আফ্রিকার মুসলিম সোসাইটি একটি বিরাট মাহফিল-ই-মিলাদ লাগোসে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পাকিস্তানের হাই কমিশনার ড. এস. কোরেশী।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অনুষ্ঠানে আয়োজক কমিটির সভাপতি আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দিন আবদুল কাদেরী আখরেদী পাকিস্তান সরকার ও জনগণের অখণ্ডতা রক্ষার প্রচেষ্টায় আন্তরিক সমর্থন জ্ঞাপন করেন। তিনি বলেন, যে নামে বলা হোক না কেন, বিচ্ছিন্নতা সব অর্থেই বিচ্ছিন্নতা।[৭১] তিনি পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে আশ্বস্ত করে বলেন, শান্তির শত্রুরা তারা যাই করুক বা তাদের মনে যাই থাকুক না কেন, সর্বশেষে সত্য এবং ভ্রাতৃত্ব বিজয় হবে। তিনি তার দেশের উদাহারণ দিয়ে বলেন, নাইজেরিয়াতেও এ ধরনের ছোটো-খাটো সমস্যা ছিল যার মধ্যেও আমরা ভ্রাতৃত্বসুলভ মনোভাব নিয়ে একই মাটিতে বসবাস করছি। তিনি পবিত্র কোরআনের সূরা-আল-ফীল-এর উদ্ধৃতি দেন। একইসাথে তিনি পাকিস্তান সরকারের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার লক্ষ্যে সাম্প্রতিক ব্যবস্থাকে সমর্থন দেন। তিনি আশা করেন, শান্তির শত্রুরা পরাজিত হবে এবং পাকিস্তানের ভ্রাতাগণ বিজয়ী হবে যেমনটি সমগ্র মুসলিম বিশ্বের যেসকল দেশ অনুরূপ সমস্যায় আছে তারাও বিজয়ী হবে।[৭২]

মিশর কায়রোর 'আল-আহরাম' পত্রিকার সিনিয়র সম্পাদক ও সাবেক আরব লীগের ভারতীয় প্রতিনিধি মি. মাকসুদ বাংলাদেশ সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বলেন, আরব জনগণ ও রাষ্ট্রগুলো পূর্ববঙ্গের সমস্যার ট্রাজিক ডাইমেনশন ক্রমশ উপলব্ধি করছে। পূর্ববঙ্গের এ মর্মান্তিক সমস্যার সমাধানের শেখ মুজিবের অবিলম্ব মুক্তি জরুরি।[৭৩]

কমনওয়েলথ কনফারেন্স

গায়েনা: কুয়ালালামপুর অনুষ্ঠিত কমনওলেথ্ আন্তর্জাতিক পার্লামেন্টারি গায়েনার প্রতিনিধি আবেগপূর্ণ ভাষণে বলেন এটা আন্তর্জাতিক রীতি ও নীতি যে আমরা একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ অনুষ্ঠিত, কিন্তু এটা ঠিক যে মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা দুঃসহ অবস্থা যেখানে প্রতিনিয়ত ঘটে চলেছে, সকল জননৈতিকভাবে অমর্যদা বিপন্ন বৈশ্বিক ন্যায্যতা সেক্ষেত্রে কমনওয়েলথ এর পার্লামেন্ট সদস্যদের এ সম্পর্কে কথা বলার মতামত দেবার অধিকার দেয়। আইনের শাসন ও বৈশ্বিক ন্যায়তার স্বার্থে ভারত-পাকিস্তানে যা ঘটছে তার অত্যাধিক গুরুত্বপূর্ণ।[৭৪]

ইন্দোনেশিয়া: কুয়ালমপুরে অনুষ্ঠিত কমনওয়েলথ পার্লামেন্টারি সম্মেলনে পর্যবেক্ষক মোহাম্মদ রয়েম এই ব্যক্তিগত অভিত প্রকাশ করেন যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় তা তিনি স্বীকার করেন না। বৈশ্বিক শান্তির ক্ষেত্রে কোনো দেশ যদি হুমকি হয়ে দাঁড়ায় তখন বিষয়টি অভ্যন্তরীণ থাকে না। তিনি পরামর্শ দেন জাতিসংঘ এবং নিরাপত্তা পরিষদ কেন হস্তক্ষেপ করছে না। ভারতের পক্ষে বিষয়টি জাতিসংঘ উত্থাপন সঠিক হবে না– তবে সহানুভূতিশীল দেশগুলো এ ব্যাপারে স্ব-ইচ্ছায় এগিয়ে আসতে পারে।

মালয়েশিয়া: মালয়েশিয়া ডেমোক্রেটিক অ্যাকশন পার্টির নেতা মোরিন তার বক্তব্যে ঈষৎ করে বলেন ইন্দোনেশিয়ার সরকার এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ বিষয়কে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সমস্যা হিসেবে চিন্তা করছে। বাংলাদেশ স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। দেশটির রয়েছে সুনির্দিষ্ট সীমান্ত, জনগণের উপর তাদের আইনানুগ কর্তৃত্ব রয়েছে জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সরকার ও প্রশাসনিক কাঠামো রয়েছে। দেশটির জাতিগত ও ভাষাগত মানবাধিকার ঘোষণার অনুচ্ছেদ ২০ (ক) বলা হয়েছে, 'জনগণের অভিপ্রায় হবে সরকারের ভিত্তি।' কিন্তু সামরিক শক্তি বলে জনগণের আকাঙ্ক্ষা ধূলিসাৎ করা হয়েছে। ইয়াহিয়া খান বাস্তবিক পক্ষে গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে যা আন্তর্জাতিক আইনে অপরাধ হিসেবে ঘোষিত। এটা অত্যন্ত পরিহাসের বিষয় যে, পশ্চিম পাকিস্তান ভিয়েতনামের হত্যাকাণ্ডে সোচ্চার বর্তমানে তারাই বাংলাদেশের চারমাসে যে সংখ্যায় গণহত্যা চালিয়েছে যা ভিয়েতনামে চার বছর লেগেছে। শরণার্থী সদস্য বন্যা ইত্যাদির উল্লেখ করে বলেন এই সম্মেলন যেন কার্যকর হয় তার জন্য তিনি প্রস্তাবনা উত্থাপন করেন :

১. অবিলম্বে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিঃশর্ত মুক্তি,
২. বাংলাদেশ হতে ইয়াহিয়া খানের সৈন্য প্রত্যাহার,
৩. বাংলাদেশকে পৃথক সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান ও লক্ষ্য অর্জনে :

ক. বাংলাদেশে যেন কলম্ব ও মালদ্বীপ হয়ে সৈন্য না আসতে পারে তার জন্য শ্রীলংকা ও ব্রিটেনের উপর চাপ প্রদান;
খ. ভারতের গণমাধ্যমে মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য উদ্দীপক সংগীত প্রচারের ব্যবস্থা করা;
গ. পরাশক্তিসমূহ যেন ইয়াহিয়া খান ও তার চক্রকে গণহত্যা বন্ধে বুঝাতে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করে;
ঘ. স্ক্যান্ডিনেভীয় দেশসমূহ শরণার্থীদের সাহায্য দিচ্ছে। এই সাহায্য রেডক্রস ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার মাধ্যমেও হতে পারে সে জন্য অনুরোধ জানান।

নয়াদিল্লি কনফারেন্স

বাংলাদেশ প্রশ্নে ১৮ থেকে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দিল্লিতে আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে ২৪টি দেশের ১৫০জন প্রতিনিধি উপস্থিত হন। উক্ত সম্মেলনে মুসলিম দেশসমূহের মধ্যে আফগানিস্তান, ইউ,এ,আর, সংযুক্ত আরব-আমিরাত, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়ার প্রতিনিধিবর্গ অংশগ্রহণ করেন। আফগানিস্তানের প্রতিনিধি কুদরত উল্লাহ হাদাত তার বক্তব্যে বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তার দেশের জনগণের গভীর সহানুভূতির কথা উল্লেখ করে বলেন, বাংলাদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অর্জন করবে কেননা, ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে কোনো মিল নেই। কিন্তু জনগণের ভোটের মাধ্যমে তা অর্জিত না হওয়ার ফলে বাংলাদেশের জনগণ নির্মম বর্বরতার শিকার হয়েছে যা আফগান জনগণ নিন্দা জ্ঞাপন করেন। তিনি সমগ্র বিশ্বের সহানুভূতি বাংলাদেশের অনুকূলে রয়েছে এবং অধিরেই তারা বিজয়ী হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংযুক্ত আরব আমিরাতের ক্লোডিজ মাকসুদ যিনি পর্যবেক্ষক হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন এটা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যাবে যে, পূর্ববঙ্গের ভাগ্য ভারত ও পাকিস্তান-ভারতের অংশ নয়, হতে পারে না এবং হওয়া উচিত নয়। এটি সত্য যে বাংলাদেশের জনগণ সংগ্রাম করছে এবং তাদের স্বাধীনতা পাওয়া উচিত এবং একইসঙ্গে শেখ মুজিবুর রহমানকে মুক্তি প্রদান করা উচিত। এটি একটি ঐতিহাসিক মুহূর্ত। পূর্ববঙ্গের জনগণের মর্যাদা সম্মান ও সভ্যতার জন্য লড়াই করবো।

ইন্দোনেশিয়া থেকে আগত পর্যবেক্ষক মোহাম্মদ রয়েম তার বক্তব্যে বলেন, যদি কোনো দেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি যদি আন্তর্জাতিক হুমকির কারণ হয় তখন বিষয়টি অভ্যন্তরীণ সমস্যা থাকে না। এটা পরিষ্কার যে, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা আন্তর্জাতিক শান্তির পক্ষে হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মালয়েশিয়া থেকে আগত প্রতিনিধি ভি. ডেজ্জি বলেন, বর্তমান সংকট সম্পর্কে মালয়েশিয়ার সরকার সম্পূর্ণ নীরব। কিন্তু জনগণ উদ্‌বিগ্ন। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা পরিপূর্ণতা পাক তা দেখতে চায়। কেউ মনে করেন, এটা ভারত-পাকিস্তানের সংঘাত; আবার অনেকেই বিশ্বাস করেন বাংলাদেশের জনগণ স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছে। আমরা যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারে বিশ্বাস করি তাহলে বাংলাদেশের জনগণের অধিকার আদায়ে নীরব থাকতে পারে না। দ্বিতীয়ত, কেউ যদি বাংলাদেশ সম্পর্কে কথা বলতে চায় তাহলে তার যোগ্য ও যথার্থ গণতান্ত্রিক নেতা হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। যদি এশিয়ায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অক্ষুণ্ন রাখতে হয় তাহলে অবিলম্বে তাকে মুক্ত করা উচিত এবং তার সঙ্গে কথা বলা উচিত। জাতিসংঘ যেভাবে কাজ করছে তাতে মালয়েশিয়ার জীবন বিব্রত ও উদ্‌বিগ্ন। এই ভয়ংকর বর্বর গণহত্যার নিন্দা করা প্রয়োজন এবং এ সঙ্গে এও বলে দিতে চাই মালয়েশিয়ান জনগণ বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে তাদের সঙ্গে আছে যে সংগ্রাম তাদের স্বাধীনতা এনে দেবে।

দিল্লি সম্মেলনে ১৩টি প্রস্তাব সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে পাকিস্তানের অধীন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন, শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য ভারত সরকার ও জনগণের প্রশংসা করা হয়। একই সাথে সভা বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংগ্রামকে স্বাধীনতা সংগ্রাম হিসেবে বিবেচনা করার জন্য বিশ্ব সম্প্রদায়ের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পাকিস্তান গুরুতর মানবাধিকার লঙ্ঘনকে জাতিসংঘে ও তার অঙ্গ-সংগঠনসমূহে উত্থাপন করা জোর দাবি জানিয়ে বলা হয় মানবাধিকার লঙ্ঘনে বিশ্বশান্তি হুমকির মুখে ঠেলে দিচ্ছে। সভা দৃঢ়ভাবে মনে করে, রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হয় আশু করণীয়। বাংলাদেশ সরকারকে বিশ্ব সম্প্রদায়ের স্বীকৃতি দেওয়া প্রয়োজন এজন্য যে, ভৌগোলিক, ঐতিহাসিক, জাতিগত, ভাষাগত বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের অস্ত্র সরবরাহ করা নৈতিক দায়িত্ব। পাকিস্তানে অস্ত্র ও অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধের প্রস্তাব গৃহীত হয়। দেশে বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের পক্ষে জনমত গঠন জানানো হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম দেশের গণমাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধ : মিশ্র প্রতিক্রিয়া

পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালি জাতির মুক্তিযুদ্ধ এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর নির্বিচার গণহত্যা, ধর্ষণ ও মানবতাবিরোধী জঘন্যতম কর্মকাণ্ড বিভিন্ন দেশের মতো বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর সংবাদপত্রেও প্রকাশিত হয়।

পূর্ব পাকিস্তানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং বিজয়ী দলের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অস্বীকৃতি এবং আলোচনার অন্তরালে সামরিক প্রস্তুতি এবং নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর সশস্ত্র আক্রমণ, নিরাপত্তাহীন জনগণের প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয়গ্রহণ, শরণার্থী সমস্যা, ভূ-রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের স্বাধীনতার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনা, মুজিবনগর সরকার গঠন এবং বিশ্ব পরিসরে কূটনৈতিক তৎপরতা ও বিরাজমান সংকট সম্পর্কে বিভিন্ন সংবাদপত্রে সংবাদ ও সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। প্রধানত মুসলিম দেশগুলোর সংবাদপত্র মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে, কয়েকটি সংবাদপত্র পক্ষে বা নিরপেক্ষভাবে সংবাদ প্রকাশ ও বিশ্লেষণ দেখা যায়। সৌদি আরবসহ ইরান, নাইজেরিয়া এবং ত্রিপোলির সংবাদপত্রসমূহ সরাসরি পশ্চিম পাকিস্তানি সামরিক সরকারের পক্ষাবলম্বন করে এবং পূর্ব পাকিস্তানের মুক্তিযুদ্ধকে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হিসেবে চিহ্নিত করে এবং তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে উল্লেখ করে। এ সকল সংবাদপত্র একতরফাভাবে ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে ভারতের ষড়যন্ত্র হিসেবে আখ্যায়িত করে একইসাথে বাঙালির মুক্তিযুদ্ধে ইসরাইলের প্ররোচনা আবিষ্কার করে। পকিস্তানের অখণ্ডতা বিনষ্টে ভারত অস্ত্র ও অন্যান্য সাহায্য দিয়ে উস্কানি দিচ্ছে।

এ ধরনের সংবাদের বিপরীত চিত্র পাওয়া যায় ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, তুরস্ক, বৈরুত, কুয়েত এমনকি সেনেগালের পত্রিকায়। এসব পত্রিকা সামরিক জান্তা কর্তৃক গণরায় বানচাল, বাঙালির নিধনযজ্ঞ, নির্বিচার হত্যাকাণ্ড, শরণার্থীদের দুর্দশা, মুক্তিযুদ্ধে গেরিলাদের প্রতিরোধ, আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক বিশ্লেষণ ও পাকিস্তানের সামরিক চক্রসহ জেনারেল ইয়াহিয়াকে দায়ী করে সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশ করে। একইসঙ্গে বৃহৎ শক্তিগুলোর ভূমিকার সমালোচনা করে।

তুরস্ক থেকে প্রকাশিত 'আঙ্কারা নিউজ' ম্যাগাজিন ইয়ানকি এক প্রতিবেদনে এই অভিমত প্রকাশ করে যে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেওয়ার যে প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করেছেন তা বাস্তবায়ন হয়নি। এখনও বেসামরিক শাসন প্রতিষ্ঠা- অসম্ভব, কেননা সবকিছু ত্যাগ করে পাঁচ লক্ষাধিক মানুষ সীমান্ত অতিক্রম করেছে এবং সেখানে তারা আশ্রয় নিয়েছে। বর্তমান অবস্থায় সামরিক চক্র মুসলিম লীগকে সমর্থন করে যদিও এই দলটি পূর্ববঙ্গে একটিও আসন পায়নি। অন্য বিকল্প পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক পার্টি যার নেতৃত্বে আমিন কিন্তু জনগণের মধ্যে বর্তমানে তিনি জনপ্রিয় নন। পত্রিকাটিতে এই অভিমত ব্যক্ত করা হয় শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি ব্যতীত পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা অসম্ভব যদি বর্তমানে তা হবার নয়।[৭৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৈরুত থেকে প্রকাশিত সাপ্তাহিক পত্রিকা আল-আনবা ভারত সীমান্ত পরিদর্শন করে এক রিপোর্টে লেখেন পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর যে ট্রাজেটি তা বাস্তবিক অর্থেই মর্মান্তিক, নির্যাতন কল্পনাতীত। নারী, শিশু ও বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যে নৃশংস অত্যাচার করা হয়েছে যা প্যালেস্টানিদের উপর যেভাবে ইহুদিরা করেছে। পত্রিকায় উল্লেখ করা হয়, শরণার্থীদের সংখ্যা প্রায় আশি লক্ষ।[৭৬]

কেনিয়ার 'সানডে পোস্ট'-এর সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'ক্র্যাস ইন্ডিয়া' আন্দোলন পশ্চিম পাকিস্তানে ছড়িয়ে গেলেও দুর্দশাগ্রস্ত শরণার্থীরা যাতে তাদের মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারে সে পরিবেশ তৈরি করা।[৭৭]

ইন্দোনেশিয়া রায়া পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বলা হয়েছে, যুক্তির পরাজয় ঘটেছে, কামান কথা বলছে। পাকিস্তান এখন ইন্দোনেশিয়ায় বিশেষ প্রতিনিধি পাঠিয়েছে। কিন্তু বিশ্ব দেখেছে পাকিস্তান কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানে তার নিজ জনগণের সঙ্গে জঘন্য আচরণ করেছে, বিজয়ী আওয়ামী লীগকে ধ্বংস করতে উদ্যত হয়েছে, শেখ মুজিবুর রহমানকে বন্দি করেছে, তাঁর অনুসারীদের হত্যা বা গ্রেফতার করেছে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সরকার বাংলাদেশের জনগণের উপর আক্রমণ চালালে লক্ষ লক্ষ শরণার্থী ভারতে আশ্রয় নিয়েছে, যার ভার পৃথিবীর কোনো একক দেশের পক্ষে সম্ভব নয়। বাংলাদেশের জনগণের অভিপ্রায়ের যথাযথ সম্মান প্রদর্শন পাকিস্তানকেই করতে হবে এবং এজন্য তাদের ভুল সংশোধন করতে হবে।[৭৮]

ইরানের 'নেতা-ই-ইরান নভিন' (NEDA-I-IRAN NOVIN) ১১ই জুলাই উপমহাদেশে উদ্‌বেগ নিরসনে ভারতের নেতৃত্বকে আন্তরিকভাবে একটি স্বাধীন এবং স্বার্বোভৌম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার আহ্বান জানান। ভারতের সাপ্তাহিক পত্রিকা ব্লিৎস (Blitz) পত্রিকার সম্পাদক কারানজিয়া সম্পাদকীয়তে বলেছেন, ভারতের নেতৃত্ব মনে করে পাকিস্তান একটি অভিনব রাষ্ট্র যার আয়ুষ্কাল স্বল্প। ভারতের এই মনোভাব সম্পর্কে উক্ত পত্রিকায় বলা হয়, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের হস্তক্ষেপ করা উচিত নয় এবং ভারতসহ বিদেশি শক্তিগুলোর বাংলাদেশ সংকটকে নিরুৎসাহিত করা উচিত এবং বর্তমান পাকিস্তানের দুর্বল অবস্থান থেকে মুনাফা অর্জনের সুযোগ নেওয়া সঠিক হবে না। পত্রিকাতে বলা হয়, পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে বর্তমান সংকট থেকে উত্তরণ হবে সবচেয়ে ভালো। পত্রিকাটি সরকারি দলের অফিসিয়াল মুখ্যপাত্র হিসেবে এই বক্তব্য প্রদান করেন।

স্পেনের দৈনিক পত্রিকা দি আরাবিয়া ২২শে জুন, ১৯৭১ সালে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেন, শরণার্থীদের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করা থেকে ভারতকে নিবৃত্ত থাকতে হবে এবং এই বিষয়টিকে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যাবে না। ভারত শরণার্থীদের ছায়াবৃত্তভাবে গেরিলা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে তাদের প্রয়োজনের সময় যাতে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করতে পারে।[৭৯] পত্রিকাটি সতর্ক করে দিয়ে বলে, এর পরিণামে সম্ভবত ভারত-পাকিস্তানের নতুন যুদ্ধ ডেকে আনবে। পত্রিকাটি আরও মন্তব্য করে যে, এই গেরিলা ক্যাম্পগুলো পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত এবং পশ্চিমবঙ্গের কম্যুনিস্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পার্টি দুই বাংলাকে স্বাধীন করবে যা নিয়ে নয়াদিল্লির সতর্ক হওয়া উচিত। পত্রিকাটি আরও মন্তব্য করেন দুর্বল পাকিস্তান ভারতের জন্য নিশ্চয় তুষ্টিকর। কিন্তু পশ্চিমবাংলার হিন্দু কম্যুনিস্টরা বাংলাদেশকে গিলে ফেললে তা হবে ভারতের জন্য ভয়ংকর ব্যাপার। পত্রিকাটি আরও বর্ণনা করে যে, ব্রিটিশ প্রতিনিধিরা এ কথা স্বীকার করেছে যে, ভারতীয় অনুপ্রবেশকারীরা পাকিস্তানের সীমান্তের ত্রিশ-চল্লিশ কিলোমিটারের ভেতরে অবস্থান নিয়েছেন। পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উৎসাহিত করার জন্য ভারতীয় গণমাধ্যম ও বেতারকে দোষারোপ করেন। পত্রিকাটি আরো বলেন, পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সর্বত্র নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছেন সেক্ষেত্রে বাংলাদেশ কেবল মাত্র আহম্মকদের কল্পনা ব্যতীত কিছু নয়।[৮০]

'ডেইলি আল বিলাদ' জেদ্দা, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল-এর সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, 'পাকিস্তানের জন্য সম্মানজনক'। এতে মন্তব্য করা হয় যে, 'মুজিবুর রহমানের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা সহায়তার জন্য ইসরায়েলের সাথে যোগাযোগ করেছে তা পাকিস্তানের জন্য যথেষ্ট সম্মানজনক।' এতে বলা হয়, 'ইসরায়েলের কাছ থেকে দলটি কোনো সাহায্য পায়নি। দলটির উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছে।' এই সম্পাদকীয়তে ইসরায়েলকে আখ্যায়িত করা হয় মানবতা, আরব এবং ইসলামের শত্রু হিসেবে। বলা হয়েছে, বাংলাদেশের প্রতিনিধি মাহমুদ কাশিম ইসরায়েলি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করছে। পূর্ব পাকিস্তানি জনগণকে ইসরায়েলিরা সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। আরবদের ধারণাতেই ছিল যে, কেউ যদি তার দেশের ঐক্যের ব্যাপারে অসৎ হয় তবে সে নিশ্চিতভাবেই একদিন ইসরায়েল বা অনুরূপ দেশের সঙ্গে যোগাযোগ করবে। শত্রুরা যদি পাকিস্তানের ক্ষতি করার জন্য ইসরায়েলের কাছ থেকে সহায়তা নেয় তাহলে ঐ মুসলিম দেশটির জন্য সম্মানজনক বিবেচিত হবে। এ দেশটি (পাকিস্তান) কোনো ঘটনাতেই আরবদের পরিত্যাগ করেনি এবং হুমকি বা চাপের মুখেও ফিলিস্তিনিদের প্রতি তাদের অবস্থান ধরে রেখেছে। "আমরা আরবরা স্থায়ীভাবে নৈতিক সমর্থন পাওয়ায় পাকিস্তানের কাছে ঋণী। কিছু আরব দেশ যখন তাদের অবস্থানে অবিচল ছিল না, তখনও তারা এই সমর্থন দিয়েছে। তাদের এই সমর্থন ইসরায়েলকে ক্ষুব্ধ করেছে। এজন্যই ইসরায়েল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের প্রতি সহানুভূতিশীল। কিন্তু ইসরায়েলের চেয়ে বড় শক্তিও আরবদের প্রতি সমর্থন দান থেকে পাকিস্তানকে বিরত রাখতে পারবে না।" পূর্ব পাকিস্তান সংঘাত সম্পর্কে বলা হয়, এটি মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ঘটানোর চেষ্টা মাত্র। "তথাকথিত মাহমুদ কাশিম (যিনি ইসরায়েলের সাথে বাংলাদেশের হয়ে যোগাযোগ করেন) গত ১৫ বছর ধরে তেহরানে বসবাস করছেন এবং পরে ইরান সরকার তাকে বহিষ্কার করে। তিনি সেখান থেকে জেনেভা যান। নিঃসন্দেহে তিনি সেখানে ইসরায়েলি গোয়েন্দাদের সংস্পর্শে আসেন এবং তারাই তেলআবিবে তার সফরের ব্যবস্থা করেন। কিছু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ব্যাপারে আমাদের অভিমত কিছুতেই পাল্টাবে না যে তারা হচ্ছে সেসব লোক যারা পাকিস্তানের কোনো ক্ষতি করার আগে বরং নিজেদেরই ক্ষতি করছে।"

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলো সমালোচনা করে নাইজেরিয়ার 'ডেইলি মর্নিং পোস্ট' ১০ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল-এ তুনজি আদেওসুন লিখিত একটি রিপোর্ট প্রকাশ করে, যার শিরোনাম ছিলো, 'পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচেষ্টা'। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ একটি রাজনৈতিক গোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতার একটি প্রচেষ্টা চালিয়েছে এবং পাকিস্তান সরকার পরিস্থিতি দমনের জন্য পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু বিচ্ছিন্নতাবাদীদের কাছ থেকে সশস্ত্র প্রতিরোধের মুখেও সরকার পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসে। পত্রিকাটিতে আরো বলা হয়, পাকিস্তানের এ যুদ্ধই এমনটা দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে এবং পশ্চিমা প্রচারমাধ্যমগুলোর কিছু অংশ স্পর্শকাতর ভূমিকায় নেমেছে। দেশটির পরিস্থিতি সম্পর্কে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বিবরণ দেওয়ার ঘটনার মতই নাইজেরিয়ার সমস্যাকালে পাঠকদের অনুরূপ খবর দেওয়া হয়েছিল। এই সাংবাদিকরা পাকিস্তানের পরিস্থিতিকে ভিয়েতনামের সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করেছে। তারা পশ্চিম পাকিস্তানিদের যুক্তরাষ্ট্রের স্থানে এবং পূর্ব পাকিস্তানি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের উত্তর ভিয়েতনামবাসীদের সঙ্গে তুলনা করছে। কিন্তু একটি শিশুও জানে অধিক যুক্তিযুক্ত বিশ্লেষণ এবং যা প্রত্যেকেই কামনা করে তা হচ্ছে নাইজেরিয়ায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের বিরুদ্ধে সম্প্রতি ফেডারেল সৈন্য পাঠিয়েছে। গুলি ছুঁড়তে উৎসাহী পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ছবি সম্পূর্ণ মিথ্যা। এই রিপোর্টে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আন্দোলনের সংগ্রামকে বলা হয়েছে 'বিচ্ছিন্নতার একটি প্রচেষ্টা'। আর পশ্চিম পাকিস্তানি সেনার বর্বর হামলাকে বলা হয়েছে 'পরিস্থিতি দমনের জন্য নেওয়া পদক্ষেপ'।

"আরেকটি বিস্ময়কর খবরে কিছু শরণার্থী লন্ডনে একটি পত্রিকাকে বলেছে যে, পাকিস্তানি সৈন্যরা তাদের গলায় ও বুকে গুলি করে এবং তারা বেঁচে যায়। একজনের গলা এবং একজনের বুকের মধ্যদিয়ে সৈন্যদের গুলি চলে যাওয়ার পর বেঁচে যাওয়ার ঘটনা কেউ বিশ্বাস করলে তাকে নতুন বিজ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে।"

এই সংবাদপত্র শেখ মুজিবুর রহমানকে সমালোচনা করে এবং বলে যে, শুরু থেকেই শেখ মুজিব আলোচনার ব্যাপারে আন্তরিক ছিলেন না এবং বিচ্ছিন্নতার দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। শেখ মুজিবের অসহযোগ আন্দোলনকে বলা হয়েছে আইন অমান্য করলে আন্দোলন শুরু করেন তিনি। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে কঠোর মনোভাব গ্রহণ করেন যেখানে আলোচনার কোনো সুযোগ নেই। তখন তার মনোভাব ছিল 'মেনে নাও অথবা চলে যাও।' বলা হয়েছে, "এক শ্রেণির পত্রিকায় বিভিন্ন খবরে গণদাবী হিসেবে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনকে বড় করে তোলার চেষ্টা কেবল সত্যের অপলাপ নয়, পাকিস্তানের অখণ্ডতার বিরুদ্ধে সেটি হচ্ছে এক ধরনের মানসিক যুদ্ধ।"

তেহরান থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি আয়ানদেগান' নামক একটি পত্রিকা ১৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১-এ বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধকালে প্রতিবেদক হুমায়ুন দারাইউস কর্তৃক খবরের শিরোনামে ছিল, 'পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান'। এই প্রতিবেদনটি বিশ্লেষণ করে সেই সময়ে ইরানের অবস্থান ও নীতি সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যেতে পারে। একটি মধ্যপ্রাচীয় দেশ হিসেবে পশ্চিম পাকিস্তানিদের পক্ষাবলম্বন করে ইসলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ধর্মের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা পাকিস্তানের সাথে শুরু থেকেই মধ্যপ্রাচ্যের মুসলিম দেশগুলোর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক ছিল এবং মধ্যপ্রাচ্য পাকিস্তান বলতে এর পশ্চিম অংশকেই বুঝাতো।

ইরানি এই পত্রিকাটি সংকট সমাধানে কতিপয় বক্তব্য তুলে ধরে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সংকট নিরসনে যা প্রয়োজন, তা হলো একটি বেসামরিক মন্ত্রীপরিষদ গঠন, সামরিক শাসনের অবসান, সামরিক বাহিনীকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখা, রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দান এবং জনগণের প্রতিনিধিদের কাছে সরকারের দায়িত্ব অর্পণ করা। ইয়াহিয়া খানের জন্য এইসব কম সমস্যাপূর্ণ না হলেও তিনি এখন এই পথই অবলম্বন করছেন। প্রথমত, আওয়ামী লীগের নির্বাচিত অনেক সদস্য ভারতে চলে গেছেন এবং তারা দেশে ফেরার ক্ষেত্রে বাধার সম্মুখীন হচ্ছেন, তাদের ফেরার ব্যবস্থা করার জন্য উপমহাদেশের একাধিক সরকারের যৌথ উদ্যোগ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

পত্রিকাটি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের জন্য স্তুতি করে। পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য ইয়াহিয়া গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের প্রশংসা করা হয়। বলা হয়েছে, একজন সৈনিক হিসেবে ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ঐক্য রক্ষা এবং জনগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এ যাবৎ আশাতীত উদ্যোগ নিয়েছেন। তিনি প্রথমবারের মতো পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রশংসনীয়ভাবে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠান করেন এবং একদিকে বাঙালিদের ও অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানি সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর দাবি পূরণের জন্য তারপক্ষে সম্ভব সব কিছুই করেছেন। তিনি মুজিবুর রহমানকে প্রধানমন্ত্রীত্ব উপহার দিতে চেয়েছেন বলে জনৈক পর্যবেক্ষক বলেন। কিন্তু মুজিব ক্ষমতা গ্রহণ করেননি এবং বৈধ উপায়ে সমস্যাগুলো সমাধান করতে চাননি। এটা ইয়াহিয়া খানের ভুল নয়। এ পর্যায়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার উদ্যোগ রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে মোটেও সহায়ক হবে না।

ত্রিপোলি থেকে প্রকাশিত 'ডেইলি আল থাউরা' ২২শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল-এ সম্পাদকীয় 'পাকিস্তান পরিস্থিতি' বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, লিবীয় আরব প্রজাতন্ত্রের জনগণ পাকিস্তানের জনগণকে তাদের সংকটের মুহূর্তে অবিচল ও আন্তরিক সমর্থন দিয়েছে। তাসত্ত্বেও ভ্রাতৃপ্রতিম জনগণের একথা জানা জরুরি যে, তারা পাকিস্তানে তাদের ভাইদের কেবল সমর্থন করছে না বরং তারা একটি সঠিক ও ন্যায়সঙ্গত বিষয়কে সমর্থন করছে। আন্তর্জাতিক ও ইহুদীবাদী চক্র পাকিস্তানের বর্তমান সংঘাতকে পাকিস্তান ধ্বংসের একটি সুর্বর্ণ সুযোগ হিসেবে বিবেচনা করছে এবং এর মাধ্যমে আরবদের সবচেয়ে ভ্রাতৃপ্রতিম দেশটিকে বিনাশ করতে চাইছে।

পশ্চিম পাকিস্তান কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনৈতিক বঞ্চনার চিত্রকে উল্টো করে দেখার চেষ্টা করেছে লিবিয়ার এই সংবাদপত্র। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের রপ্তানি আয় বর্তমানে দেশের আয়ের ৫০ শতাংশ। কেন্দ্রীয় সরকারে পূর্ব পাকিস্তানের অবদান ১৯৬১ সালে ছিল ২৬.১ শতাংশ এবং ১৯৬৮ সালে তা বৃদ্ধি পেয়ে ২৬.৩ শতাংশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানে কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যয় একই সময়ে বৃদ্ধি পেয়ে ৩৮% থেকে ৫৩% ছাড়িয়েছে। পত্রিকাটিতে উল্টা পরিসংখ্যান দিয়ে দেখানোর চেষ্টা করা হয় যে, "পশ্চিম পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে পূর্ব পাকিস্তানকে শোষণ করছে বলে ভারতীয়দের কথিত অভিযোগগুলো আদত বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণে ধোপে টেকে না।"

সেনাবাহিনীর নৃশংসতা এবং হত্যা সম্পর্কিত খবরের ব্যাপারে পত্রিকাটি প্রকৃত অর্থেই পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি স্তুতি করেছে। বলা হয়েছে, "ঘটনা হচ্ছে সাংবাদিকদের কেউ নিজে কিছুই লিখেননি। কিন্তু বরাবরই তারা বিভিন্ন সূত্রের স্বীকৃতি দিয়েছেন। পূর্বপাকিস্তানে কী ঘটেছে কলকাতায় বসে সাংবাদিকরা কী করে জানলেন? পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিবিসি'র প্রচারণা সম্পর্কে আমাদের কিছু আরব বন্ধুদের বলতে চাই যে, আপনারা যদি মধ্যপ্রাচ্য সম্পর্কে বিবিসি'র খবরের জন্য নির্ভর করতে পারেন, তাহলেই কেবল পাকিস্তান সংশ্লিষ্ট খবরের জন্য বিবিসি'র উপর নির্ভর করতে পারেন। বলা হয়েছে, বিবিসিসহ অন্যান্য পশ্চিমা সংবাদমাধ্যমগুলোতে ইহুদিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ পায়।"

জেদ্দা থেকে প্রকাশিত 'দি ডেইলি আল মদিনা' ৩০শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল-এ আদনান কামেল সালাহ কর্তৃক সম্পাদকীয়তে প্রশ্ন তোলা হয়েছে, 'যুদ্ধ কোথায়?' "গতকাল (২৯শে সেপ্টেম্বর) মস্কোয় প্রকাশিত রুশ-ভারত যৌথ বিবৃতিটি পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে রাশিয়া ও ভারতের হস্তক্ষেপের পর আরেকটি পদক্ষেপ। সত্য বটে বিপুলসংখ্যক শরণার্থী ভারতে চলে গেছে। কিন্তু তাদের সংখ্যা মোটেও ৩০ লাখ নয়, যদিও ভারত এ ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে। ভারতের ভূখণ্ড থেকে যাওয়া অন্তর্ঘাতকদের হাত থেকে বাঁচার জন্যই শরণার্থীরা ভারতে পালিয়ে গেছে।"

"পাকিস্তানকেই ভূখণ্ড রক্ষা এবং নিজ ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাত বন্ধ করতে হবে। এজন্যই তারা আগ্রাসন চালাচ্ছে না বা যুদ্ধ লাগাচ্ছে না। কিন্তু ভারত রাশিয়ার সঙ্গে প্রতিরক্ষা ও মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে একটা মারাত্মক পদক্ষেপ নিয়েছে। ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরে অন্তর্ঘাতমূলক কাজে সহায়তা দিচ্ছে। এজন্য তারা বিশ্বের বিভিন্ন অংশের পরস্পরবিরোধী গোষ্ঠীগুলোর কাছ থেকে সমর্থন পাচ্ছে। এদের মধ্যে রয়েছে মস্কোর কোসিগিন, কানাডা ও ব্রিটেনের বিভিন্ন খ্রিষ্টান সংগঠন, আমেরিকার কেনেডি এবং ইসরাইলের ইহুদি নেতৃবৃন্দ। এ সকল পরস্পর বিরোধীদের প্রতিহত করতে পারলেই শান্তির ব্যাপারে প্রকৃত ইচ্ছার প্রকাশ ঘটতে পারে।"

তুরস্ক থেকে প্রকাশিত আকশাম, ৭ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল-এ "পূর্বপাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্কটি ছিল ঔপনিবেশিক ধরনের। ধর্ম ছাড়া এই দুই অঞ্চলের মধ্যে আর কোনো মিলই নেই। পূর্ব পাকিস্তানিরা জাতীয় মুক্তির জন্য পাকিস্তানি ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধে লড়ছে।"

'দি জাকার্তা টাইমস, ১৫ই এপ্রিল ১৯৭১ সাল: সম্পাদকীয় শিরোনাম ছিল, "গণহত্যা বন্ধ কর।" পত্রিকাটি পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানি সেনাদের পরিচালিত হত্যাকাণ্ড প্রসঙ্গে প্রশ্ন তুলে যে, ইসলাম কি এটা অনুমোদন দেয়? অস্ত্রধারী একদল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলমান, নিরীহ আরএকদল মুসলমানকে হত্যা করবে? এ বিষয়ে মুসলিম দেশসমূহের তড়িৎ পদক্ষেপ প্রয়োজন। আন্তর্জাতিক ইসলামিক সংগঠনসমূহেও এ ব্যাপারে নিশ্চুপ থাকতে পারে না।

'দি স্টেটস টাইমস' মালয়েশিয়া, ৮ই জুন, ১৯৭১ সাল। সম্পাদকীয় 'পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী'। পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনা কোনোক্রমেই আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়। বিপুলসংখ্যক শরণার্থী প্রতিদিন ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হচ্ছে এবং তাদের দুর্গতি ক্রমেই বাড়ছে। এ অবস্থায় ভারতের অর্থনীতিতে চাপ বাড়ছে। চার মিলিয়ন শরণার্থী ইতোমধ্যে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে এবং এ সংখ্যা প্রতিদিন বাড়ছে।

ইন্দোনেশিয়া থেকে প্রকাশিত ইন্দোনেশিয়ান 'অবজারভার' ৩০ই আগস্ট, ১৯৭১ সাল-এর সম্পাদকীয় 'নজিরবিহীন ট্র্যাজেডি'। পূর্ব পাকিস্তানের মানবিক বিপর্যয়ের খবর আন্তর্জাতিক সংবাদমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণে স্বক্ষম হয়েছে, এর কারণ হলো সেখানে সংঘটিত গণহত্যা নজিরবিহীন মাত্রায় এবং এর ফলে অসংখ্য লোক ভারতে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। সিনেটর এডওর্য়াড কেনেডির উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয় যে, পাঁচ মাসের সংঘর্ষের ফলে ইতোমধ্যে সাড়ে সাত মিলিয়ন বাঙালি ভারতে শরণার্থী হিসেবে আশ্রয় নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমস্যাকে সামরিকবাহিনী দিয়ে সমাধানের অভিযোগ উঠেছে ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে এবং এ বিচারে ইয়াহিয়া তার পূর্বসূরি আইয়ুব খানের চেয়ে নিকৃষ্টতম কারণ সে তার সেনাবাহিনীকে লেলিয়ে দিয়েছে লাখ লাখ নিরস্ত্র বাঙালির বিরুদ্ধে।

ডাকার সেনেগাল থেকে প্রকাশিত লে সোলাই ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল-এ বারা ডিউফ এর প্রতিবেদন, 'পাকিস্তানের উদ্‌বাস্তুদের নিয়ে ভারত কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন' শিরোনামে বলা হয়, "ভারতে এখন ইতিহাসের সবচেয়ে কঠিন নাটকের মঞ্চায়ন হচ্ছে। প্রতিদিন ৫০ হাজারের বেশি উদ্বাস্তু সীমান্ত অতিক্রম করে দেশে ঢুকছে। সরকার তাদের খাওয়ানোর জন্য প্রতিদিন দুই কোটি রুপি ব্যয় করছে। এ অর্থ তাদের সমুদ্র সমান দুর্দশার মধ্যে এক ফোঁটা পানি মাত্র। পূর্ব পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের এটি হচ্ছে করুণ পরিণতি। এতে বলা হয়, ২৬শে মার্চ ১৯৭১ সাল-এ বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান ভারতীয় ভূখণ্ডের ওপারে ১৫০০ কিলোমিটার বেশি দূরবর্তী পশ্চিম পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের একটি অংশের ভাষা অপর অংশের মানুষ ও ভাষা থেকে আলাদা। এমনকি আমাদের ধর্ম ইসলামও পশ্চিম পাকিস্তানের চেয়েও ভিন্ন। এইসব পরিস্থিতিতে কিভাবে সাংস্কৃতিক ঐক্য হবে এবং একটি ঐকবদ্ধ জাতির যৌক্তিকতা কি হতে পারে?" পত্রিকাটিতে বলা হয়, কলোনিয়েল শোষণ, শাসন, আর্থিক লুণ্ঠন, ব্যবসা-বাণিজ্য সবকিছুই পশ্চিম পাকিস্তান গ্রাস করেছিল। এ পরিপ্রেক্ষিতে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। পত্রিকাটিতে লেখা হয়, "সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে বিশ হাজার গেরিলা ছড়িয়ে রয়েছে। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত ইয়াহিয়া খানের সত্তর হাজার সৈন্যের বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদের স্বাধীনতা অর্জন করতে হবে।"

বৈরুত ২রা অক্টোবর ১৯৭১ সাল, 'সাপ্তাহিক আল আনবা' পত্রিকায় পূর্ব পাকিস্তানি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নারী, শিশু ও বুদ্ধিজীবীদের ওপর পশ্চিমা পাকিস্তানি সেনাদের পরিচালিত গণহত্যাকে প্যালেস্টাইনিদের বিরুদ্ধে ইসরাইলিদের অপরাধের সাথে তুলনা করে। পত্রিকাটি অবিলম্বে গণহত্যা বন্ধ, পূর্ব পাকিস্তানি জনগণের অধিকার ফিরিয়ে আনার জন্য যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানিয়ে সম্পাকীয় লেখে। শিরোনাম ছিলো, 'বাংরাদেশের শরণার্থীদের ফিরিয়ে আনার আহ্বান।'

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সাল, ইন্দোনেশিয়ায় 'রায়া' পত্রিকার সম্পাদকীয় শিরোনাম, 'পাকিস্তান দায়ী'। এতে বলা হয়, নিজ দেশের জনগণেকে হত্যা করছে পাকিস্তানের সামরিক সরকার। পাকিস্তানের উচিত বাংলাদেশের জনগণের ইচ্ছাকে সম্মান দেখানো এবং তাদের ভুল সংশোধন করা।

২২শে অক্টোবর 'আল সাওরা' দামেস্কে-এ বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের সংকট সমাধানে সামরিক শক্তি প্রয়োগ ভুল সিদ্ধান্ত ছিল এবং তা ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় ডেকে এনেছে। পত্রিকাটি সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের পাশাপাশি ভারতে আশ্রয় নেওয়া লাখ লাখ শরণার্থীর জন্য সাহায্য ও ত্রাণের আহ্বান জানান।

৭ই ডিসেম্বর 'দি স্টেটস টাইমস' কুয়াললামপুর-এ লেখা হয়, 'একটি রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ছিল।' পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নির্বাচনী অঙ্গীকার বাস্তবায়নে যথাযথ চাপ প্রয়োগে ব্যর্থতার জন্য বৃহৎ শক্তিগুলোর সমালোচনা করা হয়।

২২শে সেপ্টেম্বর 'কুয়েত টাইসম'-এ রয়টার্স পরিবেশিত খবরে শরণার্থীদের দুর্দশার চিত্র তুলে ধরার পাশাপাশি বিশেষ করে শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা প্রাধান্য পায়।

কাইহান ইন্টারন্যাশনালের আমির তাহেরি পূর্ব পাকিস্তান সংকটের উপর বেশ কিছু ধারাবাহিক প্রতিবেদন রচনা করেন। ২৭শে জুলাই থেকে ২রা আগস্ট পর্যন্ত সময়ে মোট ৪টি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। ইরানি এই সাংবাদিকের লেখার মধ্যে রয়েছে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খানের দীর্ঘ সাক্ষাৎকার। যেখানে ইয়াহিয়া পূর্বপাকিস্তানের সংকট, সংলাপ প্রচেষ্টা, সামরিক আক্রমণ, মুজিবের ভবিষ্যৎ, পাকিস্তানের উপর আন্তর্জাতিক চাপ এবং সংকট নিরসনে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা।

প্রায় ৭৫ মিনিটের সাক্ষাৎকারে ইরান সম্পর্কে উষ্ণ অনুভূতি প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। আমির তাহেরির ভাষায়, 'ইরানের শাহানশাহকে পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ইরান আমাদের জন্য শক্তির একটি বড়ো উৎস। ইতিহাসের বিভিন্ন সময় পাকিস্তানকে সমর্থনকারী সবচেয়ে বড়ো শক্তি ইরান একথা জেনে সবসময়ই আমাদের দেশটি মনে জোর পাবে। ইয়াহিয়া খান বলেন, এ সংকটের শুরু থেকেই পাকিস্তান সম্পর্কে সঠিক নীতি গ্রহণ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র। কিন্তু ব্রিটেন সম্পর্কে একথা বলা যায় না। পূর্ব পাকিস্তান সংকটের জন্য ইয়াহিয়া খান রাজনীতিবিদদের দায়ী করেন।

২৭শে জুলাই প্রকাশিত সাক্ষাৎকারে বলা হয়, "নির্ভেজাল বিষণ্ন কণ্ঠে ইয়াহিয়া খান বলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছু করতে প্রস্তুত ছিলাম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি। এই চেয়ারের প্রতি আমার কোনো আগ্রহ ছিল না এবং সৈনিক জীবনে ফিরে যাওয়ার সুযোগের অপেক্ষায় ছিলাম আমি।" তারপর মনমরা অবস্থায় তিনি বলে যেতে থাকেন, রাজনীতিবিদরাই তাকে ডুবিয়েছে, তাঁরা একমতে পৌঁছাতে পারেননি এবং তাদেরই কারণে দেশ আজ খণ্ডিত হওয়ার মুখে। তিনি আরো বলেন, পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনীতির ধারণার মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেখ মুজিবের বিচ্ছিন্ন হওয়ায় পরিকল্পনা জানতে পেরে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে তিনি বাধ্য হন।

পাকিস্তান পিপলস্ পার্টির জুলফিকার আলী ভুট্টোর সহায়তায় তারা বেসামরিক সরকার গঠনের চিন্তা-ভাবনা করছেন কিনা? এ প্রশ্ন সম্পর্কে ইয়াহিয়া বলেন, "শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আসন পেয়েছেন ভুট্টো। কিন্তু বেসামরিক সরকারের ভেতর দু'অঞ্চলের প্রতিনিধিদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ৭০-এর নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিপুল বিজয় সম্পর্কে তিনি বলেন, কারচুপি-সন্ত্রাস আর অসাধু উপায়ে জয়লাভ করেছিল আওয়ামী লীগ। শেখ মুজিব সম্পর্কে বলেন, 'মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে খুব শিগগিরই মুজিবের বিচার হবে।'

উদ্‌বাস্তুদের বিষয়ে তিনি বলেন, "তাদেরকে দেশে ফিরে আসার আহ্বান জানানো হয়েছে এবং অনেকেই ফিরতে শুরু করেছেন। তবে উদ্‌বাস্তুদের দেশে ফেরা ঠেকাতে ওঠে পড়ে লেগেছে ভারত, কারণ তারা এই ইস্যুটিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে। ভারত তার নিজস্ব ভূখণ্ডের ভেতরে গেরিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে। প্রায় ৩৫ হাজার গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্রয়হীন মানুষগুলোকে।"

২৮শে জুলাই ডেটলাইনে আমির তাহেরির দ্বিতীয় প্রতিবেদনে পূর্ব পাকিস্তানে চলমান সংঘাতের কারণ, বর্তমান অবস্থা জানতে লেফটেন্যান্ট জেনারেল টিক্কা খান, মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী, জনৈক আওয়ামী লীগের এম.এস. সাবেক, বিচ্ছিন্নতাবাদী এ. এ. এবং তাহসিন মুহাম্মদ নামে পিআইএ'র একজন স্টুয়ার্ডের নাতিদীর্ঘ মতামত ছাপা হয়। আমির তাহেরি নিজেই বলেছেন, পূর্ব পাকিস্তানের কী ঘটছে এ সম্পর্কে বেশকিছু লোকের মতামত জানার সিদ্ধান্ত নিই আমি। দু'পক্ষের ছড়ানো প্রচারণা আর সত্যের অপলাপের মেঘ সরে গিয়ে প্রকৃত ঘটনা বেরিয়ে আসতে লেগে যেতে পারে বহু বছর। পূর্ব পাকিস্তানের বাস্তব পরিস্থিতির কাছাকাছি পৌঁছতে পারলে হয়তো একটি সাময়িক চিত্র তুলে ধরা সম্ভব হবে। এই প্রতিবেদনে সেই নাটকীয় ঘটনাগুলো সম্পর্কে বিভিন্ন মতামত আমরা দেখতে পাব।"

পূর্ব পাকিস্তানের মিলিটারি গভর্নর টিক্কা খান আমির তাহেরিকে বলেন, পাকিস্তানকে অখণ্ড রাখার জন্যই সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপ করতে বাধ্য হয়েছে। তার ভাষায়, মুজিব প্রকাশ্যে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছিল এবং একটি প্যারালাল সরকার গঠন করে, তার নির্দেশমতো সমস্ত কিছু হচ্ছিল এ অঞ্চলে। টিক্কা খান আরও বলেন, ভারত সরাসরি বিচ্ছিন্নতাবাদীদের অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ সহায়তা দিচ্ছে। পূর্ব পাকিস্তানের কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি অংশ দখল করে ভারতীয় সৈন্যরা যাতে সেটিকে বাংলাদেশ হিসেবে ঘোষণা করতে না পারে সেজন্য সারাদেশের নিয়ন্ত্রণ নিয়ে নেয় সেনাবাহিনী।

পূর্ব পাকিস্তানের সামরিক শাসনের বেসামরিক অংশটির দেখাশোনা করতেন মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী। তিনিও শেখ মুজিবকে বিচ্ছিন্নতাবাদের জন্য অভিযুক্ত করে বলেন, মুজিব বাধ্য না করলে আমরা কিছুতেই সেনা-অভিযানে যেতাম না। তিনি দাবি করেন, দাঙ্গার সময় পূর্ব পাকিস্তানে নিহতের সংখ্যা ১০ হাজারও ছাড়ায়নি। ঢাকা ও অন্যত্র নিহতের যে সংখ্যা বলা হয়েছে তা অতিরঞ্জিত। দাবি করেন পরিস্থিতি ক্রমেই স্বাভাবিক হয়ে আসছে, মানুষজন তাদের নিজ নিজ বাড়িঘরে ফিরছে এবং সরকারি কর্মাচারীদের মধ্যে ৯০ ভাগই কাজে যোগ দিয়েছে।

আওয়ামী লীগের চরমপন্থিরা প্রতিশোধ নেয় এবং যে অবাঙালিকে ধরতে পেরেছে তাকেই হত্যা করে। সেনাবাহিনীর অভিযান শুরু হবার পরে গ্রাম ও প্রত্যন্ত শহরে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা অবাঙালিদেরকে গুপ্তচর সন্দেহে হত্যা শুরু করে।

সেনাবাহিনী ও জনগণের মধ্যে অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা ও বিদ্বেষের বিবরণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, এমনকি যেসব বাঙালি সরকারি কর্মকর্তা সেনাবাহিনীর সঙ্গে সহযোগিতা করতে রাজি হয়েছিলেন, তারা এখনও সন্দেহভাজনের তালিকায় রয়েছেন। কয়েক'শ সরকারি কর্মকর্তাকে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে নিয়ে আসা হয়েছে এবং তাদের কাজ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানি সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর নজর রাখা।

তাহছির মুহাম্মদ পি.আই.এর একজন স্টুয়ার্ড। তিনি বললেন, "সংকট শুরু হওয়ার পর থেকেই পাগলেরমতো এখানে ওখানে যাওয়া আসা করতে হয় আমাদের। সৈন্য বোঝাই করে ঢাকা আসতাম এবং ঢাকা থেকে আহত ও পঙ্গু মহিলা ও শিশুদের বোঝাই করে নিয়ে যেতাম। হতাহতদের বেশির ভাগই ছিল বিহারি। কয়েক হাজার বিহারিকে সরিয়ে নিয়ে গেছি আমরা। তাদের অনেকেই চোখ তুলে নিয়েছে বাংলাদেশের সৈন্যরা। মহিলাদের স্তন কেটে নেওয়া হয়েছে। চোখের সামনে বাবাকে হত্যা করতে দেখে নির্বাক হয়ে গেছে অনেক শিশু।"

ঢাকায় বসবাসকারী একজন বিহারি বলেছেন, "আমি বিভক্তির পথ বেছে নেওয়ার কথা বলছি কারণ, পাকিস্তানের দু'অংশের মধ্যে প্রায় ১০০ মাইলের ব্যবধান। ভারতীয় ভূখণ্ড দ্বারা বিভক্ত পাকিস্তানের দু'অংশ। এ পরিস্থিতিতে পাকিস্তান টিকে থাকতে পারে না। দেশবিভাগের সময় আমরা ছিলাম উদবাস্তু।

পাকিস্তানের কাছে আমদের অনেক আশা ছিল। স্বৈরাচারের কারণে ধূলিসাৎ হয়ে যায় আমাদের স্বপ্ন। দু'অংশেরই মুষ্টিমেয় কয়েকজন পুঁজিপতি পূর্ব পাকিস্তানকে লুটে পুটে খাচ্ছিল।"

কাইহান (ইন্টারন্যাশনাল), ২৭শে জুলাই, ১৯৭১ সাল

কাইহান ইন্টারন্যাশনালের আমির তাহেরি পাকিস্তানের দু'টি অংশেই সপ্তাহব্যাপী সফর সবে শেষ করেছেন। প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানসহ পাকিস্তানের কিছু নেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছেন তিনি। যেসব সাম্প্রতিক ঘটনা পাকিস্তানকে গৃহযুদ্ধে ঠেলে দিয়েছে সেসব সম্পর্কে কয়েক সিরিজের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

"পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি সাক্ষাতকার গ্রহণ করেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, 'পূর্ব পাকিস্তানকে রাজনীতির ধারণার মধ্যে সর্বাধিক মাত্রায় স্বায়ত্তশাসন দেওয়ার' প্রস্তুতি নিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু শেখ মুজিবের বিচ্ছিন্ন হওয়ার পরিকল্পনা জানতে পেরে সামরিক হস্তক্ষেপ করতে তিনি বাধ্য হন। পাকিস্তানকে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যর্থ প্রচেষ্টা ইতোমধ্যেই এত বেশি জটিলতা সৃষ্টি করেছিল যে সেনাবাহিনীর কেউ কেউ মনে করেছেন, নতুন করে আর কোনো পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো উচিত নয়।"

প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়, "তারপরও ইয়াহিয়া খান বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের ওপর জোর দিচ্ছেন। আমাদেরকে তিনি বলেন, অক্টোবরে ইরানি রাজতন্ত্রের আড়াইশতম বার্ষিকী উদ্‌যাপনের পর এবং যেমন করেই হোক সাম্প্রতিক বছরটি শেষ হবার আগেই এধরনের একটি সরকার গঠনের আশা করেছেন তিনি।"

সাক্ষাতকালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেন, "সকল আসন পূরণ হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হবে। অ্যাসেম্বলিকে খুব শিগগিরই একটি সংবিধানের খসড়া প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হবে কিন্তু সেই সঙ্গে সরকার গঠনের আহ্বানও জানানো হবে। প্রেসিডেন্টের নিজস্ব উপদেষ্টাদের তৈরি সংবিধানের খসড়াটি 'বৃহত্তর অবকাঠামো' হিসেবে পেশ করা হবে অ্যাসেম্বলিতে। উপযুক্ত করে তোলার জন্য অ্যাসেম্বলিতে এই খসড়াটি সংশোধন করা হবে।"

ইয়াহিয়া খান আমাদের বলেন, সংবিধানের খসড়াটি "রাজনৈতিক দলগুলোর চাহিদা অনুযায়ী তৈরি করা হবে। রাজনৈতিক দলগুলো কি চায় আমি তা জানি এবং তাদের চাহিদাগুলোকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য উপদেষ্টাদের নির্দেশ দিয়েছি আমি। এ বিষয়টি মাথায় রাখতে হবে যে দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই করতে হবে আমাদের।"

আমরা তার কাছে জানতে চাই দুই অঞ্চলের অপছন্দের লোকজন নিয়ে একটি 'পুতুল বেসামরিক সরকার' গঠনের নির্দেশ দিয়েছিলেন কিনা? তিনি বলেন এটা একটা গুজব এবং একজন সৈনিক হিসেবে তিনি মনে করেন গুজব ছড়ানোটা একটি 'অপরাধ'।

গুরুতর রাষ্ট্রদ্রোহিতা প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, "মারাত্মক রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে খুব শিগগিরই মুজিবের বিচার হবে। তার বিরুদ্ধে মামলাটি তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হবে বিচার।"

আওয়ামী লীগ নেতার বিচার হলে এবং তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলে জাতীয় পরিষদের অধিবেশন বসার আগেই তা কার্যকর করা হবে কিনা এর জবাবে প্রেসিডেন্ট বলেন, বিষয়টি সামরিক বিচার বিভাগের হাতে এবং কবে বিচার শুরু হতে পারে তার সঠিক তারিখও বলতে পারেননি তিনি। ইয়াহিয়া মুজিব সম্পর্কে বলেন, 'তার কোর্ট-মার্শাল হবে। অ্যাসেম্বলির অধিবেশন শুরু হওয়া পর্যন্ত সে জীবিত থাকবে কিনা সে কথাও বলতে পারছি না আমি।'

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরণার্থী সম্পর্কে ভারতে আশ্রয় নেওয়া পূর্ব পাকিস্তানি শরণার্থীদের ব্যাপারে তার সরকারের কি ইচ্ছা-এ প্রশ্নের জবাবে ইয়াহিয়া বলেন, তাদের সকলকেই ফিরে আসার আহ্বান জানিয়েছেন তিনি, কিন্তু এই আহ্বান ঘরছাড়া মানুষগুলোর কাছে পৌঁছেছে কিনা সে সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত নন। প্রেসিডেন্ট জানান, "৮০ হাজার শরণার্থী ইতোমধ্যেই দেশে ফিরেছে এবং প্রতিদিন ফিরছে প্রায় ১,০০০ উদ্‌বাস্তু।" তিনি বলেন, উদ্‌বাস্তুদের দেশে ফেরা ঠেকাতে উঠে-পড়ে লেগেছে ভারত। দেশটির এ ধরনের আচরণের কারণ হচ্ছে, ইন্দিরা গান্ধী এই ইস্যুটিকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বলেন, "ভারত তার নিজস্ব-ভূখণ্ডের ভেতরে গেরিলাদের জন্য প্রশিক্ষণ শিবির খুলেছে। প্রায় ৩৫ হাজার গেরিলা প্রশিক্ষণ নিয়েছে। পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টির জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে আশ্রয়হীন মানুষগুলোকে।"

ইরানের সঙ্গে সম্পর্ক

প্রায় ৭৫ মিনিটের বৈঠকে ইরান সম্পর্কে উষ্ণ অনুভূতি প্রকাশ করেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া। ইরানের শাহানশাহকে পাকিস্তানের 'সবচেয়ে বড় শুভাকাঙ্ক্ষী' হিসেবে আখ্যায়িত করে তিনি বলেন, ইরান আমাদের জন্য শক্তির একটি বড় উৎস'। ইতিহাসের বিভিন্ন সময় পাকিস্তানের প্রতি ইরানের সাহায্য সহযোগিতার কথা স্মরণ করে বলেন, বর্তমানে এ অঞ্চলে পাকিস্তানকে 'সমর্থনকারী সবচেয়ে বড় শক্তি' ইরান একথা জেনে সবসময়ই আমাদের দেশটি মনে জোর পাবে। একটি ফার্সি কবিতার উদ্ধৃতি দিয়ে ইয়াহিয়া বলেন, "আমরা ভিন্ন দুটি দেশ নই। দুটি ভিন্ন দেহ হলেও আমাদের আত্মা একই।"

তিনি আরো বলেন, 'আমি নিজে একজন ইরানি। আমার পূর্বপুরুষরা ইরান থেকেই এ উপমহাদেশে এসেছিল। বাড়িতে ফার্সিতে কথা বলি আমরা। ইরানের সঙ্গে আমাদের সাংস্কৃতিক সাদৃশ্য ও অবিচ্ছেদ্য বন্ধনের কারণে গর্ববোধ করি। একজন বাইরের লোক হিসেবে নয়, বরং নিজের ভাই অথবা ছেলের মতো মনে করেই আপনার সঙ্গে কথা বলছি। বিশাল একটি পরিবারের এক সদস্য যেমন অন্য সদস্যদেরকে সালাম জানায় তেমনই ইরানের জনগণের প্রতি রইলো আমার সালাম। আমাদের দেশ সফরে এসে আপনি আসলে ইরানের আরেকটি অংশ দেখে গেলেন। অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে ইরানের ক্রমবর্ধমান সমৃদ্ধির জন্য আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাই, আমরা শাহানশাহ সর্বাত্মক সাফল্যের জন্য সর্বশক্তিমানের কাছে প্রার্থনা জানাই। শুধু ইরান, পাকিস্তানের নয়, এটা হবে সমগ্র মুসলিম বিশ্বের সাফল্য।

কাইহান (ইন্টারন্যাশনাল) পত্রিকায় ২৮শে জুলাই, ১৯৭১ সাল তিনি পুনরায় আরেকটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন। জেনারেল টিক্কা খান সাক্ষাতকারে বলেন, "পরিস্থিতি যে পুরাপুরি স্বাভাবিক হয়ে এসেছে আমি সে কথা বলবো না। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রদেশটি এখন পুরাপুরি সেনাবাহিনীর দখলে। এখন সেখানে কোনো লড়াই চলছে না, যদিও প্রতিরোধের ক্ষেত্রগুলো নির্মূলের অভিযান চালিয়ে যাচ্ছি আমরা। গুপ্ত হামলা চালানো হচ্ছে। একদিনে ঢাকাতেই তিনটি বোমা হামলা হয়। উড়িয়ে দেওয়া হয় একটি পাওয়ার প্ল্যান্ট। পাট পরিবহনকারী কনভয়ের ওপর কয়েকবার হামলা হওয়ায় সৈন্যদের প্রহরায় সেসব পাট আমরা চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দিয়েছি।

মুজিবের তথাকথিত মুক্তিফৌজের সৈন্যদেরকে বহু প্রশিক্ষণ শিবিরে ভারতীয়রা প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। ভারতীয় সেনাবাহী পুরো দফায় হামলা না চালানো পর্যন্ত আমাদের বড়ো ধরনের ক্ষতি করতে পারবে না তারা। সেটা হবে দুই সেনাবাহিনীর সমানে লড়াই এবং সেটাকে আমরা অবশ্যই মোকাবিলা করবো।"

মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলীর সঙ্গে সাক্ষাতকার উল্লেখ করে তার প্রতিবেদনে বলেন, "হাজার হাজার ঘরছাড়া লোক ফিরে আসছে নিজের ঘরে। গ্রামে ফিরে এসে নিজেদের জমি জমা ফিরে পেতে এবং স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শুরু করার ব্যাপারে আমরা তাদেরকে সাহায্য করছি। সীমান্তে আপনারা দেখতে পাবেন, ২০টি রিসেপশন সেন্টার খোলা হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে এবং ভারত থেকে আসার সকল আশ্রয়হারা মানুষর পূনর্বাসনের জন্য আমরা ক্রাশ প্রোগ্রামের ব্যবস্থা করেছি। ভারতীয় সেনাবাহিনীর ওপর পূর্ব পাকিস্তানিদের দেশে ফিরতে বাধাদানের নির্দেশ থাকায়, উদবাস্তুদের অব্যহ্নতত রুট ধরে ফিরতে হবে। আপনারা জানেন যে প্রেসিডেন্ট সাধারণ ক্ষমতা ঘোষণা করেছেন, এবং তাই পুরোপুরি নিরাপদে বাড়ি ফিরতে পারে সবাই।"

কাইহান (ইন্টারন্যাশনাল), ১লা আগস্ট, ১৯৭১ সাল প্রতিবেদনে তিনি তার অভিমত ব্যক্ত করেন,

"পশ্চিম পাকিস্তানের বেশির ভাগ মানুষের ধারণা মুজিব একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী এবং ভারত সরকারের সঙ্গে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। পূর্ব পাকিস্তানে মুজিবের বর্তমান অবস্থা সম্পর্কে ধারণা করাটা এখনও অসম্ভব রয়ে গেছে। খুব কম লোকই তার সম্পর্কে কথা বলতে আগ্রহী। মন্তব্যকারীদের বেশির ভাগই তার দলের সাবেক সদস্য। দলের লোকজনকে ফাঁদে ফেলার জন্য তারা দায়ী করেছে মুজিবকে। এদিকে, পাকিস্তানের রক্তক্ষয়ী দুঃস্বপ্ন সম্পর্কে মুজিবের নিজের বক্তব্য এখনো জানা যায়নি। ইসলামাবাদে বিচার প্রক্রিয়া শুরু হওয়ার পর শুধুমাত্র কোর্ট মার্শালেই নয়, ইতিহাসের রায়েরও মুখোমুখি হতে হবে তাকে।"

কাইহান (ইন্টারন্যাশনাল), ২রা আগস্ট, ১৯৭১ সাল ক্ষুধার্ত দানবের ভয়াবহ ছায়া শীর্ষক অন্য এক প্রতিবেদনে তিনি লিখেছেন :

"অদূর ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে আদৌ শান্তি ফিরে আসবে কিনা এ ব্যাপারে এখনও কেউ নিশ্চিত নয়। ৩৫,০০০-এর চেয়েও বেশি গেরিলাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছে ভারত। গত কয়েকমাস পশ্চিমবঙ্গে পালিয়ে যাওয়া পূর্ব পাকিস্তানিদের বেশিরভাগই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেশে ফেরার সম্ভাবনা নেই, শুধু গেরিলা আর হামলাকারী ছাড়া। শক্তিশালী বিধ্বংসী বাহিনীও সক্রিয় রয়েছে। মহাপ্রলয়ের চার অশ্বারোহীর হাত থেকে বাঁচা হারকিউলিসের মতো পূর্ব পাকিস্তানকে বাঁচানোর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের শক্তি আর সম্পদও সীমিত। সামরিক কর্তৃপক্ষ বলছে, ভারত 'পাকিস্তানকে বিভক্ত করার প্রচারণা' বন্ধ করলেই পূর্বাঞ্চলে প্রকৃত অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হবেন তারা। গত কয়েক মাস ধরে পূর্ব পাকিস্তানের ট্র্যাজিক ঘটনাবলি ভারত ও পাকিস্তান উভয়ের সমরবাদী প্রবণতাকে আরও জোরদার করে তুলছে। সামরিক বাহিনীর প্রধানরা সব সময় মর্যাদার লালসা আর সৈনিকদের "কাজের মধ্য" ডুবিয়ে রাখার ব্যাপারে আগ্রহী। ইসলামাবাদ ও নয়াদিল্লি উভয়ের নীতিমালার ওপর দিন দিন কার্যকর প্রভাব খাটানো শুরু করেছেন সামরিক প্রধানরা। দু'টি দেশেরই ভঙ্গুর কাঠামোর তুলনায় তাদের সামরিক প্রধানদের ভার বেশি হয়ে গেছে।উপমহাদেশে বর্তমানে প্রায় ২০ লাখ সশস্ত্র সৈন্য রয়েছে এবং সংঘর্ষ শুরু হয়ে গেলে হাতে অস্ত্র তুলে নেবে আরও কয়েক লক্ষ লোক। ভারতীয় কার্যত বলে বেড়াচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগ্য নির্ধারণ করবে নয়াদিল্লি। উপেক্ষার মাধ্যমে এর জবাব দিয়েছে পাকিস্তান।'

তিনি প্রতিবেদনে আরো উল্লেখ করা হয়, "ইয়াহিয়া খানের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত এবং পাকিস্তানকে বিভক্ত করার ব্যাপারে ভারতীয় প্রচেষ্টার একটি আংশিক কারণ হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সম্পর্কে দেশটির নিজস্ব ভীতি। তাই সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত কাজ হচ্ছে বাঙালিদের মাথাব্যাথার কারণটি সারিয়ে তুলতে সহায়তা করা–বাংলার দু'টি অংশই যা নিয়ে কম বেশি ভুক্তভোগী। কিন্তু এ ধরনের একটি পদক্ষেপ অন্তত এ মুহূর্তে একেবারেই চিন্তা করা যায় না।

পশ্চিমবঙ্গে যখন নকশালবাদী আন্দোলন পুরোদমে ছড়িয়ে পড়ছে তখন ভারতকে দুর্বল করার লক্ষ্যে এ ব্যাপারে সব ধরনের ইন্ধন জুগিয়েছে পাকিস্তান। নকশালবাদীরা পূর্ব পাকিস্তানে আশ্রয় নিয়েছে। চীনের পাঠানো অস্ত্র দিনাজপুর আর রাজশাহীর মধ্যে দিয়ে তাদের হাতে এসে পৌঁছাতো। ফলশ্রুতিতে পশ্চিমবঙ্গ একেবারে শাসনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। পূর্ব পাকিস্তানি গেরিলাদের আশ্রয়, তাদেরকে প্রশিক্ষণ ও অস্ত্র সরবরাহ এবং পূর্ণ রাজনৈতিক সমর্থন দিয়ে সে সময়কার প্রতিশোধ নিচ্ছে ভারত। পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত দুটি বোতলে বন্দি বাঙালি দানবকে মুক্ত করে দেওয়ায় ব্যাপারে তারা উভয়েই হয়তো নিজ নিজ সাফল্য প্রমাণ করছে। ইয়াহিয়া খানের সরকারই সম্ভবত পাকিস্তানের শেষ সরকার যেটা ভারতের সঙ্গে সৌজন্যমূলক আচরণ করেছে। কিন্তু নির্ভুলভাবে বলতে গেলে এই সরকারকেই ক্ষমতাচ্যুত করতে চাইছে নয়াদিল্লি। বর্তমান পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে গান্ধীর সরকার প্রয়োজনে সামরিক প্রধানদের হাতের পুতুল হওয়ারও ঝুঁকি নিতে রাজি আছে। পাকিস্তানের পিঠে ছুরি মারার সাথে সাথে একই সময় হয়তো আত্মঘাতী হতে হবে ভারতকেও।

তবে এ সবই কৌশলগত প্রকৃতি বিচার-বিবেচনার বিষয়। এ মুহূর্তে সবচেয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানকে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে এবং উদ্‌বাস্তুদের চাপের মুখে অর্থনৈতিক ধ্বংসের হাত থেকে পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করা। মার্কিনীরা প্রাথমিকভাবে পাকিস্তানকে বড়ো ধরনের অর্থনৈতিক ও খাদ্য সাহায্য পাঠানোর প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। গ্রীষ্মকাল শেষ হওয়ার আগেই সাহায্যের প্রথম অংশটি এসে পৌঁছানোর কথা। কিন্তু দরকার আরও অনেক বেশি। পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিকে গোটা বিশ্বেরই গুরুত্ব দেওয়া উচিত। দারিদ্র আর ক্ষুধার বিরুদ্ধে মানবিক সংগ্রামে এই কর্মক্ষেত্রে দানবীয় এক এশীয় ট্র্যাজেডির বীজ বপন করা হয়েছে।"

দি ক্যানবেরা টাইমস (ক্যানবেরা)-এ ২৯শে সেপ্টেম্বর, ১৯৭১ সাল রালফ জোসেফ ইরানে পাকিস্তানি নেতার সফর নিয়ে বিভ্রান্তি শীর্ষক একটি প্রতিবেদন প্রকাশ করেন।

প্রতিবেদনে বলা হয়, "পূর্ব পাকিস্তানে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠানের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার আগে গেরিলাদের নির্মূল করার লক্ষ্যে সারা পূর্ব পাকিস্তানে আরেকটি বড়ো ধরনের সামরিক শুদ্ধি অভিযানের জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান পরিকল্পনা করেছেন? বর্ষা মৌসুম শেষ হওয়ার এবং বেসামরিক কর্তৃপক্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও চাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় এই মুহূর্তে এমনটিই মনে হচ্ছে। সম্প্রতি তেহরানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের একদিনের আকস্মিক সফর এখনো রহস্যাবৃত রয়েছে। তবে কি তিনি শাহ'র কাছে পূর্ব পাকিস্তানে দ্বিতীয়বার বড়ো ধরনের সামরিক অভিযানের ব্যাপারে নৈতিক বা অন্য কোনো ধরনের সমর্থন চাইতে এসেছিলেন? তবে তিনি তা পেয়েছেন বলে কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায়নি। ইরানের শাহ গত গ্রীষ্মের শুরুতে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে মধ্যস্থতার চেষ্টা চালিয়েছিলেন, সেটি পূর্ব পাকিস্তানের বাংলাদেশি বিদ্রোহীদের সঙ্গে একটি রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে ছিল বলে মনে করা হয়। ইয়াহিয়ার সফরের পর ঘোষিত যৌথ ইশতেহারে অবশ্য এই ধরনের কোনো মনোভাব ফুটে ওঠেনি। আর তাতে 'অব্যাহত পারস্পরিক সহায়তার' যে উল্লেখ রয়েছে তাতে বরং এর বিপরীত দিকটিই প্রতিফলিত হয়েছে বলে মনে হয়।"

মার্কিন প্রয়াস: মুসলিম দেশ থেকে পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ

মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্টস থেকে দেখা যাচ্ছে মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন দেশকে নিক্সন প্রশাসন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে চেয়েছেন। পাকিস্তানের সমর্থক সৌদি আরব, জর্ডান, ইরান, তুরস্ক, লিবিয়া সরাসরি পাকিস্তানের পক্ষে কূটনৈতিক তৎপরতায় অংশগ্রহণ করে। মার্কিন কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে, নিক্সন প্রশাসন মুক্তিযুদ্ধ শুরু হওয়ার পরপরই ভারত ও পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু নিক্সন প্রশাসন গোপনে ইরানের মাধ্যমে ৫২টি মার্কিন ফ্যান্টম বিমান, লিবিয়া জেট বিমান, সৌদি আরব ৭৫টি জঙ্গি বোমারু বিমান এবং জর্ডান ১০টি এফ-১০৪ বিমান পাকিস্তানে সরবরাহ করে।[৮১] এমনকি জাতিসংঘে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লিবিয়ার স্থায়ী প্রতিনিধি বাংলাদেশ সম্পর্কে কোনো প্রকার সহানুভূতি না জানিয়ে বরং সোভিয়েত রাশিয়া এবং ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের মহাসচিবের বরাবর পত্র প্রেরণ করে। সেখানে ইসরাইল যেভাবে মধ্যপ্রাচ্যে আক্রমণ করেছিল ভারতও সেরূপভাবে পাকিস্তানের উপর চড়াও হয়েছে বলে মনোভাব ব্যক্ত করেন।[৮২]

এছাড়াও সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত সরাসরি মুক্তিযুদ্ধকে ভারত ও পাকিস্তানের যুদ্ধ হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে নিন্দা জ্ঞাপন করে।

উপসংহার

মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বব্যাপী ব্যাপক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করলেও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ রাষ্ট্র নিজেদের এড়িয়ে চলতে চেয়েছে। অধিকাংশ রাষ্ট্রকাঠামো ছিল রাজতন্ত্র, সামরিক বা স্বৈরতান্ত্রিক। গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ধারায় পরিচালিত যার মৌলনীতি ছিল ধর্মনিরপেক্ষতা, সেক্ষেত্রে তাদের পক্ষে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সমর্থন করা ছিল তাদের জন্য অত্যন্ত স্পর্শকাতর ও বিপজ্জনক। মুসলিম উম্মাহর কল্যাণ ও ভ্রাতৃত্ববোধের নীতির উপর ভিত্তি করে সংগঠন হিসেবে ওআইসি তার ভূমিকা পালন করতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছে। বাংলাদেশের বাঙালি মুসলমানদের উপর নির্মম আক্রমণ, গণহত্যা, ধর্ষণ, ধ্বংসযজ্ঞ এবং মসজিদ ধ্বংস হলেও মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো নৈতিকভাবে হলেও এই জঘন্য মানবতাবিরোধী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে এতটুকু প্রতিবাদ বা নিন্দা জানায়নি বরং পাকিস্তান সামরিক জান্তার ইসলামবিরোধী কর্মকাণ্ডকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন জানিয়েছে। তবে এ কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর আফ্রিকার দরিদ্র দেশগুলো আর্থিকভাবে সৌদি আরব, লিবিয়ার উপর নির্ভরশীল থাকায় তারা মুখ খুলতে পারেনি বা স্বাধীন নীতি গ্রহণ করতে অসমর্থ হয়েছে। তারপরেও মিশর, লিবিয়া, আলজেরিয়া ও আফগানিস্তান বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল হলেও সোচ্চার হতে পারেনি। তবে এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, মুসলিম দেশগুলোর শাসকগোষ্ঠী তাদের ক্ষমতার স্বার্থে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য-সহযোগিতা না করলেও সেদেশের প্রগতিশীল গণমানুষ, গণমাধ্যম, গণসংগঠন এবং বিভিন্ন আন্তর্জাতিক ফোরামে সিভিল সমাজের প্রতিনিধিবর্গ মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। অধিকাংশ মুসলিম দেশ পাকিস্তানের প্রত্যাশামতো সাহায্য করেন। যে অবনতিশীল অভ্যন্তরীণ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছিল তার ফলে অনেক দেশই তাদের আঙুল জ্বলন্ত শিখায় প্রবেশ করাতে দ্বিধান্বিত ছিল এবং প্রত্যাশিত সাহায্য এবং সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসেন।[৮৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য সংকেত

১. In 1986, the Muslim Education Trust organization (MET) located in the United Kigndom and directed by Ghulam Sarwar, obtained the 1971 census and information given by Embassies of the respective countries in London.

২. "Pakistan is not just a South Asian country, it is also essential part of South West Asian region. Only Punjab is located in South Asia." Ishtiaq Ahmad (ed.), *Pakistan is a Changing World,* Islamabad: Institute of Regional Studies, 1997, p. 63.

৩. মিশর, সৌদি আরব, ইরাক, সিরিয়া, লেবানন এবং জর্ডান

৪. George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, New York: University of California at Berkeley, Cornell University Press, 1964. ch. xvi. "Politically there were two unifying factors: the problem of Palestine and the Problem of the liberation of Arab people from foreign domination. Such points as the union of the Sudan with Egypt, the emancipation of Libya, and the freeing of Morocco could and did provide a platfrom united political action and harmonious agreement".

৫. "The creation of Pakistan is unique and the beginning of a new era in the history of mankind". Arif Hossin, *Pakistan Ideology and Foreign Policy*, chapter 5-8, London!

৬. Five main factors and concepts which motivated and inspired the Muslims. They were (a) the desire 'to build a life' according to Islamic ideals (b) Muslim nationalism (c) Islamic democracy (d) Islamic social justice or, as the Qaid-e-Azam in his 1948 Chittagong speech said, 'Islamic Socialism' (not to be confused with socialism of the Godless variety but socialism which embodies fraternity, equality and an egalitarian society wherein the common man has a say), (e) the establishment of Pakistan an the homeland of th Muslims from our sub-continent and is not created as the sole preserve of the 'sons of the soil'. A letter of M.A.H. Ispahani on Pakistani's Ideology, May 8, 1970, quoted from Azizul Haque, *Trends In Pakistan Eternal Policy 1947-1971*, Appendix-xii, Dhaka: Asiatic Society Of Bangladesh, 1985, p. 359.

৭. "Pakistan believed the "India will not allow her to vest in peace are will destroy her whenever she has opportunity" India thought that "when ever Pakistan gets an opportunity, she will move aggist India and attack her", Abul Kalam Azad, India wins Freedom, Orient Longrmans, calcutta 1959, p.226.

৮. "Under the guidance of talented Zalfrullah Khan (Foreign Minister) Pakistan Played an active role in the Middle East and "Pakistan found her international feet with unexpected speed." Azizul Haque, *op.cit.* p. vii.

৯. Lahore 1964, Vol. II, p. 520.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০. Aslam Siddiqi, *Pakistan Seeks Security*, Lahore: Longmans, 1960, p. 60.
১১. Abul Kalam Azad, *India Wins Freedom*, Calcutta: Orient Congress, 1959, p. 226.
১২. J.Korvel, *Danger in Kashmir*, Parnceton, 1954, p. 127-28.
১৩. ১৯৪৭ সালে ভারত-পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভ করলেও ও কাশ্মীরের দেশীয় রাজ্যের অধিপতি মহারাজ হরিশিং স্বাধীনভাবে এই রাজ্য শাসন করার পরিকল্পনা নেয়। সেজন্য কাশ্মীর ভারত বা পাকিস্তানে অন্তর্ভুক্ত হয়নি। কাশ্মীরের জনসংখ্যা অধিকাংশই মুসলিম হওয়াতে পাকিস্তান প্রথম থেকে কাশ্মীরকে তাদের ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালের অক্টোবর মাসে পাকিস্তান উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের সশস্ত্র উপজাতিদের এবং পরবর্তীকালে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর সৈন্যরা ছদ্মবেশে কাশ্মীরে ঢুকে পড়ে। এই অবস্থায় শেখ আবদুল্লাহর পরামর্শে মহারাজ হরিশিং ভারত বিভক্তিতে সম্মতি জ্ঞাপন করে ভারতের সাহায্য প্রার্থনা করে।
১৪. "Pakistan believed the 'India will not allow her to vest in peace are will destroy her whenver she has oppurtunity' India thought that 'when ever Pakistan gets an opportunity, she will move aggist India and attack her' Abul Kalam Azad, *op.cit.* p. 226.
১৫. পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী বগুড়ার মোহাম্মদ আলী এবং হোসেন শহীদ সোহরাওর্য়াদীর সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে।
১৬. পাকিস্তানের পররাষ্ট্রনীতি : ক. পশ্চিমাদেশ গুলোর সঙ্গে বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে বন্ধুত্ব সম্প্রসারণ করা, খ. কমিউনিস্ট ব্লকের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণ, গ. আফ্রো-এশিয়া বিশেষ করে মুসলিম দেশগুলোর সঙ্গে বন্ধুত্ব আরো নিবিড় করা।
১৭. জে.ডব্লিউ. চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো*, ঢাকা, ১৯৭১, পৃ. ১৯৫।
১৮. Craig Baxter (ed.), *Diaries Of Field Marshal Mohammad Ayub Khan 1966-1972*, Dhaka: The University Press Limited, 2007, p. 493.
১৯. *Ibid*, p. 493.
২০. Stemhen D. Tansey, *Politics The Basics*, Second edition, Routledge, London: 11 New Fetter Lane. EC 4P 4EE, p. 160-161.
২১. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য : 'Preparatory meeting for Islamic Summit Today', Dawn (Karachi), 8 September, 1969.
২২. সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী দেশগুলো হচ্ছে- ১. আলজেরিয়া, ২. আফগানিস্তান, ৩. ইরান, ৪. কুয়েত, ৫. ইন্দোনেশিয়া, ৬. গোয়েনা, ৭. চাদ, ৮. জর্ডান, ৯. তুরস্ক, ১০. নাইজেরিয়া, ১১. দক্ষিণ ইয়েমেন, ১২. উত্তর ইয়েমেন, ১৩. তিউনেশিয়া, ১৪. মালয়েশিয়া, ১৫. মালি, ১৬. মৌরিতানিয়া, ১৭. মরক্কো, ১৮. পাকিস্তান, ১৯. লেবানন, ২০. লিবিয়া, ২১. সৌদি আরব, ২২. সোমালিয়া, ২৩. সেনেগাল, ২৪. সুদান ও ২৫. সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্র
২৩. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ সেপ্টেম্বর ১৯৬৯
২৪. *Daily Telegraph*, 24 September 1969
২৫. *Dawn*, 25 September 1969, আরো দ্রষ্টব্য : Pakistan Horizon, Cronology, Vol. xxii, No. 4, pp. 356-357.
২৬. *Pakistan Times*, 25 September, 1969
২৭. "Yahya made a similar gaffe at the first Islamic Summit at Rabat. Yousuf J. Ahmed related the incident to me at Ambassador Shahryar Khan's house in

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

London in 1987. Both of them, as directors in the Foreign Office, were members of the delegation to the summit. Yahya called on the Shah of Iran, King Faisal, and the King of Morocco, all of whom mentioned India's request to join the Islamic Organization; Yahya gave the impression of acquiescing in the proposa. Wjrm S. M. Yousuf and Agha Shahi came to know of this, they felt unhappy but yahya had already cmmitted himself; at the first informal summit in the morning, the Shah of Iran proposal. The murmurings in the delegation increased. At lunch Tyabji, the outspoken Pakistan ambassador in Morocco, barged into Yahya's suite and strongly objected to India's joinnign the Organization. Yahya then registered the point and was angry that he had not been properly when India was invited to take the seat which was kept for it. This threw the concerence into pandemonium, because the matter had been taken as settled. Everntually, Pakistan's objectio prevailed. On his return to Pakistan, Yahya was hailed as *Hadi-i-Islam*". Hasan Zahir, *The Separation Of East Pakistan The Rise And Realization Of Bengali Muslim Nationalism,* Dhaka: The Univeristy Press Limited, 1998, p. 498.

২৮. *দৈনিক আজাদ*, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৯৬৯

২৯. ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পরাজিত ডা. মালিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু থেকেই এর বিপক্ষে অবস্থান নেন। ইয়াহিয়ার রাজনৈতিক সহকারী ছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হন।

৩০. Noor Ahmad Baba, *op.cit.* p.77.

৩১. "Is it rational in the interest of the nation to ignore so vast a section of mankind?", Bangladesh Prime Minister Mr. Tajuddin ahmed's appeal to Nations, dated june 13, 1971.

৩২. "In a special word to those in other Muslim and Arab countries who had not yet found it possible to condemn the mass slaughter in Bangla Desh, the Prime Minister said: "It is a tragic error on their part to think that Yahya's horders are waging a war of Islamic righteousness in Bangladesh. Their silence, therefore, condones colonialism and barbarism. Materials support to Islamabad puts them on the side of dictatorship and its well-documented crimes of arson, loot, rape and murder."

Mr. Ahmed said, "I want the Arabs to recall how they once fought to free themselves from the colonial rule of the Turks who were Muslims. Our struggle against West Pakistan-based colonialism is exactly analogues to their struggle against the Turks not very long ago." Patriot, New Delhi-June 14, 1971, See also Bangladesh Ducuments, Voll-I, p. 326.

৩৩. জয় বাংলা (মুজিবনগর), ২ জুলাই, ১৯৭১

৩৪. Asian Recorder, op cit. p. 10298; Av‡iv ¯^óe¨- Hindustan Standard, 27 June 1971.

৩৫. K M Shehabuddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dhaka: The University Press Limited, 2006, p. 126-127.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৬. K M Shehabuddin, *op.cit*, Dhaka: The University Press Limited, 2006, p. 151.
৩৭. *Pakistan Horizon*, Cronology, Vol. XXIV, No. 2, 1971, pp. 136-37.
৩৮. ২৪-২৬ জুন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
৩৯. *দৈনিক পাকিস্তান*, ৭ জুন ১৯৭১
৪০. *ঐ*, ২ জুলাই ১৯৭১।
৪১. International Islamic Organisation Calls Upon Muslim Countries To Help East Bengal Refigees: Statement, Dated June 9, 1971.
৪২. *Ibid.*
৪৩. *Pakistan Horizon*, Cronology, Vol. xxiv, no. 3, 1971, p. 76.
৪৪. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৩৭
৪৫. Statement by Mr. Adda Eban, Israeli Foreign minister, in the Knesset, Tel Aviv, 23 June, 1971
৪৬. Munir Ahmed Gichki, *Pakistan in a changing World*, Islamabad: Institute of Reginal Studies, p. 63.
৪৭. পাকিস্তান না টিকলে ইসলাম টিকবে না।
৪৮. Asian Recorder (New Delhi), Vol. XVII, No. 38, 1971. p. 10370.
৪৯. সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *'মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিকীকরণের বঙ্গবন্ধুর অবদান'*, *মাসিক অগ্রপথিক*, আগস্ট ১৯৯৭, পৃ. ৩৮
৫০. *দৈনিক পাকিস্তান*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৫১. *মর্নিং নিউজ*, ২৬ জুলাই ১৯৭১
৫২. *পাকিস্তান টাইমস*, ২৪ জুলাই ১৯৭১
৫৩. Al-Ayyam, Khartom-December 6, 1971
৫৪. *দৈনিক সংগ্রাম*, ১ আগষ্ট ১৯৭১
৫৫. *Pakistan Horizon*, *op cit*, p. 86
৫৬. *Hindustan Times*, ৫ আগস্ট ১৯৭১
৫৭. *Ibid.*
৫৮. *দৈনিক সংগ্রাম*, ৬ আগস্ট ১৯৭১
৫৯. *মর্নিং নিউজ*, ২৪ জুন ১৯৭১
৬০. The 22-nation Islamic Conference has expressed full support to sisterly Pakistan in its efforts to safeguard national unity and territorial integrity.
৬১. *পাকিস্তান টাইমস*, ২৫ জুন ১৯৭১।
৬২. Reuter despatch datelined Belgrade, 13 December, 1971
৬৩. *The Hindustan Times*, New Delhi, December 14, 1971.
৬৪. *পাকিস্তান টাইমস*, ১৫ জুন, ১৯৭১
৬৫. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৫ জুলাই ১৯৭১
৬৬. *পাকিস্তান অবজারভার*, ১৪ জুলাই ১৯৭১
৬৭. Statement By Presdent Soeharto Of Indonesia, Djakarta, December 7, 1971, *The Ddjakarta Times*- December 8, 1971
৬৮. Malyasian Prime Minister Tun Abdul Razzak's appeal to India and Pakistan, December 8, 1971

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৯. Prof. Atm Hanifa Former Indonesian Ambassador to Brazil and Italy. 7.
৭০. 'East Bengal: Failure of a Military Solution', *Al Thawra*, October 22. 1971.
৭১. 'Secession is secession no matter what name it bear or wherever it may be.' *মর্নিং নিউজ*, ১৬ জুন, ১৯৭১।
৭২. *ঐ*, ১৬ জুন ১৯৭১।
৭৩. *দি হিন্দুস্তান টাইমস*, নিউদিল্লি, ২১ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১
৭৪. Statement by Mr. Bissemter, at the Commonwealth Parliamentary Conference, Kualalmpur, 13 September, 1971
৭৫. *Yanki Ankora News Magazine*, 20-26 September, 1971
৭৬. *Al Anbaa Weekly*, Beirut- 2 October, 1971
৭৭. Crush India, Campaign In Pakistan, *Sunday Post*, editorial, Kenya- October 25, 1971.
৭৮. *Indonesia Raya*, Djakarta, 7 December, 1971.
৭৯. "Shady moves were also afoot to train the refugees as guerillas 'to utilise them as cannon fodder.'
৮০. Bangladesh as 'a fiction that fools one'. "The Arriba" *Spanish Daily*, June 22 1971.
৮১. ১৯৭২ সালের ১৭ জানুয়ারি মার্কিন কলামিস্ট জ্যাক এণ্ডারসন প্রথম এসব দেশের মাধ্যমে মার্কিন অস্ত্র সরবরাহের তথ্যটি ফাঁস করেন। দ্রষ্টব্য : *Pakistan Horizon*, cronology, vol-XXV, No- 1, 1972, p. 177.
৮২. The Union of Soviet Socialist Republics should assume a major part of the responsibility for its clear complicity with the aggressor. The failure of the Security Council to reach a decision when the aggression was first launched was the sole responsibility of the USSR, without whose support India could not have continued its defiance of the collective will of the international community. As we have been witnessing the delaying tactics, the manicures and the utilization of the veto by the representative of the USSR to further the chauvinistic designs of his country and in support of the aggressor with little regard for the killings and brutalities infected upon the population was taken by the representative of the imperialist United States of American 1967 with regard to the Israeli aggression in the Middle East. The roles are identical, but the actors are different.

This deplorable behavior could not be conducive to the creation and maintenance of an atmosphere of just peace and security which man is striving to achieve.

I request that this letter be circulated as an official document of the Security Council and the

General Assembly." Document S/10460*, Letter dated 16 December 1971 from the representative of the Libyan Arab Republic to the Secretary-General, 16 December 1971.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৩. "In spite of the expectations of a certain segment of the society in Pakistan, none of the Muslim contries gave any substantial support to Pakistan in its hour of need. The Internal situation had deteriorated to such an extent that even believers of the same God did not feel it prudent to burn their fingers in the flames which were engulfing East Pakistan." Lt. Gen. (Retd) Kamal Matinuddin, *Tragedy of Errors East Pakistan* (Crisis 1968-1971), Rawalpindi, 1994, p. 310.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সপ্তম অধ্যায়

জাতিসংঘে বাংলাদেশ সম্পর্কিত কূটনৈতিক তৎপরতা

ভূমিকা

পাকিস্তান সামরিক বাহিনী ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে নিরস্ত্র বাঙালি জাতির উপর সশস্ত্র আক্রমণ পরিচালনা করে। সকল ন্যায়-নীতি, দ্ব্যর্থহীন গণরায়, গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ, রীতিনীতি, মানবাধিকারের প্রতি ভ্রুক্ষেপ না করে দল, মত, ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে একটি জাতিকে ধ্বংস করার ব্লু-প্রিন্ট কার্যকর করতে আগ্রাসন চালায়। যুদ্ধ-আক্রান্ত, অসহায়, আতঙ্কগ্রস্ত এবং নিরাপত্তাহীন অগণিত মানুষ জীবনের আশ্রয়ে প্রতিবেশী ভারত সীমান্ত অতিক্রম করে। মানবিক বিপর্যয়ের এই জঘন্যতম কর্মকাণ্ড বিশ্ববিবেকে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পরিণামে তা কেবল দক্ষিণ এশিয়া নয়, বিশ্বশান্তিকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। এই অবস্থায় বাংলাদেশের নৃশংস ঘটনাবলিকে কেন্দ্র করে বিশ্ব পরিসরে ব্যাপক কূটনৈতিক তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়।

এক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে গণতান্ত্রিক-নির্বাচনে একটি জাতির দ্ব্যর্থহীন গণরায় নস্যাৎ করার লক্ষ্যে পাকিস্তান সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত আক্রমণ, অগণিত গণহত্যা ও শতাব্দীর মানবিক ট্রাজেডির বিষয়টিকে জাতিসংঘ কীভাবে গ্রহণ করেছিল।

জাতিসংঘে কার্যক্রম বিশ্লেষণ করলে মূলত দুটি ধারা বেরিয়ে আসে যদিও এর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে ভিন্ন উপধারা। দুটি মূল ধারার একটিতে শরণার্থীদের মানবিক সমস্যা প্রাথমিক তৎপরতা কীভাবে রাজনৈতিক সমঝোতার সমন্বিত প্রান্তে দাঁড়িয়েছে তার বহুমুখী উদ্যোগ ও কূটনৈতিক তৎপরতার প্রকাশ্য রূপ। অন্য ধারায় বাংলাদেশ সম্পর্কে কূটনৈতিক তৎপরতাকে চেপে ধরে এই প্রকট ও ভয়াবহ সমস্যাকে ভারত-পাকিস্তানের সমস্যায় রূপ দেবার প্রয়াস চালানো হয়েছে। তারপরও লক্ষণীয় প্রকাশ্যে-অপ্রকাশ্যে সংকটের শেষ অংকে এসে বাংলাদেশকে ঘিরেই জাতিসংঘের কূটনৈতিক উদ্যোগ, কার্যক্রম ও তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে।

জাতিসংঘ ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থা বাংলাদেশের শরণার্থী সমস্যাকে প্রাথমিকভাবে মানবিক ট্রাজেডি হিসেবে আখ্যায়িত করলেও পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, বাস্তবতার কারণে এই ভয়াবহ মানবিক সমস্যা রাজনৈতিক সমাধানে তারা আগ্রহী হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক সমাধানের ইপ্সিত লক্ষ্য ছিল অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় সমাধান পাওয়া; হেনরি কিসিঞ্জারের কথার সরল অর্থ ছিল রাজনৈতিক স্বায়ত্তশাসন অর্থাৎ স্বাধীন বাঙালি জাতির আবাসভূমি প্রতিষ্ঠা নয়।[১] যুক্তরাষ্ট্রের এই মৌলিক নীতি জাতিসংঘের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে।

মার্কিন কূট-কৌশলে বাঙালি জাতির স্বাধীনতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্মসূত্র দাবিকে প্রান্তিক পর্যায়ে ঠেলে রাখার সযত্ন প্রয়াস পরিলক্ষিত হলেও সকল প্রচেষ্টা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা প্রশ্নটি পরিশেষে কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায়।[২] যুক্তরাষ্টের বিঘোষিত নীতি অনুযায়ী বাইরে যেমন জাতিসংঘের অভ্যন্তরে পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করতে কুণ্ঠিত ছিল না। অন্যদিকে, সোভিয়েত রাশিয়া ভূ-রাজনৈতিক ও 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের' সমর্থনে ভারতের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নিতে গিয়ে বাংলাদেশের গণ-আকাঙ্ক্ষার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে। জাতিসংঘের চত্বরে কূটনৈতিক দাবাখেলার চাল এবং পাল্টা চাল যেকোনো বিশ্লেষকের জন্যই চমকপ্রদ।

প্রাথমিকভাবে জাতিসংঘে বাংলাদেশের বিষয়টি অপ্রকাশ্যে এসেছে শরণার্থী-আন্তর্জাতিকীকরণ, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বিপর্যয়কর মানবিক ঘটনাবলির সমাধানে রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে সমাধান খুঁজে পেতে চেয়েছে। মানবিক বিপর্যয়ের স্তূপীকৃত ঘনীভূত সমস্যার রাজনৈতিক সমধানের কূটনৈতিক তৎপরতার শেষাঙ্কে সামরিক যুদ্ধ অনিবার্য ও দৃশ্যমান হয়ে উঠলে বাংলাদেশ জাতিসংঘের কেন্দ্রবিন্দুতে এসে উপস্থিত হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নে বিভিন্ন দেশ বিশেষকরে পরাশক্তিগুলো জাতিসংঘে পরিচালিত হয় স্ব-স্ব দেশের বহুমাত্রিক ও বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতার পরিমণ্ডলে আবর্তিত হয়েছে এবং সর্বশেষ সমন্বিত পরিমণ্ডলকে সামনে রেখে পরাশক্তিগুলোর সর্তক পদক্ষেপ ছিল বিশ্বযুদ্ধ এড়ানো, যা এই অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত আকারে আলোচিত হবে।

জাতিসংঘের দায়িত্ববোধ

জাতিসংঘ সনদে পৃথিবীর সকল দেশের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার, মানবাধিকার রক্ষা এবং গণহত্যা রোধ ও শান্তি বিষয়ক সনদ গ্রহণ করা হয়েছে।[৩] জাতিসংঘের ২ (৭) উপধারায় বলা হয়েছে, "বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিস্পত্তির জন্য কোনো সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না, কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।"[৪] যদিও তা বাংলাদেশের বেলায় সপ্তম ধারা কোনো ক্ষেত্রেই কার্যকর হয়নি বা বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সপ্তম ধারা অনুযায়ী কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেনি। কিন্তু একথা সত্য যে, জাতিসংঘ সনদের সপ্তম ধারা অনুযায়ী নিরাপত্তা পরিষদের ব্যবস্থা যে নিতে পারতো না এমনটি নয়।[৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘের পূর্বাপর ভূমিকা বিশ্লেষণে দৃষ্টান্ত হিসেবে এ কথাটি উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পারস্য উপসাগরীয় যুদ্ধে স্বাধীন সার্বভৌম ইরাক প্রজাতন্ত্রের সম্মতি ব্যতিরেকে জাতিসংঘের উদ্যোগে পশ্চিমা দেশগুলো কুর্দি জনগণের স্বার্থে হস্তক্ষেপ করেছে অথবা এটাও দৃষ্টান্ত হতে পারে, কেন্দ্র সরকারের বিনা অনুমতিতে সোমালিয়ায় জাতিসংঘ ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা চালিয়েছে। সে কারণে এ কথা উঠে আসে যে, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যে বিশাল মানবিক ট্রাজেডি সৃষ্টি হয়েছিল, যে ব্যাপক গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘন যেখানে নিত্যদিনের দিনপঞ্জির নিষ্ঠুর আলেখ্য এবং যা ছিল বিশ্ব মানবতা ও শান্তির পক্ষে চরম হুমকি, সেক্ষেত্রে জাতিসংঘ তার যথাযথ ভূমিকা পালনে দ্বিধান্বিত ছিল।

আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন যেকোনো পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ সনদের ৯৯ ধারার ক্ষমতানুসারে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। কিন্তু তিনি তা করেননি। এই ব্যাখ্যা তিনি নিজেই দিয়েছেন। তাঁর কথায়, ভারত ও পাকিস্তানের ঋণাত্মক মনোভাবের কারণে নিরাপত্তা পরিষদের অধিকাংশ সদস্য কোনো সভা ডাকতে রাজি হবে কিনা, সে ব্যাপারে তিনি সন্দিহান ছিলেন। আর তা যদি সম্ভব হতো, তাহলেও সে সভার কোনো এজেন্ডা নির্ধারণ সম্ভব হতো না। কারণ পাকিস্তান তখন যুক্তি দেখিয়ে বলতো, আন্তর্জাতিক শান্তি বিঘ্নিত হয় এমন কোনো ঘটনা ঘটেনি। চলতি বিবাদ শুধু পাকিস্তান সরকার ও আওয়ামী লীগের ভেতর। "এরপরে যদি আমি 'মিথ্যা' যুক্তিতে ৯৯ ধারা ব্যবহারের চেষ্টা করেছি বলে অভিযুক্ত হতাম, তাহলে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে আমার কার্যকারিতা খুবই ক্ষতিগ্রস্ত হতো।" এতদ্‌সত্ত্বেও মার্চে ঢাকায় শেখ মুজিবুর রহমান ও ইয়াহিয়া খানের মধ্যে আলোচনা ভেঙে যাওয়ার ৪৮ ঘন্টা পর মহাসচিব উ'থান্ট জাতিসংঘে নিযুক্ত পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠকে মিলিত হয়ে ঢাকার পরিস্থিতি ও মানবিক বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন।[৬] নিরাপত্তা পরিষদের নিষ্ক্রিয়তা সত্ত্বেও উ থান্ট পরিস্থিতির ভয়াবহতা নিয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান অর্জন না করা গেলে মানবিক বিপর্যয় এড়ানো যাবে না সে কথা তিনি ভালোভাবেই জানতেন। আর তেমন কোনো সমাধান ফর্মুলা বের করতে হলে আওয়ামী লীগের সঙ্গে কথা বলতে হবে এবং পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে আলোচনার ভিত্তিতে আওয়ামী লীগকে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ভেতর আনতে হবে। আর এই কঠিন কাজটি করার জন্যই উ থান্ট টুংকু আবদুর রহমানের দ্বারস্থ হন।[৭] এ সম্পর্কে উ থান্ট গোপন কূটনৈতিক পত্রালাপ করেন। কিন্তু তাও ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

২৫শে মার্চের গণহত্যার প্রতিক্রিয়ায় জাতিসংঘ

বাংলাদেশের অভ্যুদয় পর্বে এ প্রশ্নের উদ্রেক করে যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে 'আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার', জেনেভা কনভেনশন মান্যতা এবং 'রাষ্ট্রীয় গণতান্ত্রিক নীতি' সমুন্নত রাখার কথা সমভাবে ঘোষিত হলেও জাতিসংঘের গায়ে তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আচড় কাঁটতে পারেনি, কিংবা জাতিসংঘের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করেনি বা দৃশ্যমান হয়নি। বরং এই মৌলনীতিকে 'অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার' 'ঝুলিতে' ঠেলে দিয়ে এর ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া থেকে জাতিসংঘ সনদ ও কাঠামোগত কারণের দোহাই দিয়ে নিজেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করে।[৮] পাকিস্তান শাসকগোষ্ঠীর ভয়াবহ মানবাধিকার লঙ্ঘন, গণহত্যা এবং মানবিক মর্যাদা ও মূল্যবোধকে নির্মমভাবে উপেক্ষা করে। পাকিস্তান সামরিক জান্তা এক কথায় বলা যেতে পারে, প্রথমদিকে বাংলাদেশের নৃশংস গণহত্যা এবং নির্মম মানবাধিকার লঙ্ঘন এবং সীমাহীন নির্যাতনের বিষয়টি উপেক্ষা করে জাতিসংঘ ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক ফোরামে কেবলমাত্র অভ্যন্তরীণ রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও সংহতির কথাই জোরেশোরে তুলে ধরে। কেননা পাকিস্তান মনে করেছিল সামরিক অভিযানেই বাংলাদেশ সমস্যার সমাধান সম্ভব এবং তা হবে 'স্বল্প সময়ের' মধ্যেই।

বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, একাত্তরের শেষ প্রান্তিক ব্যতীত জাতিসংঘ-বিতর্ক, আলোচনা বা প্রস্তাবে বাংলাদেশকে সরাসরি খুঁজে পাওয়া যায় না। প্রথম থেকেই জাতিসংঘের সম্পর্কের দোহাই দিয়ে বাংলাদেশ সমস্যাটিকে সামনে নিয়ে আসা হয়নি। বাংলাদেশের রক্তক্ষয়ী স্বাধীনতার গুরুতর প্রশ্নটিকে এড়িয়ে পাকিস্তান প্রথম থেকে পূর্ববঙ্গের উদ্ভূত ভয়ংকর পরিস্থিতিকে ভারত-পাকিস্তান সমস্যায় রূপান্তকরণের প্রচেষ্টা, কখনো শরণার্থী সংখ্যাতত্ত্বের জটিলতা, রাজনৈতিক সমঝোতাকে চাপা দিতে মানবিক সমস্যার আপাত স্বীকৃতি এবং সর্বোপরি ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ, যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের মতো বিষয়কে জাতিসংঘের কূটনৈতিক এজেণ্ডায় বড় করে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে। এর নেপথ্যে শক্তিশালী ও সক্রিয় পৃষ্ঠপোষক হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র-চীন ও তাদের অনুসারী রাষ্ট্রগুলো যেমন যুক্ত ছিল তেমনি মুসলিম বিশ্ব সংশ্লিষ্ট ছিল।

গবেষণায় প্রতীয়মান হবে যে, এই জ্বলন্ত আন্তর্জাতিক ইস্যু সমাধানে জাতিসংঘের অসফলতার প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘ সনদে উল্লেখিত জাতির 'আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের' মৌলিক দিকটিকে উপেক্ষা করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সমগ্র পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও বাঙালি জাতির স্বাধীনতার সংগ্রাম কোনোভাবেই বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন হতে পারে না এ কথা উপলব্ধি করতে তারা যে অক্ষম ছিল এমনটি নয়। ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে বরং ঐ দলটিকে নিষিদ্ধ করা হয়। নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হত্যা এবং নির্বিচার গণহত্যার প্রয়াস চালানো হয়। 'পোড়া মাটি নীতি' গ্রহণ করা হয়। ন্যায়বিচার, গণতন্ত্র, মানবাধিকার সবকিছুই অস্বীকার করা হয়। বাধ্য হয়ে ঐতিহাসিক ধারাবাহিকতায় বাঙালি জাতি আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার অর্জনে স্বাধীনতা ঘোষণা করে। স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সনদ মেনে চলার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করলেও দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জাতিসংঘের দুয়ার পর্যন্ত এ বার্তা পৌঁছায়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘে বাংলাদেশের ইস্যু

২৯ মার্চ জাতিসংঘে ভারতীয় রাষ্ট্রদূত সমর সেন উ থান্টের সাথে দেখা করে উপমহাদেশের পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করেন। উ থান্ট ৩০ মার্চ সমর সেনের কাছে লেখা এক অনানুষ্ঠানিক পত্রে জানান, "আমার ব্যক্তিগত অবস্থান ও জাতিসংঘ মহাসচিবের অবস্থান উভয় থেকেই, মানবিক বিষয়সমূহে আমি কখনই নিরপেক্ষ থাকি না।" কিন্তু কার্যত তা হয়নি এ জন্য যে, এই সময় বিভিন্ন দেশের সরকার দাবি করে যে, মহাসচিব কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারেন না।

উ থান্টের পত্রের জবাবে জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন অনানুষ্ঠানিক পত্রে যুক্তি দেখান যে, 'পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের একটা গ্রহণযোগ্য পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।' তিনি বলেন, 'মানবিক বিপর্যয়ের মাত্রার ব্যাপকতা বিচার করলে দেখা যায় যে, এটি এখন আর পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়।' জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯৭১-এর মার্চে পূর্ব পাকিস্তানের ঘটে যাওয়া দুর্ঘটনায় তার উদ্‌বেগের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, "যদিও এ-যুদ্ধ পাকিস্তানের অভ্যন্ত রীণ বিষয় তবুও কিছু কিছু সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গোচরীভূত হয়েছে।"[৯]

পূর্ব পাকিস্তানে মার্চ মাসে সংকট সৃষ্টির পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের মহাসচিব বসন্ত এবং গ্রীষ্মে মানবিক কর্মসূচি গ্রহণ করলেও প্রতিদিন এ অঞ্চলের পরিস্থিতি সর্বক্ষেত্রে ব্যাপক অবনতি ঘটেছে। সীমান্ত সংঘর্ষ, হামলা এবং নাশকতামূলক কাজ প্রতিনিয়ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই অবস্থায় ২০ জুলাই ১৯৭১ জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টের নিকট ইঙ্গিত প্রদান করেন যে, মানবিক সমস্যা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে, রাজনৈতিক সমঝোতার অভাবে আইন-শৃঙ্খলা, প্রশাসনের উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়নি।

রাজনৈতিক সমঝোতা, পরিবেশের উন্নয়ন, আস্থা প্রভৃতি শরণার্থীদের দেশে ফেরার সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে সম্পর্কিত। ভয়ানক খাদ্য ঘাটতির বিপদ রয়েছে, যেক্ষেত্রে ত্রাণ কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা দরকার। কিন্তু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক উপকরণসমূহ এমন পর্যায় রয়েছে যেখানে বিশাল মানবিক সাহায্যের ক্ষেত্রে একটি বিষাক্ত চক্র তৈরি হয়ে আছে। এসব বিবেচনায় রেখে যদিও নিরাপত্তা পরিষদের এজেন্ডায় এসব অন্তর্ভুক্ত নেই, তবুও জাতিসংঘের মহাসচিব হিসেবে তিনি এই অস্বাভাবিক বিষয়টি নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টের দৃষ্টিগোচর এড়াতে পারেন না। মূলকথা হলো রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও সংহতি যেখানে সনদের মূল নীতিমালা এবং অন্যদিকে আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নটি সেখানে জড়িত, সেহেতু বিষয়টি সংঘাত ও সংকটপূর্ণ।[১০]

জাতিসংঘের মহাসচিব সম্ভাব্য কার্যক্রম সম্পর্কে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, "এটা শুধু মানবিক বিবেচনায় যথেষ্ট নয়, এটা জাতিসংঘের নিকট শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও একটি কার্যকর হুমকি বটে।" তিনি আরো বলেন, বর্তমান অবস্থার অধিক অবনতি এড়িয়ে যেতে জাতিসংঘের দীর্ঘকালীন শান্তিরক্ষা ও অন্যান্য ব্যবস্থাবলির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো উচিত এবং এটা আনুষ্ঠানিক বা অনানুষ্ঠানিকভাবে, প্রকাশ্যে বা গোপনে হতে পারে।[১১]

শরণার্থী সমস্যা ও জাতিসংঘ

১৯৭১ সালের ১লা এপ্রিল জাতিসংঘের মহাসচিব উপমহাদেশের সম্পর্কে কী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন সে সম্পর্কে চাপ সৃষ্টি হলে তাঁর মুখপাত্র যা বলেন, তার সহজ অর্থ হলো পাকিস্তানের ঘটনাবলি সম্পর্কে তিনি অবহিত। এসব নৃশংস জ্ঞাত ঘটনাবলির মধ্যে রয়েছে ব্যাপক গণহত্যা, অগ্নিদগ্ধ বাড়িঘর থেকে তাড়া খাওয়া ছিন্নমূল মানুষের অবর্ণনীয় দুর্দশা, মিছিলে আক্রমণোদ্যত কামানের গোলাবর্ষণ এবং বিপর্যস্ত মানবিক ট্রাজেডি। কিন্তু পাকিস্তান সরকার এ সম্পর্কে মানবিক বিপর্যয়ে আক্রান্ত মানুষের পাশে দাঁড়ানোর মতো ন্যূনতম সহযোগিতা করার কোনো উদ্যোগ বা আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে অনুরোধ জানায়নি। সেজন্য মহাসচিবের ভাষ্যমতে তিনি যথাযথ উদ্যোগ নিতে পারছেন না। কিন্তু জাতিসংঘ থেকে প্রকাশিত ইস্তেহারে দেখা যাচ্ছে ২রা এপ্রিল ভারত মহাসচিব উ থান্টের নিকট পাকিস্তানের বর্বর ও নিষ্ঠুরতার প্রশ্নে সমালোচনা করে বলা হয়েছে, পাকিস্তান সৈন্যরা বাংলাদেশে মানুষের ওপর যেভাবে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ ও নির্যাতন চালিয়েছে এবং তা এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার মনে করে নিচেষ্ট থাকার সময় নেই।[১২] তারপরও দেখা যায়, ২২শে এপ্রিল মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি নিয়ে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বরাবর[১৩] লিখিত এক পত্রে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে পূর্ব পাকিস্তানে অবিলম্বে সম্ভাব্য সকল প্রকার সহযোগিতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে মহাসচিব জাতিসংঘ সনদে প্রথম অধ্যায়ের ২ ধারার ৭ অনুচ্ছেদে উল্লেখ করেন।[১৪] এর একদিন পরে ভারতে আশ্রয় গ্রহণকারী শরণার্থীদের সাহায্যের জন্য তিনি প্রকাশ্য উদ্যোগ গ্রহণ করেন।

শরনার্থী সমস্যা ও জাতিসংঘ

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে লিখিত জাতিসংঘ মহাসচিবের ২২শে এপ্রিলে পত্রের প্রত্যুত্তরে জাতিসংঘ শরণার্থী সমস্যার সঙ্গে জড়িয়ে পরার মাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইস্যুতে সংশ্লিষ্ট হয়।

শরণার্থী সমস্যা বিষয়ে জাতিসংঘের মহাসচিব ২২শে এপ্রিল (১৯৭০) পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট যে পত্র দেন তার প্রত্যুত্তরে পাক-প্রেসিডেন্ট বিষয়টিকে 'অতিরঞ্জিত' বলে নাকচ করে দেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট একইসঙ্গে শর্ত আরোপ করেন যে, যেকোনো আন্তর্জাতিক সাহায্য পাকিস্তানের ত্রাণ সংস্থাগুলোর মাধ্যমে পরিচালিত হতে হবে।[১৫]

শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য সম্পর্কে পাকিস্তানের নেতিবাচক অবস্থানের দিকটি স্পষ্ট এ কারণে যে, শরণার্থী সমস্যাটি যেন কোনোভাবেই আন্তর্জাতিক কূটনীতির কেন্দ্রে এসে না দাঁড়ায় যার দূরবর্তী ফলাফল হবে পাকিস্তানের জন্য কূটনৈতিক 'কালো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঘোড়া'। দ্বিতীয়ত, পাকিস্তান সামরিক জান্তা প্রণীত পরিকল্পনায় ছিল যে, পূর্ব পাকিস্তান সংকট সাময়িক এবং স্বল্প সময়ে নিরাময়যোগ্য। পাকিস্তান সামরিক জান্তার ঘোষণায় এ কথাটি বারবার প্রতিফলিত হয়েছে। সেজন্য ১৯শে মে মহাসচিবের নিকট বিভিন্ন রাষ্ট্র ও বেসরকারি সংস্থা এবং তার ব্যক্তিগত সূত্র থেকে প্রাপ্ত ভারতে আশি লক্ষ শরণার্থীর দাবিকৃত সংখ্যা সম্পর্কে পাকিস্তান আপত্তি জানিয়ে বলেছে এর সংখ্যা কোনোক্রমে দু'লাখের বেশি হবে না।

ভারত-পাকিস্তানের এই পরস্পরবিরোধী অবস্থানের পরিপ্রেক্ষিতে ২৮শে মে জাতিসংঘের সহকারি মহাসচিব ইসমাত টি কিত্তানি পাকিস্তানে গিয়ে প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করে পূর্ব পাকিস্তানে ত্রাণকার্য পরিচালনার জন্য দাতা সংস্থা ও দেশসমূহের অভিপ্রায় এভাবে তুলে ধরেন যে, 'সমগ্র সাহায্য যেন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের কাছে পৌঁছে।' এভাবে প্রথম থেকেই মানবিক সাহায্য নিয়েও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি হয়। কিন্তু জাতিসংঘসংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ মনে করেন, এই মানবিক ট্রাজেডির ক্ষেত্রে মহাসচিবের যে ত্বরিৎ ও কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ যেক্ষেত্রে অনিবার্য ছিল সেক্ষেত্রে তার দীর্ঘায়িত পদক্ষেপ 'স্ব-আরোপিত সতর্কতা' হিসেবে চিহ্নিত হয়ে থাকবে। সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রসমূহের অনুমোদন বা সম্মতি ব্যতিরেকে জাতিসংঘ উদ্যোগ নিতে পারে না, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে এই নীতি অনুসরণ করা হয়েছে। জাতিসংঘ মহাসচিব লিখিত বিশ্বপরিসরে এই প্রতিপাদ্য সর্বক্ষেত্রে বা সমভাবে প্রতিপালিত হয়েছে এমনটি বলা যাবে না।

২৩শে জুন শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার আবারো জোর দিয়ে বলেন যে, সাধারণ ক্ষমা ঘোষণার আওতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য অভ্যর্থনা শিবির খুললেও তারা তেমনভাবে ফিরে আসেনি। তিনি অভিমত ব্যক্ত করে বলেন, রাজনৈতিক সমাধান ব্যতীত তারা স্ব-গৃহে ফিরে আসবে না।[১৫]

জাতিসংঘের সহযোগী সংগঠনসমূহ, শরণার্থী বিষয়ক কমিশন, ইকোনোমিক অ্যান্ড সোস্যাল কাউন্সিল, আইনবিদ পরিষদ, আন্তর্জাতিক সাহায্য সংস্থা, উপ-সংস্থা এবং সর্বোপরি জাতিসংঘের মহাসচিব উপলব্ধি করেছেন কেবলমাত্র ত্রাণসাহায্যের মধ্যে শরণার্থী সমস্যার সমধান নিহিত নেই, বরং রাজনৈতিক সমঝোতার মধ্যে এর সমাধান খুঁজে পেতে পারে। শরণার্থীদের সামনে রেখে আন্তঃরাষ্ট্র কূটনৈতিক তৎপরতা প্রণিধানযোগ্য।

১৯৭১ সালের ১৬ই জুলাই অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ সভায় হাই কমিশনার ও মহাসচিবের বক্তব্যের উপর পূর্ণ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত আলোচনায় পরিলক্ষিত হয়েছে যে, শরণার্থীদের 'স্বেচ্ছাপ্রণোদিত প্রত্যাবর্তনের' বিষয় উপেক্ষিত রয়ে গেছে। ২৫শে মে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শরণার্থী ফিরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারে ঘোষণা দেওয়ার পরও খুব অল্পসংখ্যক শরণার্থী ও স্বেচ্ছায় ফিরে যায়নি বরং বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সংবাদে দেখা গেছে ভারতে শরণার্থী সংখ্যা বেড়েই চলেছে। এর অর্থ হলো পাকিস্তানের প্রতি আস্থাহীনতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের সমস্যাটিকে কূটনৈতিক কৌশলে ভারতসহ কয়েকটি দেশ রাজনৈতিক সমঝোতার পথে টেনে আনে। জাতিসংঘ স্বীকার করে যে, ঐ অঞ্চলের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি থাকায় পূর্ব পাকিস্তানে সবরকম সাহায্য কাজে বিঘ্ন ঘটছে। 'আইন-শৃঙ্খলা' পরিস্থিতির অবনতির উল্লেখ এই ইঙ্গিত দিয়েছে যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নেই। সংকট ও সংঘাত চলছে। যুদ্ধ ও গণহত্যা চলছে। যা রাজনৈতিক সমাধানের দিকে অঙুলি নির্দেশ করেছে।

শরণার্থী সমস্যা শুধু চিরায়িত সমস্যার বৃত্তে আবদ্ধ থাকেনি, বরং এই মানবিক সমস্যা বহুদূরব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। যার পেছনে রয়েছে বাংলাদেশের অগণিত মানুষের রক্তস্রোত, আকাঙ্ক্ষা এবং একটি জাতিগোষ্ঠীর অস্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা। মহাসচিব যদিও মনে করেছেন ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার ধ্রুপদী সম্পর্কও এই সমস্যার অন্যতম কারণ তারপরও একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, ৬ বছর আগে সম্পাদিত তাসখান্দ চুক্তির[১৬] বিপরীতের এই মানবিক ট্রাজেডি দু'দেশকেই ভয়াবহ সংকট ও যুদ্ধের দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে জাতিসংঘের আওতায় গোপন সংলাপ, পত্রালাপ বা আলোচনা কিংবা সিদ্ধান্ত নেওয়া ও তা কার্যকর করা সহজসাধ্য নয়, কারণ এর সঙ্গে যুক্ত রয়েছে নিষ্ঠুর রাজনৈতিক ও কষ্টকর মানবিক সমস্যার উপায় উদ্ভাবন। প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে মধ্য জুলাইতে মহাসচিব এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে, শুধু কিছু ত্রাণ পাঠিয়ে ও সমবেদনা জ্ঞাপন করে মানবিক সমস্যা দূর করার চেষ্টার দিন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের ফুরিয়ে গেছে।

মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যা মিলে এমন একটি সমস্যা সৃষ্টি করেছিলো যেখানে জাতিসংঘের সকল সংস্থাকে একক সত্তা হিসেবে কাজ করে সমস্যার মোকাবেলা করতে হবে। এসব কারণে মহাসচিব হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টি আকর্ষণ করার তাগিদ অনুভব করেন। একই সময়ে মহাসচিব দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করে বলেন, "প্রধান যে সমস্যা তার সমাধানের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা।"[১৭]

জেনেভায় সাংবাদিক সম্মেলনে পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীদের সম্বন্ধে জাতিসংঘের শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগাখান একইভাবে বলেন, রাজনৈতিক কারণে নিরাপত্তার অভাবে শরণার্থীরা দেশ ছাড়ছে এবং তাদের ফেরার পরিবেশ সৃষ্টির মাধ্যমে এর সমাধান সম্ভব।[১৮] জাতিসংঘের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষেদের সামাজিক সমিতির আলোচ্যসূচি ৫ (ক) : মানবাধিকার কমিশনের প্রতিবেদনের ওপর জাতিসংঘের নিযুক্ত ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি কর্তৃক 'মানবাধিকার ঘোষণা'সহ জাতিসংঘ ও আন্তর্জাতিক অন্যান্য মানবাধিকার-সংক্রান্ত চুক্তি ও দলিলের উল্লেখ করে বলা হয়, এসবে স্বাক্ষরকারী হয়েও পাকিস্তান সরকার ও সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জানমাল ধ্বংস করছে এবং নজিরবিহীন মানবাধিকার লঙ্ঘন করে চলেছে। তারা এমনকি আন্তর্জাতিক আইনবিদ পরিষদ (ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অব জুরিস্ট)-এর অবদানেও বিন্দুমাত্র ভ্রুক্ষেপ করেনি। তিনি বলেন, আন্তর্জাতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্প্রদায় যদি এসব লংঘন খতিয়ে না দেখে তবে মানবাধিকার দলিলসমূহ কৌতুকে পর্যবসিত হবে।[১৯] ইকোনোমিক এন্ড সোশ্যাল কাউন্সিল-এর সোস্যাল কমিটিতে নিউজিল্যান্ড প্রতিনিধি "মানবাধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী দেশগুলোর দায়িত্ব সম্পর্কে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘন বিষয়ে জাতিসংঘে আলোচনা করা আবশ্যক। তিনি ব্যাপক প্রাণহানি ও ধ্বংসোদ্বেগ প্রকাশ করে গণতান্ত্রিক একটি অখণ্ড পাকিস্তান দেখার আকাঙ্ক্ষার কথাও বলেন।[২০] এ প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, প্রতিদিন মৃত মানুষের লাশের সংখ্যা স্তূপীকৃত হচ্ছে, নির্যাতন ও অবর্ণনীয় ধ্বংসযজ্ঞ চলছে, মানবাধিকার সনদের সব কিছুই লঙ্ঘন করা হয়েছে–সে ফোরামে এখন পূর্ববঙ্গের মানবিক পরিস্থিতি ও সমস্যা তুলে ধরা অপাক্তেয়।[২১]

উক্ত সংস্থার ৫১তম অধিবেশন জাতিসংঘ মহাসচিবের বিবৃতির গুরুত্ব অংশে বলা হয়, 'এরকম ভয়াবহ দুর্যোগ আন্তর্জাতিক সাহায্য প্রচেষ্টা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম হয়। একই সাথে তিনি পূর্ব পাকিস্তানের জরুরি অবস্থাকে আধুনিক সমাজের সম্পদ ও কারিগরি ক্ষমতার অতীত বলে উল্লেখ করে এর মোকাবেলায় জাতিসংঘের বিরাজমান কাঠামোর পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক সাহায্য বাড়ানোর কথা বলেন।' (পরিশিষ্ট-এক) কাঠামোর পরিবর্তন সম্পর্কে মহাসচিব অবশ্য স্পষ্ট ব্যাখ্যা বা রূপরেখা তুলে ধরেছেন এমন তথ্য পাওয়া যায়নি।[২২] ৫১তম অধিবেশনে যুগোস্লাভ প্রতিনিধি এল. মেজভ জোরের সঙ্গে অভিমত প্রকাশ করেন, 'শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় ঘরে ফেরার মতো নিরাপদ ও তাদের পছন্দমতো ব্যবস্থা নেবার মাধ্যমেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।'[২৩] জাতিসংঘ উপসংস্থা (ইউএন সাব কমিশন)-এর কাছে ২২টি আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা জাতিসংঘের সংখ্যালঘু রক্ষা ও বৈষম্য প্রতিরোধ উপসংস্থার অনুষ্ঠিতব্য ২৪তম অধিবেশনে পূর্ব পাকিস্তানের নির্যাতন মানবাধিকার লঙ্ঘন ও স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন করা নিয়ে আলোচনা ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আবেদন জানান।[২৪] জেনেভায় অনুষ্ঠিত ইউ.এন.এইচ.সি.আর.-এর নির্বাহী কমিটির ২২তম অধিবেশনে ভারত সরকারের পুনর্বাসন সচিব জি.এস.কাহলন ভারত সরকারের পক্ষে 'শরণার্থীদের দ্রুত ও নিরাপদে দেশ ফেরা তাদের পছন্দমত রাজনৈতিক সমাধানের জন্য চেষ্টা করতে ও পাকিস্তান সরকারকে চাপ দিতে কমিটি ও বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানান।'[২৫]

১৬ই জুন ১৯৭০ থেকে ১৫ই জুন ১৯৭১ মহাসচিব তাঁর সংস্থার কার্যক্রমের বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ যা ২১শে সেপ্টেম্বর ১৯৭১ সালে অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন মাত্রার সাম্প্রতিক ঘটনাবলির কার্যকরণে ভারতে সীমান্ত রাজ্যগুলোতে এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে যা ভারতের অর্থনীতি ও সম্পদের উপর বিরাট চাপ সৃষ্টি করেছে মর্মে উল্লেখ করেন এবং দাবি করেন। আন্ত র্জাতিক ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতা অবিলম্বে প্রয়োজন যা দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে এবং ভারতের অবস্থিত শরণার্থীদের সাহায্য করা যায়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, মানবিক নীতি সমূহের প্রতি সম্মান এবং অর্থপূর্ণ রাজনৈতিক সমঝোতার অভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মানবিক সাহায্য প্রদানের বিষয় প্রকট হয়েছে।[২৬] বিশেষকরে পাকিস্তানে আইন-শৃঙ্খলা জনপ্রশাসনকে আক্রান্ত করেছে, খাদ্য স্বল্পতা ভয়ঙ্করভাবে দৃশ্যমান হয়েছে এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি পাকিস্তান কর্তৃপক্ষের প্রচেষ্টাকে ভয়ঙ্করভাবে বিষাক্ত করে তুলেছে।[২৭] তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, ১০ই আগস্ট ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খান বরাবর ইন্টারন্যাশনাল কমিশন অফ জুরিস্ট এক টেলিগ্রামে মহাসচিবের বক্তব্য উদ্ধৃত করে স্মরণ করিয়ে দেন যে, সেই ট্রাজিক অবস্থা মানবিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে গেছে যে, যা অভিন্ন ও অবিচ্ছিন্ন উপায়ে একত্রে জাতিসংঘের সামনে চ্যালেঞ্জ নিয়ে এসেছে। টেলিগ্রামে অভিমত প্রকাশ করা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি সম্মান দেখানো ব্যতীত এই সমস্যা সমাধানের সাফল্যজনক পথ নেই।[২৮]

এসব আলোচনা জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের থার্ড কমিটিতে আলোচনা হয়। মহাসচিব কর্তৃক শরণার্থীদের মানবিক সাহায্য প্রদানের বিষয়টি জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের উত্থাপিত আলোচ্যসূচি 'শরণার্থী বিষয়ক হাইকমিশনের রিপোর্ট' শিরোনামে বিষয়গুলো আলোচিত হয়। হাই কমিশনার জোরের সঙ্গে বলেন যে, স্বেচ্ছায় শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন একমাত্র কার্যকর সমাধান যা উভয় সরকার নীতিগতভাবে সম্মত। তিনি আরো বলেন, শরণার্থীরা অধিক সংখ্যায় ফিরে যাবে যখন তারা উপলব্ধি করবে তাদের দেশে প্রকৃত অর্থে শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে।[২৯]

সে সময় পাকিস্তানের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, তাঁর সরকার শরণার্থীদের স্বদেশে ফিরে আসার জন্য বারবার আবেদন করেছেন, উৎসাহব্যঞ্জক পদক্ষেপ নিয়েছেন, তাদের সম্পত্তি ফিরিয়ে দেওয়ার কথা বলেছেন এবং তারা কোনো প্রতিহিংসার শিকার হবে না তারা প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। শরণার্থীদের ফিরিয়ে আসার ব্যাপারে ভারতের সহযোগিতা অপরিহার্য। তিনি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ সংকট নিরসনে "রাজনৈতিক সমঝোতা"[৩০] সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেন যে, উক্ত বছরের শেষের দিকে যা একমাত্র পাকিস্তান সরকারের দায়িত্ব তা সমাধানের পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।[৩১]

ভারতীয় প্রতিনিধির বক্তব্য ছিল পাকিস্তানের উদ্ভূত ঘটনাবলির কারণে এই মানবিক সমস্যা ভারতের কাঁধে এসে পড়েছে। পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ শরণার্থীদের আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের পক্ষে ভারত দেখাশুনা করছে, কিন্তু এই অবস্থাকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য চলতে দেওয়া যায় না। তখন পর্যন্ত রাজনৈতিক সমঝোতার ক্ষেত্রে কোনো প্রকার সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। পূর্ববঙ্গে গণতান্ত্রিকভাবে জনগণের অভিপ্রায়কে চূর্ণ করে, মৌল মানবাধিকার লঙ্ঘন করে গণহত্যা চালানো হয়েছে। ভারত মনে করে এটি ভারত পাকিস্তানের বিবাদমান বিষয় নয়, পাকিস্তানকে এ সমস্যার সমাধান করতে হবে পূর্ব পাকিস্তানে।[৩২]

১৮ই নভেম্বর জাতিসংঘের সহকারি মহাসচিবের বিবৃতি থার্ড কমিটিতে উপস্থাপন করে বলা হয়, সেখানে ৩০ লক্ষ টন খাদ্য ঘাটতি এবং প্রতি মাসে দুই লক্ষ টন খাদ্য প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে ক্ষুদ্রায়তনের খাদ্য-শস্যবাহী জাহাজ ও অন্যান্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নৌযান এনে কার্যক্রমের জন্য ভাড়া করা হয়েছে। এজন্য এক হাজার ট্রাক প্রয়োজন। সাম্প্রতিক ঘটনায় রেলওয়ে নেটওয়ার্ক ভেঙে পড়েছে। জাতিসংঘের যানবাহন স্পষ্টভাবে নির্দিষ্টকরণ এবং জাতিসংঘের নাম দৃশ্যমানভাবে লক্ষিত হয় এমনভাবে উৎকীর্ণ করতে হবে যেন মানবিক সাহায্যের ব্যাপারে এগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে তা বোধগম্য হয়। পাকিস্তান সরকার জাতিসংঘের ত্রাণ কর্মীদের পূর্ব পাকিস্তানে অবাধভাবে কাজ করার অনুমতি দিলেও নিয়ন্ত্রণহীন ঘটনাবলি যেমন, সীমান্ত এলাকায় নিরবিচ্ছিন্নভাবে সামরিক চাপ থাকায় এবং যানবাহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা ভেঙে পড়ায় তা সম্ভব হচ্ছে না। পরিস্থিতি এমন সংকটপূর্ণ অবস্থায় চলে যাচ্ছে যে ক্ষেত্রে মহাসচিবের পক্ষে দীর্ঘদিন ত্রাণ সরবরাহের বিষয়টি নিশ্চিত করে বলতে পারবেন না। নীতিগতভাবে জাতিসংঘ পূর্ব পাকিস্তানের বিরাজমান রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে না জড়িয়ে কাজ করছে কিন্তু যে পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে সেক্ষেত্রে এহেনকার্য পরিচালনা করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিতর্কের সময় সদস্যগণ বিপুল সংখ্যক শরণার্থীদের ভারতে আগমনে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। অনেক বক্তা নিরাপত্তা ও রাজনৈতিক অবস্থার ক্রমাবনতি সম্পর্কে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। অনেক প্রতিনিধি পরিস্থিতির গুরুতর অবনতি সম্পর্কে শুধু মানবিক দিকটিকে বিবেচনা না নিয়ে রাজনৈতিক বিষয়টিকে গুরুত্ব দেওয়ার জন্য সহকর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।[৩৩]

এ প্রসঙ্গে পাকিস্তানের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন, শরণার্থীদের মধ্যে অনেকেই রাজনীতি করছেন, আগ্রাসন চালাচ্ছেন যা প্রশ্রয় দেওয়া কোনোক্রমেই আশ্রয়দাতা দেশের উচিত হবে না। বরং তাদের উচিত হবে রাজনৈতিক কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। তিনি আরো বলেন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে আলাচনায় প্রস্তুত আছে এবং জাতিসংঘের শরণার্থী প্রত্যর্পণের সঙ্গে একমত আছেন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি শরণার্থীদের মানবিক ব্যবস্থাপনায় ভারতীয় কার্যক্রমের প্রশংসা করেন এবং একই সাথে পাকিস্তানের শরণার্থী প্রত্যর্পণের জন্য সীমান্তে বিশেষ ক্যাম্প খোলার জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেন। ফরাসি প্রতিনিধি মনে করেন, রাজনৈতিক সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানের মাধ্যমে জনগণের দুঃখ লাঘব সম্ভব।[৩৪]

থার্ড কমিটির ভূমিকা নিয়ে মৃদু সমলোচনা করে যুক্তরাজ্য তার মতামত ব্যক্ত করেন এভাবে যে, "এটা পরিষ্কার যে, সমস্যাটির কারণ রাজনৈতিক যা রাজনৈতিক সমাধানের ভেতর দিয়ে হবে। এটা থার্ড কমিটির কাজ নয় যে বিষয়টির সমাধান তারা দেখবে।[৩৫]

সোভিয়েত রাশিয়া উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, পাকিস্তানের কষ্টদায়ক কারণসমূহ অবশ্যই সমাধান করতে হবে যে নিপীড়নসমূহ তার স্বার্থকে ক্ষতি করেছে। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্মগত অধিকারকে অবশ্যই স্বীকৃতি দিতে হবে।[৩৬]

ভারতীয় প্রতিনিধি বলেন, মানবিক কার্যক্রম কোনোক্রমেই রাজনৈতিক সমঝোতার সম্পূরক হতে পারে না। খাদ্যঘাটতির কারণে শরণার্থীরা ভারতে আসেনি। তারা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছে রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে। ভারতের প্রতিনিধি বলেন, পাকিস্তানের যদি আঞ্চলিক অখণ্ডতা বিপর্যস্ত হয় সেটা হচ্ছে সেদেশের সরকারের কর্মকাণ্ডের ফলে।[৩৭]

চীন এই বলে অভিমত প্রকাশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানের প্রশ্নটি অভ্যন্তরীণ বিষয় যা পাকিস্তানের জনগণ সমাধান করবে। তথাকথিত শরণার্থী প্রশ্নটি এসেছে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের কারণে, পাকিস্তানের বিরুদ্ধে একটি দেশের ক্রমাগত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের ফলে। চীন একটি দেশ বলতে ভারতকে বুঝিয়েছে।

নেদারল্যাণ্ড, নিউজিল্যাণ্ড এবং সুইডেন একটি খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করে শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে সাধারণ পরিষদ যেন ভারত এবং পাকিস্তানের প্রতি আবেদন জানান। জাতিসংঘের মহাসচিব এবং হাই কমিশনার আন্তর্জাতিক সাহায্য যাতে অব্যাহত থাকে এবং ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের দুর্দশাগ্রস্ত মানুষদের জন্য ত্রাণসামগ্রী সর্বোত্তম ব্যবহৃত হয় তার জন্য তাদের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। এই খসড়া প্রস্তাবের সংশোধনী আনে নাইজেরিয়া, সৌদি আরব এবং সোমালিয়া। এসব সংশোধনের মাধ্যমে জাতিসংঘের সকল সদস্য দেশসমূহকে ত্বরিৎ এবং স্বেচ্ছায় শরণার্থীদের প্রত্যর্পণের বিষয়টিতে গুরুত্ব দেওয়ার আহ্বান জানান। সংশোধনীসহ সর্বোসম্মতিক্রমে ২২শে নভেম্বর থার্ড কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয়। ২২শে নভেম্বর থার্ড কমিটির সভার সময় ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিগণ জানান সশস্ত্র বাহিনী বিভিন্ন স্থানে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়েছে।

পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলেন, শরণার্থী সমস্যাকে ভারত রাজনৈতিক ও সামরিক হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করছে যা পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে বিপন্ন করে ফেলেছে এবং জাতিসংঘ যেন পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করতে পারে তার কারণ সৃষ্টি করছে।

ভারতের প্রতিনিধি বলেন, পাকিস্তানের সামরিক জান্তার হুমকির কারণে ভারতের জাতীয় জীবনে নিরাপত্তার সমস্যা দেখা দিয়েছে। তিনি মনে করেন, এই সমস্যার শান্তি পূর্ণ সমাধান হতে পারে যদি পাকিস্তান সামরিক নেতৃত্ব পূর্ববঙ্গের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনা করেন যার প্রথম পদক্ষেপ হবে শেখ মুজিবুর রহমানের মুক্তি।[৩৮] থার্ড কমিটি কর্তৃক ভোটাভুটি ব্যতিরেকে টু পার্ট প্রস্তাব হিসেবে গৃহীত হয়। রেজুলেশন প্রস্তাবনায় পূর্ব পাকিস্তান সংকটে মানবিক ট্রাজেডির বিষয়ে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয় এবং ভারতের উপর অত্যধিক অর্থনৈতিক ও সামাজিক চাপের উল্লেখ করা হয়। প্রস্তাবে অধিক পরিমাণে মানবিক সাহায্য প্রদান এবং শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তনের মাধ্যমে কেবল সন্তোষজনকভাবে সমস্যার সমাধান হতে পারে। অপারেটিভ অংশে ৫নং স্তবকে জাতিসংঘের মূল সনদ অনুসারে শরণার্থীরা যাতে অতিদ্রুত স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যর্পণ করতে পারে তার জন্য জোর প্রচেষ্টার আবেদন জানানো হয়।

প্রস্তাবের দ্বিতীয় পার্টে শরণার্থীরা যাতে অনুকূল পরিবেশে স্বদেশে প্রত্যর্পণ করতে পারে তার উল্লেখ করা হয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই পর্যায়ে রাজনৈতিক সমাধানের প্রশ্নটি সরাসরি শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। জেনেভায় শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান জানান, গত কয়েক সপ্তাহ নতুন সাহায্য পাচ্ছেন না, তাই ত্রাণসাহায্য সরবরাহে ছেদ পড়তে পারে। যা পরিস্থিতিকে অত্যন্ত ভয়াবহ করে তুলবে। পরে তিনি যোগ করেন যে, ত্রাণ সরবরাহ নয়, স্বেচ্ছায় স্বদেশ প্রত্যাবর্তনই একমাত্র সমাধান।[৩৯] তিনি বলেন, সাধারণ পরিষদ থেকে যুক্তিযুক্তভাবেই বলা হয়েছে শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনের কাজটি কেবলমাত্র মানবিক। কমিশনের এই মানবিক দায়িত্ব পালনে সবার শুভ ইচ্ছার সঙ্গে মর্যদাপূর্ণ। শরণার্থীরা তখনই প্রত্যাবর্তন করবে যখন তারা যথার্থভাবেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, স্বদেশে প্রকৃত শান্তি ও নিরাপত্তা বিরাজ করছে। স্থায়ী সমাধান ব্যতীত শুধু কথামালা, সহৃদয়তা কিংবা সদিচ্ছা তাদের আশার সঙ্গে কৌতুক করা হবে।

জাতিসংঘ সাধারণ পষিদের থার্ড কমিটিতে ইউ.এন.এইচ.সি.আর-এর প্রতিবেদনের ওপর ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন রাজনৈতিক সমাধানের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে পাকিস্তানে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের দাবিকে বিশ্বাসযোগ্য নয় বলে জানান।[৪০]

দু'দিনব্যাপী একত্রিশটি দেশের প্রতিনিধিদের বক্তব্যের মাধ্যমে ফুটে ওঠে যে, পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা স্মরণকালের বৃহৎত্তম মানবিক বিপর্যয়। যদিও তারা অভিমত প্রকাশ করেন স্বেচ্ছায় দেশে ফেরার মতো অবস্থা তৈরিই এ সমস্যা সমাধানের রাজনৈতিক উপায় এবং এ লক্ষ্যে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টির জন্য কাজ করার অনুরোধ জানানো হয়।[৪১]

জাতিসংঘে থার্ড কমিটির প্রস্তাব: প্রস্তাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থী সমস্যা পরিধির দিক দিয়ে ইতিহাসে বিরল। শরণার্থীদের সাহায্যে সব সরকার ও সংস্থার এগিয়ে আসা উচিত এবং এর একমাত্র সমাধান নিরাপদ প্রত্যর্পণ। যার জন্য সকলের চেষ্টা করা উচিত। জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে থার্ড কমিটি সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত প্রস্তাবের যে সুপারিশ পেশ করা হয় তার ৩নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, শরণার্থী সমস্যার প্রত্যাবর্তনের জন্য অনুকূল পরিবেশ দরকার এবং জাতিসংঘের সনদে মূলনীতি মেনে সকলের মর্যাদাপূর্ণ স্পিরিট নিয়ে কাজ করা দরকার।[৪২] থার্ড কমিটির প্রতিবেদনের ওপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত প্রস্তাবে অন্যান্য বিষয়ে আলোকপাতের পর ২২শে নভেম্বর ১৯৭১ সন-এ থার্ড কমিটিতে গৃহীত প্রস্তাবেরই পুনরাবৃত্তি করা হয়। এ দুটি প্রস্তাবই নেদারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ডের সংশোধিত খসড়া প্রস্তাবের পরিবর্তিত রূপ, যেখানে পাকিস্তান ও ভারতের প্রতি শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় নিরাপদে ঘরে ফেরার মতো পরিবেশ ও অবস্থা তৈরির লক্ষ্যে কাজ করার আহ্বান জানানো হয়।[৪৩]

জাতিসংঘ উদ্যোগ নিলেও বাংলাদেশ থেকে ভারতে অগণিত শরণার্থীদের স্বদেশে স্বেচ্ছায় ফিরে আসার প্রস্তাব বাস্তব কারণে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কর্তৃক দলখকৃত ও অবরুদ্ধ বাংলাদেশে যেক্ষেত্রে মুক্তিবাহিনীর 'সাহসী ও আশান্বিত' তৎপরতা কার্যকর হয়ে উঠেছিল সেক্ষেত্রে অত্যাচারিত, নিপীড়িত ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তাহীন শরণার্থীদের দেশে প্রত্যাবর্তনের প্রশ্নটি নিরর্থক হয়ে পড়ে। তারা স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে স্বাধীন নাগরিক হিসেবে ফিরতে আশান্বিত ছিলেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রে নয়। থার্ড কমিটির প্রস্তাবনার প্রেক্ষিতে গৃহীত উদ্যোগ ব্যর্থ হবার ফলে জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে যে, এই মানবিক সমস্যা নিরসনের মূলে রয়েছে বাংলাদেশ সমস্যার সমাধানে। তারপরও মূল সমস্যাটির সমাধান কূটনৈতিক করিডোরে ঝুলন্ত অবস্থায় থেকে যায়।

জাতিসংঘের বিভিন্ন কূটনৈতিক উদ্যোগ

জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট ২০ অক্টোবর ভারত ও পাকিস্তান সরকারের কাছে এক পত্রে ১৯শে জুলাই ১৯৭১ সালে নিরাপত্তা পরিষদের প্রধানের নিকট একটি স্মারকলিপি পেশ করার কথা উল্লেখ করে বলেন, ঐ স্মারকলিপিতে তিনি ঐ অঞ্চলের শান্তিরক্ষার আবেদন জানিয়ে ছিলেন। বর্তমান পরিস্থিতিতে তার দুশ্চিন্তা বেড়েই চলেছে এই ভেবে যে এই পরিস্থিতি যেকোনও সময় দুই দেশের মধ্যে খোলামেলা বৈরিতা ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে পারে যা বিশ্বশান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ। তার নিকট খবর রয়েছে যে, পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারত সীমান্ত এবং জম্মু কাশ্মীরের যুদ্ধবিরতি এলাকাসমূহে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি আশা করেন, যুদ্ধ এড়ানো সম্ভব হবে এবং এই দুই দেশের সরকারের সদিচ্ছার উপর তাঁর পূর্ণ আস্থা আছে। তিনি উভয় দেশের কিছু নেতার উস্কানি লক্ষ্য করেছেন। এমতবস্থায় তার বক্তব্য, "মানুষের অনুভূতি যেখানে প্রবল সেখানে সামান্য অনিচ্ছাকৃত উস্কানিই বড় সংঘর্ষ ঘটাতে পারে।" উভয় সরকারের উপর তার দৃঢ় আস্থা রয়েছে যে 'কাণ্ডজ্ঞানহীন' ও যুদ্ধের ধ্বংসযজ্ঞ এড়িয়ে যেতে তারা সক্ষম।[৪৪]

উ থান্টের পত্রের জবাবে ২২শে অক্টোবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের ২০শে অক্টোবর প্রেরিত পত্র রাষ্ট্রদূত মারফত প্রাপ্তির কথা স্বীকার করে বলেন, ভারত-পাকিস্তান সীমান্তের উত্তেজনাকর পরিস্থিতি সম্বন্ধে তাঁর দুশ্চিন্তায় তিনিও একমত। দুই দেশে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হচ্ছে তাতে কয়েক মিলিয়ন জনগণ দুর্ভোগের শিকার হতে পারে। এ বিষয় দূর করে শান্তিরক্ষায় মহাসচিবের দৃষ্টিভঙ্গিকে তিনি সমর্থন করেন।" এ কথাটিও উল্লেখ করা হয়, এটা দুঃখজনক যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব সরাসরি নাকচ করে দিয়েছেন।

পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট পাকিস্তান-ভারত আন্তর্জাতিক সীমান্ত এলাকা হতে গোলাবারুদ, সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এতেও যদি সম্মত না হয় তবে উভয় দেশের সীমান্ত এলাকা হতে নিরাপদ দূরত্বে দেশ প্রতিরক্ষায় সৈন্য সমাবেশ করার প্রস্তাব তিনি দেন। একই সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরে গোলাবর্ষণও বন্ধ করার দাবি জানান। শান্তিরক্ষায় সৈন্য প্রত্যাহার ও অন্যান্য বিষয় প্রত্যক্ষ করার জন্য জাতিসংঘের পরিদর্শক নিয়োগের ব্যাপারে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের সম্মতি রয়েছে।[৪৫] তার প্রস্তাব হলো প্রথমদিকে যেমন চলে আসছিল ঠিক সেরকম সীমান্তরক্ষী ও পুলিশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনী ঐখানে থাকবে। পাকিস্তানে জাতিসংঘের দপ্তর প্রতিষ্ঠা বিষয়কে তিনি স্বাগত জানান এবং প্রেসিডেন্ট আশা করেন সৈন্য প্রত্যাহারের উপায় বের করতে খুব শীঘ্রই ভারত ও পাকিস্তান সফর করতে পারবেন। শান্তিরক্ষায় যেকোনো পদক্ষেপে পাকিস্তান জাতিসংঘের সাথে আছে।"

জাতিসংঘ মহাসচিব ১৯শে জুলাই ভারত ও পাকিস্তান সরকার বরাবর এক পত্রে বলেন যে, ভারতে অবস্থিত শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন এমন একটি জরুরি ও উদ্‌বেগের বিষয় যা সংশ্লিষ্ট সরকারকে সম্ভাব্য সকল ধরনের সহযোগিতা জাতিসংঘ করবে। যার লক্ষ্য হবে, পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থীরা স্বদেশে ফিরে আসতে পারে। তার প্রস্তাব ছিল, সীমান্তের দুই প্রান্তে শরণার্থী প্রত্যাবর্তন তদারকির জন্য সীমিত আকারে হলেও জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা যায় কিনা এই সম্পর্কে কোনো পদ্ধতি বা ব্যবস্থা পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। এজন্য সম্ভাব্য পদ্ধতি হতে পারে প্রাথমিক পর্যায়ে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে সীমান্ত এলাকায় দু'তিনটি স্থান বেছে নেওয়া যেতে পারে। যদি এটি ফলদায়ক হয় তাহলে বৃহৎভাবে উদ্যোগ নেওয়া যেতে পারে।[৪৬]

মহাসচিবের জাতিসংঘ পর্যবেক্ষক মোতায়েনের ধারণার সঙ্গে ভারত সরকারের নীতি ও মৌলিক অবস্থানের বিরাট বৈপরীত্য লক্ষিত হয়। ২রা আগস্ট মহাসচিবের ত্রাণসংক্রান্ত এক পত্রে ভারত তাকে জানিয়ে দেয় যে, বিষয়টি যৌথভাবে রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা ও আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের প্রশ্নের সঙ্গে জড়িত। ভারত সরকার বুঝতে অক্ষম 'কতিপয় পর্যবেক্ষক' দ্বারা এ লক্ষ্য অর্জনে কী করে সম্ভব? ভারত সরকারের অভিমত হলো আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় যদি মনে করে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তন জরুরি, তাহলে সর্বাগ্রে-পূর্ববঙ্গের জনগণের আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী তাদের নিকট প্রাথমিকভাবে 'রাজনৈতিক সমাধান' গ্রহণযোগ্য হতে হবে। যেখানে পাকিস্তানের সামরিক জান্তা তাদেরকে হয়রানি ও নিশ্চিহ্ন করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত।[৪৭]

১৬ই নভেম্বর ১৯৭১ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর এক পত্রে বলেন, পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষ পূর্ববাংলার জনগণের উপরে অব্যাহতভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। যার ফলে বিশাল জনগোষ্ঠী ভারতে চলে এসেছে। এর ফলে ভারতের উপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বোঝা নেমে এসেছে। পূর্ব বাংলার জনগণের অধিকার এবং ভাগ্য শুধু সমাধান হতে পারে পশ্চিম পাকিস্তান সামরিক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে।[৪৮]

পূর্ববঙ্গের অভ্যন্তরে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি পূর্ববাংলার জনগণের সাথে কোনো সমঝোতায় না আসা, তাদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণকে প্রত্যাখ্যান করা এইসব বিষয়কে লোকচক্ষুর আড়াল করার জন্য পাকিস্তান পাক-ভারত ইস্যু সৃষ্টি করছে। এর সবচেয়ে বাস্তব প্রমাণ হচ্ছে, ভারত সীমান্ত বরাবর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সৈন্যদলের সমাবেশ ঘটানো। এইসব পর্যালোচনা করে ভারত বুঝতে পেরেছে পাকিস্তান ভারতের সাথে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বড়ো ধরনের যুদ্ধ বাধাতে চায়। কিন্তু ভারত সরকার মহাসচিবকে আশ্বাস দিচ্ছে যে, "ইচ্ছাকৃতভাবে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ বাধানোর কোনো ইচ্ছা ভারতের নেই।" ভারত যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা শুধু প্রতিরক্ষার জন্য। ভারতকে স্মরণ রাখতে হবে যে, সীমান্ত হতে পাকিস্তানের সেনা ক্যাম্প কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে অবস্থিত হলেও তারা প্রচুর সৈন্যের সমাবেশ ঘটিয়েছে। যেখানে সীমান্ত হতে ভারতের সেনাক্যাম্প কয়েক দিনের দুরত্বে অবস্থিত, ভারত তার সীমান্ত এলাকায় সৈন্য পাঠানোর পূর্বে অনেকদিন অপেক্ষা করেছে।

ভারত সরকার মহাসচিবকে জানিয়ে দেয় যে, "এই সমস্যার মূলে রয়েছে পূর্ব পাকিস্তানের ৭৫ মিলিয়ন জনগণের ভাগ্য এবং অবিচ্ছেদ্য অধিকার। এইসব বিষয় দূরে ঠেলে রাখার লক্ষ্যে পাক ভারত ইস্যু সৃষ্টি করে শুধু উত্তেজনাই বৃদ্ধি করবে।[৪৯] কেবল এভাবেই শরণার্থী আসা বন্ধ হতে পারে এবং ভারতের নিরাপত্তার চাপ লাঘব হতে পারে। প্রধানমন্ত্রী বক্তব্যে এ কথাও প্রকাশিত হয়ে পড়ে যে, পাকিস্তান শুধু পূর্ব বাংলার সমস্যা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য ভারত-পাকিস্তানের বিরোধের কথা সামনে এনেছে। এ সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক সমাধানে সেদেশের জনগণের দ্ব্যর্থহীন অভিপ্রায়কে যদি সক্রিয় উদ্যোগের মাধ্যমে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে জাতিসংঘের মহাসচিব শুভ উদ্যোগ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন সে প্রচেষ্টা হবে অভিনন্দিত। সমস্যা সমাধানের এ ধারণাকে যদি মেনে নেওয়া হয় তাহলে তার উদ্যোগকে ভারত সরকার সমর্থন করবে।

২২শে নভেম্বর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিব বলেন, তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা যেমনটি এখন উপমহাদেশে বিদ্যমান সে অবস্থায় জাতিসংঘের সনদ উপেক্ষা করতে পারেন না। জাতিসংঘের মহাসচিব এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, উভয় পক্ষের সম্মতি সহযোগিতা ব্যতিত তিনি তার 'আন্তরিক উদ্যোগ' গ্রহণ করতে পারেন না।[৫০]

২৩শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘের মহাসচিবকে অবহিত করেন যে, ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী পাকিস্তান সীমান্তে চাপ সৃষ্টি করছে। পাকিস্তান বাহিনীকে তিনি কঠোরভাবে সংযত থাকতে বলেছেন। কিন্তু ভারতীয় সামরিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীর কমান্ডরগণ মোকাবেলা করতে যাচ্ছে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বলেন, পরিস্থিতি দ্রুততার সঙ্গে এমনদিকে যাচ্ছে যেখান থেকে ফেরার কোনো পথ নেই। কেবল মহাসচিবের ব্যক্তিগত আন্তরিক উদ্যোগে এই বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে পারে।

২৬শে নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিব এই ইঙ্গিত দেন যে, জাতিসংঘের সনদ তাকে যতটুকু অনুমতি ও কর্তৃত্ব দেয় সেই পর্যন্ত যাবেন, কিন্তু তিনি একই সাথে বলেন যে, উভয় দেশের স্থায়ী প্রতিনিধিদের সঙ্গে শান্তি রক্ষার জন্য যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন।

২৯শে নভেম্বর জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি মহাসচিবকে জানান পাকিস্তান

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট এক বার্তায় বলেছেন, ভারতের সশস্ত্র বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে ব্যাপকভাবে আক্রমণ চালিয়েছে। তিনি পাকিস্তান সীমান্তে অবিলম্বে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী বাহিনীকে অবস্থান নেওয়ার অনুরোধ জানান।[৫১] ঐ একই দিনে তিনি ২৯শে নভেম্বরে পাঠানো পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের বার্তাটি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে জানান এবং প্রতিনিয়ত তার উদ্যোগের কথা অবহিত করেন। মহাসচিব উল্লেখ করেন যে, পর্যবেক্ষক নিয়োগ করতে নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হতে হবে। বর্তমান উপমহাদেশে যে অবস্থা বিরাজ করছে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার স্বার্থে নিরাপত্তা পরিষদকে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা দরকার।

৩রা ডিসেম্বর উপমহাদেশের বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে পরিস্থিতি দ্রুত অবনতির দিকে চলে যায়। মহাসচিব এ সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদকে তার ভূমিকা সম্পর্কে অবগত করেন। তিনি আন্তর্জাতিক শান্তি এবং নিরাপত্তার স্বার্থে জাতিসংঘ সনদের ৯৯ অনুচ্ছেদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।[৫২] জাতিসংঘের মহাসচিব উপলব্ধি করেন যে, এ ধরনের ঘটনা জাতিসংঘে উপস্থাপন হতে পারে শুধু উভয়পক্ষের দ্বারা অথবা নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যদের দ্বারা।

উপমহাদেশে ভূমিকা পালনের জন্যে জাতিসংঘের আরেকটি উদ্যোগের এভাবেই সমাপ্তি ঘটে। এই প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে ছিল জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক মোতায়েনের প্রস্তাব, যেমন–জাতিসংঘের মহাসচিব জুলাই মাসের ১৯ তারিখ প্রথম প্রস্তাব করেন যে, শরণার্থী সমস্যা সমাধানে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্তে 'জাতিসংঘ শান্তিবাহিনী' বা পর্যবেক্ষক মোতায়েন করা।

জাতিসংঘের এই প্রস্তাব বিভিন্ন মহলে সন্দেহের উদ্রেক করে। কারণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন যে, ভারত সরকার যখন ধ্বংসযজ্ঞ এবং হত্যাযজ্ঞের পরিপ্রেক্ষিতে জাতিসংঘের কাছে ও বৃহৎ রাষ্ট্রের কাছে মানবতা ও বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য সহায়তার আবেদন জানিয়েছিলেন তখন এই সহায়তার আবেদনে তারা সাড়া দেয়নি কিন্তু যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে এসে তাদের পর্যবেক্ষক মোতায়েন প্রস্তাবকে মুজিবনগর সরকারসহ বাংলাদেশের সপক্ষের অন্যান্য শক্তিসমূহ এটাকে পাকিস্তান ও তার মিত্রদের প্রভাবিত প্রস্তাব বলে মনে করেন। জাতিসংঘের এই প্রস্তাবের বিশ্লেষণে একথাটিও বেরিয়ে আসে যে, মুক্তিযোদ্ধাদের বাংলাদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশের পথে বাধা সৃষ্টি ও ভারতীয় বাহিনীর সহায়তার প্রতি নজরদারি করা এবং তা বন্ধ করা। মুজিবনগর সরকার সরাসরি এই প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করেন।

অক্টোবরের ৩য় সপ্তাহের মধ্যেই এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন এবং পাকিস্তান হতে বাংলাদেশ স্বাধীন হোক এটা অধিকাংশ দেশের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়। ভারত এটা অনুধাবন করতে সক্ষম হয় যে, আন্তর্জাতিক মৌলিক আইন অনুযায়ী বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম ও পাকিস্তান হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়াকে বিভিন্ন রাষ্ট্র তাদের অভ্যন্তরীণ বিচ্ছিন্নতাবাদ বা জটিলতার কারণে সমর্থন দিতে পারছে না। এমতাবস্থায় ভারত সরকার বিশেষত ভারতের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে মূলত অগ্রবর্তী কার্যক্রম বিষয়ে দৃঢ়তার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। এই সিদ্ধান্তের মর্মে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার। কারণ 'অনির্দিষ্টকাল ভারত শরণার্থীদের ভার টানতে পারে না।' এ কথা বলার মধ্য দিয়ে প্রধানমন্ত্রী কূটনৈতিক যুদ্ধ অতিক্রম করে যুদ্ধের কূটনৈতিক পদক্ষেপের উপর জোর দেন। এজন্য বিশ্ব জনমত গঠনের পাশাপাশি সামরিক যুদ্ধের প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করা হয়।[৫৩] ভারতের প্রধানমন্ত্রীর কাছে কূটনৈতিক তৎপরতায় এটাও পরিষ্কার হয়ে এসেছিল যে, বিশ্বের বহু সরকার প্রকাশ্যে বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘ বা জাতিসংঘের বাইরে সমর্থন দিতে না পারলেও বিশাল জনগোষ্ঠী নীতিগতভাবে বাংলাদেশের জনগণের মুক্তিসংগ্রামে সোচ্চার। সেই সঙ্গে তিনি, তার সরকার ও সুশীলসমাজ বিশ্ব পরিসরে ও জাতিসংঘ বিতর্ক অনুষ্ঠানে বাংলাদেশের জনগণের মানবিক বিপর্যয় ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষার বিষয়টি যথার্থভাবেই তুলে ধরতে সক্ষম হন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী লক্ষ্যাভিসারী সিদ্ধান্ত গ্রহণের পূর্বেই দুর্গাপ্রসাদ ধর যিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রীর নীতি-নির্ধারকদের অন্যতম তিনি ভারতের বিশেষজ্ঞদের নিকট একটি পজিশন পেপার তৈরি করার ব্যবস্থা করেন। পজিশন পেপার বিশ্লেষণে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা সম্পর্কে আস্থাশীল নয়। পাকিস্তানের সামরিক জান্তা পূর্ব পাকিস্তানে স্থিতিশীলতা স্থাপন করতে সক্ষম হলে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পাকিস্তানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করবে।

ভারত সরাসরি পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র, পুঁজিবাদী দেশসমূহ এবং চীন ভারতকে বাধা দেবে না কিন্তু রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে পাকিস্তানকে তারা সমর্থন যোগাবে। যুদ্ধ বেঁধে গেলে পাকিস্তান সামরিক জান্তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও বস্তুগত সাহায্য প্রদান করবে। এমনকি জোটনিরপেক্ষ দেশগুলোর অনেকেই পাকিস্তানের পক্ষে অবস্থান নেবে। শুধু সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং তার মিত্র শক্তিসমূহ ভারতের পক্ষে থাকবে। এ সমস্ত বিষয় মাথায় রেখেই ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বব্যাপী ঝাটিকা সফরে বের হন। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর ভূমিকা কী হবে তা অজানা ছিল না। ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্র সফর থেকে এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করেছিলেন যে, আলোচনার মাধ্যমে সকল সমঝোতার পথ রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। তাঁকে 'যুদ্ধ-কূটনীতির' কঠিন পথে অগ্রসর হতে হবে। বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম.এ.জি. ওসমানী ভারতের সামরিক কর্মকর্তাদের এই ধারণা দিয়েছিলেন যে, শক্তিশালী পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সঙ্গে যে সকল গেরিলা কাজ করছে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ ব্যতীত তাদের আশা দিন দিন ঝুলে যাচ্ছে। সেজন্য তিনি যথাসীঘ্র সম্ভব ভারতীয় সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করেন।[৫৪]

২৭শে নভেম্বর[৫৫] বাংলাদেশে রাজনৈতিক সমাধান এবং অবিলম্বে শেখ মুজিবকে মুক্তি দেওয়ার জন্য পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী। তিনি আরো বলেন, "বাংলাদেশের জনসাধারণকে তিনি কোনো সমাধানে রাজি হয়ে যেতে বলতে পারেন না। কারণ এ ব্যাপারে তার কোনো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধিকার নেই।" এটা ছিল নিক্সন প্রশাসনের প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী পরোক্ষ স্পষ্ট জবাব।

ইন্দিরা গান্ধী নভেম্বর মাসে ওয়াশিংটন গমন করেন। বলাবাহুল্য, নিক্সন ও কিসিঞ্জারের সঙ্গে তার আলোচনা ব্যর্থ হয়। ওয়াশিংটন থেকে বিদায়ের প্রাক্কালে তিনি বলেন, "যখন জনগণকে ধ্বংস করা হচ্ছে তখন শান্তির উদ্যোগ কোথায় ছিল? জনগণের বিরুদ্ধে যখন আক্রমণ করা হলো, গণহত্যা চলছিলো, লক্ষ লক্ষ জনগণ অভুক্ত অনাহারে মারা গেছে, তখন বিশ্ব সম্প্রদায় কোথায় ছিল?" তিনি কূটনৈতিক পরিভাষায় বিশ্বকে জানিয়ে ছিলেন, মানবিক ট্রাজেডি দীর্ঘদিন ভারত সহ্য করবে না। যে কথাটি জাতিসংঘে ভারতীয় স্থায়ী প্রতিনিধি দৃঢ়তার সঙ্গে উল্লেখ করেন।

অন্যদিকে, জুলফিকার আলী ভুট্টো জরুরিভাবে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের বিশেষ দূত হিসেবে পিকিং রওনা দেন এবং চেয়ারম্যান মাও সেতুং ও প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই'র সঙ্গে দেখা করে ভারত আক্রমণ করলে সর্বপ্রকার সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি আদায়ে সচেষ্ট হন এবং জাতিসংঘ চীনের কূটনৈতিক তৎপরতায় আশ্বস্ত হন।

৩রা ডিসেম্বর জাতিসংঘ নথি হতে দেখা যাচ্ছে পাকিস্তান প্রতিনিধি অভিযোগ উত্থাপন করে যে, ভারতীয় বাহিনী এবং গেরিলাযোদ্ধারা একত্রে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণ করেছে। সৈন্যবল এবং সরবরাহের অপ্রতুলতায় পাকিস্তান সেনাবাহিনী ইতোমধ্যেই বিভিন্ন অবস্থান থেকে সরে গেছে। আরো লক্ষণীয় ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, দেশের অভ্যন্তরে গেরিলা যোদ্ধারা চলে এসেছে এবং বহু জায়গায় বাংলাদেশের পর্তাকা উত্তোলন করেছে। ভারত তার বাহিনীর সঙ্গে মুক্তিবাহিনীর নাবিকদের যুক্ত করে পাকিস্তানি নৌ-পথকে ব্লক করে দিয়েছে।

৩রা ডিসেম্বর ইন্দিরা গান্ধী যখন কলকতায় বিশাল জনসভায় বক্তৃতা করছিলেন তখনই চিরকুট পেলেন ইয়াহিয়া খান ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে এবং ভারতের বিমানঘাঁটি অমৃতসর, পাঠানকোট, শ্রীনগর, অবন্তীপুর, সোধপুর, আমবালা, আগ্রা, জম্মু, পাঞ্জাব ও রাজস্থানে বিমান হামলা চালিয়েছে। একই সাথে পাকিস্তান সেনাবাহিনী সোলায়মানকি, খেমকারান, পুঞ্চ এবং অন্যান্য সেক্টরে আক্রমণ চালায়। এ সম্পর্কে ইন্দিরা গান্ধীর মন্তব্য ছিল– "The fool has done exactly what one had expected".[৫৬] এর পূর্বে ২৫শে নভেম্বর পাকিস্তানের সামরিক প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খান বলেছিলেন, "In ten days, I might not be here in Rawalpindi. I will be fighting a war."[৫৭] উক্ত পত্রের জবাবে জাতিসংঘের মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি বরাবর একটি পত্র লেখেন। পত্রে বলা হয়, বর্তমান সামরিক সংঘর্ষকালে একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ, যদি একটি দেশ অনুরোধ করে থাকে তবুও নিরাপত্তা পরিষদের ক্ষমতায়ন ব্যতীত তা সম্ভব নয়। এরপর ঐ দিনই জাতিসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধির মাধ্যমে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট একটি বার্তা প্রেরণ করেন।[৫৮]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩রা ডিসেম্বর থেকেই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জাতিসংঘের পরিস্থিতি এই মুহূর্তে স্থবির হয়ে যায়। জাপান এবং বেলজিয়াম স্থায়ী প্রতিনিধির নিকট থেকে কোনো উৎসাহ না পেয়ে থমকে যায়। সোভিয়েত এবং ভারত চুপ করে ঘটনা পর্যবেক্ষণ করেন। কিন্তু পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত মনে করে অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদ বৈঠক হওয়া উচিত। তখন পরিস্থিতি এমন হয় যে, পাকিস্তান যদি প্রত্যাশা করে তাহলে চীন তাদের পক্ষে ভেটো প্রয়োগ করবে। অন্যদিকে, এটাও প্রতীয়মান হয়েছে ভারত চাইলে সোভিয়েত তাদের পক্ষে ভেটো দেবে। মার্কিন সিক্রেট ডকুমেন্ট থেকে জানা যায়, ৩রা ডিসেম্বর হংকংকের চায়না ওয়াচার এই মর্মে রিপোর্ট দিয়েছে যে, চীনের মিডিয়াগুলো ১০ দিন ব্যাপকভাবে ভারতবিরোধী প্রচার চালিয়েছে। তারা বিভিন্ন প্রতিবেদন, বর্ণনা এবং সংবাদপত্রের মাধ্যমে ভারতকে 'সশস্ত্র আক্রমণকারী' ও উস্কানিদাতা হিসেবে দোষারোপ করেছে। হঠাৎ করেই সোভিয়েত রাশিয়ার ভারত সংশ্লেষকে সামনে রেখে (ভারত-সোভিয়েত চুক্তি) তারা সরাসরি আক্রমণ করে। একই সঙ্গে চীন তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোনো ঝুঁকি না নেওয়ার চিন্তা করে।

নিক্সন প্রেসিডেন্টসিয়াল ম্যাটেরিয়ালস্, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত ফাইল থেকে আরো জানা যায়, ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, পাকিস্তান সর্বাত্মকভাবে ভারতকে আক্রমণ করেছে। জাতিসংঘে ভারতীয় প্রতিনিধি তুলে ধরেন ৫:৩০ মিনিটে পাকিস্তানি এয়ারফোর্স ভারতের ৬টি বিমান ঘাঁটিতে আক্রমণ করেছে এবং পাকিস্তানের আর্টিলারি বাহিনী সীমান্তে ভারতীয় বাহিনীর উপরে কামান দাগছে। ইন্দিরা গান্ধী বলেন, রাজনৈতিক কূটনৈতিক সমাধান ব্যর্থ হওয়ায় যুদ্ধ যাওয়া ব্যতীত অন্য কোনো বিকল্প ছিল না। ঐ রিপোর্টে আরো উল্লেখ করা হয় যে, পাকিস্তান স্থায়ী প্রতিনিধি জাতিসংঘে অভিযোগ করেছে ভারতের যুদ্ধবিমান তিন-চারদিন হলো পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন জায়গায় আক্রমণাত্মক হানা দিচ্ছে এবং ভারতীয় সেনাবাহিনী ৩:৩০মিনিট এবং ৪টায় রহিম ইয়ার খান এর দক্ষিণে কাশ্মীর এলাকায় আক্রমণ করেছে। পাকিস্তান বিমান বাহিনী তার পাল্টা জবাব দিয়েছে। সিআই-এ রিপোর্টে বলা হয়েছে, কোনো পক্ষ আগে আক্রমণের সূচনা করেছে তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়।[৫৯]

১৯৭১ সালের ৩রা ডিসেম্বর ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে সর্বাত্মক যুদ্ধ শুরু হয়। এ সময় জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের ক্রমাগত বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়, উত্থাপিত হয় বিভিন্ন প্রস্তাব ও পাল্টা প্রস্তাব। নিরাপত্তা পরিষদে ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্তগ্রহণ সম্ভব হয়নি। ৩ দিনে ২০ ঘণ্টা আলোচনা, বিতর্ক ও ভোটগ্রহণের পর নিরাপত্তা পরিষদ থেকে এজেন্ডাটি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরিত হয়।

সাধারণ পরিষদে কূটনৈতিক তৎপরতা

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের অধিবেশনে ১১৭টি দেশ অংশগ্রহণ করে যার মধ্যে ভারত ও পাকিস্তানসহ ৫৫টি দেশ বাংলাদেশ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কে অংশ নেয়। নিচে ৬টি ভাগে এই বির্তক উল্লেখ করা যায় :

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১. ২৪টি দেশ এই অভিমত প্রকাশ করে যে, মানবিক সমস্যার বিষয়টি জাতিসংঘ গ্রহণ করেছে। তারা রাজনৈতিক বিষয়টির রেফারেন্স এড়িয়ে যায়। দেশগুলোর মধ্যে ছিল : আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, তাইওয়ান, মিশর, ঘানা, জ্যামাইকা, জাপান, লাওস, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মেক্সিকো, মাদাগাস্কার, নেদারল্যান্ড, নিকারাগুয়া, সিরিয়া, তানজোনিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উগান্ডা, উরুগুয়ে, ইয়েমেন এবং জাম্বিয়া।

২. প্রাথমিকভাবে মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার জন্য এবং শরণার্থীদের ফিরিয়ে নেওয়ার পূর্বশর্তরূপে পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক অবস্থা তৈরি করার উপর গুরুত্বারোপ করে আটটি দেশ। দেশগুলো হলো : আফগানিস্তান, শ্রীলংকা, ইকোএডর, গ্রিনল্যান্ড, ইটালি, নেপাল, যুক্তরাজ্য এবং যুগোশ্লাভিয়া।

৩. ১৪টি দেশ, আংশিকভাবে ১৫টি দেশ মানবিক বিপর্যয়ে উদ্যোগ প্রকাশ করার পাশাপাশি রাজনৈতিক সমাধানের কথা উল্লেখ করেন। দেশগুলো হলো : অস্ট্রেলিয়া, বেলজিয়াম, সাইপ্রাস, ফ্রান্স, গায়না, আয়ারল্যান্ড, মালটা, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, নরওয়ে, পোল্যান্ড, সুইডেন, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন।

৪. ৫টি দেশ মানবিক বিপর্যয়ের বিষয়টি ভারত ও পাকিস্তান আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করুক তাই চায়। দেশগুলো হলো : আলজেরিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, লেবানন, সিয়েরালিয়ন এবং বেলজিয়াম।

৫. সৌদি আরব পাকিস্তানকে সমর্থন করে।

৬. তিনটি দেশ ভাসাভাসা বক্তব্য পেশ করে : ইথিওপিয়া, আইসল্যান্ড ও ইসরাইল।

মানবিকাধিকারসহ বিভিন্ন বিষয়ে ৮টি দেশ বিস্তারিতভাবে আলোচনা করে : বেলজিয়াম, ইকুয়েডর (পূর্ব পাকিস্তানে গণহত্যার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়), আয়ারল্যান্ড, মাল্টা (শরণার্থীরা ত্রাণশিবিরে থাকার অর্থই হলো তাদের উপর রাজনৈতিক ও সামরিক নিপীড়ন চালানো হয়েছে) মাদাগাস্কার, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন ও উরুগুয়ে।

৪টি দেশ বিস্তারিতভাবে এই বিষয়ে আলোচনা করেছে যে, জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমেই রাজনৈতিক সমাধান সম্ভব ফ্রান্স, মঙ্গোলিয়া, নিউজিল্যান্ড, সুইডেন।[৬০]

এ অধিবেশনে সভাপতি নির্বাচিত হন ইন্দোনেশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী আদম মালিক। তিনি সমস্যাটিকে মূলত ভারত-পাকিস্তানের মধ্যকার দ্বিপাক্ষিক সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিক সমঝোতার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় দেশের উপর প্রভাব বিস্তারের কথা বলেন। তিনি বাংলাদেশের প্রশ্নে সাধারণ পরিষদের বিতর্কের পক্ষে ছিলেন না। কারণ তাঁর ভাষ্যমতে জাতিসংঘের জরুরি কর্তব্য হলো পাক-ভারত সমস্যার সমাধান, সাড়ে সাত কোটি বাঙালির ভাগ্য বা তাদের আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটি এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ নয়।[৬১]

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে উপমহাদেশের বাস্তব অবস্থাকে উপেক্ষা করে এবং মুখ্য সংকটকে পাশ কাটিয়ে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রত্যাহারের উপর একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। উক্ত বিতর্কে ভারত-পাকিস্তান ছাড়াও ৫৮টি দেশ বিতর্কে অংশগ্রহণ করেন।

১. যেসব দেশ পূর্ব পাকিস্তানকে দমিয়ে রাখা এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য পাকিস্তানকে দায়ী করে।	দেশসমূহের নাম: বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, চেকোস্লোভাকিয়া, গ্রিস, হাঙ্গেরি, মঙ্গোলিয়া, সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া।
২. যেসব দেশ পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান ব্যতীত সংকটের মূল সমস্যা নিরসন হবে না বলে অভিমত প্রকাশ করে।	দেশসমূহের নাম: আর্জেনটিনা, ভুটান, বুলগেরিয়া, কানাডা, সিংহল, সাইপ্রাস, চেকোস্লোভাকিয়া, ফ্রান্স, গ্যাবোন, ঘানা, গ্রিস, হাঙ্গেরি, ইরান, ইতালি, লেবানন, মেক্সিকো, মঙ্গোলীয়া, নেদারল্যাণ্ড, পেরু, সুইডেন, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোস্লাভাকিয়া।
৩. যেসব দেশ রাজনৈতিক সমাধানের সঙ্গে বৈরিতা পরিহার ও সেনা প্রত্যাহারে মতামত পেশ করে।	দেশসমূহের নাম: ভুটান, বুলগেরিয়া, সাইপ্রাস, চেকোস্লোভাকিয়া, ডেনমার্ক, গ্যাবোন, হাঙ্গেরি, মাদাগাস্কার, নেপাল, নিউজিল্যাণ্ড, পেরু, পোল্যান্ড, ব্রিটেন, সোভিয়েত রাশিয়া, যুগোস্লাভিয়া।
৪. যেসব দেশ বর্তমান মুহূর্তে মূল সমস্যা সামনে নিয়ে আসার ব্যাপারে বর্তমান সময়কে যথার্থ মনে করেনি।	দেশসমূহের নাম: আলজেরিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, শ্রীলংকা, ইকোয়েডর, ফিজি, ইতালি, জাপান, জর্ডান, মালয়েশিয়া, নেদারল্যান্ড, হাঙ্গেরি।
৫. পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতা রক্ষার পক্ষে যেসব দেশ জোরালো মত প্রকাশ করে।	দেশসমূহের নাম: আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, চিলি, লেবানন, নেপাল, তানজেনিয়া, যুগোস্লাভিয়া।
৬. যেসব দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও অখণ্ডতা রক্ষায় সুনির্দিষ্টভাবে মত প্রকাশ করে।	দেশসমূহের নাম: আলবেনিয়া, সিংহল, চাঁদ, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জর্ডান, কুয়েত, মৌরিতানিয়া, সুদান, টগো, তাকি।
৭. যেসব দেশ অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের নীতির প্রতি সমর্থন দেয়।	দেশসমূহের নাম: আলবেনিয়া, আলজেরিয়া, আর্জেন্টিনা, বুরুণ্ডি, চাঁদ, চিলি, চায়না, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, কুয়েত, লেবানন, মৌরিতানিয়া, নেপাল, সুদান, টগো, তুরস্ক, যুগোস্লাভিয়া।
৮. যেসব দেশ ভারত-পাকিস্তানের সংকট মোকাবেলায় জাতিসংঘ বা তৃতীয় পক্ষকে ভূমিকা নেওয়ার উপর জোর দেন।	দেশসমূহের নাম: আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, কানাডা, শ্রীলংকা, চিলি, নেকারাগুয়া, ইরান, যুক্তরাষ্ট্র।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ববঙ্গের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে রাজনৈতিক সমাধান অবহেলা করার কারণে ভারত প্রস্তাবটি বিরোধীতা করে। প্রস্তাবটির প্রকৃত ছিল সুপারিশমূলক। রাজনৈতিক বাস্তবতা বিবর্জিত কারণে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি। যদিও ১০৪টি দেশ প্রস্তাবের পক্ষে, ১১টি বিপক্ষে এবং ১০ দেশ ভোটদানে বিরত থাকে।

নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি সদস্যের পরস্পরবিরোধী বক্তব্য এবং বিপরীতধর্মী অবস্থান নিরাপত্তা পরিষদে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল এসব বিতর্কে তা প্রতিফলিত হয়। এখানে দেখা যাচ্ছে যে, মার্কিন প্রতিনিধি ভারত কর্তৃক কিছু প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের উল্লেখ করে ভারতকে এককভাবে দায়ী করেছেন। চীনা প্রতিনিধিও ভারতকে 'নগ্ন আগ্রাসী' হিসেবে অভিহিত করে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা এবং নিজ নিজ দেশের সীমান্তে দু'দেশের সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানায়।

অন্যদিকে, সোভিয়েত প্রতিনিধি প্রস্তাবিত উদ্যোগের সমালোচনা করেন। তিনি এ উদ্যোগকে চীন-মার্কিন আতাঁত বলেও অভিহিত করেন।

সাধারণ পরিষদের খসড়া প্রস্তাবসমূহের উপর আলোচনাকালে দুটো বৃহৎ শক্তি ব্রিটেন ও ফ্রান্স গোটা পরিস্থিতির উপর একটা নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করে। ফরাসি প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত দুটো খসড়া প্রস্তাবের উল্লেখ করে মন্তব্য করেন যে, "পরিষদের বিতর্ক থেকে কোনো সমধান বেরিয়ে আসবে না।"

নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হওয়ার পর মাত্র কয়েকদিনে সেখানে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়। প্রথমত, ভারতীয় ও বাংলাদেশিয় যৌথবাহিনী পাকিস্তানি সৈন্যদের হাত থেকে বাংলাদেশের অধিকাংশ এলাকা মুক্ত করায় স্বাধীনতা আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়।

দ্বিতীয়ত, ভারত বাংলাদেশকে এ সময় স্বীকৃতি দেওয়ায় উপমহাদেশের রাজনৈতিক দৃশ্যপটে পরিবর্তনের ছোঁয়া লাগে। আর এ বিষয়টি ফরাসি প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্যদের অবহিত করেন। দেখা যাচ্ছে যে, ফরাসি প্রতিনিধি সাধারণ পরিষদের সদস্যদের অবহিত করেন প্রজ্ঞার সাথে।

ব্রিটেনের প্রতিনিধি অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের প্রতি আস্থা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, "নিরাপত্তা পরিষদই হচ্ছে প্রধান ফোরাম এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ শুধু নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমেই নেওয়া যায়।"

সাধারণ পরিষদে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্যদের নিকট থেকে নতুনভাবে কূটনৈতিক সমাধানের কোনো সূত্র বের হয়ে আসেনি। মূলত বিশ্ব পরিসরে দু'পরাশক্তির কৌশলগত কূটনীতিক নীতিমালাই জাতিসংঘে বারবার প্রতিফলিত হয়েছে।

সাধারণ পরিষদের বিতর্কে উপমহাদেশের প্রতিবেশী দেশসমূহের মধ্যে আফগানিস্তান ও বার্মা বিতর্কে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। শ্রীলংকার প্রতিনিধি তাঁর দীর্ঘ বক্তব্যের প্রথমেই 'কঠোরভাবে নিরপেক্ষ' থাকার কথা উল্লেখ করেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে, জাতিসংঘের বাইরেও শ্রীলংকা, পাকিস্তানের প্রতি সহানুভূতি দেখিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের উপর দিয়ে পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ হয়ে যাবার পর ১৯৭১ সালের সংকটময় দিনগুলোতে শ্রীলংকা পাকিস্তানকে ট্রানজিট সহায়তা প্রদানে এগিয়ে এসেছিল। অন্যদিকে, নেপালের প্রতিনিধি পাকিস্তানের সম্ভাব্য বিভক্তিতে শ্রীলংকার মতো এতোটা উদ্‌বিগ্ন ছিলেন না। তিনি যুদ্ধবিরতি ঘোষণা ও সৈন্য প্রত্যাহার-বিষয়ক প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। দক্ষিণ এশিয়ার অপর দেশ ভুটান ভারতের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমর্থন করে।

ক. সাধারণ পরিষদের বিতর্কে আরব বিশ্বের জর্ডান ও লেবানন মাত্র দু'টি দেশ অংশ নিয়েছিল। তারা ১৩টি দেশের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবটির প্রতি সমর্থন জানায়। জোটনিরপেক্ষ আন্দোলনের অন্যতম প্রবক্তা রাষ্ট্র মিশর ভারতের সাথে দীর্ঘদিনের সুসম্পর্কের কারণে আবার অন্যদিকে মুসলিম দেশ হিসেবে পাকিস্তানের সাথে সমকালীন প্রেক্ষাপটে দায়বদ্ধতার কারণে বাংলাদেশ প্রশ্নে অংশগ্রহণ করেনি।

খ. পূর্ব ইউরোপের সোভিয়েত বলয়ের দেশ যেমন, বুলগেরিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড এবং এশিয়ার মঙ্গোলিয়া তাদের বিবৃতির দুটো বিষয়ের উপর জোর দেয় : ১. সামরিক দিক থেকে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা। ২. রাজনৈতিক দিক থেকে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান। জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন অর্থাৎ বাংলাদেশের স্বাধীনতা।

গ. আর্জেন্টিনা, ব্রাজিল, ইকুয়েডর, মেক্সিকো, নিকারাগুয়া, উরুগুয়ে ভারতীয় উপমহাদেশের সংঘাত প্রশ্নে অনেকটা একই রকম দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে। তারা মোটামুটি সবাই ১৩টি দেশের খসড়া প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং তারা সবাই মনে করে যে, জাতিসংঘের উচিত প্রথমেই উপমহাদেশে সৃষ্ট সংঘাত বন্ধ করা। অন্যদিকে, চিলির প্রতিনিধি তাঁর বক্তব্যে সমস্যা সমাধানের একটি চমৎকার সুপারিশ করেন। তিনি ১৩টি দেশের উত্থাপিত প্রস্তাব (অখ/৬৪৭) এবং সোভিয়েত প্রস্তাব (অখ/৬৪৮)-এর মধ্যে 'সমঝোতার মাধ্যমে' একটি সমন্বয় সাধনের প্রস্তাব করেন। তদুপরি, পেরুর প্রতিনিধি মন্তব্য করেছিলেন যে, সাধারণ পরিষদে উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাব (অখ/৬৪৭) একটি অসম্পূর্ণ প্রস্তাব। কারণ তাঁর মতে, কেবল যুদ্ধবিরতি এ সমস্যার সমাধান করতে পারে না। বিশেষকরে যে প্রশ্নটি উপমহাদেশের বৈরিতার সূচনা করেছে তা অবহেলা করা যৌক্তিক হবে না।[৬২]

ভারত ও পাকিস্তানের মতামত: ভারত ও পাকিস্তান নিরাপত্তা পরিষদে যে বক্তব্য দিয়েছিল, সাধারণ পরিষদে তারই প্রতিধ্বনি করে। পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূত আগাশাহী 'তথাকথিত বাংলাদেশ' সৃষ্টির জন্য ভারতকে দোষারোপ করেন। তিনি বলেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর দখলদারিত্বের মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপর 'বাংলাদেশ' চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ক্ষুব্ধ ও হতাশ হয়ে আগাশাহী ৩৪টি দেশের সংশোধিত প্রস্তাবকে সমালোচনা করেন।

ভারতের প্রতিনিধি সমর সেন বলেন যে, "অখণ্ড পাকিস্তানের ধারনায় প্রভাবিত হয়ে সাধারণ পরিষদের অধিকাংশ দেশ উপমহাদেশের বাস্তবতা সম্পর্কে চোখ বন্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করে রেখেছে।" তিনি বলেন যে, সেই পাকিস্তান এখন অতীতের বিষয় এবং নতুন বাস্তবতা হলো বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। তিনি ১৩টি দেশের খসড়া প্রস্তাবের সাধু উদ্দেশ্যের প্রশংসা করেন এবং বলেন যে, এর মাধ্যমে বিশ্ব সংস্থাটির সংবেদনশীল মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। তবে প্রস্তাবটি অবাস্তব, অপ্রাসঙ্গিক, এমনকি বিপজ্জনক।[৬৩]

ভোটগ্রহণ: সাধারণ পরিষদে 'শান্তির জন্য ঐক্য ফর্মুলা' অনুসারে মোট ৩টি প্রস্তাব- ১৩টি দেশের প্রস্তাব, ৩৪টি দেশের প্রস্তাব এবং সোভিয়েত প্রস্তাব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পর সাধারণ পরিষদের সভাপতি কার্যপ্রণালীর ৯৩ ধারা অনুযায়ী ভোটগ্রহণের উদ্যোগ নেন। ৩টি প্রস্তাবের মধ্যে ৩৪টি দেশের সংশোধিত প্রস্তাব সম্পর্কে ভোটগ্রহণ করা হয়।

ভোটের ফলাফল পক্ষে : ১০৪টি দেশ; বিপক্ষে : ১১টি দেশ এবং বিরত : ১৬টি দেশ।

প্রস্তাবটি বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাস হয়। এখানে বাঙালিদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দাবিকে কার্যত অস্বীকার করা হয় এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতির সাথে সহানুভূতি প্রদর্শন করা হয়।

ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়া : জাতিসংঘ মহাসচিব ৭ই ডিসেম্বর এক টেলিগ্রাম বার্তায় সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব সম্পর্কে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অবহিত করেন। ৯ই ডিসেম্বর পাকিস্তান এই প্রস্তাবের একাংশ গ্রহণ করে জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর বার্তা প্রেরণ করে। পাকিস্তান অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি মেনে নিলেও ১ কোটি শরণার্থীর শান্তিপূর্ণ প্রত্যাবর্তনের বিষয়ে নীরব থাকে।

অন্যদিকে, ভারত জাতিসংঘের সাথে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও উপমহাদেশের বাস্তব পরিস্থিতি বিবেচনার জন্য এবং সংঘর্ষের মূল কারণসমূহ অনুসন্ধান করার জন্য জাতিসংঘকে অনুরোধ জানায়। অর্থাৎ ভারত প্রস্তাবটি সম্পর্কে নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করে।

নিরাপত্তা পরিষদে কূটনৈতিক যুদ্ধ

জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে ৪ থেকে ৬ ডিসেম্বের পর্যন্ত ভারত উপমহাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে দীর্ঘ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নিরপত্তা পরিষদের সভা এবং আলোচনা ও এর কার্যাবলি পর্যালোচনাকালে অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রই অভিমত প্রকাশ করবেন যে, নিরাপত্তা পরিষদ জাতিসংঘের ছকবাঁধা কূটনৈতিক বিতর্ক সভায় পরিণত হয়। উপমহাদেশের সংকটের মূল কেন্দ্র-উদ্ভূত বাংলাদেশ সমস্যাকে এড়িয়ে সেনা প্রত্যাহার, 'পর্যবেক্ষক নিয়োগ', শান্তি স্থাপন ও সংঘর্ষ বন্ধ ইত্যাকার কথামালায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে। একটি বিশ্ব ফোরামকে পরাশক্তি বিভক্ত দেশগুলো প্রকৃত সমস্যার সমাধান অন্বেষণ ও ব্যবস্থা গ্রহণ ব্যতীত কীভাবে অকার্যকর ও নিষ্ফল ডিবেটিং ক্লাবে পরিণত করেছে যা ভাবলে বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হতে হয়। বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে অগণিত মানুষের আত্মাৎসর্গ, আত্মবলিদান এবং শতাব্দীর মানবিক ট্রাজেডিকে নিদারুণ উপেক্ষা ও জাতিসংঘের কাঠামোগত ছকে আবদ্ধ বিশ্ববিবেক বাধা পড়েছিল তাও কূটনৈতিক 'অপরিধেয়' দৃষ্টান্ত হয়ে থাকছে। পরাশক্তি বিভক্ত বিশেষকরে মার্কিন প্রভাবিত রাষ্ট্রগুলো কূটনীতির অন্ধ অনুকরণে সমস্যার মৌলিক সূত্রের দিকে অগ্রসর হয়নি বা হতে পারেনি। সোভিয়েত রাশিয়া পোলান্ড এবং উক্ত বলয়ের ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষ ও যুদ্ধের নেপথ্যে মূল কারণ হিসেবে বাংলাদেশ সমস্যাকে তুলে ধরতে চেয়েছে। ফ্রান্স ও ব্রিটেন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ নিয়ে উপমহাদেশের সংকটময় পরিস্থিতির অন্বেষণে মূল সমস্যা-সমাধানে বাংলাদেশের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ উপস্থিতি আন্তঃকূটনৈতিক সমীকরণ দ্বারা তাড়িত হয়েছে। যার পেছনে ছিল বিপুল বিশ্ব জনমত।

সব মিলিয়ে নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কে শরণার্থী সমস্যা অতিক্রমণে রাজনৈতিক সমঝোতার কূটনৈতিক কণ্ঠস্বর প্রাধান্য পেয়েছে। বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রস্তাবনা, খসড়া প্রস্তাব, আলোচনা ও বিতর্কে সে বৈশিষ্ট্য ও দৃষ্টান্তগুলো লক্ষণীয় হবে।

৪ঠা ডিসেম্বর আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, ইটালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সোমালিয়া, যুক্তরাজ্য এবং যুক্তরাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তানের সশস্ত্র সংঘর্ষে ক্রমবনতিশীল অবস্থায় অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকার অনুরোধ জানান। ঐদিনই পরিষদের সভা বসে এবং বিষয়টি মহাসচিবের রিপোর্টসহ এজেন্ডার অন্তর্ভুক্ত করা হয়। প্রথমেই ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বিতর্কে অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানানো হয়। যদিও তাদের ভোটাধিকার ছিল না। পরিষদের নিকট ভারতের ৪ঠা ডিসেম্বরের পত্র যা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর বিবৃতিটি সংশ্লিষ্ট করে দেয়া হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ৩রা ডিসেম্বের আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ শুরু হয়। ফলে একদিন পর ৪ঠা ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি অধিবেশন শুরু হয়। পরিষদের সভা বসার পূর্বক্ষণে বাংলাদেশ প্রতিনিধিদলের নেতা বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরী নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতির কাছে মুজিবনগর সরকারের পক্ষ্যে বক্তব্য রাখার জন্য এক পত্রে আবেদন জানান। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসে এ পত্রটির অন্যান্য সাধারণ গুরুত্ব রয়েছে। এতে সংক্ষিপ্তভাবে মুক্তিযুদ্ধের পটভূমি, কারণ ও জাতিসংঘের ভূমিকা এবং কর্তব্যের বিষয়টি তুলে ধরা হয়েছে। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, ৪ঠা ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হয়নি, কিন্তু তখন এ পত্রটিকে নিরাপত্তা পরিষদের সরকারি দলিল হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রথম জাতিসংঘে বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য বাংলাদেশের প্রতিনিধির মাধ্যমে সরাসরি উচ্চারিত হল।

পত্রটি বিশ্লেষণ করলে বাংলাদেশের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের স্বপক্ষে কিছু মৌল বক্তব্য খুঁজে পাওয়া যায় : ক. সাড়ে সাত কোটি বাঙালির বিরুদ্ধে পাকিস্তান ২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালে যে যুদ্ধ শুরু করেছে সেটাই হলো এ সংকটের মূল কারণ, খ. জাতিসংঘ এ পর্যন্ত মূল সমস্যার সমাধানে উদ্যোগী হয়নি। কারণ জাতিসংঘ এ বিয়োগান্তক ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মারাত্মক সংকটের প্রধান পক্ষ বাংলাদেশের মানুষকে বিবেচনায় আনেননি, গ. চলমান সংকটের বর্তমান পরিস্থিতি, এর প্রকৃতি কারণ এবং সামগ্রিক সমাধান কোনো কিছুই সম্ভব নয়, যদি না বাংলাদেশের মানুষের বক্তব্য এখানে শোনা না হয়, এবং ঘ. বাংলাদেশের জনগণ ও সরকারের প্রতিনিধি হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদের সামনে একটি বিবৃতি পাঠের জন্যও বিচারপতি চৌধুরী অনুরোধ জানান।[৬৪]

সোভিয়েট রাশিয়া বাংলাদেশ প্রতিনিধির বক্তব্য শোনার প্রস্তাব করেন। কিন্তু নিরাপত্তার পরিষদের প্রেসিডেন্ট এই প্রস্তাব 'রুল্ড আওট' করেন এবং বিষয়টি বিবেচনার ব্যাপারে একমত হননি।

বিতর্কের শুরুতে পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভারত কর্তৃক পাকিস্তান ভূখণ্ড আক্রমণের বিষয়টি উল্লেখ করে ক্ষান্ত হয়নি 'বরং প্রকাশ্যে পাকিস্তান ভাঙার দাবি তুলছে।' তার বক্তব্য ছিল, এই পরিষদ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে এভাবে সংশ্লিষ্ট হতে পারে যে এটা শুধু পাকিস্তানের বিষয় নয়, বরং একটি বৃহৎ প্রতিবেশী শক্তি যেকোনো রাষ্ট্রের জন্য হুমকির বিষয়। যার ফলে জাতিসংঘ সনদ বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। ২১শে নভেম্বর থেকে ভারতের নিয়মিত সশস্ত্রবাহিনী ট্যাংক বিমান নিয়ে উস্কানি ব্যতিত পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক আক্রমণ চালিয়েছে। এতে সর্বাত্মক যুদ্ধ চলে। যেখানে নাশকতা ও সন্ত্রাসী কার্যক্রম ভারত দ্বারা সংঘটিত হচ্ছিলো। এটা নিরাপত্তার পরিষদের দায়িত্ব ভারতকে কীভাবে এই আক্রমণ থেকে প্রতিহত করবে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কৌশলগত সামাজিক ও আদর্শগত দিক বিবেচনায় একটি রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে পারে না। এসব বিষয়ে নিরাপত্তা পরিষদ পাকিস্তানের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, আঞ্চলিক অখণ্ডতা এবং অন্য সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক নীতিতে হস্তক্ষেপ করতে পারে না।[৬৫]

ভারতের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের সামনে সমস্যার দীর্ঘ ইতিহাস ও পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের সম্পর্কের বিষয় প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। তার বক্তব্য ভারত নয়, বরং পাকিস্তান নিজেই তার দেশকে ভেঙে ফেলছে এবং সেই লক্ষ্যে ভারতকে আক্রমণ করেছে। এক কোটি লোককে ভারতে পাঠানোর অর্থই হলো এক ধরনের আক্রমণ। যার ফলে ভারতের উপরে অসহনীয় সামাজিক, রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করেছে। ভারত-প্রতিনিধি পাকিস্তান উত্থাপিত প্রশ্নের জবাবে পাল্টা একথা তুলে ধরেন যে, বাঙালি বিদ্রোহীদের দমিত করতে না পেরে পাকিস্তান এখন সমস্যাটিকে আন্তর্জাতিকীকরণ করছেন এবং তা ভারত পাকিস্তানের সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এবং পাকিস্তান যে সমস্ত ঘটনাবলি পূর্ব পাকিস্তানে ঘটিয়েছে তা থেকে ভিন্ন দিকে দৃষ্টি সরাতে চায়। ভারত এ সম্পর্কে দৃঢ় ইচ্ছা পোষণ করে বলতে চায় পূর্ববঙ্গের জনগণের অংশগ্রহণ ব্যতীত এবং জনগণের উপর নির্যাতন অব্যাহত রেখে নিরাপত্তা পরিষদের এ বিষয়ে কোনো পক্ষ হওয়া উচিত নয়। তিনি বলেন, "যুদ্ধবিরতি ভারতের সঙ্গে নয়, বাংলাদেশের সাথে হতে হবে।"[৬৬]

ভারত ও পাকিস্তান প্রতিনিধির বক্তব্য পেশের পর বিভিন্ন রাষ্ট্র বক্তব্য প্রদান করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি বলেন, ভারত পাকিস্তানের সংঘর্ষ শুরু হয়েছে যা এশিয়ার শান্তি এবং স্থিতিশীলতার জন্য হুমকিস্বরূপ। যুক্তরাষ্ট্র প্রস্তাব করে যে, উভয় পক্ষ সীমান্ত থেকে তাদের সামরিক সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহার করবে। মহাসচিব দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা সমধানে কল্যাণকর উদ্যোগ নিবে। কিন্তু ভারত কোনো প্রস্তাবেই সমর্থন করছে না। জাতিসংঘের উচিত ভারত এবং পাকিস্তানকে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতিতে সম্মত করানো, অবিলম্বে বিদেশের মাটি থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা। যার ফলে রাজনৈতিক সমাধানের অগ্রগতির জন্য সন্তোষজনক পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে। ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের পর যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ ৭টি পয়েন্ট সম্বলিত একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৬৭]

প্রস্তাবগুলোর উদ্দেশ্য যুদ্ধবিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার, শান্তি প্রতিষ্ঠা এবং শরণার্থী প্রত্যাবর্তন হলেও মূল বাংলাদেশ সংকট-সমস্যা সমাধানে কোনো কিছু ছিল না। লক্ষ্য, মার্কিন নীতি অনুসরণে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষা।

আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, ফ্রান্স, ইটালি, জাপান, সিয়েরা লিয়েনো, সোমালিয়া, সিরিয়া, আরব রিপাবলিক এবং যুক্তরাজ্য অবিলম্বে সংঘর্ষ বন্ধের আহ্বান জানান। অনেকেই অবিলম্বে সামরিক বাহিনী প্রত্যাহারের দাবি জানান। কতিপয় সদস্য উভয় পক্ষের সীমানা সংঘর্ষের কথা, মানবিক দুঃখ-দুদর্শা লাঘব করার পরামর্শ দেন। জাতিসংঘের তদারকিতে যুদ্ধবিরতি, পূর্ব পাকিস্তানে রাজনৈতিক পরিবেশ সৃষ্টি যাতে শরণার্থীরা স্বেচ্ছায় ফিরতে পারে এবং সামগ্রিকভাবে পরিস্থিতির সমাধানের প্রয়োজনীয়তার কথা বলা হয়। বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান প্রস্তাব পেশ করেন।[৬৮] তারা ৫টি প্রস্তাব উত্থাপন করেন।[৬৯]

চীনের প্রতিনিধি অভিযোগ করেন, ভারত পূর্ব পাকিস্তানকে জয় করার জন্য সরাসরি সৈন্য পাঠিয়েছে। এর ফলে উপমহাদেশ বিশেষকরে সমগ্র এশিয়ায় ব্যাপক আকারে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ভারতের আক্রমণের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের নিন্দা করা উচিৎ, যাকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ সমর্থন দিয়েছে। চীনা প্রতিনিধি অবিলম্বে এবং নিঃশর্তভাবে পাকিস্তান এলাকা থেকে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের দাবি জানান।

সোভিয়েত প্রতিনিধি পাকিস্তানের সামরিক কর্তৃপক্ষের কর্মকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ বক্তব্য তুলে ধরে বলেন, তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের উপরে সন্ত্রাস ও শক্তি প্রয়োগ করেছে। লক্ষ লক্ষ লোককে বাড়িছাড়া করেছে, সম্পত্তি থেকে বিতাড়িত হয়েছে এবং পালিয়ে এসে ভারতের শরণার্থী হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধির অফিসিয়ালি স্বীকার করা উচিত তাদের দেশে ভয়ানক অভ্যন্তরীণ সংকট রয়েছে। যে সংকট আন্তর্জাতিক রূপ নিয়েছে। নিরাপত্তা পরিষদের উচিত সংকটের গভীরে প্রবেশ করা। একই সঙ্গে সোভিয়েট রাশিয়া পরিষদের একটি প্রস্তাব পেশ করেন। যেখানে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের সংকট নিরসনে প্রয়োজন রাজনৈতিক সমঝোতা এবং পাকিস্তান সরকারের উচিত পূর্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানে যে সশস্ত্র সংঘর্ষ চলছে তা বন্ধ করা। যার ফলে পরিস্থিতির অবনতি ঘটবে।[৭০]

পোল্যান্ডের প্রতিনিধি স্পষ্ট করে বলেন, সংঘর্ষের মৌলিক সূত্র মুছে ফেলার জন্য পূর্ব বাংলার জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সমঝোতা ও শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে পারে না।

আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, নিকারাগুয়া, সিয়ারোলিয়েনো এবং সোমালিয়া একটি খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপনপূর্বক ভারত-পাকিস্তান সীমান্ত বরাবর সংঘর্ষের খবর সম্বন্ধে দারুণ উদ্‌বেগ প্রকাশ করে। যতো শীঘ্র সম্ভব এই শত্রুতা দূর করে শান্তি প্রতিষ্ঠায় যুদ্ধ বন্ধ করার এবং সৈন্য প্রত্যাহারের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করার সুপারিশ পেশ করে।[৭১]

৫ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের খসড়া প্রস্তাবের উপর ভোট গৃহীত হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ১১টি, বিপক্ষে ২টি (পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়া) এবং দুটি দেশ (ফ্রান্স এবং যুক্তরাজ্য) ভোট দানে বিরত থাকেন। পরে ৫ই ডিসেম্বর পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে বসলে তাদের অনুরোধে তিউনেশিয়া ও সৌদি আরবের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানান। যদিও তাদের ভোটাধিকার ছিল না। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধি পুনরায় বিতর্কে অংশগ্রহণ করার জন্য বাংলাদেশের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানোর দাবি জানান। আর্জেন্টিনা, চীন, ভারত, ইটালি, পাকিস্তান, পোল্যান্ড এবং সোভিয়েত রাশিয়া এ বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখেন। সোভিয়েত রাশিয়ার সম্মতিক্রমে বিষয়টি পরবর্তী দিনের আলোচনার জন্য মুলতুবি রাখা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিনিধি সোভিয়েত ইউনিয়নের তাস (Tass) এর একটি টেলিগ্রাফিক এজেন্সি কর্তৃক প্রকাশিত বিবৃতি জাতিসংঘে প্রচার করে।[৭২] প্রচারিত শেষ তিনটি অনুচ্ছেদে বলা হয় :

"হিন্দুস্তান উপদ্বীপে শান্তি রক্ষার জন্য ক্রমাগত প্রচেষ্টা চালিয়ে সোভিয়েত সরকার পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দকে সুস্পষ্টভাবে তাদের এই বিপজ্জনক পথে চলার গুরুদায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত করে দেওয়া প্রয়োজন মনে করে।

বর্তমানে হিন্দুস্তানে যে সামরিক বিপদ দেখা দিয়েছে–যে সামরিক বিপদের দিকে কোনো শান্তিকামী দেশই উদাসীন থাকতে পারে না–সেই বিপদের মুখে সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিলম্বে এই রক্তক্ষয় বন্ধের জন্য, এবং আইনসঙ্গত অধিকারের ভিত্তিতে এবং সে দেশের জনগণের স্বার্থে পূর্ব পাকিস্তান সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

সোভিয়েত সরকার একথাও বিশ্বাস করে যে, পৃথিবীর সব দেশের সরকারেরই এই বিরোধের সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে জড়িত হওয়া থেকে- যা হিন্দুস্থান উপদ্বীপের পরিস্থিতির আরো অবনতি ঘটাবে-বিরত থাকা উচিত।"

সেখানে সোভিয়েত রাশিয়ার অবস্থান তুলে ধরা হয়। বিবৃতিতে সতর্ক করে দিয়ে বলা হয়, পাকিস্তান যে ভয়ঙ্কর পথ অনুসরণ করেছে যা প্রত্যক্ষভাবে সোভিয়েত সীমান্তে গুরুতর ঘটনার জন্ম দিবে।

চীন একটি খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করে। প্রস্তাবের বৈশিষ্ট্য হলো এখানে ভারতকে দোষারোপ করা হয়, এভাবে যে, ভারত বাংলাদেশ নামক নামসর্বস্ব ইস্যু

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তৈরি করছে। প্রস্তাবনায় বলা হয় ইন্দো-পাকিস্তান উপমহাদেশে মারাত্মকভাবে শান্তি বিঘ্নিত হচ্ছে। ভারত পাকিস্তানের উপর আক্রমণ করেছে। তথাকথিত বাংলাদেশ সৃষ্টির জন্য ভারত সরকার পাকিস্তানের উপর নাশকতা, পকিস্তান ভেঙে ফেলা এবং অখণ্ডতা ধ্বংসের জন্য আগ্রাসন চালিয়েছে। অপারেটিভ পার্টে বলা হয়, ভারত পাকিস্তান সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহার, বৈরিতা হ্রাস এবং পাকিস্তানের জনগণের উপরে পাকিস্তানের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামের বিরুদ্ধে ভারত যে আক্রমণ করেছে তা প্রতিহত করার আহবান জানান। প্রস্তাবের পক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে চীন বলে সৈন্য প্রত্যাহার ব্যতিত যুদ্ধবিরতিতে কোনো লাভ হবে না। এটা শুধু আগ্রাসনকে উৎসাহিত করবে।[৭৩] তিউনিশিয়ার প্রতিনিধি বলেন, নিরাপত্তা পরিষদের সরাসরি নির্দেশ দেওয়া উচিত। না হলে অন্তত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের আবেদন করা উচিত। প্রতিনিধি বলেন, শরণার্থীদের স্বেচ্ছায় প্রত্যাবর্তন সবচেয়ে ভালো সমাধান কিন্তু তার জন্য আস্থার পরিবেশ সৃষ্টি করা দরকার। সৌদি আরবের প্রতিনিধি বলেন, এশিয়ার সরকারপ্রধানদের এ সংঘর্ষ অবসানের জন্য একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার জন্য একটি সভা আহ্বানের প্রস্তাব দেন।

৮টি দেশ আর্জেন্টিনা, বেলজিয়াম, বুরুন্ডি, ইটালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়রো, লিয়েন এবং সোমালিয়া প্রস্তাব করে যে : ক. অবিলম্বে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ বন্ধ; খ. জাতিসংঘের চার্টার অনুসারে যে কারণসমূহে বর্তমান বৈরিতা সৃষ্টি হয়েছে তার যথাযথ অনুমোদন প্রয়োজন; গ. শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের জন্য রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন যেখানে স্বাভাবিক অবস্থা বিরাজ করে; এবং ঘ. জাতিসংঘের সনদ এবং আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা শক্তিশালী করার লক্ষে ১৯৭০ সালের ১৬ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ যে ঘোষণা করেছে তার পরিপ্রেক্ষিতে স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার স্বার্থে হুমকি ও শক্তির বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ, একইসাথে জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার অনুযায়ী তাদের ভাগ্য নির্ধারণ এবং জাতিসংঘের চার্টার অনুসারে বিবাদ নিরসন করা।[৭৪]

অপারেটিভ পার্টে বলা হয় রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করে তাদের ভূখণ্ডে নিয়ে যাবে। শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনে স্ব-স্ব পক্ষ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবে। মহাসচিবকে শরণার্থীদের সাহায্যের ব্যাপারে রাষ্ট্রসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। পরে ৫ই ডিসেম্বর সোভিয়েত খসড়া প্রস্তাব ভোটে দেওয়া হয়। প্রস্তাবের পক্ষে ২টি, বিপক্ষে ১টি এবং ১২জন ভোটদানে বিরত থাকে। সেজন্য প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।[৭৫]

এরপর নিরাপত্তা পরিষদ আট জাতির খসড়া প্রস্তাব ভোটে প্রদান করলে পক্ষে ১১টি, বিপক্ষে ২টি এবং বিরত থাকে ২টি দেশ। নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী প্রতিনিধি সোভিয়েত রাশিয়া নেতিবাচক ভোট দেওয়ার ফলে প্রস্তাবটি গৃহীত হয়নি।[৭৬]

ফ্রান্সের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদের কার্যকর ব্যর্থতায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন এবং ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে মহাসচিব কর্তৃক অবস্থা সম্পর্কে উদ্‌বেগপূর্ণ দৃষ্টি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর্কষণ সম্পর্কে উল্লেখ করেন এবং এ সম্পর্কে বলেন ফ্রান্স এবং ইতালির প্রতিনিধি যখন পরিষদের সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন তখন সেটি বিবেচনার জন্য বলেছিলেন। তিনি বলেন, আট জাতির প্রস্তাবে তার অনুপস্থিত কারণ হলো এটা গ্রহণ করার কোনো সম্ভাবনা ছিল না। তিনি পরিষদে পুনরায় আলোচনার অনুরোধ জানান।

যুক্তরাজ্যের প্রতিনিধি ফ্রান্সের অনুরূপ অভিমত প্রকাশ করেন এবং আলোচনার জন্য আহ্বান করেন।

চীন, রাশিয়া ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি পরিস্থিতি সম্পর্কে স্ব-স্ব সরকারের অবস্থান থেকে মতামত তুলে ধরেন। পরে ৫ই ডিসেম্বর বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়ারো লিয়ন একটি নতুন খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এ প্রস্তাবে বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকি এবং সংঘর্ষ সম্পর্কে গভীর উৎকণ্ঠা প্রকাশ করেন। এই লক্ষ্যে প্রাথমিকভাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, যুদ্ধ বন্ধ এবং এ সম্পর্কে মহাসচিবকে প্রস্তাবটি বাস্তবায়ন সম্পর্কে অবগত করার অনুরোধ জানানো হয়।

৬ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদ পুনরায় বৈঠকে বসলে তিউনেশিয়া যুদ্ধ বন্ধ ও সৈন্য প্রত্যাহারের আবেদন করেন। নিকারাগুয়ার প্রতিনিধি বলেন, যদি নিরাপত্তা পরিষদ ভেটো প্রদানে পঙ্গুত্ব বরণ করে থাকে তাহলে সাধারণ পরিষদে এই ব্যাপারে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে।[৭৭]

ফ্রান্সের প্রতিনিধি নিরাপত্তা পরিষদকে অবহিত করেন যে, যুক্তরাজ্যের সহযোগিতায় তিনি একটি প্রস্তাব তৈরি করেছেন যা বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান ৪ ডিসেম্বর প্রস্তাব করেছিলেন যে, অবিলম্বে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসেবে যুদ্ধবিরতি, সামরিক কার্যক্রম এবং পারস্পরিক সৈন্য সমাবেশ বন্ধের কথা বলা হয়েছিল। এ প্রস্তাবটি ফ্রান্স এবং ব্রিটেন কতিপয় সদস্যদের বিরোধীতার কারণে পেশ করেনি। ফলে শান্তি পরাজিত হয়েছে। জাতিসংঘ পুনরায় ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে এবং অস্ত্র বিষয়টি নির্ধারণ করছে।[৭৮]

সোভিয়েত প্রতিনিধি বলেন, বেলজিয়াম, ইতালি, জাপান, নিকারাগুয়া ও সিয়ারো লিয়ন আট জাতির এই খসড়া প্রস্তাবে শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের সামরিক আগ্রাসন বন্ধের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হলো, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত জনগণের অভিপ্রায় এখানে অঙ্গাঅঙ্গিভাবে জড়িত যা উপেক্ষা করা হয়েছে। কিন্তু আট জাতির প্রস্তাবে এই বিষয়টি এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। যার ফলে তিনি সংশোধনী প্রস্তাব পেশ করেন। এসময় ইতালি পূর্বে পাঁচ জাতি দেওয়া প্রস্তাব প্রত্যাহারে ঘোষণা দিয়ে বলেন, এটা এই মূহুর্তে সময়োপযোগী নয় এবং গৃহীত হওয়ার কোনো সুযোগ নেই।

ভারতের প্রতিনিধি ৬ই ডিসেম্বর ভারতের পার্লামেন্টে দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর একটি বিবৃতি পরিষদে পড়ে শোনান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশকে ভারতের স্বীকৃতি কথা জানান। তিনি বলেন, ভারত পাকিস্তানের ক্যাটাগরিতে পড়ে না। ভারত এমন কোনো সিদ্ধান্ত মেনে নেবে না যেখানে দু'দেশকে এক করে দেখা হয়। তিনি বলেন, উপমহাদেশে মূল সমস্যা ও কারণ না জেনে এবং বাংলাদেশের প্রতিনিধির অভিমত না জেনে কোনো সিদ্ধান্তই গ্রহণে সম্মত হবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের প্রতিনিধি বলেন, উপমহাদেশে যে সমস্যা উদ্ভব হয়েছে তা ভারতের নাশকতা, অস্ত্র সমর্থন এবং আগ্রাসনের কারণে। তিনি বলেন, ভারতের আক্রমণের কারণে পাকিস্তান সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে বাধ্য হয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিনিধির প্রশ্ন উত্থাপন করেন, পরিষদ তথাকথিত বাস্তবতাকে বৈধতা দেবে? এবং জবরদস্তি দখল, আক্রমণ এবং অবৈধ শক্তি প্রয়োগকে বৈধতা দেবে কিনা।

চীনের প্রতিনিধি বলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে ভারত পাকিস্তানকে ভেঙে ফেলার জন্য বাংলাদেশকে সৃষ্টি করেছেন।

সোমালিয়ার প্রতিনিধি নীতিগতভাবে একদেশ থেকে অন্যদেশ দেশের শত্রু সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টি সমঝোতার বিষয় নয়। সামরিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাধান অন্যদেশ চাপিয়ে দিতে পারে না। সময় এসেছে প্রশ্নটি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তরিত করা। যেমনটি হয়েছিল ১৯৫০ সালের ৩রা নভেম্বরে (৩৭৭অ(৫)) প্রস্তাবে সাধারণ পরিষদে শান্তির জন্য ঐক্যবদ্ধ প্রস্তাব গৃহীত হয়।[৭৯] যা পরবর্তী পর্যায়ে আলোচনায় উঠে আসবে।

বাংলাদেশকে অস্বীকার করার কৌশল : শান্তির জন্য ঐক্য ফর্মুলা

জতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের অচলাবস্থার অবসানে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তার জন্য সাধারণ পরিষদ একটি গ্রহণযোগ্য ফর্মুলার অন্বেষণে ব্যস্ত থাকে। কয়েকটি দেশ জাতিসংঘের চত্বরে আনুষ্ঠানিক আলোচনা শুরু করে। নিকরাগুয়ার প্রতিনিধি সেভিল্লা সাকাসা নিরাপত্তা পরিষদে বলেন, "যদি আমরা কোনো কিছু করতে ব্যর্থ হই, তবে সাধারণ পরিষদ উদ্যোগ নিতে পারে। কারণ এটা মনে করার কারণ নেই যে, কেবল নিরাপত্তা পরিষদই আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে উদ্‌বিগ্ন থাকবে।"

এই ধারণা থেকে নিরাপত্তা পরিষদের ছয়টি দেশ আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরে, লিওন ও সোমালিয়া ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১ নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬ ও ১৬০৭ বৈঠকে ঐক্যমতের প্রস্তাব গ্রহণের ব্যর্থ হওয়ায় একত্রে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে।[৮০] খসড়া প্রস্তাবের সুপারিশে বলা হয়, উক্ত বৈঠকসমূহে ঐক্যমত না হওয়ায় ১৯৫০ সালে সাধারণ পরিষদে গৃহীত প্রস্তাব (377 A(V)) অনুযায়ী জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের বিশেষ অধিবেশনে প্রেরণ করা হোক।[৮১]

এই প্রস্তাব উত্থাপনের পর নিরাপত্তা পরিষদে সংক্ষিপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। প্রস্তাবটির উপর বিতর্ক অনুষ্ঠানকালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, ফ্রান্স ও ব্রিটেন ও অস্থায়ী সদস্য পোল্যান্ড ভিন্ন মত প্রকাশ করে।

নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যবৃন্দ অবগত ছিলেন যে, এই প্রস্তাবের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র শক্তভাবে পৃষ্ঠপোষকতা করেছে। ছয় জাতি উত্থাপিত এই প্রস্তাব ৬ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে গৃহীত হয়।[৮২]

নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্টকে জাতিসংঘে নিযুক্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি একটি পত্র লেখেন। পত্রটিতে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের মনোভাব ও নীতি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হয়েছে। পত্রে বলা হয়েছে, ভারত উপমহাদেশে যুদ্ধ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। ইতোমধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬, ১৬০৭, ১৬০৮ তারিখে বৈঠকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের প্রস্তাব ব্যর্থ হয়েছে। সে লক্ষ্যে সাধারণ পরিষদ ৭ই ডিসেম্বরের বৈঠকে সংকট অবস্থা নিরসনে 'শান্তির জন্য ঐক্য' ফর্মুলা ১০৪ ভোট পক্ষে, ১১ ভোট বিপক্ষে এবং ১০ রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থেকেছে এবং ভারত ও পাকিস্তানকে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানিয়েছে। পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিয়েছে, ভারত এখন পর্যন্ত তা মেনে নেয়নি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন নিরাপত্তা পরিষদের বিশ্বশান্তি স্থাপন ও হুমকি মোকাবিলায় অবিলম্ব দায়িত্ব রয়েছে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র সরকারের পক্ষ হতে তিনি অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের সভা ডাকার আহ্বান জানান।[৮৩]

উপমহাদেশের যুদ্ধবিরতি প্রশ্নে নিরাপত্তা পরিষদ সর্বসম্মত সিদ্ধান্তগ্রহণে ব্যর্থ হলে বিষয়টি সাধারণ পরিষদে উত্থাপন করা যায় কি না সে-সম্পর্কে নিরাপত্তা পরিষদের ১১টি সমমনা রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক আলোচনা করে। এ উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিলো নিরাপত্তা পরিষদের ১৯৫০ সালের ৩ নভেম্বরের প্রস্তাবনা অনুযায়ী।[৮৪]

এটি সাধারণত 'শান্তির জন্য ঐক্য ফর্মুলা' নামে পরিচিত।[৮৫] এ চিন্তা থেকেই নিরাপত্তা পরিষদের ৬টি দেশ যথাক্রমে আর্জেন্টিনা, বুরুন্ডি, জাপান, নিকারাগুয়া, সিয়েরোলিওন ও সোমালিয়া পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং বিষয়টির জন্য সুপারিশ করে। ৬টি দেশ এই প্রস্তাব উত্থাপনের পর নিরাপত্তা পরিষদে একটি সংক্ষিপ্ত বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। পরিষদের সভাপতি এই খসড়া প্রস্তাবের উপর বিতর্কের অবসানের জন্য ভোট গ্রহণ করেন। ভোটে কোনো দেশ ভেটো না দেওয়ায় এই প্রস্তাব পাস হয় এবং পাসের পর জাতিসংঘ উপমহাদেশে যুদ্ধবন্ধের লক্ষ্যে 'শান্তির জন্য ঐক্য ফর্মুলা' প্রয়োগের জন্য কার্যক্রম শুরু করে।

৭ই ডিসেম্বর সাধারণ পরিষদে গৃহীত 'শান্তির জন্য ঐক্য' প্রস্তাব গৃহীত হয়। কিন্তু যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গৃহীত হলেও যুদ্ধ বন্ধ হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নির্দেশ মোতাবেক ১২ই ডিসেম্বর জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি জর্জ বুশ নিরাপত্তা পরিষদের প্রেসিডেন্ট বরাবর নিরাপত্তা পরিষদের অধিবেশন ডাকার আহ্বান জানান। ঐদিন বিকাল চারটায় যুক্তরাষ্ট্রের উদ্যোগে নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১১তম বৈঠক বসে। বৈঠকে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি জর্জ বুশ এক প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতের প্রতি অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানান। প্রস্তাবে বলা হয়, পাকিস্তান যুদ্ধবিরতিতে সম্মত আছে কিন্তু ভারত এখন পর্যন্ত নিঃশর্তভাবে প্রস্তাবটি গ্রহণ করেনি। এই প্রস্তাবের বিপক্ষে ১৩ই ডিসেম্বর সোভিয়েত রাশিয়া ভেটো প্রয়োগ করে। পাকিস্তানের প্রতিনিধি ভুট্টো দীর্ঘ বক্তৃতায় অতীতের মতো ভারতের আগ্রাসন থেকে পাকিস্তানকে রক্ষায় জাতিসংঘের ব্যর্থতার সমালোচনা করেন।

১২ই ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং তার বক্তব্য প্রদান শুরু করে। তার পক্ষ থেকে বলা হয়, একপক্ষ কালের মধ্যে দক্ষিণ এশিয়ার মর্মান্তিক ঘটনাবলি দ্বিতীয়বারের মতো নিরাপত্তা পরিষদে আলোচনা শুরু হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে বিশেষজ্ঞগণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মনে করেন, ৭ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাস হওয়ার ফলে ভারত উদ্‌বিগ্ন হয়ে ওঠে এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে তড়িঘড়ি করে পুনরায় জাতিসংঘে ফিরে আসতে হয়। যেকোনো সচেতন পাঠকমাত্রই উপলব্ধি করতে পারবেন ১২ ও ১৩ ডিসেম্বর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এই দীর্ঘ ভাষণ প্রদানের লক্ষ্য ছিল এই সময়ের মধ্যে ভারত ও বাংলাদেশ মিত্রবাহিনী যেন বাংলাদেশ কব্জা করতে পারে এবং নিরাপত্তা পরিষদ কোনো রকম হস্তক্ষেপ করার সুযোগ না পায়, যা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষণের বক্তব্য ছিল, সাধারণ পরিষদে আলোচনার শেষ পর্যায়ে গৃহীত প্রস্তাবে ভারত উপমহাদেশে উদ্ভূত পরিস্থিতি ও বাংলাদেশ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছে সম্ভবত তা ছিল অবাস্তব। কেননা সেখানে বাংলাদেশের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা হয়নি।[৮৬] তিনি বাংলাদেশের জনগণের উপরে পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর অবর্ণনীয় নির্যাতন ও সামরিক শাসনের বিস্তারিত উল্লেখ করেন। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী প্রতিনিধি জর্জ বুশের মন্তব্য খণ্ডন করে বলেন, ভারত সবসময়ই সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে আছে। যদি জাতিসংঘ বাস্তব অবস্থাকে বিবেচনায় নিয়ে আসতে পারে। বর্তমান পরিস্থিতিতে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবের আহ্বান বাস্তব সম্মত হবে যদি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনী পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে ব্যস্ত রয়েছে কেন সে সম্পর্কে বাংলাদেশের প্রতিনিধিদের নিকট থেকে শুনতে দেওয়া হয়।[৮৭]

১২ই ডিসেম্বর ওয়াশিংটনে মার্কিন শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে হেনরি কিসিঞ্জার সভাপতিত্ব করেন। আলোচনায় শুরুতে সি.এ.আই. রিপোর্টের পাকিস্তানের পশ্চিম অংশে বিদ্যমান পরিস্থিতির ওপরে সি.আই.এ উত্থাপিত পরস্পরবিরোধী রিপোর্ট পর্যালোচনা করা হয়। সিআইএ ভারতের দখলকৃত পূর্ব পাকিস্তান এলাকা মানচিত্রে দেখাতে সম্মত হয়। প্রেসিডেন্ট ৯৯ মিলিয়ন ডলারের সাথে সংশ্লিষ্ট আর কোনো অপ্রত্যাহারযোগ্য ঋণপত্র ইস্যু এবং ৭২ মিলিয়ন ডলারের পিএল ৪৮০ ঋণ কার্যকর করার লক্ষ্যে নতুন কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেন। নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের উদ্দেশ্যে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের প্রকৃত অবস্থা জানার জন্য বিকালে পাকিস্তানি রাষ্ট্রদূতের সাথে আনুষঙ্গিক আলোচনার পরিকল্পনা করা হয়। এসময় নিক্সন প্রশাসন কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি অর্থনৈতিক কূটনীতির মাধ্যমে ভারতের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সাহায্য স্থগিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং যেটি করা হয় নিক্সনের ইচ্ছানুসারে। এ সময় স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা উইলিয়াম বিশ্ব জনমতের পরিপ্রেক্ষিতে বিষয়টি প্রেসিডেন্ট ভেবে দেখেছেন কিনা প্রশ্ন তোলেন। কিসিঞ্জার জবাবে পরিষ্কার করে বলেন যে, উপমহাদেশের বিদ্যমান পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে নতুন অর্থ সাহায্য স্থগিত রাখা হয়েছে। কিসিঞ্জার আরো বলেন, এসময় যুক্তরাষ্ট্রের কাজ হলো জাতিসংঘের দিকে হাত বাড়ানো। এই লক্ষ্যে জাতিসংঘকে সক্রিয় করার জন্য অগ্রসর হন এবং পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে পাঠান এবং কিসিঞ্জার তার মন্তব্য জুড়ে দেন যে, 'এই ধরনের পরিস্থিতিতে জাতিসংঘ যদি কার্যকর ভূমিকা না রাখতে পারে, তাহলে বলতেই হবে যে, এর কার্যকারিতা ফুরিয়ে গেছে এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মধ্যপ্রাচ্য প্রশ্নে জাতিসংঘের দেওয়া নিশ্চয়তা অর্থহীন হয়ে গেছে।' এ লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বানের পরিকল্পনা ব্যক্ত করেন। কিসিঞ্জার আরো বলেন, 'যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সমাধানের পক্ষে, কিন্তু নিরপত্তা পরিষদের মূল কাজ হলো সামরিক তৎপরতা বন্ধ করা, যদিও যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য হবে পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে থাকা।'[১৮৮]

বৈঠকে অবিলম্বে নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র অনুরোধ জানাবে বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তৃতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের গৃহীত সিদ্ধান্ত প্রকাশিত হবে। জাতিসংঘের কর্মকাণ্ডে মার্কিন সরকারের পক্ষপাতি থাকবে পাকিস্তানের দিকে। পাকিস্তানের প্রতি বর্তমানে বহাল অর্থনৈতিক সাহায্য বাতিল করা হবে না। কিসিঞ্জারের ভাষ্য ছিল, ভারত সর্বাত্মক আক্রমণ ঘোষণা করলে জাতিসংঘ প্রতিবেদনে অবশ্যই তার প্রতিফলন ঘটা উচিত। ডি পালমা পরামর্শ দেন যে, যুক্তরাষ্ট্র যদি জাতিসংঘ আলোচনায় ভারতের বিরুদ্ধে ঘোষণার প্রসঙ্গ টানা হয়, তাহলে তাদের অবশ্যই ইয়াহিয়া মন্তব্যের কথাও উল্লেখ করতে হবে। এসময় পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, কিন্তু ভারত তেমনটি ঘোষণা দেয়নি। এ প্রসঙ্গে কিসিঞ্জার জানতে চান জাতিসংঘে কী হচ্ছে। এর উত্তরে ডি পালমা জানান যে, যুক্তরাজ্য, বেলজিয়াম, জাপান ও সম্ভবত ফ্রান্স নিরাপত্তা পরিষদের সভা আহ্বান করার লক্ষ্যে ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে। সভা আহবানের জন্য আমাদের অনুরোধ সম্বলিত চিঠিতে জাপান কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব খুঁজে পেয়েছে। জাপানিরা শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের পক্ষে। যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য জাপানিদের কাছে তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি। এ কথায় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিসিঞ্জার বলেন, জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান অবশ্যই পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিতে হবে। জাতিসংঘের মার্কিন রাষ্ট্রদূত বুশ যদি বুঝতে পারেন কী তাঁর বলা উচিত, তাহলে অন্য কে কী মনে করল, সেটার পরোয়া তিনি করেন না।

ডি পালমা জানান যে, নিরাপত্তা পরিষদের সভা (সেদিন) বিকালে না সন্ধ্যায় আহ্বান করা হবে, সেটা তার জানা নেই। সভার প্রাথমিক বিবৃতিগুলো অবশ্য ভারতীয় ও পাকিস্তানিরাই দেবে। তিনি পরামর্শ দেন যে, প্রতিদ্বন্দ্বী দেশ দুটোর বিবৃতি শেষ হয়ে যাবার পর প্রথমদিকেই রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তব্য দেওয়া উচিত। শুরুর দিকে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান জানিয়ে দিলে সেটার প্রভাব বেশি হবে বলে তিনি মনে করেন। কিসিঞ্জার এতে কোনো আপত্তি করেননি। এ সময় ডি পালমারের বক্তব্য ছিল বিবৃতি প্রকাশ করার আগেই অন্যদেরকে সময় লাগলেও পক্ষে আনতে চাই কি না। কিসিঞ্জার পরামর্শ দেন যে, এভাবে এগুনোর চেয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, প্রয়োজনে এককভাবে যুক্তরাষ্ট্রের বিবৃতি দিয়ে ফেলা উচিত। কিসিঞ্জারের মত অনুসারে, একমাত্র যে পথটি বর্তমানে খোলা আছে তা হল, 'যুক্তরাষ্ট্র বৃহত্তর স্ট্রাটেজির প্রেক্ষিতে তাদের অবস্থান পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করা।' সকলে জানেন, কীভাবে এটা ঘটবে এবং সকলেই এটাও জানেন যে, ভারত শেষ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তান দখল করে নেবে। কাজেই, যুক্তরাষ্ট্রের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান ব্যক্ত করে তাদের গৃহীত সিদ্ধান্ত আলোচনার জন্য উপস্থাপন করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রয়োজন একটি সিদ্ধান্ত যা রাষ্ট্রদূত বুশ তাঁর বক্তৃতার মাধ্যমে ঘোষণা করবেন। অন্যেরা যদি যুক্তরাষ্ট্রের সাথে আসতে চায়, তা হবে চমৎকার। কিন্তু যে কোনো অবস্থায় রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তব্যের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত উপস্থাপন করতে হবে।

কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান ব্যক্ত করাটা জরুরি। জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের এই প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়ে যাবার আশঙ্কা প্রবল, কারণ সোভিয়েতরা ভেটো প্রয়োগ করতে পারে। এই যুদ্ধ বন্ধ করতে জাতিসংঘেরও খুব সামান্যই করণীয় আছে। তিনি যা বলেন, তার সারসংক্ষেপ হলো এই যে, তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রদূত বুশের বক্তৃতার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত জাতিসংঘে প্রকাশ করা হবে এবং সেটা অবিলম্বে। পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্যমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে সাধারণ আলোচনায় যুক্তরাষ্ট্র অবশ্যই অংশ নেবে, কিন্তু কোনো নির্দিষ্ট পরামর্শ, যেমন: মুজিবের মুক্তি, সে প্রস্তাব তারা দেবে না।

জাতিসংঘে ভারতীয় কৌশল নিয়ে আলোচনা: কিসিঞ্জার জানতে চান, নিরাপত্তা পরিষদে ভারতীয়রা কাজ শুরু করতে কতটা দেরি করতে পারে। ডি পালমা বলেন, তারা দীর্ঘ বক্তৃতা দিতে পারে অথবা যুক্তরাষ্ট্রের উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলতে পারে। ফন হোলেন বলেন যে, তারা যতটা সম্ভব প্রলম্বিত করবে, যার ফলে পূর্ব পাকিস্তানের পরিস্থিতিতে তারা মনোসংযোগ করতে সমর্থ হবে। ডি পালমা বলেন, তারা বড়জোর তিন-চারদিন দ্বিধাগ্রস্ত থাকবে যা, হেমসের মতে, তাদের পূর্ব পাকিস্তান দখল করার পক্ষে যথেষ্ট সময়। ডি পালমা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সব সময়ই ভোটের জন্য চাপ প্রয়োগ করতে পারে। কিসিঞ্জার পুনরাবৃত্তি করেন যে, জাতিসংঘ থেকে লাভজনক কিছু পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই। কেননা ডি পালমার অভিমত ছিলো, কোনো না কোনো পক্ষের ভেটো দেবার আশঙ্কা খুবই প্রবল।

ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে স্বীকৃতি প্রদানের প্রেক্ষাপটে জাতিসংঘের প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কূটনৈতিক তৎপরতা দৃশ্যত অকার্যকর হয়ে যায়। এক্ষেত্রে লক্ষ্য করা গেছে যে, এ সময় যুক্তরাষ্ট্র যেমন জাতিসংঘকে সামনে রেখে তাদের সুনির্দিষ্ট কূটনৈতিক লক্ষ্য অর্জনে তৎপর ছিল, তেমনি গোপনে সামরিক কূটনীতি জোরদার করার পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকে এগিয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্রের গোপন নথিতে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ভারত বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেছে। ভারত পূর্বাঞ্চলে লড়াই জোরদার হয়েছে। ভারত ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে তেমন সাফল্য অর্জন করেনি যদিও তারা আকাশ পথ কব্জা করেছে, নৌ-যুদ্ধে পাকিস্তানকে বেকায়দায় ফেলেছে এবং মস্কোর উত্তরোত্তর জোরালো ও প্রকাশ্য সাহায্য জোরদার হয়েছে এবং জাতিসংঘে কোনো উদ্যোগকে বিশেষকরে লড়াই বন্ধের বিষয়ে সমর্থন দেয়নি।

কিসিঞ্জার এ সময় জাতিসংঘের উদ্যোগ প্রসঙ্গে অবগত হন। তাকে বলা হয়,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরাপত্তা পরিষদের দুটি সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ভেটো প্রয়োগ করেছে। এই অবস্থা নিরসনে সাধারণ পরিষদে 'শান্তির জন্য ঐক্য' সংক্রান্ত ধারার আওতায় একটি জরুরি সভা আহ্বানের ভিত্তি প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। সভায় উল্লেখ করা হয় যে, ১৩৬টি রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বে এই পরিষদের যেকোনো প্রতিকূলতা মোকাবেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্রকে প্রস্তুত থাকতে হবে। এ প্রসঙ্গে ডি. পালমা বলেন, ৩.৩০ মিনিটে যে কাউন্সিলের একটি সভা আছে সেখান থেকে সমস্যাটি সাধারণ পরিষদে স্থানান্তর করতে হবে। কারণ নিরাপত্তা পরিষদের মাধ্যমে যে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হচ্ছে না এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র নিশ্চিত'। কিসিঞ্জার বলেন, ভারতীয়দের প্রতি নিস্পৃহ আচরণ এবং তাদের খুব একটা সম্মান যুক্তরাষ্ট্র দেখাবে না। অবশ্য পালমা বলেন, সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব উত্থাপনের পর ঘটনার নতুন মোড় নেবে। সেক্ষেত্রে ভারত আর সমস্যার রাজনৈতিক নিষ্পত্তির ব্যাপারে আগ্রহ দেখাবে না। কারণ এটা কোনো সমস্যা বলে স্বীকৃতি দেওয়ার প্রয়োজন হবে না। তারপরেও কিসিঞ্জার বলেন প্রেসিডেন্ট নিক্সন নিশ্চিতভাবে চান না পাকিস্তান পরাজিত হোক। এরজন্য সামরিক কূটনীতি পরিচালনা পরিচালিত হবে গোপনে।

এসময় সিআইএ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ সম্পর্কে একটি গোপন রিপোর্ট তৈরি করে। রিপোর্টে প্রথম ৬ লাইন প্রকাশ করা হয়নি। রিপোর্টে জাতিসংঘে ভারতের ভূমিকা কী হতে পারে তা উঠে এসেছে।

১. প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, কূটনৈতিক ফ্রন্টে ভারত বেশ ভালো করেছে। ভারত সোভিয়েত বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন জাতিসংঘে ভারতকে সহায়তা করেছে। এমনকি নিরাপত্তা পরিষদে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের ভূমিকায় তিনি সন্তুষ্ট।

২. যদিও চীন জাতিসংঘে পাকিস্তানকে সমর্থন করেছে তবুও এটা মারাত্মক কিছু নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী আশা করেছেন চীন ভারতের উত্তর সীমান্তে সামরিক হস্তক্ষেপ করবে না। সোভিয়েত রাশিয়া লাদাখ এবং চমবাই এলাকায় তরবারি ঘুরাতে চীনকে সর্তক করে দিয়েছে। চীন যদি আক্রমণে এগিয়ে আসে তাহলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাউন্টার-ব্যালেন্স করবে।

৩. যুক্তরাষ্ট্র সম্ভবত জাতিসংঘে যুদ্ধ বন্ধের জন্য আর একটি প্রস্তাব আনতে পারে। সোভিয়েত সেখানে ভেটো প্রয়োগ করবে। সাধারণ পরিষদের কোনো প্রস্তাব ভারত মানবে না যদি না : ক. বাংলাদেশ স্বাধীন না হয়, খ. আজাদ কাশ্মীরের দক্ষিণ অংশ মুক্ত না হয়, এবং গ. পাকিস্তান গোলন্দাজ এবং বিমান বাহিনী সম্পূর্ণ ধ্বংস হতে হবে যাতে পুনরায় তারা ভারতকে আক্রমণ করার পরিকল্পনা না করতে পারে।

৪. এটা খুবই দুঃখজনক যে ভারতের প্রচেষ্টা সত্ত্বেও যুক্তরাষ্ট্র উপমহাদেশ সম্পর্কে তাদের নীতির পরিবর্তন করেনি। নতুন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। জাতিসংঘে তা ঘোষণা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গান্ধী আশা করেন অচিরেই সমাজতান্ত্রিক দেশগুলো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেবে। কিন্তু বর্তমানে সবচেয়ে জরুরি বিষয় হলো অতিশীঘ্র বাংলাদেশকে মুক্ত করা। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘে বিতর্ক তৎপরতা জোরদার করে বিশ্ব জনমতকে অনুকূলে রাখতে হবে। অঘোষিত যুদ্ধে সর্বাত্মক সক্রিয়তা বজায় রাখা অব্যাহত ও দ্রুততর করতে হবে। কেননা সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে জানিয়ে দিয়েছে নতুন করে পুনরায় ভেটো ভোটে ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাবে না।

১০ই ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসের এক বৈঠকে জাতিসংঘের স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্ট পলমার্ক হেনরি অবহিত করেন যে, পূর্ব পাকিস্তানের রাও ফরমান আলী পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নিকট অনুমোদনের জন্য যে বার্তা পাঠিয়েছে সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে জাতিসংঘের মাধ্যমে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি ব্যবস্থা করা হোক এবং যাতে কোনো প্রতিহিংসার ঘটনা না ঘটে তার গ্যারান্টি চাওয়া হয়। কিন্তু কোনোক্রমেই আত্মসর্ম্পণ নয়। ঐ বার্তায় এই ইঙ্গিত দেওয়া হয় এই যে, এই প্রস্তাব না মানা হলে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর শেষ মানুষটি জীবিত থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবে। এ সময় কিসিঞ্জার বলেন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানি সারেন্ডারের বিপক্ষে যেহেতু চীন তাদের সঙ্গে আছে। প্রেসিডেন্ট সারেন্ডারের পক্ষে নয়। প্রয়োজনে ভারতের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র কোনোক্রমেই পাকিস্তানকে ফেলে দিতে পারে না। ঐদিনই নিক্সন কিসিঞ্জারকে চীনা প্রতিনিধির সঙ্গে বসতে পরামর্শ দেন এই বলে যে, যদি সম্ভব হয় চীনা সামরিক বাহিনী ভারতের দিকে অগ্রসর হতে পারে কিনা অথবা তারা সৈন্য পাঠাচ্ছে বলে ভারতকে হুমকি দিতে পারে কিনা। সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভের প্রস্তাবে যা পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের নিকট পাঠানো হয়েছিল, ইয়াহিয়া খান সে প্রস্তাবে যুদ্ধ বন্ধ, পারস্পরিক আলোচনার ভিত্তিতে সৈন্য প্রত্যাহার এবং আলোচনার ভিত্তিতে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণের কথা বলেছেন। জাতিসংঘে পাকিস্তান প্রতিনিধি এ ধরনের সুস্পষ্ট প্রস্তাব ঘোষণা করেছে। কিন্তু ভারত এই মুহূর্তে জাতিসংঘে প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়ে আলোচনায় বসতে অস্বীকার করেছে। আলোচনায় বসলেই পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিনিধি দল পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতা দাবি করবে এবং পশ্চিম পাকিস্তান সেখানে শর্তারোপ করবে। এই উদ্যোগ তাদের নেয়া উচিত হবে না। বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দানের প্রশ্নে নিক্সন বলেন, "we must never recognize Bangladesh until west Pakistan gives us the go ahead."

জাতিসংঘ অভিমুখে যাত্রার প্রাক্কালে লণ্ডনে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার শরণ সিং বলেন, জাতিসংঘকে তিনি জানাবেন, বর্তমানে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণের অযোগ্য। বাংলাদেশ পরিস্থিতির মূল সমস্যা যতক্ষণ না মিটছে এবং বাংলাদেশের যুদ্ধবিরতির আলোচনায় যতক্ষণ না বাংলাদেশকে ডাকা হচ্ছে ততক্ষণ যুদ্ধবিরতি অবাস্তব বলে মনে হয়। তিনি আরো বলেন, যতদিন প্রয়োজন তার বেশি একদিনও বাংলাদেশে ভারতীয় সৈন্য থাকবে না। ১০ই ডিসেম্বর ভারতের বিদেশমন্ত্রী সিকিউরিটি কাউন্সিলে ভাষণ দেওয়ার জন্য নিউইয়র্কে আগমন করেন। সে সময়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতীয় কর্মকর্তাগণ জাতিসংঘে তাঁর ভাষণ প্রস্তুত করে রেখেছিলেন যা ছিল সংক্ষিপ্ত, সুনির্দিষ্ট এবং সুসংহত।

বিদেশমন্ত্রী ভাষণটি অবলোকন করে এটাকে নাকচ করে দেন। তিনি বলেন, তার জন্য একটি দীর্ঘ ভাষণ তৈরি করতে। যে ভাষণে পাকিস্তান জন্মের পর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের উপর কীভাবে শোষণ-শাসন, অত্যাচার ও গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ, হত্যাযজ্ঞ ও শরণার্থী সমস্যা সৃষ্টি ইত্যাদি বিষয়ে তার বিশদ বর্ণনা দিতে বলেন। একই সাথে বর্তমান পরিস্থিতি সম্পর্কে ভারতের সুস্পষ্ট কূটনৈতিক ভূমিকা করার নির্দেশ প্রদান করেন। সর্বমোট ৩০ পৃষ্ঠার ভাষণ তৈরি করা হয়।[৮৯] ভাষণটি চারটি ভাষায় তা অনূদিত হয়। ভারতের বিদেশমন্ত্রী ১২ এবং ১৩ই ডিসেম্বর দুদিন দীর্ঘ সময় ধরে ভাষণ দেন। ১৪ তারিখের সকালে এটা পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক সংঘর্ষ শেষ হওয়ার পথে। পরবর্তীকালে সর্দার শরণ সিংহকে এই দীর্ঘ ভাষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের যুদ্ধে চূড়ান্ত ফলাফলের জন্য সময়ের প্রয়োজন ছিল।[৯০]

অন্যদিকে, তখন জাতিসংঘে চলছিল তুমুল বিতর্ক। বাংলাদেশ সংকট নিয়ে জাতিসংঘে প্রায় ১৭টি প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। সাধারণ পরিষদে ৪টি এবং নিরাপত্তা পরিষদে ১৩টি। নিরাপত্তা পরিষদে ১২ই ডিসেম্বর থেকে ২১ই ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রস্তাবগুলো নিয়ে আলোচনা হয়। যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত রাশিয়া এবং পোল্যান্ডের প্রস্তাবগুলো ছিল বেশি গুরুত্বপূর্ণ। যুক্তরাষ্ট্রের প্রস্তাব ছিল অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি, পাকিস্তান ও ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার এবং অনুকূল পরিবেশ তৈরি, যেন শরণার্থীরা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করতে সমর্থ হয়। এ লক্ষ্যে জাতিসংঘের মহাসচিব যেন তার যথাযথ ভূমিকা রাখেন। মার্কিন নীতি অনুযায়ী বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংকটের সমাধান ও জনগণের প্রত্যাশা পূরণের কোনো কথাই প্রস্তাবে ছিল না।

পক্ষান্তরে, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাব ছিলো সংক্ষিপ্ত এবং সুনির্দিষ্ট। প্রস্তাবে বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বাস করে রাজনৈতিক সমাধান এ সকল সমস্যার নিরসন করতে পারে, সংঘর্ষ বন্ধ হবে এবং পাকিস্তানকে পূর্ব পাকিস্তানে সামরিক কার্যক্রম বন্ধের প্রস্তাব দেন। চীনের প্রস্তাবের মূল লক্ষ্য ভারতবিরোধী। আগ্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করে ভারতকে পাকিস্তান ও দখলি এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করা উচিত। বিশ্বের সব দেশ পাকিস্তানকে সমর্থন করা উচিত এবং ভারতের আগ্রাসন বন্ধে কার্যকর ভূমিকা নেয়ার কথা জোরের সঙ্গে উত্থাপন করে। ফ্রান্স, ব্রিটেন এবং স্থায়ী সদস্য নয় এমন প্রতিনিধিগণ যুক্তরাষ্ট্রের অনুরূপ প্রস্তাবের পদক্ষেপ নেয়। সমর্থন করেও কিছুটা দূরত্ব নিস্পৃহ থাকেন। ১৪ই ডিসেম্বর গুরুত্বপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন করে পোল্যান্ড।

পোল্যান্ডের খসড়া প্রস্তাব : ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শোনার পর পোল্যান্ড প্রস্তাব করেন যে, (ডিসেম্বর ১৪) ১. সংঘর্ষপূর্ণ পূর্বাঞ্চল (পূর্ব পাকিস্তান) ক্ষমতা তাদেরকে হস্তান্তর করতে হবে যারা সংখ্যাগরিষ্ঠ অর্থাৎ শীঘ্রই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বন্দিদশা থেকে মুক্তি দিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে নির্বাচিত দলের কাছেই ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে; ২. ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া মাত্রই সকল এলাকায় পরিচালিত সশস্ত্রবাহিনীর কার্যক্রম বন্ধ করতে হবে এবং প্রাথমিকভাবে ৭২ ঘন্টার যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে; ৩. প্রাথমিক যুদ্ধবিরতি অবস্থা চালু হওয়া মাত্রই পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন অবস্থান থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে হবে; ৪. পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক যারা এখানে আছেন তারা পশ্চিম পাকিস্তানে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের নাগরিক যারা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে আসতে চায়, তাদেরকে জাতিসংঘের নেতৃত্বে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। কারো উপর বলপ্রয়োগ করা যাবে না; ৫. ৭২ ঘন্টার মধ্যে পাকিস্তানি বাহিনী তাদের সৈন্যসংখ্যা গুটিয়ে নেওয়ার সাথে সাথে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের স্থানান্তর প্রক্রিয়া শুরু হওয়া মাত্রই ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনীকেও পূর্ব পাকিস্তানে তাদের সামরিক অভিযান বন্ধ করে দিতে হবে; এবং ৬. যুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে পাকিস্তান ও ভারত সরকার যে সমস্ত এলাকা দখল করেছে তা নিয়ে উভয় দেশের মধ্যে নীতিগতভাবে আলোচনা করতে হবে যাতে ঐ এলাকা কেউ দখলে না থাকতে পারে।[৯১] ১৪ই ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের বৈঠক শুরু হলে কোনো ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব হয়নি। ফলে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্য দেশগুলো স্ব-স্ব দেশের সরকারের নির্দেশের জন্য পরবর্তী দিন পর্যন্ত সভা মুলতুবি করার আহ্বান জানান।

সিরিয়ার খসড়া প্রস্তাব : ১৫ই ডিসেম্বর। ১. পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত সকল রাজবন্দিকে মুক্তি দেওয়ার উপর গুরুত্বারোপ করেছে; ২. সকল ফ্রন্টে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ করা; পাকিস্তান ও ভারত স্বীয় সীমান্ত এলাকা এবং জম্মু কাশ্মীরের নিয়ন্ত্রণ রেখা বরাবর তাদের সৈন্য প্রত্যাহার করে নেবে; ৩. মহাসচিবকে অতি শীঘ্রই একজন বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণের অনুরোধ করা হচ্ছে, যার দায়িত্ব হবে- উপরোক্ত কার্যক্রম পরিচালনা করা। পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও পশ্চিম পাকিস্তান সরকারের মধ্যে রাজনৈতিক সমাধানের লক্ষ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে কাজ করবেন। শরণার্থীদের স্বেচ্ছাপ্রত্যাবর্তনের উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবেন; এবং ৪. মহাসচিবকে অনুরোধ করা হচ্ছে। তিনি যেন এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের কাউন্সিলকে তাগিদ দেন।[৯২]

ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্যের খসড়া প্রস্তাব: ১৫ ডিসেম্বর। মানবজীবন রক্ষার্থে এবং ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের প্রতিফলন ঘটাতে তাদের প্রস্তাব নিম্নরূপ: ১. ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে স্থায়ী যুদ্ধবিরতি এবং পশ্চিমাঞ্চলে সকল যুদ্ধাঞ্চলে সংঘর্ষ বন্ধে একই সাথে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি এবং সকল পক্ষের সংঘর্ষ এড়াতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি; ২. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধির কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের লক্ষ্যে অবিলম্বে রাজনৈতিক সমাধানের আহ্বান জানাচ্ছে; ৩. উপমহাদেশ অথবা বিশ্বের যেকোনো স্থানে নিরাপত্তা বিঘ্নিত হতে পারে এমন পরিস্থিতি হতে দূরে থাকার জন্য সকল সদস্যদের অনুরোধ করা হচ্ছে; ৪.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অসুস্থ, যুদ্ধবন্দি এবং সাধারণ জনগণের জীবনকে ১৯৪৯-এর জেনেভা কনভেনশন অনযায়ী পরিচালিত করার লক্ষ্যে সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে; ৫. দুর্গতদের জন্য ত্রাণ, শরণার্থীদের পুনর্বাসন, তাদের নিরাপত্তা, বাড়িতে ফিরে যাওয়ার মর্যাদা দেওয়ার জন্য আন্তর্জাতিক সাহায্য কামনা করছে; ৬. মানবিক সমস্যা দূরীকরণে একজন বিশেষ প্রতিনিধি প্রেরণের জন্য মহাসচিবকে আহ্বান জানাচ্ছে; ৭. এই প্রস্তাবটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের জন্য যতো শীঘ্র সম্ভব মহাসচিবকে অনুরোধ করছে।[৯৩]

সোভিয়েত-এর খসড়া প্রস্তাব : ১৫ই ডিসেম্বর। ১. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সকল সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য এবং অবিলম্বে যুদ্ধবন্ধের জন্য উভয়পক্ষকে আহ্বান জানায়; ২. পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত প্রতিনিধিগণের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে রাজনৈতিক সমাধান আনয়ন করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে; ৩. মানবজীবন রক্ষায় ও ১৯৪৯ সালের জেনেভা কনভেনশনের প্রয়োগ করার জন্য উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণে আহ্বান জানাচ্ছে; ৪. এই প্রস্তাবটি বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে পরিষদকে অবিলম্বে অবগত করানোর জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করছে; এবং ৫. সমস্ত এলাকায় শান্তি আনয়নে এই আলোচনা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।[৯৪]

এছাড়া জাপান ও ইতালি যৌথভাবে একই ধরনের খসড়া প্রস্তাব উপস্থাপন করেন। তবে এই প্রস্তাবের ৭নং অনুচ্ছেদের বৈশিষ্ট্য ছিল ভারত এবং পাকিস্তানের সম্মতিক্রমে সাংঘর্ষিক এলাকায় স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য নিরাপত্তা পরিষদে ৩ সদস্যের একটি কমিটি গঠন, যারা পরিষদের প্রস্তাব ও জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী কাজ করবে।

এসব প্রস্তাব আলোচনার পূর্বে পাকিস্তানের উপ-প্রধানমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জরুরি বিবৃতি দানের জন্য পরিষদের সভাপতি আহ্বান জানান।

জুলফিকার আলী ভুট্টো ৮ই ডিসেম্বর '৭১ নিউইর্য়ক যাত্রা করেন। কূটনৈতিক তৎপরতার মাধ্যমে বাংলাদেশের অন্তর্ভুক্ত জায়গাগুলো সম্পর্কে কিছু না হলেও অন্তত যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে তা তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রয়াস চালান। যাত্রার প্রাক্কালে করাচি এয়ারপোর্টে আগত সমর্থক নেতা-কর্মীদের উদ্দেশ্যে বলেন, "আমরা থেমে থাকব না।" একই সঙ্গে তিনি জোরের সঙ্গে বলেন, প্রয়োজনে আমরা পবিত্র পাকিস্তানের মাটি থেকে ভারতীয়দের কবলমুক্ত করতে হাজার বছর যুদ্ধ করবো। ১১ই ডিসেম্বর নিউইয়র্কে ভুট্টো কিসি্ঞ্জারের সঙ্গে বৈঠক করেন। কিসিঞ্জার তাঁকে বলেন, "পাকিস্তান শুধুমাত্র চমৎকার কথা উচ্চারণের মাধ্যমে রক্ষা পাবে না। আমরা যে পাকিস্তানকে সাহায্য করব না তা নয়, বরং যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে রক্ষা ও অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য সব সময় পাশে থাকবে। আগামী ৪৮ ঘন্টা হচ্ছে সিদ্ধান্তমূলক সময়।"

১৫ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় ভুট্টো জাতিসংঘে নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য রাখেন। নিরাপত্তা পরিষদের সভাপতি জুলফিকার আলী ভুট্টোকে জরুরি বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানান। ভারতের বিদেশমন্ত্রী সরদার শরণ সিংহ বক্তৃতার পরপরই তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, "সময় শেষ হয়ে যাচ্ছে। আমি ভালো ভালো কথা বলা জন্য বা ভাষণ দেওয়ার জন্য আসিনি। আমি যা বলছি বা বলতে চাই পরিস্থিতি তার চেয়েও ভয়ঙ্কর।" বক্তব্যের এক পর্যায়ে আবেগ আপ্লুত হয়ে ভুট্টো বলেন, "আমরা অতীতের ভুলত্রুটি শুধরে নিতে প্রস্তুত। পাকিস্তান একটি আদর্শ। আমরা ফিজিক্যাল ধ্বংসের জন্য প্রস্তুত। ১২০ মিলিয়ন জনগণ শেষ হয়ে যেতে পারে তারপরও নতুন করে নতুনভাবে আমরা নতুন পাকিস্তান গড়ে তুলবো। এটা দুঃখজনক যে ভারত-পাকিস্তান আজ বর্বরোচিতভাবে পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে, একে অন্যকে নিশ্চিহ্ন করার কর্মে লিপ্ত। কিন্তু এটা অসম্ভব। পাকিস্তানের সাহসী জনগণ তাদের সম্মান, মর্যাদা ও স্বাধীনতা রক্ষার জন্য মরণযুদ্ধ করবে। এ সব বিবেচনায় তিনি বলেন, আসুন বন্ধুত্বের হাত ধরে চলি।"

ভুট্টো তার বক্তৃতা থামিয়ে তখনও বলেছেন, "বাংলাদেশের অস্তিত্ব কেবলমাত্র ভারত-সরকারের মুখে এটা কেবল তাদের মাথায় আছে, কিন্তু বাস্তবে এর কোনো অস্তিত্ব নেই।"

ভুট্টো চিৎকার করে বলছিলেন, আমরা মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত, মৃত্যুভয়ে আমরা ভীত নই। আমাদের জনগণ সাহসী। বিশ্বাস করুন, মেক্সিকো যুক্তরাষ্ট্র দখল করতে পারে, ডেনমার্ক, জার্মান, ফিনল্যান্ড সোভিয়েত ইউনিয়ন দখল করে নিতে পারে, কিন্তু ভারত কোনোভাবেই পাকিস্তান দখল করতে পারবে না। আমরা যুদ্ধ করবো, প্রয়োজনে হাজার বছর যুদ্ধ করবো। অতীতে করেছি, এখনো করবো।"

জুলফিকার আলী ভুট্টোর যুক্তরাষ্ট্র আগমনের পরপরই নিক্সন বিমানসজ্জিত পরমাণু জাহাজ ইন্টারপ্রাইজ ৭ম নৌবহরকে বঙ্গোপসাগরের দিকে যেতে নির্দেশ দেন। কিসিঞ্জার এই বলে ভুট্টোকে আশ্বস্ত করেছিলেন যে, ভারত-সোভিয়েত-এর আক্রমণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করবে। ভুট্টো যখন দ্বিতীয়বারের জন্য জাতিসংঘে ভাষণ দিচ্ছিলেন তখন পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ডার জেনারেল নিয়াজী সারেন্ডার করার জন্য ভারতের সামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট সিগন্যাল প্রেরণ করেন। বিষয়টি নিউইর্য়ক ভুট্টোর অজানা ছিল না। তারপরও বাইরে দৃঢ়তার ছাপ রেখে ভুট্টো জাতিসংঘে বলেন, পাঁচ দশ বছরের জন্য পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে নিলে কিছু আসে যায় না আমরা তা ফিরে নিয়ে আসবই। পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের অংশ।"

পাকিস্তান ভারতের বিদেশমন্ত্রী সর্দার শরণ সিংহের দিকে আঙুলি তুলে বলেন, বিশ্বাস করুন, এটা ইতিহাসের প্রাথমিক শিক্ষা যা জনগণের তা জনগণ ফিরে পাবেই। ভারতের বিদেশমন্ত্রীর প্রস্তাব বাংলাদেশ সরকারের প্রতিনিধিগণকে নিরাপত্তা পরিষদে বক্তব্য রাখতে দেওয়া হোক এবং তার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের কথা বলেছেন। এটা একটি অবাস্তব কথা। কোনো দেশই সে দেশের একটি পার্টি প্রতিনিধিকে নিরাপত্তা পরিষদে বক্তৃতা দেবার সুযোগ করে দিতে পারে না। তাহলে কোনো সময় শিখ আসবে, কোনো সময় পাঞ্জাবি আসবে বা কখন ভারত থেকেই কিছু লোক এসে বলবে আমরা বক্তব্য দিতে চাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্দার শরণ সিংহ উদ্দেশ্য করে বলেন, "আমরা শেষ পর্যন্ত, শেষ মানুষটি পর্যন্ত যুদ্ধ করব। ১৫ই ডিসেম্বর তৃতীয় এবং শেষ বারের মতো এক বক্তৃতায় ভুট্টো বলেন, ঢাকার পতন হলে কি হবে? কিংবা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের পতন হলে কী আসে যায়? কী আসে যায় যদি সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানের পতন ঘটে। জুলফিকার আলী ভুট্টোর দিশেহারা নাটকীয়তা শিষ্টাচার ছড়িয়ে যায়।

জাতিসংঘের প্রেসিডেন্টকে সম্বোধন করে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, ভারতীয় বিদেশমন্ত্রীকে 'ডিসটিংগুইসড' বলে কেন সম্বোধন করেছেন? কেমন করে তিনি ডিসটিংগুইস্ড হলেন? তার হাতে রক্ত লেগে আছে, বুকে আছে প্রতিহিংসা। আর আমি তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। আমি জনগণের প্রতিনিধি, এমনকি শেখ মুজিবুর রহমানের চেয়েও শক্ত অবস্থানে জনগণ আমাকে এনেছে। আমরা আমাদের সন্তানদের বলে যাব–তারা তাদের সন্তানদের বলে যাবে–তবুও আমরা নতি স্বীকার করব না। আবেগজড়িত কণ্ঠে জুলফিকার আলী ভুট্টো বলেন, আমরা হাজার বছর যুদ্ধ করব।[৯৫] এরপর ভুট্টো পোলান্ডের উত্থাপিত খসড়া প্রস্তাবসমূহ টুকরো টুকরো ছিঁড়ে ফেলে জাতিসংঘ ত্যাগ করেন।

অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন, পোল্যান্ড উত্থাপিত প্রস্তাব টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলার মাধ্যমে ভুট্টো যেন পাকিস্তানের দ্বিখণ্ডিত বাস্তবতার প্রতিফলন দৃশ্যমান করেন। ভুট্টোর এইসব দৃশ্য জাতিসংঘের সম্মানিত প্রতিনিধিবৃন্দ বিশেষকরে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী উপভোগ করেন। ভুট্টোর বক্তৃতার জবাবে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং ভুট্টোর যোগ্যতার প্রশংসা করে বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের মেজরিটি পার্টির নির্বাচিত নেতা হিসেবে তাঁকে আমরা সম্মান করি এবং আশা করি যে, সামরিক জান্তা জনগণের রায়ের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হবে এবং প্রতিনিধিত্বশীল সরকার গঠন হলে সমস্যার মূল কারণসমূহ দূর করে শান্তি, বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহযোগিতা সম্ভব হবে।[৯৬]

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তার বক্তব্যে বলেন, ভারত একদিনের জন্যও যুদ্ধ চালু রাখতে চায় না। ভারত শুধু আত্মরক্ষার প্রয়োজনে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েছে। তিনি সংকট ও যুদ্ধ নিরসনে তিনটি প্রস্তাব তুলে ধরেন। যার মাধ্যমে কার্যকরভাবে পরিস্থিতির মোকাবেলা করা যাবে : ক. বাংলাদেশের জনগণের অধিকার সম্পর্কে আলোচনার জন্য তাদের বক্তব্য শুনতে হবে; খ. যুদ্ধবিরতি নিস্পন্ন করার জন্য বাংলাদেশকে অংশিদার করার অধিকার তাদের রয়েছে; গ. ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচনে গণরায়ে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যা সমাধান খুঁজে পেতে হবে। এর সঙ্গে তিনি বলেন, এর ফলে বাংলাদেশ থেকে পাকিস্তান এবং ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার করা ও কার্যকর আলোচনায় উভয় দেশের ভূখণ্ড বিষয়ে সমঝোতা হতে পারে।

ঐদিন সন্ধ্যা ৭:২০টায় নিরাপত্তা পরিষদের ১৬১৫ তম বৈঠক বসে। শুরুতেই চীনা প্রতিনিধি তাঁর বক্তৃতায় পোল্যান্ডের উত্থাপিত প্রস্তাবকে আনুষ্ঠানিক ও আইনসঙ্গতভাবে পাকিস্তানকে দ্বিখণ্ডিত করার লক্ষ্যে আনীত প্রস্তাব হিসেবে অভিহিত করেন। শ্রীলংকার প্রতিনিধি (সভাপতির আমন্ত্রীত) তাঁর বক্তৃতায় বলেন যে, "শ্রীলংকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিরপেক্ষ অবস্থান থেকে সমস্যার সমাধান কামনা করে।" তাঁর মতে, এই সমাধান এরূপ হওয়া চাই যেখানে বিজয় হবে ঝামেলামুক্ত, পরাজয় হবে গ্লানিবিহীন এবং সর্বোপরি শান্তি বিরাজ করবে।

সোভিয়েত প্রতিনিধি পোল্যান্ডের প্রস্তাবকে সমর্থন জানান। সিরিয়ার প্রস্তাবে বলা হয় যে, পাকিস্তানের রাজনৈতিক বন্দিদের মুক্তি দিতে হবে যাতে তারা পূর্ব পাকিস্তানে তাদের ম্যান্ডেট কার্যকর করতে সক্ষম হয়। সিরিয়ার প্রস্তাবের অনুরূপ যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স পারস্পরিক আলোচনার পর একটি খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করে–যাতে উপমহাদেশের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের যুদ্ধবিরতির বিষয়টিকে পৃথকভাবে দেখানো হয়।

সোভিয়েত প্রস্তাবে বলা হয় যে, পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে একটি সামগ্রিক রাজনৈতিক সমঝোতার পৌঁছাতে হবে এবং একই সাথে যুদ্ধবিরতির ঘোষণাও দিতে হবে। এসব প্রস্তাব উত্থাপনের পর কোনো দেশই ভোটগ্রহণের জন্য উৎসাহ দেখায়নি। তাই ১৬ই ডিসেম্বর সকাল সাড়ে ১০টা পর্যন্ত পরিষদের বৈঠক মুলতবি ঘোষণা করা হয়।

১৬ই ডিসেম্বর দুপুর ১২:০৫টায় নিরাপত্তা পরিষদের ১৬তম বৈঠক শুরু হয়। সভাপতির প্রাথমিক বক্তব্যের পর ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী (আমন্ত্রীত) সরদার শরণ সিং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি বিবৃতি পড়ে শোনান। এতে দুটো মূল বক্তব্য ছিল :

১. ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণের মাধ্যমে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে, যার ফলে সংঘর্ষের আর কোনো কারণ নেই; ২. অতিরিক্ত রক্তক্ষয়, জীবনহানি বন্ধে পশ্চিম রণাঙ্গনে ভারতের যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হয়েছে।[৯৭] বাংলাদেশে যুদ্ধ বন্ধ হয়েছে এবং পশ্চিম রণাঙ্গনে যুদ্ধ বন্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনে করেন, নিরাপত্তা পরিষদে উদ্ভূত সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে এই সংবাদটি খুবই প্রাসঙ্গিক।

ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী কর্তৃক একতরফাভাবে যুদ্ধবিরতির ঘোষণা দেয়ার সময় পাকিস্তানের প্রতিনিধি অনুপস্থিত ছিলেন। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রস্তাবে তাদের উদ্যোগ ও তাগাদা ছিল না।

জাতিসংঘের সমস্ত পরিস্থিতি পাল্টে যায়। কিসিঞ্জার এই সময় ফারল্যান্ডের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে একতরফা যুদ্ধবিরতি মেনে নেওয়ার জন্য প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করেন। ইয়াহিয়া খান বেকায়দায় পরে যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করেন।[৯৮]

বাংলাদেশের অভ্যুদয় এবং ভারতের একতরফা যুদ্ধবিরতি ঘোষণার পরও নিরাপত্তা পরিষদে একটি ঐক্যবদ্ধ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বির্তক অব্যাহত থাকে। শেষাবধি ২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের ৭টি অস্থায়ী সদস্য দেশের উত্থাপিত প্রস্তাবটি পাস হয়ে যায়। যখন এ প্রস্তাব বাংলাদেশ বা পাকিস্তানের জন্য কোনো ভূমিকাই রাখতে পারেনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপসংহার

জাতিসংঘের বিভিন্ন তথ্য ও দলিলপত্র থেকে প্রতীয়মান হয় যে, দক্ষিণ এশিয়ার এই সংকট নিয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষ হতে পারে সে বিষয়ে প্রথমদিকে পরাশক্তিগুলোর ধারণা স্পষ্ট ছিল না। যদিও রুশ-মার্কিন স্নায়ুযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ কমবেশি দু'পক্ষে বিভক্ত, তবুও তৎসময়ে বিশ্ব পরিসরে 'দাতাত'-এর আলোচনা চলছিলো, ফলে আগ্রাসী মনোভাব স্থিত ও ভারসাম্যমূলক অবস্থায় বিদ্যমান ছিল। যার প্রেক্ষিতে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের নীতিগত ও স্বার্থগত দিকটি প্রধান হয়ে উঠছিল। তবে পরাশক্তির সর্বাত্মক ভাবনার বিষয়টি ছিল বড় ধরনের আন্তঃদেশীয় সংঘর্ষ জড়িয়ে না পড়া।

বাংলাদেশের মূল সমস্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র জাতিসংঘের প্রতি তাদের তেমন আগ্রহ ও আস্থা প্রকাশ করেননি। বরং প্রথমদিকে শরণার্থীকেন্দ্রিক তৎপরতার জটিলতা নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানের পথে যুক্তরাষ্ট্রকে জাতিসংঘের দিকে হাত বাড়াতে হয়। আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়ে যা জাতিসংঘে তাদের নানা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কর্মকাণ্ডের ভেতরে প্রতিফলিত। অন্যদিকে, সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের ঘনিষ্ট মিত্র হওয়ার ফলে এবং ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির ফলশ্রুতিতে পাকিস্তান ও ভারতের কূটনৈতিক যুদ্ধ যখন সামরিক যুদ্ধে পরিণত হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসংঘ ভেটো প্রদানের মাধ্যমে এটিই প্রমাণ করতে চেয়েছে বিষয়টি শুধু অভ্যন্তরীণ সমস্যা নয়, বাংলাদেশ সংকট 'জাতীয় মুক্তিসংগ্রাম' যা তাদের বিঘোষিত নীতি তার থেকে তারা পিছু হটবে না। শেষপর্যন্ত বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিশ্বের কূটনৈতিক বলয়কে ছাড়িয়ে সামরিক যুদ্ধের দিকে নাটকীয়ভাবে ধাবিত হচ্ছিলো এবং যা বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকির কেন্দ্রবিন্দুতে এসে দাঁড়ায়। যদিও যুক্তরাষ্ট্র লুকিয়ে (Cover) ও প্রকাশ্যে (Over) কূটনীতির মাধ্যমে পাকিস্তানের পক্ষে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে ছিল যেন পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা পুরোপুরি রক্ষা পায়। কিন্তু শেষপর্যন্ত মার্কিনী কূটনীতি এতটুকু সফল হয়েছে যে, তাদের শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের ভৌগোলিক অখণ্ডতা নিয়েই সর্বশেষ কূটনৈতিক তৎপরতায় সন্তুষ্ট থাকতে হয়।

মূলত সোভিয়েত রাশিয়ার ভেটো প্রদান ঢাকা দখলে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কূটনৈতিক তৎপরতার পাশাপাশি সামরিক ক্ষেত্রেও যুক্তরাষ্ট্র প্রেরিত সপ্তম নৌবহর মোকাবেলায় সোভিয়েত পাল্টা নৌবহর পাঠিয়ে একথা প্রমাণের চেষ্টা করে যে, যেকোনো ভাবেই হোক বিশ্বশক্তির ভারসাম্যের মাধ্যমে বৃহৎ আকারে যুদ্ধ এড়িয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে দুই পরাশক্তির ভাবনার বিষয় ছিল চীনের ভূমিকা কী হবে। সেজন্য লক্ষ্য করা যায় জাতিসংঘ বলয় ও তার বাইরে মার্কিন নীতি-নির্ধারকগণ চীনের সঙ্গে সংলাপ ও সংযোগ রেখে চলেছে। যদিও সোভিয়েত রাশিয়ার চাপে শেষ পর্যন্ত চীনের তেমন কিছু করণীয় ছিল না এজন্য যে, সোভিয়েত রাশিয়া চীন সীমান্তে ব্যাপক সেনা সমাবেশ করেছিল। সেজন্য জাতিসংঘে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রশ্নে চীনের বৈরিতা শুধু 'চেচামেচির' ভেতরে সীমাবদ্ধ ছিল। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে জাতিসংঘ চত্বরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের ভূমিকা ছিল পরিকল্পিত ও পরিপক্ক : ঢাকা দখলের সাথে সাথে ভারত স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে জাতিসংঘে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব উত্থাপনের মাধ্যমে তার ত্বরিত কূটনৈতিক বিজ্ঞতার প্রমাণ করে।

জাতিসংঘের সামগ্রিক পরিকল্পনায় শরণার্থীদের মানবিক বিষয়টি যেভাবে ক্রমান্বয়ে আলোড়িত এবং পর্যায়ক্রমে যা রাজনৈতিক সমাধানের কেন্দ্রে এসে দাঁড়ায়, তার শেষাংশে বাংলাদেশ প্রশ্নটি অপ্রত্যক্ষভাবে হলেও কূটনৈতিক তৎপরতায় প্রবলভাবে চলে এসেছে। জাতিসংঘের কার্যকর ভূমিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতার প্রশ্নটি গৌণ থাকলেও বিশ্ব কূটনৈতিক ক্ষেত্রে তা ছিল জীবন্ত, আলোড়িত এবং পরাশক্তি ও রাষ্ট্রগুলোর নিরবিচ্ছিন্ন অব্যক্ত কূটনৈতিক যন্ত্রণা। জাতিসংঘ বাংলাদেশ সংকট সমাধানে কার্যকর প্রস্তাব, ভূমিকা ও উদ্যোগ গ্রহণের পূর্বেই বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে।

পরিশিষ্ট : ১

জাতিসংঘের কাঠামো

Structure of the United Nations		
Principal Organs	**Member and Voting**	**Responsibilities**
Security Council	15 members; 5 permanent with veto; 10 rotating on substantive issues	Peace and security; identifies aggressor; decides on enforcement measures
General Assembly	185 members; each state has one vote; work in 6 functional committees	Debates any topic within charter; admits states; elects member to special bodies
Secretariat headed by Secretary General	Secretariat of 15,000; elects secretary-general for 5 years renewable term	Secretariat: gathers information, coordinates, and conducts activities Secretary-General; chief administrative officer, spokesperson
Economic and Social Council (ECOSOC)	54 members elected for 3-year terms	coordinates economic and social welfare programs; coordinates action of specialized agencies (FAO, WHO, UNESCO)
Trusteeship Council	Originally composed of administering and non-	Administers and supervise self-garment territories only the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

	administering countries; now comprises 5 great powers	Trust Territory of the Pacific Islands remains
International Court of Justice	15 judges	Noncompulsory jurisdiction on cases brought exclusively by states

Karen Mingst (University of Kentucky), *Essentials Of International Relations*, W.W. Norton & Company. 1998, Pu. 248.

পরিশিষ্ট : ২

১৯৭১ সালের ১২-২১ ডিসেম্বর নিরাপত্তা পরিষদের বিতর্কের সারসংক্ষেপ

A SHORT NOTE ON DISCUSSIONS AT THE SECURITY COUNCII

December 12 to 21, 1971

The Security Council considered the situation in the Indian sub-continent again from December 12 to 21, 1971. A draft resolution tabled by the U.S.A. for an immediate cease-fire and withdrawal of armed forces was vetoed by the U.S.S.R. on December 13, 1971. Meanwhile, the situation in the sub-continent changed with the fall of Dacca and India's position in the U.N. circles. The recognition of cease-fire in the western sector, following the unconditional surrender by Pakistani military occupation forces in Dacca on December 16, 1971, confirmed the repeated assurances given by India that it had no territorial designs on Pakistan. Pakistan's attempt to collect signature to take the whole issue back to the General Assembly failed as it was able to collect only 23 signatures out of 104 countries which had earlier voted for the General Assembly Resolution. This was clearly indicative of the understanding of the realities of the situation in Bangladesh by the Members of the United Nations.

The Security Council was eventually able to adopt a Resolution on December 21, 1971 which took note of the unilateral declaration of cease-fire by India in the weltern sector and Pakistan's agreement thereto with effect from December 17, 1971, and demanded that 'a durable cease-fire and cessation of all hostilities in all areas of conflict be strictly observed and remain in effect until withdrawals take place, as soon as practicable, of all armed forces to their respective territories and to positions which fully

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

respect the cease-fire line in Jammu and Kashmir supervised by the United Nations Military Observer Group in India and Pakistan'. The Voting was 13 in favour, none against and 2 abstentions.

পরিশিষ্ট : ৩

জাতিসংঘের মহাসচিবের নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরাষ্ট্রের সরকারপ্রধানদের নিকট পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের আবেদন পত্র

Distr.
GENERAL
A/8641
S/10468
22 December 1971

GENERAL ASSEMBLEY
SECURITY COUNCIL
Twenty-sixth session
Twenty-sixth year
Agenda item 102
QUESTION CONSIDERED BY THE SECURITY COUNCIL AT ITS 1606TH, 1607TH AND 1608TH MEETINGS, ON 4, 5 AND 6 DECEMBER 1971

Letter dated 21 December 1971 from the Permanent Representative of Pakistan to the United Nations address to the Secretary-General

Under instructions of my Government, I have the honor to forward to you the enclosed letter from the President of Pakistan.*

(Signed) A. SHAHI
Permanent Representative of Pakistan
to the United Nations

* Circulated to the members of the General assembly and the Security Council in accordance with a note verbale dated 22 December 1971 from the Permanent Representative of Pakistan.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Pakistan Mission to the United Nations
21 December 1971
Excellency,

I have today addressed the following earnest appeal to Heads of State of Government of the countries that are the members of the Security Council. I am sure that this appeal will have your whole-hearted support and that you would use your influence in impressing upon the Security Council the need of most urgent action to stop the carnage and human suffering in East Pakistan.

Your Sincerely,
Zulfikar Ali BHUTTO
President of Pakistan

His Excellency U Thant
Secretary-General of the
United Nations
New York

TEXT OF APPEAL TO HEADS OF STATE OR GOVERNMENT OF COUNTRIES THAT ARE MEMBERS OF THE SECURITY COUNCIL

Excellency,

1. It is with a very heavy heart that I address this, my first message to you, for your assistance to alleviate human suffering.
2. News from Dacca is grim. Reports from independent sources, which must have reached you by now, speak of inhuman atrocities and mass murders of innocent people in a part of Pakistan which is now under India's military occupation. To say that these killings and atrocities are being perpetuated by the so-called 'Mukti Bahini' does not, and cannot, absolve India of its responsibility to ensure the safety of life and property of the people. The commanding General of India has publicly stated that the 'Mukti Bahini' and all other forces now in East Pakistan are under his effective command.
3. What is happening in Dacca is by no means an isolated affair. Reports of similar incidents are being received from other cities in East Pakistan also.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

4. News of this indiscriminate carnage has been receive with the gravest concern therefore, addressing this earnest appeal to you on behalf of the people of Pakistan, and on my own behalf, to use your influence with India most urgently to prevent further carnage. Otherwise that province might soon be engulfed in a wide-spread blood-bath.
5. My Government has already approached the International Red Cross, which has sent some personnel and supplies to Dacca. The need of the hour, however, is for Red Cross presence in greater strength, for assistance by way of medicines and field hospitals in a more massive form. Apart from requesting the International Geneva Conventions, my Government has also enlisted the support of other friendly Governments to lend their weight in moving the Red Cross and also to take action themselves through humanitarian organizations.
6. An urgent appeal to India by all permanent members of the Security Council and action by them individually in pursuance of these humanitarian objectives would go a long way in bringing peace to that strife-torn land.
7. I would in particular impress on you immediately to approach the Government of India to take effective measures with all the means at their command to ensure that this carnage stops without loss of time.

I avail of this opportunity to renew to Your Excellency the assurances of my highest consideration.

Zulfikar Ali BHUTTO

পরিশিষ্ট : ৪

জাতিসংঘে লিবিয়ার প্রতিনিধির মহাসচিব বরাবর লিখিত পত্র

Document S/10460*

Letter dated 16 December 1971 from the representative of the Libyan Arab Republic to the Secretary-General

[16 December 1971]

Upon the instructions of my Government, I have the honor to convey to you my Government's deep concern at the bloodshed and destruction

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

caused by the Indian aggression against Pakistan.

The failure of the United Nations to exercise its responsibilities in bringing to an end the aggression by one Member State against another, in spite of General Assembly resolution 2793 (XXVI) of 7 December 1971, adopted by an overwhelming majority of the States Members of the United Nations, and in spite of the repeated efforts of the majority of the members of the Security Council, constitutes a direct and grave challenge to the principles of the Charter of the United Nations, to international law and to humanity as a whole.

The situation that existed in the eastern part of Pakistan was not without its mistakes, as was acknowledged by the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs of Pakistan in his statement of 15 December 1971 before the Security Council [resumed 1614th meeting]. These mistakes and the flow of refugees to India could not constitute a justification for a premeditated and executed full-scale invasion by the forces of a neighboring State of Pakistan. This practice, if allowed to succeed with impunity, will undoubtedly jeopardize the course of normal relations among States and will constitute an open invitation to every State to interfere in the internal affairs of others.

The allegations by India that the international community did nothing to alleviate the sufferings of the refugees are unfounded. It was India who rejected he Secretary-General's proposal. For, while the international community, including my Government, contributed hundreds of millions of dollars for the refugees, India imposed severe limitations on the work of international relief organizations. And, despite the promising discussions that were under way between Pakistan and certain other Government to rectify the situation in the eastern part of Pakistan, India showed that its goal is the dismemberment of Pakistan by military invasion, and not a solution to the problem by peaceful means, as required by the Charter.

It is regrettable that India, which has no many occasions been militant in its support of the principles of the Charter and international law, has become militaristic and aggressive, not only in its designs and pronouncements, which contributed greatly to the creation of the present tragedy, but in its armed and brutal invasion of Pakistan.

While the General Assembly and the Security Council were rendered ineffective and paralysed, tens of thousands of men, women and children

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

DPA reported from Dacca on 20 December: "The 'Mukta Bahini' (meaning the East Pakistan rebels under the eastern command of the Indian army—ed.) are rampaging on a merciless purge against the people they term 'Razakars'—collaborators".

The report said that six alleged "Razakars" were beaten up before foreign journalists, and when the Pakistan men were helpless and semi-conscious on the ground, the "Mukti Bahini" massacred them with bayonets as they lay there. 'The dead are everywhere in the streets of this town, probably one of the ugliest places in the world', it added.

Sarian, correspondent of the "Indian Express", also disclosed in a report from Dacca on 21 December the large-scale massacre of the East Pakistan people in Dacca.

A foreign news agency quoted his report as saying that 'in a period of 48 hours he had counted 70 bodies of West Pakistanis in just one area of the East Pakistan Capital'.

On 18 December, the third day of the invasion of Dacca by the Indian aggressors, some East Pakistan rebels held a meeting of some 5,000 people at the race course of Dacca to see the bloody execution of four Pakistan people by bayonets without specific charges. The executors clamored that it was a warning to those who refuse to submit. The bloody incident aroused immense indignation from many of the witness. It was reported that a Pakistan youth just returned to Dacca from abroad said, "I don't think they should have been so brutal."

In Khulna, south-western East Pakistan, the Indian aggressors and the East Pakistan rebels under their command, started massive arrests and slaughtering of the local people. An AFP report from khulna on 20 December said that the Bihari District of the town was deserted. Four thousand people have been arrested by the Indian aggressor troops. Some were killed and many have gone into hiding with their weapons.

Reports also disclosed that terror reigns in a number of cities of East Pakistan including Sylhet and Mymensing. End Item.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তথ্য সংকেত

১. প্রেসিডেন্ট নিক্সন-এর জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা হেনরী কিসিঞ্জারের ৭ই ডিসেম্বর '৭১-এর সাংবাদিক সম্মেলন। দ্রষ্টব্য: Congressional Record- Senate, S21012/ December 9, 1971.

২. Minutes of Senior Review Group Meeting, *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976,* Volume XI, South Asia Crisis, 1971, p. 24-25, /1, Source : National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California.।

৩. "Authorize the UN to intervene in matters which are essentially within the domestic jurisdiction of any state" (Article 2, Section 7.), জাতিসংঘ সনদ।

৪. জাতিসংঘ সনদ, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ৪

৫. ঐ

৬. *Bangladesh Documents*, Vol. II.

৭. *দৈনিক প্রথম আলো*, বিজয় দিবস সংখ্যা, ১৬ ডিসেম্বর, ২০০০। *(বাংলাদেশের অভ্যুদয় ও জাতিসংঘ*, আশফাক হোসেন, বাংলা একাডেমী, ২০০২, পৃ.২৪৮-২৪৯)

৮. Politics beyond the State: international institutions
"As for the Security Council, the potential world 'Government', at least the institution of Permanent Members (the US, China, Russia, Britain, France – each with a veto over any decision by the Council) has the merit of political realism, in that the UN cannot be expected to act effectively without Great Power agreement. Alas, until the 1990s. This meant virtually all effective action by the UN was stillborn.", Stephen D. Tansey, *Politics The Basics,* Routledge, 1995, p. 41-42.

৯. পূর্ব বাংলার পরিস্থিতি সম্পর্কে জাতিসংঘের কার্যধারার উপর প্রণীত বার্ষিক প্রতিবেদনে মহাসচিবের মুখবন্ধের অংশবিশেষ। *জাতিসংঘ ডকুমেন্ট*, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১

১০. *UN Yearbook 1971,* p. 144. "A conflict between the principles of the territorial integrity of States and of self-determination was involved, which had often before given rise to strife."

১১. *Ibid,* "Should now play a more forthright role to avert further deterioration of the situation. The Security Council, he said, was in a position to consider what measures might be taken; such consideration might take place formally or informally, in public or in private. The Secretary-General observed that his memorandum was meant to provide a basis for discussions on this matter."

১২. মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, ঢাকা: ইউ.পি.এল. ২০০৪, পৃ. ৮।

১৩. জাতিসংঘ ডকুমেন্টস। পাকিস্তানের সরাসরি প্রত্যাখ্যান সত্ত্বেও মহাসচিব ২২ এপ্রিল দ্বিতীয়বারের মতো মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য প্রসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে পত্র লেখেন। এ পত্রের পুরো বক্তব্য ১২ মে জাতিসংঘ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করে। এতে মহাসচিব পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ইয়াহিয়াকে জানান যে, ২৫ মার্চের ক্র্যাকডাউনের পর ঢাকা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে জাতিসংঘের যে সকল কর্মকর্তা ফেরত এসেছেন তাঁদের মাধ্যমে এবং বিভিন্ন সূত্র থেকে তিনি পরিস্থিতির নেতিবাচক প্রবণতা সম্পর্কে অবহিত হয়েছেন। তিনি জাতিসংঘ সনদের ধারা ২(৭) সম্পর্কে তাঁর আস্থা পুনর্ব্যক্ত করে করে বলেন যে, ভবিষ্যতেও এটি সমুন্নত রাখতে তিনি কাজ করে যাবেন। তবে জাতিসংঘের কাঠামোতে মানবাধিকারের যে নীতিমালা রয়েছে তার প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে জানান যে, পাকিস্তানের সম্মতি পেলে জাতিসংঘ এবং তার বিশেষায়িত সংস্থাগুলো একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে। তিনি আরও জানান যে, সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে দুর্গতি ও মানবিক বিপর্যয়ের মুখে পড়েছে তার সহায়তায় জাতিসংঘ ভূমিকা রাখতে পারে।

১৪. জাতিসংঘ সনদ, ধারা-২, অনুচ্ছেদ-৭, পৃ. ৪। "বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিছক অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোনো সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না; কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।"।

১৫. জাতিসংঘ ডকুমেন্টস্, জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর পাকিস্তান প্রেসিডেন্টের পত্র দ্রষ্টব্য। মহাসচিব সম্পূর্ণ মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে জাতিসংঘের সকল সংস্থার পক্ষ হতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের জন্য তাৎক্ষণিক ত্রাণ প্রেরণের প্রস্তাব দেন। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ৩ মে প্রেরিত পত্রে মহাসচিবকে এর জন্য স্বাগত জানান এবং বলেন, যেসব বিদেশি ও জাতিসংঘের বিশেষ প্রজেক্ট কর্মকর্তা পাকিস্তান ত্যাগ করেছিলেন তাঁরা পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে তাঁদের কাজ আবার শুরু করতে পারেন। কিন্তু তাদের পাকিস্তানের সংস্থাগুলোর মাধ্যমে কাজ করতে হবে।

১৬. ২৩ জুন, ১৯৭১, জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, "However while the building of Reception Centers the Dectaration of an Amemnesty an appeal by the Pakistan President for return were excellent these were not enough perse to bring about the return of refugees. In all cases of refugees he said what brought people back was political solution.

১৭. ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ হয়। যুদ্ধ মীমাংসার জন্য সোভিয়েত রাশিয়া উদ্যোগ গ্রহণ করে। দেশটির মধ্যস্থতায় যুদ্ধরত উভয় দেশ তাসখন্ডে 'যুদ্ধ নয় শান্তি' এবং বন্ধুত্বপূর্ণ সহাবস্থানের সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়।

১৮. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট। জাতিসংঘের ২৬তম সাধারণ পরিষদ অধিবেশনে ১৭ সেপ্টেম্বর উত্থাপিত বার্ষিক প্রতিবেদনে জাতিসংঘের মহাসচিব উল্লেখ করেন–"The basic problem can be solve only if a political solution based on reconciliation".

১৯. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, ৫ মে ১৯৭১, জেনেভায় সাংবাদিক সম্মেলনে জাতিসংঘ শরণার্থী বিষয়ক হাই কমিশনার স্বীকার করেন যে, কমিশন অরাজনৈতিকভাবে মানবিক সহায়তা প্রদান করছে; কিন্তু সমস্যাটি 'রাজনৈতিক'।

২০. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, ১২ মে ১৯৭১, জাতিসংঘ বিবৃতি, ভারতীয় প্রতিনিধি সমর সেন বক্তব্যের শেষ পর্যায়ে বলেন, "The large-scale masacre, senseless killings of unarmed civilians, including women and children, brutalities and atrocities committed no a massive scale, widespread burning and destruction of property and the mulitude of indignities inflicted on the people of East Bengal constitute a problem of such magnitude that international conscience must be roused and international effort must be made to restore some semblance of civilised existence in this part of the world".

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২১. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, ১৭ মে ১৯৭১
২২. ঐ
২৩. ঐ, ৫ জুলাই ১৯৭১, "Indeed the Council may wish to consider whether these considerations do not call for an upward revision of the very modest proposals contained in my report।"
২৪. ঐ, ১৬ জুলাই ১৯৭১
২৫. ঐ, ২০ জুলাই ১৯৭১
২৬. ঐ, ৫ অক্টোবর ১৯৭১
২৭. Moreover, humanitarian relief needs were increasing, hampered by the lack of substantial progress towards a political solution based on reconciliation and the respect of humanitarian principles. *UN Yearbook 1971*, **p.** 139.
২৮. *Ibid*, p. 140.
২৯. Telegram dated Augest 10, 1971 from International Commission of Jurists, Geneva, to President Yahya Khan, Ref. 2/103/2, NMD/ks, "I am deeply concerned about the possible-consequences of the present situation, not obly in the humanitarian sense, but also an a potential threat to peace and security and for its bearing on the future of the United Nations as an effective instrument for international co-operation and action."
৩০. *Ibid*, p. 140. The refugees would only return in significant numbers when they were convinced that real peace and security prevailed in their country..
৩১. পাকিস্তান প্রতিনিধি 'রাজনৈতিক সমঝোতা' বলতে বুঝিয়ে ছিলেন, ৭০ সালে নির্বাচন বাতিল, একটি উপনির্বাচন এবং সেই নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে অখণ্ড পাকিস্তান রক্ষায় সমঝোতা স্থাপন।
৩২. *Ibid*, p. 140. As for the need to arrive at a political solution to resolve the internal crisis, the objective should be attained before the end of the year, but the nuture of the solution was the sole responsibility of the Government of Pakistan.
৩৩. *Ibid*, p. 140. India, which was looking after millions of Pakistan refugees on behalf of the international community, could not allow that situnation to continue indenfinitely. There was no appreciable progress towards political reconciliation, the principal cause being gross violation of basic human rights amounting to genocide, with the object of stifling the democratiocally expressed wishes of a people. India considerd that the problem had to be solved in East Pakistan by the Pakistan Government and that it must not be transformed into a dispute between India and Pakistan,
৩৪. UN Yearbook 1971, p. 140. "A number of representatives urged their colleagues to avoid introducing political considerations in the discussion of purely humanitarian problems",
৩৫. *Ibid*, "France felt it was essential to arrive at a peaceful solution of the political problem, which was the only way to put an end to the suffering of the

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

population".

৩৬. *Ibid,* "While it was clear that the causes of the problem were political and that a political solution would have to be found".

৩৭. *Ibid,* "The inalienable rights of the people of East Pakistan must be recognized".

৩৮. *Ibid,* "If the territorial integrity of Pakistan was in jeopardy, it was due to the actions of that country's Government".

৩৯. *UN Yearbook 1971,* p. 141. "The problem could be solved only by peaceful negotiations between the military leaders of West Pakistan and the elected leaders of East Bengal; the release of Sheikh Mujibur Rahaman shuld be the first step towards the opening of such negotiations."

৪০. ১৩ অক্টোবর, ১৯৭১, জাতিসংঘ ডকুমেন্ট

৪১. ঐ. ১৮ নভেম্বর, ১৯৭১

৪২. ঐ, ১৮ ও ১৯ নভেম্বর, ১৯৭১

৪৩. ঐ, ২২ নভেম্বর, ১৯৭১, জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের তৃতীয় কমিটি কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে গৃহীত ৩য় অনুচ্ছেদ " That the only solution to this grate refugee problem is the safe return of the refugees to their homes, and that this requires a favorable climate which all persons of good will should work to bring about in a spirit of respect for the principles of the Charter of the United Nations." ।

৪৪. ঐ, ৬ ডিসেম্বর ১৯৭১, তৃতীয় কমিটির প্রতিবেদনের উপর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক গৃহীত ৫এর ৩য় ধারায় বলা হয়েছে, ÒThat the only solution to this grave refuge problem is the safe return of the refugees to their homes and that this requires a favorable climate which all persons of goodwill should work to bring about in a spirit of respect for the principles of the Charted of the Charter of the United Nations."

৪৫. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রদত্ত মহাসচিবের পত্র।

৪৬. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট। "I farther recommended that U.N. Observer on both sides of borders should oversee the withdrasal we surprise the maintenance of peace". জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর লিখিত পত্র।

৪৭. ঐ, ১৯ জুলাই, ১৯৭১, "One possible method doing this might be to establish a limited representation of the High Commissioner for Refugees on both sides of the border. The High Commissioner for Refugees is already acting as a focal point for the United Nations effort on behalf of these refugees. The representatives of the High Commissioner would be stationed at cllecting points on the Indeian side, at border crossing points on both sides, and in reception centers on the Pakistan side."

৪৮. ঐ, ২ আগস্ট, ১৯৭১, "An improved political atmosphere in East Pakistan is an indispensable pre-requisite for the return of the refugees from India. The conflict between the principles of territorial integrity of States and self-determination is particularly relevant in the situation prevailing in East Pakistan where the majority of the population is being suppressed by a minority military

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

regime which has last year and had launched a campaing 75 million people. Unless this basic cause for the influx of refugees into India is removed, all attempts to solve this problem by unrealistic experiments are bound to failt."

৪৯. *UN Yearbook 1971*, p. 145, "The problem, which involved the rights and the fate of the people of East Bangla, could only be resolved by peaceful negotiations between the military rulers of West Pakistan and the elected leaders of East Bengal."

৫০. হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, বাংলাদেশ স্বাধীনতাযুদ্ধ, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৮২১। "The root of the problem is the fate of the seventy-five million people of East Bangal and their inalienable rights. This is what must be kept in mind, instead of the present attempt to save the military regime. To side track this main problem, and to convert it into an Indo-Pakistan dispute, can only aggravate tensions."

৫১. *Ibid*, p. 145, However, under he circumstances, there did not seem to be a basis for the exercise of his good offices since this would require the consent and co-operation of both parities".

৫২. *UN Yearbook 1971*, p. 146.

৫৩. জাতিসংঘ সনদ, ধারা ৯৯। "যদি সেক্রেটারি জেনারেল কোনো বিষয় আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিস্বরূপ বলে বিবেচনা করেন, তবে তিনি তা নিরাপত্তা পরিষদের দৃষ্টিগোচর করতে পারেন"।

৫৪. সেই লক্ষ্যে- ১. গেরিলা যুদ্ধ জোরদার করার লক্ষ্যে কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ এবং তাদের ট্রেনিং-এর জন্য সামরিক বিশেষজ্ঞদের নির্দেশ প্রদান; ২. ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে সর্বাত্মক প্রস্তুতি নেওয়ার চূড়ান্ত নির্দেশ প্রদান; ৩. অবিলম্বে বিদেশে বাংলাদেশ থেকে আগত শরণার্থীদের দুঃখ-দুর্দশা তুলে ধরা এবং বাংলাদেশ প্রশ্নে বিশ্ব জনমত গঠন; এবং ৪. সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের বিচার বন্ধ এবং তাঁর মুক্তি এবং তাঁর সঙ্গে আলোচনা করে উপমহাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতির নিরসন।

৫৫. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond, Indo-Bangladesh Relations*, Dhaka: 2001, P. 85.

৫৬. "Is there any peace when a whole people are massacred? Will the world be concerned only if people die because of war between two countries and not if hundreds of thousands are butchered and expelled by a military regime waging war against the people". *A New History of India*- Stanley Wolpert, p. 402-3.

৫৭. J.N. Dixit, *Liberation and Beyond*, *op.cit.*. p. 110.

৫৮. ২৯ নভেম্বর পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর পত্র দেন।

"The Parmanent Representative of Pakistan conveyed to the Secreatry-General a massage from the President of Pakistan as follows: "I have the honour to convey the following massage from the President of Pakistan to Your Excellency. This message was received yestareday and was orally conveyed to Under Secretary-General Roberto Guyer at 9pm. last night. Begins:

Excellency,

As you will have seen from my letter of 23rd November, a grave situation

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

prevails at present on the borders of East Pakistan as a result of unprovoked and large-scale attacks by the Indian armed forcees. As Your Excellency is aware, while accepting your office of good officees I had proposed a simultaneous withdrawal of Indian and Pakistani forces and suggested that may be supervised by UN. Obviate a threat to peace and to arrest the deteriorating situation, I now request Your Excellency to consider stationing a force of UN. observers on violations of our territory.

General Agha Muhammad Yahya Khan

Presedent of Pakistan.

Ends"

৫৯. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, Report of UN Secretary, General Relaling to situation in East Pakistan to the Security Council, S/10410, December 1971.

৬০. *American Secret Documents, Foreings Relations 1969-1976,* Volvot XI, South Asia Crisis, 1971, p. 24-25, Minutes of Senior Review Group Meeting/1, National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California.

৬১. *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্র,* ত্রয়োদশ খন্ড, পৃ: ৮৬৯-৮৭০।

৬২. Bangladesh Documents, Vol. ii, P.219, সাধারণ পরিষদের সভাপতি জনাব আদম মালিক সংবাদ সম্মেলনে এ-সম্পর্কিত এক মন্তব্যে মানবিক কারণ'কে বড় করে দেখেছেন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দু'দেশের সমস্যা সমাধানে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট আবেদন করেন।

৬৩. *Bangladesh Documents,* Vol. II, p. 489-90. পেরুর প্রতিনিধি প্রথম খসড়া প্রস্তাবে বলেন, "To cope with the effects and ignore the cause is a half-measure" পরের সংশোধনীতে বলেন, First cease-fire and at a subsequent stage adoption of measures to deal with the questions that have led to the outbreak of hostilities."

৬৪. *Bangladesh Documents,* Vol. II, p. 516. "There is a battle between Indian soldiers and Pakistani soldiers brought about by Pakistani aggression, and a battle between the Mukti Bahini and Pakistan soldiers brought about by Pakistani repression. What this draft resolution tends to do is to stop one kind of battle and leave the repression part, resistance part alone. This obviously will not work."

৬৫. UN Doc, S/10415. At the heart of these developments lies the war which has been waged since 25 March 1971 by the Government of Pakistan against 75 million people of Bangladesh, formerly East Pakistan. Despite the full reports which have been appearing in the international press regarding this neighbouring territiories of India and consequent international tension, the United Nations had not addressed itself so far to this basic problem, nor has it so far taken into account the party most concerned in this tragic and dangerous crisis namely, the 75 million people of Bangla Desh. There can be no proper evalution of the present situation, its causes, present state and furture solution, without Bangla Desh being given a hearing.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৬. ৪ ডিসেম্বর, জাতিসংঘ ডকুমেন্ট। *UN Yearbook 1971*, p. 147। ৪ ডিসেম্বর ১৯৭১ শুরু হয় নিরাপত্তা পরিষদের ১৬০৬ তম অধিবেশন। অধিবেশনে ভারত ও পাকিস্তানের প্রতিনিধিদের বক্তব্য প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। প্রথমে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত আগা শাহী তাঁর দীর্ঘ বক্তৃতায় ভারতের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদের ২(৪) ও ২(৭) ধারা লঙ্ঘনের অভিযোগ করেন। অন্যদিকে ভারতের স্থায়ী প্রতিনিধি, রাষ্ট্রদূত সমর সেন পাকিস্তানি প্রতিনিধির উদ্দেশ্যে বলেন যে, তিনি সামরিক সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন না এবং তাঁর প্রতিপক্ষ মূল সমস্যা এড়িয়ে ভারতকে অযথা অভিযুক্ত করছেন।

৬৭. *UN Yearbook 1971*, p. 147. India, he said, wished to give a very serious warning to the Security Council that it would not participation of the people of East Bengal and opperession. The question of a cease-fire was not bone between India and Pakistan but between the Pakistan army and the people of Bangladesh.

৬৮. *Ibid*, মার্কিন প্রতিনিধির ৭ টি পয়েন্ট সংবলিত প্রস্তাব : ১. যুদ্ধবিগ্রহ অবসানে ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে আহ্বানব জানানো যাচ্ছে; ২. ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে নিজস্ব সেনা প্রত্যাহারের আহ্বান করা যাচ্ছে; ৩. মহাসচিবের তত্ত্বাবধানে যুদ্ধবিরতি ও সৈন্য প্রত্যাহার করা হচ্ছে কিনা তা জানার জন্য এর সদস্যদের পাঠানো হোক; ৪. পূর্ব পাকিস্তানের শরণার্থী ফিরে যাওয়ার মতো পরিবেশ সৃষ্টির জন্য উভয় সরকারের কাছে অনুরোদ করা হচ্ছে; ৫. শান্তি বিঘ্নিত করে এমন অবস্থা সৃষ্টি না করার জন্য উভয় সরকারকে আহ্বান জানানো যাচ্ছে; ৬. মহাসচিব কর্তৃক ভারত ও পাকিস্তানে অফিস স্থাপনের ব্যাপারে উভয় সরকারের সম্মতি চাওয়া হচ্ছে; এবং ৭. এই ধারণাটি বাস্তাবায়িত করার জন্য মহাসচিবকে নিরাপত্তা পরিষদে রিপোর্ট পেশ করার অনুরোধ করা হচ্ছে। জাতিসংঘ ডকুমেন্ট।

৬৯. বেলজিয়াম, ইতালি ও জাপানের প্রতিনিধিবর্গের উৎকণ্ঠা নিয়ে বলেন, "এটা অনুধাবন করছি যে, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শত্রুতা ছড়িয়ে পড়ছে যা বিশ্ব শান্তি ও নিরাপত্তার হুমকিস্বরূপ।"

৭০. *Ibid*, P. 147. ১. প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উভয় সরকারের প্রতি যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেওয়া যাচ্ছে; ২. উভয় সরকারকে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের দায়িত্বশীল হওয়ার অনুরোধ করা যাচ্ছে; ৩. ঐ-সব শরণার্থীদের সাহায্যার্থে মহাসচিবকে সমস্ত রাষ্ট্রকে পূর্ণসমর্থন জানানোর আহ্বান জানানো যাচ্ছে; ৪. অবস্থা সম্পর্কে সবসময় পরিষদকে অবহিত করার জন্য মহাসচিবকে অনুরোধ করা যাচ্ছে; ৫. ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বিঘ্নিত হচ্ছে একথা বলা হয়।

৭১. *Ibid*, p. 148. The USSR subsequently introduced a draft resolution by which the Council would: (1) call for a political settlement in East Pakistan that would inevitably result in a cessation of hostilities; and (2) measures to cease all acts of violence by Pakistan forces in East Pakistan which had led to deteriration of the situation.

৭২. বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র : ত্রয়োদশ খণ্ড, ঐ, পৃ. ৮৩৬। ১. ভারত ও পাকিস্তান সরকারকে অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধের এবং নিজ নিজ সীমান্ত হতে সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানাচ্ছি; ২. মহাসচিবকে এই বিষয় সম্বন্ধে পরিষদকে সবসময় অবগত রাখার জন্য অনুরোধ করছি। ভারত-পাকিস্তানের সীমান্ত সংঘর্ষে উদ্বেগ প্রকাশ করে এবং কী কারণে এসব বৈরিতা সংঘঠিত হচ্ছে তার প্রাথমিক কারণ উদঘাটনের জন্য যুদ্ধ বিরতির প্রস্তাবনা উপস্থাপন করেন। কিন্তু অপারেটিভ পার্টে উভয় দেশের সীমান্ত থেকে অবিলম্বে সশস্ত্র বাহিনী প্রত্যাহারের আহ্বান জানান।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৩. জাতিসংঘ ডকুমেন্টস, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১। সোভিয়েত তথ্য বিভাগ প্রচারিত পুস্তিকা, ৫ ডিসেম্বর, ১৯৭১। "তাসের বিবৃতিতে ১২টি অনুচ্ছেদ রয়েছে। পাকিস্তান সরকার কর্তৃক পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বনে পরিস্থিতির অবনতি, আলোচনার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অকুণ্ঠ গণরায়কে নস্যাৎ করা, মুজিবুর রহমান, আওয়ামী লীগ নেতাদের বন্দি, হাজার হাজার মানুষকে হত্যা করা, পূর্ব পাকিস্তানের লক্ষ লক্ষ নাগরিক প্রাণ ভয়ে প্রতিবেশী ভারতে পলায়ন, ব্যাপক সন্ত্রাস, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে অত্যাচার ও নিপীড়ন এসব বিবেচনায় সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক পাকিস্তান সরকারকে অনুরোধ জানিয়ে সমাধানে গণতান্ত্রিক উদ্যোগে যে পরামর্শ দিয়েছিল তা এড়িয়ে গিয়ে সামরিক প্রস্তুতি গ্রহণ এবং ভারতের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের সশস্ত্র আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়ন নিন্দা জ্ঞাপন করবে একথাও জানিয়ে দেয়া হয়েছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে তাসের বিবৃতিতে বলা হয়, "এসব ঘটনাবলিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন উদাসিন থাকতে পারে না। কারণ, যেসব ঘটনা ঘটছে সোভিয়েত সীমান্তের নিকটবর্তী এক অঞ্চলে এবং সেজন্য তার নিরাপত্তার স্বার্থ জড়িত।"

৭৪. *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* : ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ৮৩৭-৮৩৮। এখানে দেখার বিষয় যে, ভারত পাকিস্তানের উপর বড়ো পরিসরে আক্রমণ করছে যা ভারত-পাকিস্তান তদ্‌সংলগ্ন অঞ্চলের শান্তি বিনষ্ট করছে; ২. বাংলাদেশ নামক নামসর্বস্ব একটি ইস্যু সৃষ্টি করার জন্য এবং পাকিস্তানের উপর আক্রমণের জন্য ভারতকে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি; ৩. ভারত ও পাকিস্তান উভয় সরকারকে তাদের নিজ নিজ সৈন্য প্রত্যাহারের আহ্বান জানাচ্ছি। ভারত ও পাকিস্তান শত্রুতা থেকে বিরত থাকতে এবং দ্বন্দ্ব নিরসনে উভয়ের মধ্যে শান্তিপূর্ণ বন্দোবস্তের জন্য আহবান জানাচ্ছি; এবং ৪. এই বিষয়টি বাস্তাবায়িত করার জন্য মহাসচিবকে যতো শীঘ্রসম্ভব নিরাপত্তা পরিষদে একটি রিপোর্ট পেশ করার অনুরোধ করছি।

৭৫. জাতিসংঘ সনদ, পৃ. ৪। ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৪: "আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সব সদস্য আঞ্চলিক অখণ্ডতার বিরুদ্ধে কিংবা অন্য কোনো রাষ্ট্রের রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগের ভীতি প্রদর্শন থেকে এবং জাতিসংঘের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো উপায় গ্রহণ করা থেকে নিবৃত্ত থাকবে।" ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৫: "সব সদস্য বর্তমান সনদ অনুযায়ী জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সব কর্মপ্রচেষ্টায় সর্বতোভাবে সহযোগিতা করবে এবং যেসব রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রতিষেধক বা কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করবে সেসব রাষ্ট্রকে সাহায্য প্রদান থেকে বিরত থাকবে।" ধারা ২, অনুচ্ছেদ ৬: "জাতিসংঘ-বহির্ভূত রাষ্ট্রগুলো ও যাতে আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তার খাতিরে এসব মূলনীতি অনুযায়ী কার্জ সম্পাদন করে সেজন্য সংগঠনটি সচেষ্ট থাকবে।"

৭৬. *UN Yearbook, 1971*. S/10418. USSR: draft resolution, rejected by Council on 5 December 1971, meeting 1607, by vote of 2 in favour (Poland, USSR) to 1 against (China), with 12 abstentions (Argentina, Belgium, Brundi, France, Italy, Japan, Nicaragua, Sierra, Leone, Somalia, Syrian Arab Republic, United Kingdom, United States.

৭৭. *Ibid*, S/10423. Argentina, Belgium, Burndi, Italy, Japan, Nicaragua, Siera Leone, Somalia: draft regulation, rejected by council, having received the negative vote of a permanent member, on 5 December 1971, meeting 1607, by vote of 11 in favour (Argentina, Belgium, Burndi, China, Italy, Japan, Nicaragua, Siera Leone, Somalia, Syrian Arab Republic, United States) to 2 against (Poland, USSR), with 2 abstentions (France, United Kingdom)

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭৮. *Ibid*, "The representave of Nicaragua said that if the Security Council was paralysed because of the veto, the General Assembly could take action."

৭৯. *UN Yearbook, 1971*. "The peace was defeated, the United Nations had again, faild, and arms would decide the issue."

৮০. শান্তির জন্য ঐক্য' সম্পর্কিত আলোচনা পরবর্তী পর্যায়ে দ্রষ্টব্য

৮১. S/10429, 6 December, 1971.

৮২. *Bangladesh Documents*, Vol. II, p. 339.

৮৩. *Ibid*.

৮৪. জাতিসংঘ ডকুমেন্ট, ১২ ডিসেম্বর ১৯৭১, S/10444, December 12, 1971.

৮৫. **United Nations General Assembly (UNGA) resolution 377 A**, the **"Uniting for Peace" resolution**, states that in any cases where the Security Council, because of a lack of unanimity amongst its five permanent members, fails to act as required to maintain international peace and security, the shall consider the matter immediately and may issue any recommendations it deems necessary in order to restore international peace and security. If not in session at the time the General Assembly may meet using the mechanism of the emergency special session.

The Uniting for Peace resolution—also known as the 'Acheson Plan'—was adopted 3 November 1950, after fourteen days of Assembly discussions, by a vote of 52 to 5 (Czechoslovakia, Poland, the Ukrainian Soviet Socialist Republic, the Union of Soviet Socialist Republics and the Byelorussian Soviet Socialist Republic), with 2 abstentions (India and Argentina).

৮৬. **ANNEX**

The rules of procedure of the General Assembly are amended in the following respects:

1. The present text of rule 8 shall become paragraph (a) of that rule, and a new paragraph (b) shall be added to read as follows:

"Emergency special sessions pursuant to resolution 377 A (V) shall be convened within twenty-four hours of the receipt by the Secretary-General of a request for such a session from the Security Council, on the vote of any seven members thereof, or of a request from a majority of the Members of the United Nations expressed by vote in the Interim Committee or otherwise, or of the concurrence of a majority of Members as provided in rule 9."

2. The present text of rule 9 shall become paragraph (a) of that rule and a new paragraph (b) shall be added to read as follows:

"This rule shall apply also to a request by any Member for an emergency special session pursuant to resolution 377 A (V). In such a case the Secretary-General shall communicate with other Members by the most expeditious means of communication available."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

3. Rule 10 is amended by adding at the end thereof the following:
". . . In the case of an emergency special session convened pursuant to rule 8 (b), the Secretary-General shall notify the Members of the United Nations at least twelve hours in advance of the opening of the session."
4. Rule 16 is amended by adding at the end thereof the following:
". . . The provisional agenda of an emergency special session shall be communicated to the Members of the United Nations simultaneously with the communication summoning the session."
5. Rule 19 is amended by adding at the end thereof the following:
". . . During an emergency special session additional items concerning the matters dealt with in resolution 377 A (V) may be added to the agenda by a two-thirds majority of the Members present and voting."
6. There is added a new rule to precede rule 65 to read as follows:
"Notwithstanding the provisions of any other rule and unless the General Assembly decides otherwise, the Assembly, in case of an emergency special session shall convene in plenary session only and proceed directly to consider the item proposed for consideration in the request for the holding of the session, without previous reference to the General Committee or to any other Committee; the President and Vice-Presidents for such emergency special sessions shall be, respectively, the Chairman of those delegations from which were elected the President and Vice-Presidents of the previous session."
302nd plenary meeting,
3 November 1950

৮৭. *Bangladesh Documents*,, Vol-II, p. 518. "My Government has taken not of the Resolution which the General Assembly adopted at the end of its discussion on the situation in Bangla Desh and on the Indian sub-cuntinent".

৮৮. *Bangladesh Documents*, Vol-II, P. 537. ÒThe armed forces of the new State have long been engaged in a struggle against the forces of West Pakistan in Bangla Desh. In these circumstances is it realistic to call upon India to cease-fire without, at the same time, giving a hearing to the Reprehensive of Bangla Desh whose armed forces are engaged against the forces of West Pakistan?".

৮৯. *American Sectret Documents*. পল হেমস্ এস. নয়েস, ডেপুটি অ্যাসিস্টন্ট সেক্রেটারি ফর নিয়ার ইস্টার্ন আফ্রিকান এণ্ড সাউথ এশিয়ান অ্যাফেয়ার্স। উইলিয়াম ডি পালমা। স্টেট ডিপার্টমেন্টের কর্মকর্তা।

৯০. *Bangladesh Documents*, Vol. II, p. 532-33. There is one other consideration of fundamental importance which I would like to raise. International law recognizes that where a mother State has irrevocably lost the allegiance of such a large section of its people-as represented by Bangla Desh-and cannot bring them under its sway. conditions for the separate existence of such a State come

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

into being. It is India's assessment that this is precisely what has happened in Bangla Desh.

The struggle that the people of India and the people of Bangla Desh are engaged in today, is a struggle for their territorial integrity and security; for their fundamental liberties; for the strengthening of the forces of peace; for upholding the very principles if the Charter which Pakistan is guilty of violating. This is a struggle, not merely for survival in dignity and freedom of nearly one-sixth of mankind, but for survival of the international community within the framework of international covenants and agreements which the peoples of the world have so laboriously built up after two holocausts during this century.

৯১. J.N. Dixit, *Liberation And Beyond*, *op.cit*, p. 99. "He have to ensure such a drift because his main objective was to gain sufficient time for india to bring the conflit to a decisive end without being thwarted by any Security Council decision."[১]

৯২. *Bangladesh Documents*, 14 December, 1971, S/10453, Vol-II, p. 353. যদিও প্রস্তাবটি একই সঙ্গে ১৫ ডিসেম্বর উত্থাপিত হয়।

৯৩. *Bangladesh Documents*, 15 December,1971, Vol-II, p. 356.

৯৪. *Bangladesh Documents*, 15 December, 1971, Vol-II, p. 355.

৯৫. *Bangladesh Documents*, 15 December, 1971, Vol-II, p. 557.

৯৬. "We will fight for a thousand years.. India is intoxicated today with is military successes... So you will see.. this is the beginning of the road... Today, it is Pakistan. We are your guinea pigs toeay. But there will be other guinea pigs... You want us to lick the dust. We are not going to lick the dust... I am not a rat. I have ratted in my life. I have faced assassination attempts. I have faced imprisonmments, I have always confronted crises. Today I am not ratting, but I am leaving your Security Council. I find it disgraceful to my person and my country beckons me.. You can take your Security Council," the thundered as he tore up his notes on the resoluition, tossing the paper aside. "Here you are. I am going."

৯৭. *Bangladesh Documents*, Vol-II, p. 338.

৯৮. *Bangladesh Documents*, 16 December, 1971, Vol-II, p. 345. "we have repeatedlly declared that India has no territorial ambitions. Now, as the Pakistani armed forces have surrendered in Bangla Desh and Bangla Desh is free, it is pointless in our view to continue the resent conflict. Therefore, in order to stop further bloodshed and unnecessary loss of life, we have ordered our armed forces to cease-fire everywhere on the western front with effect from 2000 hours repeat 2000 hours I.S.T. (Indian Standard Time) on Friday, the 17th repeat 17th December, 1971. It is our earnest hope that there will be a corresponding immediate response from the Government of Pakistan".

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৯. Hasan Zaheer, *op.cit*, p. 422. [যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ-এর সঙ্গে আলোচনা করে কিসিঞ্জার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, বিদ্যমান পরিস্থিতিতে পশ্চিম পাকিস্তানের অখণ্ডতা নিরঙ্কুশ করা যুক্তরাষ্ট্রের প্রধানতম কর্তব্য। সেজন্য তিনি পাকিস্তানে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্যারল্যান্ডকে নির্দেশ দেন যেকোনোভাবে হোক ইয়াহিয়া খান যেন ভারত কর্তৃক প্রস্তাবিত যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব মেনে নেন এবং এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া খানের উপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের চাপ প্রয়োগের এই নাটকীয়তা উল্লেখিত বইয়ে তুলে ধরা হয়েছে।] যেভাবে বলা হয়েছে।

"Farland: I have a request. If you are not accepting the cease-fire, please let me know. I want to evacuate the Americans.

Yahya: Why?

Farland: Pakistan is not going to be a fit place to live in if India really starts this offensive.

Yahya: Don't lose your bloody never like that.

Farland: Not as a friend but I am asking you as ambassador of my country that if you are not accepting, please let me know in time so that I evacuate Americans. Pakistan will not be a healthy place for any human being.

Farland also conveyed the American opinion that the Indians were hoping that Pakistan would refuse, so that they could come with their full might to West Pakistan.

After the US Ambassador left, Yahya asked Sultan Muhammad to draft a statement accepting the Indian offer of a cease-fire, and summoned General Hamid, Chief of Staff, Lieutenant-General Gul Hassan, Chief of General Staff, and Air Marshal Rahim Khan, C-in-C Air Force. He briefed them about his meeting with the US Ambassador and gave his opinion that was no empty American threat. All the three agreed with the President."

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অষ্টম অধ্যায়

বাংলাদেশের স্বাধীনতা : চতুর্ভূজ কূটনীতি

ভূমিকা

পাকিস্তানের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য ভারতবিরোধীতা। দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানের বৈদেশিক নীতির সূত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবে গৃহীত হয়েছে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে সুদৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন। একইসঙ্গে পাকিস্তান রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও নিরাপত্তার স্বার্থে তার পররাষ্ট্র নীতি পরিচালিত করতে হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোট বাধার আকাঙ্ক্ষায়। ধর্মের ভিত্তিতে অভ্যন্তরীণ রাজনীতি পরিচালিত হওয়ায় স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিজম বা কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের বিরোধীতা তার মৌলিক নীতি হয়ে দাঁড়ায়।

অন্যদিকে, ভারতের ঘোষিত পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম লক্ষ্য জোটনিরপেক্ষ নীতি বাস্তবায়নের একটি মডেল রাষ্ট্র হিসেবে নিজেকে বিশ্ব পরিসরে উপস্থিত করা। ১৯৬১ সালে ২২শে আগস্ট ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু অত্যন্ত জোরের সঙ্গে পার্লামেন্টে ভারতের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের প্রয়োজনীয়তা উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'সামরিক সাহায্য নেওয়ার বাস্তব অর্থ হলো এককাতারে সারিবদ্ধ হওয়া।'[১] ভারতের পররাষ্ট্র নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো পঞ্চশীল ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। পঞ্চশীল নীতিতে বিশ্বাসী শক্তিবর্গ পরস্পরের সীমানা অতিক্রম করে আক্রমণ করবে না ও অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না বলে চুক্তিবদ্ধ। পারস্পরিক সাহায্য, সহাবস্থান ও সার্বভৌমত্বকে স্বীকৃতি দান করা পঞ্চশীলের অঙ্গ।

নির্জোট আন্দোলনের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এই আন্দোলন সাম্রাজ্যবাদ ও জাতিবিদ্বেষ বিরোধী। জোটনিরপেক্ষ নীতি আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে দুই বৃহৎশক্তির প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্বে দুই শিবিরে বিভক্ত বিশ্বপরিস্থিতির ফলশ্রুতি। এছাড়া, অতীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের যুগ হতে ভারতের আন্তর্জাতিক দৃষ্টিভঙ্গির ঐতিহ্য এই নীতির দিকে পথনির্দেশ করেছিলো।

ভারত বিভক্তির পর হতেই ভারত এবং পাকিস্তান দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, আস্থাহীনতা এবং আদর্শগত কারণে পরস্পর একে অন্যের বিরুদ্ধে অবস্থান গ্রহণ করে। জন্মসূত্রের শত্রুতার পরিপ্রেক্ষিতে পাকিস্তান পরাশক্তি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিভক্ত বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং মুসলিম ভ্রাতৃত্বের নামে মুসলিম বিশ্বের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপনকে মৌলিক নীতি হিসেবে গ্রহণ করে। অন্যদিকে, ভারত পরাশক্তি বিভক্ত বিশ্বের আওতা থেকে নিজেকে মুক্ত রেখে তার পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনার সূত্র গ্রহণ করে। উপমহাদেশে এই দুই বৈরী রাষ্ট্রশক্তি জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে তাদের কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যার ফলে দু'দেশেই শত্রু-মিত্রতার ক্ষেত্রে তাদের অবস্থান পরিবর্তন করেছে। দুই রাষ্ট্রের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিলো ভারত পরিচালিত হয়েছে গণতান্ত্রিক ধারায় এবং পাকিস্তান পরিচালিত হয়েছে আমলাতন্ত্র, সামরিক চক্র এবং অগণতান্ত্রিক চক্রান্তের ঘাঁটি হিসেবে। তারপরেও ভারত তার মূল মৌলিক পররাষ্ট্র নীতিমালাকে নানাভাবে, নানামাত্রিকতায় এবং নবতর ব্যাখ্যার বৃত্তে নিজেকে আবদ্ধ করে রাখারপ্রচেষ্টা চালিয়েছে। সেই বিশ্লেষণে দেখা যায়, পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিবর্গের সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের শত্রুতা-মিত্রতার বন্ধন কখনো দৃঢ় হয়েছে কখনোবা ছিন্ন হয়েছে। 'শত্রুতা-মিত্রতা'র দাবাখেলায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পূর্বাপর ঘূর্ণাবৃত্ত চতুর্ভূজ কূটনীতিক কৌশলের অন্তর্গত দিকসমূহ যেকোনো গবেষকের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারে না।

১. জন্মেই জটিলতা

ভারত বিভক্তির সময় ও পরবর্তীকালে ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, উভয় দেশে ছিন্নমূল মানুষের ভিড় এবং কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে কয়েক দফা বিচ্ছিন্ন সংঘর্ষে দুটি দেশই অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও একে অপরের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যায়। দুটি দেশই গণতান্ত্রিক পথে অগ্রসর হতে চেয়েছে। ভারত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করে এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করে রাষ্ট্রকে একটি সাংবিধানিক ধারায় পরিচালিত করতে সমর্থ হয়। অন্যদিকে, পাকিস্তান গণতান্ত্রিক পথের অভিযাত্রায় এক বছরের মধ্যে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যু, লিয়াকত আলী খান হত্যা, কাদিয়ানি দাঙ্গা এবং শাসনতন্ত্র প্রণয়নে ব্যর্থতা রাষ্ট্রটিকে সামরিক-বেসামরিক আমলা চক্র কবজা করে ফেলে। পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় সংহতি অস্থিতিশীল ও গণতন্ত্রের অনুপস্থিতির কারণে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ শাসিত, শোষিত ও বঞ্চিত হতে থাকে। দুই অঞ্চলের গণমানুষের মৌলিক চেতনার পার্থক্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে যেমন কোনো মৌলিক আদর্শের স্থিতি অর্জিত হয়নি, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিশ্বব্যবস্থায় নিজেকে বিশ্বাস ও গ্রহণযোগ্য করে তুলতে সমর্থ হয়নি।

ভারতের পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু জোটনিরপেক্ষ নীতি সম্পর্কে বলেছিলেন যে, "এ সম্পর্কে আমার দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস আছে যে ভারতে যে কেওই ক্ষমতায় আসুক না কেন তারা এই নীতি অনুসরণের ক্ষেত্রে বিশেষ কোনো ব্যতিক্রম করবে না।" কিন্তু পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে জোটনিরপেক্ষ নীতির সঙ্গে আপোষ করতে হয়। ১৯৬২ সালের ২২শে অক্টোবর ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক সাহায্যর ব্যাপারে সম্মতি প্রদান করে।[২] যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি শর্তহীনভাবে ভারতে অস্ত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সরবরাহে সম্মত হয়। ইতোপূর্বে অবশ্য ভারত অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার জন্য ব্রিটেন ও ইউরোপ থেকে অস্ত্র আমদানি করেছে।

১৯৫৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে মিচুয়্যাল সিকিউরিটি অ্যাক্ট-এর অধীনে চুক্তিতে আবদ্ধ হয় তখন ভারত ঐ চুক্তি করতে ঘোরতর আপত্তি জ্ঞাপন করেন। কিন্তু সেই ভারতই যুক্তরাষ্ট্রের নিকট হতে অস্ত্র সংগ্রহ করতে আগ্রহী হয়ে ওঠে। যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে অস্ত্র সরবরাহ করে এই মর্মে যে, এই অস্ত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বিশ্ব শান্তি সমুন্নত রাখার স্বার্থে ব্যবহৃত হবে। ইতোপূর্বে জোটনিরপেক্ষ দেশগুলো যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র এবং অস্ত্রের সঙ্গে প্রশিক্ষণ নেওয়ার যে শর্তগুলো অপরিহার্য ছিল সে কারনে যুক্তরাষ্ট্রের অস্ত্র গ্রহণে অসম্মতি ছিলো। কিন্তু ১৯৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে চীনা সৈন্য পূর্ব সীমান্ত নেফা অঞ্চলের ম্যাকমোহন লাইন অতিক্রম করলে চীনা আক্রমণ প্রতিহত করার লক্ষ্যে নেহেরুকে নতুনভাবে কূটনৈতিক নীতিমালা মূল্যায়ন করতে হয়। ২০শে অক্টোবর লাদাখ ও নেফা এলাকায় চীন বড় ধরনের আক্রমণ পরিচালনা করে এবং বেশ কিছু অঞ্চল দখল করে নেয়।[৩] প্রথম দিনেই ম্যাকমোহন লাইনের দক্ষিণের পাহারা চৌকি কবজা করে। এই আক্রমণে ভারত প্রাথমিক পর্যায়ে বিব্রত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ে। এই সময় হতে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতে অস্ত্র সরবরাহ শুরু করলে চীন একতরফাভাবে ২২শে নভেম্বর যুদ্ধবিরতি ঘোষণা করে। চীন অনুধাবন করে যে, এই যুদ্ধে তাদের বিজয় হয়েছে এবং বিশ্ব পরিসরে তাকে নতুন মাত্রায় উপস্থিত করেছে। অন্যদিকে, ভারত বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। চীন-ভারত যুদ্ধবিরতির পর ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আহ্বানে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট কেনেডি ভারতের কী ধরনের অস্ত্র প্রয়োজন সে সম্পর্কে একটি উচ্চ পর্যায়ের টিম প্রেরণ করেন।[৪] এক্ষেত্রে পাকিস্তান ভারতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক সমরসম্ভার প্রেরণে পাকিস্তান প্রবল আপত্তি জ্ঞাপন করে। কারণ পাকিস্তানের আশঙ্কা ছিল যে, এই সকল অস্ত্র পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। পরবর্তীকালে ঘটনায় প্রমাণিত হয়েছে যে, পাকিস্তানই মার্কিন ট্যাংক ও বিমানবহর ভারতের বিরুদ্ধে ব্যবহার করেছে।

পাকিস্তান চীনা নীতি পুনর্বিন্যাস করতে বাধ্য হয় যখন যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব ভারতের দিকে ঝুঁকে যায়। প্রেসিডেন্ট কেনেডি প্রশাসন ভারতকে সরাসরি বৃহৎ আকারে অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এগিয়ে আসে যেন ভারত আর্থিক ও সামরিকভাবে শক্তিশালী হতে পারে। উপমহাদেশে সামরিক ক্ষেত্রে ভারসাম্য বিনষ্ট হওয়ার ভয়ে পাকিস্তান ভীত হয়ে পড়ে। যদিও পাকিস্তান সামরিক ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের পরীক্ষিত মিত্র। এ অবস্থায় পাকিস্তান অসন্তুষ্ট চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে এবং ১৯৬১ সালে জাতিসংঘে সাধারণ পরিষদে রাশিয়া কর্তৃক চীনের অন্তর্ভুক্তির খসড়া প্রস্তাবকে সমর্থন করে এবং চীন জাতিসংঘের সদস্য হয়। এভাবে পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ন রেখেও চীনের সাথে সম্পর্ক জোরদার করে। ১৯৬২ সালের মে মাসে চীন এবং পাকিস্তানের সীমান্ত নিয়ে আলোচনা শুরু হয়। চীন-পাকিস্তান সীমান্ত সংশ্লিষ্ট এলাকা পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে থাকবে এ বিষয়ে চীন একমত হয়। ভারত এই সমঝোতায় প্রতিবাদ করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত দাবি করে সমগ্র কাশ্মীর তাদের এবং চীন-পাকিস্তান সীমান্ত নেই। চীনের সীমান্ত এলাকা যদি পাকিস্তানের দখলে থাকে চীন তা মেনে নিলে তা পাকিস্তানেরই। কিন্তু ভারতীয় সমীক্ষায় বলা হয়, কাশ্মীরের আড়াই হাজার বর্গমাইল এলাকা পাকিস্তান চীনকে ছেড়ে দিয়েছে। এছাড়া পাকিস্তানের ১৬০০ বর্গমাইল এলাকার উপর কোনো নিয়ন্ত্রণ নেই।[৫] চীন-পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তির পর চীনের সঙ্গে পাকিস্তানের একটি ব্যবসায়িক চুক্তি এবং বিমান চলাচলের চুক্তি, বার্টার চুক্তি এবং সুদবিহীন ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার পাকিস্তানের উন্নয়নের জন্য চীন সহায়তা প্রদানে সম্মত হয়।

১৯৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে চৌ এন লাই পাকিস্তান সফর করেন এবং এর ৯ বছর পর পুনরায় চৌ এন লাই ১৯৬৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে পাকিস্তান সফরে আসেন। এ সফরটি ছিল কূটনৈতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের জন্য উল্লেখযোগ্য অর্জন। চৌ এন লাই ও আইয়ুব খান যুক্ত বিবৃতিতে আশা করেন কাশ্মীর সমস্যার সমাধান হবে কাশ্মীরের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী যা ভারত ও পাকিস্তান দুইপক্ষই মেনে নিয়েছে।[৬]

এ পর্যায়ে চীন-ভারত যুদ্ধ শুরু হলে সোভিয়েত নেতৃত্ব বিব্রতকর অবস্থায় পড়ে। এ সময় পিকিং-এ অবস্থানরত সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে চীনের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয় যে, ভারত সোভিয়েত তৈরি হেলিকপ্টার, যানবাহন ও বিমান ব্যবহার করছে। চীন কর্তৃক উত্থাপিত অভিযোগ সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ এই বলে অস্বীকার করেন যে, এটা আকাশচুম্বী কথা। এক্ষেত্রে সোভিয়েত নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ করেছে বলে জানানো হয়।[৭]

২০শে অক্টোবর ক্রুশ্চেভ চীন-ভারত সীমান্ত পরিস্থিতি নিয়ে শক্ত ভাষায় ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে পত্র লেখেন। নেহেরু ক্রুশ্চেভ বরাবর এ বিষয়ে বিস্তারিত পত্র লেখেন কিন্তু সোভিয়েত প্রাভদা চীনকে সমর্থন করে সম্পাদকীয় লেখেন। বলা হয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের সঙ্গে থাকবে। এমনকি ভারতের শাসকদের শ্রেণিচরিত্র ও আদর্শ নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করা হয়। অভিযোগ উত্থাপন করা হয়, পূর্বে যে ভারত কোনো সামরিক ব্লকে যায়নি, সাম্রাজ্যবাদী বেজ স্থাপনে অস্বীকৃতি জানিয়েছে, জোটনিরপেক্ষ ও পঞ্চশীলা ঘোষণা করেছে সেই নীতি থেকে সরে এসেছে। ভারতের বিদেশনীতি সাম্রাজ্যবাদীদের বাজারের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। শান্তিপূর্ণভাবে সমাজতন্ত্রের উত্তরণ এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের আদর্শগত অবস্থান থেকে ভারত পিছু হটে এসেছে।

এছাড়াও পর্যবেক্ষকরা বলেছেন এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন কিউবার মিসাইল সমস্যার সংকট নিয়ে ব্যস্ত ছিল এবং কোনোক্রমেই কমুনিস্ট ক্যাম্পে ভাঙন সৃষ্টি হয় এ ধরনের কোনো ঝুঁকি নেয়নি। ৩১শে অক্টোবর নেহেরুকে লেখা এক পত্রে ক্রুশ্চেভ উল্লেখ করেন, ভারতের বিষয়ে সোভিয়েতের পূর্বে যে অবস্থান ছিল তা তারা পরিবর্তন করেনি। অন্যদিকে, ডিসেম্বরে প্রেরিত এক গোপন মেমোরেন্ডাম চীনা পার্টি থেকে বলা হয়েছে ভারতের বিরুদ্ধে চীন আক্রমণ করেনি। কেবল চীনা ভূখণ্ড ফেরত চেয়েছে। তারপরেও চীনা পর্যবেক্ষণ এই যে, যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেন সাম্রাজ্যবাদীর পক্ষে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত ইউনিয়ন হাত মিলিয়েছে। সোভিয়েত সামরিক সাহায্য প্রকারান্তে চীনের বিরুদ্ধে। সোভিয়েত ইউনিয়ন চীন কর্তৃক প্রদত্ত একটি চিঠি উল্লেখ করে বলে যে, যদি চীন জানতো যে, তারা ভারতকে প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম দিয়ে যাচ্ছে তবুও তারা যুদ্ধের জন্য সোভিয়েত সাহায্য চেয়েছে। সোভিয়েতের যুক্তি ছিল তারা অস্ত্র সাহায্য এজন্য দিয়েছে ভারত যেন ব্রিটেন এবং যুক্তরাষ্ট্রের দিকে না যায়। কিন্তু বাস্তব অবস্থা হলো চীন-ভারত যুদ্ধের সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ বন্ধ রাখে এবং যুদ্ধ বন্ধ হলে পুনরায় সাহায্য শুরু করে।

১৯৬০ থেকে ১৯৬২ সাল পর্যন্ত চীনের সিনকিয়াং প্রদেশ থেকে বহুসংখ্যক কাজাখ সোভিয়েত অঞ্চলে ঢুকে পড়ে। চীন অভিযোগ করে যে এসব শরণার্থীদের অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় যারা সিনকিয়াং-এ এসে নাশকতা সৃষ্টি করে।[৮] এছাড়াও এটা পরিষ্কার যে, সোভিয়েত ইউনিয়ন সীমান্ত সংঘর্ষ নিয়ে ভারতের পক্ষে কূটনৈতিক আগ্রাসনে অবতীর্ণ হয় চীনকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য। ভারতকে সোভিয়েত ইউনিয়ন যে সাহায্য করে যাচ্ছে এটা ১৯৬২ সালের যুদ্ধের পূর্ব থেকেই পরিষ্কার ছিল এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সামরিক সাহায্য দিয়ে আসছিল চীনের সঙ্গে সংঘর্ষের বিষয়টিকে সামনে রেখে। চীন এক্ষেত্রে মনে করে ইন্ডিয়া ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষ এশিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব বিস্তারে সাহায্য করবে।

এক্ষেত্রে চীনের সঙ্গে সংঘর্ষে ভারতকে সাহায্য করার ব্যাপারে সোভিয়েত ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে একটি মৌন সমঝোতার মনোভাব পরিলক্ষিত হয় এবং এই সাহায্যের ক্ষেত্রে কারো কোনো গুরুতর আপত্তি ছিল বলে মনে হয় না। ১৯৬৪ সালের মাঝামাঝি যুক্তরাষ্ট্র চীনের ক্ষেত্রে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করে এবং ভারত তাদের নিয়ন্ত্রিত স্ট্রেটেজিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যুক্তরাষ্ট্র এটা প্রত্যাশা করে। যুক্তরাষ্ট্র সেক্রেটারি অব স্ট্রেট্স ডীন রাস্ক ১৮ই জুন গুরুত্ব সহকারে পুনর্ব্যক্ত করে যে, আর্থিক ও প্রতিরক্ষা খাতে আগামী দিনগুলোতে তারা ভারতকে দ্ব্যর্থহীনভাবে সমর্থন অব্যাহত রাখবে। সেপ্টেম্বর মাসে সিনেটর হামফ্রে যিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী তিনি এশিয়ান রাষ্ট্রগুলোর সমঝোতার ক্ষেত্রে ভারত মুখ্য ভূমিকা পালন করবে এবং যা নাকি চীনের শক্তিকে কাউন্টার ব্যালেন্স করবে।[৯]

২. চীন-ভারত কূটনৈতিক টানাপোড়েন

আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক অঙ্গনে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালের প্রথম থেকেই চীন ও সোভিয়েতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের ধারণা গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী নেহেরুর গণতান্ত্রিক ও সমাজতান্ত্রিক ভাবনার সঙ্গে সামাজিক-আর্থিক সংস্কারের ক্ষেত্রে সোভিয়েত সমর্থন প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে, চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ও উন্নয়ন অপরিহার্য ছিল। এ কারণে ভারতের পররাষ্ট্র নীতির মূল লক্ষ্য সাম্রাজ্যবাদবিরোধী জোটনিরপেক্ষ নীতির প্রতি সমর্থন আদায়, যেক্ষেত্রে কলোনিয়ান জোয়াল খসে পড়বে এবং একটি নতুন এশিয়ার স্বপ্ন উদিত হবে। যদিও ভারত একথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কখনই ভাবেনি যে চীন এক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়াবে বা চীনের দিক থেকে হুমকি আসতে পারে। বরং ভারত মনে করেছে পাশ্চাত্য বিশ্বের সঙ্গে একসঙ্গে দাঁড়ানোর জন্য চীনকে প্রয়োজন। প্রাথমিক পর্যায়ে চীনের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যা নিয়ে সমাধানের তাগিদ ভারত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেনি।

১৫ই নভেম্বর ১৯৬২ সালে চৌ এন লাই আফ্রো-এশিয়ান নেতৃবৃন্দের নিকট প্রেরিত এক পত্রে উল্লেখ করেন যে, ভারত সরকার কলোনিয়ান মনোভাবের উত্তরাধিকারী হয়ে তিব্বতে প্রভাব বিস্তার বা তিব্বতকে চীন-ভারতের মধ্যে একটি বাফার স্টেটে পরিণতি করতে চায়। পূর্ব প্রান্তে ৯০,০০০ হাজার, মধ্যভাগে ২০০০ হাজার বর্গ কিলোমিটার মাইল ভারত দখল করে আছে। ভারত আরো ৩৩ হাজার কিলো মাইল দখল করতে চায়। নেতৃবৃন্দকে জানানো হয়, এশিয়ার এই দুই বৃহৎ প্রতিবেশী সরাসরি আলোচনা ও সমঝোতার মাধ্যমে কেবল সন্তোষজনকভাবে সীমান্ত সমস্যার সমাধান হতে পারে।[১০] এর পূর্বে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বিশ্ব নেতৃবৃন্দের নিকট এক পত্রে বলেন যে, ৫ বছর পূর্বে চীন ভারতের ১২ হাজার বর্গ মাইল দখল করেছে। ১৯৬২ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর চীন হঠাৎ করে পূর্ব সীমান্ত অতিক্রম করে। ভারত এই আক্রমণ প্রতিরোধ করে এবং এক পত্রে ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, এই মুহূর্তে প্রয়োজন বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক যা উভয় দেশ ও বিশ্বশান্তির জন্য প্রয়োজন।[১১] জোটনিরপেক্ষ আফ্রো-এশিয়ান দেশসমূহ বার্মা, কম্বোডিয়া, সিংহল, ঘানা, ইন্দোনেশিয়া, সংযুক্ত আরব আমিরাত ১২ই ডিসেম্বর ১৯৬২ সালে ৬-দফা প্রস্তাব কলম্বো সম্মেলনে পেশ করে। আলোচনার ভিত্তিতে সমাধানের জন্য উভয় পক্ষকে আহ্বান জানায়।[১২]

এ সময় পিকিং রিভিউ-এর মন্তব্য প্রতিবেদনে বলা হয়, ব্রিটিশ-যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ব্যাপকভাবে সমরাস্ত্র সাহায্য করে যাচ্ছে এবং ভারতকে প্রকাশ্যে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি সমর্থন দিয়ে যাচ্ছে।[১৩] কিন্তু তখন পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় কমুনিস্ট দেশগুলো চীনের প্রকাশ্য সংঘর্ষের পরও ভারতের প্রতি তাদের বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব অক্ষুণ্ন রেখেছে।[১৪] এ সময় জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি ও চীন-ভারত সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। এই প্রস্তাবের পরিপ্রেক্ষিতে ২০শে এপ্রিল চৌ এন লাই ৫ই মার্চ নেহেরু কর্তৃক প্রেরিত পত্রের জবাবে বলেন, চীনা সরকার চীন-ভারত সীমান্ত বিরোধকে আন্তর্জাতিক মধ্যস্থতার বিষয়ে পরিণত করতে কখনো সম্মত হবে না।[১৫] বরং চীন পাল্টা অভিযোগ করে যে,[১৬] মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনে ভারত সরকার 'দুই চীন নীতি' অনুসরণ করছে। সে লক্ষ্যে ভারতের একটি প্রতিনিধি দল ও জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ তাইওয়ান সফরে গেছেন।[১৭] চীন এসময় পরীক্ষামূলকভাবে আনবিক বিস্ফোরণ ঘটায়। এর প্রতিবাদ করে লালবাহাদুর শাস্ত্রী ২৭শে নভেম্বর এসব মারণাস্ত্র তৈরি বন্ধের জন্য চৌ এন লাইকে পত্র দেন।[১৮] এই পত্রের কোনো তোয়াক্কা না করে চীন নিজস্ব পথে অগ্রসর হয় এবং ভারতবিরোধী প্রচার অব্যাহত রাখে। এই প্রসঙ্গে চীনা তাত্ত্বিক পিকিং রিভিউ পত্রিকার শিরোনামে "Non-aligned India's

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Double Alignment" প্রতিবেদন লেখেন, 'জোটনিরপেক্ষ' ভারতকে অক্টোবর ১৯৬২ সাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র ২৩০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দিয়েছে। অন্যদিকে, সাম্প্রতিক নিরীক্ষণে দেখা যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ১০০ মিলিয়ন ডলারের সামরিক সাহায্য দিয়েছে।[১৯]

পাকিস্তানের মত চীন মনে করে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক ব্যাপক সামরিক অস্ত্র সরবরাহ শেষ পর্যায়ে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হবে। এ সময় চীনা সমর্থন পাকিস্তানের জন্য জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। পাকিস্তান চীনের ভাইস প্রিমিয়ার চেং ইং করাচিতে ভারতীয় একনায়কতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে কাশ্মীর প্রশ্নে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন এবং ভারতের সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের ন্যায় সংগত সংগ্রামের প্রতি দ্ব্যর্থহীন সমর্থন জ্ঞাপন করেন।[২০] এ সময় চীন সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাবকে খর্ব করার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করে। দ্বিতীয় আফ্রো-এশিয়ান সম্মেলন অক্টোবর, ৩০ তারিখে আলজির্য়াসে অনুষ্ঠিত হয়। ৪৫টি দেশ অংশগ্রহণ করে। আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল ৬২টি দেশকে। চীন ও পাকিস্তান অংশগ্রহণ করে। প্রশ্ন ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নে অংশগ্রহণ করার অধিকার আছে কিনা। সোভিয়েত ইউনিয়ন, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুরের অংশগ্রহণের প্রশ্নে কয়েকদিন আলোচনা এবং তাদের অংশগ্রহণের প্রশ্নে সমঝোতা হয়। চীন এ আলোচনার বিরোধীতা করে সম্মেলন বয়কট করে।[২১] ১১ই নভেম্বর ১৯৬৫ সালে *পিপলস ডেইলি* ও *রেডফ্লাগ* সম্পদকীয় প্রকাশ করে। সম্পাদকীয়তে বলা হয়, ক্রুশ্চেভ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট কেনেডিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য ব্যস্ত ছিলেন। তার লক্ষ্য চীনকে এক ঘরে করা।[২২]

১৯৬৩ সালের ১লা এপ্রিল ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী এক ভাষণে প্রশ্নাকারে বলেন, চীন যদি ভারতের প্রতি হুমকি হয় তাহলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ভারত কীভাবে তা মোকাবিলা করবে? ইন্দিরা গান্ধী বলেন, ভিয়েতনামে চীন তার সামরিক বাহিনীকে সরাসরি যুক্ত না করার ব্যাপারে সতর্ক। কিন্তু চীনের ছায়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়িয়ে পড়েছে। চীনের পক্ষ থেকে প্রকৃত হুমকি যতটা না সামরিক তার চেয়েও রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। প্রগতিশীল জাতীয়তাবাদী সরকারগুলো দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণের মাধ্যমে বর্তমানে উন্নয়ন প্রচেষ্টায় লিপ্ত এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তারা অগ্রসর হচ্ছে; সেক্ষেত্রে চীনের ভূমিকার কারণে তাদের বিরাটভাবে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

এসময় ভারতের বিভিন্ন এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোষ্ঠীর মধ্যে চৈনিক আদর্শ প্রতিষ্ঠার জন্য বিচ্ছিন্নভাবে সশস্ত্র লড়াই ছড়িয়ে পড়ে। ভারত বিষয়টিতে চীনের উস্কানি রয়েছে বলে মনে করে এ কারণে যে, চীন তখন বিশ্বব্যাপী বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলে চীনপন্থি নেতারা কিছু কিছু এলাকা মুক্তাঞ্চল হিসেবে ঘোষণা করে এবং তাদের বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছে। ভারত সরকার এক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক আদর্শ নিয়ে তাদের মোকাবিলা করছে, পরিকল্পিত অর্থনীতি ও দারিদ্র্য নিরসনের জন্য কাজ করছে। গণতন্ত্রের সুযোগ নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ যুবসমাজের একটি অংশ যেখানে সশস্ত্র লড়াই শুরু করে সেক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক নিয়ম-নীতি ও কাঠামোয় সেই গেরিলা লড়াইকে নিয়ন্ত্রণ করা যেকোনো গণতান্ত্রিক সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। ভারতের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এই ধরনের একটি পরিস্থিতি মোকাবেলা সরকারকে বিব্রতকর অবস্থায় ফেলে দেয়। ভারত মনে করে, এটা সম্পূর্ণই চীনের কৌশলগত চাপ।

পিকিং রিভিউ ১৫ই এপ্রিল ১৯৬৬ সালের ইন্দিরা গান্ধীর যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর নিয়ে একটি বক্তব্য প্রতিবেদন পেশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রেসিডেন্ট জনসন প্রশাসন যখন কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের বিস্তৃতি ঘটিয়েছে এবং যেখানে সোভিয়েত সংশোধনবাদীরা চীনবিরোধী প্রচারণা জোরদার করেছে এবং ভারত তার অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অসুবিধায় আছে এবং ব্যাপক খাদ্যঘাটতির মুখোমুখি হয়ে পড়েছে তখন ত্রিশক্তি চীনকে একলা করার জন্য কূটনৈতিকভাবে একত্রিত হয়েছে। জনসনের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর যে কথা হয়েছে তার মর্মকথা হল, "কমিউনিস্ট চীনের হুমকি যাতে বিস্তৃতি না হয় সে জন্য তাকে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামরিকভাবে বৃত্তায়িত করতে হবে।"[২৩]

১৯৬৭ সালের ৭ই আগস্ট পিপলস ডেইলি একটি মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে যার শিরোনাম 'নক্সালবাড়ির লাল পতাকা ঊর্ধ্বে তুলে ধর।'[২৪] নক্সালবাড়ি পশ্চিমবাংলায় একটি নাজুক পাবর্ত্য এলাকা। বস্তুত এই শিরোনামের মাধ্যমে একথা উপলব্ধি করা সহজ হয়ে পড়ে যে, চীন ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রকাশ্যে ঢুকে পড়েছে। উক্ত প্রতিবেদনে বলা হয়, ভারতীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও পুলিশ কর্তৃক বিপ্লবী কৃষক শক্তিকে 'ঘিরে রাখা ও নির্যাতন' করার যে অভিযান চালিয়েছিল নক্সালবাড়ি ও দার্জিলিং-এর আশেপাশে ও অন্যত্র; তা প্রতিহত করে প্রথম রাউন্ডে 'বিপ্লবী'রা বিজয় অর্জন করেছে। দক্ষ ও সাহসিকতার সঙ্গে সশস্ত্র কৃষক বিপ্লবী ইন্ডিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির গেরিলারা বিভিন্ন স্থানে অভিযান চালাচ্ছে।[২৫] সশস্ত্র কৃষক বিপ্লব দ্রুত এগিয়ে চলেছে শিরোনামে পিকিং রিভিউ ২৫শে সেপ্টেম্বর ১৯৭০ সালে একটি মন্তব্য প্রতিবেদন প্রকাশ করে। প্রতিবেদনে বলা হয়, কমুনিস্ট পার্টি (এম. এল.) প্রত্যন্ত অঞ্চলে সক্রিয়, তাদের স্লোগান বন্দুকের নলের মাধ্যমে রাজনৈতিক শক্তি অর্জন। কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে এই সশস্ত্র বিপ্লব ছড়িয়ে পড়েছে এবং এর বৈশিষ্ট্য হলো বহু বুদ্ধিজীবী, কৃষক গেরিলাদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করছে।[২৬]

শুধু অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে নয়, আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও ভারতীয় কূটনৈতিক পদক্ষেপের সঙ্গে চীনের গৃহীত নীতিমালা বহু ক্ষেত্রে সাংঘর্ষিক হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৬৫ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় আফ্রো-এশিয়া ফোরামকে চীন তাদের রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে ব্যবহার করার গৃহীত পরিকল্পনার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায় ভারত। চীনের পরিকল্পনায় এই ফোরামকে জাতিসংঘের বিকল্প একটি বৈপ্লবিক সংস্থা হিসেবে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করে। কিন্তু এক্ষেত্রে চীনের পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারতের কূটনৈতিক তৎপরতা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ; যার অর্থ চীনা পরিকল্পনা বানচাল করা। বিশেষকরে চীনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গৃহীত পদক্ষেপ মোকাবিলা করার উদ্যোগ ভারতের কাধে গিয়ে পড়ে।[২৭] দ্বিতীয় আফ্রো-এশিয়া সম্মেলনে সহযোগী আয়োজক হিসেবে পাকিস্তানের ভূমিকা পালনের সিদ্ধান্ত ছিল। এই সম্মেলনের উদ্দেশ্য ছিল নয়া বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে তোলা। এই উপলক্ষে ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট ড. এ. আর. সুকার্নো দুইবার পাকিস্তান সফর করে কাশ্মীর প্রশ্নে সমর্থন দান করেন। ভারত পর্যবেক্ষণ করে যে, পাকিস্তান-ইন্দোনেশিয়া ও চীনের সহযোগিতামূলক চুক্তি একটি অশুভ আতাঁতে পরিণত হতে যাচ্ছে। এ কারণে ভারত এই সম্মেলনে সোভিয়েতকে আমন্ত্রণ করা এবং আফ্রিকার কোনো দেশে সম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবি জানায়। ভারত কর্তৃক সোভিয়েতকে অর্ন্তভুক্তি করার প্রচেষ্টা সফল না হলেও সম্মেলন স্থান পরিবর্তিত হয়ে আলজেরিয়ায় নির্ধারিত হয়। কিন্তু আলজেরিয়ায় অবনতিশীল অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে এই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়নি।

৩. চীনের কূটনৈতিক মোড়

১৯৬০-এর দশকের শেষপাদ এবং ১৯৭০-এর দশকের শুরুতে জাতীয় স্বার্থের সন্ধানে চীন পুনর্বার তার শত্রু-মিত্র চিহ্নিতকরণে সক্রিয় হয় এবং বিশ্বের বৃহৎ শক্তিগুলোর সঙ্গে নাটকীয়ভাবে সম্পর্ক পুনঃনির্ধারণে তৎপর হয়। চেকোশ্লোভাকিয়ায় সোভিয়েত অভিযান (১৯৬৮ সাল) এবং ব্রেজনেভ নীতি ঘোষণা, যার মাধ্যমে মস্কো সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অধিকার দাবি করে। ১৯৬৯ সালে চীন-সোভিয়েত সীমান্তে রক্ষক্ষয়ী সংঘর্ষ, চীন পারমাণবিক শক্তি নির্মান-স্থলসমূহে আঘাত হানার পরোক্ষ সোভিয়েত হুমকি প্রভৃতির ফলে সোভিয়েত ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণে চীন উদ্‌বুদ্ধ হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন নীতি 'নিক্সন ডকট্রিন' ঘোষণার (১৯৬৯ সাল) ফলে ইন্দোচীন থেকে যুক্তরাষ্ট্রের সরে যাবার উদ্যোগ এবং চীনের প্রতি মার্কিন হুমকিও হ্রাস পায়। কৌশলগত ধ্যান-ধারণা চীনা নেতৃত্বকে ওয়াশিংটনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে সক্রিয় করে তোলে এবং সম্ভাব্য সোভিয়েত হুমকির মোকাবেলা ও সোভিয়েত 'আধিপত্যবাদের' বিরুদ্ধে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ্য অবস্থান গ্রহণ করে। ওয়াশিংটনের সঙ্গে 'পিং পং কূটনীতি', চীনে কিসিঞ্জারের গোপন সফর এবং সাংহাই ইস্তেহার ঘোষণা ইত্যাদি ১৯৭০-এর দশকের প্রথম দিকে এসব ঘটনাপ্রবাহ চীন-মার্কিন সমঝোতার পথ উন্মুক্ত করে এবং এক কালের দুই চরম শত্রুদেশ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠায় ও ভবিষ্যতে সহযোগিতা বিধানে জোর দ্বি-পাক্ষিক কূটনৈতিক তৎপরতা উন্মোচিত করে।

৪. পাকিস্তানের পক্ষে চীন

চীন-ভারত যুদ্ধ এবং পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ, চীন-মার্কিন ও পাকিস্তান-মার্কিন চলতি সম্পর্কে ছেদ পড়ে। যুক্তরাষ্ট্র চীন-পাকিস্তানের বন্ধুত্বে বিব্রতবোধ করে এবং পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সাহায্য ও এইড পাকিস্তান ক্লাব মিটিং স্থগিত করে। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারত যুদ্ধে পাকিস্তান এবং যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্কের অবনতি ঘটে। যুদ্ধে চীন সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করে এবং চীন এই বলে ভারতকে অভিযোগ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা অনুযায়ী এশীয়দের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে এবং আফ্রো-এশীয় ঐক্য ক্ষতিগ্রস্থ করছে।[২৮]

এপ্রিল মে মাসে ভারত-পাকিস্তান বিরোধপূর্ণ সীমান্ত কুচ সেক্টরে সশস্ত্র সংঘর্ষ শুরু হলে চীন সরাসরি পাকিস্তানকে সমর্থন করে। আগস্ট মাসে কাশ্মীরে পাকিস্তানের অনুপ্রবেশকারীরা প্রবেশ করলে পরিস্থিতি অবনতি ঘটে এবং সংঘর্ষ শুরু হয়। ২৪শে আগস্ট প্রাভদা অভিযোগ করে যে, কাশ্মীর সমস্যা কলোনিয়েল ধারাবাহিকতা, যা নিয়ে পাকিস্তান এবং ভারত সাম্রাজ্যবাদী প্ররোচনায় যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছে। চীনের বিদেশমন্ত্রী চেন উই করাচি সফর করেন। পাকিস্তানের পক্ষ নেন এবং বলেন পাকিস্তান ভারতের সশস্ত্র প্ররোচণার বিরুদ্ধে কাশ্মীরে যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। ৯ই সেপ্টেম্বর চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের আগ্রাসনকে নিন্দা করেন এবং বলেন এতে এশিয়া শান্তির হুমকিতে পড়েছে। এমনকি চীনা একটি নোটে অভিযোগ করা হয় যে, সিকি তিব্বত সীমান্তে অনুপ্রবেশকারীরা ঢুকেছে এবং দাবি করা হয় সিকি বর্ডারে বিরোধপূর্ণ এলাকা হতে ভারতীয় সৈন্য প্রত্যাহারের। এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন অতিদ্রুত চীনের বিরুদ্ধে ভারতকে সমর্থন জানান।

চীনের ভূমিকার কারণে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন কৌশলগত কারণে সমান্ত রালভাবে ভারতকে শক্তিশালী করার নীতি গ্রহণ করে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পাকিস্তানের চেয়ে ভারত চীনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে ভাল মিত্র হবে। কারণ সেন্টো ও সিয়াটো সদস্য হলেও ৬০-এর দশকে চায়নার ঘনিষ্ট হতে পাকিস্তান এগিয়ে যায়। চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক বান্দুং সম্মেলনের সময় হতে উষ্ণ হতে শুরু করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী (বগুড়া) সোভিয়েত ইউনিয়নকে সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদী হিসেবে উল্লেখ করে এবং চীনকে বন্ধু ও শান্তিপ্রিয় প্রতিবেশি হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি চৌ এন লাই-কে বুঝাতে সক্ষম হন যে, পাকিস্তান সিয়াটোর সদস্য হলে চীনের সঙ্গে তার কোনো বৈরিতা নাই এবং ঐ চুক্তির ভিত্তিতে যুক্তরাষ্ট্র যদি কোনো আক্রমণাত্মক ভূমিকা নেয় তাহলে পাকিস্তান তার সঙ্গে থাকবে না।[২৯] এমনকি মোহাম্মদ আলী তাইওয়ানকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের মধ্যে বিরোধের মধ্যস্থতা করার প্রস্তাব দেয়। যা ওয়াশিংটন ঠান্ডা মাথায় বিরোধীতা করে। প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এই সমঝোতায় উপনীত হয় যে পাকিস্তান সিয়াটো সদস্য হলেও চীনের সঙ্গে বৈরিতার কোনো বাস্তব কারণ নাই। এইভাবে চীন-পাকিস্তান সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটে। যদিও পাকিস্তান ১৯৫৫ সালের জুলাই মাসে মিডিলিস্ট ডিফেন্স অরগানাইজেশন সদস্যভুক্ত হয়।

গবেষকবৃন্দ এভাবে সমীক্ষা করেন যে, সীমান্ত নিয়ে চীন এবং ভারতের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে দক্ষিণ-পশ্চিমে চীনের যে সীমান্ত তা শান্তিপূর্ণ।[৩০] এসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন বান্দুং সম্মেলনে চীনের সাফল্যের প্রতিপক্ষে দক্ষিণ এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কূটনৈতিক আক্রমণ পরিচালিত করে। সোভিয়েত নেতা ক্রুশ্চেভ ১৯৫৬ সালে ভারত সফর করেন এবং ঘোষণা করেন 'কাশ্মীর ভারতের অন্তর্ভুক্তি চূড়ান্ত এবং সম্পূর্ণ।' চীন এ পর্যন্ত কাল কাশ্মীর সম্পর্কে ভারতকে সমর্থন করা থেকে বিরত ছিল। ১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তান সামরিক শাসন জারি হলে ৫ই মার্চ ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি করার বিষয়ে দ্বি-পাক্ষিক প্রতিরক্ষা চুক্তি সম্পাদিত হয়। এর ফলে দেশের অভ্যন্তরে কমিউনিস্টদের উপর চড়াও হলে চীন-পাকিস্তান সম্পর্কে চিড় ধরে। ১৯৫৯ সালে তিব্বতের লামা বিদ্রোহে পাকিস্তান চীনের নিন্দা করে। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বৈদেশিক নীতিতে শক্তভাবে পশ্চিমের দিকে ঝুঁকে যায়। তিব্বত বিদ্রোহ ও সীমান্ত বিরোধ নিয়ে চীন-ভারত সম্পর্ক যখন সংকটপূর্ণ তখন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান উপমহাদেশের জন্য যৌথ প্রতিরক্ষা পরিকল্পনার প্রস্তাব দেন।[৩১] প্রধানমন্ত্রী নেহেরু এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, এই প্রস্তাব বাগাড়ম্বরপূর্ণ এবং কার বিরুদ্ধে? চীন-ভারত সীমান্ত ঘটনায় পাকিস্তান চীনের পক্ষে ঘুরে দাঁড়ায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন অর্থনৈতিক সহযোগিতার মাধ্যমে পাকিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষায় প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৫৯ সালে বার্টার এগ্রিমেন্ট, তেল এবং খনিজ সম্পদ অনুসন্ধানে প্রযুক্তিগত সহযোগিতার আলোচনা চলে। ১৯৬০ সালের মে মাসে সোভিয়েত সীমানায় যুক্তরাষ্ট্রের ইউ-২ গোয়েন্দা বিমান ভূপতিত হয় এবং দেখা যায় বিমানটি পাকিস্তানের পেশোয়ার ঘাঁটি থেকে এসেছে। তারপরও আলোচনা চলতে থাকে এবং ডিসেম্বরে তা সাফল্যজনকভাবে সমাপ্ত হয়।

১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করে। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ১১ই সেপ্টেম্বর ভারত এবং পাকিস্তানকে 'তৃতীয় শক্তি' সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, এই সংঘর্ষে 'তৃতীয় শক্তি' লাভবানের প্রচেষ্টা নিচ্ছে এবং মস্কো অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব করেন।

'তৃতীয় শক্তি' বলতে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ চীনকে ইঙ্গিত করেন। উপমহাদেশে চীনের প্রভাব যে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছিলো তা সোভিয়েতের নজর এড়ায়নি। ভারতের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে আদর্শগত দিক থেকে পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা, আসাম, মিজোরাম, বিহারসহ কয়েকটি প্রদেশে চীনের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯৬৩-৬৪ সালের মধ্যে চীন ও পাকিস্তানের মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্য, সীমানা নির্ধারণ, বিমান চলাচল, বার্টার চুক্তি এবং দ্বিপাক্ষিক আমদানি-রপ্তানির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উভয় দেশ সফর করেন। এ সময় পূর্ব পাকিস্তানে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)-এর নেতা মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে একটি প্রতিনিধি দল চীনের অক্টোবর বিপ্লব বার্ষিকীতে যোগদান করেন এবং চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। পাকিস্তানের সঙ্গে চীনের সম্পর্কের প্রেক্ষাপটে মাও সেতুং-এর পরামর্শে মওলানা ভাসানী অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে 'ডন্ট ডিস্টার্ব আইয়ুব' এই নীতি গ্রহণ করেন। পাশাপাশি ১৯৬৪ সালের ১৮-২৬শে ফেব্রুয়ারি চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই পাকিস্তান সফরে আসেন। চৌ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এন লাইয়ের সফরের পর এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে হবে কাশ্মীরের জনগণের ইচ্ছা অনুসারে।'[৩২] অন্যদিকে, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের ২-৫ই মার্চ চীন সফর করেন। আইয়ুব খানের সফরের পর প্রকাশিত যৌথ বিবৃতির এক অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'আফ্রো-এশীয় সংহতি বৃদ্ধি এবং উপনিবেশবাদ' ও 'বর্ণ বৈষম্য'কে জাতীয় স্বাধীনতা ও বিশ্বশান্তির পরিপন্থি বলে অভিহিত করা হয়। পাকিস্তান এ সময় 'দুই চীন' নীতির বিরোধীতা করে, অন্যদিকে চীন কাশ্মীরে গণভোটের কথা পুনরায় উল্লেখ করে।[৩৩]

১১ই সেপ্টেম্বর *পিপলস ডেইলি* পাকিস্তানকে সমর্থন করে এবং প্রকাশ করে যে, পাকিস্তান আক্রমণকারীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছে এবং কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য লড়াই করছে। ১৮ই সেপ্টেম্বর পিপলস ডেইলিতে বলা হয়, ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া সাহায্য করছে। কারণ পাকিস্তানের স্বাধীন নীতিকে তারা সহ্য করতে পারছে না। পত্রিকাটিতে সোভিয়েত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার কথা উল্লেখ করে বলা হয়, রাষ্ট্রটি ন্যায় এবং অন্যায় যুদ্ধের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে পারেনি। যুদ্ধ গুরুতর আকার ধারণ করলে ১৬ই সেপ্টেম্বর চীন ৭২ ঘণ্টার হুমকি দিয়ে বলে যে, তিব্বত এবং সিকিম সীমান্তে কথিত ভারতীয় সামরিক স্থাপনা সরিয়ে নিতে বা ধ্বংস করতে হবে। নাহলে পাকিস্তানের সমর্থনে চীন এগিয়ে যাবে।[৩৪] ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী চীনের প্রতি-হুমকিতে বলেন, আক্রান্ত হলে ভারত দৃঢ় প্রত্যয়ে লড়াই করবে এবং পাশাপাশি সীমান্তে যৌথ পরিদর্শনের ব্যাপারে চীনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।[৩৫] চীন যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতকে সতর্ক করে দিয়ে বলে যে, তারা যেন পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ না করে।[৩৬]

নিরাপত্তা পরিষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক যুদ্ধবিরতি কার্যকর হয়। এই যুদ্ধে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান না হলেও সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত এশিয়ায় উপস্থিতির সুযোগ এনে দেয়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য অবিলম্বে সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্বিপাক্ষিক সমস্যা ও ইস্যুগুলোর সমাধান খুঁজে নিতে উভয় পক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে। রাশিয়ার প্রস্তাবে ভারত সম্মতি জ্ঞাপন করে। কিন্তু আইয়ুব খান এই প্রস্তাবে বিলম্ব করেন যতক্ষণ না পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের অনুমতি না পেয়েছেন। অন্যদিকে, তাসখণ্ড চুক্তি সম্পাদনে বহুবিধ জটিলতা অতিক্রম করা সম্ভব হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থন থাকায়।[৩৭]

১৯৬৬ সালের ৩-১০ই জানুয়ারি মাসে তাসখণ্ডে ত্রিদেশীয় মিটিং হয়। সভায় আলোচিত হয়, অঘোষিত যুদ্ধের বিরতি এবং ১৯৬৫ সালের ৫ই আগস্ট যে স্থানে উভয় দেশের সেনাবাহিনী ছিল সেখানে চলে যেতে হবে। বাণিজ্য, ভ্রমণ, সাংস্কৃতিক সম্পর্ক আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হবে। কাশ্মীর পূর্ব অবস্থায় থাকবে। তাসখণ্ড স্পিরিট বাস্তবায়িত হয়নি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী তাসখণ্ড চুক্তি ঘোষণার পরই মৃত্যুবরণ করেন এবং আইয়ুব খান ঐ চুক্তির জন্য প্রচণ্ড সমালোচনার মুখে দেশে ফিরেন। চীন পর্যবেক্ষণে বলেছে, ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের যোগসূত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রয়েছে। প্রেসিডেন্ট জনসন প্রশাসন কোনো সময়ক্ষেপণ না করে তাসখণ্ড ঘোষণাকে সমর্থন জানান। এ সম্পর্কে *পিপলস ডেইলি* জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবকে আক্রমণ করে প্রতিবেদন লেখে। প্রথমত, ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে নিন্দা করা হয়নি; দ্বিতীয়ত, পাকিস্তানের আত্মরক্ষার জন্য যে প্রতিআক্রমণ করা হয়েছিল তা উল্লেখ করা হয়নি; এবং তৃতীয়ত, তারা অন্যান্য দেশকে পাকিস্তানের পক্ষে সমর্থনের সুযোগ দেননি এবং কাশ্মীর সম্পর্কে বলা হয়, নিরাপত্তা পরিষদ কাশ্মীরের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারকে অবহেলা করেছে।[৩৮]

১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যুক্তরাষ্ট্রকে ভারতে অস্ত্র সরবরাহের সুযোগ এনে দেয়। পাশাপাশি এ সময়ে ভারতে প্রচণ্ড খরা হওয়ায় দুর্ভিক্ষ অবস্থা বিরাজ করছিল। এজন্য ভারত খাদ্যশস্যের জন্য যুক্তরাষ্ট্রের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে এবং পিএল-৪৮০ অনুযায়ী শান্তির জন্য খাদ্য কর্মসূচি জুন মাসে শেষ হয়ে আসছিল। ভারতের অর্থনীতি নাজুক হয়ে পড়ে। এ সময় প্রেসিডেন্ট জনসন সমস্ত সাহায্য বন্ধ করে দেন। যুক্তরাষ্ট্র ওয়ার্ল্ডব্যাংকের সাহায্য শক্তভাবে ক্রমসংকুচিত করে। ভারত পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী গৃহীত ঋণ পরিশোধে অসুবিধায় পড়ে। বাধ্য হয়ে ডিসেম্বর মাসে ভারত সরকার বেসরকারি বিনিয়োগের ক্ষেত্রে উদারনীতি গ্রহণ করে। এটি এমন সময়ের চিত্র যেক্ষেত্রে লাল বাহাদুর শাস্ত্রী মৃত্যুবরণ করেছেন এবং ইন্দিরা গান্ধী প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তিনি ১৯৬৬ সালের মার্চ মাসে যুক্তরাষ্ট্রে সাহায্যের আশায় গমন করেন। এসময় প্রেসিডেন্ট জনসন এই শর্ত আরোপ করেন যে, ভারতকে অধিক পরিমাণে বেসরকারি পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ দিতে হবে এবং উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বাধাহীন সুবিধা দিতে হবে এবং বেশি পরিমাণে জমিতে সার ব্যবহার করতে হবে। ইন্দিরা গান্ধীর পাঁচদিন ওয়াশিংটন সফর শেষে মার্কিন প্রেসিডেন্ট জনসন ৩০শে মার্চ ঘোষণা করেন যে, ভারতকে ৩৫০ মিলিয়ন টন খাদ্য সহায়তা দেওয়া হবে এবং বিশ্বব্যাংক ভারতের জন্য কনসোর্টিয়াম-এর মাধ্যমে অর্থনৈতিক সাহায্য দেবে।[৩৯]

ইন্দিরা গান্ধীর মার্কিন অভিমুখি কূটনৈতিক পদক্ষেপ এবং একই সঙ্গে ভারতের সঙ্গে কাশ্মীর অন্তর্ভুক্তির বিষয়টি চীন বিপজ্জনক বলে মনে করে। এমনকি ভারতের কতিপয় বিশেষজ্ঞরা চীন বিরোধকে আদর্শিক সংঘর্ষ বলে মনে করে, যেমনটি পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মনে করতেন, ১৯৬২ সালে চীন কর্তৃক ভারত আক্রমণ ছিল বিশ্বে আধিপত্য বিস্তারের লক্ষ্যে। ইন্দিরা গান্ধী ওয়াশিংটন থেকে মস্কো হয়ে সোভিয়েত প্লেনে ভারতে চলে আসেন। এই অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্র ভারতের বিদেশনীতি প্রভাবান্বিত করার জন্য সহযোগিতা কূটনীতির কথা ঘোষণা করেন। এসময় 'শর্ত' বা 'নিয়ন্ত্রণ' যাই বলা হোক না কেন যুক্তরাষ্ট্র ও ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের সাহায্য পেতে ভারতকে শর্তগুলো মানতে হয়েছে। এমনকি ৬ই জুলাই ওয়ার্ল্ডব্যাংকের পরামর্শ মোতাবেক শতকরা ৫৭ ভাগ টাকা অবমূল্যায়ন করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক হস্তক্ষেপ ভারতের ঘোষিত পঞ্চশীল নীতিতে পরিবর্তন এনে দেয়। ভারত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক হারিয়ে ফেলে। অভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিপর্যয় ও যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তার উপর নির্ভরশীল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হওয়ায় ভারত ভিয়েতনাম সম্পর্কে সরকারিভাবে স্বাধীন ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। ভারত বৈদেশিক নীতিতে এই কথা বিশ্বাস করে যে, ভিয়েতনামে যুক্তরাষ্ট্রের উপস্থিতি ও ভূমিকা প্রকৃত পক্ষে ভারতের স্বার্থকে সমুন্নত রাখবে এবং তা হবে চীনের বিপক্ষে।[৪০]

এভাবে ভারতের বিদেশনীতি স্বতঃসিদ্ধভাবে একদিকে চীন রাশিয়ার মধ্যে বিভেদ বৃদ্ধি করে। ভারত একদিকে সোভিয়েত রাশিয়া থেকে সামরিক-অর্থনৈতিক সহযোগিতা লাভ করে, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র থেকে আর্থিক সুবিধা গ্রহণ করে। কিন্তু তাকে মূলনীতি থেকে সরে আসতে হয়।[৪১] যদিও এসময় জোটনিরপেক্ষ নীতির ব্যাখ্যার পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে।

১৯৭১ সালে এসে ভারত চীন কর্তৃক ১৯৬১ সালে প্রদত্ত প্রস্তাবের দিকে অগ্রসর হয়।[৪২] কিন্তু এই পদক্ষেপ বেশিদূর এগিয়ে যেতে পারেনি। জুলাই মাসে হেনরি কিসিঞ্জারের পিকিং সফরের পরপরই ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই-এর বরাবর বাংলাদেশ ও অন্যান্য পারস্পরিক স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে আলোচনার জন্য এক পত্র লেখেন। পত্রে ইঙ্গিত প্রদান করা হয় যে, ভারত মর্যাদার সঙ্গে উভয় পক্ষের সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে আগ্রহী, একই সঙ্গে মুখ্য বিষয় হিসেবে বাংলাদেশ প্রসঙ্গ আলোচিত হবে।[৪৩] ডি. পি. ধর মস্কোতে চীনা রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে মে মাসে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। চীনের পক্ষ থেকে তখন বিষয়টি বিবেচনা করা হবে বলে বলা হয়েছিল। ইন্দিরা গান্ধীর পত্রের কোনো সাড়া পাওয়া যায়নি। তখন চীন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে কূটনৈতিকভাবে ব্যস্ত ছিল।

এমতাবস্থায় কিসিঞ্জার পিকিং সফরের চার সপ্তাহের ভেতরে সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তি বাংলাদেশ সংকটে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যবহন করে। এই চুক্তি সম্পর্কে প্রাথমিক পর্যায়ে চীন কূটনৈতিক নীরবতা পালন করে। কিন্তু মধ্য নভেম্বরে ভারত এবং পাকিস্তানের সংঘর্ষ শুরু হলে চীন এই চুক্তির একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদ সম্পর্কে মুখ খোলে। এ সময় চীন দেখতে পায়, সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনা সীমান্তে ১০ লক্ষ সৈন্য সমাবেশ করেছে এবং এশিয়ায় 'কালেক্টিভ সিকিউরিটি সিস্টেম'-এর লক্ষ্যে সোভিয়েত তৎপর হয়ে উঠছে যা চীন মনে করে এসবই চীনের বিরুদ্ধে। এভাবে উপমহাদেশে বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে সোভিয়েতের লক্ষ্য এবং ভারতের ভূমিকা চীনকে তার অবস্থান নিতে অগ্রসর করে দেয়। বাংলাদেশ এবং ভারতের প্রতি চীনের মনোভঙ্গি এই প্রতীতি জন্মায় যে, এটা হলো চীন এবং সোভিয়েতের মধ্যকার বৃহত্তর আদর্শিক বিরোধ।[৪৪]

৫. চীনের কূটকৌশল

এ সম্পর্কে চীন তার নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশ করে। একইসাথে বাংলাদেশের সংকট প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে *পিপলস ডেইলি* মন্তব্য করে যে, বাংলাদেশের সমস্যা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। পত্রিকায় বলা হয়,[৪৫]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘে চীনের প্রতিনিধি হুওয়াং বলেন, সোভিয়েত সরকার চীনের সিনকিয়াং প্রদেশের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহীদের দিয়ে নাশকতা এবং চীনের বিরুদ্ধে বিভক্তিমূলক কাজ করছে। কয়েক লক্ষ বেসরকারি লোককে জোরপূর্বক গ্রহণ করে তাদের দ্বারা চীনবিরোধী কার্যক্রম ঘটিয়ে চলেছে। পাকিস্তানের শরণার্থী প্রসঙ্গে জ্যাকব মালিকের যুক্তি অনুযায়ী সোভিয়েত রাশিয়া এই সুযোগই খুঁজছে যে, কীভাবে চীনের বিরুদ্ধে সশস্ত্র আক্রমণ করা যায়।[৪৬]

এ পর্যায়ে বৈশ্বিকভাবে চীনের কূটনৈতিক নীতিমালার পরিপ্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশীয় নীতিমালা বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। চীনা নীতির আলোকে ল্যাটিন আমেরিকা ও আফ্রিকায় গেরিলাযুদ্ধ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি চীনা কমিউনিস্ট পার্টি ভারতে সর্বহারাদের রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে উষ্কানিমূলক প্রচার চালায়। ১৯৬৫-৬৬ সালের মধ্যে আইভরিকোষ্ট, কেনিয়া, মালাগাছি, মালয় প্রভৃতি রাষ্ট্র থেকে অভ্যন্তরীণ অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপের অভিযোগে চীনা কূটনীতিকদের বহিষ্কার করা হয়। রুয়ান্ডা এ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করেন। এমনকি নাইজেরিয়ার বায়াফ্রা প্রদেশের সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে চীন সমর্থন করে।[৪৭] শ্রীলংকার জেভিসি যারা চেগুয়েভারার গেরিলা পদ্ধতি অনুসরণে সশস্ত্রযুদ্ধ পরিচালনা করছিল কিংবা সুদানের চীনপন্থি কমিউনিস্টদের জেনারেল নিউমেরি যাদের ফাঁসি দিয়েছিল চীনের এই সমস্ত কার্যক্রম বৈশ্বিক স্ট্র্যাটেজি বা জাতীয় স্বার্থ সংরক্ষণের চেয়েও আদর্শবাদ দ্বারা তাড়িত ছিল যার লক্ষ্য ছিল বিশ্ব বিপ্লবের অগ্রসেনানী হিসেবে নিজেকে প্রকাশিত করা। যুক্তরাষ্ট্র ও মস্কোকে এক কাতারে ঠেলে দেওয়া। মস্কো এক সময় জেনারেল নিউমেরিকে সবসময় সমর্থন করেছিল। ভারত-সোভিয়েত শ্রীলংকায় জেভিসি বিপ্লবীদের দমনের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করে। শেষপর্যন্ত চীনও ঐসব বিপ্লবীদের হঠকারি বলে চিহ্নিত করে। এশিয়ায় চীনকে একইসঙ্গে ভারত, সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কূটনৈতিকভাবে মোকাবেলা করতে হয়। এ কারণে কোনোক্রমেই পাকিস্তানকে চীন হাতছাড়া করতে চায়নি। চীনকে যখন নিরাপত্তার বেষ্টনী দ্বারা বিচ্ছিন্ন করার প্রচেষ্টা চলে তখন চীন তার জাতীয় স্বার্থেই কতিপয় নীতিমালা গ্রহণ করতে হয়। এইসব নীতিমালার বিশ্লেষণে লক্ষ্য করা যাবে দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের প্রধান মিত্র পাকিস্তান এবং স্বাভাবিকভাবে নয়াদিল্লি ছিল তার স্বাভাবিক অমিত্র, যদিও সময়ে সময়ে স্ট্রাটেজিক কারণে ভারতের সঙ্গেও অনুকূল সম্পর্কও বজায় রেখেছে।[৪৮] দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত কৌশলগত বলয়ে ভারতকে ঠেলে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক করার তাগিদ অনুভব করেছে। এমনকি ভারতে বিপ্লবী বা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের প্রতি চীনের সমর্থন পুনর্ব্যক্ত করা এবং সুবিধামতো বিরোধ পূর্ণ চীন-ভারত সীমান্ত অঞ্চলে চাপ সৃষ্টি করার কৌশল গ্রহণ করে।[৪৯]

চীন স্বয়ং পাকিস্তানের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখতে আগ্রহী ছিল, এমনকি পাকিস্তানের সঙ্গে যে বিদ্যমান সম্পর্ক তা গভীর করতেও তৎপর হয়। ১৯৬০-এর দশকের সূচনা থেকে সাংস্কৃতিক বিপ্লব চলাকাল অবধি চীন বহির্বিশ্বের সঙ্গে, বিশেষকরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুসলিম দুনিয়ার দেশসমূহ ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে পাকিস্তানকে ব্যবহার করে কূটনৈতিক যোগযোগ প্রতিষ্ঠা করে। এসব সত্ত্বেও আরেকটি ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটলে পাকিস্তানের সাহায্যে হস্তক্ষেপ করার বিষয়ে কোনোরূপ সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকার প্রদান থেকে নিঃশব্দে চীন বিরত থাকে।

৬. মুক্তিযুদ্ধে চীনের ভূমিকা

২৫শে মার্চ ১৯৭১ সালের পর চীন নিঃসন্দেহে পাকিস্তানের জন্য 'প্রতিশ্রুত' তার অর্থনৈতিক ও সামরিক সরবরাহ অব্যাহত রাখে। পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থানরত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর জন্য প্রেরিত ব্যাপক চীনা সামরিক সরঞ্জাম জাহাজ থেকে খালাশ করার বিষয়েও বেইজিং আপত্তি তোলেনি। তবে উল্লেখ্য বিষয় এই যে, এসব সামরিক সরঞ্জাম ২৫শে মার্চের পূর্বেই জাহাজবোঝাই করা হয়, যদিও চট্টগ্রাম নৌ-বন্দরে এসব সরঞ্জামাদি এপ্রিলের দিকে পৌঁছে। এভাবে চীন তার পূর্বে ওয়াদাকৃত সামরিক সরবরাহ পাকিস্তানকে প্রদান করে, কিন্তু ১৯৭১-এর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালের নতুন সামরিক সাহায্য প্রদানের বিষয়ে অনীহার ভাব প্রদর্শন করে। পাকিস্তান চীন থেকে বিশেষকরে কিছু জঙ্গি বিমানের জন্য আবেদন করে। এসকল আবেদন বিবেচনার প্রক্রিয়ায় বেইজিং বেশ কালক্ষেপণ করে এবং পরবর্তীকালে কয়েক মাস সময় নিয়ে যখন পাকিস্তানকে ঐ সকল জঙ্গি বিমান পাঠায়, বাংলাদেশকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ তখন শেষ হয়ে যায়।[৫০]

৫ই এপ্রিল পিকিং রেডিও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলির উপর কোনো মন্তব্য না করে সম্প্রচার করে যে, এটা 'ভারতের হস্তক্ষেপ' ও 'আধিপত্যবাদ'। একই দিনে নয়াদিল্লিতে চীনা দূতাবাসের সামনে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভের বিরুদ্ধে চীন একটি প্রতিবাদ নোট প্রেরণ করে। ১১ই এপ্রিল *পিপলস ডেইলিতে* কর্তৃপক্ষীয় মন্তব্যে বলা হয়, ৩১শে মার্চ ভারতীয় পার্লামেন্টে এবং কংগ্রেস ওয়াকিং কমিটিতে যে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছে তা পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ে' হস্তক্ষেপ এবং ভারতীয় আধিপত্যবাদ। পত্রিকায় বলা হয়, ভারত পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ব্যাপক সেনা সমাবেশ করেছে, যা পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। ঐ পত্রিকার মন্তব্যে পদগোর্নির পত্র এবং মার্কিন মুখপাত্রের বক্তব্যে দুই পরাশক্তি ভারতের সঙ্গে নিবিড় সহযোগিতায় পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে রূঢ়ভাবে হস্তক্ষেপ করছে।[৫১] পাকিস্তান সরকারের ন্যায়সঙ্গত সংগ্রামে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন দেবে।

এই পর্যায়ে ভারত এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো চীনও মনে করেছে বাংলাদেশ সংকট পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ১৩ই এপ্রিল চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই ইয়াহিয়া খান বরাবর এক পত্রে লেখেন, সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্নির চিঠির বিষয়টি চীনা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে; এ কথা উল্লেখ করে বলেন :

"চীন বিশ্বাস করে ঘটনাটি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। যা পাকিস্তানের জনগণই সমাধান করতে পারবে এবং এক্ষেত্রে বিদেশি কারো নাক গলানোর প্রয়োজন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নাই। পত্রে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গুটিকয়েক লোক পাকিস্তান বিভক্তি করার জন্য নাশকতামূলক কাজ করছে। ভারত যদি পাকিস্তান আক্রমণের দুঃসাহস দেখায় তাহলে চীনা সরকার পাকিস্তান সরকার ও জনগণকে তাদের স্বাধীনতার সার্বভৌমত্ব রক্ষার সংগ্রামে দৃঢ়ভাবে সর্বদা সমর্থন করবে।"[৫২]

২১শে মে চীন পাকিস্তানের কূটনৈতিক সম্পর্কের ২০তম বার্ষিকীতে ভাইস ফরেন মিনিস্টার হান নেইন লিউ বাংলাদেশ ও ভারত প্রসঙ্গ এড়িয়ে যান। কিন্তু ঐ একই ভোজ সভায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত বলেন, বাইরের বৈরী হস্তক্ষেপের ফলে জাতি হিসেবে আমাদের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন। চীন দ্বিধাহীনভাবে পাকিস্তানের জাতীয় সংহতির সমর্থনে এগিয়ে এসেছে।[৫৩] এটা ছিল নিছক পাকিস্তান কূটনীতিকের মন্তব্য।

ভারত আশ্বস্ত ছিল যে, বাংলাদেশ সংকটে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধে চীন হস্তক্ষেপ করবে না। কিন্তু যুদ্ধের মাঝামাঝি সময়ে একজন সরকারি মুখপাত্র চাতুর্যপূর্ণ মন্তব্যে বলেন, চীনা সৈন্যরা সীমান্তে আনাগোনা করছে কিন্তু দুই পক্ষই বরফ পরার জন্য প্রার্থনা করছে। ভারত সম্ভবত তৃতীয় কোনো দেশের মাধ্যমে এই আশ্বাস পেয়েছে এই সংঘর্ষে চীন হস্তক্ষেপ করবে না। যখন সীমান্তে বরফ পড়েছে চীন এই অযুহাতই দেখাবে যে, বরফে ভারত-সীমান্ত ঢাকা পড়ে গেছে এবং হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ নেই। তবুও ভারত চীন সীমান্ত থেকে তার মাউন্টেন ডিভিশন সরিয়ে নেয়নি এই আশংকায় যে, চীন এই যুদ্ধে জড়িত হবে কি হবে না তা স্পষ্ট নয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ৩১শে ডিসেম্বর সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'চীনের ক্রিয়াকার্য তিনি যেভাবে আশা করেছেন তার থেকে কোনো কম বেশি হয়নি।'

বাংলাদেশ প্রসঙ্গে চীনের প্রধানমন্ত্রী প্রশ্ন উত্থাপন করে বলেন, ভারত যদি যুদ্ধে উস্কানি দেয় তাহলে এর থেকে কোনো ফায়দা বা সমস্যার সমাধান করতে পারবে? যদি দুই পক্ষের যুদ্ধ বেধে যায় দু'পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যুদ্ধ বেধে গেলে চীনের অবস্থান কী হবে তা নির্দিষ্ট আছে। চীন ভারতের নাশকতামূলক এবং আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের বিরুদ্ধে পাকিস্তানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন করে। ভারত যা তৈরি করছে তার বিষাক্ত স্বাদ তাকেই নিতে হবে। এর ফলে উপমহাদেশে ভারসাম্য ফিরে আসবে না।"[৫৪]

যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত কলামিস্ট জ্যাক এন্ডারসন-এর ভাষ্যে বলা হয়েছে, ভারতকে সোভিয়েত রাশিয়া এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে, চীন যদি যুদ্ধে লিপ্ত হয় তাহলে সোভিয়েত রাশিয়া চীনের সিনকিয়াং এলাকা ফ্রন্ট খুলে বসবে। হোয়াইট হাউসের গোপন দলিলের সূত্র থেকে এন্ডারসন দাবি করেন যুক্তরাষ্ট্র এবং চীন পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে সমুদ্রে এবং সমতলে অংশ নেওয়ার ক্ষেত্রে কাছাকাছি চলে এসেছিল। এইসব দলিল অনুসারে ১১ই ডিসেম্বর হোয়াইট হাউসে এ রিপোর্ট পৌঁছে যে, পাঁচটি সোভিয়েত নৌ-বহর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করেছে। যার অবস্থান শ্রীলংকার দক্ষিণ-পশ্চিমের ১৮০ মাইল দূরে। যুক্তরাষ্ট্রের প্যাসিফিক ফিল্ড কমান্ডার অ্যাডমিরাল জন ম্যাককেইন রিপোর্টটি ওয়াশিংটনকে জানায় এবং জিজ্ঞেস করে সে এয়ারক্রাফ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেরিয়ার ইন্টারপ্রাইজ সোভিয়েত যুদ্ধ জাহাজের পূর্বগামিনী হবে কিনা? যুক্তরাষ্ট্রের নির্দেশে টাস্কফোর্সটি ১৩ই ডিসেম্বর বঙ্গোপসাগরে প্রবেশ করে এবং নয়াদিল্লিতে বেসরকারি সূত্র থেকে সংবাদ পৌঁছে যে, নৌ-বহরটি চট্টগ্রাম এসে পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থিত পাকিস্তানি সৈন্যদের উদ্ধার করে নিয়ে যাবে। কিন্তু নৌ-বহরটির চলাচল ও অবস্থান সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি। অবশ্য কিসিঞ্জার বলেছেন, 'চীনের সঙ্গে যে মিত্রতা গড়ে উঠছে তার বিশ্বস্ততা প্রমাণের জন্য সপ্তম নৌ-বহর পাঠানো জরুরি ছিল।'

সিআইএ উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদে চীনের রাষ্ট্রদূত ইয়াহিয়া খানকে আশ্বস্ত করেছেন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে চীনা সৈন্য সীমান্ত অভিমুখে অগ্রসর হবে। কিন্তু সিআইএ এই রিপোর্টটি অনুমোদন করেনি। নেপালের কাঠমাণ্ডুতে নিয়োজিত যুক্তরাষ্ট্রের মিলিটারি অ্যাটাচি ওয়াশিংটনে একটি রিপোর্ট পাঠায়। রিপোর্টে বলা হয়, সোভিয়েত অ্যাটাচি চীনের অ্যাটাচিকে বলেছে যে, পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধ নিয়ে চীনের হস্তক্ষেপ করলে তা হবে গুরুতর এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিক্রিয়া হবে ভয়াবহ এবং প্রয়োজনে তার দেশ মিসাইল ও অন্যান্য অস্ত্র ব্যবহার করবে।[৫৫] সিআইএ কাঠমান্ডু থেকে ৮ই ডিসেম্বর রিপোর্ট করে যে, চীনারা হিমালয় অঞ্চলে আবহাওয়া পরিসংখ্যান সংগ্রহ করছে। সম্ভবত তারা বরফের মধ্যেও ভারত সীমান্ত অতিক্রম করতে বদ্ধপরিকর। নয়াদিল্লি থেকে সিআইএ রিপোর্টে বলা হয়, ইন্দিরা গান্ধী গোপন ও বিশ্বস্ত সূত্রের উদ্ধৃতি উল্লেখ করে কংগ্রেস পার্টি মিটিং-এ বলেন, তার কাছে এমন সংবাদ রয়েছে যে, চীন হস্তক্ষেপের ইচ্ছা প্রকাশ করেছে এবং তাদের আক্রমণ আসতে পারে লাদাখ এলাকা হতে। কিন্তু সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত নিকোলাই পেখভ ১৩ই ডিসেম্বর ভারত সরকারকে জানান যে, চীনের বিরুদ্ধে সিনকিয়াং-এ তারা একটি ফ্রন্ট খুলেছে এবং বঙ্গোপসাগর হতে সপ্তম নৌবহর টাস্কফোর্সকে হস্তক্ষেপ করতে দেবে না।[৫৬]

ষাটের দশকে চীনের চেয়ারম্যান মাও সেতুং ঘোষণা করেন, বিপ্লবোত্তর চীনের সামন্তবাদের অবশেষ ও প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অবসান হয়নি। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি স্থায়ীভাবে দূর করার লক্ষ্যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব শুরু করেন। ১৯৬৭ সালে সাংস্কৃতিক আন্দোলনের ফলে লিও শাওচির বিরুদ্ধে সমাজতন্ত্র বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগ ওঠে এবং রেডগার্ড আন্দোলন ও সাংস্কৃতিক বিপ্লব ক্ষমতাসীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে ধনতান্ত্রিক পথে প্রত্যাবর্তনের প্রচেষ্টা বন্ধ করার অযুহাতে তাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয়। ১৯৬৯ সালে সাংস্কৃতিক বিপ্লবের সময় লিন-পি-আও-র প্রভাব বৃদ্ধি পায়। কিন্তু বিমান দুর্ঘটনায় তার মৃত্যু হলে চীনের পার্টি কংগ্রেস তার কার্যকলাপকে গর্হিত বলে নিন্দা করা হয় এবং মাও সেতুং এর রেডগার্ড ও রেডবুকের স্থলে পার্টি উদারপন্থি নীতি গ্রহণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে মিত্ররূপে গ্রহণ করতে নীতি পরিবর্তনে দ্বিধা করেনি। এই পরিবর্তনশীল অবস্থায় চীন ও রাশিয়ার মধ্যে দ্বন্দ্ব, সম্পর্কের অবনতি এবং পাশাপাশি ওয়াশিংটন ও পিকিং-এর মধ্যে সম্পর্কের উন্নতির প্রচেষ্টা অব্যাহত থাকে। এ পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীন পাকিস্তানের পক্ষে সরাসরি যুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অংশগ্রহণে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়ে।

ঢাকা পতনের পরে ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তানকে সমর্থন করে চীন। প্রকাশ্যে বাইরের শক্তির আক্রমণ সম্পর্কে এক বিবৃতি প্রকাশ করে। ঐ একই দিনে পিকিং-এ ভারতীয় দূতাবাসে সীমান্ত সংঘর্ষের অভিযোগ উত্থাপন করে ১০ই ডিসেম্বরের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং অভিযোগ করে জাতিসংঘের ৭ই ডিসেম্বর প্রস্তাব অমান্য করে একটি পুতুল সরকারকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করছে ও আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। এটা সম্ভব হয়েছে যে, ভারতকে সোভিয়েত রাশিয়া বিপুল পরিমাণ সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করে উৎসাহ জুগিয়েছে।

৭. বাংলাদেশের স্বাধীনতা: সোভিয়েতের ভূমিকা

২৫শে মার্চ রাতে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে আক্রমণ চালালে চীন কোনো মন্তব্য করেনি। ২রা এপ্রিল সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বরাবর এক পত্র প্রেরণ করে অত্যাচার বন্ধ এবং সমস্যার শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য আহ্বান জানান। পত্রে উল্লেখ করা হয় :

"পাকিস্তান জনগণের এই দুর্দশার দিনে বন্ধুপ্রতিম রাষ্ট্র হিসেবে কয়েকটি কথা না বলে পারছি না। আমরা সবসময়ই বিশ্বাস করে এসেছি এবং এখনো মনে করি যে, পাকিস্তানে সম্প্রতি যে জটিল সমস্যার উদ্ভব হয়েছে, তার সমাধান অবশ্যই রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিক শক্তি প্রয়োগ না করেই করতে হবে। অব্যাহত পীড়ন নীতি ও রক্তপাতের ফলে সমস্যার সমাধান নিঃসন্দেহে সুদূরপরাহত হয়ে যাবে এবং তা পাকিস্তানের জনগণের সামগ্রিক মৌলিক স্বার্থ ক্ষুণ্ন করবে।

ইউএসএসআর (USSR)-এর সুপ্রীম সোভিয়েতের পক্ষ থেকে প্রেসিডেন্ট, আপনার কাছে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্ত করাটা আমরা আমাদের পবিত্র কর্তব্য বলে মনে করছি এবং সেই সাথে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের বিরুদ্ধে পরিচালিত দমন-পীড়ন ও রক্তপাত অবিলম্বে জরুরি ভিত্তিতে বন্ধ করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়ে বিদ্যমান সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সনির্বন্ধ আবেদন জানাচ্ছি। আমরা আশাবাদী, পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণের স্বার্থ এবং এই অঞ্চলের শান্তি রক্ষার স্বার্থ সংরক্ষণে এই পদক্ষেপ কার্যকর ভূমিকা পালন করবে। উদ্ভূত সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হলে সোভিয়েত জনগণ স্বস্তি ও তৃপ্তি লাভ করবে।"[৫৭]

এই বার্তা সম্পর্কে পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের কাছে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি 'রক্তপাত' ও 'নিষ্ঠুরতা'র বিরুদ্ধে তাঁর বার্তায় রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি আশা করেছিলেন বার্তাটি অপ্রকাশিত থাকুক, কিন্তু রুশ কর্তৃপক্ষ বার্তাটি প্রকাশ করে দেওয়ায় সোভিয়েতের সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্কের আরো অবনতি ঘটেছে।

তাসখণ্ড চুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন উপমহাদেশে নীতিগতভাবে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। পূর্বে ১৯৬৫ সালে যুদ্ধকালীন পূর্বাপর সোভিয়েত রাশিয়া

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতকে যেভাবে সহযোগিতা করেছে তার থেকে দূরে সরে এসেছে বলে ভারতীয় বিশেষজ্ঞগণ মনে করে। শুধু তাই নয়, ১৯৬৬ সালের শেষের দিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানে অর্থনৈতিক সহযোগিতা প্রদান করে। পাকিস্তানে তেল, গ্যাস ও খনিজ সম্পদ আহরণ ও অনুসন্ধানে ২.৫ ভাগ সুদে ৩২.৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের সাহায্য প্রদানের চুক্তি স্বাক্ষর করে। কিন্তু পাকিস্তান তার পাশ্চাত্য ঘেষা বৈদেশিক নীতি অব্যাহত রাখলে মস্কোর প্রত্যাশা দুর্বল হয়ে পড়ে।[৫৮] বরং এই সময় পাকিস্তান চীনের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এ কারনে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। সোভিয়েত নেতা নিকিতা ক্রুশ্চেভ কমিউনিস্ট পার্টির এক সম্মেলনে পাকিস্তানের শাসক এলিট শ্রেণিকে 'সামন্তবাদী' ও 'সাম্রাজ্যবাদের তোষামদকারী' এমন এক কায়েমি স্বার্থের চক্র হিসেবে অভিহিত করেন যা প্রগতিশীলতার পথ থেকে দূরে থাকে। যদিও পাকিস্তান এর প্রতিবাদ জানায়।[৫৯] এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে তিন স্কোরাল মিগ-২১ যুদ্ধবিমান সরবরাহ করে। এর প্রতিক্রিয়ায় আইয়ুব খান এটিকে 'গুরুতর ঘটনাবলি' উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের মস্কো সফরের উদ্দেশ্য ছিল পাকিস্তানের প্রতি সোভিয়েতের ক্ষোভ প্রশমন, সন্দেহ দূর করা এবং উপমহাদেশে নিরপেক্ষ নীতির প্রত্যাশা। আইয়ুব খানের মস্কো সফরের পর প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিন ভারত সফর করেন এবং নিশ্চয়তা প্রদান করেন যে, পাকিস্তান সোভিয়েতের সম্পর্কের উন্নতি কখনই ভারত-সোভিয়েত বন্ধুত্বের বিনিময়ে সাধিত হবে না।

এই পরিস্থিতির বিবেচনায় পাকিস্তানের গণমাধ্যম যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন দুই পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিভিন্ন রকম প্রতিবেদন প্রকাশ করে। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী এই সময় বিবেচনা করে যে, সোভিয়েত রাশিয়া এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন জরুরি। পাকিস্তান নীতি-নির্ধারকগণ বিশেষভাবে জ্ঞাত ছিলেন যে, পিকিং-এর সঙ্গে তাদের গাটছাড়া বাধার ব্যাপারটি যুক্তরাষ্ট্র স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করেনি।

জুলাই মাসে ভারতের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক রিপোর্ট পর্যালোচনায় পরিলক্ষিত হয় যে, ভারত ১৯৭০ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত পঞ্চাশ জনের অধিক রাষ্ট্রদূত বিশ্বের বিভিন্ন রাজধানীতে চীন সম্পর্কে কূটনৈতিক আক্রমণ চালিয়েছে। রিপোর্টে চীন সম্পর্কে শক্ত ভাষায় বলা হয়েছে, এই প্রথমবারের মতো তারা অবক্ষুসুলভ প্রতিবেশীর মতো কাজ করছে। পাকিস্তান সম্পর্কে বলা হয়, পাকিস্তান কলোনিয়াল পদ্ধতিতে পূর্বাংশে কাজ করছে এবং সেনাবাহিনী 'সাম্রাজ্যবাদী' ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। ভারতীয় বিশ্লেষকগণ এই রিপোর্টে পরামর্শ দেন যে, চীনের হুমকি নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হওয়ার কারণ নেই, যা পূর্বের বছরগুলোতেও দিয়েছে। ১৯৬৫ সালে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পূর্বে চীন এই ধরনের হুমকি দিয়েছে যা বর্তমানে বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে বলছে। ১৯৬৫ সালে চীন ভারতের বিদেশ ও অভ্যন্তরীণ নীতি নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা করে। কিন্তু বর্তমানে তাদের সমালোচনা শুধু ভারত-পাকিস্তান ইস্যুর মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে। বিশ্লেষকগণ এটাও মনে করেন, চীনের এই ধরনের মনোভাবের নেপথ্যে রয়েছে মস্কো ও ওয়াশিংটনের বিরুদ্ধে যতটা না তারচেয়ে বেশি নয়াদিল্লির

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিরুদ্ধে। ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির পূর্বে চীন ভারতের বিরুদ্ধে বৈরিতাপূর্ণ আচরণ করেছে এমন লক্ষণ দেখা যায় না।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের মধ্যে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপনের ঘোষণা দিলে ভারতের প্রতিক্রিয়া ছিল ইতিবাচক। ভারতের বিদেশ বিষয়কমন্ত্রী শরণ সিং বরাতে বলা হয়, যুক্তরাষ্ট্র-চীনের সম্পর্ক স্বাভাবিক পর্যায়ে উন্নীত হবে এটা ভারতের প্রত্যাশা। ভারত আশা করে উভয় দেশের সম্পর্ক হবে পারস্পরিক মর্যাদা, নিরাপত্তা, সার্বভৌমত্ব এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপহীন।[৬০] লোকসভায় ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ৯ই আগস্ট সোভিয়েত-ভারত মৈত্রী চুক্তি সম্পর্কে চীন সম্পর্কে মুখ খোলেনি তার অর্থ এই নয় যে, উপমহাদেশে সোভিয়েতের লক্ষ্য সম্পর্কে তারা তাদের নিজস্ব মূল্যায়ন করা থেকে বিরত থেকেছে। তিন সপ্তাহের মধ্যেই ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী অভিমতের যথার্থতা প্রমাণ হয় চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই যুগোস্লাভিয়ার একটি পত্রিকায় যে সাক্ষাৎকার দিয়েছেন তার মাধ্যমে।[৬১] ঐ পত্রিকার সম্পদকের নিকট তিনি মন্তব্য করেন যে, দু'টি পরাশক্তি ভারত মহাসাগর নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে। চীন তা মুক্ত করার জন্য সবকিছু করবে। এই চুক্তি সম্পর্কে ৩রা সেপ্টেম্বর আরো স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় গায়েনা সফররত একটি বাণিজ্যিক প্রতিনিধি দল যাদের মধ্যে একজন মন্তব্য করে চীন অবশ্যই ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তিকে বন্ধু সুলভ কাজ মনে করে না। উক্ত প্রতিনিধি হান সুইন পিকিং-এ মন্তব্য করেন, চুক্তিটিতে সামরিক অনুচ্ছেদ যুক্ত হওয়ায় ভারতের অবস্থানকে নিচু পর্যায়ে নামিয়ে এনেছে।[৬২] ২০শে নভেম্বর চুক্তি সম্পর্কে কর্তৃপক্ষীয় মন্তব্য পাওয়া যায়। চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এক সাক্ষাৎকারে[৬৩] বলেন, "নিক্সনের চীন সফরের ঘোষণা শোনার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন দ্রুততার সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদন করেন। এর লক্ষ্য হলো ব্রেজনেভ কর্তৃক ঘোষিত 'এশিয়ান কালেক্টিভ সিকিউরিটি সিস্টেম' বাস্তবায়ন করা। যার লক্ষ্য যেসব দেশের প্রতি সোভিয়েত রাশিয়ার বৈরিতা রয়েছে তাদেরকে ঘিরে ফেলা। কিন্তু এই লক্ষ্য অর্জন করা কঠিন এ কারণে যে, অন্যকোনো দেশ এ পর্যন্ত উক্ত পরিকল্পনার পক্ষে সমর্থন জানায়নি। অন্যান্য দেশের সঙ্গে এই ধরনের চুক্তি করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রস্তুত থাকলেও অধিকাংশ দেশই তা প্রত্যাখ্যান করেছে। ২৭শে নভেম্বর জাতিসংঘে চীনা প্রতিনিধি দলের নেতা সিহাইও হুয়ান হুয়া বলেন, 'সোভিয়েত সাম্রাজ্যবাদ' ভারতের সঙ্গে সামরিক জোট বেঁধেছে এবং ভারত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সক্রিয়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানে নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডে নিয়োজিত করেছে।

৭ ক. চুক্তি পরবর্তী ভারতের মূল্যায়ন

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ২৭-২৮শে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মস্কো সফর করেন। তার এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সি কোসিগিনের এক যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়, 'পূর্ববঙ্গের জনগণের ইচ্ছা, অপরিবর্তনীয় অধিকার এবং আইনসঙ্গত স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান, দ্রুততম সময়ে শরণার্থীদের মর্যাদা,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সম্মান নিয়ে স্বদেশে ফিরে যাওয়ার' মধ্যে এই সংকটের সমাধান নিহিত রয়েছে। কিন্তু যুক্ত বিবৃতিতে ভারত ও সোভিয়েতের গুরুতর মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। রাশিয়ান ভাষ্যে 'পূর্ব পাকিস্তান' উল্লেখ করা হলেও ইংরেজি ভাষ্যে 'পূর্ববঙ্গ' উল্লেখ করা হয়। ভারতীয় বিশ্লেষকরা চারটি ঘটনার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েছেন সোভিয়েত রাশিয়া যুদ্ধকে পরিহার করতে চেয়েছিল। প্রথমত, সোভিয়েত পক্ষ থেকে ইন্দিরা গান্ধীর সেই অংশটুকু উদ্ধৃত করা হয়েছে, যেখানে ভারতে আশ্রিত পূর্ব বাংলার শরণার্থীরা যাতে অবিলম্বে স্বদেশে ফিরতে পারে সে সম্পর্কে দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছে; দ্বিতীয়ত, ইন্দিরা গান্ধী ভারত ত্যাগের পর সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী ভারতীয় সংবাদদাতাদের বলেন, শান্তিপূর্ণভাবে সমস্ত সমাধানের পথ রুদ্ধ হয়ে গেলে ভারত যুদ্ধে যেতে পারে, কিন্তু তার আগে নয়। ভারতের বিশ্লেষকরা বলেছেন, এর দ্বারা কোসেগিন এই কথা বুঝাতে চেয়েছেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে শান্তিপূর্ণ সমাধানের বাইরে অন্য কোনোভাবে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়; তৃতীয়ত, ১লা অক্টোবর পদগোর্নি নয়াদিল্লিতে পূর্ব বাংলার সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের উপর জোর দিয়ে বলেন, উপমহাদেশে সামরিক সংঘর্ষ পুনরায় সংঘটিত না হয় তা হতে বিরত থাকার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মধ্যস্থতা করতে সম্মত; এবং চতুর্থত, সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো ২০শে সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি উইলিয়াম রজার্সের সঙ্গে উপমহাদেশে পুনরায় যেন উত্তেজনা বৃদ্ধি না পায় তা রোধ করার বিষয়ে একমত হন।[৬৩] সোভিয়েত উপ-পররাষ্ট্রমন্ত্রী ফেরুবিন ও ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী অক্টোবরের শেষে নয়াদিল্লিতে একটি যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়, ভারতকে হুমকি দেওয়ার ধারণার পরিমাপ কী ধরনের এবং তা কীভাবে মোকাবেলা করা যাবে তা বিশ্লেষণ করা হচ্ছে। উপমহাদেশের বর্তমান অবস্থায় শান্তিপূর্ণ অবস্থার পরিবর্তে যে হুমকি ও উত্তেজনা বিরাজ করছে এর সম্পর্কে উভয় পক্ষ মূল্যায়ন করেন। এসময় যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণ করে যে, আগস্টের শেষদিকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সংযত করার পরিবর্তে তারা জাতিসংঘে ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে চিহ্নিত করার প্রচেষ্টার উপর ভেটো প্রয়োগ করবে। চীন বা পাকিস্তান ভারত আক্রমণ করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন জরুরি প্রয়োজনে বিমানে সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে প্রতীয়মান হয়েছে, সোভিয়েত ইউনিয়ন ইন্দিরা গান্ধীকে 'ব্ল্যাঙ্ক চেক' প্রদান করেছে।[৬৪] এ সম্পর্কে ২৯শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকোর সঙ্গে ওয়াশিংটনে আলাপ প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতকে যুদ্ধ থেকে নিবৃত্ত করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করলে গ্রোমিকো অনাগ্রহ প্রকাশ করেন। এমনকি বেসামরিক কর্তৃপক্ষের নিকট ক্ষমতা হস্তান্তরপূর্বক মার্চ মাস পর্যন্ত কেন যুক্তরাষ্ট্র পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে চায় এ সম্পর্কে তিনি ব্যাখ্যা দাবি করেননি। এসময় কিসিঞ্জারের নিকট প্রতীয়মান হয়েছে, ভারত কর্তৃক পাকিস্তানকে অপদস্ত করার সুযোগ সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে লাঞ্ছিত করার সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করবে।[৬৫] যদিও সিনেট বৈদেশিক সম্পর্ক বিষয়ক কমিটি যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক পাকিস্তানে আর্থিক ও সামরিক সরঞ্জাম স্থগিতে ভোট দিয়েছে এবং অনেক সিনেট সদস্য তখন পর্যন্ত আরো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কঠিন ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য শোরগোল করে আসছিল।[৬৬] যুক্তরাষ্ট্র মনে করে সোভিয়েতের লক্ষ্য ছিল, চীন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক উন্নয়নে একটি বিব্রতকর ফেনিল অবস্থা সৃষ্টি এবং উভয়ের দেশের মধ্যে মিত্রতার সম্পর্ক উন্নয়নে বিশ্বাসযোগ্যতার প্রশ্নে অন্তঃসারশূন্যতা প্রমান করা।

৭ খ. চুক্তি সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের মনোভাব

৯ই আগস্ট ১৯৭১ সালে ভারত-সোভিয়েতের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রসচিব হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে 'বোম শেল'-এর (Bombshell) মত প্রতিয়মান হয়। যদিও এটা ছিল বিশ বছরব্যাপী শান্তি, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা চুক্তি। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে চুক্তির ১১ অনুচ্ছেদ ব্যতীত অন্যান্য অনুচ্ছেদগুলো নিয়ে উদ্‌বিগ্ন তার কোনো কারণ ছিল না। কিসিঞ্জারের কাছে এবং বিশেষজ্ঞদের কাছে মনে হয়েছে, এর ফলে নেহেরু কন্যা ইন্দিরা গান্ধী জোটনিরপেক্ষ নীতি বর্জন করে সামরিক জোটের সঙ্গে বাধা পড়বে। সোভিয়েত ইউনিয়নও এই চুক্তিকে কূটনৈতিক সাফল্যের অন্তর্বৃত্ত বলে উল্লেখ করে। ভারতের নীতি-নির্ধারকদের কাছে এতোদিন পর্যন্ত যে সামরিক মিত্রতার বিচ্ছিন্নতা পরিলক্ষিত হচ্ছিলো এই চুক্তির ফলে এখন তারা মনে করে যুদ্ধের সময় সোভিয়েত সামরিক সরবরাহ চীন আক্রমণ করলেও তা অব্যাহত থাকবে।

৮. ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত সম্পর্ক

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের মধ্যে সম্পর্ক প্রথম দিকে উষ্ণ না থাকলেও নয়াচীনের জাতিসংঘে অন্তর্ভুক্তি ও দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে নিন্দা উভয় দেশকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কাছাকাছি নিয়ে আসে। দক্ষিণ-আফ্রিকার বর্ণবাদী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় প্রস্তাব যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য বিরোধীতা করে এবং বিষয়টি উক্ত দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় বলে অভিহিত করে। ১৯৫০ সালে ভারত জাতিসংঘে গণপ্রজাতন্ত্রী চীনকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব উত্থাপন কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন সমর্থন জানায়।

কোরিয়ার যুদ্ধে ১৩ই জুলাই ১৯৫০ সালে জওহরলাল নেহেরু স্টালিন বরাবর ব্যক্তিগত বার্তায় সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাজ্য, চীন ও অন্যান্য দেশের সহযোগিতায় একটি সমঝোতায় উপনীত হওয়ার প্রস্তাব রাখেন। নেহেরুর এই শান্তি উদ্যোগ সোভিয়েত ইউনিয়ন যথাযথ মনে করে। নেহেরু কর্তৃক কোরিয়ার যুদ্ধে শান্তি উদ্যোগ প্রাভদায় গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়। স্টালিন অতিদ্রুত এই শান্তি উদ্যোগ জাতিসংঘে কোরীয় জনগণের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে সে দেশের প্রতিনিধির বক্তব্য শোনার আগ্রহ প্রকাশ করে নেহেরুকে পত্র লেখেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে রাজনৈতিক সম্মেলনের প্রস্তাবে ভারতের অন্তর্ভুক্তির বিষয়ে সোভিয়েত সমর্থন করে। যুক্তরাষ্ট্র বিরোধীতা করে। স্টালিনের উত্তরাধিকারী মালেনকভ প্রকাশ্যে ভারতের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সুসম্পর্কের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। পাশাপাশি তিনি পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নে তার অভিমত ব্যক্ত করেন।

কিন্তু ১৯৫৩ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক সমঝোতা হয়। প্রাভদা এসময় যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকার তীব্র সমালোচনা করে বলে যে, ওয়াশিংটন পাকিস্তানে সামরিক ঘাঁটি বানাতে চায়। যার ফলে ভারতের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের বৈরীতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। পাকিস্তানে মার্কিন ঘাঁটি তৈরির পদক্ষেপ কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত জোরেশোরে উত্থাপন করে। এ সম্পর্কে সোভিয়েত মুখপাত্র *প্রাভদা* ১৬বার প্রতিবেদন ও রিপোর্ট প্রকাশ করে। ৩০শে নভেম্বর ১৯৫৩ সালে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত পাকিস্তানের ফরেন সেক্রেটারির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে জানিয়ে দেয় যে, পাকিস্তান সেন্ট্রো চুক্তির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে তা সোভিয়েত ইউনিয়নের নিরাপত্তার প্রতি হুমকি।[৬৭] ১৯৫৪ সালে সোভিয়েত-পাকিস্তান সম্পর্ক সর্বনিম্ন পর্যায়ে এসে দাড়ায় এ কারণে যে, এ সময় পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়। যদিও স্বাভাবিক যোগসূত্র অব্যাহত থাকে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন নিরস্ত্রীকরণ ফোরামে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার সর্বদা প্রচেষ্টা চালায়। ১৯৫৪ সালে জাতিসংঘ নিরস্ত্রীকরণের সাব-কমিশনে ভারতকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কমিশনের কলেবর বৃদ্ধির চেষ্টা চালানো হয়। এমনকি এ সম্পর্কিত বিতর্ক অনুষ্ঠানে সোভিয়েত প্রতিনিধি ভি. সিনোস্কি এ পর্যন্ত বলেন যে, ব্রিটেন কেন কমনওয়েলথের একজন সদস্য রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্তিতে আপত্তি জানাচ্ছে।

১৯৫৪ সালে জেনেভা কনফারেন্সে ইন্দো-চীন নেগোশিয়সনে ভারতের প্রতিনিধি কৃষ্ণ মেনন নেপথ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। রাশিয়া কারিগরি ক্ষেত্রে অনুন্নয়নশীল দেশে বিনিয়োগের জন্য ৪ মিলিয়ন রুবল জাতিসংঘ তহবিলে প্রদান করলে কেবল তা সরকারি খাতে বিনিয়োগের শর্ত থাকায় ভারত বেশি সহায়তা গ্রহণ করতে সমর্থ হয়। ১৯৫৪ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে ভারতের মধ্য প্রদেশের বিল্লাই স্টিলপ্লান্ট স্থাপনে সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তি হয়। সাংস্কৃতিক-শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যাপক শুভেচ্ছা সফর অনুষ্ঠিত হয়। এমনকি ৫টি ভারতীয় ছবি ২৪-২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯টি শহরে প্রদর্শিত হয়। রাজকাপুরের আওয়ারা এবং বিমল রায়ের দো বিঘা জমিন মস্কোতে প্রদর্শিত হয়। দশ লক্ষ লোক ছবিগুলো অবলোকন করে।

১৯৫৪ সালে ভারত চীনের সঙ্গে পঞ্চশীল নীতি তুলে ধরে যা সোভিয়েত কর্তৃক অভিনন্দিত হয়। ১৯৫৫ সালে সুপ্রীম সোভিয়েত পঞ্চশীল-এর ভিত্তিতে যে সম্পর্ক গড়ে উঠে তা অনুমোদন পূর্বক ঘোষণা করে অন্যান্য দেশও পাঁচটি নীতি গ্রহণ করতে পারে।[৬৮] এ সময় সোভিয়েত নেতৃত্বের পরিবর্তন হয়। মালেনকভের পরিবর্তে বুলগানিন ক্ষমতাসীন হন। কিন্তু ভারতের সঙ্গে স্বার্থের বিষয়ে কোনো পরিবর্তন সাধিত হয়নি। ভারতের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটতে থাকে। কিন্তু পাকিস্তানের সঙ্গে তা উষ্ণ হয়নি। কারণ পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দিকে তাকিয়ে ছিল।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু ১৯৫৫ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নে সফর করেন, সে সময় পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গড়ে তুলছে, যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক নিবিড় করেছে, ব্যবসা-বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সম্পর্কের দিগন্ত খুলে দিয়েছে। সর্বোপরি, বান্দুং সম্মেলন তার সফরের পেছনে ক্রিয়াশীল ছিল।

নেহেরুর সোভিয়েতে প্রথম সফর ছিল ঐহিতাসিক। তার সাথে ছিলেন তার কন্যা শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী। নেহেরু প্রথম মস্কো ভ্রমণ ছিল ১৯২৭ সালে তার বাবা মতিলাল নেহেরুর সঙ্গে। উক্ত ভ্রমণে নেহেরু শুধু রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সফরের বিশেষ দিক হলো তিনি জনসভায় প্রকাশ্যে ভাষণ দেন। মস্কো, লেনিনগার্ড, তাসখণ্ড অন্যান্য শহরে ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোকের সমাবেশে ভাষণ দেন। এসময় ক্রুশ্চেভ বুলগানিন সোভিয়েত নেতৃবৃন্দ তার সঙ্গে থাকতেন। সফর শেষে একটি বিবৃতি প্রকাশিত হয়। বিবৃতিতে পঞ্চশীল নীতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয়। একথাও উল্লেখ করা হয়, বৃহৎ শক্তিসম্পন্ন রাষ্ট্রগুলোর ভয়ে ছোটো ছোটো রাষ্ট্রগুলো ভীতির মধ্যে থাকে তার উল্লেখ করে এর সমাধান হিসেবে বলা হয়, শুধু শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি এক্ষেত্রে কার্যকর হতে পারে। উভয় প্রধানমন্ত্রী এমনকি যৌথ বিবৃতিতে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের সমাজ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, পরিবেশের ভিন্নতা থাকলেও সহযোগিতার ক্ষেত্রে তা বাধা হতে পারে না।[৬৯] নেহেরু মস্কো থেকে প্রত্যাবর্তনকালে বলেন, 'আমার হৃদয়কে পেছনে রেখে যাচ্ছি।' পাশ্চাত্যের গণমাধ্যমে নেহেরুর এই সফরকে সহজভাবে গ্রহণ করেনি। লন্ডন টাইমস সম্পাদকীয় মন্তব্যে প্রকাশ করে যে, সোভিয়েত-ভারত যুক্ত বিবৃতি শান্তি ও ঐক্যের ক্ষেত্রে সামান্যই অবদান রাখবে। নিউইয়র্ক টাইমস নেহেরুকে এই বলে সতর্ক করে যে, তাকে নিপুণতার সঙ্গে 'ইদুর বন্দি' করা হয়েছে।

১২ই নভেম্বর ১৯৫৫ সালে ক্রুশ্চেভ এবং বুলগানিন ও ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ দিল্লি সফরে আসেন। দিল্লি, চন্ডীগড়, জয়পুর, পুনা, বোম্বে, মাদ্রাজ, কলকাতাসহ ১১টি প্রদেশের জনসভায় জনগণের বিপুল সমাগম তাদের মনে এই বিশ্বাস দৃঢ় করে যে, প্রকৃতপক্ষে ভারতের জনগণের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কলকাতায় ক্রুশ্চেভ বলেন, গোয়া বিদেশি শাসকদের হাত থেকে শীঘ্র মুক্ত হবে। ১০ই ডিসেম্বর শ্রীনগরের এক জনসভায় ক্রুশ্চেভ্ ঘোষণা করেন, কলোনীয়াল শক্তি কাশ্মীর সমস্যার সৃষ্টি করেছে। কাশ্মীরের জনগণ ইচ্ছেমত ভারত প্রজাতন্ত্রে যোগদান করবে যা সোভিয়েত মেনে নেবে। ক্রুশ্চেভ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভক্তির নিন্দা করেন।[৭০] এসময় সুপ্রীম সোভিয়েতে ক্রুশ্চেভ কূটনৈতিক কৌশল তুলে ধরে বলেন, 'আমাদের বন্ধুদের মাধ্যমে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমরা বন্ধুত্ব স্থাপন করতে পারি।'[৭১]

মিশরের সুয়েজ খাল নিয়ে যে প্রকট সমস্যা দেখা দেয়, সে ক্ষেত্রে ভারত-সোভিয়েত দুটি দেশ প্রায় একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করে। ১৯৫৬ সালে ইন্দো-ফ্রান্স-ইসরাইল মিলিত হয়ে মিশর আক্রমণ করলে ভারত সাথে সাথে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ঐ সময় সোভিয়েত রাশিয়াও ঐ আক্রমণের তীব্র নিন্দা জানায় এবং ভয়ঙ্কর প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক করে দেয়। সুয়েজ খাল নিয়ে লন্ডন কনফারেন্সে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিনিধি স্পিলভ্ ভারতীয় প্রস্তাবকে 'সুয়েজ সমস্যা'র শান্তিপূর্ণ পরিকল্পনা হিসেবে অভিহিত করেন।[৭২] এসময় হাঙেরী সমস্যা সম্পর্কে ভারতের অভিমত ভারতীয় পার্লামেন্টে এভাবে প্রকাশ করে যে, হাঙেরীর অভ্যন্তরীণ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে দমনে সহযোগিতা করতে রাশিয়া বাধ্য হয়ে এ ব্যবস্থাকে বেছে নিতে হয়েছে। জাতিসংঘে রাশিয়ার বিরুদ্ধে ভোট দানে ভারত বিরত থাকে।

৮ ক. ভারত-চীন সংঘর্ষে সোভিয়েত নিরপেক্ষতা

মধ্য ১৯৫৯ সালের হিমালয় সীমান্তে ভারত-চীন বর্ডার গার্ডদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়–যা বিশ্বব্যাপী দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ৯ সেপ্টেম্বর *তাস*-এর মন্তব্যে বলা হয়, এই দ্বন্দ্ব ভিন্ন সামাজিক পদ্ধতি সত্ত্বেও এশিয়ার জনগণের শক্তিকে ঐক্যবদ্ধ করার বিপরীতে সহ-অবস্থানের ধারণাকে বাধাগ্রস্ত করছে। ৩০শে অক্টোবর সুপ্রীম সোভিয়েত নীতি নির্ধারণী সভায় সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী বলেন, চীন-ভারত সীমান্তে যে বিরোধ দেখা দিয়েছে উভয় দেশের সন্তুষ্টি অনুযায়ী তার সমাধান গুরুত্বপূর্ণ উপায়ে করা সঙ্গত।[৭৩] নয়াদিল্লির রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ মনে করেন, সোভিয়েতের এ মন্তব্য তাদের পক্ষে। যদিও সোভিয়েত সংঘর্ষের কারণ সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি, যাতে মনে হতে পারে তারা চীনকে সমর্থন দিয়েছে। ১৯৬০ সালে ভারতের প্রেসিডেন্ট রাজেন্দ্র প্রসাদ মস্কো ভ্রমণের সময় সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ বলেন, শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থেকে আমাদের উষ্ণ সহযোগিতার ক্ষেত্রে কেউ বাধা দিতে পারবে না।[৭৪]

১৯৬১ সালে প্রধানমন্ত্রী নেহেরু বেলগ্রেড থেকে ফিরতি পথে চারদিনের জন্য মস্কো সফর করেন। ঘানার নক্রুমার নিকট থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রকে লেখা নিউক্লিয়ার পরীক্ষা বন্ধের একটি বার্তা বহন করেন। মস্কোর জনসভায় নেহেরু তা প্রকাশ করেন। জনসভায় ক্রুশ্চেভ বলেন, জার্মান শান্তি-চুক্তি করতে পশ্চিমা শক্তি অগ্রাহ্য করেছে। সোভিয়েত ইউনিয়নের চারদিকে সামরিক ব্লক গড়ে তুলছে এবং সোভিয়েতের প্রস্তাবিত সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণ চুক্তি তারা অগ্রাহ্য করছে। যুক্ত বিবৃতিতে জার্মানির বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনের প্রচেষ্টা ভয়ংকর পরিণতি ডেকে আনবে বলে উল্লেখ করা হয়।

৮ খ. চীন-সোভিয়েত কূটনৈতিক দূরত্ব

১৯৫০ সালের ১৫ই ফেব্রুয়ারি মৈত্রী সমঝোতা চুক্তি চীন-সোভিয়েতের মধ্যে সম্পাদিত হয়। জানুয়ারি ১৯৫৭ সালে চীন-সোভিয়েত বৈঠকে ঘোষিত হয় যে, উভয় দেশ একত্রে সমাজতান্ত্রিক বিশ্বে সহযোগিতা করার ক্ষেত্রে সংকল্পবদ্ধ। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে কারিগরি দিক থেকে সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসে। সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি স্বল্প তরঙ্গের রাডার চীন ভূখণ্ডে নির্মাণের জন্য প্রস্তাব দেয়, নেপথ্য কারণ প্রশান্ত মহাসাগরে সোভিয়েত সাবমেরিনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে পরিকল্পনা। একই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের ডুবন্ত ও ভাসন্ত সাবমেরিনসমূহ যাতে পর্যবেক্ষণ করতে পারে এজন্য যৌথ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারিগরি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়; যার কমান্ড রাশিয়ার হাতে থাকার কথা বলা হয়।

মাত্ত সেতুং এর মতে, এটি হলো চীনে সোভিয়েতের সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের প্রস্ত াব। অথচ চীন চাচ্ছিল সোভিয়েত প্রযুক্তির সাহায্যে চীন নিজেই পরমাণু সাবমেরিন তৈরি করবে। চীন সোভিয়েতের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে যে, তারা চীনকে সামরিক কমান্ডে নিয়ে যাচ্ছে। চীন এসময় মনে করে সোভিয়েত যে প্রস্তাব দিয়েছে ও কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে তাতে প্রতীয়মান হয়, চীনের উপরে তাদের কোনোরূপ বিশ্বাস নেই।[৭৫]

মাও সেতুং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের নমনীয় আচরণগত নীতির বিরোধীতা করেন। তার স্লোগান, "বর্তমানে পশ্চিমের হাওয়ার চেয়ে পুবের হাওয়া অনেক শক্তিশালী।' এই নীতিতে চীন সোভিয়েতের মার্কিন নীতির প্রতি দ্বিমত প্রকাশ করে।[৭৬] এবং এই স্লোগানটি বিশ্বব্যাপী জোরোশোরে তুলে ধরলে পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়া এ পর্যায়ে আরো বিব্রত বোধ করে।

৮ গ. ভারসাম্য বিলীন হলো

১৯৬০ সালে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে পার্থক্য দৃশ্যমান হয়ে উঠে। এপ্রিল ১৯৬০ সালে লেনিনের উনিশতম জন্ম বার্ষিকী উপলক্ষ্যে চীন তাদের তত্ত্ব হাজির করে। এর মূল কথা হলো, 'বন্দুকের নল, ক্ষমতা উৎস ও বিপ্লব' ছড়িয়ে দেওয়া এবং সাম্রাজ্যবাদকে ক্রমাগত আঘাত করা। *রেড ফ্লাগ*-এ প্রকাশিত এ তত্ত্বে আন্তর্জাতিকভাবে চীনা কমুনিস্ট পার্টির মতামত তুলে ধরা হয়। এর এক মাসের মধ্যে চৌ এন লাই সীমান্ত সমস্যা নিয়ে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলোচনার জন্য দিল্লি সফর করেন। কিন্তু তা ফলপ্রসূ হয়নি। এসময় পাকিস্তানের পেশোয়ারের ঘাঁটি হতে মার্কিন গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ সোভিয়েত তার ভূখণ্ডে ভূপাতিত করে। চীন মনে করেছিল এক্ষেত্রে সোভিয়েত ইউনিয়ন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নেবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ মে মাসে ক্যাম্প ডেভিড কনফারেন্সে এ সম্পর্কে উত্তপ্ত বাক্য প্রয়োগ করলেও চীন-রাশিয়াকে কাছাকাছি আনতে সমর্থ হয়নি। চীন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক গোয়েন্দা বিমান ইউ-২ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রুশ্চেভের বক্তব্যে সমর্থন দানের ক্ষেত্রে চীন নেতৃবৃন্দ এগিয়ে আসে। ভারতের বক্তব্য ছিলো মার্কিনঘেষা, তা ছিল সোভিয়েত সমর্থনের চেয়ে বেশি। চীন সে সময় মস্কোর নিকট প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে যে, ভারত হলো 'সুন্দর আবহাওয়ার বন্ধু'।[৭৭]

মাও সেতুং ক্রমাগতভাবে ক্রুশ্চেভের সমালোচনায় অগ্রসর হয় এবং সোভিয়েতকে সংশোধনবাদী হিসেবে আক্রমণ করতে থাকেন। ১৯৫৮ সালের জুলাই মাসে ইরাকে গভীর সংকট দেখা দিলে মার্কিন-ব্রিটিশ সৈন্য তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসে। এ সময় চীন সোভিয়েতকে জোর দিয়ে বলে যে, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান গ্রহণ করতে হবে। কিন্তু ক্রুশ্চেভ শক্ত অবস্থান গ্রহণ না করে ১৯শে জুলাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ভারত রাষ্ট্রবর্গের নেতৃবৃন্দ কীভাবে এই সংকট মোকাবিলা করা যায় তার জন্য একটি শীর্ষ সামিট গ্রহণের উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রস্তাব দেয়। এই

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রস্তাব মস্কো-দিল্লির সম্পর্ক উন্নয়ন হয় এবং চীন আড়ালে পড়ে যায়। ১৯৫৭ সালের অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন চীনকে পরমানু অস্ত্র নির্মাণে বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তি এবং কারিগরি সহযোগিতা দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু ১৯৫৯ সালের ২০শে জুন রাশিয়া জানিয়ে দেয়, যে ধরনের প্রযুক্তি ও বোমা বা অস্ত্র রাশিয়া নিজেদের জন্য তৈরি করে সে অনুরূপ প্রযুক্তিগত সাহায্য ও সহযোগিতা তারা করবে না।

চীন এসময় তিব্বত সংক্রান্ত বিষয়ে নেহেরু সম্পর্কে কড়া সমালোচনা করতে থাকে। অথচ সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে জওহরলাল নেহেরু একজন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন নেতৃত্ব, যার প্রজ্ঞা সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব নির্মাণে সাহায্য করবে। এসময় দালাইলামা ভারতে চলে আসার পেছনে চীনকে পরোক্ষভাবে দায়ী করে। নেহেরু সব সময় বলে এসেছে তিব্বত চীনের অংশ। তারপরও নেহেরুর বা ভারতের বিরুদ্ধে আগ্রাসন সোভিয়েতের মতে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিই এতে লাভবান হবে।[৭৮] মস্কো ও পিকিং কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ক্রমশ: দূরে সরে যায় এবং সেক্ষেত্রে এ সময় লক্ষণীয় ভারত মস্কোর দিকে হাত বাড়ায়।

৯. পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়েনের সম্পর্ক

প্রাথমিকভাবে রাশিয়ান তাত্ত্বিকেরা যেমন দেকভ লিখেছেন, পাকিস্তন 'একটি আর্টিফিসিয়াল রাষ্ট্র' এবং মন্তব্য করেন, এর দুই অঞ্চলের মধ্যে একমাত্র সংযোগ ধর্ম। রাশিয়ার অনেক লেখক মার্ক্সীয় দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানকে মার্ক্সীয় মতবাদ ও আদর্শের ক্ষেত্র হিসেবে মনে করেনি। ভারতীয় রাষ্ট্রদূত কে.পি.এস. মেননকে ১৯৫৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে স্টালিন বলেছিলেন, এটি আদিম অবস্থার মত যেখানে ধর্মের ভিত্তিতে একটি রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে।[৭৯] পাকিস্তান প্রকৃত অর্থেই ধর্মের ভিত্তিতে দ্বি-জাতিতত্ত্বের মোড়কে গঠিত একটি রাষ্ট্র। সেজন্য ইসলাম ধর্মের মূলনীতি অনুসারে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা মৌলনীতি বিরুদ্ধ হওয়ায় সোভিয়েত রাশিয়ার আগ্রহের উদ্রেক করেনি।

পাকিস্তান প্রথম থেকেই প্যান-ইসলামিক শক্তির প্রতি ঝুলে পড়ায় রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। মস্কো প্রথম ইসলামিক অর্থনৈতিক সম্মেলন করাচিতে আহবান করার নিন্দা জ্ঞাপন করে। পাকিস্তানের পাশ্চাত্য-ঘেষা নীতির কারণে সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্তান রাষ্ট্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনে সন্দেহ পোষণ করে। রাশিয়া মনে করে, ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তানের গোপন চুক্তি রয়েছে এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ও অন্যত্র তাদেরকে ঘাঁটি দেওয়া হয়েছে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে মার্কিনীদের ঘনঘন যাতায়াতকে সোভিয়েতের সন্দেহকে দৃঢ় করে। এমনকি খাইবার পাশ পর্যন্ত তাদের গমনাগমন, ছবি তোলা-এসব মিলিয়ে প্রতীয়মান হয় যে, পাকিস্তানে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ঘাঁটি গড়ে তুলেছে।

এ ছাড়া কোরীয় যুদ্ধে পাকিস্তানের ভূমিকা সোভিয়েতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্কোন্নয়নে অন্তরায় সৃষ্টি করে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান প্রকাশ্যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘের প্রতি সমর্থন ঘোষণা করে উত্তর কোরিয়ার পদক্ষেপকে পরিষ্কার আগ্রাসন হিসেবে চিহ্নিত করে। এমনকি দক্ষিণ কোরিয়াকে সাহায্যের জন্য পাঁচ হাজার টন গম অনুদান হিসেবে ঘোষণা করে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর এই পদক্ষেপকে সোভিয়েত পত্রিকা 'লিয়াকত আলী খানের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে টিকে থাকার উদ্দীপক হিসেবে' মন্তব্য করে।[৮০]

১৯৫০-৫২ এ দুই বছর সোভিয়েত গণমাধ্যম কাশ্মীর সমস্যা সম্পর্কে ভারতের পক্ষে ব্যাপকভাবে সমর্থন করে। কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এই প্রচারের বিরুদ্ধে সক্রিয় সমর্থনের জন্য পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। ১৯৫২ সালের ১৯শে জুন *প্রাভদা* ইতালির *অভান্তি* পত্রিকার বরাত দিয়ে প্রকাশ করে যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে শুধু সামরিক বা অর্থনৈতিক সাহায্য করছে না, যুক্তরাষ্ট্র সক্রিয়ভাবে কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে পাকিস্তানের ভূমিকাকে সমর্থন করছে। ১৯৬০ সালের ৯ই আগস্ট *ইজভেস্তিয়া* রিপোর্ট প্রকাশ করে যে, কাশ্মীর সমর্থনের বিপরীতে পাকিস্তান কোরীয় যুদ্ধে মার্কিন পক্ষ অবলম্বন করেছে।

পাকিস্তান প্যান-ইসলামিইজম-এর মুখোশ পড়ে মধ্যপ্রাচ্য ও দূরপ্রাচ্য দেশগুলোতে সোভিয়েতবিরোধী জোটকে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালায়। সোভিয়েত তাত্ত্বিক দেভক-এর পর্যবেক্ষণ হলো, পাকিস্তান সোভিয়েত ব্লকের বিরুদ্ধে মুসলিম বিশ্বের বিশেষ করে মধ্যপ্রাচ্যে প্যান-ইসলামিজমের স্লোগান তোলে যা প্রকারান্তে আমেরিকা ও ব্রিটেনের অক্ষশক্তির পক্ষে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।[৮১]

১৯৫০ সালে পাকিস্তান সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলে এবং পরস্পর রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে। নীতি-নির্ধারকগণ উপলব্ধি করেন যে, রাষ্ট্র হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের দ্বি-পাক্ষিক সম্পর্ক গড়ে তোলা প্রয়োজন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যারা ছিল জমিদার ভূস্বামী তারা কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করে সমাজতান্ত্রিক দেশের বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছে।[৮২] ১৯৫৪ সালে পূর্ববঙ্গে যুক্তফ্রন্ট বিজয় হওয়ার ফলে পাকিস্তানের রাজনীতি ও কূটনীতিক ক্ষেত্র নতুন ধারার দিকে মোড় নেয়। পাকিস্তান নীতিগতভাবে জোটবদ্ধ নীতির পাশাপাশি দ্বি-পাক্ষিক কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করে। ১৯৪৭ সালে আফগানিস্তান জাতিসংঘে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্তির ক্ষেত্রে বিরোধীতা করে এবং ঐ বছরের ডিসেম্বর মাসে পাখতুনিস্তানের দাবি তুলে ধরে। সেজন্য ১৯৫১ সন পর্যন্ত উভয় দেশের সীমান্তে উত্তেজনা ও সংঘর্ষ চলতে থাকে। এমনকি ১৯৫৫ সালে কাবুলে পাকিস্তানের দূতাবাস থেকে পতাকা নামিয়ে ফেলা হয়। এর পরিণতিতে পেশোয়ারে আফগান কন্সুলেট আক্রমণ করা হয় ও পতাকা পুড়িয়ে দেয়া হয়। এ ক্ষেত্রে ইরান, তুরস্ক, মিশর হস্তক্ষেপ করে এবং ১৯৫৫ সালের অক্টোবর মাসে উভয় দেশে পুনরায় রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত হন।

ক্রুশ্চেভ ডিসেম্বর মাসে আফগানিস্তানের দাবি অনুসারে পাখতুনিস্তানকে সমর্থন করে, যা ছিল আগুনে তেল ঢালার মতো। আফগানিস্তানে সোভিয়েত প্রভাব প্রচণ্ডভাবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বৃদ্ধি পায়। পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের হাত বাড়িয়ে দেয়। প্রেসিডেন্ট ইসকান্দার মীর্জা এবং প্রধানমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৫৬ এবং ১৯৫৭ সালে কাবুল সফর করেন। আফগানিস্তানের প্রধানমন্ত্রী দাউদ খান ও বাদশাহ জহির শাহ্ ১৯৫৭ এবং ১৯৫৮ সালে পাকিস্তান সফর করেন। ১৯৫৭ সালে বিমান চুক্তি, ১৯৫৮ সালে ভিসা চুক্তি, ১৯৫৯ সালে টেলিযোগাযোগ চুক্তি দু'দেশের মধ্যে সম্পন্ন হয়। ১৯৫৯ সালে সোভিয়েত সমর্থনে আফগানিস্তান পুনরায় পাখতুনিস্তান দাবি করলে অবস্থার অবনতি হয়। অন্যদিকে, ১৯৬১ সালের মার্চ মাসে পাকিস্তান-সোভিয়েত সম্পর্কের উন্নতি হলেও কাশ্মীর প্রশ্নে ১৯৬২ সালে জাতিসংঘে রাশিয়া পুনরায় ভেটো প্রয়োগ করে। এসময় পাকিস্তান উপলব্ধি করে যে, পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন অপরিহার্য। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-সোভিয়েত সম্পর্ক নতুন দিকে মোড় নেয়। পাকিস্তান লক্ষ্য করে ভারত-চীন যুদ্ধের পর থেকে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ভারতকে ব্যাপক অস্ত্র সরবরাহ করে আসছে। এসময় চীনের সঙ্গে পাকিস্তান সীমান্ত চুক্তি করলে অবস্থার আরো অবনতি হয়। ফলশ্রুতিতে, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জনসন প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিতব্য মার্কিন সফর আকস্মিক বাতিল ঘোষণা করেন। ঋণ স্থগিত করে। এসময় আইয়ুব খান উপলব্ধি করেন যে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের বন্ধু নয়, প্রভু হিসেবে ব্যবহার করছে।[৮৩] এ প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত সফর করেন। বিশ্লেষকগণ মনে করেন, রাশিয়া কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এতোদিন পর্যন্ত আফগানিস্তান ও পাখতুনিস্তান সমস্যাকে সামনে রেখে পাকিস্তানের সঙ্গে 'ঝাঁঝালো' সম্পর্ক তৈরি করেছিল। ১৯৬৫ সালের ২৯শে জুলাই সোভিয়েত রাশিয়া অর্থনৈতিক সহায়তা প্রদান করে। সোভিয়েত পরিকল্পনাবিদরা ২৮শে আগস্ট এবং ২৪শে অক্টোবর পাকিস্তানে আগমন করে। সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্তানকে তৃতীয় বার্ষিক পরিকল্পনা ৩০টি বৃহৎ প্রকল্পে সহায়তা দান ঘোষণা করে। পাকিস্তানের সামরিক প্রতিনিধি দল ১৯৬৬ সালের জুন মাসে সোভিয়েত ভ্রমণে যান। ১৯৬৮ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসেগিন পাকিস্তানে এই প্রথমবারের মত সফর করেন। ১৯৬৮ সালে সোভিয়েত রাশিয়া পাকিস্তানে অস্ত্র বিক্রয়ের চুক্তি করে।[৮৪]

সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট পশ্চিম পাকিস্তান ভূ-রাজনৈতিক স্ট্র্যাটেজিক অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়েছে। ১৯৬৫ সালের যুদ্ধের পর থেকে শুধুমাত্র ভারতকে সমর্থন করার নীতিমালা থেকে সরে এসে সোভিয়েত ইউনিয়ন একটি নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। একটি পরাশক্তি হিসেবে সোভিয়েত ইউনিয়ন আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক স্বার্থে ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সমঝোতার উদ্যোগ নেয়, যার ফলশ্রুতি তাসখন্দ চুক্তি। এই চুক্তির ফলে পাকিস্তান-সোভিয়েত রাশিয়ার সম্পর্ক উন্নয়ন ঘটে। বাণিজ্য, সাহায্য, পারস্পরিক যোগাযোগ ও বিভিন্ন রকম চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এমনকি ১৯৬৮ সালে ভারতের আপত্তি সত্ত্বেও সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ করে। ঐ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বছরের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসেগিন পাকিস্তান সফরে আসেন এবং পারস্পরিক সহযোগিতার দৃষ্টান্ত হিসেবে কালাবাগ স্টিল মিল ও পূর্ব পাকিস্তানে আনবিক প্রকল্প সহায়তার ঘোষণা দেন। কয়েক মাস পর পাকিস্তান সেনাবাহিনীর প্রধান মস্কো সফর করেন এবং পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহে সোভিয়েতের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়। ১৯৬৯ সালের মার্চ মাসে দ্বিতীয় সপ্তাহে সোভিয়েত প্রতিরক্ষামন্ত্রী মার্শাল গ্রেসকো পাকিস্তান সফর করেন। তিনি পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের সোভিয়েত মিলিটারি একাডেমি পরিদর্শন এবং সোভিয়েত নৌজাহাজ পাকিস্তান বন্দর থেকে যেন মেরামত ও জ্বালানি পেতে পারে সে প্রস্তাব রাখেন। মার্শাল গ্রেসকোর সফরসঙ্গীর সঙ্গে রাজনৈতিক কর্মকর্তাগণ যারা তার সঙ্গে এসেছিলেন তারা প্রস্তাব রাখেন যে, ভারত-পাকিস্তানের বিরোধ ধাপে ধাপে মিটাতে হবে এবং কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের ক্ষেত্রে মূল ইস্যু হিসেবে আলোচনা করা যাবে না। এমনকি তারা পাকিস্তানের অর্থনীতির উন্নয়নে সন্তোষ প্রকাশ করেন, যদিও ভারতের অর্থনীতি ও রাজনীতি নিয়ে তারা উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। কিন্তু তারা এটাও বলেন, তাদের নিকট সবচেয়ে বড় উদ্‌বেগের কারণ হলো চীন। চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের পর চীন মধ্যপ্রাচ্যসহ বিশ্বব্যাপী নানাভাবে সোভিয়েতের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালায় যা সোভিয়েত ইউনিয়ন 'জ্বালাতন' হিসেবে বিবেচনা করেছে।

ইয়াহিয়া খান পাকিস্তানের ক্ষমতা গ্রহণের দুই মাসের মধ্যে ৩০শে মে, ১৯৬৯ সালে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান সফর করেন। তিনি পাকিস্তানের গণতন্ত্র পূর্ণঃপ্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণের প্রশংসা করেন। আশা করেন যে, পাকিস্তান-সোভিয়েত সম্পর্ক প্রকৃত অর্থেই বিশ্বস্ততা ও পারস্পরিক সহযোগিতা উন্নীত হবে। কোসেগিন ইয়াহিয়া খানকে বলেন, ভারত এবং আফগানিস্তানের সঙ্গে পাকিস্তান বন্ধুত্ব স্থাপনে আগ্রহী। কিন্তু কাশ্মীর ও পাখতুনিস্তান ইস্যুতে তৃতীয় পক্ষ নাক গলালে তা জটিল হবে। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসেগিন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে সরাসরি আফগানিস্তানের বাদশাহ জহির শাহ্ ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে কথা বলার আহ্বান জানান। একইসঙ্গে চীনের গৃহীত পলিসির তীব্র সমালোচনা করে বলেন, 'আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে চীনকে কোন দেশ সাহায্য করে সে সম্পর্কে সোভিয়েত রাশিয়া উদাসীন থাকবে না।'[৮৫] কোসেগিন আরো সুনির্দিষ্টভাবে ভারত-পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে বৈঠক করার এবং এসব দেশগুলোর মধ্যে ট্রানজিট, বাণিজ্য চুক্তি বিষয়ে প্রস্তাব করেন। তিনি একথাও বলেন, এক্ষেত্রে কোনো রাজনৈতিক জটিলতা বা আলোচনা হবে না। অন্যান্য দেশ যেমন, ইরান এবং তুরস্ক পরবর্তীকালে অংশগ্রহণ করবে এবং এই ট্রানজিট বাণিজ্য ইউরোপ পর্যন্ত বিস্তৃত হবে। কিন্তু ইয়াহিয়া খান এ বিষয়ে আলোচনার জন্য আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসেনি এবং এরকম ব্যবহার করেছেন যে, বিষয়টি রাষ্ট্রের জন্য জটিলতাপূর্ণ। তারপরও কোসেগিন মনে করেছেন ইয়াহিয়া খান প্রস্তাব সম্পর্কে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছেন।

১৯৬৯ সালের ৭ই জুন মস্কোতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট সম্মেলনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রেসিডেন্ট ব্রেজনেভ এশিয়ায় কালেক্টিভ সিকিউরিটি সিস্টেমের প্রস্তাব করেন এবং এ ব্যাপারে একটি ধারণাপত্র পাকিস্তান সরকারের নিকট মন্তব্যের জন্য প্রেরণ করেন। এটা কোনো সামরিক জোট তৈরির জন্য নয়, বরং পারস্পরিক নিরাপত্তার জন্য শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার মাধ্যমে বিভিন্ন সামাজিক পদ্ধতির ব্যবস্থাপনা, শক্তি প্রয়োগ আনুষ্ঠানিকভাবে পরিত্যাগ, রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ভূখণ্ডগত সম্মতি এবং অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ বন্ধ। পাকিস্তান পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় পর্যালোচনা করে স্পষ্টত দেখতে পায় এই প্রস্তাবের লক্ষ্য চীনকে একঘরে করে ফেলা। পাকিস্তান সেজন্য এ প্রস্তাবে নির্দেশ করে যে, এশিয়ার নিরাপত্তা পদ্ধতি চীনকে বাদ দিয়ে করলে তা উত্তেজনা বৃদ্ধি পাবে এবং এশিয়ার দেশগুলোতে সংঘর্ষকে উস্কে দেওয়া হবে। এসময় চীন পাকিস্তানকে সতর্ক করে দেয় যে, ট্রানজিট, বাণিজ্য চুক্তি এই হালকা দাবিটি প্রকৃতঅর্থে যৌথ অর্থনৈতিক উদ্যোগের জন্য এবং যা এশিয়ান সিকোরিটি সিস্টেমের দিকে এগিয়ে যাবে। চীন দ্ব্যর্থহীনভাবে বলে দেয় এটা সামগ্রিক অর্থে চীনের বিরুদ্ধে।

ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী প্রাথমিক পর্যায়ে এশিয়ান সিকিউরিটি সিস্টেম নিয়ে সতর্ক মন্তব্য করেন। কিন্তু ১৯৭০ সালের মার্চ মাসে ভারত সরকার এই পরিকল্পনাকে 'কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ নতুন উন্নয়ন' এবং একথা উল্লেখ করে যে, ইউরোপীয় শক্তির মতো সোভিয়েত ইউনিয়ন এশিয়ান শক্তিও বটে।[৮৬] একইসাথে ভারত ট্রানজিট চুক্তি নিয়ে কাবুলে পাঁচজাতির সম্মেলন অনুষ্ঠানের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানান।[৮৭] পাকিস্তান ব্রেজনেভ পরিকল্পনা ট্রানজিট বাণিজ্য প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করে। সোভিয়েত ইউনিয়ন এর প্রতিক্রিয়ায় ১৯৭০ সালের প্রথম দিকেই পাকিস্তানে অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান মস্কো সফরে যান এবং পদগোর্নির সঙ্গে দেখা করে বিষয়গুলো উত্থাপন করলে কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব পাননি। বরং ইয়াহিয়া খানকে বলে দেয়া হয়, ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে উপমহাদেশে উত্তেজনা প্রশমন সম্পর্কে আলোচনা করতে। ইয়াহিয়া আগ্রহ দেখান কিন্তু এর সঙ্গে একথা বলেন যে, কাশ্মীর সম্পর্কে আলোচনা হবে না, এ সম্পর্কে ভারতকে একটি বিবৃতি দিতে হবে। এ সফরে সোভিয়েত সরকার করাচি স্টিল মিলের জন্য ২০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বরাদ্দ করে এবং আশা প্রকাশ করে যে, অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার হবে। কিন্তু অস্ত্র সরবরাহ বন্ধ থাকবে। ১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত প্রেসিডেন্টকে জানায় যে, ইন্দিরা গান্ধী মনে করেন যে, শীর্ষ সম্মেলনের জন্য বিদ্যমান অবস্থা সঠিক সময় নয়, বরং মন্ত্রীপর্যায়ে সভা করে ভবিষ্যতের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে, ১৯৭০ সালের আগস্ট মাসে কারাকোরাম মহাসড়ক খুলে দেওয়ার ফলে চীন ভারত মহাসাগরে আসার সুযোগ পেয়ে যায়। ভারত এসময় বিচ্ছিন্নভাবে সংঘটিত চীন এবং সোভিয়েত সীমান্ত সংঘর্ষে রাশিয়াকে সমর্থন করে, কিন্তু পাকিস্তান নিরপেক্ষ থাকে। এসময় ভারত এবং পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে দু'টি ঘটনা ঘটে। একটি হলো ভারতের জাতীয় নির্বাচনে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় বিপুল সংখ্যক আসন লাভ করেন; অন্যটি হলো, পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলাদেশের শেখ মুজিবুর রহমান সমগ্র পাকিস্তানে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করেন। উপমহাদেশের এই দুটি ঘটনা ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য তৃপ্তিদায়ক, যা পরবর্তীকালে ঘটনাবহুল রক্তাক্ত দৃশ্যমান ট্রাজেডি ও কূটনৈতিক বিশ্ব পরিমণ্ডলকে তোলপাড় করে তুলে।

১০. ব্রিটেনের ভূমিকা: ভারত-পাকিস্তান

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেনের সংশ্লিষ্টতা নানামাত্রিকতায় পর্যবেক্ষণ করা যেতে পারে। কিন্তু কূটনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'কভার' ডিপ্লোমেসির অন্তর্ভুক্ত করাই বিধেয়। গোপনে ও নীরবে তাদের নির্দিষ্ট অথচ সীমিত কূটনৈতিক তৎপরতার বিষয়টি অনেক গবেষকই এড়িয়ে গেছেন।

প্রবাসে বাঙালিদের বসবাস ব্রিটেনে ছিল সবচেয়ে বেশি। একটি উদার গণতান্ত্রিক দেশে বসবাসরত বাঙালিদের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর ঘটনাবলি নিয়ে তাদের মধ্যে ক্রিয়া এবং প্রতিক্রিয়া ছিল ত্বরিৎ ও গতিশীল। পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার পর হতেই পূর্ব বাংলার বাঙালিদের উপরে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী যেভাবে অবহেলা, নিপীড়ন ও নির্যাতন চালিয়েছে। স্বদেশে ও ব্রিটেনেও যে বৈষম্যমূলক আচরণ করেছে স্বাভাবিকভাবেই সে কারনে প্রবাসী বাঙালিরা ছিল ক্ষুব্ধ এবং সংগ্রামী। বিদেশে থাকলেও পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি তাদেরকে আলোড়িত করেছে নানাভাবে। নিপীড়ন, নির্যাতন ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে সবসময়ই তারা ছিল সংগ্রামরত। ভাষা আন্দোলন, স্বায়ত্তশাসন, স্বাধিকারের সংগ্রাম প্রতিটি ক্ষেত্রেই তারা বিদেশে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিজয়ী হলে তাদের যেমন উজ্জ্বল উপস্থিতির মধ্যে পাই, তেমনি স্বাধীনতা সংগ্রামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত শুরু হলে তাদের উচ্চকিত কণ্ঠস্বর বিশ্ববাসীকে আকৃষ্ট করেছে। ২৫শে মার্চ পাকিস্তানি সামরিক জান্তা বাঙালি জাতির উপর আক্রমণ করলে লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিরা তাৎক্ষণিকভাবেই প্রতিবাদ, আন্দোলন গড়ে তোলে এবং বিশ্বব্যাপী তা বিস্তৃত করার লক্ষ্যে কূটনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। এ কথাগুলো বলার উদ্দেশ্য হলো তাদের এই আন্দোলনের সঙ্গে সে দেশের জনগণ, গণমাধ্যম, সরকার এবং বিরোধীদলসমূহ কীভাবে সক্রিয়তা দেখিয়েছে তা যেমন বিচার্য তেমনি কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটেন বাংলাদেশকে ঘিরে যেসব গোপন পদক্ষেপ নিয়েছে তাও উদ্‌ঘাটিত হওয়া প্রয়োজন। মার্চ মাসে ইসলামাবাদের ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস থেকে প্রেরিত এক টেলিগ্রামে পাকিস্তান সামরিক জান্তার মনোভাব জানিয়ে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরে আসবে বলে আমি মনে করি না। বাঙালির নেতৃত্ব চলে যাবে আন্ডারগ্রাউন্ডে অবস্থানরত উগ্রপন্থিদের হাতে। পরিস্থিতি একটু শান্ত হয়ে আসার পর থেকেই প্রতিরোধ মুভমেন্ট শুরু হবে বলে আমি মনে করি; প্রায়ই তা হয়তো ছোটোখাটো ডাকাতির মতো মনে হবে এবং কিন্তু তা অনির্দিষ্ট কাল ধরে চলতে থাকবে। নক্সালপন্থি এবং অস্ত্রের প্রবেশ ঘটবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্থনৈতিক জীবন প্রবলভাবে অসংগঠিত হয়ে পড়বে। ধনী ও বিদেশি নাগরিকগণ বিপজ্জনকভাবে আক্রান্ত হবেন ও অপহৃত হবেন। সন্দেহ নেই, সেনাবাহিনী বিশ্বাস করে যে, যখন কিছু সংখ্যক ষড়যন্ত্রকারীকে জনগণের মধ্যে থেকে নিশ্চিহ্ন করা হবে, তখন তারা পাকিস্তানের অংশ হয়ে থাকতে চাইবে। কিন্তু প্রতিরোধের তীব্রতা যখন বাড়বে তখন ব্রিটিশ কর্মকর্তার মনে হয়েছে সেনাবাহিনী নিরাপদে ক্যান্টমেন্টে অবস্থানকেই বেছে নেবে এবং দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়বে, যতটা চলবে তা স্বয়ম্ভু এবং এটা সর্বাংশেই সত্য প্রমাণিত হবে।[৮৮] ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূতের এই বিবরণ কূটনৈতিক ব্যাখ্যার আওতাভুক্ত করলে দেখা যাবে, গেরিলাযুদ্ধ তীব্রতর হবে এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী ডিফেন্সিভ অবস্থায় চলে যাবে।

৩১শে মার্চ পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে চিঠি লিখে জানান যে, শেখ মুজিবের শেষ মুহূর্তের আলোচনাগুলোর সরলার্থ হলো দেশের বিভাজন। সেজন্য সরকার বাধ্য হয়েই রাষ্ট্রের অখণ্ডতা রক্ষার্থে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। পত্রে ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলা হয়, ভারত পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে স্পষ্টভাবে নাক গলাচ্ছে যা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের গোচরে আনা জরুরি। সীমান্তে ভারতীয় সৈন্যের উপস্থিতি পাকিস্তানের নিরাপত্তার জন্য হুমকি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের এই পত্রে ব্যাপক হত্যাযজ্ঞের বিষয়টি উল্লেখ করা হয়নি। পাকিস্তানে নিযুক্ত ব্রিটিশ হাই কমিশনার স্যার সিরিল পিকার্ড প্রেরিত এক টেলিগ্রামে এটা স্পষ্ট যে, ইয়াহিয়া-ভুট্টো চক্র নির্বাচিত নেতা শেখ মুজিবের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে।

৭ই এপ্রিল ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ইয়াহিয়া খানকে এক ব্যক্তিগত পত্রে বলেন, সমস্যার রাজনৈতিক সমাধান প্রয়োজন। এই পত্রে উল্লেখযোগ্য দিক হলো, পাকিস্তান সামরিক জান্তার হাতে বন্দি শেখ মুজিবুর রহমানকে প্রকাশ্যে জনসমক্ষে নিয়ে আসার জন্য প্রেসিডেন্টের উপরে চাপ সৃষ্টি করেন। একইসাথে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ভারত সরকারের নিকট থেকে তিনি এই মর্মে নিশ্চয়তা পেয়েছেন যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারত কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ করবে না। প্রধানমন্ত্রী বার্তা হস্তান্তর কালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রধানমন্ত্রীর বার্তায় 'রক্তপাত' শব্দটি ব্যবহারে মর্মাহত হয়েছেন বলে উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্ট আরো বলেন, রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট পদগর্নি 'রক্তপাত' ও 'নিষ্ঠুরতা'র বিরুদ্ধে তাঁর বার্তায় অত্যন্ত রূঢ় শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে উল্লেখ করেন।

১৫ই এপ্রিল ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ সেক্রেটারি স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম এমপি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর সঙ্গে আলোচনায় বলেন, গণতান্ত্রিক ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসী শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ নেতৃত্বকে যদি শেষ করে দেওয়া হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানের নেতৃত্ব কমিউনিস্ট বিশেষকরে চীনপন্থিদের হাতে চলে যাবে। অ্যালেক ডগলাস হিউমের মন্তব্য ছিল, পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা এক হলে একটি কমিউনিস্ট রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা হবে। সে কারণে ধারণা হয় ব্রিটিশ কূটনীতি সর্বদা বাংলাদেশ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংকটকে অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় রাখতে চেয়েছেন।

ব্রিটেন সর্বদা বলে এসেছে বর্তমান সমস্যা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার। ব্রিটেন পাকিস্তানে সামরিক সরঞ্জাম পাঠানোর ব্যাপারে অনীহা প্রকাশ করে। এ সময় ব্রিটেনের নীতিগত আবস্থান হল, পাকিস্তানের কাছে ব্রিটেন অস্ত্র বিক্রি করে থাকে এটা ঠিক, কিন্তু এই পর্যায়ে পাকিস্তানের সরকারের পক্ষ থেকে কোনো অস্ত্রের অর্ডার এলে তা বিবেচনার জন্য সময়ক্ষেপণ করা হবে। ব্রিটেন এ সময় মানবিক সাহায্য প্রদানের জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের নিকট আবেদন করার জন্য জাতিসংঘ মহাসচিবকে অনুরোধ করে।

৩রা মে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রেরিত স্পেশাল এনভয় মিয়া আরশাদ হোসোনের সঙ্গে বৈঠকে ফরেন সেক্রেটারি স্যার অ্যালেক ডগলাস হীউম বলেন, ব্রিটেন মনে করে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মৌন থাকা ব্রিটেনের কর্তব্য। তবে পাকিস্তান সেনাবাহিনী যেভাবে গণহত্যা চালাচ্ছে সেক্ষেত্রে এই 'নীরবতা' ব্রিটেনের জনগণের সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

১৩ই মে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর একটি পত্র ভারতীয় হাই কমিশনার আপা বি. পান্থ ব্রিটিশ হাই কমিশনারের নিকট হস্তান্তর করেন। পত্রের একটি অংশে বলা হয়, বন্দুকের নল ঠেকিয়ে রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্য আদায় করা সম্ভব নয়। জনগণের ইচ্ছাকে শক্তভাবে থামিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে উগ্ররাজনৈতিক শক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠছে। পত্রে আরো বলা হয়, যুক্তরাজ্য পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীকে চাপ প্রয়োগ করে বুঝাতে বাধ্য করে, যেন পাকিস্তান তার নিজস্ব নাগরিকের উপর অমানবিক অত্যাচার না চালায় এবং বিদেশি রাষ্ট্রে তাদের আশ্রয় গ্রহণ করতে না হয়। পত্রে বন্দি শেখ মুজিবের নিরাপত্তার বিষয়টি জোর দেয়া হয়। পত্রের উত্তরে ২০শে মে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বলেন, "আমি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে ব্যক্তিগতভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরাপত্তার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি।" কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ভারত ও ব্রিটেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা সমর্থকে একই ধরনের মনোভাব প্রকাশ করেন।

১১ই জুন প্রধানমন্ত্রী হীথ শরণার্থীদের বিষয়টি উল্লেখ করে ইয়হিয়া খানকে লেখেন মর্মান্তিক মানবিক সমস্যার সমাধান করা না গেলে বিশ্ব সম্প্রদায় উদ্‌বেগাকুল হয়ে পড়বে। এর সঙ্গে তিনি এও বলেন, এর জন্য রাজনৈতিক সমাধান জরুরি। ২১শে জুন প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ১০নং ডাউন স্ট্রিটে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী শরণ সিং-এর সঙ্গে আলোচনায় বলেন, ব্রিটেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বারবারই সমস্যার রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়ে তাগিদ দিয়েছে। এ সময় ইয়াহিয়া খানের পরিকল্পনা অনুসারে বিকল্প সরকার গঠনে কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করলে তা সফল হবে কিনা জানতে চাইলে শরণ সিং বলেন, 'তারা সবসময় দেশদ্রোহী হিসেবে চিহ্নিত থাকবে।'

ব্রিটিশ সরকারের কর্মকাণ্ড পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জুলাই মাসে ব্রিটেন পূর্ব পাকিস্তানের বিষয়টি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে তোলার চিন্তা-ভাবনা করছে। তবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটেনের শঙ্কার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে চীন যদি এর মধ্যে নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী সদস্য হয়ে যায়, তাহলে পূর্ব পাকিস্তান সংকট নিরসন কঠিন হয়ে পড়বে। যুক্তরাষ্ট্র উদ্যোগ নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে চীনকে স্থায়ী সদস্য করে নেয় যা ছিল ব্রিটেনের উদ্‌বেগের কারণ। কারণ ব্রিটেনের অজানা ছিল না যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে চীন পাকিস্তানের পক্ষ নেবে এবং ভারতের তীব্র বিরোধীতা করবে যেটা হবে সংকট নিরসনে বাধা।

৫ই জুলাই ইসলামাবাদ থেকে পামফ্রে'র (তিনি স্যার সিরিল পিকার্ডের স্থলাভিষিক্ত হন) পাঠানো এক টেলিগ্রাম থেকে জানা যায়, সম্প্রতি ভারতের প্রধানমন্ত্রী কাশ্মীর সফরকালে এ কথা বলেছেন যে, তিনি শরণার্থীদের পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে জবাই হতে দেবেন না। এর অর্থ দাঁড়ায় দ্রুত রাজনৈতিক সমাধান না হলে বাংলাদেশের সংকট নিরসনে ভারত একাই অগ্রসর হবে। এর অর্থ কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে বুঝানো হয়েছে, শরণার্থী সমস্যা সমাধানে পূর্ববঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে রাজনৈতিক সমাধানে পাকিস্তানকে সমঝোতা করতে হবে।

২৮শে জুলাই এই সময় যুক্তরাষ্ট্র ব্রিটেন সরকারকে পাকিস্তানের পক্ষে সোচ্চার হওয়ার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করেন। সেখানে বলা হয়, রাজনৈতিক সমাধানের জন্য ব্রিটেন ও আমেরিকা যৌথভাবে এমন কোনো উদ্যোগ নিতে পারে কিনা যেক্ষেত্রে ইয়াহিয়া খানের মঙ্গল হবে। ব্রিটেন সেদিকে অগ্রসর হয়নি। বরং ব্রিটেন এ সময় অর্থনৈতিক কূটনীতির দিকে অগ্রসর হয়। অর্থনৈতিক সমীক্ষায় লক্ষণীয় হয়ে ওঠে যে, পাকিস্তান অর্থনৈতিকভাবে ভেঙে পড়েছে। সেক্ষেত্রে ব্রিটেন মনে করে, বিশ্বব্যাংকের মাধ্যমে পাকিস্তানকে আর্থিক সাহায্য দানের ব্যাপারে অংশগ্রহণ করে রাজনৈতিক সমাধানে পৌছানোর জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার উপর চাপ সৃষ্টি করা যেতে পারে এবং রাজনৈতিক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে ব্রিটেন পূর্ণ সহযোগিতা দিয়ে যাবে।

আগস্ট মাসে পাকিস্তানের সামরিক জান্তার পক্ষ থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বিচার করার বিষয়টি জোরেশোরে উচ্চারিত হয়। ব্রিটেন এক্ষেত্রে কূটনৈতিক শিষ্টাচার লঙ্ঘন করে মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রীকে অনুরোধ করেন ইয়াহিয়া খানের উপর চাপ সৃষ্টি করতে, যাতে শেখ মুজিবের বিচার ও তাঁকে হত্যা না করা হয়। ব্রিটেনের এই উদ্যোগের সঙ্গে মার্কিন স্ট্রেট ডিপার্টমেন্টের সিসকো একমত প্রকাশ করেন। ব্রিটেন নানাভাবে বঙ্গবন্ধুর জীবন রক্ষার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

৪ঠা অক্টোবর ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীকে পাঠানো এক মেমোরেন্ডামে বলা হয়, বাংলাদেশ সংকট নিয়ে ব্রিটেনের ভবিষ্যৎ পলিসি কী হতে পারে। সেখানে বলা হয় : ক. অন্যান্য বন্ধু রাষ্ট্রকে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানে শরণার্থীদের সাহায্য প্রদানের ব্যাপারে ব্রিটেন উৎসাহ প্রদান করবে; খ. পাকিস্তান সরকারকে একটি রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলোচনায় বসতে উৎসাহ প্রদান অব্যাহত থাকবে; গ. পরবর্তী কয়েক মাস পাকিস্তানকে মারণাস্ত্র সরবরাহ থেকে ব্রিটেন বিরত থাকবে; এবং ঘ. ভারত সরকারকে গেরিলাদের সাহায্য সহযোগিতা প্রদান থেকে বিরত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকার বিষয়ে ভারতকে বুঝানোর চেষ্টা অব্যাহত থাকবে। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রের উপরে ব্রিটেনের প্রভাব সীমিত হলেও তা অব্যাহত রাখতে হবে এবং উভয়ের ক্ষেত্রেই গ্রহণযোগ্যতা বজায় রাখতে হবে। অখণ্ড পাকিস্তান ব্রিটেনের কাম্য হলেও শেষ পর্যন্ত তা বোধহয় এক থাকছে না। অক্টোবর মাসে সংকট ঘনীভূত হয় এবং ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে।

৩১শে অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকটি হয় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর অবকাশ নিকেতন চেকার্স-এ। আলোচনা প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তার প্রতিরক্ষামন্ত্রী সম্প্রতি বলেছেন, 'যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের যে জায়গা দখল করা হবে তা ফেরত দেওয়া হবে না।" এরকম ধারণা ভারতের জনগণের এবং পার্লামেন্টের। অধিবেশন শুরু হলে গান্ধী শঙ্কা প্রকাশ করেন যে, এই দাবি শেষ পর্যন্ত পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বাধিয়ে দেবে। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর প্রশ্নের জবাবে ইন্দিরা গান্ধী বলেন, বাংলাদেশের গেরিলারা বিভিন্নভাবে সাহায্য পাচ্ছে। তারা নিজেরাই যথাসাধ্য করছে। বেশিরভাগ সাহায্য আসছে প্রবাসী বাঙালিদের কাছ থেকে। বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দ আবেগপ্রবণ এবং স্বাধীনতার প্রতি তারা এতটাই প্রতিশ্রুতিবদ্ধ যে স্বাধীনতা ব্যতীত অন্যকোনো চুক্তি করতে রাজি হবে না। ইন্দিরা গান্ধী আরো বলেন যে, তার দেশের উগ্রপন্থিরা মনে করে প্রথমেই ভারতের যুদ্ধ করা উচিত ছিল। এতে জনগণ ও আন্তর্জাতিকভাবে সকলকে ব্যাপারটা বুঝানো সুবিধা হত ; পরিস্থিতি এখন আরো জটিল।

নভেম্বর মাসে প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রধানমন্ত্রী হীথ বাংলাদেশ সমস্যা নিয়ে মূল্যায়ন করেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন অত্যন্ত নগ্নভাবেই ভারতের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি সরাসরি বলেন, ভারত শুধু উস্কানিদাতাই নন, পাকিস্তান ভাঙার ষড়যন্ত্রকারী। প্রধানমন্ত্রী হীথ অবশ্য দ্বিমত প্রকাশ করেন। এই সময় ব্রিটিশ ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসকে নতুন রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক চিন্তায় পেয়ে বসে। ভারত বিভক্তির সময় ব্রিটেন কাশ্মীর নিয়ে সে সমস্যার জন্ম দিয়েছিলেন তা শেষ করার নতুন উদ্যোগ দেখা দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের বিনিময়ে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করা যেতে পারে কিনা সে বিষয়টি নিয়ে তারা হিসাব-নিকাশ শুরু করে। ব্রিটেন ও আমেরিকা এই বিষয়ে একমত হতে পারেননি। তবে এ বিষয়ে উভয়ে উপলব্ধি করে যে, পাকিস্তান কোনোমতেই অখন্ড থাকবে না। পরিস্থিতি এমন যে পাকিস্তান ভাঙনের দিকে এগিয়ে গেছে। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ও মার্কিন প্রেসিডেন্ট এই ব্যাপারে একমত হলেও ডিসেম্বরে গিয়ে দেখা যায় যুক্তরাষ্ট্র শেষপর্যন্ত পাকিস্তানের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বিষয়টি পূর্ব থেকেই অনুধাবন করতে পেরেছিলেন। ব্রিটেন জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত উভয়পক্ষের সৈন্য সরিয়ে নেওয়ার ব্যাপারটি সমর্থন করে। ভারতকে এই মর্মে অবহিত করেছে যে, জাতিসংঘের এই প্রস্তাবে সাড়া না দিলে ভারতের অবস্থান ক্ষুণ্ন হবে, অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সহযোগিতা কমে যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৬ই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের কাছে পাঠানো এক চিঠিতে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক নিরাপত্তা পরিষদে বাংলাদেশের সংকট নিয়ে জড়িত হওয়াকে ভারত মূল সমস্যা সমাধানকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার পদক্ষেপ হিসেবেই মনে করে এবং পশ্চিম পাকিস্তানের বর্বর সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জনগণের সংগ্রামের ফলাফল ভোগ করার ও গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জনের পথে এই পদক্ষেপ বাধা বলে গণ্য হবে।

২৩শে নভেম্বর ওয়াশিংটনে নিযুক্ত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত ক্রোমারের টেলিগ্রাম সূত্র হতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, পাকিস্তান সামরিক শক্তি প্রয়োগ করলে ব্রিটেন সামরিক আক্রমণের নিন্দা করলেও সরাসরি পাকিস্তানকে দায়ী করবে না। ২৫শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কাছে লেখা এক পত্রে এডওয়ার্ড হীথ ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, 'নিরাপত্তা পরিষদে বিষয়টি উত্থাপন করলে পরিস্থিতি আরো কঠিন হয়ে যাবে।' ঐদিনই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথের টেলিফোনের কথোপকথনের সূত্রে প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, "বর্তমান মুহূর্তে পাকিস্তানের তুলনায় ভারতকে বেশি আগ্রাসী মনে হচ্ছে। যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তানের জন্য তা হবে মারাত্মক হুমকি।" এই মুহূর্তে ভারতকে প্রতিহত করার জন্য উভয় দেশ যতটুকু প্রভাব খাটাতে পারে তা ব্যবহার করা হবে। নিক্সন বলেন, চীন পাকিস্তানের পক্ষে আছে এবং রাশিয়ানরা ধৈর্য ধরেছে এই কারণে যে, একসময় মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকায় তাদের আসতে হতে পারে। নিক্সন বলেন, আমি নিশ্চিত যে, ভারত পাকিস্তানকে ভাঙতে চাইছে এবং সেই পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং সে জন্যে জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক তারা মেনে নেয়নি এবং এভাবে তারা সমাধান চায়নি। প্রেসিডেন্ট নিক্সন এডওয়ার্ড হীথকে বলেন, ইন্দিরা গান্ধী যখন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন তখন তাকে বলা হয়েছিল, কোনো শর্ত ছাড়াই পাকিস্তান সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নিতে প্রস্তুত; কিন্তু গান্ধী এই সম্পর্কে কোনো কথাই বলেননি। এ সময় ব্রিটেন অবশ্য প্রেসিডেন্টকে বলেন, শেখ মুজিবের সঙ্গে পাকিস্তানকে আলোচনার জন্য রাজি করাতে পারলে রাজনৈতিক সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যেতো।

৩রা ডিসেম্বর যুদ্ধ শুরু হলে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রীর কাছে ভারত ও পাকিস্তান সরকার প্রধানগণ পত্র লেখেন। দু'দেশের এই চিঠির মধ্যে দৃশ্যত দু'ধরনের মতামত বেরিয়ে এসেছে।

৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে লেখা ইয়াহিয়া খানের চিঠির সারমর্ম হলো, পাকিস্তানের ওপর ভারতের নগ্ন আগ্রাসন এমন একটি অসম্ভব পরিস্থিতির তৈরি করে দিয়েছে যা সবাইকে একটি অত্যন্ত বিপজ্জনক ও বহুমাত্রিক যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। আগ্রাসনের শিকার হিসেবে পাকিস্তান আপনার সরকারের অকুণ্ঠ সহযোগিতা আশা করে এবং একটি দেশের সীমানাগত অখণ্ডতা রক্ষার নীতিকে সম্মান দেখিয়ে দু'টি দেশের মধ্যে অস্ত্রের ব্যবহারকে উৎসাহ না দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানাচ্ছি। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট অনুরোধ জানায় যে, ব্রিটেন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এমন কিছু করুক যাতে ভারত তার আক্রমণ বন্ধ করে এবং সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে এগিয়ে আসে।

৬ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথকে লেখা গান্ধীর চিঠিতে বলা হয়, আন্তর্জাতিক কমিউনিটিকে এই ঘটনার বাস্তবতা সম্পর্কে ভারত বার বার বোঝানোর চেষ্টা করেছে। জাতিসংঘে এ ব্যাপারে ভারতের তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে এবং প্রধানমন্ত্রী নিজে ও তার সহকর্মীগণ দেশে দেশে ঘুরে বেড়িয়েছে, কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি। ভারত আশা করেছিলো যে, বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে, নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে সমস্যার একটি রাজনৈতিক সমাধানে যেন তিনি ব্রতী হন, কিন্তু সেরকম কিছুই হয়নি।

আমরা শান্তিপূর্ণ জীবনযাপনে বিশ্বাসী, কিন্তু আমরা এও জানি যে, শান্তি স্থায়ী হবে না যদি আমরা আমাদের গণতন্ত্র এবং জীবনধারণ পদ্ধতিকে নিরাপত্তা দিতে না পারি। আমরা শুধু আমাদের ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য লড়ছি না; যে-মৌলিক ভিত্তির উপর ভারত দাঁড়িয়ে আছে এবং যার উপর ভারতের ভবিষ্যৎ নিহিত, আমরা সেটি রক্ষার জন্যও লড়ে যাবো।

১০ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ বার্তা পাঠান। সে বার্তায় বলা হয়, নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে আলোচনাকালে ব্রিটিশ সরকার সকল অর্থহীন ইঙ্গিত এড়িয়ে বাস্তবসম্মত পদক্ষেপ গ্রহণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অবিলম্বে সমস্যা সমাধানে যা কিছু প্রয়োজন আমরা তা করতে প্রস্তুত, একথা আপনি বিশ্বাস করবেন বলে আমি আশা করি। বর্তমান পরিস্থিতিতে আমাদের মধ্যে ঘনিষ্ট সম্পর্ক বজায় রাখা হবে সবচেয়ে ভালো কাজ।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিসে পাঠানো দিল্লি থেকে ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. গার্ভে-র টেলিগ্রাম। টেলিগ্রামে ভারতীয় পররাষ্ট্রসচিব পি.এন. হাসকার-এর কথা উল্লেখ করে বলা হয়, রাও ফরমান আলীর যুদ্ধবিরতির উদ্যোগ সম্পর্কিত বার্তা হেনরি কিসিঞ্জারের মাধ্যমে জাতিসংঘ মহাসচিবের কাছে পৌছালে আগা শাহী তা "সৈনিকের খসড়া প্রস্তাব" ও অযৌক্তিক বলে নাকচ করে দেন, কিন্তু একে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে উল্লেখ করেন।[৯০]

হাসকার বলেন, দিল্লিতে নিয়োজিত আমেরিকান কূটনীতিবিদরা পশ্চিম ও উত্তর সীমান্তে শান্তি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ভারতের উদ্দেশ্য সম্পর্কে প্রশ্ন করে তাঁর কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে। তার অভিযোগ আমেরিকা ভারতকে এই বলে চোখ রাঙাচ্ছে যে, যদি ভারত পাকিস্তানের কোনও জায়গা দখলের চেষ্টা করে, তাহলে পাকিস্তানের সঙ্গে আমেরিকান যে চুক্তি হয়েছে[৯১] সে অনুযায়ী আমেরিকা পাকিস্তানের পক্ষে এগিয়ে আসবে। আমেরিকা নিশ্চিতভাবেই পাকিস্তানের জায়গা দখল বলতে আজাদ কাশ্মীরকে বুঝিয়েছে।

১১ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। দিল্লি থেকে ব্রিটিশ হাই কমিশনার মি. গার্ভের টেলিগ্রামে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলা হয়, ক. সংবাদমাধ্যমের খবর অনুযায়ী বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট মি. নজরুল ইসলাম ও মিসেস গান্ধীর মধ্যে এক আনুষ্ঠানিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, যাতে স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশের পুনর্গঠনে ও স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদানের আশ্বাস দিয়েছে ভারত। এতে আরও বলা হয়েছে, ভারতীয় সেনাবাহিনী ও মুক্তিবাহিনী এখন থেকে যৌথবাহিনী হিসেবে কাজ করবে যার পরিপূর্ণ দায়িত্ব থাকবে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে। যতোদিন পর্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে না আসে ততোদিন পর্যন্ত ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশে অবস্থান করতে পারবে বলে চুক্তিতে বলা হয়েছে।[৯২] খ. বাংলাদেশে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসা মাত্র শরণার্থীদের ক্যাম্প থেকে ফিরে নেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। সেখানে বেসামরিক কর্তৃত্ব শক্তিশালী করার উদ্যোগ ইতোমধ্যেই নেয়া হয়েছে। শীঘ্র ২৮ জন আইএএস ও আইপিএস অফিসার বাংলাদেশের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দেবেন, সেখানে সাধারণ ও পুলিশ প্রশাসন পুনর্গঠনের লক্ষ্যে। এদের পর পরই বাংলাদেশে যাবে রেলওয়ে, পোষ্ট, টেলিগ্রাফ, যাতায়াত ব্যবস্থা, মেডিকেল সার্ভিস ইত্যাদি সম্পর্কিতত বিশেষজ্ঞ গ্রুপ। গ. এসব অফিসারদের বলা হয়েছে যে, তাদের ৩ থেকে ৬ মাস বাংলাদেশে অবস্থান করতে হতে পারে। তবে দায়িত্বকাল ততোদিনই স্থায়ী হবে যতোদিন বাংলাদেশ সরকার চায়। ঘ. চুক্তি অনুযায়ী ভারতীয় কমান্ডার নির্দিষ্ট সময়ের পর পর রিপোর্ট পেশ করবেন চীফ অব আর্মি স্টাফের কাছে এবং তিনি বাংলাদেশের ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীকে সকল বিষয় অবগত করবেন। মুক্ত এলাকায় উভয় দেশের বাহিনী "সকলের" নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে বলে চুক্তিতে বলা হয়েছে।

১৪ই ডিসেম্বর, ১৯৭১। উপমহাদেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে দিল্লি থেকে পি. ক্র্যাডক-এর (সম্ভবতঃ দিল্লিতে নিযুক্ত ব্রিটিশ গোয়েন্দা কর্মকর্তা) বিশ্লেষণধর্মী প্রতিবেদনের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো :

ক. ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে ভারসাম্যে মৌলিক পরিবর্তন আসবে। এমন কি যুদ্ধের আগে ভারত আকারে বড় এবং ক্ষমতাবান শক্তিশালী ছিল। পাকিস্তানের তুলনায় ভারতে ব্রিটেনের স্বার্থ অধিকতর ছিল। পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার ফলে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থ একেবারেই নিরঙ্কুশ হল। আমাদের নীতি নির্ধারনে একথা মনে রাখতে হবে।

খ. পূর্ব পাকিস্তানের জায়গায় স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠিত হবে। এই নতুন দেশটি টিকে থাকতে সক্ষম হবে। পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক সম্পদের অধিকারী, বিশেষ করে পাট যা থেকে গোটা পাকিস্তানের বৈদেশিক আয়ের শতকরা ৪৮ ভাগ অর্জিত হত। এছাড়া এই দেশটির সঙ্গে ভারতের প্রাকৃতিক সীমারেখা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। ভারতের শুভেচ্ছার ফল দেশটি ভোগ করবে। ভারতের সহযোগিতায় দেশটি উল্লেখযোগ্য ভূ-খণ্ডের স্বত্বাধিকারী হবে এবং অতি সহজেই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করে নেবে। বর্তমান সঙ্কট কেটে গেলেও বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ভাবে প্রাধান্য কম পাবে এবং ভারতের "ক্লায়েন্ট স্টেট" অথবা "তাঁবেদার রাষ্ট্র" হিসেবে গণ্য হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভারতের রাজনৈতিক অস্থিরতা, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং পাশ্ববর্তী রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের অস্থিতিশীলতা এই নতুন দেশটিকে কম্যুনিস্ট এবং চরমপন্থিদের স্বর্গরাজ্য করে তুলবে।

গ. পাকিস্তান সম্পর্কে মূল্যায়নে বলা হয়েছে, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার ফলে পশ্চিম পাকিস্তানও ভেঙে যেতে পারে বলে মনে হচ্ছে। যদি নাও ভাঙে তাহলে দেশটি চরম অস্থিতিশীল পরিস্থিতির ভেতর দিয়ে যাবে; সেনাবাহিনীর দীর্ঘদিনের যোগ্যতা এবং সুনামের দেয়ালটি একেবারেই ধ্বসে পড়বে; দেশের অভ্যন্তরে তিক্ততা এবং ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে; পাট থেকে অর্জিত অর্থ এবং পূর্ব পাকিস্তানের বাজার হাতছাড়া হওয়ায় দেশটি আরও গরীব হতে থাকবে। শেষ পর্যন্ত ত্রাণ সাহায্যের জন্য দেশটি তার মুসলিম প্রতিবেশী যেমন ইরান ও তুরস্কের কাছে হাত পাতবে। চীনের সঙ্গে সম্পর্কের প্রয়োজনীয়তা সম্মন্ধে প্রশ্ন উঠবে, কিন্তু এই সম্পর্ক টিকে থাকবে। এই সম্পর্কের ভিত্তি হবে অস্ত্রের গ্রাহক হিসেবে এবং টিকে থাকবে একটি সুপার পাওয়ারেরও সাহায্যভোগী হিসেবে।

ঘ. সোভিয়েত ইউনিয়নের জয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয়; এবং কী করে "প্রক্সিওয়ার" (অন্যের পরিবর্তরূপে যুদ্ধ) করা হয় সে সম্পর্কে ব্রিটেনের একটা শিক্ষা হলো এবং এটা স্পষ্ট হলো যে, যেখানে অন্য সুপার পাওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করে সেখানে সোভিয়েত নিজের স্বার্থে ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। ১৯৬৫ সালে তাসখন্দের সোভিয়েত ইউনিয়ন যে নীতি অবলম্বন করেছিল তার সম্পূর্ণ বিপরীত নীতি আমরা এখানে দেখতে পেলাম। আগস্টে সম্পন্ন ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তি এখন আরও শক্তিশালী এবং প্রতিষ্ঠিত ; তবে এক্ষেত্রে দীর্ঘকাল আগে পরিকল্পিত ভারত-সোভিয়েত ষড়যন্ত্রের কথা ভাবার প্রয়োজেন নেই। বস্তুতঃ সোভিয়েত ভেটো-ই পূর্ব পাকিস্তানে জয়লাভের সহায়ক হয়েছে; ফলত এখানে সোভিয়েত-এর ভূমিকা আরও বৃদ্ধি পাবে, যা ভারতের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে নিঃসন্দেহে মিলে-মিশে থাকবে, অর্থাৎ ভারতীয় সেনাবাহিনী ও প্রশাসন উভয় স্থানেই সোভিয়েত বলয় বলবৎ থাকবে; হয়তো সোভিয়েত নৌবাহিনী এ অঞ্চলে স্থায়ী ঘাঁটি গড়বে। তবে এর মধ্যেও খানিকটা "কিন্তু" রয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়ন আজাদ কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ভারতকে কোনও প্রকার সহযোগিতা করবে না। কারন সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের সঙ্গেও তার সম্পর্ক ভাল রাখতে আগ্রহী এবং তার দক্ষিণাঞ্চলীয় সীমান্ত রাষ্ট্রসমূহ যেমন ইরান, তুরস্ক ইত্যাদি দেশগুলোকেও সে হাতছাড়া করতে চায় না। ওদিকে ভারতও তার পশ্চিমা মিত্রদের চিরতরে হারাতে চাইবে না। এছাড়া ভারতের ভৌগোলিক আকার ও তার ভেতরের চাহিদার কারণেই তাকে নানা দিক দিয়ে আপোস করে চলতে শেখাবে।

ঙ. এখানে সোভিয়েত-চীন সম্পর্কের পরিপ্রেক্ষিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন আরও লাভবান হয়। পূর্ব পাকিস্তান রক্ষার প্রশ্নে চীন তার পরম মিত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করায় সোভিয়েত ইউনিয়ন এতদ্অঞ্চলে একক কম্যুনিস্ট পাওয়ার হিসেবে স্বীকৃত হল, যদিও চীন পূর্ব পাকিস্তানকে এশিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ এলাকা বলে মনে করে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চ. চীন এখানেই তার চালে ভুল করেছে। পাকিস্তানের পক্ষ নিয়ে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া ইন্দো-সোভিয়েত চুক্তির কারণে এই মুহূর্তে হয়তো কঠিন হতো, তাছাড়া চীন-এর অভ্যন্তরীণ রাজনীতির কারণেও তাকে বাধ্য হয়েই পিছিয়ে আসতে হয়েছে এবং যে কারণে চীন যুদ্ধ শুরু করার চেষ্টা পর্যন্ত করেনি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান যদি সর্বাত্মকভাবে আক্রান্ত হতো, তাহলে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার জন্য চীন অধিকতর চাপের সম্মুখীন হত। কিন্তু তা করতেও চীন হয়তো ব্যর্থ হতো; তারা শুধু পশ্চিমবঙ্গ এবং বাংলাদেশকে তীব্র ভাষায় নিন্দা করে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির প্ররোচনা দিয়েই ক্ষান্ত হতো। আক্রমণকারী ভারত ও তাদের তাঁবেদারদের পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ প্রতিরোধ করবে বলে চীন দাবি করতে পারে। কিন্তু তাদের এই দাবি অর্থহীন বলে মনে হয়। উপমহাদেশ নিয়ে চীনের সুদূরপ্রসারী চিন্তাভাবনা রয়েছে যা বাস্তবায়নে তারা দীর্ঘদিন অপেক্ষা করতে রাজি বলেই প্রতীয়মান হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সে ধরনের চিন্তা-ভাবনা নেই। ভঙ্গুর পাকিস্তান, নতুন দেশ বাংলাদেশ এবং উপমহাদেশের অন্যান্য স্থানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন চীনকে তার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সবদিক দিয়েই সুযোগ করে দিচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও দেবে। অন্যদিকে তারা ভারতের এই বিজয়কে এ কারণে ভয় পাচ্ছে যে, ভারত এতে নতুন করে শক্তিশালী হয়ে উঠবে এবং এই অঞ্চলে সোভিয়েত স্বার্থের পাহারাদার হিসেবে কাজ করা ছাড়াও ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত ঘাঁটি স্থাপনের সুযোগ করে দেবে।

ছ. আমেরিকা চরমভাবে ভারতের উপর থেকে তার প্রভাব হারালো। তবে এই ক্ষত একেবারে নিজের তৈরি করা, কোনও যুদ্ধের দ্বারা সৃষ্ট নয়। যথাসময়ে এই ক্ষত শুকিয়ে যেতে পারে। ভারতের আমেরিকা তথা পশ্চিমকে যেমন প্রয়োজন রয়েছে, তেমনি সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর অতিমাত্রায় বোঝা হয়ে ওঠার ব্যাপারে ভারত অস্বস্তি বোধ করবে। ব্রিটেনের আগ্রহ হবে যতো তাড়াতাড়ি সম্ভব ভারত-আমেরিকা সম্পর্ক সুস্থ হয়ে ওঠার ব্যাপারে নিশ্চিত করা। এ কারণে ইউরোপ থেকে ভারতকে বেশি পরিমাণে সাহায্য দিয়ে তাকে সোভিয়েত বলয় থেকে সরিয়ে আনার ব্যাপারটিও এগিয়ে নিতে হবে। তবে একটি দুঃখজনক ভবিষ্যদ্বাণী হচ্ছে, আমেরিকা হয়তো শত্রুর কবল থেকে দেশ উদ্ধারের পাকিস্তানি মনোবৃত্তিকে সহায়তা দিতে পারে যা এখানে পাকিস্তান-আমেরিকা ও ভারত-সোভিয়েত ইউনিয়ন সংঘর্ষের জন্ম দেবে।

জ. এই যুদ্ধে জাতিসংঘেরও বড় ধরনের পরাজয় ঘটেছে। নিরাপত্তা পরিষদ ও সাধারণ পরিষদে বিষয়টির নিষ্পত্তি না হওয়ায় এখন থেকে যে অঞ্চলে দুই পরাশক্তির আগ্রহ রয়েছে সেখানে কোনও সমস্যা দেখা দিলেই তারা জাতিসংঘকে বাদ দিয়ে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করবে। জাতিসংঘের অসহায় অবস্থা এবং বহির্বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মতৎপরতা হ্রাস পাওয়ার ফলে তৃতীয় বিশ্বকে একটি মহাশক্তির দেশের (কমিউনিস্ট হলেই ভালো) সহায়তা গ্রহণ (ভেটো দেওয়ার জন্য) করতে হবে। এর ফলে তৃতীয় বিশ্বের অস্ত্র ক্রয় এবং স্থিতিহীন পরিস্থিতি হবে নিরুৎসাহব্যঞ্জক।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রিটিশ পররাষ্ট্র সচিব ডগলাস হিউম পূর্ব পাকিস্তানের প্রাণহানিতে নিন্দাজ্ঞাপন করেন, তিনি বলেন যে এটা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়। ব্রিটেন এতে হস্তক্ষেপ করবে না। ৫ই এপ্রিল পুনরায় বলেন, ব্রিটেন অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করবে না; তবে রক্তপাত বন্ধ হওয়া এবং জনগণের পছন্দমতো রাজনৈতিক সমাধান যে তার কাম্য তা প্রধানমন্ত্রী পাকিস্তান প্রেসিডেন্টকে জানিয়েছেন। ২৬শে এপ্রিল কমন্সসভার বিবরণী থেকে জানা যায়, যুদ্ধবিরতির জন্য চাপ প্রদান, অস্ত্র বিক্রি এবং সিয়াটো চুক্তি অনুসারে সামরিক সাহায্য সম্পর্কে বিতর্ক হয়। প্রধানমন্ত্রী প্রশ্নোত্তর অংশে ব্রিটিশ নীতি ব্যাখ্যা করে বলেন, পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা ও অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতিতে ব্রিটেন বিশ্বাসী। তিনি কমনওয়েলথের মাধ্যমে এই সমস্যার মধ্যস্থতা সম্ভব নয় বলে মনে করেন।

১৫ই মে কমন্সসভার এমপি'রা বাংলাদেশ পরিস্থিতি পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় ব্রিটিশ সরকারের এই অবস্থান পরিত্যাগপূর্বক ২০০জনের বেশি এমপি, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক, ব্যবসায়ী শ্রেণির পক্ষ থেকে দাবি করা হয় পাকিস্তানকে সাহায্য দেওয়া বন্ধের দাবি জানানো হয়। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সদস্য রাজনৈতিক সমাধানের উপরে জোর দেন। গণহত্যা বন্ধে আন্তর্জাতিক আইনের এখতিয়ারে নেওয়া যায় কিনা এরকম দাবি উত্থাপনও হয়।

মে মাসে বাংলাদেশের পরিস্থিতি প্রত্যক্ষদর্শী এমপিদের বিবরণ কমন্সসভায় তুলে ধরা হয়। সেখানে বলা হয়, "স্বাধীন বাংলাদেশ সরকার ও আওয়ামী লীগের দীর্ঘমেয়াদী গেরিলাযুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার ক্ষমতা আছে।"[৯৩] দীর্ঘ বিতর্কে ব্রিটিশ এম.পি.গণ অনেকেই বাংলাদেশকে সমর্থন করেন, অনেকেই পাকিস্তান সরকারকে সমর্থন দেন। কেউ কেউ অবশ্য মন্তব্য করেন, বর্তমান সংকট থেকে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা রয়েছে। আবার কেউ অভিমত প্রকাশ করেন, জনগণের পছন্দমত রাজনৈতিক সমাধান হওয়া দরকার। ৮ই জুন ব্রিটিশ সরকার এই প্রথমবারের মতো স্বীকার করেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি শুধু পূর্ব পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় নয়, বরং পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিষয়ও।

৩১শে আগস্ট ব্রিটিশ এমপি পিটার শোর অভিমত প্রকাশ করেন যে, "বাংলাদেশ পরিস্থিতিকে পুরোনো জাতির মৃত্যুযন্ত্রণা ও নতুন জাতির প্রসববেদনার সঙ্গে তুলনা করেন। তিনি বর্তমান সংকট নিরসনে শেখ মুজিবের মুক্তি ও নির্বাচিত প্রতিনিধির সাথে আলোচনাকে একমাত্র উপায় ও পাকিস্তানের উপর বিদেশি সাহায্য বন্ধ করে চাপ সৃষ্টি করা উচিত।"

২৩শে সেপ্টেম্বর হাউজ অব কমন্স-এর কার্যবিবরণীর শিরোনামে পূর্ব পাকিস্তানের পরিবর্তে এই প্রথমবার পূর্ব বাংলা ব্যবহার করা হয়। ৪ঠা নভেম্বর হাউজ অব কমন্স-এ পররাষ্ট্রসচিবের মন্তব্য থেকে জানা যায়, ইয়াহিয়া খান শরণার্থীদের জন্য জাতিসংঘের অভ্যর্থনা কেন্দ্র স্থাপনার লক্ষ্যে দু'দেশের সীমান্ত থেকে সৈন্য সরিয়ে নেওয়া,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগের প্রস্তাব করেন। ভারত এইসব প্রস্তাবকে অকার্যকর বলে মন্তব্য করেছেন।

১১. বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ব্রিটেনের ভূমিকা

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার অবসান হয়ে ভারত ও পাকিস্তান স্বাধীন হলেও উভয় দেশের উপরই যুক্তরাজ্যের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। উভয়েই অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্য, বাণিজ্য ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্রিটেনের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল ছিল।

যুক্তরাজ্য সংকট শুরু হবার বেশ আগে থেকেই পরিস্থিতির উপর সতর্ক নজর রাখছিল এবং সাবেক ঔপনিবেশিক হিসেবে এ উপমহাদেশের সাথে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় সমস্যার স্বরূপ ও এর সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন পক্ষ সম্পর্কে স্পষ্ট ও খুঁটিনাটি ধারণা ছিল।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের শুরু থেকেই ব্রিটেনের সংবাদমাধ্যম ও জনগণ বাংলাদেশের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে সাহায্যে এগিয়ে আসে। পূর্ব পাকিস্তানে বাঙালিদের হত্যা-নির্যাতনের খবর প্রকাশ করে বিবিসি রেডিও ও ব্রিটিশ সংবাদপত্রসমূহ বাংলাদেশের স্বাধীনতার সমর্থনে বিশ্বজনমত গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

ব্রিটিশ রাজনীতিকগণও তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের দুর্দশা লাঘব এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার পক্ষে তাঁদের সমর্থন ব্যক্ত করেছেন, তাঁদের এ প্রয়াস কতটা জোরালো ছিল তা বোঝা যায়, যখন ১৪ই মে ১৯৭১ কমন্স সভায় পূর্ব পাকিস্তান পরিস্থিতি আলোচিত হয় এবং এতে এমনও বলা হয় যে, "মৃত দেহের স্তূপের নিচে পাকিস্তান কবরস্থ হয়েছে।"[৯৪]

বিশ্লেষণে বেরিয়ে আসে ব্রিটেন 'নীরব কূটনৈতিক' ভূমিকায় অগ্রসর হয়েছে। প্রতিপাদ্য এভাবে লিপিবদ্ধ করা যায় যার : ১. ব্রিটেন কোনো পক্ষের দিকে ঝুঁকে পড়েনি বা বিবদমান কোনো পক্ষের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেনি; ২. পূর্ব পাকিস্তানে যা সংঘঠিত হয়েছে তা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়, কিন্তু একথাও একইসাথে ভারত এবং পাকিস্তানের সরকারপ্রধানের কাছে লিখিত বক্তব্যে পূর্ববঙ্গের ট্রাজেডির বিষয় উল্লেখ করেছেন, বিভিন্নভাবে নির্যাতন, হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে কূটনৈতিক শিষ্টাচারের আওতায় প্রতিবাদ করেছে; ৩. বেসামরিক নির্বাচিত নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর ও রাজনৈতিক সমাধানে পৌছানোর জন্য পাকিস্তানের উপর চাপ সৃষ্টি এবং বিভিন্ন রাষ্ট্রপ্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে; ৪. সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হলো নির্বাচিত নেতা হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা বিধান, জীবন রক্ষা, মুক্তি এবং তার মাধ্যমে বা তার অনুমোদিত প্রতিনিধির মাধ্যমে সংকট সমাধানে রাজনৈতিক সমঝোতার গুরুত্বপূর্ণ পূর্বশর্ত হিসেবে বিশ্ব পরিসরে অবস্থান নিয়েছে; এবং ৫. গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত গণ-আকাঙ্ক্ষা এবং গণমাধ্যমের নিরবচ্ছিন্ন মতামতকে প্রাধান্য দিয়ে ব্রিটেন তার কূটনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে; এমনকি ক্ষেত্রবিশেষে মিত্র

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গেও অপ্রকাশ্যে দ্বিমত প্রকাশ করেছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ব্রিটেন বাঙালিদের অনুভূতি ও হৃদয় বিদীর্ণ যন্ত্রণাকে ধারণ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে কূটনৈতিক পদেক্ষপ গ্রহণ করেছে।

১২. যুক্তরাষ্ট্র ও ভারত

শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতাসীন হয়ে ভারতীয় বিদেশনীতি পুনঃমূল্যায়নে অগ্রসর হন। ১৯৬৭ সালে সোভিয়েত রাশিয়া ব্রেজনেভ পরিকল্পিত এশিয়ান কালেক্টিভ সিকিউরিটি তত্ত্ব অনুসরণে চুক্তির যে প্রস্তাব দিয়েছিলো তার মূল্যায়নে ভারত দেখতে পায় যে, চীনের বিরুদ্ধে এটা হতে পারে একটা নিরাপত্তার গ্যারান্টি। এটাকে ত্বরান্বিত করতে বাংলাদেশের উদ্ভূত ঘটনাবলি যেমন সাহায্য করেছে, তেমনি চীন-মার্কিন ক্রমবর্ধমান সম্পর্ক উন্নয়নের প্রতিপূরক হিসেবে চুক্তি করার বিষয়ে ভারতকে অগ্রসর করে নেয়।

চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে নিক্সন প্রশাসন দৃঢ়তার সঙ্গে এগিয়ে যায়। যদিও হোয়াইট হাউজ এটা পর্যবেক্ষণ করে যে, এই সম্পর্কের ফলে দক্ষিণ এশিয়ায় উত্তেজনা বৃদ্ধি পেতে পারে অথবা মস্কোর সঙ্গে দাঁতাত (détente) ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারে। মার্চ মাসে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ কালে সিনিয়র রিভিউ গ্রুপ মিটিং-এ হেনরি কিসিঞ্জার উপমহাদেশের উদ্ভূত পরিস্থিতি সম্পর্কে নীতি নির্ধারণী এক মন্তব্যে বলেন, 'তারা এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবেন না।' যুক্তরাষ্ট্র এমন কোনো কাজ করবে না যাতে পিকিং-এর সাথে সম্পর্ক উন্নয়নের ক্ষেত্রে কোনো অসুবিধা সৃষ্টি হয়, সেহেতু প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে তারা বিশেষভাবে কিছু বলবেন না। এমনকি যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান সংকট সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকবে। ঐ সভায় উপমহাদেশ সম্পর্কে 'ম্যাসিভ ইন-অ্যাকশন' নীতি গ্রহণ করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট বরাবর সুপারিশ করা হয়। ঐ নীতিতে বলা হয়, মার্কিন-চীন সম্পর্কের এই মধ্য পর্যায়ে এসে এটাকে থামিয়ে দিলে তা হবে মারাত্মক রকম ভুল এবং এ কথা উল্লেখ করা হয়, যারা ভিয়েতনামে তাদেরকে যেভাবে হস্তক্ষেপ করার জন্য ঠেলে দেওয়া হয়েছিল এখনও কতিপয় গোষ্ঠী একইভাবে পাকিস্তানে গৃহযুদ্ধের দিকে যুক্তরাষ্ট্রকে ঠেলে দিতে চাচ্ছে। এই চাপটি ছিল প্রবল। এজন্য নিক্সন উল্টো চালে বাংলাদেশের শরণার্থীদের সাহায্য বাড়িয়ে দেওয়া এবং পূর্ণাঙ্গভাবে ভারত-পাকিস্তান যাতে যুদ্ধ না হয় সেজন্য ভারতের প্রধানমন্ত্রী ও পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টের নিকট পত্র লেখেন। ঐ পত্রে তিনি আরো লেখেন, কোনো তৃতীয় দেশ যেন এই সংঘর্ষে হস্তক্ষেপ না করে। মে মাসে হোয়াইট হাউজ সংবাদ পেতে থাকে যে, পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় সৈন্য ব্যাপকভাবে সমাবেশ ঘটিয়েছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন, ভারত যদি পাকিস্তান সরকারকে উল্টে দিতে চায় এরূপ মনে হলে ভারতের সমস্ত অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করে দিতে হবে। পাকিস্তান ও ভারত কী করছে মার্কিন নীতিতে সেটি বড় নয় বরং চীন-আমেরিকার সম্পর্কের ক্ষেত্রে কিসিঞ্জার যে চীন সফর করবে সেক্ষেত্রে যেন কোনো বাধা না আসে। সেজন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরো কয়েকমাস সক্রিয় রাখতে হবে, যাতে পাকিস্তান চীন গমনের প্রবেশ দ্বার হিসেবে ব্যবহৃত হতে পারে।

জুলাই মাসে পিকিং যাওয়ার পথে কিসিঞ্জার পাকিস্তান ও ভারতের কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করেন। বিদেশ যাওয়ার আগে জো সিসকো কিসিঞ্জারকে বলেন, ইন্দিরা গান্ধীর বিরুদ্ধে শক্ত অবস্থান নিতে হবে। সিসকো আরো বলেন, হোয়াইট হাউজে যারা বসে আছেন তারা বুঝতে পারছেন না পরিস্থিতি কী ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। কিসিঞ্জার পরিষ্কারভাবে তাকে জানিয়ে দেন যুক্তরাষ্ট্র জানে বর্ষা মৌসুম শেষ হলেই ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে। পাকিস্তানের কর্মকর্তাদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ বৈঠক হয়। এই বৈঠক সম্পর্কে ভারত অভিযোগ উত্থাপন করে যে, পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন সমর্থন তাদের 'দুঃসাহসিক' নীতি গ্রহণে উৎসাহিত করবে। কিসিঞ্জারের সঙ্গে বৈঠকে ইন্দিরা গান্ধী দেখতে পেলেন, রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের কোনো সম্ভাবনা নেই। তারপরেও তিনি প্রকাশ্যে যুদ্ধের কথা না বলেও এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তা বর্তমানে অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়েছে। কিসিঞ্জারের পর্যবেক্ষণে ধরা পড়ে যে, যুদ্ধ শুরু হলে পাকিস্তান-ভারত বাইরের শক্তির ক্রীড়াভূমিতে পরিণত হবে এবং চীন যাতে ভারতের বিরুদ্ধে উস্কানি না দিতে পারে সে বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র পর্যবেক্ষণ করবে।

চীন থেকে ফিরে এসে কিসিঞ্জার দেখতে পেলেন, বিপর্যয় আসন্ন। তার অভিমত হলো, বর্ষা শেষ হলে ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করবে এবং তিনি আশঙ্কা করেন পাকিস্তানের পক্ষে চীন হস্তক্ষেপ করবে এবং এই অজুহাতে চীনকে শিক্ষা দেয়ার জন্য মস্কো অগ্রসর হবে। আর যদি দক্ষিণ এশিয়ার যুদ্ধ শুধু দুই পক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে তাহলে তার ফলাফল হবে সীমাবদ্ধ। কিন্তু এই সংঘর্ষের ফলে দুটি বিষয় আশঙ্কার মধ্যে পড়বে! এক. চীনা বিফলে ভেস্তে যেতে পারে; দুই. এর ফলে মস্কোর সঙ্গে চীনের ভয়াবহ একটি উত্তেজনা সৃষ্টি হবে, এমনকি নিক্সনের সামনের নির্বাচনকেও বিপদের মধ্যে ফেলে দিতে পারে। কারণ নিক্সন নির্বাচনে বিজয়ী হওয়ার শর্ত হিসেবে ভিয়েতনাম যুদ্ধের পরিসমাপ্তি এবং ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অগ্রগতি নির্ভরশীল। ১৬ই জুলাই জাতীয় নিরাপত্তা কাউন্সিলে নিক্সন ভারতীয়দের সম্পর্কে বলেন, তারা 'পিছলে বিশ্বাসঘাতক'। ভারত পাকিস্তানকে ধ্বংস করা ছাড়া আর কিছুই চাচ্ছে না। কিন্তু তিনি তা হতে দেবেন না। পিকিং সফরের পূর্বে তিন/চার মাস যুক্তরাষ্ট্র কোনো কিছুই হতে দেবে না। কারণ চীনের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র যে পর্যন্ত এগিয়ে গেছে তা ড্রেনে ফেলে দিতে পারে না।[৯৫]

৯ই আগস্ট ভারত-সোভিয়েত চুক্তি ঘোষণা করা হয়। নিক্সন-কিসিঞ্জার একমত হন যুদ্ধ হতে যাচ্ছে, এর ফলে তাদের বিদেশ নীতি বিপন্ন হবে। কিসিঞ্জার এই চুক্তিকে 'বোম্বশেল' (Boombshell) হিসেবে বর্ণনা করেন। এই চুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে নিশ্চয়তা দিয়েছে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে তারা চীনের বিরুদ্ধে। কিসিঞ্জার পররাষ্ট্রমন্ত্রী রজার্সকে আরো জানান যে, এর একটি অর্থ হলো সোভিয়েত কোনো যুদ্ধে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জড়িয়ে পড়লে ভারত তাকে সমর্থন করবে। এই চুক্তি সম্পর্কে হেনরি কিসিঞ্জারের মন্তব্য হল, 'বারুদের বাক্সে জ্বলন্ত ম্যাচের কাঠি নিক্ষেপ করা।' যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যায়ন হলো এটা চীন-মার্কিন সমঝোতার জন্য হয়নি, এই চুক্তি হয়েছে এশিয়ায় মার্কিন-চীন এবং পাকিস্তান সমঝোতার কারণে। সেপ্টেম্বর মাসে যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত লক্ষীকান্ত ঝা কিসিঞ্জার-কে জিজ্ঞেস করেন, যুক্তরাষ্ট্র কেন পূর্ববঙ্গকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে রাখতে চায়। কিসিঞ্জার জবাবে বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হলো পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্নতা নয়, কিন্তু যুদ্ধ এই বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক সংঘর্ষে পরিণত করতে পারে। অক্টোবর মাসে কিসিঞ্জারের সঙ্গে আলোচনায় রাষ্ট্রদূত ঝা ভবিষ্যৎবাণী করেন যে, রাজনৈতিক সমাধান না হলে এবছরের শেষের দিকে যুদ্ধ ঘটে যেতে পারে। কিসিঞ্জার সতর্ক করে বলেন, যুদ্ধ শুরু হলে ভারতকে যুক্তরাষ্ট্র সকল প্রকারের অর্থনৈতিক সহযোগিতা বন্ধ করে দেবে।

১২ ক. দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতি

পাকিস্তান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে চারটি ধরনের ছকে ফেলে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমে পাকিস্তানের 'ভূ-রাজনৈতিক' অবস্থান নিয়ে মার্কিন গ্লোবাল আগ্রহ কী থাকতে পারে। এক্ষেত্রে এ বিষয়টি পরিষ্কার থাকা প্রয়োজন যে, মার্কিন নীতিমালা সর্বদা সামরিক এবং অর্থনৈতিক কর্মসূচি ঘিরে আবর্তিত হয়েছে।

পাকিস্তানের অভ্যুদয় ঘটে এমন একটি রাষ্ট্র হিসেবে যার জন্মগত জটিলতা প্রথম থেকেই তাকে অস্থিতিশীল করে রাখার জন্য ছিল যথেষ্ট। ভৌগোলিক দিক থেকে পাকিস্তানের পশ্চিম সীমান্তে প্রতিবেশী ভারতের সঙ্গে ১৩২৪ মাইল এবং পূর্ব সীমান্তে ২১৬৫ মাইল দ্বারা বেষ্টিত এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সীমান্ত যোগাযোগের দূরত্ব ছিল ৩৯০০ মাইল। এছাড়া পশ্চিম পাকিস্তান তিনটি বৃহৎ শক্তি বেষ্টিত। মাথার শীর্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন, উত্তর-পূর্বে চীন এবং দক্ষিণ-পূর্বে চীন। এছাড়াও পূর্ব পাকিস্তানের তিন দিকেই ভারত এবং কিছু অংশ বার্মা দ্বারা বেষ্টিত। ভৌগোলিক এই বিশেষ ও দূরতম বৈশিষ্ট্য পাকিস্তানের জন্ম ইতিহাস দুর্বল ভিত্তির উপরে স্থিত। এছাড়াও পশ্চিম পাকিস্তানের ৩০০ মাইল দীর্ঘ সীমান্ত আফগানিস্তান ও চীনের সিং কিয়াং অঞ্চলের সঙ্গে উত্তর-পশ্চিম দক্ষিণ-পূর্ব থেকে কারাকুরাম পাস পর্যন্ত ত্রিদেশীয় সংযোগ স্থল পাকিস্তানের গিলগিট ও হোনজার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করেছে।[৯৬] অন্যদিকে, সিকিম, ভুটান, পশ্চিম বঙ্গ দ্বারা পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে চীন সীমান্ত বিভক্ত হলেও তার দুরত্ব একশ মাইলের বেশি নয়।[৯৭] এ অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের রিপোর্টে বলা হয়েছে, পাকিস্তান এশিয়ার মধ্যে এমন একটি অকমিউনস্ট দেশ যার পূর্বাংশে বার্মা পর্যন্ত ছড়িয়ে আছে এবং চীনের সঙ্গে সম্পর্ক বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। এ দেশটি কমিউনিস্ট কেন্দ্রের মধ্যভাগে অবস্থিত এবং অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে উপমহাদেশের দুই প্রান্তে সংযোগ স্থাপন করতে পারে। এসময় মার্কিন বেসিক স্ট্যাটেজিক অবজেকটিভস্ নির্ধারণ করা হয়েছিল এভাবে : ১. সোভিয়েত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়নের আধিপত্য ও বিস্তার প্রতিরোধ; ২. এশীয় দেশগুলো থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো সামরিক সমর্থন বা সাহায্য না পেতে পারে এবং অন্যদেশ থেকে সুযোগ গ্রহণ করতে না পারে; ৩. এসমস্ত দেশের সঙ্গে সহযোগিতা এবং সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন ঘটাতে হবে ও সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধের প্রয়োজন হলে এদেশগুলোকে পক্ষে রাখতে হবে: ৪. পাকিস্তান প্রসঙ্গে বলা হয়, দেশটির সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে যা প্রয়োজনে এমন সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে করাচি এবং লাহোর এলাকা থেকে ঘাঁটি করার সুবিধা নেওয়া যেতে পারে।

ঐ সময়ই যুক্তরাষ্ট্রের প্রশাসনের নিকট প্রতীয়মান হয় পাকিস্তানকে যদি সামরিক সহযোগিতা না করা হয়, তাহলে সে বেপোরোয়া হয়ে অন্য দেশ থেকে সামরিক সাহায্য নেওয়ার চেষ্টা করবে এবং ইতিমধ্যে ১৯৪৮ সালে সোভিয়েত প্রভাবান্বিত দেশ চেকোস্লোভাকিয়া থেকে অস্ত্র সংগ্রহ করেছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট তার পলিসি স্টেটমেন্টে পাকিস্তানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দেওয়ার জন্য ইঙ্গিত প্রদান করে। ১৯৫০ সালের ১৫ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পাকিস্তান মিউচুয়্যাল ডিফেন্স অ্যাসিসট্যান্স এগ্রিমেন্ট সম্পাদিত করে। ভাইস প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও সেক্রেটারি অব স্টেট ১৯৫৩ সালে পাকিস্তানে গমন করেন এবং ঐ চুক্তি কার্যকর করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিরক্ষা সম্পর্কে গুরুতর উদ্‌বিগ্ন হয়ে পড়েন। এসময় পাকিস্তানকে বিশেষ বিবেচনায় সামরিক সাহায্য দেওয়া হয়। পঞ্চাশ দশকে পাকিস্তানের সামগ্রিক বৈদেশিক সাহায্যের শতকরা ৮০ ভাগ যুক্তরাষ্ট্র সহায়তা দেয়। ষাট দশকে হ্রাস পেয়ে তা তিপ্পান্ন ভাগে এবং সত্তর দশকে তা আরও কমে বিশ ভাগে উন্নীত হয়।[৯৮] প্রথমদিকে ভারত বিভক্তির অবস্থায় পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আলোচনায় অগ্রসর হয়। যুক্তরাষ্ট্র দেখতে পায় আন্তর্জাতিক সিস্টেমে পাকিস্তান বিশ্বাসযোগ্য। যুক্তরাষ্ট্র এটা অনুভব করে যে, পাকিস্তান সেনা সরঞ্জাম ও সামরিক ডিপোগুলো পায়নি, পেয়েছে ভারত।[৯৯]

পাকিস্তান প্রসঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের নীতিতে প্রতিফলিত হয়েছে মনোভঙ্গির দিক থেকে রাষ্ট্রটি কমিউনিস্ট বিরোধী এবং মধ্যপ্রাচ্যে পাকিস্তানের সম্প্রসারিত নীতি এবং যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশিয়ায় গ্লোবাল নিরাপত্তা স্বার্থরক্ষাকারী, মধ্যপ্রাচ্যের স্বার্থ প্রতিরক্ষায় অগ্রণী এবং কমিউনিস্ট ও সমাজতান্ত্রিক দেশের জন্য একটি প্রতিরক্ষা বেষ্টনী। ষাট দশকে স্নায়ুযুদ্ধের তীব্রতা হ্রাস পেতে থাকলে যুক্তরাষ্ট্রের নিকট পাকিস্তানের গুরুত্ব পূর্বের মতো থাকেনি। সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে শীতল সম্পর্ক কেটে যেতে থাকলে উভয় দেশই চীনের দিকে নজর দেয় এজন্য যে, ততোদিনে চীন তিব্বত আক্রমণ করেছে, সীমান্ত উত্তপ্ত করেছে এবং ভারত ও পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্ত বাদে গোটা এশিয়ায় আধিপত্য বিস্তার শুরু করেছে। ভিয়েতনামে চীনের ভূমিকা মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে উভয় সংকটে ফেলে দেয়। অন্যদিকে, চীন তৃতীয় বিশ্বে নৈতিক ও আদর্শিক অনুপ্রেরণার দিক থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নকে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একটি বেষ্টনীর ভিতরে আবদ্ধ করতে সচেষ্ট। ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, থাইল্যান্ড, ভারত এবং পূর্ব পাকিস্তানে চীনের প্রভাব অনুভূত হয়। যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত রাশিয়া উদ্‌বেগপূর্ণ সম্পর্কের মধ্যেও দুই পরাশক্তির কার্যকলাপে আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে। লক্ষ্য করা যায়, মার্কিন স্ট্র্যাটিজিতে পাকিস্তান পূর্বের ন্যায় গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান থেকে সরে যায়। পাকিস্তান এসময় সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করে। কেননা পাকিস্তানের জাতীয় বাজেটে বৃহৎ অংশ প্রতিরক্ষা খাতে দেয়া হয় এবং সে যে অস্ত্র ভান্ডার গড়ে তুলেছে তা সোভিয়েত বা চীনের বিরুদ্ধে নয় বরং তা ভারতের বিরুদ্ধে। সেজন্য এসময় যুক্তরাষ্ট্র মনে করে পাকিস্তানের প্রাপ্ত সাহায্য ও সম্পদ কার্যকরভাবে উন্নয়ন কর্মসূচিতে ব্যয় করা উচিত। শিল্প উদ্যোক্তাদের জন্য অর্থ বিনিয়োগ করা এবং প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার প্রয়োজন। সেলক্ষ্যে বিপুল প্রতিরক্ষা ব্যয় হ্রাস করে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়ন জরুরি।[১০০] লক্ষণীয় ভারত-চীন সীমান্ত সংঘর্ষের কারণে দক্ষিণ এশিয়ায় মার্কিন নীতির মৌলিক পরিবর্তন ঘটে। এই সংঘর্ষের ফলে ভারত এবং যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরে সামরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে দক্ষিণ এশিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্রাটিজিক্যাল উদ্যোগ ব্যাপকভাবে হ্রাস পায়। এসময় পাকিস্তানকে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে প্রথম সারির রাষ্ট্র হিসেবে মনে করা হত না, বরং তাকে দেখা হয়েছে বিশ্বস্ত কৌশলগত রাষ্ট্র হিসেবে যার মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের সম্পর্ক গড়ে উঠতে পারে।[১০১] নিক্সন ও কিসিঞ্জার চীন সফরকে কেন্দ্র করে প্রস্তুতিমূলক কাজে ব্যস্ত থাকার ফলে পাকিস্তানের দুর্যোগপূর্ণ রাজনৈতিক অবস্থার দিকে যুক্তরাষ্ট্র যথাযোগ্য নজর দিতে পারেনি। হেনরি কিসিঞ্জারের পর্যবেক্ষণ ছিলো যুক্তরাষ্ট্র মাঝ পথে এসে যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতা মেনে নেওয়া সঠিক হবে না। কিসিঞ্জার এ ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে যে সমর্থন দিয়েছেন নিমিত্তস্বরূপ এ কারণে যে, চীন ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোকে দেখানো যে, যুক্তরাষ্ট্র যে অঙ্গীকার করে তা থেকে সরে আসে না এবং দারুণ বৈরিতার মধ্যেও বাস্তবায়নের চেষ্টা করেন।[১০২]

বাংলাদেশ সংকটের সময় যুক্তরাষ্ট্রের কূটনৈতিক গতিধারা মূল্যায়ন ও পরীক্ষা করার জন্য Carnegie Endowment for International Peace নামে একটি বৃহৎ প্রকল্প হাতে নেয়। এটা হলো যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি সংস্থা ছাড়াও পররাষ্ট্রনীতি গবেষণার জন্য একটি সংস্থা। পাকিস্তান গৃহযুদ্ধের ব্যাপক মানবিক দুঃখ-দুর্দশার প্রতি যুক্তরাষ্ট্র যথাযথ সংবেদনশীলতা দেখাতে ব্যর্থ হলো কেন-এ বিষয়ে বিশদ অনুসন্ধানই প্রকল্পটির উদ্দেশ্য। কার্নেগির ঘোষিত মানবিক গবেষণা কর্মসূচির অধীনে প্রতিষ্ঠানটির উদারনৈতিক গবেষকরা গণহত্যার প্রতি মার্কিন নীতির পক্ষপাত ঠিক কী প্রক্রিয়ায় সম্ভব হলো সেটা গবেষণা করে বের করতে উদ্যোগী হলেন। বায়াফ্রা ও নাইজেরিয়া গৃহযুদ্ধের কথা বিবেচনায় এনে সংস্থা বাংলাদেশ সংকটের গবেষণার উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সংস্থার গবেষকগণ পররাষ্ট্র দফতর, সিআইএ, প্রতিরক্ষা দফতর, হোয়াইট হাউজের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ, ইউএসএআইডি, জননিরাপত্তা সংস্থা ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অন্যান্য সংস্থার একশ' জনেরও বেশি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা-যাদের কোনো না কোনভাবে সামান্য হলেও বাংলাদেশ সংকটের সাথে যোগাযোগ ছিল–তাঁদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন। জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কিসিঞ্জারের পরিকল্পনা পরিচালক উইনস্টন লর্ড কার্নেগির পেপারসে যে কথা বলেছেন তা হলো এই, "যুক্তরাষ্ট্র মাত্র চীনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন করছিল। অবস্থাটা বেশ নাজুক। ১৯৭১ সালের জুলাই মাসে কিসিঞ্জারের চীনের যাবার কথা, ফেব্রুয়ারিতে নিক্সনের আর তার আগে জেনারেল হেইগের। চৌ এন লাই ও অন্যান্য নেতাদের সাথে সবেমাত্র যুক্তরাষ্ট্রের আলাপ শুরু হচ্ছিল। যুক্তরাষ্ট্রের তখন চীনকে দেখানো জরুরি যে যুক্তরাষ্ট্র সরকার হিসেবে যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য। চীনকে বোঝানো দরকার ছিল যে, যুক্তরাষ্ট্র তার বন্ধুত্বকে যথেষ্ট সম্মান করে এবং আন্তর্জাতিক সীমানা লঙ্ঘনের বিরোধীতা করে। দেশ হিসেবে যে যুক্তরাষ্ট্র নির্ভরযোগ্য, বন্ধুর বিপদের সময় যে যুক্তরাষ্ট্র পাশে এসে দাঁড়ায়, চীনকে সেটা দেখাবার জন্যই যুক্তরাষ্ট্রকে অমন আচরণ করেছে। অর্থাৎ 'এটা দেখানো যে আমরা আমাদের অঙ্গীকার রক্ষায় পেছপা হবো না, আমরা যা করছি তা ঠিক করছি, এটা দেখাবার জন্য আমরা দেশের ভেতর গঞ্জনা সহ্য করতেও প্রস্তুত। এসব চিন্তার সময় একটা বিবেচনা কাজ করছিলো যে, উপমহাদেশে ভারতই বড় শক্তি, তাই আমাদের ভৌগোলিক স্বার্থ বিবেচনা করা দরকার। কিন্তু স্বীকার করতে দ্বিধা নেই, আমরা পুরো ঘটনার মানবিক দিকটা, এই যে এত অত্যাচার নির্যাতন চলছে, এটা বুঝতে বড্ড দেরি করে ফেলেছিলাম।"[১০৩]

এ কারণে মার্কিন কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে হঠাৎ করেই নাটকীয় রদবদল দৃষ্ট হয়। ১৯৫৪ সালে মার্কিন সামরিক জোট সেন্টো ও সিয়াটো-তে পাকিস্তানকেও সামিল করে নেওয়া হয়। ভারত এ ব্যাপারে নিস্পৃহ থাকে। চৌএনলাই ও নেহরুর উৎসাহে 'বান্দুং সম্মেলনে' তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতিতে জোটনিরপেক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পাকা করে। আইয়ুব খান অভ্যুত্থানের ঠিক আগে ১৯৫৪-৫৮ সালে যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পাকিস্তানের আঁতাতের বিরুদ্ধে বিরোধীতা দানা বাধতে লাগলো। এই প্রশ্নে আওয়ামী লীগ ভেঙে যায়। সোহরাওয়ার্দী ও শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন পাশ্চাত্যঘেঁষা অংশটি এই আঁতাতের স্বপক্ষে মত প্রকাশ করে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে দলের বিরোধী অংশ এই আঁতাতের বিরোধীতা করে আওয়ামী লীগ ত্যাগ করে এবং (পিকিংপন্থি) ন্যাপ গঠন করে। এ ছাড়া শেখ মুজিবের নিজেরও বিলেতি ধাঁচের গণতন্ত্রের প্রতি দুর্বলতা ছিল। পাশ্চাত্যের দেশগুলোতে তাঁর যতো বন্ধু ছিল, এরা প্রধানত যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্র্যাটিক দল বা বিলেতের শ্রমিক দলের লোক এবং যারা উদারনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী।

কিন্তু ১৯৭১ সালে দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি সম্পূর্ণ ভিন্ন ছিল। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর নির্মম হত্যাযজ্ঞের শিকার বাঙালিদের প্রতি কিসিঞ্জার বা নিক্সনের বিন্দুমাত্র সহানুভূতি ছিল না, যদিও এই বাঙালিরাই নির্বাচনে জিতেছিলেন। তখন আন্তর্জাতিক রাজনীতির সব বড় বড় হিসেব কষা হচ্ছে, সেখানে পূর্ববঙ্গের 'সমস্যা' একটা বিরক্তিকর অথচ ভীতিপ্রদ উটকো ঝামেলা হিসেবে বিবেচিত হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যখন ঢাকায় এই ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড চলছে তখন পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খান ও পাকিস্তানের পিকিংস্থ রাষ্ট্রদূত কে.এম. কায়সার নিক্সনের পিকিং যাত্রার স্পর্শকাতর পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দূতিয়ালীর কাজে ব্যস্ত। কিসিঞ্জার জেদ ধরেছিলেন, যে কোনো মূল্যেই এসব আলাপ আলোচনা অব্যাহত রাখতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বের কাছে আর সব কিছু তখন গৌণ। নিক্সন ও কিসিঞ্জারের খুব ঘনিষ্ঠ মহলের বাইরে চীন উদ্যোগের কথা আর কেউ জানতেন না। ঠিক এই পর্যায়ে সারা যুক্তরাষ্ট্রের মাত্র চারজন লোক কিসিঞ্জারের পিকিং যোগাযোগের ব্যাপারটা জানতেন। এ ছাড়াও নিক্সনের রিপাবলিকান রাজনীতি আর কিসিঞ্জারের বাস্তব ও স্বার্থ-প্রধান রাজনৈতিক দর্শনে পরিষ্কারভাবে তৃতীয় বিশ্বের সামরিক একনায়কদের প্রতি দুর্বলতা দেখা যাচ্ছিলো। পূর্ববঙ্গে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগের সামরিক শাসনবিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলন আরোও উগ্রপন্থি প্রবলতার সুতিকাগার হতে পারে, এর প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নমনীয়তা দেখানো অসম্ভব–এমন মতও প্রকাশ করা হয়েছিল। এ কারণেই পরিস্থিতি অবশেষে এমন দাঁড়াল যে, কিসিঞ্জারের মতের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতরের নজীরবিহীন বিরোধীতা সত্ত্বেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে প্রায় কোনো রকম সরকারি সমর্থনই আদায় করতে পারেনি।

ঢাকায় পাকিস্তানিদের হত্যাযজ্ঞের পর আওয়ামী লীগ নেতৃত্ব পার্শ্ববর্তী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। আশ্রয় ও সামরিক তৎপরতার ঘাঁটি হিসেবে ভারতীয় সমর্থন বাঙালিদের জন্য কৌশলগত বিবেচনায় অত্যন্ত জরুরি হিসেবে দেখা দেয়। নানা কারণে আওয়ামী লীগের আন্দোলনকে সহায়তা দান ভারতের কাছে বেশ যুক্তিসঙ্গত মনে হয়েছে। বাইরে থেকে আওয়ামী লীগ ও কংগ্রেস দল উভয়ের মতাদর্শই একরকম তা হলো একটি ধর্মনিরপেক্ষ সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার উপর বিশ্বাস। তাছাড়া কৌশলগত দৃষ্টিকোণ থেকে পাকিস্তানের ভাঙনে দক্ষিণ এশিয়ায় নয়াদিল্লির প্রধান শত্রুর বিদায় সূচিত করবে। শুধু সতর্ক দৃষ্টি ছিল, স্বাধীনতা যুদ্ধের দীর্ঘায়নের ফলে উগ্রপন্থি মার্কসবাদীদের হাতে যেন মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব না চলে যায়। তাই ১৯৭১-এর ডিসেম্বরে ভারতীয় সেনাবাহিনী বাংলাদেশ যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করে নয় মাসের গেরিলাযুদ্ধের সমাপ্তি টেনে দেয়। সরাসরি হস্তাক্ষেপের আগে মার্কিন শত্রুতার মুখোমুখি হয়ে ভারত পরাশক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের আর্থিক, কারিগরি ও সামরিক সমর্থন পেতে থাকে। ভারত-সোভিয়েত অক্ষশক্তির উপর আওয়ামী লীগের সামরিক ও অর্থনৈতিক নির্ভরতার ফলে শেখ মুজিবকে পরে আরো কট্টর জাতীয়তাবাদীদের কাছে যথেষ্ট সমালোচনা সহ্য করতে হয়। এরা কখনো চাননি ভারত তাদের হয়ে হস্তক্ষেপ করুক।[১০৪] যখন ক্রমাবনতিশীল অর্থনৈতিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে পাকিস্তানি আধিপত্য থেকে মুক্ত হওয়ার স্থলে বাংলাদেশকে ভারতীয় খবরদারি কবুল করতে হয়েছে, তখন এসব কথা উঠেছিল।[১০৫] পাকস্তানের প্রতি মার্কিন পক্ষপাত নতুনভাবে প্রতিভাত হয়, বিশেষকরে চীনের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নাটকীয় মতবদলের লক্ষ্যে কিসিঞ্জারের তৎকালীন গোপন আলাপ আলোচনা বিশ্লেষণ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করলে দেখা যাবে পিকিং যাবার ক্ষেত্রে পাকিস্তানি যোগসূত্রের প্রতি একচেটে মার্কিন পক্ষপাত কিভাবে বাংলাদেশের প্রতি মার্কিন নীতির ক্ষেত্রে প্রভাব রেখেছিল। আবার ঊর্ধ্বতন মার্কিন কর্মকর্তাদের জবানি থেকে শ্রীমতী গান্ধীর প্রতি নিক্সনের দীর্ঘকালীন বিরাগ ও পাকিস্তানের সামরিক নেতৃত্বের সাথে পুরনো সখ্যতার কথাও জানা যায়।

১২ খ. বাংলাদেশ সংকট নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রশাসনে অভ্যন্তরীণ টানপোড়েন

নিক্সন প্রশাসন ও মার্কিন সিভিলসমাজে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার নিয়ে যে দ্বন্দ্ব চলছিল তা নিয়ে কিসিঞ্জারের সামান্যই আগ্রহ ছিল। বৃহত্তর রণতাত্ত্বিক বিবেচনায়, টানাপোড়েনের বড়ো বড়ো হিসেবে এইসব ধড়িবাজ রণতাত্ত্বিকদের কাছে এই ছোট দেশগুলো বিন্দুমাত্র বিবেচনার যোগ্য ছিল না। কিসিঞ্জারের কাছে কম্বোডিয়া যদি গৌণ অনুষঙ্গ হয়ে থাকে তবে নিঃসন্দেহে বলা যায় বাংলাদেশ তার কাছে তাও ছিল না। তবুও কিসিঞ্জারের পাকিস্তান প্রীতির জন্য মার্কিনীদের সরবরাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের ফলে বাংলাদেশে হতাহত এবং শরণার্থী সংখ্যা ক্যাম্বোডিয়ার চাইতে ঢের বেশি ছিল।

নিক্সনের শাসনের প্রথমপাদে কিসিঞ্জারের জন্য ক্যাম্বোডিয়া এবং বাংলাদেশ দু'টো বড়ো ব্যর্থতা। মার্কিন জনগণের কাছে কম্বোডিয়ার আগ্রাসন উদ্ভূত ঘটনাবলি সুবিদিত : সারাদেশ জুড়ে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ধর্মঘট, কেন্ট স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ে হত্যাকাণ্ড এবং তারপর ওয়াশিংটনে গণবিক্ষোভ। কিসিঞ্জারের নিজের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে এসময় হঠাৎ করে এক ঝাঁক কর্মকর্তা পদত্যাগপত্র পেশ করে। কিন্তু নিক্সন প্রশাসনে বাংলাদেশের ঘটনাবলি যে সেদেশের আভ্যন্তরীণ সংকট সৃষ্টি করেছিল তা তাদের গোচরে আসলেও মার্কিন প্রশাসন তা আমলে নেয়নি। অথচ পররাষ্ট্র দফতরে কিসিঞ্জারের নীতির বিরুদ্ধে যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিবাদ হয়েছিল সেটা অভূতপূর্ব। "এর আগে আমরা কখনো মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির বিরুদ্ধে এতখানি বিরোধীতা দেখিনি। আমার অভিজ্ঞতায় এটা সম্পূর্ণ একক ঘটনা।"[১০৬]

বাংলাদেশের সংকটকালীন মুহূর্তগুলো এবং তা থেকে উদ্ভূত ঘটনাবলির উপর নজর দিলে মার্কিন বিদেশনীতির অপরিপক্ক সূত্রগুলো বেরিয়ে আসবে। এক দশক ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খানের সামরিক একনায়কতন্ত্রের পর ১৯৭০-এর ডিসেম্বরে অবাধ গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়। প্রস্তাবিত জাতীয় সংসদে সমগ্র পাকিস্তানে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে ও গণতান্ত্রিক নিয়মে আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হওয়ার কথা। দীর্ঘ দু'দশক ধরে পূর্বাঞ্চলের অর্থনীতির উপর পশ্চিম পাকিস্তান যে আর্থিক প্রভুত্ব কায়েম করেছিল এই ঘটনার ফলে তার অর্থবহ পরিবর্তন হয়ে যেত। পাঞ্জাবের যুদ্ধংদেহী অংশ ও জুলফিকার আলী ভুট্টোর দল পিপিপি'র চাপের মুখে সামরিক কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া ও পদ্ধতি ত্যাগ করতে অস্বীকার করে। ১৯৭১-এর ১লা মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে দেশের অস্থায়ী সামরিক জান্তা ৩রা মার্চের নির্ধারিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতীয় সংসদ অধিবেশন মুলতবি ঘোষণা করে। এর ফলে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক বেসামরিক আইন অমান্য আন্দোলন শুরু হয়। তারপর ২৫শে মার্চ রাতে দক্ষিণ এশিয়ায় জঘন্যতম গণহত্যার মাধ্যমে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। ফলে পাকিস্তান এক অনিবার্য গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে, এবং বাংলাদেশ পূর্ণ স্বাধীনতার দিকে দৃঢ় অঙ্গীকারে এগিয়ে যায়।।

বাংলাদেশের ঘটনাবলি মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করে। ঢাকায় ব্যাপক হত্যাকাণ্ড সত্ত্বেও মার্কিনীদের সেন্টো/সিয়াটো মারফত সরবাহকৃত অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্যে একটা গণতান্ত্রিক নির্বাচনের ফলাফলকে নস্যাৎ করা হচ্ছে বুঝতে পেরেও মার্কিন প্রশাসনের উচ্চপর্যায়ে পাকিস্তানি জান্তার প্রতি অহেতুক পক্ষপাতের জেদ বাংলাদেশের সংকট সম্পর্কে সচেতন পররাষ্ট্র দফতরের কিছু কর্মচারীর কাছে পরিষ্কার হয়ে যায়। যুক্তরাষ্ট্র তার বিঘোষিত মানবিক মূল্যবোধ, ন্যায্যতা ও গণতন্ত্রের মৌলিক মূল্যবোধ থেকে সরে এসেছে। পররাষ্ট্র দফতরের রাজনৈতিক কর্মচারীরা, বিশেষত ঢাকায় বসে যারা ব্যাপক হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করছিলেন, তারা আর পেশাসুলভ সংযম ও নিস্পৃহতার সাথে ব্যাপারটা গ্রহণ করতে পারেননি। ফলে মার্কিন পররাষ্ট্র সার্ভিসে একটা অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। ঢাকার কনসাল জেনারেল আর্চার ব্লাড এর নেতৃত্বে বিশজন মার্কিন দূতাবাস কর্মচারী মার্কিন সরকারি নীতির প্রতি তাদের সকলের ধিক্কারের কথা তারযোগে ওয়াশিংটনে পাঠান। ১৯৭১-এর ৬ই এপ্রিল এই তারবার্তাটিতে বলা হয়, মার্কিন সরকার গণতন্ত্র অবদমনের বিষয়টি নিন্দা করতে ব্যর্থ হয়েছে, তার নাগরিকদের রক্ষায় শক্ত নীতি গ্রহণ করেনি এবং দেউলিয়াত্বের প্রমাণ দিয়েছে। পক্ষান্তরে, সোভিয়েত রাশিয়া গণতন্ত্র, নির্বাচিত নেতৃবৃন্দের গ্রেফতার, রক্তপাত এসব বিষয়ে প্রতিবাদ করেছে। তারবার্তার শিরোনাম, 'পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের নীতির সাথে ভিন্ন মত' : 'পূর্ব পাকিস্তানের সাম্প্রতিক ঘটনাবলির প্রতি মার্কিন নীতি ব্যাপক অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের নৈতিক স্বার্থ এবং সংকীর্ণ অর্থে যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় স্বার্থ, কোনোটাই রক্ষা করে না-এই বিশ্বাসে উদ্বুদ্ধ হয়ে ঢাকাস্থ মার্কিন কনসাল জেনারেল, ইউএসএআইডি ও ইউএসআইএস এর কিছু অফিসার বর্তমান নীতির কিছু মৌলিক দিকের সাথে নিজেদের গভীর ভিন্নমত জানিয়ে দেওয়া কর্তব্য মনে করে। যুক্তরাষ্ট্রের সরকার গণতন্ত্র হরণের প্রতিবাদ করতে ব্যর্থ হয়েছে। সরকার নিজেদের নাগরিকদের রক্ষাকল্পে দৃঢ় ব্যবস্থা নিতেও ব্যর্থ হয়েছে। অথচ একই সময় পশ্চিম পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত সরকারের মনোরঞ্জনের জন্য, তাদের উপর যুক্তিসঙ্গত নেতিবাচক আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া ঠেকানোর জন্য অহেতুক আগ্রহ ব্যক্ত করেছে।[১০৭]

পাকিস্তানের উপর যুক্তরাষ্ট্র সাম্প্রতিক পলিসি পেপার-এ পাকিস্তানে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ যে আসলে মানবিক, কৌশলগত নয়-এ কথাটাই বলা হয়েছিল। অথচ 'একটি সার্বভৌম রাষ্টের সম্পূর্ণ নিজস্ব ব্যাপার' এই ছুতোর যুক্তরাষ্ট্র এই দ্বন্দ্বে–যেখানে বহু ব্যবহারজীর্ণ 'গণহত্যা' কথাটি দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রযোজ্য সেক্ষেত্রেও নীতিগতভাবে হস্ত ক্ষেপ না করা সমীচীন বোধ করেছি। বেসরকারি মার্কিনীরা এ বিষয়ে ঘৃণা জানাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কুণ্ঠাবোধ করেননি। "পেশাদার সরকারি কর্মচারি হিসেবে আমরা শুধু বর্তমান নীতির সাথে দ্বিমত ব্যক্ত করছি আর সর্বান্তঃকরণে কামনা করছি যেন এখানে আমাদের সত্যিকার ও স্থায়ী স্বার্থ চিহ্নিত করা হয় ও আমাদের নীতি সঠিক পথে পরিচালিত হয়।"

রাত চারটার সময় ঢাকা হতে তারবার্তাটি যখন ওয়াশিংটনে পৌঁছালো তখন পররাষ্ট্র দফতর ভবনের সাত তলায় পররাষ্ট্র দফতরের একদল দক্ষিণ এশিয়া বিশেষজ্ঞ একত্র হলেন। এই সাত তলাতেই পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিভিন্ন বৈঠকে সভাপতিত্ব করে থাকেন এবং এখানেই রাত্রিকালিন খবরাদি আসে। দলটি 'ভিন্ন মত'-এর বক্তব্যের সাথে সম্পূর্ণ একমত হয়ে তাদের নিজেদের স্বাক্ষর জুড়ে দেবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এছাড়া নিজেরাও একটা চিঠি লিখলেন। ভিন্নমতাবলম্বীদের সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ত্রিশ-এ। তাদের বক্তব্য শোনার পর তাদের খুব হালকা ও আনুষ্ঠানিকভাবে জানানো হলো যে, পররাষ্ট্র দফতর ঠিকমত চালানোর জন্য এ ধরনের 'অভ্যন্তরীণ বিতর্ক' যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরবর্তী দিনগুলোতে তাদের ঠান্ডা মাথায় উপেক্ষা করা হয় ও নীতি নির্ধারণ হতে দূরে রাখা হয়।

কম্বোডিয়া এবং বাংলাদেশ উভয় সংকটের সময় কিসিঞ্জারের বৃহত্তর ভৌগোলিক পরিকল্পনার আওতায় সব নির্দিষ্ট দায়িত্বকে অধীন করার কৌশলটির সাথে পররাষ্ট্র দফতরের বিশেষজ্ঞদের বোঝাবার বা একমত হবার অপারগতা কিসিঞ্জারের জন্য প্রভূত তিক্ততার উৎস ছিল। চীন সম্পর্কের পরিবর্তনের বেলায় যেমনটা হয়েছিল, তিনি কখনো কাজ শেষ হওয়ার আগে তার বৃহত্তর কৌশলগত লক্ষ্য সম্বন্ধে কিছু বলতেন না। বিশেষজ্ঞ অথবা ওয়াকিবহাল মহল বাংলাদেশ ও কম্বোডিয়ার ব্যাপারে তার বিরোধীতা করেছিল-এটা সুবিদিত। এরপর থেকে তিনি এমন সব অনুগত অবিশেষজ্ঞ পছন্দ করতেন, যারা দ্বিতীয় চিন্তা না করে হোয়াইট হাউজের নীতি বাস্তবায়িত করবে। বাংলাদেশের ব্যাপারে সম্পর্কিত বিষয় হতে তাদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। বহু বছর পর কার্টার ক্ষমতায় আসায় তারা পুনর্বাসিত হন।

কার্নেগি পেপারস মার্কিন নীতি নির্ধারণের উঁচু মহলের এই চড়া নাটকে 'দ্বিচারী' দিকটা উন্মোচিত হয়েছে। কর্মকর্তাদের বৈঠক ও আলোচনার স্মৃতিচারণে ধারণা করা যায়, সংকটের সব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো যেমন, পূর্ববঙ্গে গণহত্যা, পরাশক্তির দ্বন্দ্ব, পাকিস্তানি একনায়কত্ব ও গণতন্ত্রের প্রতি মার্কিননীতি-এসব কিছু দুই ভাবে ছকে ফেলা হয়েছিল। ছকের একধারে ছিল ভারতের প্রতি নিক্সনের ব্যক্তিগত বিদ্বেষ এবং অন্যদিকে, ছিল চীন আলোচনা নিয়ে কিসিঞ্জারের অন্ধ একপেশে মনোযোগ। এই একপেশে নীতিকে ঢেকে ফেলতে যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাত্র কূটনৈতিক ছাতা ব্যবহার করেছিল আর তা হলো পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলিকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ ঘটনা ও গৃহযুদ্ধ হিসেবে চালিয়ে দেওয়া।[১০৮] যদিও সিনেটর এডোয়ার্ড কেনেডি ও সিনেটর বি. সেক্সবে নির্বিচার গণহত্যা, বুদ্ধিজীবী হত্যা, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, ছাত্র-যুবক-মহিলা হত্যা এবং অগণিত মানুষের দুর্দশার জন্য নিন্দা করার জন্য সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করেন।[১০৯]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৯৬৭ সালে নিক্সন যখন দক্ষিণ এশিয়ায় সফর করেছিলেন-ভারতীয়রা তাকে যথাযথ মূল্যায়ন করেনি। পক্ষান্তরে পাকিস্তান তাকে সমাদর করে। পাকিস্তানিরা কিন্তু ভেবেছে একে নিয়ে একটু মাতামাতি করলে ক্ষতিটা কী? লোকটা কিছু লোককে চেনে, আমাদের কাজে আসতে পারে এমন কিছু যোগাযোগও আছে সুতরাং আমাদের ক্ষতিটা কোথায়? ভবিষ্যতের জন্য তাদের কিছু সুবিধে জমা হয়ে রইলো।"

সুচিন্তিত, বিজ্ঞ সুবিবেক নীতি-নির্ধারকরা পরিস্থিতি কিংবা নীতি সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে বিজ্ঞ, সুশৃঙ্খল ও সতর্ক সিদ্ধান্ত নেন-এ ধরনের প্রক্রিয়ার সাথে বাস্তবে মার্কিন পররাষ্ট্র নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়াটির মিল সামান্য। তবুও দম্ভ এবং পক্ষপাত সীমিতভাবে কাজ করতে অথবা বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বিশ্বজোড়া মার্কিন একাধিপত্যের গূঢ় রহস্য তাতে ব্যাখ্যা করা হয় না। আমাদের মতে ইতিহাসের এই 'নচ্ছার/মোটা দাগের প্রতিক্রিয়া' তত্ত্বের অনুভূতিনির্ভর দিকটি আড়ালের বাস্তব বুদ্ধিপ্রসূত প্রক্রিয়াগুলোর উপর একটা চটুল পলেস্তারা দেয়। কিন্তু এসব ব্যাপারে গভীর ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের এখতিয়ার বহির্ভূত।[১১০]

১৩. চীন-মার্কিন গোপন কূটনৈতিক যোগযোগ

প্রেসিডেন্ট নিক্সন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে দেখে নেওয়ার[১১১] মনোভাব থেকে চীনকে উস্কে দেওয়ার নীতি গ্রহণ করেন। এই লক্ষ্যে চীনে এরূপ বার্তা প্রেরণ করা হয় যে, চীন যদি মনে করে তারা কতিপয় পদক্ষেপ নেবে তাহলে কোনো শক্তি তাদের উপর হস্তক্ষেপ করবে এ কথা মনে করে ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। নিক্সন হেনরি কিসিঞ্জারকে এই বলে প্রেস কনফারেন্স করতে বলেন যে, উপমহাদেশে সংঘর্ষে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো দায়িত্ব নেই। কিসিঞ্জার সাংবাদিকদের বলেন যে, রাশিয়ানদের ভারতে স্বার্থ রয়েছে, চীনের স্বার্থ রয়েছে পাকিস্তানের পক্ষে, কেবল যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ হলো শান্তি প্রতিষ্ঠা।[১১২] ভারতের আক্রমণের পরিপ্রেক্ষিতে মস্কোর উপর চাপ সৃষ্টি করা হয়। নিক্সন প্রশাসন চীনের সেনাবাহিনীকে ভারত সীমান্তে এগিয়ে যেতে ও বঙ্গোপসাগরে নৌবহর পাঠাতে সম্মত হয়। ৯ই ডিসেম্বর নিক্সন প্রশাসন শক্ত নীতি গ্রহণ করেন। হোয়াইট হাউজে সোভিয়েত কৃষিমন্ত্রী ভ্লাদিমির মেসকেভিকস্ যার পররাষ্ট্র সম্পর্কে বলার কোনো এখতিয়ার ছিল না তাকে নিক্সন বলেন, মার্কিন-সোভিয়েত সম্পর্ক উভয় দেশের জন্য সবকিছুর ঊর্ধ্বে। কিন্তু দক্ষিণ এশিয়ার পরিস্থিতি তার উপর বিরাট কালো ছায়া বিস্তার করেছে। এই যুদ্ধ সোভিয়েত রাশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক বিষাক্ত করছে এবং দু'দেশকে সংঘর্ষের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। নিক্সন বলেন, অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধকে স্বীকৃতি দেওয়া দরকার। ঐদিনই সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, যে নৌবহর পাঠানো হয়েছে তা পূর্ব পাকিস্তান থেকে দু'শত মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য, যা কেউ বিশ্বাস করেননি। যুক্তরাষ্ট্র এ সময় শক্তি প্রদর্শনের নীতি গ্রহণ করে। চীনকে সীমান্তে সৈন্য পাঠানোর কথা বলা হয়। ঐদিনই কিসিঞ্জার প্রকাশ্যে পাকিস্তানকে সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন। কিসিঞ্জার বলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যে, তিনি ভারত বা পাকিস্তানবিরোধী নন, কিন্তু রাজনৈতিক সিদ্ধান্তে প্রতিবেশী দেশের সশস্ত্র বাহিনী মনোচিত্র পরিবর্তন করে দেবে তিনি তার বিরুদ্ধে।

১০ই ডিসেম্বর হেনরি কিসিঞ্জার ঈষৎ চক্রান্তমূলক পরিকল্পনায় চীনের দু'জন প্রতিনিধির সঙ্গে দেখা করার জন্য গোপনে ওয়াশিংটন থেকে নিউইয়র্কে যান। তিনি তাদের সঙ্গে একটি অ্যাপার্টমেন্টে দেখা করেন। কিসিঞ্জার তাদের বলেন, প্রেসিডেন্ট নিক্সন তাদের আশ্বস্ত করেছেন। উপমহাদেশের বিষয়ে যদি তাদের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র সেক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করবে। তিনি চীনের প্রতিনিধিদের পরামর্শ দেন শ্রীমতী গান্ধী পাকিস্তানের আর্মি ও সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে চান এবং কাশ্মীরের বাকি অংশ দখলে নিতে চান। এ সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তান-ভারতকে যুদ্ধবিরতি ও রাজনৈতিক সমঝোতার আহ্বান জানালে ভারত পূর্ব পাকিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারে অস্বীকৃতি জানান। চীনা রাষ্ট্রদূত বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতা সম্পূর্ণভাবে অসমর্থনযোগ্য। কিসিঞ্জার বলেন, এই বৈঠকের লক্ষ্য হলো চীনা সামরিক সাহায্য, প্রকৃত অর্থে পাকিস্তান কীভাবে পরাজিত হচ্ছে অথবা বাংলাদেশের স্বাধীনতা আয়োজন করছে সেটি নয়।

ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েতের ব্রেজনেভের বরাবর একটি পত্র লেখেন। ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত নিক্সনের লেখা বার্তার কোনো জবাব মস্কো থেকে আসেনি অথবা রাষ্ট্রদূত বা কৃষিমন্ত্রীকে যা বলা হয়েছিল তার কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। নিক্সন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে যে, ব্রেজনেভকে হটলাইন বার্তা পাঠাবে। নিক্সনের বক্তব্য ছিল, হোয়াইট হাউজকে শক্ত হতে হবে।

নিক্সন-কিসিঞ্জার চীনের ভূমিকা কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করেন। কিসিঞ্জারের বক্তব্য হল, চীন যদি সীমান্তে কিছু সৈন্য না পাঠায় তাহলে তাদের সঙ্গে বা তাদের আর কথা বলার দরকার নাই। তারা আলোচনা করেন চীন যদি ভারতের দিকে অগ্রসর হয় তাহলে সোভিয়েত সৈন্য সাড়া দেবে। তাহলে যুক্তরাষ্ট্রের কিছুই করার থাকবে না এবং কিসিঞ্জারের কথায়, 'আমরা তখন শেষ হয়ে যাব।' এসময় নিক্সন বলেন, আমরা পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে লবিং করতে পারি। কিসিঞ্জারের মতে এই মুহূর্তে সেটা সম্ভব হবে না। এই সময় তাদের পরামর্শ হলো ভারত যাতে পাকিস্তানকে সম্পূর্ণ ধ্বংস করতে না পারে এবং সোভিয়েত কর্তৃক চীন যাতে পরাজিত বা ধ্বংস না হয় সেটার উপর জোর দেওয়া। এ বিষয়টি বিশ্বে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিবর্তন আনবে এবং যুক্তরাষ্ট্রকে কয়েক যুগ ধরে সতর্ক অবস্থায় থাকতে হবে। নিক্সন মস্কোর সঙ্গে মুখোমুখি হতে সম্মত হন। এসময়ে ফরাসি প্রেসিডেন্ট জর্জ পমপিডো নিক্সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলে নিক্সন বলেন, এরকম অবস্থায় সাত কোটি মার্কিন ও সাত কোটি রাশিয়ান মারা যাবে যদি আনবিক অস্ত্র ব্যবহার করা হয়। কিন্তু তাদের উচিত শান্তির পথ ধরে সমঝোতায় উপনীত হওয়া।

নিক্সন তাকে বলেন, "বিগত ২৪ ঘন্টা ধরে সংঘর্ষ এড়াতে এবং সমঝোতার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার সমস্যা নিরসনের চেষ্টা করে যাচ্ছি।"[১১৩]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এই প্রসঙ্গে নিক্সনের অভিমত যে মুহূর্তে চীন পাকিস্তানের সাহায্যে এগিয়ে আসবে তখন যদি সোভিয়েত চীনের দিকে ধাবিত হয় তখন ব্রেজনেভকে সামরিক ব্যবস্থা সম্পর্কে সতর্ক করা হবে। ঐদিনই সোভিয়েত প্রতিবার্তা সকালে ওয়াশিংটনের হস্তগত হয়। বার্তায় বলা হয়, দিল্লি পশ্চিম পাকিস্তানকে গ্রাস করবে না এবং যুদ্ধবিরতি আলোচনা চলছে। ১২ই ডিসেম্বর বিকালে হেগ জানান, ভারতের সীমান্তে চীনা সৈন্যরা অগ্রসর হচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত চীন তার সৈন্যকে আর অগ্রসর করাননি।

১৩ ক. যুক্তরাষ্ট্র-চীন : কূটনৈতিক রণকৌশল

নিউইয়র্কে ১০ই ডিসেম্বর চীনের পক্ষে রাষ্ট্রদূত ও জাতিসংঘের স্থায়ী প্রতিনিধি ওয়াং হুয়া ও চেন চুয়া, জাতিসংঘের সহকারী স্থায়ী প্রতিনিধি এবং ডিরেক্টর ইনফরমেশন ডিপার্টমেন্ট, মিনিস্ট্রি অব ফরেন অ্যাফেয়ার্স, তাং ওয়েনহেং, সাই ইয়েন-হুয়া, ইন্টারপ্রিয়েটার এবং যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষে হেনরি কিসিঞ্জার, যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের জাতীয় নিরাপত্তা বিষয়ক সহকারী, রাষ্ট্রদূত জর্জ বুশ, জাতিসংঘের প্রতিনিধি, বিগ্রেডিয়ার জেনারেল আলেকজেন্ডার এম. হেগ, প্রেসিডেন্টের নিরাপত্তা বিষয়ক জুনিয়র ডেপুটি অ্যাসিস্ট্যান্ট এবং উইনস্টন লর্ড, সিনিয়র নিরাপত্তা বিষয়ক স্টাফ মেম্বার নিউইয়র্কে ১০ই ডিসেম্বর যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের শীর্ষ কর্মকর্তাদের বৈঠক হয়। উভয় পক্ষের আলোচনায় কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানকে যুদ্ধে অস্ত্র দেওয়ার ব্যাপারে আইনগত বাধা রয়েছে এবং মিত্র দেশ পাকিস্তানকে মার্কিন অস্ত্র প্রেরণের ক্ষেত্রে আইনগত নিষেধ রয়েছে। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্রের ভিন্নভাবে অস্ত্র প্রেরণের ব্যবস্থা করতে হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র জর্ডান, ইরান, সৌদি আরব এবং তুরস্ককে অস্ত্র প্রেরণে কথা বলা হয়েছে। তাদের নিজস্ব নিরাপত্তার জন্য যদি পাকিস্তানে অস্ত্র প্রেরণ করতে অসুবিধা হয় সেটা যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দেখবে এবং প্রয়োজনে আগামী বাজেটে তাদের অসুবিধাগুলো দূর করার ব্যবস্থা থাকবে। এই আশ্বাসের ভিত্তিতে ১০ই ডিসেম্বর ৪টি যুদ্ধ বিমান জর্ডান ত্যাগ করেছে এবং এ সপ্তাহে আরো ২২টি যুদ্ধ বিমান পৌঁছাবে। গুলি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম পাঠানো হচ্ছে। এসময় চীনের রাষ্ট্রদূত ওয়াং বলেন, এক কথায় অর্থ হলো যুদ্ধ প্রলম্বিত সময় হবে ডিসেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত। কিসিঞ্জার বাগাড়ম্বর করে বলেন, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে চীন যে ধরনের সংঘাত চায় বা কতো সৈন্য সমাবেশ করেছে তাও যদি চীন জানতে চায় সেসব তথ্য যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকে পেতে পারে। দ্বিতীয়ত, ভারত উপমহাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে চীনের নিরাপত্তার উপরে কোনো হুমকি আসে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র এ ধরনের হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে। যুক্তরাষ্ট্রের নৌবাহিনী মালাক্কার পূর্ব প্রান্ত অতিক্রম করেছে।

এ সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের অজ্ঞাত ছিল না যে, যার উল্লেখ করে কিসিঞ্জারের মন্তব্য ছিল, 'পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানের সৈন্য পরাজিত হয়েছে।' পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যদের তেল ও গ্যাস মাত্র দুই থেকে তিন সপ্তাহের জন্য মজুদ আছে। যুক্তরাষ্ট্রের বর্তমানে লক্ষ্য হলো ভারতের সেনাবাহিনী যাতে অবিলম্বে পাকিস্তান আক্রমণ ও লক্ষ্য

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অর্জন করতে না পারে। যুক্তরাষ্ট্র যদি তাদের বাধা দিতে না পারে তাহলে আশঙ্কা রয়েছে পূর্ব পাকিস্তান হবে ভুটান এবং পশ্চিম পাকিস্তান হবে নেপাল। তখন ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের সাহায্যে যেদিকে ইচ্ছা শক্তি প্রয়োগ করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রের অভিমত হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে যদি ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় সেক্ষেত্রে দুটো জিনিস প্রয়োজন। সেটা হলো, চূড়ান্তভাবে ভারতকে ভীতি প্রদর্শন করা এবং কিছুটা হলেও রাশিয়াকেও। ভারতের বিঘোষিত রণকৌশল হল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী মন্ত্রী পরিষদে যেমনটি বলেছেন, ভারত পাকিস্তান সেনা এবং বিমান বাহিনীকে ধ্বংস করতে চায়, কাশ্মীরের একটি অংশ দখলে নিতে চায়, তারপর যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব দেবে। যুক্তরাষ্ট্র মনে করে অবিলম্বে এটা প্রতিরোধ করা দরকার। সেজন্য এই বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে।

কিসিঞ্জারের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে চীনা রাষ্ট্রদূত হুয়াং কিসিঞ্জারকে ধন্যবাদ দিয়ে বলেন, তিনি যুক্তরাষ্ট্রের এই বক্তব্য প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাইকে জানাবেন। চীনা রাষ্ট্রদূত চীনা নীতি সম্পর্কে বলেন, সরকারের অবস্থান গোপনে নয়, সবকিছুই বিশ্বকে জানানো হয়েছে। চীন জাতিসংঘে যে ভূমিকা নিয়েছে সেটি চীন সরকারের অনুমোদিত ভূমিকা। চীন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে ও সাধরণ পরিষদে, প্লিনারি অধিবেশনে এবং খসড়া প্রস্তাবে যুদ্ধবিরতি, সেনা প্রত্যাহারের কথা বলেছে। অধিকাংশ দেশ তা সমর্থন করেছে এবং বিশ্ববাসী দেখেছে। যদি ভারত সোভিয়েত রাশিয়ার সাহায্য নিয়ে উপমহাদেশে নিজস্ব উদ্দেশ্য সাধন করতে চায়, তার অর্থ হলো একটি সার্বভৌম রাষ্ট্রকে ভেঙে ফেলা এবং নতুন রাষ্ট্রের নবরূপ ম্যানচুকুও-র মতো হবে বাংলাদেশ। এর অর্থ হলো সামরিক আগ্রাসন এবং সার্বভৌম ভূখণ্ড দখল। এ বিষয়ে রাষ্ট্রদূত হিসেবে তার ব্যক্তিগত অভিমত হল, যুক্তরাষ্ট্র বর্তমানে যে অবস্থান নিয়েছে তা হলো দুর্বল। সোভিয়েত রাশিয়া ভারত উপমহাদেশে চূড়ান্ত পর্যায়ে ভয়ঙ্কর পথে এগিয়ে যাচ্ছে এবং এর অর্থ হলো এটা এমন একটি পদক্ষেপ যা চীনকে ঘিরে ফেলা। ব্রেজনেভ যে ব্যক্তিগত উদ্যোগ গ্রহণ করেছে, যা চীন দেখতে পাচ্ছে, রাজনৈতিক সমঝোতার কথা তা হলো সরাসরি ও দৃশ্যত একটি দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ; যা চীনের নিকট সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। চীনের নীতিগত অবস্থান রাষ্ট্রদূতের বক্তব্যে প্রকাশিত হয়। চীনের অভিজ্ঞতা বলে যে, পাকিস্তানের জনগণ[১১৪] যে ন্যায্য সংগ্রাম শুরু করেছে সেক্ষেত্রে চীনা জনগণ তা সমর্থন করবে যেমন সমর্থন করবে সাড়া বিশ্বের জনগণ। যারাই ন্যায় এবং স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এবং ভূ-নিরাপত্তার জন্য সংগ্রাম করছে চীন তাদের সমর্থন করে।

কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক এবং সামরিকভাবে ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। পূর্ব পাকিস্তান ও পাকিস্তানের নেতাদের মধ্যে রাজনৈতিক সমঝোতার ব্যাপরেও যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ নেই। যুক্তরাষ্ট্র অখণ্ড পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েত রাশিয়ার চুক্তিবদ্ধ অবস্থানে আগ্রহী। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের মধ্যে চুক্তির ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো আগ্রহ নেই। পরিশেষে কিসিঞ্জার বলেন, যেকোন বিষয় বা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

যেকোনো ঘটনা হোক না কেন, বাংলাদেশের সঙ্গে কাউকে কথা বলার জন্য অথরাইজ করা হয়নি। যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিচ্ছে না এবং স্বীকৃতি দেবে না।[১১৫]

১৪. যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন

১১ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিক্সন বরাবর পাক-ভারত পরিস্থিতি নিয়ে কিসিঞ্জার এক মেমোরেন্ডম প্রেরণ করেন। সেখানে উল্লেখ করা হয় ১০ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতি, পাকিস্তান সৈন্যদের প্রত্যাবর্তন এবং পূর্ব পাকিস্তানের নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পর্কে পাকিস্তান সরকারের নতুন প্রস্তাব সকালে তার হস্তগত হয়েছে।[১১৬] পশ্চিম সীমান্তে কাশ্মীরে তুমুল ট্যাংক যুদ্ধ চলছে, অন্যদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর স্টাফের নিকট হতে জানা গেছে পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যা সমাধান হলে ভারত পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আক্রমণ করবে এবং এ মাসের মধ্যে তা সমাপ্ত করবে। এ ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের ভারপ্রাপ্ত সেক্রেটারি আইরিউইন ভারতের রাষ্ট্রদূতের নিকট এসম্পর্কে কড়া ভাষায় প্রতিবাদ জানিয়েছেন। ব্রিট্রিশ কাশ্মীর দখল নিয়ে যুদ্ধ না করার জন্য ভারতের উপর চাপ সৃষ্টি করেছে। দিল্লিতে এ খবর ছড়িয়ে পড়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্রের সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগরের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এছাড়াও ভারত মহাসাগরে সোভিয়েত ইউনিয়নের ষোলটি নৌবহরসহ তিনটি আকাশ প্রতিরক্ষণ যুদ্ধ জাহাজ রয়েছে।[১১৭]

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে কিসিঞ্জার অপরাহ্ন ৩টায় টেলিফোনে কথা বলেন। কিসিঞ্জার তাকে জানান চীন কিছু একটা করতে যাচ্ছে এবং তা শীঘ্রই, কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিজস্ব গোয়েন্দা সংস্থার খবর নেই। নিক্সন বলেন, চীন ভারতকে হুমকি দিতে পারে কিন্তু এতে রাশিয়া যে চীনের বিরুদ্ধে খুব একটা অবস্থান নেবে তা না।[১১৮] ঐদিন সন্ধ্যা ৭.৩০টায় পুনরায় তাদের মধ্যে কথা হয়। কিসিঞ্জার টেলিফোনে নিক্সনকে জানান, চীনারা কিছু একটা করতে ইচ্ছুক এবং তারা কিছু একটা করতে যাচ্ছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কে তাদের সন্দেহ আছে। কেননা প্রথমে যুক্তরাষ্ট্র বলেছে 'aggression'। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র সেই অবস্থান থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছে। সেজন্য চীনাদের মনে প্রশ্নের উদ্রেক হওয়া স্বাভাবিক। চীন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে জানতে চায় রাশিয়া তাদের চাপ সৃষ্টি করলে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা কী হবে। কিসিঞ্জার বলেন, রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে যুক্তরাষ্ট্র 'গেমপ্ল্যান' তৈরি করবে সে পথ যথাযথ হবে। ইতিপূর্বেই ব্রেজনেভকে লেখা হয়েছে, এভাবে 'নগ্ন আক্রমণ' চলতে থাকে তাহলে পাকিস্তানের প্রতি যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে। ভুট্টো বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রের দুর্বলতার কারণে এসব ঘটনা ঘটছে।[১১৯]

১৫. যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত কৌশলগত তৎপরতা

সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভরন্টসভ-এর সঙ্গে ৭.৩৫ মিনিটে টেলিফোনে কিসিঞ্জার বলেন, ১১ই ডিসেম্বরের ভেতরে সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে যদি কোনো সাড়া না পাওয়া যায়, তাহলে পূর্বের যৌথভাবে চলার নীতি পরিত্যাগ করে যুক্তরাষ্ট্র নিজস্ব পথে চলবে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে বিশ্ব শান্তির লক্ষ্যে ৪৮ ঘণ্টা যুক্তরাষ্ট্র অপেক্ষা করেছে। রাষ্ট্রদূত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলেন, কুজনেসভ দিল্লি মিশনে গেছেন এবং সেখানে যোগাযোগ করছেন। তিনি মস্কোতে ১২ই ডিসেম্বর ফিরে আসবেন। কিন্তু অফিসিয়াল সিদ্ধান্ত জানা যায়নি। তবে কিসিঞ্জারের বক্তব্য মস্কোতে প্রেরণ করা হয়েছে। কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র চাপ দিচ্ছে না, তবে যুক্তরাষ্ট্র কী ভয়ানক অবস্থার ভেতরে আছে তা সোভিয়েত নিশ্চয় উপলব্ধি করবে। কিসিঞ্জার অবশ্য কুজনেসভ-এর দিল্লি গমনকে ইতিবাচক মনে করেন।[১২০] ঐদিন কিসিঞ্জারের সঙ্গে ভুট্টোর টেলিফোনে কথোপকথন হয়। কিসিঞ্জার তাকে বলেন, তিনি প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলাপ করেছেন। প্রথমত, সবকিছু বিবেচনা করে সম্ভাব্য সবকিছুই যুক্তরাষ্ট্র করেছে, যদিও যুক্তরাষ্ট্র খুব বেশি একটা করতে পারেনি। যা চীনাদের অভিযোগ। নিক্সন প্রশাসন জনমতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে এবং নৈতিক দিক থেকে আমলাতন্ত্রের যে নীতিমালা আছে তার বিরুদ্ধে কাজ করছে। সেজন্য চীনাদের বুঝা উচিত যুক্তরাষ্ট্র কী করেছে। দ্বিতীয়ত, ১২ই ডিসেম্বরের ভেতরে সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট থেকে যুক্তরাষ্ট্র কোনো উত্তর না পেলে যুক্তরাষ্ট্র নিরাপত্তা পরিষদে শক্তভাবে বিবৃতি দেবে যে, যদি এই যুদ্ধ চলতে থাকে, তাহলে এই নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র মূল প্রস্তাবকে সমর্থন করবে। যার অর্থ শুধু যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব। তার অর্থ এটা হবে একটি নীতির উপরে ভিত্তি করে। যদিও চূড়ান্ত পর্যায়ে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করার ক্ষেত্রে আশ্বস্ত করা হয়েছে। যা ঘটেছে তাতে যুক্তরাষ্ট্রের হৃদয় ভেঙ্গে গেছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্রের নিশ্চয়তা হলো পাকিস্তানকে রক্ষা করা। সেজন্য যুক্তরাষ্ট্র কী করছে, তার অবস্থান কী, পাকিস্তান চীনা বন্ধুদের এবং নতুন বন্ধুদের প্রশ্ন করার কোনো কারণ নেই। হেনরি কিসিঞ্জার বলেন, আমাদের নৌ-বহর ১২ই ডিসেম্বর রাতের মধ্যে মালাক্কা প্রণালি অতিক্রম করে সমুদ্রে দেখা যাবে। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হলো, পৃথিবীর যেখানে যুক্তরাষ্ট্রের বন্ধু আছে, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সঙ্গে বিশ্বস্ত থাকতে চায়।[১২১]

১৬. ত্রিদেশীয় কূটনৈতিক আঁতাত

১৯৭১-এর বসন্তে মার্কিন নীতিকৌশলে মুখ্য ব্যাপার ছিল এই যে, চীন-মার্কিন সম্পর্কে কিসিঞ্জারের নাটকীয় পরিবর্তন-পরিকল্পনার পরিপ্রেক্ষিতে প্রতিটি পৃথক ঘটনা, যার ভিত্তিতে বিশেষকরে দক্ষিণ এশিয়ায় সংকট বিবেচনা করতে হবে। ৯ই জুলাই ইসলামাবাদ থেকে একটা পাকিস্তানি বিমানে কিসিঞ্জার গোপনে পিকিং যাওয়ার কথা। নিক্সন প্রশাসনে কিসিঞ্জারের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ এই প্রচেষ্টার সফলতার উপর মারাত্মকভাবে নির্ভর করছিল। এ সময়ে পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ পিকিং ও ওয়াশিংটনের মধ্যে যোগাযোগের একমাত্র সূত্র ছিল। নিক্সন এবং কিসিঞ্জারের খুব ঘনিষ্ঠ মহলের বাইরে আর কেউই চীন তৎপরতার কথা জানতেন না। বিশেষকরে দক্ষিণ এশীয় নীতি নির্ধারণের সাথে যারা জড়িত ছিলেন, তাদের কেউই এ বিষয়ে কিছু জানতেন না। পরে যখন গোপন চীন আলোচনার সংবাদ প্রকাশ করা হলো তখন পররাষ্ট্র দফতরে বাংলাদেশের ব্যাপারে মার্কিন নীতির সমালোচকদের ঠান্ডা করার জন্য নতুন সম্পর্কের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিষয়টি উচ্চগ্রামে ব্যবহার করা হত। যুক্তিটা ছিল এই যে, চীন আলোচনা এতই স্পর্শকাতর এবং যুক্তরাষ্ট্রের জন্য এতই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে তার ক্ষতি হতে পারে এমন ঝুঁকি নেওয়ার উপায় ছিল না। পাকিস্তানের প্রতি পক্ষপাত কিসিঞ্জারের চীন নীতির একটা অত্যাবশ্যকীয় সাফল্যের শর্ত পূরণ করে। বাংলাদেশের ঘটনাবলি সেক্ষেত্রে ছিল গৌণ অনুষঙ্গ।

পররাষ্ট্র দফতরে দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে দীর্ঘকালীন নীতিকৌশল পরিকল্পনার দায়িত্বে নিয়োজিত এ বিভাগের একজন পদস্থ রাজনৈতিক সমীক্ষক কার্নেগির গবেষকদের কাছে চীন-সম্পর্ক বিষয়ে মূল্যায়নটি করেছেন এভাবে যে, "বিশ্লেষণে মনে হয় রিচার্ড নিক্সন একজন অত্যন্ত হিসেবি লোক। তিনি মানবিক বিবেচনাকে খারিজ করার ক্ষমতা রাখতেন। তার নজর ছিল বৃহত্তর রাজনৈতিক ফায়দার উপর। তার কাছে মনে হয়েছিল পাকিস্তান একটা সেতুর মতো। দেশটিকে যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন জানাতে ব্যর্থ হলে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে হারাবে। ইন্দো-চীন সংকট নিরসনের পর বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উন্নত করার উদ্দেশ্যে পররাষ্ট্র দফতরে নানা রকম শলাপরামর্শ দিতে লাগলো- কিন্তু কোনটাই তেমন অর্থবহ কিছু ছিল না। হোয়াইট হাউজ এমন একটি নীতি ঠিক করেছিলো যাতে সব চুকে যাওয়ার পর পিকিং এর চোখে যুক্তরাষ্ট্রের ভাবমূর্তি উন্নত হয়। কর্মকর্তারা স্পষ্ট কিছু প্রস্তাব রেখেছিলেন, কিন্তু সেগুলোকে কোনো আমল দেওয়া হয়নি। মনে হয় পরাশক্তি রাজনীতিতে নিমগ্ন একজন ব্যক্তির নিজস্ব নীতি অনুসরণ করা হচ্ছিল, তাই পররাষ্ট্র দফতর থেকে দক্ষিণ এশিয়ার প্রেক্ষিত বিচার করে যেসব প্রস্তাব এসেছিল সেগুলো মোটের উপর হোয়াইট হাউজ উপেক্ষা করে।"

উল্লিখিত মন্তব্যে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদে কিসিঞ্জারের সহকারী উইনস্টন লর্ড কার্নেগি গবেষকদের কাছে জোর দিয়ে বলেন যে, প্রশাসনের উঁচু মহলের ভেতর ছুতো দাঁড় করাবার অভ্যাস তৈরি হয়ে গিয়েছিল। লর্ড উইলস্টন কার্নেগিকে বলেন যে, "আমাদের (যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্ব) চীনকে বোঝানো জরুরি ছিল যে আমরা সরকার হিসেবে নির্ভরযোগ্য এবং আমাদের উভয়ের বন্ধুকে (পাকিস্তান) যথেষ্ট সম্মান করি।" দু'দশক ধরে চীনের সাথে অহিনকুল সম্পর্কের পর শুধু রক্তাক্ত গৃহযুদ্ধের সময় পাকিস্তানকে সমর্থন করলেই চীনের কাছে প্রমাণ হয়ে যাবে যে যুক্তরাষ্ট্র একটি নির্ভরযোগ্য সরকার। এ সম্পর্ক পাল্টাবার কোনো তাগিদ যুক্তরাষ্ট্রে কখনো অনুভব করেনি। চীনের ক্ষেত্রেও একই কাণ্ড হয়েছিল। ১৯৭১-এর সেপ্টেম্বরে লিন পিয়াও এর ঘটনা সবকিছু ওলট-পালট করে দিয়েছিল। কিসিঞ্জারের সে সময়কার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, "চীনের সাথে সব ঠিকঠাক হয়ে যাক, তারপর আমরা উপমহাদেশের দিকে দৃষ্টি ফেরাবো।"[১২২]

কিসিঞ্জারের মনে হয়েছিল, বর্তমান সময়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ চীন কূটনীতি, যার ওপর ভিয়েতনাম আলোচনাসহ অন্য এতকিছু নির্ভর করছে, (১৯৭১-এ) পূর্ব পাকিস্তানের ঘটনাবলি তার প্রভূত ক্ষতি করছে, তার থেকে মনোযোগ সরিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশ সংকট তার নিকট একটা অপ্রয়োজনীয় উপদ্রব হিসেবে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উপস্থিত, বেয়াড়া এক রাজনীতিবিদ যিনি ঠিকমত কথা শুনে চলেন না। পূর্ব পাকিস্তানের একজন রাজনীতিবিদ যদিও সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন তবুও সমস্যাকে জটিল করে তুলতে পারেন, যদি তার মৃত্যুদণ্ড হয়, তবে তার দায়িত্ব তিনি এড়াতে পারেন না। বিষয়টি এমন যে তিনি ফেলে দিতে পারছেন না, আবার এগিয়ে যেতেও পারছেন। সেখানে কিসিঞ্জার সমস্ত ব্যাপারটা ব্যক্তিগত লাভ-ক্ষতির সম্পর্কের পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। কিসিঞ্জারের কূটনীতিতে ব্যক্তিগত মনোভাবের ছাপ বরাবরই ছিল, সেই সাথে ছিল প্রতিহিংসাপর মনোবৃত্তি। হেনরি কিসিঞ্জারের নীতি হিসেবে, 'কোন স্থায়ী শত্রু বা মিত্র নয়, শুধু স্থায়ী স্বার্থ।' এই নীতির গুরুত্ব ধরে মার্কিন নীতির অঙ্কের যোগফল মিলাতে হবে।[১২৩]

১৭. যুদ্ধের শেষ দশ দিনের চূড়ান্ত কূটনৈতিক তৎপরতা

৩রা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয়। যুক্তরাষ্ট্রের কাছে নীতিগত প্রশ্ন এসে দাঁড়ায় কে প্রথম আক্রমণকারী? এ বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানে সিআইএ জানান যে, কে প্রথম যুদ্ধ শুরু করেছে এটা নির্ণয় করা সম্ভব নয়। সকাল ১০টায় (ওয়াশিংটন টাইম) কিসিঞ্জার মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে বিষয়টি নিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপনের প্রস্তাব করেন, সাথে সাথে এ কথাও বলেন যে, প্রস্তাব উত্থাপিত হলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারত বিরোধীতা করবে। কিসিঞ্জারের অভিমত হলো, পাকিস্তান যুদ্ধে পরাস্ত হলেও তাকে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে হবে। না হলে এমনিতেই দেশের অর্ধেক ছেড়ে দিলে তারা ধ্বংস হয়ে যাবে। নিক্সন ভারতে অর্থ সরবরাহ বন্ধের নির্দেশ দেন। ঐদিনই কিসিঞ্জার মার্কিন সেক্রেটারি অব স্টেট রজার্স-এর সঙ্গে কথা বলেন, প্রেসিডেন্ট পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়ার কথা বলেছেন। রজার্স বলেন, ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে ইতিমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র নিন্দা করেছে।[১২৪] ঐদিনে হোয়াইট হাউজে এক সভায় অনুসন্ধান করা হয় পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অস্ত্র সরবরাহের কোনো দ্বিপাক্ষিক চুক্তি আছে কিনা। কিসিঞ্জার দাবি করেন, পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬২ সালের জানুয়ারি মাসে এরকম একটি প্রটোকল স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

৪ঠা ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খান আবেদন করেন, মার্কিন সামরিক অস্ত্র অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। সেজন্য ইয়াহিয়া খান অবিলম্বে তৃতীয় দেশের মাধ্যমে অস্ত্র পাঠানোর জন্য কাকুতি-মিনতি করেন।[১২৫] ঐদিনে নিরাপত্তা পরিষদের সভা সম্পর্কে কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলাপ করেন। তিনি বলেন, চীন সভায় রাশিয়া এবং ভারতের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ভারত যখন পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যাকে এজেন্ডাভুক্ত করতে চেয়েছিল, তখন চীন বলেছে এ সমস্যা পূর্ব পাকিস্তানের নয়, এটা হলো ভারতের সমস্যা। নিক্সন-কিসিঞ্জার সোভিয়েত-ভারতের সঙ্গে তুমুল 'ঝগড়া' চালিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে কৌশলগতভাবে চীনকে সামনের দিকে ঠেলে দিতে একমত হন। ঐদিনই পুনরায় বেলা ১২.১৫ মিনিটে নিক্সন কিসিঞ্জারকে বলেন, গণমাধ্যমের দিকে এখন প্রশাসনের নজর দিতে হবে। তিনি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্বীকার করেন, ভারত যুদ্ধের কারণ হিসেবে পাকিস্তানকে কাঠগোড়ায় দাঁড় করিয়েছে। নিক্সন কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন, মি. সেলি-কে[১২৬] সঙ্গে নিয়ে গণমাধ্যমে প্রকাশ করতে হবে যে, যুক্তরাষ্ট্র কী করতে যাচ্ছে, কী করছে এবং কেন ভারতকে দোষারোপ করা হচ্ছে।[১২৭]

৫ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নির্বাহী সেক্রেটারি এলিয়ট হেনরি কিসিঞ্জারের কাছে যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক অতীতে পাকিস্তানকে কী ধরনের নিরাপত্তা সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছিল সে সম্পর্কে একটি মেমোরেন্ডাম উপস্থাপন করেন। উক্ত মেমোরেণ্ডাম অনুযায়ী, ১৯৬২ সালের ৫ই নভেম্বর রাষ্ট্রদূত ম্যাক কনোগে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানকে পরিষ্কারভাবে আশ্বাস প্রদান করেছিলেন, "ভারত যদি পাকিস্তানকে আক্রমণ করে তাহলে পাকিস্তানের সাহায্যে যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসবে।"[১২৮]

ঐদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর একটি পত্র লেখেন। পত্রে পাকিস্তান সামরিক জান্তা কর্তৃক পূর্ববঙ্গে পরিকল্পিতভাবে গণহত্যা, অত্যাচার-নিপীড়নের কথা উল্লেখ করা হয়। উক্ত পত্রে ৩রা ডিসেম্বর পাকিস্তান ভারতের পশ্চিম সীমান্ত লঙ্ঘনপূর্বক আক্রমণ পরিচালনা করেছে একথা উল্লেখ করা হয় এবং বিমানবাহিনী কর্তৃক বিভিন্ন জায়গায় বোমাবর্ষণ এবং সীমান্ত এলাকায় ব্যাপক গোলা নিক্ষেপের কথাও বলা হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের সাফল্য এখন ভারতের উপর আক্রমণের কারণ হয়েছে। আমরা শান্তিপ্রিয়, কিন্তু আমরা এও জানি যে, গণতন্ত্র রক্ষা না করতে পারলে শান্তি স্থায়ী হয় না। এই বিপদের মুহূর্তে ভারত আশা করবে, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে আক্রমণাত্মক নীতি থেকে বিরত রাখার প্রচেষ্টা নেবে। পাকিস্তান সরকারের উপরে মার্কিন প্রেসিডেন্টের যে সন্দেহাতীত প্রভাব রয়েছে তা কাজে লাগিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ এবং পূর্ব বাংলার যে গণ-দুর্ভোগ সৃষ্টি হয়েছে তার মূলসূত্র অনুধাবন করে অবিলম্বে উপমহাদেশের যে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে তা নিরসন করতে প্রভাব বিস্তার করবে।[১২৯]

ঐদিনে যুক্তরাষ্ট্র এবং চীনের প্রকৃত অবস্থান কী হতে পারে সে সম্পর্কে রজার্সের প্রশ্নের জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, চীনের সঙ্গে বলতে গেলে আমরা দুই-তৃতীয়াংশ অবস্থানে আছি। ঐদিন *নিউইর্য়ক টাইম* ও *ওয়াশিংটন পোস্ট* ভারতকে আক্রমণকারী হিসেবে দোষারোপ করায় নিক্সন সন্তোষ প্রকাশ করেন। এদিন জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ সমস্যা সম্পর্কে আলোচনার এক পর্যায়ে কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানবিরোধী কোনো প্রস্তাব এলে চীন ভেটো দেবে। কিসিঞ্জার নিক্সনকে আরো জানান যে, আজ সকালে রাশিয়া জাতিসংঘে পাকিস্তানের উপর আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেছে এবং চীনকে এ সম্পর্কে জড়িত না হওয়ার বিষয়ে সতর্ক করে দিয়েছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি কী হতে পারে এমনি এক আলোচনায় কিসিঞ্জার বলেন, সরাসরিভাবে যুক্তরাষ্ট্র এসব বিষয়ে জড়িত হওয়ার ও অবস্থান পরিবর্তনের কোনো কারণ নেই। তিনি স্বীকার করেন, বর্তমান অবস্থায় ভারতের সঙ্গে আমাদের কোনো বন্ধুত্ব থাকবে না। এ অবস্থায়

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কী করণীয় হতে পারে নিক্সন তা জানতে চাইলে কিসিঞ্জার বলেন, এমতাবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রের পরামর্শ হবে শেখ মুজিবের মুক্তি, যা রাশিয়ার নীতিগত অবস্থান। কিন্তু নিক্সনের জানা আছে পাকিস্তান তা মানবে না। এসময় যদি যুক্তরাষ্ট্র দৃশ্যমান শক্তি দেখাতে ব্যর্থ হয় তাহলে আমাদের অবস্থান উজ্জ্বল হবে না। আমরা ব্যর্থ হলে সোভিয়েত আমাদের সম্মান করবে না, চীন অদৃশ্য হয়ে যাবে এবং অন্যান্য দেশ তাদের ধারণার চিত্র আঁকবে।[১৩০]

৫ই ডিসেম্বরের গোপন নথি হতে দেখা যাচ্ছে, জাতিসংঘ যুদ্ধবিরতি ও সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব থেকে যুক্তরাষ্ট্রের বিরত থাকা দরকার, কারণ হিসেবে নিক্সন মনে করছেন, এর অর্থ দাঁড়ালো ভারতের হাতে পাকিস্তানের অর্ধেক তুলে দেওয়া। এটা হবে চীনের মুখে ডিম ছুঁড়ে মারা। যুক্তরাষ্ট্র তার কূটনৈতিক স্ট্রাটেজিতে উভয় সংকটে পড়ে। সংকটের স্বরূপ হলো, 'আমরা চীন সফরকে রক্ষা করতে চাই, কিন্তু কিছু লোক এটা অনুধাবন করতে অক্ষম যে, চীনা সফর সফল না হলে মস্কো সফর সম্ভবত নাও হতে পারে।'[১৩১] একইসাথে যুক্তরাষ্ট্র সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে একথা বলে পাঠায় যে, যদি বর্তমানের মতো সোভিয়েত রাশিয়া একই ধারায় চলে তাহলে মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য বিষয়াদি সম্পর্কে তাদের আলোচনা সম্ভব হবে না। রাষ্ট্রদূত কিসিঞ্জারকে বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের পথে অগ্রসর হওয়া যায় কী না। কিসিঞ্জার তার উত্তরে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যুদ্ধবিরতি, সেনা প্রত্যাহারের পর অবিলম্বে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানের পথ সম্পর্কে আলোচনায় বসতে পারে।[১৩২]

৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের গোয়েন্দা সংস্থা ভারতীয় মন্ত্রীসভার গোপন কার্যবিবরণী সংগ্রহ করতে সমর্থ হয়। বেলা ১১টার সময় ভারতের প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রী পরিষদের সদস্যদের উদ্দেশ্যে ভারতের যুদ্ধের লক্ষ্য ও স্ট্রাটেজি নিয়ে যে রূপরেখা তুলে ধরেন তা ভারতের একজন মন্ত্রীর নিকট থেকে গোয়েন্দা সংস্থা সংবাদ সংগ্রহ করে। উক্ত রিপোর্টে বলা হয়, ভারতীয় সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বোচ্চ শক্তি নিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাবে এবং পশ্চিম পাকিস্তানে ব্যাপক আক্রমণ চালাবে, যাতে তারা সেখানেই নিজেদের আত্মরক্ষা নিয়ে ব্যস্ত থাকে। রিপোর্টে বলা হয়েছে, ভারতের সৈন্যরা পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন ফ্রন্টে ক্রমাগত সাফল্য অর্জন করছে এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন স্ট্রাটেজিক ফ্রন্টে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছে এবং নিকট ভবিষ্যতে তারা নাটকীয় সাফল্য অর্জন করবে। ভারতের লক্ষ্য হলো চলতি সপ্তাহের ভেতরে পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তানি সৈন্যদের আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য করা। পশ্চিম ফ্রন্টে ভারতীয় স্ট্রাটেজি হল, যে পর্যন্ত পূর্ব পাকিস্তানে বিজয় অর্জন না করবে সে পর্যন্ত পশ্চিম পাকিস্তানে ডিফেন্সিভ অবস্থানে থাকা। এমনও নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে যে, কাশ্মিরে পাকিস্তানিরা ব্যাপকভাবে আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে। এছাড়া আকাশপথ, জলপথ, সমুদ্রপথ সবকিছুকে ভারত নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নেবে। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো এদিন ভারতের প্রধানমন্ত্রী বহুদিনের কাঙ্ক্ষিত বাংলাদেশের স্বাধীনতা স্বীকৃতি ঘোষণা, যার ফলে পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করে। সুইস সরকার নয়াদিল্লিতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পাকিস্তানের স্বার্থ দেখাশুনা করার দায়িত্ব নিয়েছে।[১৩৩] ঐদিন সামরিক অবস্থা সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের পর্যালোচনায় বলা হয়, মুক্তিবাহিনী গেরিলাদের সাহায্যে ভারত দশদিনের ভিতরে পূর্ব পাকিস্তানে বিদ্রোহী সরকারকে (মুজিবনগর সরকার) প্রতিষ্ঠিত করতে সমর্থ হবে। পর্যালোচনায় জুম ওয়াল্ট[১৩৪] বলেন, পাকিস্তান এবং কমিউনিস্ট চীনের মাস্টার স্ট্রাটেজি কী যুক্তরাষ্ট্র তা জানেনা। যুক্তরাষ্ট্র অনেক মানসিক চাপ সহ্য করছে। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষে দাঁড়িয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাবে এবং এতে প্রতীয়মান হবে আমরা অকার্যকর মিত্র। সোভিয়েত রাশিয়া ভারতকে নিয়ে লাভবান হবে। স্বল্প সময়ে ভারত মহাসাগর এলাকার ভারসাম্য আমাদের বিপক্ষে চলে যাবে। যুক্তরাষ্ট্র উভয়পক্ষকে যুদ্ধ বন্ধের কথা বলেছে। তারা বলেছে পাকিস্তান রাজি হলেও ভারত তা মানছে না। পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাদেশ ফোর্স বিজয়ী হলে উর্দুভাষী লোকজনের জন্য বিপর্যয় ডেকে আনবে। রাষ্ট্রদূত জনসন বলেন, বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটলে তা হবে আন্তর্জাতিক বাস্কেট কেস। কিসিঞ্জার তার জবাবে বলেন, কিন্তু এটা যেন আমাদের বাস্কেট কেস না হন।[১৩৫]

৬ই ডিসেম্বর প্রেসিডেন্ট নিক্সন সোভিয়েতের সেক্রেটারি জেনারেল ব্রেজনেভ বরাবর প্রেরিত এক পত্রে লেখেন, সংঘর্ষের কারণ যাই হোক না কেন বাস্তব লক্ষ্য হলো সোভিয়েত রাশিয়া ভারতীয় নীতি অনুসরণে সার্বভৌম রাষ্ট্রকে খণ্ড বিখণ্ড করতে চায়। ইতোমধ্যে গুরুতর পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে। এটা ভাবা ভ্রান্তি যে, সামরিক শক্তি সমাধান বয়ে আনবে। এ ধরনের সমাধানের কথা ভাবা কল্পনাপ্রসূত বরং এরকম কার্যক্রম পারস্পরিক সম্পর্ককে জটিল করে তুলবে যা সমস্ত সমস্যাগুলোর উপরে বিরূপ প্রভাব ফেলবে। বিশেষকরে মস্কোতে মে মাসে যে সামিট হবে যার উপর নতুন সম্পর্কের দিগন্তের প্রবেশে যে প্রেরণা সৃষ্টি হয়েছে তা বাধাগ্রস্ত হবে। আমাদের উভয়কে সংযত আচরণ করতে হবে এবং অবিলম্বে সংঘর্ষের পরিসমাপ্তি এবং উপমহাদেশের রাষ্ট্রগুলোর আঞ্চলিক অখণ্ডতা বজায় রাখা জরুরি।[১৩৬]

ঐদিনই ন্যাশনাল সিকিউরিটি কাউন্সিলের মিটিং-এ নিক্সন বলেন, ভারতকে বিভিন্ন সময়ে যে ১০ বিলিয়ন মার্কিন সাহায্য দেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে যুক্তরাষ্ট্র ভারতের উপর কোনো প্রভাব ফেলতে পারেনি, অর্থনৈতিক কূটনীতি ব্যর্থ হয়েছে। পাকিস্তান ভারতকে আক্রমণ করতে পারে না যেমন, ফিনল্যান্ড পারে না রাশিয়াকে আক্রমণ করতে। নিক্সন মনে করেন, যেখানে যে ধরনের সংকট সৃষ্টি হোক না কেন তা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে দোষারোপ করা হয়। এক্ষেত্রেও দেখা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্রের দক্ষিণ এশীয় নীতি ব্যর্থ হয়েছে।[১৩৭] কিসিঞ্জারের অভিমত ছিল, বৈদেশিক নীতির এই ব্যর্থতা বিগত ৭ বছরের ফলাফল। নিক্সন মন্তব্য করেন, বর্তমানে এই সংঘর্ষ স্পষ্টত ভারত বহু পূর্ব থেকেই সতর্কভাবে পরিকল্পনা করে রেখেছিল।[১৩৮] কেউ কেউ অনুমান করতে পারে ভারতেরা সংযমের পরিচয় দিয়েছে। আসলে দৃশ্যত এখন তারা সামনের দিকে অগ্রসর হবে। বর্ষা শেষ হয়েছে। চীন সীমান্তে বরফ পড়েছে। বাংলাদেশের গেরিলা প্রশিক্ষিত হয়েছে। এখন ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী এগিয়ে যাবে এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্ব

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সফর শেষ করেছেন। নিক্সন মন্তব্য করেন, যুক্তরাষ্ট্র আইয়ুব খানকে যে কথা দিয়েছিল তা ভঙ্গ করার মধ্যেই পাকিস্তানের ভাঙনের সূত্রপাত। ভারতীয়রা বহুকাল আগে থেকেই পাকিস্তানকে আঘাত করতে চেয়েছে। তারা যতটা না পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি আগ্রহী তার চেয়ে বেশি আগ্রহী কাশ্মীর নিয়ে। সময় এসেছে অস্ত্র সরবরাহ সমস্যা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন করে ভাবনার। এটা মনে হতে পারে, সামরিক সহায়তা প্রদান না করার অর্থ যুদ্ধ না হওয়া। এই ধারণাটি 'বোকামি'। এটা নির্ভর করে স্থানীয় অবস্থার উপরে। প্রেসিডেন্ট আইসেনহাওয়ার-প্রশাসন পাকিস্তানের শক্তি অক্ষুণ্ন রাখার জন্য সাহায্য করেছিলো। কিন্তু পাকিস্তান যখন চীনের সঙ্গে খেলা শুরু করল, তখন সামরিক সরবরাহ বন্ধ করা হয়।[১৩৯]

নিক্সন উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন যে, ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নভেম্বর মাসে যখন যুক্তরাষ্ট্রে এসেছিলেন তখন তিনি খুব ভালোমানুষী দেখিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি মনে করেন, ইন্দিরা গান্ধী তার নির্দিষ্ট কার্যক্রমে অটল ছিলেন এবং তাকে আকর্ষিত করেছিলেন।[১৪০]

ঐদিন সোভিয়েত-এর তরফ থেকে একটি বার্তা পান যেখনে সোভিয়েত বলেছে, অবিলম্বে পাকিস্তান এবং ভারতের মধ্যে যুদ্ধবিরতি এবং ১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ যে রায় দিয়েছিল, সে অনুসারে পাকিস্তান সরকারের স্বীকৃতি দাবি করে। সোভিয়েত বার্তায় দ্ব্যর্থহীভাবে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের প্রতি পাকিস্তান সরকারের আক্রমণের ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।[১৪১] ঐদিনই ভারতের রাষ্ট্রদূত লক্ষীকান্ত ঝা এবং যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত রাজনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী মহারাজা কৃষ্ণ রাজগোত্র প্রেসিডেন্ট নিক্সন বরাবর লিখিত ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি পত্র হস্তান্তর করেন। পত্র প্রদানকালে ঝা বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সরকারের এই ক'দিনের কার্যকলাপে ভারত বেদনাহত ও বিস্মিত। ঝা বলেন, এক সপ্তাহ আগে দিল্লিতে ভারতীয় পশ্চিম সীমান্তে সৈন্য বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তারা যেন কিছুই না করে। এমনকি এও বলা হয়েছে, এমন কোনো আচরণ করা যাবে না যাতে অপর পক্ষ উত্তেজিত হয়। ভারত যুক্তরাষ্ট্রের সেনা প্রত্যাহারের প্রস্তাব গ্রহণ করেনি ঠিকই, কিন্তু একথাও ঠিক যে, পশ্চিম সীমান্তে আক্রমণ করার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারত একই মনোভাব পোষণ করে। এসময় সেক্রেটারি উইলিয়াম রজার্স বলেন, আমাদের পরিকল্পনা হলো, যুদ্ধবিরতি, সৈন্য প্রত্যাহার এবং তারপরে রাজনৈতিক সমাধানের ব্যাপারে কাজ করা। আমরা রাজনৈতিক সমঝোতার প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকৃতি জানাই, কিন্তু প্রতীয়মান হয় ভারত সামরিক শক্তি প্রয়োগে সমাধানের পথ বয়ে নিয়ে আসবে। এ জন্য যুক্তরাষ্ট্র বিশেষভাবে অসন্তুষ্ট। এসময় রাজগোত্র উল্লেখ করেন যে, জাতিসংঘের প্রস্তাবের মূলবিষয় স্পর্শ করা হয়নি। সেক্রেটারি রজার্স বলেন, যুক্তরাষ্ট্র মনে করে রাজনৈতিক সমাধান হওয়া উচিত। কিন্তু ভারত সরকারের অবস্থান থেকে মনে হয়, তারা প্রথমে রাজনৈতিক সমঝোতা চায় তারপরে যুদ্ধবিরতি চায়। যুক্তরাষ্ট্রের নিকট উল্টো। যুক্তরাষ্ট্রের কথা হলো প্রথমে যুদ্ধবিরতি, পরে রাজনৈতিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সমঝোতা। এসময় ঝা বলেন, ভারত দীর্ঘ আট মাস অপেক্ষা করেছে, কিন্তু রাজনৈতিক সমাধানের কোনো উৎসাহজনক অগ্রগতি দেখেনি। রজার্স বলেন, তার বিবেচনায় ভারত যা করতে যাচ্ছে এবং যেভাবে সমাধান চাচ্ছে, সেক্ষেত্রে পরিস্থিতি আরো খারাপ হবে।[১৪২]

৭ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিক্সন বরাবর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান প্রেরিত এক পত্রে বলা হয়, পূর্ব পাকিস্তানের অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে চলে যাচ্ছে। বিগত ২৪ ঘণ্টায় আর্টিলারি এবং বিমান সমর্থন ছিল না। ইয়াহিয়া খান পত্রে লেখেন, সাত কোটি মানুষের পূর্ব পাকিস্তান যদি ভারতের লক্ষ্যানুসারে রাশিয়ার সাহায্যে হাত ছাড়া হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে তা হবে দক্ষিণ এশিয়ার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি। এই অঞ্চল আসাম, বার্মা, থাইল্যান্ড এবং মালয়েশিয়া সোভিয়েত আধিপত্যের প্রভাবে চলে আসবে।[১৪৩] পত্রে তিনি উল্লেখ করেন, এসময় অবিলম্বে রাশিয়ার প্রতি শক্ত হুমকি দেওয়া প্রয়োজন এবং ভারতকে বলা দরকার পাকিস্তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বন্ধ করার। তিনি আশা করেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে অবিলম্বে পাকিস্তানকে সাহায্য করা দরকার।

ঐদিনই যুক্তরাষ্ট্র ইয়াহিয়া খানকে রাষ্ট্রদূত ফারল্যাণ্ডের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠান। নিক্সন ঐ বার্তায় ইয়াহিয়া খানকে বলেন, পাকিস্তানের এই সংকটময় মুহূর্তে যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করবে। উপমহাদেশে শান্তি স্থাপনের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। ভারতের সৈন্য প্রত্যাহার এবং পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রাজনৈতিকভাবে সমাধান করা হবে, এবং আঞ্চলিক সমস্যা সমাধানের সূত্র বের করা হবে তবে তা যুদ্ধের মাধ্যমে নয়। নিক্সন আরো বলেন, সোভিয়েত ইউনিয়নকে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষার জন্য নয়াদিল্লির উপর চাপ দিতে এবং যুদ্ধ বন্ধ করতে। চীনকে আমরা যে সমস্ত উদ্যোগ ও কার্যক্রম গ্রহণ করেছি সে সম্পর্কে তাদের অবগত করা হয়েছে এবং তারা শক্ত অবস্থান গ্রহণ করলে তাদের স্বাগত জানানো হবে।[১৪৪] ঐদিন যুক্তরাষ্ট্রের বাণিজ্যসচিব ১১ দিনব্যাপী মস্কো সফর শেষে প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে জানান, কোসেগিনের সঙ্গে আলাপে তিনি নিশ্চিত হয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র-সোভিয়েত সম্পর্ক উন্নয়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন আগ্রহী।[১৪৫]

৮ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে কিসিঞ্জার এক মেমোরেন্ডমে নিক্সনকে জানান, ঢাকা থেকে যুক্তরাষ্ট্রের কাউন্সিলর জানিয়েছেন, তার নাক চেপে আসছে।[১৪৬] ঐ প্রতিবেদনে সিআইএ-র পর্যালোচনার সূত্রে দিয়ে বলা হয়, চীন ভারত সীমান্তে অবস্থান নেয়নি এবং প্রতীয়মান হচ্ছে সামরিকভাবে পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে চীন বড়ো ধরনের অংশ নেবে না। চীন ছোটোখাটো প্রচেষ্টা চালাতে পারে এবং ভারত সীমান্তে চেকপোস্টে বিক্ষিপ্ত হামলা করতে পারে কিংবা প্রকাশ্যে সেনা চলাচল দেখাতে পারে ও প্রচার করতে পারে। এই অবস্থায় রাজনৈতিকভাবে ইয়াহিয়া খান ৭ই ডিসেম্বর নুরুল আমীনকে প্রধানমন্ত্রী করে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোকে উপ-প্রধানমন্ত্রী ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী নিযুক্ত করে একটি কোয়ালিশন গভর্মেন্ট করেছেন। ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশনস্ গ্রুপের সভায় কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র প্রকৃত বিপদ সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে পারেনি। সকলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্যর্থ হয়েছি। যুক্তরাষ্ট্র একটি দেশের অর্ধেকটা অন্য দেশের স্যাটেলাইট স্টেটে পরিণত হওয়ার সুযোগ দিয়েছে, যা সোভিয়েত রাশিয়া কর্তৃক সমর্থিত এবং যুদ্ধ সজ্জিত। এর পরিবর্তে উপমহাদেশে আমেরিকার স্বার্থ বিঘ্নিত হয়েছে, যা ফলশ্রুতিতে অন্যান্য দেশ সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে কী ধরনের সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসাহী হবে তার উপসংহার টানবে।

ওয়াশিংটন থেকে নির্দেশ পেয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ৮ই ডিসেম্বর তেহরানে পাকিস্তানকে সামরিক সাহায্য করা যায় কিনা এ বিষয়ে ইরানের বাদশাহর সঙ্গে আলাপ করেন। ইরানের বাদশাহ তাকে অবগত করেন যে, সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে ভারতের চুক্তি হওয়ার ফলে তিনি ইরানের যুদ্ধবিমান ও বৈমানিক পাকিস্তানকে দিতে পাচ্ছেন না। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত নন। তিনি প্রস্তাব রাখেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জর্ডানের বাদশাহ কিং হোসেনকে পাকিস্তানে এফ-১০৪ যুদ্ধ বিমান পাঠানোর পরামর্শ দেন। এর পরিবর্তে তিনি জর্ডানে দুই স্কোয়াড্রন বিমান পাঠাতে পারেন।

৮ই ডিসেম্বর জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের বিশেষ সভায় বর্তমান ভারতীয় আক্রমণের পরিবর্তে কী করা যায় এ সম্পর্কে নিক্সন জিজ্ঞেস করলে কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের দু'টি পছন্দের পথ আছে। একটি হলো ভারতকে সম্মত করিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানে আক্রমণ বন্ধ করতে এবং এজন্য যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে ভয় দেখাতে পারে। অন্যদিকে, রাশিয়াকে আমরা শক্ত সতর্ক বার্তা পাঠাতে পারি। তবে এর ফলে আসন্ন সামিট বিপদগ্রস্ত হতে পারে। এক্ষেত্রে আমরা চীনকে বলতে পারি, তোমরা যদি অগ্রসর হতে চাও তাহলে এটাই সেই সময়। চীন যদি সীমান্তে সৈন্য প্রেরণ করে তাহলে আরেকটি সহযোগী বিপদ হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতকে সাহায্যের জন্য চীন সীমান্তে তার সৈন্য প্রেরণ করবে। নিক্সন বলেন, আর কোনো সভা করতে আমি চাই না, চীনের সাহায্য ব্যতীত আমরা কিছু করতে পারছি না। যদি আমরা দেখি যে, চীন ভারত সীমান্তে সৈন্য পাঠিয়েছে তাহলে কেবল ভারত সামান্য ভীত হতে পারে। নিক্সন চীনকে কার্যকর করার জন্য বার্তা পাঠাতে কিসিঞ্জারকে নির্দেশ দেন। চীনকে আমাদের বলা উচিত আমরা বঙ্গোপসাগরে নৌ-বহর পাঠাচ্ছি। কিসিঞ্জার মনে করেন, তিনি আশাবাদী যে, চীন এ ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া দিবে।[১৪৭]

ঐদিন ৮ই ডিসেম্বর নিক্সন ব্রেজনেভের চিঠি পান। চিঠিতে বলা হয়, সংকটের প্রথম থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন শান্তিপূর্ণ সমাধানের জন্য অবস্থান গ্রহণ করেন এবং প্রয়োজনে যা কিছু সম্ভব উভয় পক্ষকে বুঝানোর চেষ্টা করেন। আমরা প্রথম থেকেই ইয়াহিয়া খানকে বলে এসেছি রাজনৈতিক সেটেলমেন্টের জন্য প্রয়োজন রাজনৈতিক উপায়। আমরা বারবার জোর দিয়েছি সমস্যার মৌলিক সমাধান। কিন্তু পাকিস্তান কর্তৃপক্ষ রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় না গিয়ে পূর্ব পাকিস্তানে ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে জনগণ যাঁদের উপরে সম্পূর্ণভাবে আস্থা রেখেছিল তাঁদের উপরে আক্রমণ চালায়। যার ফলে বর্তমান পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে। স্বাভাবিকভাবে আমরা বিশ্বাস

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করি, এই সংঘর্ষ এড়ানোর জন্য আমাদের দু'পক্ষের সংঘর্ষের প্রয়োজন নেই।[১৪৮] ব্রেজনেভের পত্র সম্পর্কে কিসিঞ্জারের মন্তব্য হল, এগুলো সবই পুরনো প্রস্তাব যা অগ্রহণযোগ্য। কিসিঞ্জারের মতামত হলো যদি অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় আলোচনা হয় এবং পূর্ব পাকিস্তানকে সর্বাধিক স্বায়তশাসন দেওয়া হয় তাহলে আলোচনা হতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি কার্যকর করতে হবে। যাতে পশ্চিম পাকিস্তান ধ্বংস না হয়ে যায়।[১৪৯]

৯ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ড এর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন, তিনি পূর্ব পাকিস্তানে তার সেনাবাহিনীর জন্য বেশি কিছু করতে পারবেন না, কিন্তু তারা মুসলমান হিসেবে শেষ পর্যন্ত লড়াই করে যাবে। এদিন জাতিসংঘের মহাসচিব উ থান্ট ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ঠিক করে বিদেশিদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ২৪ ঘন্টার জন্য উভয় সরকারের নিকট সময় দিতে সম্মত হওয়ার আহ্বান জানান।[১৫০] ওয়াশিংটন স্পেশাল অ্যাকশন গ্রুপ মিটিং-এ অবিলম্বে বঙ্গোপসাগরে নৌবহর পাঠিয়ে মার্কিন নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ্যাডমিরাল মুরার রিপোর্ট করেন যে, চীনা যানবাহনগুলো চলাচল করছে, কিন্তু তারা কী বহন করছে এ সম্পর্কে জানা যায়নি। তিনি রিপোর্ট করেন, ন্যাটোপ্রধানের কাছ থেকে জানা গেছে ইরান পাকিস্তানকে সাহায্য করার প্রস্তুতি নিচ্ছে কিন্তু তার এক চোখ ইয়াহিয়া খানের দিকে রাখতে হচ্ছে। শেষ পর্যন্ত ইরান কোনো গুরুত্বপূর্ণ সাহায্য করতে পারবে বলে মনে হয় না। কিসিঞ্জার প্রশ্ন করেন, ভারতের আক্রমণ থেকে পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষার উপায় কী এবং সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কতদূর পর্যন্ত জড়িয়ে পরতে পারে। গণমাধ্যম কী বললো তাতে কিছু আসে যায় না। কত ডিগ্রি পর্যন্ত জড়িত হব সেটাই প্রশ্ন। জনসন বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধ বন্ধ হলে ভালো এবং পাকিস্তান জাতিসংঘের যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব গ্রহণ করেছে। কিন্তু ভারত গ্রহণ করেনি। তারা সেনা প্রত্যাহার করেনি। তিনি আরো বলেন, ভারতের নিজস্ব পরিকল্পনা রয়েছে, সেভাবে তারা অগ্রসর হয়। কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানের সেনা ও বিমানবাহিনী ধ্বংস হয়ে গেলে পাকিস্তান এলোমেলো হয়ে যাবে এবং ইরান বুঝতে পারল সোভিয়েতের অস্ত্র ও কূটনীতি দ্বারা এটা সম্ভব হয়েছে। তখন মধ্যপ্রাচ্যের প্রতিক্রিয়া কী হবে। কিসিঞ্জার মন্তব্য করেন, যদি প্রয়োজন হয় ভারতের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের শক্তি প্রয়োগের বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হবে।[১৫১]

ঐদিনই প্রেসিডেন্ট নিক্সন ও হেনরি কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউজে দক্ষিণ এশিয় সংকট নিয়ে বৈঠক করেন। ভারতকে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার সুযোগ দিলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তার প্রতিক্রিয়া কী হবে হেনরি কিসিঞ্জার তার বর্ণনা দেন। এরকম হলে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্র যেমন, ইরান, ইন্দোনেশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে একটি চাপ সৃষ্টি হবে। এর পরিপ্রেক্ষিতে কিসিঞ্জার বলেন; প্রথমত, কেনেডির সময় ভারত কর্তৃক পাকিস্তান আক্রান্ত হলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে সাহায্য করবে এ ধরনের অঙ্গীকার ছিল, এই তথ্যটি ভারত ও রাশিয়ার কাছে প্রকাশ করতে হবে; দ্বিতীয়ত, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হেলিকপ্টার বহনকারী নৌ-বহর পাঠাতে পারে সেক্ষেত্রে প্রকৃত উদ্দেশ্য গোপন করে যুক্তরাষ্ট্র বলতে পারে মার্কিন নাগরিকদের উদ্ধারের জন্য আমরা এটা পাঠাচ্ছি।[১৫২] চীনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে যুক্তরাষ্ট্র টাস্কফোর্স পাঠাতে পারে। এ সম্পর্কে নিক্সন জানতে চান তাতে লাভ কী হবে। কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র বুঝাতে পারবে এর পিছনে সে কিছু এটা করতে যাচ্ছে। কিসিঞ্জার বলেন, জর্ডান কিছু বিমান পাকিস্তানে পাঠিয়েছে। ভারতের রাষ্ট্রদূত আমাকে বলেছেন, ভারত জায়গা দখল করতে চায় না। কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউজ ও ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট ভিন্ন প্রস্তাব নিয়ে অগ্রসর হতে চাইছে। স্টেট ডিপার্টমেন্ট পশ্চিমে যুদ্ধবিরতি হলে তার পরিবর্তে বাংলাদেশের স্বীকৃতি কার্যকর করা যায়। এ প্রস্তাব হবে কিসিঞ্জারের ভাষায় 'টোটাল কোলাপস্'। যা চীনকেও ব্যথিত করবে। নিক্সন অবশ্য বলেন, পাকিস্তান বিভক্তি বাস্তব সত্য। এ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তা কেন? কিসিঞ্জার বলেন; প্রথমত, যুক্তরাষ্ট্রের দুশ্চিন্তার কারণ হচ্ছে পাকিস্তান সৃষ্টির পর হতে যেসব উর্দুভাষী যারা পূর্ব পাকিস্তানে আছে তারা যেন একেবারে ধ্বংস না হয়; দ্বিতীয়ত, চাইনিজ হাত যুক্তরাষ্ট্রের ধরে রাখতে হবে; তৃতীয়ত, বিশ্ব মনস্তাত্ত্বিক ক্ষেত্রে এটা যেন মনে না হয়, শক্তির ভারসাম্য কেবলমাত্র সোভিয়েত রাশিয়া এককভাবে প্রয়োগ করতে পারে, সেক্ষেত্রে কিছু না করে যুক্তরাষ্ট্রের বসে থাকা চলবে না। এক্ষেত্রে কলকাঠি নাড়তে হবে। যুক্তরাষ্ট্র রাশিয়াকে বলতে পারে থামো। এক্ষেত্রে কিসিঞ্জার এবং নিক্সনের মধ্যে বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয় : এক, যাই করা হোক না কেন ইয়াহিয়া খানের নিকট পরিষ্কার করতে হবে; দুই, যুদ্ধবিরতি ও আলোচনা কীসের ভিত্তিতে হবে। আলোচনায় এই উদ্‌বেগ প্রকাশ পায় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরের নির্বাচনে অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় ইসলামাবাদ আওয়ামী লীগের সঙ্গে আলোচনা হতে পারে; তিন, এবং যুক্তরাষ্ট্রকে পাকিস্তানে অস্ত্র দেওয়ার বিষয়ে ভাবতে হবে। নিক্সনের পর্যবেক্ষণে এই বক্তব্য বেরিয়ে আসে যে, দক্ষিণ এশিয়ার ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের যে সম্পর্ক ছিল তা ধ্বংস হয়ে গেছে। তাতে যুক্তরাষ্ট্র তোয়াক্কা করছে না। নৌ-বহর পাঠিয়ে যুক্তরাষ্ট্র বলতে পারে মার্কিন নাগরিকদের জীবনরক্ষার জন্য এটা পাঠিয়েছি। ভারত মনে করতে পারে এটা তাদের জন্য হুমকি। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র শক্তি দেখাতে চাচ্ছে না। যুক্তরাষ্ট্র টাস্কফোর্স ক্যারিয়ার পাঠিয়ে চীনকে বলতে পারে তোমরা সীমান্তে সৈন্য পাঠাও। বঙ্গোপসাগরে টাস্কফোর্স পাঠানোর ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সে সম্পর্কে কিসিঞ্জার বলেন, এ সময় যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস অধিবেশনে থাকবে না। এই আলোচনায় সিদ্ধান্ত হয় যে, এক, পাকিস্তানে জর্ডানের যুদ্ধ বিমান পাঠাতে উৎসাহ দান। দুই, চীনকে জানানো তারা যা সিদ্ধান্ত নিয়েছে সে মতে কাজ করতে পারে। তিন, পাকিস্তান রক্ষায় কেনেডি যে অঙ্গীকার করেছিল তা প্রকাশ করা এবং ভারতকে বলে দেওয়া তাদের আশ্বস্ত করতে হবে তারা জায়গা দখল করবে না।[১৫৩]

ঐদিনই সোভিয়েত অফিসিয়াল্‌স ম্যাট্‌সকেভিস-এর সঙ্গে আলোচনায় প্রেসিডেন্ট নিক্সন বলেন, পাকিস্তান অর্ধেক হয়ে যাচ্ছে। স্বল্পমেয়াদীভাবে এটা সোভিয়েত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইউনিয়নের লাভ মনে হতে পারে এবং চীনের পরাজয়। এটা পাকিস্তানের জন্য বিপর্যয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে যে নতুন সম্পর্ক হতে যাচ্ছে সেখানে সে পরিবেশকে বিষময় করে তুলবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ভারতের চুক্তি হয়েছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের দায়িত্ব রয়েছে পাকিস্তানের প্রতি। সেজন্য অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি দরকার। বিশেষকরে এই দুই দেশের মধ্যে ঐ অঞ্চলের শান্তির জন্য একটি উত্তম পদ্ধতি বের করা উচিত। এর জন্য প্রথমে প্রয়োজন যুদ্ধবিরতি। দ্বিতীয়ত পশ্চিম পাকিস্তানে ভারত যাতে আক্রমণ না করে তা বন্ধ করা। যুদ্ধবিরতিকে যুক্তরাষ্ট্র রাজনৈতিক সমঝোতায় অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় নিয়ে আসবে। সোভিয়েত যদি ভারতকে সমঝোতায় নিয়ে আসতে পারে তাহলে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সঙ্গে ইয়াহিয়া খানের সমঝোতার ব্যাপারে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।[১৫৪]

এই আলোচনার ফলাফল সম্পর্কে কিসিঞ্জার নিক্সন পর্যালোচনা করেন। তিনি বলেন, গতকাল পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র সামরিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে ১১০% পিছিয়ে ছিল। আলোচনার পর ৭০% পর্যন্ত পিছনে আছে। এই আলোচনার পর যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা যাতে ঐক্যমতে কাজ করে তার জন্য মার্কিন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সভায় কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তানিদের সারেন্ডারের জন্য আমরা ঠেলে দিতে পারি না, যখন চীন তাদের পক্ষে আছে। প্রেসিডেন্ট নিক্সন ইয়াহিয়া খানের নিকট না শুনে কিছু করবেন না। যুক্তরাষ্ট্র পশ্চিম পাকিস্তান ও ভারতের আক্রমণ বন্ধের চেষ্টা করছে। ফারল্যান্ডের মাধ্যমে ইয়াহিয়া খানের নিকট তার মতামতের জন্য বার্তা পাঠানো হয়েছে। তাকে জানান হয়, যুক্তরাষ্ট্রের মতামত হলো পশ্চিম পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতি। ভুট্টো বলেছেন, তিনি আওয়ামী লীগের সঙ্গে এমনকি শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য প্রস্তুত এবং যথাসময় তিনি সমঝোতার জন্য নয়াদিল্লি যেতেও রাজি।[১৫৫]

১০ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট নিক্সন এবং কিসিঞ্জার পুনরায় আলোচনায় মিলিত হন। কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, বেলা ১১.৩০টায় সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভরন্টসভ-এর সঙ্গে বৈঠকে তিনি বলে দিয়েছেন, পূর্ব পাকিস্তানে পাকিস্তান যা করেছে তার ফলশ্রুতি অনুসারে যুক্তরাষ্ট্র তা করেছে। তিনি এসময় কেনেডি কর্তৃক পাকিস্তানের সঙ্গে যে অঙ্গীকার রয়েছে তা প্রদর্শন করেন এবং ব্রেজনেভ বরাবর একটি কঠোর নোট তার হাতে তুলে দিয়ে বলেন, যুদ্ধবিরতির মাধ্যমে বিষয়টি পরিসমাপ্তি হওয়া দরকার। পাকিস্তান তাদের দেশের অর্ধেক হারিয়েছে, বাকি অর্ধেক তাদের রক্ষা করতে হবে। নিক্সন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে রক্ষা করা।[১৫৬] নিক্সনের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, ভারতীয়দের উপর এখন কঠিন চাপ সৃষ্টির উদ্যোগ নেওয়া হবে। চীন কী ভারতকে হুমকি দিয়েছে নিক্সনের এই প্রশ্নের জবাবে কিসিঞ্জার বলেন, আজ রাতে তা জানা যাবে। নিক্সন বলেন, চীন ভারতকে হুমকি দেয়নি এবং তারা যে যুদ্ধে আসবে একথা বলেনি। নিক্সন বলেন, ভারতীয়রা কী ভীতু নয় এ প্রশ্নের উত্তরে কিসিঞ্জার বলেন, রাশিয়া তাদের পেছনে আছে। রাশিয়া ইতোমধ্যেই ইরান, তুরস্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এবং অন্যান্য দেশে হুমকি দিয়ে বার্তা পাঠিয়েছে। রাশিয়া দুর্বিষহ খেলায় নেমেছে। নিক্সন বলেন, "পশ্চিম পাকিস্তান সংকেত না দিলে আমরা কখনো বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দিতে পারব না।"[১৫৭]

প্রেসিডেন্ট নিক্সনের প্রতি প্রেরিত মেমোরেন্ডামে কিসিঞ্জার বলেন, একটি বিশ্বস্ত সূত্র থেকে জানা গেছে ইন্দিরা গান্ধী বলেছেন, চীনের সেনাবাহিনী হস্তক্ষেপের জন্য এগিয়ে আসছে এরকম কিছু নিদর্শন তিনি পেয়েছেন। তিনি প্রমাণ উপস্থিত করেননি। কিন্তু বারবার বলেছেন, ঢাকা পতনের পূর্বে চীন পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে এবং কাশ্মীরের কাছে লাদাখ এলাকায় তারা আক্রমণ করতে পারে। ভারত জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জন কোনটাই করেনি। ভারত ঢাকা এবং করাচি থেকে বিদেশি নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার লক্ষ্যে বোমাবর্ষণ থেকে বিরত আছে। আজ থেকে করাচীতে চার ঘন্টা এবং আগামীকাল ২৪ ঘন্টার জন্য বিদেশি নাগরিকদের সরিয়ে নেওয়ার জন্য ভারত বোমাবর্ষণ থেকে বিরত থাকবে। তবে ঢাকায় যাওয়ার শর্তানুসারে তাদের প্রথমে কলকাতা বিমানবন্দরে তাদের জন্য প্রেরিত বিমান অবতরণ করবে তারপর ঢাকা যাবে।[১৫৮] ইয়াহিয়া খানের বাসায় ফারল্যান্ড সকাল ১০ টায় দেখা করেন এবং ৯ ডিসেম্বর প্রেরিত বার্তা প্রেরণ করেন। ইয়াহিয়া খান বার্তাটির মর্মার্থ উপলব্ধি করতে অক্ষম ছিল। ইয়াহিয়া খান অত্যন্ত জোরের সঙ্গে প্রকাশ করেন যে, ভারত যা চাচ্ছে রাশিয়া তাকে সবকিছু দিয়ে যাচ্ছে।

১৮. বিশ্বযুদ্ধের উত্তাপ

১২ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে সকাল ৮.৪৫ মিনিটে হেনরি কিসিঞ্জার হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করেন। কিসিঞ্জারের সহকারি আলেকজান্ডার হেগ একটু পরে তাদের সঙ্গে কথোপকথনে যুক্ত হন। এক ঘন্টার আলোচনায় নিক্সন এই অভিমত প্রকাশ করেন যে, ভারতকে গণমাধ্যমে আক্রমণকারী দেশ হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে। নিক্সন ও কিসিঞ্জার হটলাইনে ব্রেজনেভকে কী বার্তা পাঠানো হবে সে সম্পর্কে আলাপ করেন। নিক্সন বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে রাশিয়ানদের প্রতারণা করার জন্য কোনো কিছুই সংযোগ দেওয়া হয়নি। এর অর্থ হলো একটি শক্ত অবস্থান নেওয়া। যুক্তরাষ্ট্র যদি কিছু না করে তাহলে অবশ্যই বিপর্যয় আসবে। যুক্তরাষ্ট্র শক্ত অবস্থানে দাঁড়ালে চীন সাহায্যে এগিয়ে আসবে। নিক্সন বলেন, এর চেয়ে ভাল কী করা যেতে পারে। নত হয়ে থাকলে কাউকে সাথে পাওয়া যাবে না। ১৩ই ডিসেম্বর নৌ-বহর ভারত সাগরে পৌঁছবে। দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ে চীন, সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারতের নিকট যথার্থভাবে প্রতীয়মান হতে হবে 'হোয়াইট হাউজে যে মানুষটি আছে সে খুব শক্ত' ('man in the White House' was tough.)। আলোচনায় চীনের কার্যক্রম নিয়ে আলোকপাত করা হয়। কিসিঞ্জার ভুট্টোকে বলে দিয়েছেন, চীনের কাছ থেকে আর বেশি কথা শুনতে চাই না। যুক্তরাষ্ট্র জনমতের বিরুদ্ধে, আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে, নৈতিকতার বিরুদ্ধে কাজ করছে। এখন যদি চীন কথা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বলতে আসে তাহলে শর্ত হিসেবে চীনের কিছু সৈন্য সীমান্তে রওনা করতে হবে। যদি তা না হয় সে পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্র কোনো কথা শুনতে চায় না। এসময় হেগ বলেন, জরুরি ভিত্তিতে চীন কথা বলতে চায়। যেহেতু নিক্সন এবং কিসিঞ্জার আজরোস ছুটি কাটাতে চলে যাচ্ছেন, সেজন্য চীন প্রস্তাব করেছে চীন রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়া ও হেগের সঙ্গে মিটিং-এর জন্য। কিসিঞ্জার বলেন, চীন উদ্যোগী হয়ে যে মিটিং-এর কথা বলেছে তা সম্পূর্ণভাবে অপ্রত্যাশিত। এর অর্থ হলো তারা সীমান্তে সৈন্য পাঠাচ্ছে। নিক্সন হেগকে বলেন, তিনি কী মনে করেন চীন যে মিটিং-এর কথা বলেছেন তার অর্থ তাদের সৈন্যরা কি যাত্রা করেছে? হেগ কিসিঞ্জারকে সমর্থন করেন। ভারতের বিরুদ্ধে চীন অগ্রসর হলে সম্ভবত সোভিয়েত সৈন্য চীনের বিরুদ্ধে আক্রমণ করলে যে সমস্যার সৃষ্টি হবে এই প্রশ্নটি সম্ভবত সামনে এসেছে। কিসিঞ্জার বলেন, সোভিয়েত যদি চীনের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয় সেক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র কিছু না করলে বিশ্বশক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের গুরুত্ব হ্রাস পাবে। নিক্সন এক্ষেত্রে কঠিন অবস্থা গ্রহণের কথা বলেন এবং পারমাণবিক অস্ত্র ব্যবহার সম্পর্কে লবিং শুরু করতে বলেন। যদি এই পরিস্থিতিতে সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অগ্রসর হয় এবং সফল হয় তাহলে সেটা হবে চূড়ান্ত শক্তি পরীক্ষা। যদি তারা উত্তীর্ণ হয় তাহলে যুক্তরাষ্ট্র শেষ হয়ে যাবে।

এক পর্যায় নিক্সন জিজ্ঞেস করেন, কী জন্য চীন ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অগ্রসর হবে। কিসিঞ্জার বলেন, পাকিস্তান যদি ভারত কর্তৃক বিপর্যস্ত হয়ে যায়, সোভিয়েত কর্তৃক চীন ধ্বংস হয়ে যাবে, পরাজিত হবে এবং অপমানিত হবে ও পৃথিবীর শক্তির ভারসাম্য তাৎপর্যপূর্ণভাবে পরিবর্তন হয়ে যাবে এবং আমেরিকাকে তখন যুগ যুগ ধরে মধ্যপ্রাচ্যের মতো এ ধরনের যুদ্ধের মুখোমুখি থাকতে হবে। নিক্সন মন্তব্য করেন, চীনের ৮০০ মিলিয়ন এবং ভারতের ৬০০ মিলিয়ন মানুষ এবং এসব মিলে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ভীত হয়ে পড়বে, জাপান অচল হয়ে যাবে এবং ইউরোপিয়ানরা তাদের পেছনে দৌড়াবে, আমেরিকা তখন একঘরে হয়ে যাবে। দক্ষিণ এশিয়ার এই অবস্থায় কিসিঞ্জার আজরোসে না গিয়ে ওয়াশিংটনে থাকতে চান। নিক্সন হেগকে বলেন, চীনা সৈন্য অগ্রসর হোক। নিক্সন বলেন, যুক্তরাষ্ট্র যখন চীনকে এগিয়ে যেতে বলবে এবং সোভিয়েত যখন হুমকি দেবে তখন যুক্তরাষ্ট্র পারমাণবিক অস্ত্র সম্পর্কে লবিং শুরু করবে, যাই ঘটুক না কেন। কিন্তু তার আগে হটলাইনে সোভিয়েতের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তাদের বলা হবে তোমরা কোথায় যেতে চাও। কিসিঞ্জার বলেন, পারমাণবিক অস্ত্র নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র লবিং করবে না, তবে সতর্ক থাকবে। নিক্সন তা স্বীকার করে। কিসিঞ্জার বলেন, যুক্তরাষ্ট্র সৈন্য নিয়োগ করবে এবং তাদের বোমাবর্ষণে সহযোগিতা করবে। যুক্তরাষ্ট্র হ্যানয়কে চরম পত্র দেবে, হাইফং অবরোধ করবে। নিক্সন বলেন, ঠিক আছে। এই ব্যবস্থা চীনকে আঘাত করলে এই পয়েন্টে আমাদের দুঃখিত হওয়ার কিছুই নেই। নিক্সন বলেন, আমরা বিশ্ববাসীকে জানাবো যুক্তরাষ্ট্রের লক্ষ্য দেশকে রক্ষা করা। রাশিয়া এবং চীন যুদ্ধে জড়িত হলে যুক্তরাষ্ট্র উত্তর ভিয়েতনামকে দখল করে নেবে। নিক্সন বলেন, তার বিবেচনায় রাশিয়া ও চীন যুদ্ধে জড়াবে না। কিসিঞ্জারের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অভিমত হলো; প্রথমত, রাশিয়া চীনের প্রতি সদয় হবে না; দ্বিতীয়ত, চীনকে হটিয়ে দিতে পারলে নিক্সনের চীন সফরে দুর্ঘটনা ঘটবে ও তারা চীনকে যে একঘরে করতে চাইছে এবং নিক্সনের চীন সফর বাতিল করা তাদের পরিকল্পনার অংশ হতে পারে। এসময় হেগ বলেন, তিনটি বিষয়ে ভাবার আছে। একটি হলো সোভিয়েতরা ভীতু। যখন যুক্তরাষ্ট্র কিউবা ও মধ্যপ্রাচ্য নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যায়, তখন রাশিয়া পিছু হটে।[১৫৯]

ঐদিন নিউইয়র্কে হেগ চীনের রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুর সঙ্গে অপরাহ্নে কথা বলেন। হেগকে বলা হয়, চীনা উদ্যোগের অর্থ এই নয় যে, পাকিস্তানকে সমর্থনের জন্য তারা সৈন্য দিয়ে সমর্থন করবে। তার পরিবর্তে তারা যুদ্ধবিরতি এবং উভয় পক্ষের সৈন্য প্রত্যাহারের বিষয়টিকে সমর্থন জানাবেন।[১৬০]

নিক্সনের প্রতি কিসিঞ্জারের মেমোরেন্ডামে দক্ষিণ এশিয়া পরিস্থিতি তুলে ধরা হয়। ফারল্যান্ডকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বলেছেন, বর্তমান অবস্থায় যা কিছু যুক্তিযুক্ত তা মেনে নিতে তিনি রাজি আছেন। ঐদিন ডি পি ধর আলোচনার জন্য মস্কো সফরে যান। কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানাচ্ছেন, পূর্ব পাকিস্তানে আমেরিকানদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে চারটি ব্রিট্রিশ সি-১৩০ বিমান দ্বারা। এর তদারকি করেছে ইউএনও প্রতিনিধিরা। এভাবে সপ্তম নৌ-বহর পাঠানোর প্রকাশ্য প্রয়োজনীয়তা ফুরিয়ে যায়। ইসলামাবাদ থেকে বিশ্বস্ত সূত্রের রিপোর্টে বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তার প্রধানমন্ত্রীকে বলেছেন, চীনা রাষ্ট্রদূত তাকে আশ্বস্ত করেছেন ৭২ ঘণ্টার মধ্যে চীন সৈন্য ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে অগ্রসর হবে। কিন্তু সিআইএ ও ডিআইএ জানাচ্ছে, তিব্বত এলাকায় চীন সৈন্যদের ব্যতিক্রম চলাচল দেখছেন না।[১৬১]

কিসিঞ্জার নিক্সনকে বলেন, সোভিয়েত থেকে পত্রের জবাব পাওয়া গেছে। পত্রে বলা হয়েছে, শ্রীমতী গান্ধী পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না এবং কীভাবে যুদ্ধবিরতি করা যায় তাই নিয়ে তারা এখন কাজ করছে। নিক্সন মন্তব্য করেন, রাশিয়ানদের অবস্থান কী সে অবস্থার বিবেচনা করতে পারছি না এবং তারা (কুত্তার বাচ্চারা) চাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র চীনকে ছেড়ে যায়। কিসিঞ্জারের মতে, নিক্সনের পারমাণবিক লবিং-এর সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল বীরত্বপূর্ণ কাজ। বর্তমান সময়ে যুক্তরাষ্ট্রের উচিত হবে 'কঠিন পছন্দকে' এড়িয়ে যাওয়া। এটা হবে সামগ্রিক চিন্তাধারা। সরকার, মার্কিন প্রতিষ্ঠানসমূহসহ, জনগণকে বলা হবে যুক্তরাষ্ট্র ঝামেলা টেনে আনতে পারে না। তাহলে সমগ্র বিশ্বই ঝামেলায় পড়ে যাবে। নিক্সন এসময় মনে করছেন না যে, সোভিয়েতের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। কারণ রাশিয়া যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমঝোতা করতে চায়, কিন্তু রীতি অনুসারে কমিউনিস্টরা আস্তে আস্তে সমঝোতার জন্য চাপ প্রয়োগ করে। তারপরে সমঝোতার লক্ষ্যে অগ্রসর হয়। প্রেসিডেন্ট কেনেডি পাকিস্তানের সঙ্গে যে অঙ্গীকার করেছিল তার ফলে সোভিয়েতরা যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হতে প্রস্তুত নয়। যুক্তরাষ্ট্র চীনাদের রাশিয়ার বার্তা দেখাবে এবং তাদের কাছে জানতে চাওয়া হবে চীন এখন কী চায়।[১৬২]

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঐদিন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন ব্রেজনেভের সঙ্গে হটলাইনে বার্তা পাঠান। বার্তায় উপমহাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্‌বেগ প্রকাশ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্র প্রেসিডেন্ট নিক্সন তার প্রেরিত বার্তার জবাবে ব্রেজনেভ্ কর্তৃক ৭২ ঘন্টা বিলম্বে উত্তর প্রাপ্তির পাওয়ার বিষয়টি ঈষৎ উষ্মা প্রকাশ করে বলেন, নিরাপত্তা পরিষদে বৈঠক ডাকা হয়েছে। এটা উল্টানো যাবে না এবং ভারতীয়দের আশ্বাস এখন পর্যন্ত সুনির্দিষ্ট অঙ্গীকারের অভাব রয়েছে। পরিস্থিতি জরুরি বিবেচনায় নিক্সন প্রস্তাব করে যে, গোপন চ্যানেলে এবং নিবিড়ভাবে উভয়ের মধ্যে আলোচনার প্রস্তাব অব্যাহত রাখতে হবে। এ কথা জোর দিয়ে বলার প্রয়োজন নেই যে, বর্তমান পরিস্থিতি এড়াতে সময় একটি বিরাট ফ্যাক্টর, যা কেউই উপেক্ষা করতে পারে না।[১৬৩]

ঐদিনই কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলেন, বিগত ১০ ডিসেম্বর যা বলা হয়েছে তা করতে প্রস্তুত। এটা সোভিয়েত জনগণের জন্য নির্দেশ পাঠানোর সুযোগ নিতে পারে। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের সঙ্গে কাজ করবে, এছাড়া অন্যকোনো বিকল্প নেই। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান পরিষ্কার।[১৬৪] এরপরেই প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলাপ করে এক ঘন্টার মধ্যে পুনরায় কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভরনসভের সঙ্গে কথা বলেন। প্রেসিডেন্ট বলেছেন, এমন একটি কার্য পরিকল্পনা করতে হবে যার স্পিরিট হবে কেউ হারেনি, কেউ জিতেনি।[১৬৫] রাষ্ট্রদূত বলেন, দিল্লিতে যা হচ্ছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এমন একটি সমাধান যা যুক্তরাষ্ট্রের, সোভিয়েত রাশিয়ার, ভারতের এবং পাকিস্তানের কাছে গ্রহণযোগ্য। এদিনও ভারতীয় রাষ্ট্রদূত এল. কে. ঝা ওয়াশিংটনের আন্ডার সেক্রেটারি আরউইন-এর সঙ্গে কথা বলে ভারতীয় যুদ্ধের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেন, কোনো ভূখণ্ড দখলের ইচ্ছা ভারতের নেই এবং পাকিস্তানকে এ ধরনের নিশ্চয়তা দিতে হবে। আরউইন পুনর্ব্যক্ত করেন, ভারত ও পাকিস্তানের কাশ্মীর সীমান্ত পরিবর্তনের কোনো উদ্যোগ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অগ্রহণীয়। এর সাত ঘন্টা পরে হেগ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে সঙ্গে সপ্তম নৌ-বহর চলাচলের ব্যাপারে বিলম্ব করেছে এ কারণে যাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন হটলাইন বার্তার কী প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে তা জানতে।[১৬৬]

১৩ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে নিক্সনের পাঠানো বার্তার প্রতি-উত্তরে সোভিয়েত থেকে বলা হয়, সরাসরি যোগাযোগ বার্তাটি গভীর মনোযোগের সঙ্গে নিরীক্ষা করা হচ্ছে। উভয় পক্ষের মধ্যে গোপনীয় কথাবার্তা অনুযায়ী সোভিয়েত এই পরামর্শ দিতে চায়, বর্তমান সময়ে যা কিছু ঘটছে ভারতের কাছে তার সবকিছুই ব্যাখ্যা দিতে ইচ্ছুক। সোভিয়েত অবিলম্বে এই ব্যাখ্যার ফলাফল যুক্তরাষ্ট্রকে অবগত করবে।[১৬৭] এ উপলক্ষে হেগ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অবগত করার জন্য ফারল্যান্ডের মাধ্যমে একটি বার্তা পাঠান। বার্তায় বলা হয়, ভুট্টো নিউইয়র্কে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য বুশকে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে আলোচনা করে একটি সমঝোতামূলক প্রস্তাব উত্থাপনের পরামর্শ দেন। প্রস্তাবটি হলো, 'পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য পাকিস্তান সরকারকে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বলা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হোক এবং এক পাকিস্তানের আওতায় পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ইচ্ছা অনুযায়ী স্বীকৃতি প্রদান করা হোক।'[১৬৮] ইয়াহিয়া খান ভুট্টো কর্তৃক সংশোধিত প্রস্তাবটি অনুমোদন করেন। ঐদিনই অত্যন্ত গোপনীয়ভাবে কিসিঞ্জার হেগকে বলেন, "জনমতের চাপ থাকলেও যুক্তরাষ্ট্র সপ্তম নৌবহরকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য বলবে।" হেগ কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেন, নৌবহরটি কি সিঙ্গাপুরে একদিনের জন্য দেরি করতে পারে? এর জবাব এভাবেই সমাপ্ত হয় যে, যাই ঘটুক না কেন সপ্তম নৌবহরকে ভারত মহাসাগরে যেতে হবে।[১৬৯]

১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে পাকিস্তানিরা তাদের সৈন্যদের মনোবল চাঙা করার জন প্রচারণা চালাচ্ছিল, চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সামরিক সাহায্য দেবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এবং শিগ্‌গিরই তা বাস্তবায়িত হবে। এটা তারা বিশ্বাসও করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু ১৩ই ডিসেম্বর সন্ধ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানের আর্মি হেডকোয়ার্টার্সে পাঠানো নিয়াজির বার্তাটি ভারতের কাছে ধরা পড়েছে। বার্তাটি ছিল: ঢাকা প্রচণ্ড চাপের মুখে। বিদ্রোহীরা ইতোমধ্যে শহর ঘিরে ফেলেছে। ভারতীয়রাও এগিয়ে আসছে। পরিস্থিতি গুরুতর। 'প্রতিশ্রুত সাহায্য' ১৪ই ডিসেম্বরের মধ্যে অবশ্যই বাস্তবায়িত হতে হবে। নেফা অঞ্চলে নয়, শিলিগুড়ির মাধ্যমে এই পরিকল্পনা কার্যকর করতে হবে এবং শত্রুদের এয়ারবেসগুলোকে ব্যস্ত রাখতে হবে।[১৭০]

ভারতীয় সমর পরিকল্পনায় চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কাকে সামনে রেখে তৈরি করা হয়েছে। সেজন্য লক্ষণীয় মাউন্টেন ডিভিশনকে ভুটানের নিরাপত্তার জন্য উত্তরবঙ্গের কোল ঘেষে রাখা হয়েছিল। অবশ্য ৮ই ডিসেম্বর পর্যন্ত ভারতের সমর পরিকল্পনায় চীনা হুমকির পরিপ্রেক্ষিতে ঢাকা অগ্রসর হওয়ার ক্ষেত্রে মাউন্টেন ডিভিশনের মাত্র দু'টি ইউনিটকে বাংলাদেশে অগ্রসর হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। তখন এমন একটি জটিল অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে ভারতীয় সমর নায়কদের সোভিয়েত, আমেরিকান, কাঠমাণ্ডুস্থ মার্কিন মিলিটারি অ্যাট্যাশে, পররাষ্ট্র ও গোয়েন্দা সংস্থা বিশেষজ্ঞবৃন্দ পাকিস্তানের সমর্থনে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কা উড়িয়ে দেননি।[১৭১]

কথিত 'প্রতিশ্রুত সাহায্য'-এর অর্থ হলো বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সরাসরি চীনা ও মার্কিন হস্তক্ষেপ। ভারতীয়দের মধ্যে তাদের গতিবিধি সম্পর্কে ভুল ধারণা দেওয়ার লক্ষ্যে চীনারা তিব্বতে তাদের সামরিক ফরমেশনগুলোতে আবহাওয়া সম্পর্কিত তথ্যাদি পাঠাতে শুরু করে। কাঠমাণ্ডুস্থ মার্কিন মিলিটারি অ্যাটাশে কর্নেল মেলভিন হোলস্ট সম্ভাব্য চীনা হস্তক্ষেপ সম্পর্কে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সচেতনতার কথা জানিয়ে রিপোর্ট করেন এবং সেই অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে বলেন। যুদ্ধ শেষ হলে ফোর্ট উইলিয়ামে জে. জ্যাকবের সঙ্গে দেখা হলে চীনা হস্তক্ষেপের আশঙ্কা সম্পর্কে তাঁর রিপোর্ট সংক্রান্ত প্রশ্নের জবাব এড়িয়ে যান। সিদ্দিক সালিক-এর তথ্যানুয়ায়ী, 'উত্তরদিক থেকে হলুদ এবং দক্ষিণদিক থেকে সাদা' সৈন্যরা যুদ্ধে হস্তক্ষেপ করতে আসছে, এই মর্মে রিপোর্ট বের করে রাওয়ালপিন্ডি পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর মনোযোগ যুদ্ধবিরতি থেকে অন্যদিকে ঘুরিয়ে দিয়েছিলো। সিগন্যাল ইন্টারসেপশনের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কাজে নিয়োজিত ভারতের সংস্থা এই বার্তাগুলো সংগ্রহ করে। ভারতের উত্তরসীমান্তের পর্যবেক্ষণকেন্দ্রগুলোতে যোগাযোগ করলে তারা বলেছেন যে, চীনাদের গতিবিধির কোনো নিশানও দেখা যাচ্ছে না। সিদ্দিক সালিক বলেছেন যে, জেনারেল নিয়াজি ঢাকাস্থ চীনা ও মার্কিন কূটনৈতিক মিশনের প্রধানদের সাথে এ ব্যাপারে যোগাযোগ করেছেন। কিন্তু তাঁরা তাঁদের সরকারের এ ধরনের কোনো পরিকল্পনার কথা জানেন না বলে জনিয়েছেন। পাকিস্তানি ইস্টার্ন কমান্ড চীনা ও মার্কিন সাহায্যের কথা আবার জিজ্ঞাসা করলে তাদেরকে আরো ছত্রিশ ঘন্টা অর্থাৎ ১২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলা হয়। রাওয়ালপিন্ডিতে পেরিত এই বার্তাগুলো ভারত ইন্টারসেপ্ট করে এবং নিশ্চিত হয় যে, চীন ও যুক্তরাষ্ট্রের তৎপরতা 'ঘেউ ঘেউয়ের' মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে; কামড়ানোর কোনো ইচ্ছেই তাদের নেই।[১৭২]

যুক্তরাষ্ট্রের বিমানবাহী জাহাজ এন্টারপ্রাইজ এর গতিবিধি নিয়ে দিল্লিতে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। ভারতকে বলা হয়েছিলো, তারা শুধু তাদের নাগরিকদের পূর্ব পাকিস্তান থেকে উদ্ধারের জন্য ঐ নৌবহর পাঠিয়েছে। ভারত একথা বিশ্বাস করেনি যে, শুধু বেসামরিক নাগরিকদেরকে সরিয়ে নেওয়াই ছিল টাস্কফোর্সের উদ্দেশ্য। ভারতীয়দের মনে তাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে যে একটি সন্দেহের জন্ম দিতে চেয়েছিল, এটা পরিষ্কার। টেলিফোনে নিয়মিত কথাবার্তার মধ্যে অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ টাস্কফোর্সের গতিবিধি নিয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করলেও তিনি নিশ্চিত ছিলেন, তাদের এই গতিবিধির উদ্দেশ্য হলো ভারতকে ভয় দেখানো। এই নৌবহর এত দূরে ছিল যে, সময়মতো তার পক্ষে উত্তর-বঙ্গোপসাগরে পৌঁছানো সম্ভব ছিল না।

জেনারেল মানেকশ'র এসব বার্তা পাঠাতেন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নরের উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী-র উদ্দেশ্যে। ৯ই ডিসেম্বর পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর ড. এ. এম. মালিক অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির সুপারিশসহ ইয়াহিয়া খানের কাছে বার্তা পাঠান। ইয়াহিয়া খান উত্তরে জানান যে, গভর্নরকেই এই সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং এ ব্যাপারে জেনারেল নিয়াজিকে তিনি প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করেছেন। তখন জাতিসংঘের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি জেনারেল মার্ক হেনরিকে পাঁচ দফার একটি প্রস্ত াব দেওয়া হয়: অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি; পশ্চিম পাকিস্তানের সৈন্যদের প্রত্যাবাসন; ফিরে যেতে ইচ্ছুক অন্যান্য পশ্চিম পাকিস্তানির প্রত্যাবাসন; ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্ত ানে বসবাসরত নাগরিকদের নিরাপত্তা এবং কোনো ধরনের প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা না নেওয়ার নিশ্চয়তা। রাওয়ালপিন্ডি থেকে নির্দেশের জন্য অপেক্ষমান গভর্নর ১৪ই ডিসেম্বর বেলা বারোটায় গভর্নমেন্ট হাউসে এক উচ্চ পর্যায়ের বৈঠক আহ্বান করেন। সিগন্যাল ইন্টেলিজেন্সের প্রধান লেফটন্যান্ট কর্নেল পি. সি. ভল্ল সকাল ৯.৩০ মিনিটে এক ইন্টারসেপশন বার্তা বহন করেন। সঙ্গে সঙ্গে শিলংয়ের ইস্টার্ন এয়ার কম্যান্ডে সুদক্ষ সিনিয়র এয়ার স্টাফ অফিসার এয়ার ভাইস মার্শাল দেবাশরকে ফোন করে তা অবগত করানো হয়। কর্তৃপক্ষ একমত হয় যে, বৈঠকটি ভেঙে দিতে পারলে গভর্নর আরো বেশি করে আত্মসমর্পণের দিকে ঝুঁকবেন। কিন্তু সমস্যা হলো, সংশ্লিষ্ট

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কর্মকর্তাদের অজানা ছিল যে, দুই গভর্নর হাউসের মধ্যে কোনটিতে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে–নতুনটা নাকি পুরাতনটা। প্রথমত ধারণা করা হয়, পুরাতনটিতেই বৈঠক হবে; কারণ ইয়াহিয়া ঢাকায় এলে নতুন হাউসেই উঠতেন। টুরিস্ট গাইড ম্যাপ থেকে পুরাতন গভর্নর হাউস চিহ্নিত করে আক্রমণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। অনুসন্ধানে জানা যায়, সেখানে কোনো বিমানবিধ্বংসী কামান ছিল না। এ সম্পর্কে আশ্বস্ত হয়ে আকাশযুদ্ধ ভারতের পক্ষে অনায়াসসাধ্য হয়ে পড়ে। নিখুঁতভাবে আক্রমণ পরিচালিত হয়। প্রাথমিক আক্রমণের অব্যবহিত পরে গ্যাভিন ইয়াং ও কেলি গভর্নরের সাথে দেখা করতে যান। মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলি উপস্থিত ছিলেন। কেলিকে আতঙ্কিত গভর্নর পদত্যাগের কথা বললে কেলি জাতিসংঘকে এর মধ্যে জড়াতে চাননি বলে সরাসরি প্রশ্নটি এড়িয়ে যান। পরবর্তী বিমান আক্রমণ শুরু হলে ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্যে ড. মালিক পদত্যাগ পত্র পেশ করেন। আক্রমণ যখন পুরোদমে চলছে, তখন ড. মালিক তাঁর জুতো-মোজা খুলে ওজু করে মাথায় সাদা রুমাল বেঁধে বাঙ্কারের মধ্যে নামাজ আদায় করেন। এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের শেষ গভর্নরের শেষ কাজ।

এর আগে ১৩-১৪ই ডিসেম্বর রাতে নিয়াজি পাকিস্তানি কমান্ডার-ইন-চিফ জেনারেল হামিদ-এর সাথে কথা বলে তাঁকে অনুরোধ করেন, যাতে ইয়াহিয়া খানকে বলে অবিলম্বে তিনি যুদ্ধবিরতি কার্যকর করার ব্যবস্থা করেন। ১৪ই ডিসেম্বর নিয়াজির কাছে এক বার্তা পাঠিয়ে ইয়াহিয়া অবিলম্বে যুদ্ধ বন্ধ ও সশস্ত্রবাহিনীর সদস্যদের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশ দেন। নিয়াজিকে পাঠানো ইয়াহিয়ার বার্তা ছিল:

"প্রবল প্রতিকূলতার মধ্যেও আপনারা বীরত্বের সাথে লড়াই করেছেন। জাতি আপনাদেরকে নিয়ে গর্বিত এবং সারা পৃথিবী প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বিদ্যমান সমস্যার সমাধানকল্পে মানুষের-পক্ষে-সম্ভব এমন সমস্ত পদক্ষেপই আমি গ্রহণ করেছি। বর্তমানে এমন এক পর্যায়ে আপনারা পৌঁছেছেন যে, এরপরে প্রতিরোধের যে কোনো প্রচেষ্টাই হবে অমানুষিক এবং সেটা কার্যকরীও হবে না; বরং তা আরো প্রাণহানি ও ধ্বংসেরই কারণ হবে। এই অবস্থায় আপনাদের উচিত হবে যুদ্ধ বন্ধ করে পশ্চিম পাকিস্তানি সশস্ত্র বাহিনীর সকল সদস্য ও অন্যান্য বিশ্বস্ত সহযোগীদের জীবনরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা। পূর্ব পাকিস্তানে ভারতীয় সমরাভিযান বন্ধ করে পাকিস্তানি সশস্ত্রবাহিনীর এবং অন্যান্য জনসাধারণ যারা দুষ্কৃতিকারীদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারে, তাদের সকলের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ভারতকে অনুরোধ করার জন্য আমি ইতোমধ্যেই জাতিসংঘে তৎপরতা চালিয়েছি।"[১৭৩]

ভারতীয় সময় বিকেল তিনটায় নিয়াজি এই বার্তা পান। এরপর নিয়াজি ও ফরমান আলি ইউনাইটেড স্টেট্স কনসাল জেনারেল হার্বার্ট ডি. স্পিভাক-এর সাথে দেখা করতে যান। স্পিভাকে নিয়াজি ভারতের সাথে পূর্ববর্ণিত বিষয়াবলির নিশ্চয়তাসহ যুদ্ধবিরতির ব্যবস্থা করতে অনুরোধ করেন। স্পিভ্যাক বার্তাটি যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাসের মাধ্যমে দিল্লিতে প্রেরণ করেন। রাও ফরমান আলি অবিলম্বে পূর্ব পাকিস্তান সামরিক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাহিনীর যুদ্ধবিরতির বার্তা মানিকশ' বরাবর পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যুদ্ধবিরতির জন্য আগের প্রস্তাবনাগুলোর আলোকে বার্তাটি প্রণীত হয়: ক. যুদ্ধ বন্ধ হবে এবং পূর্ব পাকিস্তানে যাবতীয় সামরিক অভিযান বন্ধ হবে; খ. পূর্ব পাকিস্তানের শাসনভার জাতিসংঘের গৃহীত ব্যবস্থা অনুযায়ী শান্তিপূর্ণভাবে হস্তান্তরিত হবে; এবং গ. যে বিষয়গুলোতে জাতিসংঘ নিশ্চয়তা দেবে, সেগুলো হলো: ১. পশ্চিম পাকিস্তানে ফিরে যেতে পারেনি সামরিক ও আধাসামরিক বাহিনীর এমন সকল সদস্যের নিরাপত্তা; ২. সকল পশ্চিম পাকিস্তানি বেসামরিক নাগরিক ও সরকারি চাকুরিজীবী, যারা পশ্চিম পাকিস্তানে প্রত্যাবর্তন করতে পারেনি, তাদের নিরাপত্তা; ৩. ১৯৪৭ সাল থেকে পূর্ব পাকিস্তানে বসবাসরত অস্থানীয় জনগোষ্ঠীর সদস্যদের নিরাপত্তা; এবং ৪. মার্চ ১৯৭১ থেকে যারা পাকিস্তান সরকারের চাকরি করেছেন অথবা সরকারকে সহায়তা করেছেন এবং পাকিস্তানের পক্ষে কাজ করেছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিশোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ না করার নিশ্চয়তা।

ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেলে (বর্তমানে রূপসি বাংলা) গভর্নরের কাছে ফরমান আলি এই বার্তার একটি অনুলিপি প্রদান করেন। বার্তাটি ভারতে পাঠালেও অবশ্য ওয়াশিংটনে পাঠানো হয়। ১৪ই ডিসেম্বর আনুমানিক বিকাল পাঁচটায় কলকাতাস্থ কনসুলার অফিসের এক কূটনীতিক স্পিভাকের সাথে নিয়াজির যুদ্ধবিরতি প্রস্তাবনা নিয়ে তাঁর আলোচনার কথা ভারতীয় কর্তৃপক্ষ জানতে পারেন। সাথে সাথে জেনারেল জ্যাকব কলকাতাস্থ ইউনাইটেড স্টেট্স কনসালে জেনারেল হার্বার্ট গর্ডন-এর কাছে ফোন করেন। তিনি এ বিষয়ে তাঁর অবগতির কথা অস্বীকার করেন। সাথে সাথে জেনারেল মানেক শ'কে ফোন করে তাঁকে দিল্লিস্থ মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করা হয়। জেনারেল মানেক শ' মার্কিন রাষ্ট্রদূতের সাথে কথা বলেন এবং তিনি জানান যে, স্পিভাককে করা কোনো অনুরোধ সম্পর্কে তিনি কিছু জানেন না। আপাতদৃষ্টে মনে হয়, বার্তাটি তিনি ইসলামাবাদে মার্কিন রাষ্ট্রদূতের কাছে পাঠান,[১৭৪] যিনি পরবর্তী পর্যায়ে ওয়াশিংটনে স্টেট ডিপার্টমেন্টে পাঠিয়ে দেন। পরে কিসিঞ্জার জানান, স্টেট ডিপার্টমেন্ট বিষয়টি একদিন ধরে রাখার সিদ্ধান্ত নেয় যাতে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবার আগে পাকিস্তানিরা পশ্চিমে আরো কিছু এলাকার দখল নিতে পারে। জেনারেল মানেক শ' বার্তাটি পান ১৫ই ডিসেম্বর। মানেক শ' নিশ্চয়তা দেন, পাকিস্তানিরা 'আত্মসমর্পণ' করলে তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা হবে। এ বিষয়ে পাকিস্তানি ইস্টার্ন কম্যান্ডকে ফোর্ট উইলিয়ামে ইস্টার্ন কম্যান্ডের সাথে যোগাযোগ করতে বলা হয়। পূর্ব পাকিস্তানি কমান্ডার-ইন-চিফ এই শর্ত গ্রহণ করার জন্য নিয়াজিকে সংকেত দেন। ১৫ই ডিসেম্বর বিকাল পাঁচটা থেকে পরদিন বেলা ৯টা পর্যন্ত যুদ্ধবিরতির জন্য উভয়পক্ষ রাজি হয়। পরবর্তীকালে এই মেয়াদ বিকেল তিনটা পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। যতটা উপবব্ধি করা যায়, ইয়াহিয়া যুদ্ধবিরতিতে সম্মত হয়েছিলেন, যেটা ছিল 'আত্মসমর্পণেরই' নামান্তর, যদিও হাসান জহির তাঁর বইতে[১৭৫] সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন যে, পাকিস্তানিরা 'আত্মসমর্পণ শব্দটি পরিহারের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

করেছেন। এছাড়া ফরমান আলি শুধু ভারতীয় বাহিনীর কাছে 'আত্মসমর্পণ' করতে চেয়েছেন। বাংলাদেশ ও ভারতীয় বাহিনী সমন্বয়ে যৌথ বাহিনীর কাছে 'আত্মসমর্পণে' জোর আপত্তি জানান।[১৭৬] ঢাকায় 'আত্মসমর্পণ' নিয়ে আলোচনার সময় নিয়াজি আশা করেছিলেন, স্পিভাককে দেওয়া তাঁর প্রস্তাবনা অনুযায়ী দলিল তৈরি করা হবে। সম্ভবত এই কারণেই পরবর্তীতে ঢাকায় 'আত্মসমর্পণে'র দলিল দেখার পরে সেটা গ্রহণ করতে নিয়াজির অনীহা লক্ষ্য করা যায়।[১৭৭]

ঐদিনই ভারতের রাষ্ট্রদূত ঝা মার্কিন স্টেট সেক্রেটারি সিসকোর সাথে দেখা করে ভারত মহাসাগরে পরমাণুসজ্জিত সপ্তম নৌবহর পাঠানোর ব্যাপারে উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন। ঝা সিসকোকে বলেন, এরকম একটি রিপোর্ট শোনা যাচ্ছে যে, যুক্তরাষ্ট্র সরকার বাংলাদেশের কিছু অংশ দখল করে পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে পশ্চিম পাকিস্তানের নেওয়ার পরিকল্পনা করছে। ঝা বলেন, এ ধরনের প্রয়াস হবে গুরুতর এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের দীর্ঘস্থায়ী অবনতির কারণ হবে। ঝা বলেন, যুক্তরাষ্ট্রে যে ব্যবস্থা নিচ্ছে তা কেবল বর্তমানকে প্রভাবিত করবে না, ভবিষ্যতেও দীর্ঘস্থায়ী সম্পর্কের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য বহন করবে। ইতোমধ্যে কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভরন্টসভের সঙ্গে কথা বলেন। সেখানে দু'জনের মধ্যে দু'টি বিষয়ে ঐক্যমত্য হয়; এক, ভারত পশ্চিম পাকিস্তান আক্রমণ করবে না; ও দুই, কোনো ভূখণ্ড দখল করবে না এবং করলেও তা পূর্বের অবস্থায় ফেরত যাবে। কিসিঞ্জার বলেন, সোভিয়েত রাশিয়া কী করে ভাবতে পারে যখন সে যুক্তরাষ্ট্রের মিত্রদের উপর চাপ সৃষ্টি করে অথবা তাদের ভেঙে ফেলতে চায় তখন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতরে পারস্পরিক সম্পর্ক উন্নয়ন কীভাবে সম্ভব। নিক্সন পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার বিষয়টি নিয়ে গভীরভাবে পর্যালোচনা করেন এবং শেষ পর্যন্ত বাস্তবতাকে মেনে নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

১৫ ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে ঢাকায় নিযুক্ত মার্কিন দূতাবাস থেকে যুক্তরাষ্ট্রকে জানানো হয়, "পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট দৃঢ়ভাবে পূর্ব পাকিস্তানে যুদ্ধবিরতির অবসান চান। এজন্য গভর্নর মালিক এবং জেনারেল ফরমান আলীর মাধ্যমে তাকে জানানো হয়েছে অবিলম্বে দুই ঘন্টার জন্য যুদ্ধবিরতির আয়োজন করার ইচ্ছা প্রকাশ করেন যাতে সংশ্লিষ্ট সামরিক অধিনায়কগণ উদ্দেশ্য সাধনে কোথায় কীভাবে সম্মানের সঙ্গে পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও নাগরিকদের নিরাপত্তা দেওয়া সম্ভব হয়।"[১৭৮]

ঐদিনই দিল্লিতে মার্কিন রাষ্ট্রদূত কিটিং অপরাহ্নে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর সেক্রেটারি পি. এন. হাকসার-এ সঙ্গে দেখা করে নিক্সন বরাবর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীকে একটি পত্র দেওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।[১৭৯] ১৫ ডিসেম্বর সকালে কিসিঞ্জার প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে দেখা করে সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে অবগত করেন। নিক্সন কিসিঞ্জারকে জিজ্ঞেস করেন, ব্রেজনেভ তাকে যে পত্র লিখেছেন তা প্রকাশ করলে চীনের কি প্রতিক্রিয়া হবে? কিসিঞ্জার বলেন, পশ্চিম পাকিস্তানের রক্ষার নিশ্চয়তা পেলে চীন শিহরিত হয়ে উঠবে। কিসিঞ্জার বলেন, বিষয়টি বলতে গেলে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অলৌকিক। কারণ আমি সমগ্র গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টগুলো অনুধাবনে অভ্রান্তভাবে পরিষ্কার ছিলাম যে, ভারতের স্ট্রাটেজি হলো পশ্চিম পাকিস্তানকে আঘাত করা।[১৮০] কিসিঞ্জার এ কথাও বলেন, ঝা একটি ভ্রান্ত প্রমাণ পেয়েছে যে, যুক্তরাষ্ট্র বঙ্গোপসাগরে নামছে। নিক্সন বলেন, জাতিসংঘ টিকে থাকবে না এবং বিশ্ব স্থিতিশীল হবে না, যদি একজন সদস্যের জন্য জাতিসংঘ বিকল হতে হয়, "যা আমি হতে দিতে পারি না।"[১৮১] অন্য এক মেমোরেন্ডামে কিসিঞ্জার নিক্সনকে জানিয়েছেন, বেসরকারি সরকার প্রতিষ্ঠা করে পূর্ব পাকিস্তানে রাষ্ট্র পরিচালনার বিষয়ে ভারত খুব শক্ত অবস্থান নিয়েছে। তারা জাতিসংঘে খসড়া উপস্থাপন করেছে, যেখানে বলা হয়েছে, ১৯৭০ সালে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতা হস্তান্তরের পর একইসাথে যুদ্ধবিরতি কার্যকর হবে।[১৮২] ঐদিনই কিসিঞ্জার সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতকে ডেকে তার হাতে কোসিগিন বরাবর একটি পত্র তুলে দেন। সেখানে বলা হয়েছে, পশ্চিম সীমান্তে জাতিসংঘের মাধ্যমে অথবা সরাসরি আলোচনার মাধ্যমে অথবা যা যথাযথ হয় সেভাবে অবিলম্বে যুদ্ধবিরতি করতে হবে। এবং পশ্চিম পাকিস্তানেও যুদ্ধ বন্ধ হলে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে যে কালো ছায়া বিস্তার করে আছে তা ক্রমশ দূর হবে।[১৮৩] ১৫ এবং ১৬ই ডিসেম্বর পাকিস্তান আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে নির্দেশ করা হয় যে, সমস্ত কারেন্সি ও ট্রাভেলার চেক ধ্বংস করতে হবে। ন্যাশনাল ব্যাংকের চেক, সাংকেতিক চিহ্ন এবং কোড বইও নষ্ট করে দিতে হবে। ১৫-১৬ই ডিসেম্বর রাতে স্টেট ব্যাংক খোলা হয় এবং সমস্ত টাকা ও মুদ্রা পোড়ানো হয়।

১৬ই ডিসেম্বর বিকাল ৪:৪১ মিনিট। রমনা রেসকোর্স। 'আত্মসমর্পণ' অনুষ্ঠানের জন্য মঞ্চ বানানো হলো। বিশাল ময়দানটি যেখানে ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ৭ই মার্চে ভাষণে মুক্তি ও স্বাধীনতার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছিলেন সেই ময়দানে পাকিস্তানের করুণ পরাজয়ের দলিল স্বাক্ষরিত হলো। এভাবে চতুর্ভূজ কূটনীতির জটিল আবর্ত থেকে রক্তস্নাত স্বাধীন সার্বভৌম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে।

তথ্য সংকেত

১. "Taking military help meant practically getting alinged", *Rajya Sabha*, 22 August 1961.

২. 'On 29 October 1962, India formally decided to accept United States military aid, after Ambassador J. K. Galbraith had met Nehru. Galbraith had insisted with Foreign Secretary M. J. Desia that the press should be told clearly that request for military aid came from the Indian Prime Minister.'

৩. "The result of the 1962 debacle was that the Chinese came into occupation of about 37,000 square miles of Indian Territory in Ladakh (25,000 occupied as a

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

result of October 1962 invasion and 12,000 occupied eairlier." Major Jodh Singh & P.N. Khera, *India's India*, An Issd Publication, 1972, p. 30.

৪. "After the cease-fire, President Kennedy responding to Nehru's appeal earlier dispatched a high-powered team of State Department and Defence Advisers led by Averill Harriman. The team included Gen. Paul Adams, commander of the mobile strike force alerted for emergency ground action in the war. The British sent a similar mission, head by Duncan Sandys to synchronies with the United States mission's in New Delhi. They together processed India's request for military aid for the next three years, formalized few weeks later at Nassau by President Kennedy and Prime Minister Harold Macmillan. The 120 million dollar aid package gave small arms, ordnance machinery and ammunition, the donors sharing the cost." Mohon Ram, *Politics of Sino Indian Confrontation*, pp. 123-124.

৫. *Lok Sabha*, 5 March 1963.

৬. "Chou-Ayub communiqué hoped "the Kashmir dispute could be resolved in accordance with the wishes of the people of Kashmir as pledged to them by India and Pakistan," *China, India and Pakistan,* Karachi: Pakistan Institute of International Affairs, 1966, p. 425.

৭. "The Truth About How the Leaders of the CPSU Have Allied Themselves with India Against China," *People's Daily*, 2 November 1963.

৮. 'Chou-En-lai told Neville Maxwell in 1971 that in 1962 the Soviet leadership indulged in provocation and subversion against China by getting many Chinese to leave Sinkiang.' *The Sunday Times,* 19 December 1971. Cf. also "The Origin and Development of Differences Between the Soviet Union and Ourselves," *Red Flag and People's Daily*, 6 September 1963. Mohon Ram, *op.cit.*, p. 133.

৯. *New York Times*, 13 September 1964.

১০. Documents 187, *India-China Relation Documents*, p. 230.

১১. Documents 181, *Ibid,* p. 213.

১২. Documents 194, *Ibid,* p. 247.

১৩. Documents 213, *Ibid,* p. 263.

১৪. নেহেরুর বক্তব্য ফরেন অ্যাফেয়ার্স পত্রিকা এপ্রিল ১৯৬৩ সংখ্যায় প্রকাশ করে, পৃ. ২১৮

১৫. Documents 219, *India-China Relation Documents*, p. p 280-281.

১৬. পিকিং রিভিউ, ৩রা জুলাই ১৯৬৪

১৭. Documents 252, *India-China Relation Documents,* p. 314

১৮. Documents 258, *Ibid,* p. 320-321

১৯. Documents 267, *Ibid,* p. 332. *পিকিং রিভিউ*, ১৩ই আগস্ট ১৯৬৫ সালের চীনের মার্কসবাদী তাত্ত্বিক লিং ইয়েন লিখিত প্রতিবেদন দ্রষ্টব্য।

২০. Documents 269, *Ibid,* p. 333

২১. Documents 271, *India-China Relation Documents*, p. 334

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২. Documents 272, *Ibid,* p. 335
২৩. Jonson says, "The threat of communist Chinese expansion must be contained by political military" Documents 284, *Ibid,* p.p. 346-347
২৪. 'Let the Red Flag of Nexalbari by still higher.'
২৫. Documents 311, *India-China Relation Documents*, p. 366
২৬. Documents 356, *Ibid,* p. 409
২৭. "India is also fighting this battle is the crucial foreign of Afro-Asia which China has sought to use as a political dancing pad and as revolutionary substitute for the United Nation." Documents 282, *India-China Relation Documents*, p. 345
২৮. "U.S. scheme of making the Asians fight Asians, thereby disrupting Afro-Asian unity", *Peking Review*, 14 May 1965
২৯. *New York Times*, 25 April 1955
৩০. B.N. Goswami, *Pakistan and China*, New Delhi, Allied, 1971, pp.43-44.
৩১. *Dawn*, 27 October, 1959
৩২. *Dawn*, 22 & 25 February, 1964
৩৩. *Peking Review*, March 12, 1965, pp. 9-11
৩৪. In February, 1957, Prime Minister H. S. Suhrawardy declared in the National Assembly: "I seek the friendship of China. I am not isolated. I feel prefectly certain that when the crucial time comes, China will come to our assistance." Cited, Sisir Gupta, *India's Relations with Pakistan*, *op.cit.*, p. 39; President Ayub Khan stated in an interview with selig Harrison: "And if we are attacked by Inida, then that means India is on the move and wants to expand. We assume that other Asiatic power, expecially China would take notice of that." *Washintong Post,* 12 September, 1963, quoted in B.L. Sharma, *op.cit.,* p. 103.
৩৫. *লোকসভা*, ১৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫
৩৬. "According to Z.A. Bhutto, the Chinese threat was conveyed to India through the United States representative at Warsaw. Pakistan National Assembly 15 March 1966. Azizur Rehaman said in the Pakistan National Assembly on 14 March 1966 that China directly warned India through its Charge d'affaires in Peking that would intervene if East Pakistan was attacked".
৩৭. "Kosygin deserves thanks all peace-loving people for his vital part in Tashkent agreement. US deserves equal credit, not only for its support of Tashkent, but for its withholding of aid from both sides, thus providing incentive to agreement without which Kosygin would not have been successful." Complied and Selected by Rodedad Khan, *The American Papers, Sectet and Confidential India, Pakistan, Bangladesh Documents. 1965-1973,* Dhaka: The University Press Ltd. 1999, p. 124.
৩৮. "United Nations is an American-Soviet Market Place," editorial in *People's Daily*, 27 December, 1965.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৩৯. "United States' decision to provide India through the consortium headed by World Bank economic assistance "on a scale that is related to the needs of our sister democracy", text of communiqué in *The Hindu,* 31 March 1966

৪০. "India thought it should not let Vietnam go under Chinese influence. Mrs Gandhi's foreign policy aides believed United States presence and role om Vietnam really helped India's National interests vis-a-vis Chinia", Mohon Ram, *op.cit.*, p. 174.

৪১. "Inida got the best of both worlds to confront China continued military and economic aid from Soviet Union and resumed economic aid from United States at the cost of proclaimed basic policies", Mohon Ram, *Ibid.*.

৪২. ১৯৬১ সালে পিকিং-এ ভারতের রাষ্ট্রদূত জি. পার্থসারথিকে প্রত্যাহার করে আনে। তারপরেও চীন এরকম ইঙ্গিত দিয়েছে যে, ভারতের সঙ্গে সীমান্তসহ যে সমস্ত সমস্যা রয়েছে তার নিরসন হওয়া উচিত। এমনকি চীন ধারণা দিয়েছে জম্মু কাশ্মীরের উপরে ভারতের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নেবে এবং ভারত পিকিং-এ রাষ্ট্রদূতের যে পদ অপূর্ণ রয়েছে সেখানে রাষ্টদূত নিয়োগ করবে।

৪৩. "India wanted in 1971 what China had proposed in 1961 but found the dialogue ended abruptly. Soon after Henry Kissinger's visit to Peking (July 1971), Inidira Gandhi had written to Chou En-lai offering to discuss Bangladesh and other subjects of mutual interset at any level China might choose. The letter had indicated that while Bangladesh was the main subject for discussion, India was willing to initiate a dialogue towards normalisation of relations on terms honoruable to both the sides", Mohon Ram, *Ibid*, p. 214.

৪৪. "China's attutiude to India and Bangladesh, predictably, was a function of the larger Sino-Soviet ideological dispute", Mohon Ram, *Ibid*, p. 215.

৪৫. '*Tass* "declared with ulterior motives that the Soviet Union cannot remain indifferent to the developments, considering also the circumstance that they are taking place in direct proximity of USSR's borders and, therefore, involve the interests of its security ..." Mohon Ram, *Ibid*, p. 225.

৪৬. Mohon Ram, *op.cit.*, p. 225.

৪৭. অনেকেই বায়াফ্রার অভ্যুত্থানের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের অযৌক্তিক তুলনা করে থাকেন। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বিচ্ছিন্নতাবাদী কোনো আন্দোলন ছিল না এবং শুধু সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থান ছিল না। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছিল স্বাধীনতা যুদ্ধ। যদিও প্রায় একইসময় সংঘঠিত এই অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বায়াফ্রা অভ্যুত্থানের প্রধান ছিলেন, জেনারেল উজুকো। তিনি নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি ছিলেন না। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হয়েছিল সার্বিক গণ-আকাঙ্ক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে একটি নির্বাচিত সরকারের অধীন পরিচালিত মুক্তিসংগ্রাম।

৪৮. "Negotiations between an eager India and a somewhat less enthusiastic China were carried on between 1952 and 1954, finally culminating in the 1954 treaty on Tibet that included the famous 'five principles' (Panchshila) of 'peaceful coexistence.' Richard Sisson & Leo E Rose, *War and Secession Pakistan, India and the Creation of Bangladesh,* Vister Publications, New Delhi, *p.* 247-248.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৪৯. Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid, p.* 247-248.
৫০. Richard Sisson & Leo E Rose, *Ibid,* p. 250
৫১. "The two super powers, working in close co-ordination with the Indian reactionaries, crudely interfere in the internation affairs of Pakistan", Mohon Ram, *op.cit.*, p. 216.
৫২. চৌ-এর পত্র "Dare to launch aggression against Pakistan the Chinese government will, as always, firnly support the Pakistan government and people in their struggle to safeguard their state soverignty and national independence", Mohon Ram, *Ibid,* pp. 216-217.
৫৩. "Ram and the Dragon," *Far Eastern Economic Review*, 7 August 1971.
৫৪. "If India should brazenly provoke a war, can it benefit from it and can the problems be solved? Once a war breaks out both sides, not just one, will incur losses. You know what our attitude will be if a war breaks between India and Pakistan. We firmly support Pakistan against India's subversive and aggressive activities. India would in the end taste the bitter fruit of its own making. And from then on there would be no tranquillity on the subcontinent", *Sunday Times*, 5 December 1971.
৫৫. Mohon Ram, *op.cit.*, p. 227
৫৬. Mohon Ram, *Ibid*, p. 227
৫৭. ২রা এপ্রিল ১৯৭১-এ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানকে লেখা প্রেসিডেন্ট নিকোলাই পদগোরনির চিঠি। সূত্র: *বাংলাদেশ ডকুমেন্টস*, পৃ. ৫১০-১১।
৫৮. *New York Times,* 15 March, 1961.
৫৯. *New York Times,* 24 October, 1961.
৬০. "We should not only defuse but also try to normalise relations with China. However, normalisation does not depend on one party alone. There has to be a mutual normalisation. If and when the Government of the People's Republic of China will be willing and ready to take concrete steps towards normalisation we should be equally willing and ready to do so. It must, however, be clearly understood that normalisation can take place only on the basis of mutual respect of each other's integrity and soverèignty and on the principle of non-interference in the internal affairs. We welcome the change in the style of Chinese diplomacy which has been in evidence of late and we hope that it will also lead to a change in substance." *Lok Sabha*, 20 July 1972.
৬১. *দি মেইল*, ২৮শে আগস্ট, ১৯৭১
৬২. *The Indian Express*, New Delhi, 20 October, 1971
৬৩. *সানডে টাইমস*, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৭১
৬৪. Mohon Ram, *op.cit.*, p. 221
৬৫. "The Soviet Union, in other words, came close to giving Mrs. Gandhi a blank check." Henry Kissenger, *White House Years*, Boston: Little, Brown And Company, 1979, p. 874

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৬৬. "India's opportunity to humilate Pakistan was also Soviet Union's opportunity to humilate China." Henry Kissenger, *White House Years*, *op.cit.*, p. 875

৬৭. "On October 5, the Senate Foreign Relations committee voted to suspend all US economic and military aid to Pakistan. Many Senators were clamoring for tougher measures still." Henry Kissenger, *Ibid*, p. 875.

৬৮. *Pavda*, 2 December, 1953

৬৯. *Pavda*, 26 January, 1955

৭০. "different social structures can exist side lye side in peace and concord are work to the common good." *New Times*, 28, September 1955. Edited by Gilles Boquerón & Frederic Grare India, *India, China, Russia Intricacies of an Asian Triangle*, New Delhi: Research Press, 2004.

৭১. "We are absolutely convinced that when passion have calmed down and the people realise the significance of such artificial division of dis they will regret it." *Pavda*, 11 December, 1955

৭২. *Pavda*, 30 December, 1955

৭৩. *New Times*, 26 September 1950, pp. 36-37

৭৪. *Pavda*, 1 November 1959

৭৫. *Pavda*, 21 June, 1960

৭৬. *Himetes, conversation between Mao*' Zedong and Ambassador Yudin, 22 July 1958, p. 17

৭৭. "The East Wind is now Stronger Than the West Wind".

৭৮. Mr. Subimal Dutt, Indian Foreign Secretary, about Nehru's views about the failure of the Sumit Conference, United Kingdom High Commissioner in India to the Commonwealth Relations Officer, 27 May 1960, *Public Record Office*, FO 371 152540.

৭৯. Edited by Gilles Boquerón & Frederic Grare India, *op.cit.*, p.19.

৮০. 'No fit into maxist ideology' এবং 'How a primitive it is to estate a state on the basis of religion' *The Evolution of Russia's Paistan polies*, New Delhi: a paper presented by Vigay Sen, Buahvaj at a Seninan on satiation held under the auspiees of the Nehru Museum, 21 November, 1969.

৮১. 'as Liaquat Ah. Khan's servile Zeal." *New Times*, no.28, 12 July 1950, pp. 19-20.

৮২. "in foreign policy the task of pan-Islamism is to mask the Pakistan government's reactionary policy scraping together an anti-Soviet block among the Muslim countries of near Middle East. By Pan-Islamic Slogans and demagogy the common interest of all Muslims in the world, the Muslim League is trying to conceal the dependence of Polluting present policy on British American diktats and to veil Pakistan's role as the bighead of the Anglo-American block." *Cited is canval Asia Review*, Vol. 54, no. 7. 1957, pp. 166-69.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৮৩. "Landowners represented the largest single group in the Muslim League Council (1942)- out of 503, 163 were landowners, followed by lawyers. about 145. Jinnah often addressed meetings of Memon merehants and Chambers of Commerce and they were his principal supporters." See Khalid Bin Sayeed, *The Political System of Pakistan,* London: Oxford University Press, 1967, pp. 51-55.

৮৪. "People in developing countries seek assistance, but no the basis of nutual respect; they want to have friends not masters." Mohammad Ayub Khan, *Friends not Masters,* Dacca: Oxford University Press, p. 159.

৮৫. *Pakistan Yearbook,* 1969 (Dacca, 1969), p. 128.

৮৬. Hasan Zaheer, *The Separation Of East Pakistan The Rise Aand Realization Of Bengali Muslim Nationalism*, Dhaka: The University Press Limited, 1998, pp. 304-305.

৮৭. 'a new devlopment of some significance', Zubeida Musfata, *'USSR and Indian Action in East Pakistan Horzion'*, vol. xxiv, no. 4, 72.

৮৮. Zubeida Musfata, *op.cit.*

৮৯. সিরিল পিকার্ডের রিপোর্ট: পাকিস্তান পলিটিক্যাল ক্রাইসিস, ফরেন অ্যান্ড কমনওয়েলথ অফিস, সাউথ এশিয়ান ডিপার্টমেন্ট।

৯০. "Haksar (Indian Foreign Secretary), when I saw him this evening, said Farman Ali's cease-fire initiative which had been transmitted through Henry Kissinger to Secretary General (of the UN), had been disowned in New York by Aga Shahi (Pakistan Ambassador to the UN). It was a typical 'soldier's draft' and was full of absurdities: but represented a first move".- Telegram from the British High Commissioner in New Delhi to the British Foreign and Commonwealth Office, dated 11 December, 1971.

৯১. '৬২ সনে কেনেডির সঙ্গে চুক্তিতে বলা হয়েছে, ভারত পাকিস্তান আক্রমণ করলে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের পক্ষ নেবে।

৯২. According to Press, in a understanding formally reached between Acting President of Bangladesh, Nazrul Islam and Mrs. Gandhi, India has officered assistance to Bangladesh Government for reconstruction and restoration of normalcy after liberation. Indian army and Mukti-Bahini will work under unified command over which commander of Indian forces will have full operational command. Agreement has taken into account necessity for Indian army and security forces to be in Bangladesh until normalcy is restored.
- Telegram from the British High Commissioner in New Delhi to the British Foreign and Commonwealth Office, dated 11 December, 1971.

৯৩. ব্রুস ডগলাস ম্যান, এম.পি। ব্রিটিশ কমনসভার কার্যবিবরণী, ১৪ই মে, ১৯৭১। ।

৯৪. এম.পি. ব্রুস ডগলাস ম্যান মন্তব্য করেন; হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র* : ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ১৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৯৫. *সিক্রেট ডকুমেন্টস্*

৯৬. 'The west Pakistan-China border was demarcated in 1963'.*Pakistan-China Boundary agreement*, Korachi: Government of Pakistan, August 1963.

৯৭. Mohammad Ayub Khan, *Friends Not Master*, p. 114.

৯৮. Leo E. Rose, *U.S. Pakistan Forum Relation with the Major Powers*, p. 118.

৯৯. "পাকিস্তান ভারতের সমঝোতা মোতাবেক পাকিস্তানের প্রাপ্য ১৭.৫% অ্যাসেড। ৪০টি অডিন্যান্স দেবার মতো ৫টি মাত্র পাকিস্তানি সীমানার মধ্যে অবস্থিত ছিল। ৪২০০০ সেনা, নৌ, বিমান বাহিনীর মধ্যে পাকিস্তান দেড় লক্ষ লোকবল প্রাপ্ত হয়। ভারত যেখানে সাত স্কোয়াড্রন যুদ্ধবিমান পেয়েছে সে তুলনায় পাকিস্তান পেয়েছে দুই স্কোয়াটন যুদ্ধবিমান। ভারত যেক্ষেত্রে পেয়েছে ৪৮টি রয়েল ইন্ডিয়ান নেভি পাকিস্তান সেখানে পেয়েছে ৮টি মাত্র। (Khan, *Friends not master*, p. 434)। সামরিক দিক থেকে পাকিস্তান ৪০টি আর্মাড রেজিমেন্টের মধ্যে মাত্র ৬টি, ৪০ আর্টিলারির মধ্যে ৮টি এবং পদাতিক ২১টি ইউনিটের মধ্যে পাকিস্তান মাত্র ৮টি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে দেশবিভাগের নীতিমালা অনুসারে ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ আর্মি থেকে প্রাপ্তির অনুপাত ছিল ৩৯.৬১। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান পেয়েছে ৩০ ভাগ। (বেনজির ভুট্টো, পৃ. ১৬৬)। ভারত বিভাগের চুক্তি অনুসারে ১ লক্ষ ৬৫ হাজার টন প্রতিরক্ষা stores এর মধ্যে ৪ হাজার সাতশত তিন টন ৩১ মার্চ পাকিস্তানের ডেলিভারি দেওয়া হয়। একশত পঞ্চাশটি শেরমান ট্যাঙ্ক একটিও পাকিস্তানকে দেওয়া হয়নি।" K. Sarwar Hossain, *Pakistan Relation with India 1974-66*, pp. 61-62.

১০০. Office of Intelligence Research, Department of State, Intelligence Report no. 7706, May 15, 1958, in Jain, ed., *U.S.-South Asian Relations*, p. 15, quoated from Leo E. Rose, *op.cit.*, p. 121.

১০১. Henry Kissinger, *The White House Years, op.cit.*, pp. 684-732, 889-918.

১০২. *Ibid*, pp. 816-63. For a proposed corrective and dissent on ceratain Kissinger recollections, see Christoper Van Hollen, "The Tilt Policy Revisited: Nixon-Kissinger, Geopolitics, and South Asia," *Asian Survey* 20(4) (April 1980): 339-61. And in his fourth Foreign policy report released on May 3, 1973, President Nixon observed that "we did not dispute the aspirations of the poeple of East Bengal for autonomy.....we opposed not independence but the outbreak of international war"; quoted in Mehrunnisa Ali, "Pakistan-United States Relations: The Recent Phase: *Pakistan Horizon*, Karachi: 31(2-3) (1978:32.).

১০৩. লরেন্স লিফসুলৎসের প্রতিবেদন অনুসরণে *মুজিব হত্যা চক্রান্ত*, আশফাক আলম স্বপন, ঢাকা: ত্রিধারা প্রকাশন, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, পৃ. ৯২-৯৩।

১০৪. মুজিব বাহিনীর অন্যতম সংগঠক আবদুর রাজ্জাক মাত্র নয় মাসে বাংলাদেশ স্বাধীনতার প্রশ্নে ভিন্নমত প্রকাশ করেছেন। তার মত ছিল 'লোহাকে তাতিয়ে ইস্পাত বানাতে পারলাম না।'

১০৫. জহিরুল কাইয়ুম বলেন, ভারতের দাসত্বের বদলে পাকিস্তানে থাকাই শ্রেয়।

১০৬. যুক্তরাষ্ট্রে সরকারি সংস্থা ছাড়াও পররাষ্ট্রনীতি গবেষণার জন্য প্রতিষ্ঠিত একটি সংস্থা হলো Carnegie Endowment। এর গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনা হলো ত্রৈমাসিক ফরেন পলিসি। কার্নেগির গবেষকদের কাছে ওয়াশিংটন পোস্ট-এর পররাষ্ট্র বিষয়ক সম্পাদক রোনাল্ড কোভেন এরূপ মন্তব্য করেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১০৭. "Dissent Telegram' from Archer Kent Blood was received by the State Department in Washington." Dhaka: 6 April, 1971.

১০৮. *Asian Recorder*, 14-20 May, 1971.

১০৯. এডোয়ার্ড কেনেডী ছিলেন ডেমোক্রেটিক পার্টির ও বি. সেক্সবে ছিলেন রিপাবলিকার্ন পার্টির সিনেটর। *Asian Recorder*, 14-20 May, 1971.

১১০. লরেন্স লিফসুলৎসের প্রতিবেদন অনুবাদ, *মুজিব হত্যা চক্রান্ত*, আশফাক আলম স্বপন, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৪-১০০।

১১১. "Nixson declared, "She is going to pay," and he and kissinger drowned each other out in professions of determination to punish her", Robert Dallek, *Nixson And Kissinger Partners In Power,* New Yourk: Allen Lane Penguin Books Ltd, Penguin Group (USA) Inc..,375, Hudson Street, New Yourk 10014, USA, p. 343.

১১২. "We are not anti-Indian, we're not anti-Pakistan. We are anti-agression", Robert Dallek, *op.cit.*, p. 343.

১১৩. "When Nixon met with French President Georges Pompidou the next day in the Azores, he reflected on the 'sober, somber fact' that a nuclear war could kill 70 million Americans and 70 million Russians. 'It is essential,' he told Pompiodou, "that the two nations pursue the negotiating track rather than the confornation track. We have impressed this on the Soviets with regard to Southern Asia in the last 24 hours", Robert Dallek, *op.cit.*, p. 343.

১১৪. এ কথা দ্বারা চীন বাংলাদেশের মুক্তিযোদ্ধাদের বা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে জনশক্তির প্রতি ইঙ্গিত করেনি। বরং এ কথার দ্বারা তারা বুঝাতে চেয়েছে বাংলাদেশের চীনপন্থি যে সমস্ত দল, উপদল সশস্ত্র সংগ্রাম করছে এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত সে সমস্ত জনগণ তাদের কথা বলা হয়েছে।

১১৫. Documents 274, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Vol. XI, South Asia Crisis, 1971.*

১১৬. জেনারেল রাও ফরমান আলী প্রেরিত বার্তা যেটি ইয়াহিয়া খান প্রস্তাব করেছেন।

১১৭. Documents 275, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১১৮. Documents 277, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১১৯. Documents 278, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১২০. Documents 279, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১২১. Documents 280, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১২২. লরেন্স লিফসুলৎসের প্রতিবেদন অনুসরণে *মুজিব হত্যা চক্রান্ত*, আশফাক আলম স্বপন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০২

১২৩. রজার মরিস এর সাক্ষাৎকার, *Uncertain Greatness : Henry Kissinger And American Foreign Policy* গ্রন্থের রচয়িতা।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৫৪. "He wants it to tile twoards Pakistan." Documents 217 and 218, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৫৫. "Yahya Khan was, on his knees pleading, "for God's sake don't hinder or impede the delivery of equipment from friendly third countries." Documents 222, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৫৬. জন সেলি, স্পেশাল কনসালটেন্ট প্রেসিডেন্ট।

১৫৭. Documents 225, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৫৮. "One such excerpt was from a 26 January 1962, latter from President Kennedy to President Ayub, reads as follows; "As a firm ally, Pakistan is entitled to the re-affirmation you have requsted of the prior assuances given by the United States to Pakistan on the subject of agression against Pakistan. My Government certainly stands by these assuranes." Documents 218, American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.

১৫৯. Documents 226, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬০. 'It we collapse now, I admit it's not a brilliant position, but if we collapse now, the Soviets won' respect us for it; the Chinese will despise us and the other countries will draw their conclusions.' Documents 228, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৬১. "The problem – I know it will always be put on the ground that we want to save the China trip but these people don't recognize that without a China trip, we wouldn't have had a Moscow trip", Documents 229, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬২. Documents 230, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬৩. Documents 232, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬৪. Zumwalt, Admiral Elmo R., Chief of Naval Operations.

১৬৫. Documents 234 and 235, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৬৬. Documents 236, *Ibid, op.cit.*

১৬৭. "In this sense U.S. politicies failed in South Asia.....", Documents 237, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬৮. "The confilict was obviously the result of a carefully worked out plan designed by the Indians some time ago." Documents 237, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৬৯. Documents 237, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭০. Documents 239, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৭১. Documents 241, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭২. Documents 245, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৭৩. "Should India succeed in objective the loss of East Pakistan with a population of 70 million people dominated by Russia will also be a threat to the security of South Asia. It will bring under Soviet domination the region of Assam, Burma, Thailand and Malaysia." Documents 242, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭৪. Documents 243, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭৫. Documents 244, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭৬. 'noose is obviously getting tighter.', Jaswant Singh, Major General S.P. Bhatia, *Conflict & Diplomacy, US and The Birth of Bangladesh Pakistan Divides,* New Delhi: Rupa co., 2008, p. 84.

১৭৭. Documents 251, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৭৮. "In general I belive that a favourable element, from the viewpoint of prospects in the struggle for ending the conflict, is that there is no confrontation here of our two powers." Documents 253, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৭৯. Documents 253, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮০. Documents 254, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮১. Documents 255, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮২. "we should move the helicopter ship...and some escort into the Bay of Bengal" **ostensibly** to evacuate U.S. citizens", Documents 256, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮৩. Documents 256, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৮৪. Documents 257, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮৫. Documents 263, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮৬. "our desire is to save West Pakistan." Ref. Documents 266, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৮৭. Documents 266, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৮৮. Documents 267, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৮৯. Documents 281, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৯০. Documents 281, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯১. Documents 282, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯২. Documents 283, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৩. Documents 286, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৪. "This will give you a chance to send instructions to your people and we will be working with the Pakistanis. We had no choice. We had to make our position clear." Documents 287, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৫. "we will work it out in a sprit so there are no winners or losers." Documents 288, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৬. Documents 289, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

১৯৭. Documents '291, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৮. "calls upon the GOP to take effective action towards a political settlement in East Pakistan, giving immediate recognition to the will of the East Pak population within the framework of one Pakistan." Documents 292, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

১৯৯. Documents 293, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

২০০. "Dacca under heavy pressure. Rebels have already surrounded the city. Inidans also advancing Situation serious promised assistance must take practical shape by 14 December. Will be effective in Silliguri not NEFA and by engaging enemy air bases." লে. জেনারেল জে. এফ. আর. জেকব, *Surender at Dhaka, একটি জাতির জন্য*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৯, পৃ. ১০৮।

২০১. লে. জেনারেল জে. এফ. আর. জেকব, *সারেন্ডার অ্যাট ঢাকা একটি জাতির জন্ম*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিঃ, ১৯৯৯, পৃ. ১৩৭।

২০২. লে. জেনারেল জে এফ আর জেকব, *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১০৯।

২০৩. "You have fought a heroic battle against overwhelming odds. The nation is proud of you and the world full of admiration. I have done all that is humanly

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

possible to find an acceptable solution to the problem. You have now reached a stage where further resistance is no longer humanly possible nor will it server any useful purpose. It will only lead to a further loss of life and destruction. You should now take all necessary measures to stop the fighting and preserve the lives of armed forces personnel, all those from West Pakistan, and all loyal elements. Meanwhile I have moved the UN to urge India to stop hostilities in East Pakistan forthwith and to guarantee the safety of armed forces and all other people who may be the likely targets of miscreants."

২০৪. The Consul-General, instead of passing the message to the Indians, sent it to Washington.

২০৫. Hasan Zaheer, *op.cit.*

২০৬. প্রতক্ষ্যদর্শী হিসেবে লে. জেনারেল জে. এফ. আর. জেকভ তার গ্রন্থে লিখেছেন, ফরমান আলী ভারতীয় বাংলাদেশীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে অস্বীকৃতি জানান। লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. এফ. আর. জেকব, *Surender at Dhaka একটি জাতির জন্য*, আনিসুর রহমান মাহমুদ অনূদিত, ঢাকা: ইউনিভারর্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ১১৬।

২০৭. লেফটেন্যান্ট জেনারেল জে. এফ. আর. জেকব, *Surender at Dhaka একটি জাতির জন্য*, আনিসুর রহমান মাহমুদ অনূদিত, ঢাকা: ইউনিভারর্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯, পৃ. ১০৮-১১৩।

২০৮. I have been informed by Government Malik and General Farman Ali that President Yahya Khan Strongly desires to put a end to hostilities in EP (East Pakistan). For this purpose he wishes to arrange with the Indian Government an immediate cease-fire period of at least two hours in which discussions for this purpose can take place between the military commanders concerned. The President desires honorable conditions for Pakistani troop's protection of civilians. Spivack" Documents 307, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op.cit.*

২০৯. Documents 308, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

২১০. "I have this whole file of intelligence reports which makes it unmistakably clear that the Indian stratgy was to knock over West Pakistan." Documents 309, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

২১১. Documents 309, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

২১২. Documents 310, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, Ibid.*

২১৩. "Dear Mr Chairman:

Now that the military conflict in East Pakistan appears to be moving to a conclusion, the most challenging task to both our countries, as great and responsible power, is to see to it that the bloodshed should promptly end that fighting does not continue in the West.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Although the United Nations has been seized with this difficult problem, efforts in that body have so far not resulted in progress, partly because of the difficulties of resolving political issues. It is not therefore urgently desirable that our two countries should take prompt and responsible steps to ensure that the military conflict does not spread and that assurances be given against territorial acquisition by either side? I know that you will agree with me that when this has been successfully accomplished that dark cloud that now hangs over the international situation as a whole will have been substantially lightened. I hope therefore that we can cooperate to achieve an end to all the fighting, to remove the concern that the war will become one of conquest, and to eliminate the thereat to peace that has arisen. This would, of course, not prejudice anybody's position with respect to an ultimate political solution.

I believe, that efforts in the above direction must continue to be vigorously pursued.

Sincerely,"Documents 312, *American Secret Documents Foreign Relations, 1969-1976, op,cit.*

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নবম অধ্যায়

উপসংহার

বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম প্রকৃত অর্থে ছিল একটি জনযুদ্ধ। জনগণ 'যার যা আছে তাই নিয়ে' পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রাম গড়ে তোলে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হাজার বছরের শাসিত-শোষিত, বঞ্চিত বাঙালি জাতির মুক্তির লক্ষ্যে গণসংগ্রাম গড়ে তোলেন। ১৯৪৭ সালে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক এমন একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয় যার দুই অংশের দূরত্ব প্রায় দুই হাজার মাইল, যা বিশাল ভারত রাষ্ট্রদ্বারা বিচ্ছিন্ন। পাকিস্তানের এই দুই অংশের মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্ব যতটা না বেশি, তার চেয়ে বেশি ছিল সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক চেতনার পার্থক্য। একমাত্র সেতুবন্ধন ধর্ম। অবিভক্ত ভারতে ইংরেজ এবং হিন্দু ভূস্বামীদের নিকট মুসলিম সম্প্রদায় শোষিত, অবহেলিত, বঞ্চিত। হিন্দু উচ্চ বর্ণের ব্যক্তিকগোষ্ঠী, সামাজিক অসম আচরণের ফলে এবং সর্বোপরি অবহেলা ও শোষণের ফলে মুসলিম সম্প্রদায় হিন্দু সম্প্রদায়ের হাত থেকে মুক্তির লক্ষ্যে দ্বি-জাতিতত্ত্বকে গ্রহণ করে, যেখানে ধর্মীয় উন্মাদনা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে পূর্ববঙ্গের মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দেয় এবং যথারীতি পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর পূর্ববঙ্গের জনগণ উপলব্ধি করে যে প্রকৃত অর্থে তারা স্বাধীন হয়নি। শুধু প্রভু বদল হয়েছে। ইংরেজ ও হিন্দুদের পরিবর্তে রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী আরো নগ্নভাবে পূর্ববঙ্গের জনগণকে ধর্মের নামে শাসন-শোষণ, অত্যাচার ও নিপীড়ন শুরু করে। যে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান গঠিত হয়েছিল, সে ধর্ম বা ইসলামকে নিয়ে পাকিস্তান শাসন ও শোষণের মাত্রা তীব্র হয়। এমনকি জনগণের মুখের বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়ার ষড়যন্ত্রে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার প্রয়াস নেওয়া হয়। পূর্ববঙ্গের জনগণ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ সেহেতু স্বাভাবিক কারণে মুখের ভাষা বাংলা রাষ্ট্র ভাষা হওয়ার কথা। কিন্তু বাংলা ভাষার পরিবর্তে উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার চক্রান্ত বাঙালি জাতিসত্তায় প্রচণ্ড আঘাত আসে। বাঙালির আত্মপরিচয়ের অন্বেষায় নতুনভাবে উপলব্ধি করে পাকিস্তান এক রাষ্ট্র হলেও এক জাতি নয়। বাঙালি ভিন্ন জাতি। এভাবে জাতিসত্তার বিকাশের ধারায় শাসন-শোষণ বিষয়টি সামনে চলে আসে এবং পাকিস্তানি শাসকদের বিরুদ্ধে বাঙালি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। এর প্রথম ফলাফল ১৯৫৪ সালের যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন। যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধর্মীয় বন্ধনকে ছিন্ন করে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে বাঙালি জাতির নতুন অভিযাত্রা শুরু হয়। এরপর স্বাধিকার ও স্বায়ত্তশাসনের আন্দোলন তীব্র হয়ে উঠে। ১৯৫২-৫৪ কালপর্বে জাতিসত্তা বিকাশ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি উপস্থাপিত হয়। ১৯৬৪ সালের পর হতে ঐ দাবি আদায়ে সংগ্রাম ও লড়াই শুরু হয়।

এই সময় পাকিস্তান শাসকচক্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সিয়াটো-সেন্টো চুক্তিতে আবদ্ধ হয় এবং পশ্চিম পাকিস্তানের পেশোয়ারে মার্কিন সামরিক ঘাঁটি নির্মাণের অনুমতি দেয়। সেখান থেকে সোভিয়েত রাশিয়া ইউ-২ গোয়েন্দা বিমানের মাধ্যমে কার্যক্রম চালানোর এক পর্যায়ে সোভিয়েত রাশিয়া গোয়েন্দা বিমানকে ভূপাতিত করে। পাকিস্তানের সঙ্গে সোভিয়েতের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। পাশাপাশি পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ব্যাপকভাবে সামরিক অস্ত্রাদি প্রেরণ করে। দেশের অভ্যন্তরে স্বায়ত্তশাসনের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো নিজেদের অধিকারসমূহ আদায় করতে গিয়ে বিভিন্ন পর্যায়ে যে আন্দোলন, চক্রান্ত ও নিষ্ঠুর বৈষম্যের নগ্ন চিত্র দৃশ্যমান হয় তারই আলোকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশের একটি বিশেষ পর্যায়ে উন্নীত হয়। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্বার্থ রক্ষায় পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারির মাধ্যমে জেনারেল আইয়ুব খান রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করেন। গণতন্ত্র নির্বাসিত হয়। নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়। সামরিক শাসনের একটি পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক চাপে আইয়ুব খান মৌলিক গণতন্ত্র প্রবর্তন করে। মৌলিক গণতন্ত্র না ছিল মৌলিক, না ছিল গণতন্ত্র। দেশে এই তথাকথিত মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু হয়। এই আন্দোলন দমনের জন্য ১৯৬৫ সালে আইয়ুব খান কাশ্মীর ইস্যুতে ভারত আক্রমণ করে। সেক্ষেত্রে চীন ব্যাপকভাবে পাকিস্তানকে সাহায্য করে।

এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র ভারতের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে। শেষপর্যন্ত সোভিয়েতের মধ্যস্থতায় তাসখণ্ড চুক্তির মাধ্যমে এই যুদ্ধের অবসান হয়। তাসখণ্ড চুক্তির ফলে পাকিস্তানে প্রচণ্ড গণআন্দোলন শুরু হয়। এই বাস্তব অবস্থা বিবেচনা করে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি পেশ করেন। যা ছিল বাঙালির মুক্তির সনদ। শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিটি এলাকা সফর করে জনগণের মধ্যে ছয় দফা ছড়িয়ে দেন। ছয় দফার ভিত্তিতে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করেন। পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাঙালি জাতির এই নব আত্ম-উপলব্ধিকে ধ্বংস করার জন্য আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় শেখ মুজিবকে ফাঁসি দেওয়ার চক্রান্ত করে। কিন্তু বাঙালি জাতি উপলব্ধি করে যে, শেখ মুজিব ছয় দফার মাধ্যমে যে দাবিগুলো উত্থাপন করেছেন তা হলো তাদের বাঁচার দাবি। ১৯৬৯ সালে প্রচণ্ড গণ আন্দোলনে আইয়ুব খান দিশেহারা হয়ে গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করে। কিন্তু শেখ মুজিব ব্যতীত কোনো দলই গোলটেবিল বৈঠকে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে না বলে আইয়ুব খানকে জানিয়ে দেয়। বাধ্য হয়ে আইয়ুব খান শেখ মুজিবকে কারাগার থেকে মুক্তি দেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বাংলার জনগণ সংগ্রামী এই নেতাকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধিতে ভূষিত করে। আইয়ুব খান আহুত গোলটেবিল বৈঠকে বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দাবি পুনরায় পেশ করলে আলোচনা ভেঙে যায়। গণ আন্দোলন তীব্রতর হয়। ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় আসেন। তিনি চীন, সোভিয়েত রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে আইয়ুব খানের আমলে যে কূটনৈতিক বন্ধন দৃঢ় হচ্ছিলো ইয়াহিয়া খানও আইয়ুব অনুসৃত কূটনৈতিক ধারায় অগ্রসর হন। তিনি পাকিস্তানে প্রথমবারের মতো সাধারণ নির্বাচন ঘোষণা করেন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তানি সামরিক-বেসামরিক চক্র জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অনীহা প্রকাশ করে। বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে শুরু হয় ব্যাপক অসহযোগ আন্দোলন। আন্দোলন এমন এক পর্যায়ে উন্নীত হয়, যে পর্যায়ে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শক্তি দেখতে পায় পূর্ব পাকিস্তান দ্রুত স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ছে। এ পর্যায়ে ১৯৭১ সালে নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র ফেব্রুয়ারি মাসে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে স্পষ্ট করে জানিয়ে দেয় যে, অখণ্ড পাকিস্তান রাষ্ট্রীয় কাঠামোর মধ্যেই তাকে সমাধান খুঁজে পেতে হবে। পাকিস্তান ভাঙন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন করে না। অসহযোগ আন্দোলন তীব্রতর হলে ইয়াহিয়া খান বাংলাদেশে এসে বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। গবেষক মাত্রই লক্ষ্য করবেন এই আলোচনাকে সামনে রেখে ইয়াহিয়া খানের উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপকভাবে সৈন্য মোতায়েন করা। আলোচনা একপর্যায়ে ভেঙে যায়। ইয়াহিয়া খান আন্দোলন দমনের জন্য সেনাবাহিনীকে নির্দেশ দেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী হত্যা, খুন, ধর্ষণ, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের এক বিভীষিকা সৃষ্টি করে। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তাকে বন্দি করা হয়। হাজার হাজার ছিন্নমূল মানুষ রিক্ত-নিঃস্ব হয়ে জীবনের নিরাপত্তার আশায় প্রতিবেশী দেশ ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করে। বাংলাদেশের প্রতিটি জেলায়-থানায়-গ্রাম-প্রত্যন্ত অঞ্চলে গড়ে উঠে প্রতিরোধের দুর্বার প্রত্যয়। জনগণ মুক্তি ও স্বাধীনতার সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়ে। শুরু হয় জনযুদ্ধ।

নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ ও অগণিত শরণার্থী ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। ৪ঠা এপ্রিল তাজউদ্দীন আহমদ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সরকার গঠনের কথা জানান। ভারত এসময় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনার জন্য গঠিত সরকারকে ভারতে থাকার এবং সেখান থেকে কার্যক্রম চালানোর অনুমতি প্রদান করে। একইসাথে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষিত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। মুক্তিযুদ্ধ প্রচারের জন্য একটি মিডিয়াওয়েভ বেতার যন্ত্র প্রদান করে। ১০ই এপ্রিল আনুষ্ঠানিকভাবে সরকার গঠিত হয়। ১৭ই এপ্রিল কুষ্টিয়া জেলার মেহেরপুর মহকুমার বৈদ্যনাথতলায় এই সরকার শপথ গ্রহণ করেন। প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমেদ বৈদ্যনাথতলার নামকরণ করেন মুজিবনগর সরকার। প্রজাতন্ত্রের নাম গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নামে মুজিবনগর সরকার তার কার্যক্রম পরিচালনা করেন।

সরকার গঠনের পর গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কূটনৈতিক সম্পর্ক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্থাপনের জন্য ২৪শে এপ্রিল অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভারতের রাষ্ট্রপতি বরাবর একটি পত্র প্রেরণ করেন। এখানে উল্লেখ করার বিষয় এই যে, প্রেরিত পত্রে প্রধানমন্ত্রীর অনুস্বাক্ষর না থাকলেও পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাকের স্বাক্ষর দৃষ্ট হয়। এর থেকে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠনে জটিলতার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য পরবর্তী অন্যসব পত্রে প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর যুক্ত স্বাক্ষরে অথবা প্রধানমন্ত্রীর একাকী স্বাক্ষরে ভারতের সঙ্গে পত্র যোগাযোগ করেন। এর থেকে সরকার গঠনের জটিলতা নিরসনে প্রথমে খন্দকার মোশতাকের 'ক্রোধ' হ্রাসের লক্ষ্যে সম্ভবত কৌশলগত কারনে অস্থায়ী প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী এই পন্থা গ্রহণ করেছিলেন। মুজিবনগর সরকার গঠনে যে জটিলতা পরিদৃষ্ট হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে তা আরো দৃঢ় হয়। খন্দকার মোশতাক পূর্ণ স্বাধীনতার পরিবর্তে অখণ্ড পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় একটি কনফেডারেশন গঠনের ভাবনা নিয়ে অগ্রসর হন এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এই বিষয়ে তিনি ও তার বলয়ের ব্যক্তিবর্গ অন্তত তের বার যোগাযোগ করেন। যুক্তরাষ্ট্রের নীতি হলো অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় সমাধান খুঁজে পেতে হবে। মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্ট ও গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে তার এই গোপন যোগাযোগ প্রকাশিত হয়ে পড়লে তাকে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে সরিয়ে না দিলেও মূলত অকার্যকর করে রাখা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় ও নীতি অখণ্ড পাকিস্তানের আওতায় বাংলাদেশ সমস্যা সমাধানের ব্যাপারে যে জটিলতা সৃষ্টি হয়েছিল এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্যাবিনেটে যেমন, তেমনি গণপ্রতিনিধির ভিতরেও যে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়েছিল তা অস্বীকার করা যাবে না। কিন্তু অধিকাংশ গণপ্রতিনিধি রণাঙ্গন ও জোনাল কাউন্সিলের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে অর্থাৎ মুক্তিযুদ্ধে সক্রিয় থাকায় এই ষড়যন্ত্র ফলপ্রসূ হতে পারেনি। বিশেষকরে জুলাই মাসে শিলিগুড়ির বাগডোগরায় অনুষ্ঠিত অনানুষ্ঠানিক গণপরিষদের সভায় সর্বসম্মতিক্রমে পূর্ণ স্বাধীনতার অর্জনের শপথের মাধ্যমে এই ষড়যন্ত্র স্থিমিত হয়ে যায় এবং সেপ্টেম্বরের শেষের দিকে কলকাতা থেকে যুক্তরাষ্ট্র কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব থেকে তাদের হাত গুটিয়ে নেয়।

মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক প্রচেষ্টা ছিল: এক, স্বাধীন বাংলাদেশের স্বীকৃতি; দুই, বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের মুক্তি; এবং তিন, শরণার্থী প্রত্যাবর্তন। এই তিনটি মূল বিষয়ের একত্রিত যোগফলের সঙ্গে উল্ল্যেখযোগ্য দিক ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের প্রশিক্ষণ এবং গেরিলা যুদ্ধ জোরদার ও স্বাধীনতা অর্জন। মুজিবনগর সরকার রণাঙ্গণের যুদ্ধের পাশাপাশি বিশ্ব-কূটনৈতিক তৎপরতা জোরদার করেন। মুজিবনগর সরকারের পক্ষ হতে বিদেশে বাংলাদেশের পরিস্থিতি ও স্বীকৃতি আদায়ে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দল প্রেরণ করেন। একইসাথে যেসমস্ত পেশাদার কূটনীতিক পাকিস্তানে চাকরিরত ছিলেন তাদের পাকিস্তান পক্ষ ত্যাগ করে বাংলাদেশের আনুগত্য গ্রহণে উদ্বুদ্ধ করেন এবং সফলতা অর্জন করে। আন্তর্জাতিক কূটনৈতিক ক্ষেত্রে এটি ছিল পাকিস্তানের মুখে চপেটাঘাত। এছাড়া প্রবাসী বাঙালিরা প্রতি মুহূর্তে বাংলাদেশের রক্তাক্ত চিত্র, স্বাধীনতা ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা তুলে ধরে বিশ্বপরিসরে মুক্তির বার্তা ছড়িয়ে দেন। বিভিন্ন রাষ্ট্র ও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে সহমর্মিতা আদায় করেন। গণমাধ্যমে সংবাদ প্রেরণ করে বিশ্বজনমতকে পক্ষে আনেন। মুজিবনগর সরকারের সমরনীতি ছিল দ্রুত সময়ে বিজয় অর্জন। পাকিস্তানি সেনাদের আঘাত করা এবং তাদের অবরুদ্ধ করা।

ভারতীয় পত্রপত্রিকা, গণমাধ্যম, লোকসভার বিতর্ক এবং জনগণের আবেগের পরিমাপে যেকোনো গবেষকমাত্রই দেখতে পাবেন যে, বাংলাদেশকে স্বীকৃতির ব্যাপারে ভারতের সরকার, বিরোধীদল কিংবা জনগণ কারো বিরোধীতা ছিল না। বরং অবিলম্বে বাংলাদেশে সরাসরি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করে বাংলাদেশকে মুক্ত করার আকাঙ্ক্ষাই প্রতিনিয়ত প্রতিফলিত ও উচ্চরিত হয়েছে নানা মাত্রিকতায়। প্রথমদিকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী সরাসরি সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ সংকট নিরসন করতে চাইলেও তার বিজ্ঞ উপদেষ্টামণ্ডলী বা ইনার সার্কেলের পরামর্শে তিনি তার মত পরিবর্তন করে কূটনৈতিক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হন। তাকে পরিষ্কারভাবে একথা বলা হয়েছিল যে, কূটনৈতিক যুদ্ধে বিজয়ী না হলে সামরিক যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া এবং সেই বিজয়কে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত করা দুঃসাধ্য হয়ে পড়বে। সেজন্য ভারত বিশ্বপরিসরে ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করে। ভারতের কূটনৈতিক কৌশল ছিলো– ক. শরণার্থী সমস্যাকে মানবিক সমস্যা এবং স্মরণতম ইতিহাসে ভয়াবহ মানবিক ট্রাজেডি হিসেবে বিশ্বপরিসরে তুলে ধরা; খ. শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধান যুক্ত করা; গ. বাংলাদেশ সংকট নিরসনে রাজনৈতিক সমাধানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করা হয় বন্দি শেখ মুজিবের মুক্তি; এবং ঘ. শরণার্থীরা তাদের নিরাপত্তা, সম্মান ও মর্যাদার সঙ্গে স্বদেশ প্রত্যাবর্তন বিষয়টিকে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর বিশেষকরে শেখ মুজিবের মুক্তির সাথে সম্পর্কিত করা। শরণার্থী সমস্যার ক্ষেত্রে ভারত এপ্রিল মাসেই জাতিসংঘ মহাসচিব বরাবর পত্র প্রেরণ করে ভারতে আশ্রিত ছিন্নমূল, অসহায়, বিপর্যস্ত, অত্যাচারিত মানবিক দিকটি সার্থকভাবে তুলে ধরে। পূর্ব পাকিস্তান থেকে ২৫শে মার্চ আর্মি ক্রাকডাউনের পর বহিষ্কৃত বিদেশি সাংবাদিকদের কেন্দ্রস্থল হয়ে উঠে দিল্লি, কলকাতা ও আগরতলা। রণাঙ্গন থেকে যুদ্ধ সংবাদ সংগ্রহ, দুর্দশাগ্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের আর্তনাদ ও বিভীষিকাময় পরিস্থিতির রিপোর্ট, প্রতিবেদন এবং পাকিস্তান সেনাবাহিনী কর্তৃক মানবসৃষ্ট ট্রাজেডির মর্মন্তুদ আখ্যানলিপি বিশ্বপরিসরে এমনভাবে প্রচারিত হয়েছিল যা স্বাভাবিকভাবেই বিশ্ব বিবেককে হতভম্ব ও হতচকিত করে তুলেছিল, বিশ্ববিবেককে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়েছিল। সেজন্য শিল্পের তুলিতে, সংগীতের মুর্ছনায়, বিক্ষুব্ধ চিত্তের বেদনা দগ্ধ অনুভূতিতে, প্রতিনিয়ত রক্তাক্ত যুদ্ধরত বাংলাদেশ উপস্থিত থেকেছে। শরণার্থীদের সাহায্যে মানবতাবাদী সংস্থা ও ব্যক্তিবর্গ অকুণ্ঠভাবে এগিয়ে এসেছে। এই এগিয়ে আসার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কী করে এই ট্রাজিক মানবিক সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া যায়। এজন্য ভারত কূটনৈতিক ক্ষেত্রে মানবিক-রাজনৈতিক ফর্মুলা নিয়ে অগ্রসর হয়। ভারতের স্পষ্ট বক্তব্য ছিল, ১৯৭০ সালের নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হলে শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিরাপদ বোধ করবে না, মর্যাদা ও সম্মান অক্ষুণ্ন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থাকবে না। ভারতের প্রধানমন্ত্রী বারবার কূটনৈতিক ভাষায় বিশ্বকে স্মরণ করে দিয়েছেন পূর্ববঙ্গের ঘটনা পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলেও পূর্ববঙ্গের জনগণের গণরায় অনুযায়ী নির্বাচিত প্রতিনিধি বিশেষকরে তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে তাদের ইচ্ছানুযায়ী রাজনৈতিক সমঝোতা খুঁজে নিতে হবে।

জুলাই এর পর থেকে ভারত পূর্ববঙ্গের সংকটকে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয় হিসেবে আর বিবেচনা করেনি। তার বক্তব্য ছিল অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যখন উপমহাদেশের শান্তি ও স্থিতিশীলতাকে বিনষ্ট করছে এবং বিশ্বশান্তির প্রতি হুমকি হয়ে দাড়িয়েছে তখন বিষয়টি অভ্যন্তরীণ নয় বরং তা আন্তর্জাতিক। যার সমাধান আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের দায়িত্ব ও কর্তব্য। আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় এই দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হলে তা হবে এক নিষ্ঠুর পরিণতি। বাংলাদেশ সংকট প্রশ্নে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিশ্বব্যাপী সফর করে সংকটের গুরুত্ব ও তাৎপর্য অনুধাবনে রাষ্ট্রপ্রধানদের সচেষ্ট করার ব্যাপক কূটনৈতিক উদ্যোগ গ্রহণ করেন। তিনি ও তার সরকার, মন্ত্রীবর্গ, বিশেষ দূত, কূটনীতিক, বেসরকারি বরেণ্য ব্যক্তিবর্গ প্রায় ৭০টি দেশে কূটনৈতিক অভিযান পরিচালনা করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের জীবনের নিরাপত্তা ও তার মুক্তির দাবিতে ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের নিকট পত্র প্রেরণ করেন। তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে পুরাতন মিত্রতা ঝালাই করে নেন।

রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি সামরিক কূটনীতি জোরদার করার লক্ষ্যে ভারত ৯ই আগস্ট সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে একটি শান্তি সহযোগিতা মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষর করে। এই চুক্তি অপরিহার্যতা ছিল এই যে, বিশ্ব কূটনৈতিক অঙ্গনে যুক্তরাষ্ট্র তখন নতুনভাবে কূটনৈতিক বিন্যাসের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। নিক্সনের 'চীন ডকট্রিন' ঘোষণার পর সোভিয়েত রাশিয়া ও ভারত দুই দেশই উপলব্ধি করে যে, যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিপ্রেক্ষিতে চীনও তার ধ্রুপদী নীতির পরিবর্তন করেছে। মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে চীনের পরিবর্তিত নীতিতে 'ঝাঁঝ' কমে এসেছে এবং মিত্র হিসেবে পাওয়ার ক্ষেত্রে আগ্রহী হয়ে উঠেছে। যুক্তরাষ্ট্র চীনের সঙ্গে প্রাথমিক সম্পর্ক স্থাপনের স্প্রীং বোর্ড হিসেবে পাকিস্তানকে বেছে নেন। জুলাই মাসে যুক্তরাষ্ট্রের হেনরি কিসিঞ্জার পাকিস্তান থেকে গোপনে চীন গমন করেন এবং মাও সেতুং ও চৌ এন লাই-এর সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বিস্তারিত আলাপ করেন। চীন-পাকিস্তান সম্পর্ক জোরদার হয়। যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানকে তার বিশ্বস্ত মিত্র হিসেবে এই সম্পর্ক স্থাপনে সেতু হিসেবে কাজে লাগিয়েছে। এজন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিষয়ে কিসিঞ্জারের ভাষায় 'তারা যথেষ্ট সময় দিতে পারেনি' মনোযোগী হয়নি। এমনকি বাংলাদেশ সংকটকে যুক্তরাষ্ট্র একটি উৎকট ও বাড়তি সমস্যা হিসেবে বিবেচনা করেছে। বিশ্বস্ত হিসেবে অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্র দ্ব্যর্থহীন সমর্থন দিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় রাজনৈতিক সমাধানের উপরে গুরুত্বারোপ করেছে এবং মার্কিন নীতি হিসেবে তা বাস্তবায়নের জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা চালিয়েছে।

বন্দি শেখ মুজিব সম্পর্কে যুক্তরাষ্ট্রের নীতি ছিল তাকে জীবিত রাখতে হবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেননা 'জীবত মুজিবের চেয়ে মৃত মুজিব হবে আরো ভয়ঙ্কর'। হেনরি কিসিঞ্জার বন্দি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনের নিরাপত্তা, ক্যামেরা ট্রায়ালে বিচার এবং মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে এ সম্পর্কিত সংবাদে উৎকণ্ঠিত ছিলেন। তিনি রাষ্ট্রদূত ফারল্যান্ডের মাধ্যমে বন্দি মুজিবের নিরাপত্তা বিধানে সরাসরি ইয়াহিয়া খানকে বার্তা পাঠান। কিসিঞ্জারের একথা বুঝতে অসুবিধা হয়নি যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতির মধ্যপন্থি, গণতান্ত্রিক এবং ভারসাম্যমূলক। তার অবর্তমানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ বামপন্থিদের হাতে চলে যাওয়ার আশঙ্কা তিনি দেখতে পান। তাছাড়া কূটনৈতিক ক্ষেত্রে শেখ মুজিবকে জীবিত রেখে পরিস্থিতির প্রয়োজনে তাকে 'ট্রাম কার্ড' হিসেবে ব্যবহারের চিন্তা করেছিলেন। ভারত কিসিঞ্জারের এই মনোভাব সম্পর্কে অবগত ছিল। সেজন্য বাংলাদেশ সংকট নিরসনে শেখ মুজিবের মুক্তিকে রাজনৈতিক সমাধানের মূল সূত্র হিসেবে তুলে ধরতে বিলম্ব করেননি এবং কূটনীতিক পরিমণ্ডলে বঙ্গবন্ধুর মুক্তির দাবিকে শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের শর্ত হিসেবে যুক্ত করেন।

২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক জান্তার ক্রাকডাউনের ফলে রক্তপাত, মানবিক নিপীড়ন, ধর্ষণ, খুন এবং নিরীহ মানুষের উপর আক্রমণের প্রতিবাদ জানিয়ে সোভিয়েত প্রেসিডেন্ট পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট বরাবর ২রা এপ্রিল একটি প্রতিবাদ পত্র প্রেরণ করেন। পত্রে 'রক্তপাত' ও সামরিক বাহিনীর 'নির্যাতনের' উল্লেখ ছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এই পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সোভিয়েত ইউনিয়ন উপমহাদেশের ঘটনাবলি পর্যবেক্ষণ করে। নিক্সনের চীনা নীতির ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগিন পাকিস্তানের বিদ্যমান সংকটকে অভ্যন্তরীণ সমস্যা বলে মনে করলেও অবিলম্বে শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের উপর চাপ প্রয়োগ করেন। চীন পাকিস্তানকে দৃঢ়ভাবে সমর্থন জানালে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের দিকে ঝুঁকে পড়ে। কিন্তু জুলাই পর্যন্ত পাকিস্তানের সাথে স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক রাখার মনোভাব ধরে রাখে। এসময় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পাকিস্তানের সম্পর্ক শীতল হয়ে আসে। তারপরেও সোভিয়েত এই ধারণা পোষণ করে যে, সংকটের এক পর্যায়ে তাসখন্দের মতো মধ্যস্থতা করার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তান যখন কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একই লক্ষ্যে অগ্রসর হয় তখন সোভিয়েত ইউনিয়ন নীতিগত ও কৌশলগত কারণে উপমহাদেশে তার আধিপত্য বহাল ও বিস্তার করার লক্ষ্যে ভারতের সঙ্গে কূটনৈতিক ও সামরিক সম্পর্ক জোরদার করে। সেই লক্ষ্যে ৯ই আগস্ট ভারত-সোভিয়েত শান্তি, মৈত্রী ও বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এই চুক্তির একটি অনুচ্ছেদে ছিল 'সামরিক সাহায্যের ক্ষেত্রে' পারস্পরিক সহযোগিতা।

২৯শে সেপ্টেম্বর সোভিয়েত পররাষ্ট্রমন্ত্রী গ্রোমিকো যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সঙ্গে ওয়াশিংটনে মত বিনিময় করেন। সে সময় নিক্সন বলেন যে, সোভিয়েত রাশিয়া ইতিপূর্বেও ঐ অঞ্চলে শান্তি রক্ষায় গরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে এবং ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ যাতে না হয় সে লক্ষ্যে সোভিয়েত সংকট নিরসনে অগ্রসর হতে পারে। গ্রোমিকো

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিক্সনকে আশ্বস্ত করেন সোভিয়েত ইউনিয়ন এই সংঘর্ষ যুদ্ধে পরিণত হোক তা চায় না এবং সোভিয়েত যে যুদ্ধ চায় না সে সম্পর্কে ভারতের প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করানো হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ঐ সময় ২৭-২৯শে সেপ্টেম্বর মস্কো গমন করেন। মস্কো প্রশাসন তাকে পরামর্শ দেয় যে, শান্তিপূর্ণ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে যাওয়া। এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর নিকট 'একটি নেতিবাচক ঝাঁকুনি।' প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অবিলম্বে প্রয়োজনীয় সামরিক অস্ত্র ও সরঞ্জাম সরবরাহের জন্য অনুরোধ জানান। সোভিয়েত রাশিয়া এক বিলিয়ন ডলারের অস্ত্র সরবরাহ করতে সম্মত হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার নিকট প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে বলেন যে, কোনো দেশ ভারতকে সমর্থন করুক বা না করুক তিনি তার নিজস্ব মতে লক্ষ্য অর্জনে এগিয়ে যাবেন। যুক্তরাষ্ট্র-চীন-পাকিস্তান ত্রিভুজ কূটনৈতিক বন্ধনে সোভিয়েতকে 'বিচ্ছিন্ন' করার প্রয়াস লক্ষ্য করে সোভিয়েত রাশিয়া ভারতের সাহায্যে এগিয়ে আসে। যুদ্ধের প্রাক্কালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতবর্ষ প্রতিনিয়ত যোগাযোগ রক্ষার জন্য রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের বাইরে অতিরিক্ত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করে। মস্কোর পক্ষে কুঝনেস্‌সভ ও ভারতের পক্ষে ডি.পি. ধর উচ্চ পর্যায়ের পরামর্শ করে প্রতিনিয়ত যুদ্ধপ্রস্তুতি সামরিক গতিপ্রকৃতি মূল্যায়ন করেন। নভেম্বর মাসের ভিতরেই সোভিয়েত সামরিক সরঞ্জাম জাহাজযোগে ভারতে প্রেরণ করা হয় এবং শেষেরদিকে বিমানে করে অস্ত্র পাঠানো চলমান থাকে। সোভিয়েত-ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক জাতিসংঘের সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদের কার্যক্রমে প্রতিফলিত হয়। পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের প্রাককালে সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনৈতিক তৎপরতা বিশ্বপরিসরে ভারতের পক্ষে ঝুঁকে পড়ে, এমনকি জাতিসংঘ পর্যন্ত প্রসারিত হয়।

৪ ও ৫ই নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট নিক্সনের সঙ্গে আলোচনায় রাজনৈতিক সমঝোতার বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী কর্তৃক উত্থাপিত প্রস্তাব উপেক্ষিত করা হয়। প্রেসিডেন্ট নিক্সন জাতিসংঘ কর্তৃক প্রস্তাবিত উভয় দেশের সৈন্য প্রত্যাহার এবং জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগে জোর তাগিদ দেন। ভারত ইতোপূর্বেই বারবার বলে এসেছিল যে, রাজনৈতিক সমাধান হতে পারে কেবল ১৯৭০ সালে নির্বাচনের জনপ্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে। শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, এই আলোচনা ব্যর্থ হবে যদি শেখ মুজিবকে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে না দেওয়া হয়। হেনরি কিসিঞ্জারের বক্তব্য ছিলো এই মূহূর্তে শেখ মুজিবের প্রশ্নটি এড়িয়ে যেতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয়। ফিরে এসে নয়াদিল্লি থেকে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী নিক্সনকে এক পত্রে বলেন, যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের উপরে রাজনৈতিক সমাধানের জন্য প্রভাব বিস্তার করবে বলে তিনি আশা করেন। ২৫শে নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের সেক্রেটারি অব স্টেট রজার্স ভারতের চার্জ দি অ্যাফেয়ার্স রাজগোত্রাকে বলেন, পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তের অভ্যন্তরে ভারতীয় সৈন্য অগ্রসর হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে। রাজগোত্রা এই বিষয়ে ব্যক্তিগতভাবে উদ্‌বেগ প্রকাশ করে বলেন, কেউ চায় না যুদ্ধ হোক। কিন্তু যুদ্ধ চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্টেট ডিপার্টমেন্টের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সেক্রেটারি রজার্স সেনা প্রত্যাহার এবং বাংলাদেশ ও পাকিস্তানের প্রতিনিধির মধ্যে আলোচনার সম্ভাবনা বিষয়টি দেখতে বলেন। ২৬শে নভেম্বর মার্কিন সিনেটর কানসার্স ও কিটিং প্রধানমন্ত্রী গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন। ২৯শে নভেম্বর তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্টের একটি পত্র প্রধানমন্ত্রী বরাবর হস্তান্তর করেন। পত্রে পাকিস্তান এবং ভারতের প্রতিনিধিদের একত্র বৈঠক করা এবং সৈন্য প্রত্যাহারের পরামর্শ দেওয়া হয়। এই পত্র পাওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী গান্ধী দৃঢ় অবস্থান গ্রহণ করেন এবং ভারত তার স্বার্থের প্রয়োজনে যা কিছু প্রয়োজন তা করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ইন্দিরা গান্ধী এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, যুক্তরাষ্ট্র কিংবা আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় উপমহাদেশের সমস্যা বিশেষকরে পূর্ববঙ্গের সমস্যার কোনো সমাধান করবে না। নিক্সনের সৈন্য প্রত্যাহারের পরামর্শ ও জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক নিয়োগ সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা এমন কথা শুনতে পারি না যা আমাদের দূর্বল করবে। কিটিং-এর রিপোর্টে বলা হয়, ভারত তাকে আশ্বস্ত করেছে মুক্তিবাহিনী নিজেই পূর্ববঙ্গ মুক্ত করতে ব্যর্থ হবে না।

চীনা বিপ্লব সফল হওয়ার পর ভারত চীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করে। কোরিয়া ও তিব্বতের মতো চীনের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে ভারতের নির্জোট দৃষ্টিভঙ্গি চীন-ভারতকে কূটনৈতিক ক্ষেত্রে কাছাকাছি নিয়ে আসে। এ কূটনৈতিক ধারা ছিল পরাশক্তির বাইরে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত দেশগুলি স্বাধীনভাবে পররাষ্ট্র নীতির ক্ষেত্রে 'হস্তক্ষেপ-বহির্ভূত' একটি বাতাবরণ সৃষ্টি। ১৯৫০ থেকে এই দুটি এশীয় শক্তির মৈত্রী বান্দুং সম্মেলনে আরো নিবিড় হলে সোভিয়েত ও চীন আফ্রো-এশিয়া অকমিউনিস্ট দেশগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনে ভারতকে সামনে এগিয়ে দেয়। কিন্তু ১৯৫০ সালের শেষদিকে চীন-ভারত সীমান্ত নিয়ে বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধের পরিণতিতে শেষ পর্যায় ১৯৬২ সালে এক স্বল্পকালীন যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ভারত এই সময় যুক্তরাষ্ট্রের দিকে হাত বাড়ায় এবং জাতীয় স্বার্থে উভয় পরাশক্তির সাহায্য লাভে কূটনীতি পরিচালনা করে। এই কারণে চীন কৌশলগতভাবে পর্যবেক্ষণ করে যে, প্রতিবেশী ভারত ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে তার এককভাবে রাজনৈতিক এবং কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালনা করা কষ্টকর। ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান-ভারতের যুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্র ভারতকে সমর্থন করে এবং পাকিস্তানের প্রতি 'প্রতিশ্রুত' সকল সাহায্য বন্ধ করে দেয়। চীন পাকিস্তানের পাশে দাঁড়ায় এবং পাকিস্তানের নিঃসঙ্গতা দূরীকরণে চীন সামরিক সরঞ্জাম সরবরাহের প্রধান উৎস হিসেবে তাকে সাহায্য করে। এসময় সোভিয়েত রাশিয়া ভারত ও পাকিস্তানকে সাহায্য না দিয়ে অনেকটা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে। পাকিস্তানকে চীন সাহায্য করায় ভারতের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়ে উঠে।

১৯৬৯ সালে সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভ ঘোষিত 'এশিয়া নিরাপত্তা বেষ্টনী তত্ত্ব' হাজির করেন এবং বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর এই তত্ত্বের প্রতি ভারত সমর্থন জ্ঞাপন করে। সোভিয়েত নেতা ব্রেজনেভের নীতি ছিল দক্ষিণ এশিয়াসহ এমন একটি নিরাপত্তা কাঠামো গড়ে তোলা যার ফলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে সোভিয়েত কর্মকাণ্ডে গতি লাভ করে। সোভিয়েতের সঙ্গে ভারত এই তত্ত্বের আওতাভুক্ত হয় এবং চীন এর বাইরে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অবস্থান করে। চীন মনে করে তাকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য এই তত্ত্ব হাজির করা হয়েছে। যে সময় চীন ও সোভিয়েত সীমান্তে উত্তেজনা অনুভূত হচ্ছে। এই সময় পাকিস্তান চীনবিরোধী যেকোনো পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে ১৯৭০ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সঙ্গে পাকিস্তানের দূরত্ব বৃদ্ধি পেতে থাকে।

২৫শে মার্চ পাকিস্তান সামরিক বাহিনী পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক গণহত্যা চালালেও চীন তার প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেনি, বরং ৪ঠা এপ্রিল চীনের মুখপাত্র নিউ চায়না এজেন্সি সংবাদ প্রকাশ করে যে, পূর্ব পাকিস্তানে 'বিচ্ছিন্নতাবাদীদের' স্তব্ধ করার জন্য পাকিস্তান সামরিক বাহিনী কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। ১১ই এপ্রিল *পিপলস ডেইলি* ভারতের সমালোচনা করে এই বলে যে, পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ভারত হস্তক্ষেপ করছে। ঐদিনই চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন-লাই পাকিস্তান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বরাবর এক পত্রে পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারত সরকারকে অভিযুক্ত করেন। অনেক গবেষক মনে করেন, চীন পাকিস্তানের জনগণের প্রতি সমর্থনসূচক অঙ্গীকার করলেও পাকিস্তান সামরিক সরকারের প্রতি কোনো সুস্পষ্ট সমর্থন ছিল না। তারপরেও একথা দ্ব্যর্থহীনভাবে বলা যায় চীন ব্যাপকভাবে পাকিস্তানকে সামরিক অস্ত্র সরবরাহ করে এবং চীনের একথা জানা ছিল যে, সরবরাহকৃত ঐ অস্ত্রদ্বারা বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে গণহত্যা চলছে। সে সময় চীন ও যুক্তরাষ্ট্র সম্পর্কের নব দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছিল। ৯ই আগস্ট চীন ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তির কারণে দেখতে পায় যে, ভারত তার জোটনিরপেক্ষতার নীতি পরিত্যাগ করেছে এবং ভারত এবং সোভিয়েত মিলে তার চারপাশে নিরাপত্তা বেষ্টনী গড়ে তুলছে। চীন মনে করে এটা শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নয় বরং এই চুক্তি চীনের জাতীয় স্বার্থকে আঘাত করবে। এই অবস্থায় ভারত ও সোভিয়েত রাশিয়ার কূটনৈতিক পদক্ষেপের বিপরীতে চীন তার ঘোষিত নীতি পুনমূল্যায়ণ করে এবং যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সহযোগিতামূলক সম্পর্ক স্থাপন করে। অনেক গবেষক বলে থাকেন, ১৯৭১ সালে চীন পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধের সময় চীনের সৈন্য সমাবেশ কিংবা যুদ্ধের প্রস্তুতি তেমনটি না থাকায় এ কথা ধরে নেওয়া যায় যে, চীন ঐ সময় পাকিস্তানের সাহায্যে তিব্বত কিংবা শিলিগুড়ি অঞ্চলে সৈন্য মোতায়েন করেনি। কিংবা ভারতকে মোকাবেলা করার কোনো তৎপরতা দেখা যায়নি। চীনের এই ভূমিকার কারণ অন্বেষণে অনেক গবেষক মনে করেন, বাংলাদেশ সংকটে পাকিস্তানের সঙ্গে যুদ্ধ বেঁধে গেলে চীন পূর্ব পাকিস্তানের দিকে অগ্রসর হতে পারবে না এ কারণে যে, চীনের সিয়াং কিং প্রদেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন দশ লক্ষাধিক সৈন্য সমাবেশ করেছিল যার ফলে চীন এদিকে যেন মনোযোগ দিতে না পারে।

চীনের বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে অনেকেই এই মন্তব্য করে থাকে যে, চীন সম্ভবত স্বাধীনতা সংগ্রামরত বাঙালিদের বিরুদ্ধাচরণ করেনি। কিন্তু জাতিসংঘে চীনের কর্মকাণ্ড বিশ্লেষণ করলে এসব কথা মোটেই ধোপে টিকে না। জাতিসংঘে চীন বাংলাদেশ প্রশ্নে পাকিস্তানের পক্ষে প্রচণ্ড বিরোধীতা করে। এমনকি যুক্তরাষ্ট্রের গোপন

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নথি থেকে দেখা যায়, হেনরি কিসিঞ্জারের সঙ্গে গোপন বৈঠকে চীনের রাষ্ট্রদূত হুয়াং হুয়ার দৃষ্টিভঙ্গিতে পাকিস্তানকে সাহায্য করার মনোভাব প্রতিফলিত হয়। এসময় যুক্তরাষ্ট্র চীনকে পূর্ব সীমান্তে সৈন্য প্রেরণের জন্য বারবার প্ররোচিত করে। এছাড়াও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে চীনের মূল্যায়ন ছিল পাকিস্তান ভেঙ্গে স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় হলে তা হবে ভারতের মিত্র রাষ্ট্র এবং স্বাভাবিকভাবে তা হবে চীনবিরোধী। চীনের অন্য একটি সুদূরপ্রসারী দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায়, বাংলাদেশের অভ্যন্তরে যেসব পিকিংপন্থি উপদলগুলো সশস্ত্র যুদ্ধে লিপ্ত ছিল এবং পশ্চিমবাংলা, মিজোরাম, নেপাল এসব অঞ্চলে যেসব সশস্ত্র পিকিংপন্থি দলগুলো পারস্পরিক যোগসূত্রে এমন পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটাবে যেখানে মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে স্বাভাবিকভাবেই বাংলাদেশের নেতৃত্বের পরিবর্তন হবে এবং বামপন্থি নেতৃত্বে সেসব জায়গায় অধিষ্ঠিত হওয়ার সম্ভবনা উদিত হবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে চীনের ভূমিকার কারন ভিন্নভবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। চীন পাকিস্তানকে নৈতিক সমর্থন, সামরিক সরবরাহ সত্ত্বেও রাশিয়া ভারতের বিরোধীতা কূটনৈতিক তৎপরতার ভিতরেই নিজেকে সীমাবদ্ধ রেখেছিল। নিক্সন অবশ্য জাতিসংঘে রাশিয়া-ভারতের বিরুদ্ধে চীনের এই 'তীব্র ঝগড়াটে' প্রতিবাদ উপভোগ করেছেন। তার কথা ছিল চীন এরকম 'ঝগড়া' করতে থাকলে তা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য সুবিধাজনক। এসব ব্যক্তিত চীন মূলত তার ভূমিকা কূটনৈতিক তৎপরতার ভিতরেই সীমাবদ্ধ রেখেছিল সরাসরি যুদ্ধে এগিয়ে আসেনি। কিন্তু যুদ্ধের মাঝামাঝি পর্যায়ে চীন সীমান্ত দিয়ে যেমন প্রতিদিন অস্ত্র পাঠিয়েছে, তেমনি চীন গেরিলা যুদ্ধ মোকাবেলার জন্য গেরিলা কৌশল প্রশিক্ষণে ঢাকায় দুইশত সামরিক বিশেষজ্ঞ পাঠিয়েছিল। তাছাড়াও চীন বহুজাতিক রাষ্ট্রে বিভক্ত এবং আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের সমস্যা নিয়ে তখন পর্যন্ত তাদের অভ্যন্তরীণ অবস্থা সুসংহত ছিল না, সে কারণে বাংলাদেশের জাতিত্বের ভিত্তিতে বিচ্ছিন্নতাগামী জনগণকে সমর্থন করা তাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। তাছাড়া চীন বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামকে স্বতঃস্ফূর্ত জনযুদ্ধ হিসেবে মনে করেনি। মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব দানকারীদের জাতীয় মুক্তিসংগ্রামের উপযুক্ত বলে তার নিকট প্রতীয়মান হয়নি।

এক্ষেত্রে ব্রিটেনের অবস্থান ছিল নীরব কূটনৈতিক বৈশিষ্ট্য মণ্ডিত। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ার্ড হীথ ২৭শে মার্চ বলেন, পূর্ব পাকিস্তান সংকটে ব্রিটেন জড়িত হবে না। ৫ই এপ্রিল ব্রিটিশ ফরেন সেক্রেটারি স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম ব্রিটিশ পার্লামেন্টে বলেন ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না। ব্রিটিশ সরকার ব্রিটেনের গণমাধ্যমের ব্যাপক সমালোচনার সম্মুখীন হন এবং সামরিক এবং অর্থ সাহায্য বন্ধের জন্য পার্লামেন্টের ভিতরে এবং বাইরে দারুণ চাপ সৃষ্টি হয়। যদিও প্রকাশ্যে ব্রিটেন দেখিয়েছে যে, তার ভূমিকা নিরপেক্ষ এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করছে না, কিন্তু কূটনৈতিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের সংকট নিয়ে যথেষ্ট উদ্‌বিগ্ন ও তৎপর ছিল। ব্রিটিশ সরকার পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূতকে ডেকে সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধানে জোর দেন এবং রাজনৈতিক মতপার্থক্য সমাধানে বন্দি মুজিবের সঙ্গে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলোচনার পরামর্শ প্রদান করেন। প্রধানমন্ত্রী হীথ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে একই ধরনের অভিমত প্রকাশ করে বলেন, সমস্যা সমাধানের জন্য শেখ মুজিবের মুক্তি অপরিহার্য। এই লক্ষ্যে ব্রিটেন সরকার পাকিস্তানের সরকার বরাবর কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল। পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান বিশেষ দূত হিসেবে মিয়া আরসাদ হোসেনকে বিদেশে পাঠান। তিনি মস্কো, লন্ডন, প্যারিসে সরকারপ্রধানদের সঙ্গে দেখা করেন। পাকিস্তান প্রত্যাবর্তন করার পর তার নিকট প্রতীয়মান হয়েছে দেশগুলো ভারত কর্তৃক বিচ্ছিন্নতাবাদীদের যে সহায়তা দিচ্ছে তা তারা ভালোভাবে নিচ্ছেন না। সরকারগুলো রাজনৈতিক সমাধানের জন্য মতামত প্রকাশ করেন। ১৫ই জুন পার্লামেন্টে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের বিষয়টি ভারতের কোনো উদ্‌বেগের কারণ নয়। কিন্তু ভারত এমন কোনো সমাধান মেনে নেবে না যা বাংলাদেশের মৃত্যু ঘটাবে। এর কয়েকদিন পর শ্রীমতী গান্ধী বলেন, রাজনৈতিক সমাধানের অর্থ শেখ মুজিবের নেতৃত্বে বাংলাদেশ সংকটের সমাধান। ব্রিটিশ সরকার কমন্সসভায় বিরোধী দল এবং বাইরে গণমাধ্যমের প্রবল বিরোধীতার সম্মুখীন হন। যার ফলে ব্রিটিশ সরকার অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ করতে বাধ্য হয়। ৮ ও ৯ই জুন কমন্সসভায় বক্তৃতাকালে স্যার অ্যালেক বলেন, রাজনৈতিক সমঝোতার জন্য এমন একটি কাঠামোর উদ্ভাবন করতে হবে যেক্ষেত্রে শরণার্থীরা স্বদেশ প্রত্যাবর্তনে নিরাপত্তা বোধ করবে। ১৫ই জুন লেবার পার্টির ১২০জন সদস্য বাংলাদেশের গণহত্যার নিন্দা এবং বাংলাদেশ স্বীকৃতির জন্য একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ১২-২০শে জুন পর্যন্ত কনজারভেটিভ পার্টির জিল গেট, একজন লেবার পার্টি এবং অন্য একজন সদস্য পাকিস্তান সফর করেন। প্রতিনিধিদল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। তিনি ব্রিটেনে ফিরে এসে বিবৃতি বলেন, এখনও পূর্ব পাকিস্তানে অত্যাচার, নিপীড়ন ও ধ্বংসযজ্ঞ চলছে। তিনি ইয়াহিয়া খানের বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন করে বলেন, তার বিরুদ্ধে বহির্বিশ্বে যতই সমালোচনা হোক না কেন তাতে তিনি কান দিচ্ছেন না।

ব্রিটিশ সরকার দ্বিতীয়বারের মতো একটি পার্লামেন্ট প্রতিনিধি প্রেরণ করেন। এর মধ্যে দুজন লেবার পার্টি ও দুজন কনজারভেটিভ পার্টির সদস্য ছিলেন। এর নেতৃত্বে ছিলেন কমনওয়েলথের প্রাক্তন সেক্রেটারি আর্থার বটমূলী। এর লক্ষ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিমবঙ্গে শরণার্থীদের অবস্থা অবলোকন এবং পরিস্থিতির বাস্তবতা অনুধাবন। প্রতিনিধি দল ব্যাপকভাবে পূর্ব পাকিস্তান ঘুরে তিক্ত অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন। ২৮শে জুন প্রতিনিধি দলের সদস্য টবি জেসেল বলেন, যা দেখেছি তার পরিপ্রেক্ষিতে ভারতে যারা উদ্বাস্তু আছে তাদের ফিরিয়ে আসার কথা বলা সমীচীন নয়। ১লা জুলাই নয়াদিল্লিতে আর্থার বটমূলী প্রতিনিধি দলের পক্ষে বলেন, তারা পূর্ব পাকিস্তানে এখনো ধ্বংসযজ্ঞ চলছে এবং মানুষ আতঙ্কে আছে। তার কাছে মনে হয়েছে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানও সম্ভবত জানেন না পূর্ববঙ্গে কী ঘটে চলেছে। সমাধানের ক্ষেত্রে তিনি বলেন, রাজনৈতিক সমাধান গ্রহণযোগ্য হবে যদি শেখ মুজিবের নেতৃত্বে নির্বাচিত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা যায়। অর্থাৎ ব্রিটিশ সরকার প্রকাশ্যে না হলেও নানাভাবে বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। লন্ডনে বাংলাদেশের দূতাবাস খোলার অনুমতি দেয়। লন্ডন থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়। লন্ডনে প্রবাসী বাঙালিরা বিভিন্ন মিটিং, মিছিল, আন্দোলন, সংগ্রামে, স্লোগানে, সঙ্গীতে যে পরিবেশ সৃষ্টি করে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে তা অবিস্মরণীয়। লন্ডনকে কেন্দ্র করে বিশ্বব্যাপী প্রবাসী বাঙালিদের ও মুজিবনগর সরকারের কূটনৈতিক তৎপরতা পরিচালিত হয়েছে। সেদিক থেকে বিবেচনা করলে ব্রিটেন যে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ছিল এমনটি নয়, বরং ব্রিটেন বাংলাদেশের জনগণের সঙ্গে সহমর্মিতা জ্ঞাপন করেছে। ব্রিটেন-এর 'নীরব কূটনৈতিক' তৎপরতা জাতিসংঘে 'নিরপেক্ষ' ভূমিকা পরোক্ষভাবে বাংলাদেশের জনগণের পক্ষে এসে দাঁড়ায়।

মুসলিম বিশ্বের কূটনৈতিক কার্যক্রম পাকিস্তানের পক্ষে পরিচালিত হয়েছে। ওআইসির দেশগুলো বাংলাদেশের গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে কোনো নিন্দা জ্ঞাপন করেনি বা প্রস্তাব উত্থাপন করেনি। বরং পাকিস্তানের পক্ষে ভারতের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে। যুদ্ধের শেষপর্যায়ে যুক্তরাষ্ট্রের অভিপ্রায় অনুযায়ী লিবিয়া, জর্ডান, সৌদি আরব, তুরস্ক, ইরান প্রভৃতি মুসলিম দেশগুলো পাকিস্তানকে অর্থ ও সামরিক সরঞ্জাম এমনকি অত্যাধুনিক বিমান সরবরাহ করেছে। মুসলিম দেশগুলো বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের উপর পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর অত্যাচার নিপীড়নের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া দূরে থাক, সহানুভূতি প্রকাশ করেনি। একমাত্র আফগানিস্তান ব্যতীত কোনো মুসলিম দেশ বাংলাদেশ সংগ্রামকে সমর্থন জানায়নি। মালয়েশিয়া ও ইন্দোনেশিয়া পাকিস্তানের পক্ষ অবলম্বন করলেও একইসাথে তারা ভারতের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছে। ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট জেনারেল সুহার্তো ভারত-পাকিস্তান সংঘর্ষে মধ্যস্থতা করতে চেয়েছে, কিন্তু বাংলাদেশ নিয়ে তেমন কোনো ইতিবাচক পদক্ষেপ নিয়েছে বলে তথ্য মেলে না।

সবচেয়ে বিস্মিত হতে হয় জাতিসংঘের ভূমিকা নিয়ে। যদিও শরণার্থী সাহায্যের ব্যাপারে জাতিসংঘ কার্যকর উদ্যোগ নিয়েছিল, কিন্তু বাংলাদেশ সংকট নিরসনে প্রকাশ্যে কোনো সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। যদিও ভারত প্রথমেই শরণার্থী সমস্যা ও বাংলাদেশ সংকট জাতিসংঘে উপস্থাপন করে। জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯শে জুলাই নিরাপত্তা পরিষদকে দেওয়া এক পত্রে তার উদ্‌বেগের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি একথা বলেছেন সমস্যাকে শুধু মানবিক দিক থেকে দেখলে চলবে না, বরং শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি এটা গুরুতর একটি হুমকি। যেক্ষেত্রে মানবিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সমস্যার মিশ্রণে এমন একটি জটিল পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে সেক্ষেত্রে জাতিসংঘের জন্য এটা হবে একটি চ্যালেঞ্জ। এই চ্যালেঞ্জ এমন সুদূরপ্রসারী যে নিরাপত্তা পরিষদের সদস্যরা এই সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা পাওয়ার আগেই জাতিসংঘ সর্বজনগ্রাহ্য কোনো ভূমিকা নিতে পারে না। কিন্তু আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণে বিশ্বের সর্বোচ্চ সংস্থা হিসেবে নিরাপত্তা পরিষদকে সমস্যা সমাধানে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সর্বোচ্চ মনোযোগ ও আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা সংরক্ষণের দায়িত্ব পালন করার কথা।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একটি ন্যায়ানুগ ঘটনা। জাতিসংঘ দায়িত্ব পালনে যথাযথ ভূমিকা পালন না করার ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে একটি দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়। নীতিটি হলো- এক, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার এবং মানবাধিকার বিষয়ে; ও দুই, রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার নীতি। বাংলাদেশ প্রশ্নে জাতিসংঘের এই নীতির দুটি অংশ পারস্পরিক সাংঘর্ষিক হিসেবে উপস্থিত হয়। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশে যখন ব্যাপক গণহত্যা ও মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছিল তখন জাতিসংঘ তা বন্ধে ব্যর্থ হয়। কিন্তু মানবাধিকারে ঘোষিত অনুচ্ছেদগুলির কার্যকারিতা সহজেই এই ব্যর্থতাকে অতিক্রম করতে পারত। কিন্তু জাতিসংঘে যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা বাংলাদেশ সংকটকে তার চত্বরে প্রবেশ করতে দেয়নি। চীন ও মুসলিম দেশগুলোর প্রচণ্ড বিরোধীতার কারণে জাতিসংঘ তার প্রত্যাশিত ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। গণহত্যা ও নির্যাতনের বিষয়টি জাতিসংঘ প্রকাশ্যে তুলে ধরতে পারেনি এ কারণে যে, কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে অন্য কোনো রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের কোনো সুযোগ চার্টারে উল্লেখ ছিল না বলে দোহাই দেওয়া হয়েছে। অথচ জাতিসংঘ সনদে ধারা ২-এর ৭ উপধারায় বর্ণিত হয়েছে, "বর্তমান সনদ জাতিসংঘকে কোনো রাষ্ট্রের নিজস্ব অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপের অধিকার দিচ্ছে না বা সেরূপ বিষয়ের নিষ্পত্তির জন্য কোন সদস্যকে জাতিসংঘের দ্বারস্থ হতে হবে না, কিন্তু সপ্তম অধ্যায় অনুযায়ী কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহনের ব্যাপারে এই নীতি অন্তরায় হবে না।" সপ্তম অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতিসংঘ এ বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার ক্ষেত্রে কোনো বাধা ছিল না।

মুজিবনগর সরকার সর্বদা বাংলাদেশের স্বীকৃতির প্রশ্ন জাতিসংঘের দ্বারস্থ হয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনে একটি সরকার গঠন অথবা স্বীকৃতির ক্ষেত্রে যে শর্তগুলো পালন করা প্রয়োজন ছিল বাংলাদেশ সরকার তার সবগুলো পালন করে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পাবার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন। শর্তগুলোর মধ্যে : ১. একটি সার্বভৌম সরকার গঠন; ২. অধিকৃত এলাকায় বৈধ শাসন; এবং ৩. স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হিসেবে সংগ্রাম অব্যাহত রাখা। মুজিবনগর সরকার হিলি, রৌমারি, পঞ্চগড় এলাকায় তার দখল কায়েম করেছিল, প্রশাসনযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলো, সচিবালয় স্থাপন করেছিল, কূটনৈতিক মিশন স্থাপন, নিজস্ব কোষাগার, কর্মচারীদের বেতন, পুলিশ বাহিনী ও সেনাবাহিনী গঠন করা এবং রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে তাদের বেতন-ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা করেছিলেন। এছাড়াও ছিল নিজস্ব প্রচারমাধ্যম, জয়বাংলা পত্রিকা ও স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র। সর্বোপরি, সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য ছিল সমগ্র জনগণের আস্থা অর্জন এবং আন্তর্জাতিক দায়িত্ব পালনে কূটনৈতিক পরিমণ্ডলে দৃশ্যমান উপস্থিতি। এরপরেও জাতিসংঘ বাংলাদেশ সম্পর্কে ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে। বরং জাতিসংঘের মহাসচিব ১৯শে জুলাই ভারত-পাকিস্তান উভয় সীমান্তে পর্যবেক্ষক মোতায়েনের যে প্রস্তাব দিয়েছিল তার উদ্দেশ্য মানবিক মনে হলেও

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাজনৈতিকভাবে এবং সামরিকভাবে তা ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের বিপক্ষে। কেননা এই প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে মুক্তিযোদ্ধাদের যাতায়াত এবং যুদ্ধ প্রশিক্ষণের উপরে বিরাট অন্তরায় সৃষ্টির সম্ভাবনা ছিল। সেজন্য মুজিবনগর সরকার এবং ভারত জাতিসংঘের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বার্ষিক অধিবেশনে অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করার নীতি ও রাষ্ট্রীয় অখণ্ডতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের বিষয়ে আটকে থাকায় রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানে কোনো অগ্রগতি সাধিত হয়নি। জাতিসংঘের ২৬তম অধিবেশনে বাংলাদেশের সংকট সরাসরি এজেন্ডাভুক্ত হয়নি। মহাসচিব কর্তৃক 'বাংলাদেশ' শব্দটি উচ্চারিত না হলেও এবং সাধারণ পরিষদের সভাপতি কর্তৃক তা উপেক্ষা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশ সংকট সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা এবং বাংলাদেশ সমস্যাকে রাজনৈতিক সমস্যা হিসেবে না দেখে মানবিক সমস্যা হিসেবে এড়িয়ে গেছে। ৫৭টি দেশের মধ্যে ২২টি দেশ বাংলাদেশ সংকটকে সরাসরি মানবিক দৃষ্টি থেকে বিচার করেছে। ৩৩টি দেশ মানবিক সংশ্লিষ্টতার সঙ্গে বাংলাদেশ সমস্যার রাজনৈতিক দিকটি চিহ্নিত করেছেন। পাকিস্তান বলেছে বাংলাদেশ সমস্যা বলে কিছু নেই বরং তাদের মতে এটা ভারত-পাকিস্তানের সমস্যা। অন্যদিকে, ভারতের বক্তব্য ছিল এটা পাকিস্তান ও বাংলাদেশের সমস্যা, এটা কোনোক্রমেই ভারতের সমস্যা নয়। প্রকৃতপক্ষে বহুপাক্ষিক কূটনৈতিক চালে বাংলাদেশ সমস্যাকে আড়াল করার প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে। যদিও জাতিসংঘে মুজিবনগর সরকারের প্রতিনিধি বিচারপতি আবু সাঈদ চৌধুরীর অংশগ্রহণ করতে পারবে কিনা সে সম্পর্কে যখন বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় তখন বাংলাদেশ সমস্যা সামনে চলে আসে। চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশের স্বাধীনতার আন্দোলনের প্রতি কটাক্ষ করেছে সবচেয়ে বেশি। চীনা প্রতিনিধি হুয়াং বাংলাদেশ প্রতিনিধিকে 'পূর্ব পাকিস্তানের বিদ্রোহীদের প্রতিনিধি' বলে অভিহিত করেন। তিনি আরো বলেন, বিচারপতি চৌধুরীকে আমন্ত্রণ জানানোর অর্থ হলো, একটি সদস্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্ত ক্ষেপ করা। তাই চীনা প্রতিনিধি বাংলাদেশের প্রতিনিধির বৈঠকে অংশগ্রহণেই শুধু বিরোধীতা করেননি, পরিষদে যাতে তার পত্রটি বিলি না হয়, সে জন্যেও তৎপর ছিলেন। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রস্তাবে নিরাপত্তা পরিষদের ডকুমেন্ট হিসেবে পত্রটি বিলি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলেও অংশগ্রহণের দাবিটি সমর্থিত হয়নি। ভারত অবশ্য বলেছিল, আগা শাহী যেসব যুক্তি তুলে ধরেছেন তা পাকিস্তানের এক অংশের বক্তব্য। পূর্ববঙ্গ পৃথক এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেজন্য তাদের দাবি শোনা প্রয়োজন।

জাতিসংঘ স্বাধীনভাবে তার কার্য পরিচালনা করতে সমর্থ হয়নি, বরং জাতিসংঘের বাইরে অথবা জাতিসংঘের অভ্যন্তরে পরাশক্তি ও বৃহৎ শক্তিগুলো জাতীয় স্বার্থ ও ভূ-রাজনৈতিক স্বার্থকে সামনে রেখে অগ্রসর হয়েছে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলো নিজস্ব অবস্থান নিতে পারেনি এ কারণে যে, স্ব-স্ব দেশের আঞ্চলিক 'বিচ্ছিন্নতা' প্রবণতা মনস্তাত্ত্বিকভাবে তাদের দুর্বল করে রেখেছিল। নিরাপত্তা পরিষদে যুক্তরাষ্ট্রের উত্থাপিত প্রস্তাব এবং চীনের উদ্যোগ ব্যর্থতায় পর্যবেশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেটোর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কারণে। ফ্রান্স এবং ব্রিটেন নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করে তা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক হয়। তবে সাধারণ পরিষদে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে পাকিস্তান অখণ্ডতার প্রতি সমর্থন থাকলেও তা কাজে আসেনি, কারণ তখন বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত হয়ে গেছে। সেজন্য নিরাপত্তা ও সাধারণ পরিষদে বৈঠকগুলোর কার্যকারিতা অকেজো হয়ে যায়।

চীন যুক্তরাষ্ট্রের বহুমূখী কূটনীতিক তৎপরতা ও মুসলিম দেশগুলোর পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন থাকা সত্ত্বেও পাকিস্তান ভাঙন ঠেকানো যায়নি। চতুর্ভূজ কূটনীতির কারনে একদিকে ভারত এবং সোভিয়েত, অন্যদিকে যুক্তরাষ্ট্র, পাকিস্তান ও চীনের কূটনৈতিক মৈত্রীর বন্ধন সামরিক কূটনীতির কাছে পরাস্ত হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের গানবোট ডিপ্লোমেসির বিপরীতে সোভিয়েত পরমাণু নৌবহরের উপস্থিতি বাংলাদেশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে নতুন কূটনৈতিক মাত্রা যোগ করে। সামুদ্রিক কূটনীতির ক্ষেত্রে ভারতীয় সামুদ্রিক রণকৌশলের নিকট পাকিস্তান অসহায় হয়ে পড়েছিল, যেমন আকাশযুদ্ধে বাংলাদেশের সীমানায় ৭ই ডিসেম্বরের পর হতেই তারা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বাংলাদেশের জনগণের দুর্দমনীয় মনোভাব ও স্বাধীনতার প্রতি অদম্য আকাঙ্ক্ষার প্রচণ্ডতা পাকিস্তানের শক্তিশালী সামরিক বাহিনীর মনস্তাত্ত্বিক পরাজয় ডেকে এনেছিল। যার ফলে বাংলাদেশের যুদ্ধরত পাকিস্তানি সেনানায়কগণকে ৯৩ হাজার সৈন্যসহ অমর্যাদা ও অসম্মানজনকভাবে 'আত্মসমর্পণ' করতে বাধ্য হয়েছিল। রাজনৈতিক কূটনীতির পাশাপাশি ভারতের সামরিক কূটনীতি এবং ভারত-বাংলাদেশ যৌথ সামরিক কমান্ড গঠনের মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের পূর্বাংশে ধ্বংসপ্রাপ্ত কফিনে শেষ পেরেকটি ঢুকে দেয় দ্রুততার সঙ্গে। ভারত-বাংলাদেশের সমর কূটনীতির যথার্থ বাস্তবায়নে জলস্থলে অন্তরীক্ষে পালাবার পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়ায় ৯৩ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পণ তাদের জিম্মি করায় পশ্চিম পাকিস্তানের হিমশীতল বন্দি কারাগার থেকে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নিরাপত্তা ও মুক্তি অনিবার্য করে তুলেছিল। যা রাজনৈতিক কূটনীতি ও সমর কূটনীতির যৌথ ফলাফলের ফলশ্রুতি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্রন্থপঞ্জি

ক. দলিলপত্র

মাহাবুব কামাল (অনু.), *বিদেশি সাংবাদিকের দৃষ্টিতে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৮৮।

মিজানুর রহমান খান, ১৯৭১ *আমেরিকার গোপন দলিল*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০১০।

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ১২ খণ্ড, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০২-২০১২।

মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৫ খণ্ড, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫।

রফিকুল ইসলাম (সংকলিত), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: ঐতিহাসিক ভাষণ, ইশতেহার ও চিঠি*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭।

মোহাম্মদ শাহজাহান সিরাজী, *সংবাদপত্রে একাত্তরের স্বাধীনতা*, ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী, ২০০১।

হাসান হাফিজুর রহমান (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ দলিলপত্র: ১৫ খণ্ড*, ঢাকা: তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, ১৯৮২।

A Nation is Born, Calcutta University, Banglades Sahayak Samiti, 1972.

Arefin, A.S.M. Shamsul, *Bangladesh Document 1971*, 4 Vol, Dhaka: Bangladesh Research and Publications, 2009.

Bangladesh Documents, 2 Vols., New Delhi: Ministry of External Affairs.

Biswas, Sukumar (collected and compiled), *Bangladesh Liberation War Mujibnagar Government Documents, 1971*, Dhaka: Mowla Brothers, 2005.

M. A. Aziz, "Bangladesh Relations with India", *Endeavor*, Vol. 8, Nos. 10 and 11 (February 1989।

Draft Resolution by Poland in the Security Council, S/10453, December 14, 1971.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Elahi, Maudood (compiled by), *Assignment Bangladesh '71: A Chronology of Events as seen by the World Press,* Dhaka: Momin Publications, 1999.

Henery Kissinger, *White House Years : The Indo Pakistan Crisis of 1971,* Boston: Little Brown and Company.

Husain, M.D. (compiled), *International Press on Bangladesh Liberation War,* Dhaka: Ayman Shams Husain, 1989.

Islam, Rofiqul, Genocide in Bangladesh: Harrowing Accounts of some Eye-witness and the extracts from the Press, Dhaka: Upoma Prokashani, 1991.

J.N. Dixit, *Liberation and Beyond Indo Bangladesh Relations,* Dhaka: *American Secret Documents, Foreign Relations, 1969-1976,* Vol. XI, South Asia Crisis, 1971.

Khan Roedad (Compiled and Selected by), *The American Papers, Secret and Confidential, Documents 1965-1973*, Dhaka: The University Press, 1999.

Maulana Abdul Hamid Khan Bhasani's appeal to world leaders, Dated April 21, 1971, Secretary General U-thant, United Nationns, New york, U.S.A.

National Archives, Nixon Presidential Materials, NSC Files, California, 1971.

UN Yearbook 1971.

খ. গ্রন্থ : বাংলা

আখতারুজ্জামান মন্ডল, *১৯৭১ : উত্তর রণাঙ্গনে,* ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৯০।

আনিসুজ্জামান, *আমার একাত্তর,* ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৭।

আফসান চৌধুরী, বাংলাদেশে '৭১, ৪ খণ্ড, ঢাকা : মওলা ব্রাদার্স, ২০০৭।

আবদুল মতিন, *স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবাসী বাঙালী, বাংলাদেশ : ১৯৭১,* ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯৭।

আবু আল সাঈদ, *আমাদের বঙ্গবন্ধু,* ঢাকা: প্রকাশ ভবন, ১৯৯৭।

আবু ওসমান চৌধুরী, *এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম,* ঢাকা: সেবা পাবলিশার্স, ১৯৯১।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধু চর্চা,* ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *ভাবনায় মুক্তিযুদ্ধ, চেতনায় মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৮।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশ : মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক গ্রন্থপঞ্জি*, ঢাকা : মূলধারা, ১৯৯১।

আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন ও সহিদা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী*, ঢাকা: আইন ও সালিশ কেন্দ্র এবং মুক্তিযুদ্ধে শহীদ আইনজীবী প্রকল্প, ১৯৯৮।

আবু সাঈদ চৌধুরী, *প্রবাসে মুক্তিযুদ্ধের দিনগুলি*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৭।

আবুল ফজল শামসুজ্জামান, *জাকার্তায় একাত্তরের ঢেউ*, ঢাকা: ত্রিভূজ প্রকাশনী।

আবুল মনসুর আহমেদ, *শেরে বাংলা হইতে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: আহমেদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮১।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *বাংলাদেশে : জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০০।

আবুল মাল আবদুল মুহিত, *স্মৃতি অম্লান ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।

আব্দুল মতিন, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী বাঙালির ভূমিকা' সালাহ্উদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আমিরুল ইসলাম ও অন্যান্য (সম্পা.), *শত মুক্তিযোদ্ধার কথা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৩।

আহমদ রফিক, *একাত্তরে পাক বর্বরতার সংবাদভাষ্য*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১।

আহমদ সালিম, পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দি জীবন (অনুবাদ মফিদুল হক), ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮।

আসাদ চৌধুরী এবং এনামুল কবির (সম্পা.), *যাদের রক্তে মুক্ত এদেশ* (শহীদ জীবনী) (প্রথম খণ্ড), ঢাকা: একাডেমিক পাবলিশার্স, ১৯৯১।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *মুক্তি সংগ্রামে বাংলা ১৯০৫-১৯৭১*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।

আসাদুজ্জামান আসাদ, *একাত্তরের গণহত্যা ও নারী নির্যাতন*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯২।

আঁদ্রে মালরো, বাংলাদেশের ট্রাজেডি, সোহরাব হাসান সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বিদেশিদের ভূমিকা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৯।

আহমদ শরীফ ও অন্যান্য (সম্পা.), *একাত্তরের ঘাতক ও দালালরা কে কোথায়*, ঢাকা: মুক্তিযুদ্ধ চেতনা বিকাশ কেন্দ্র, ১৯৮৯।

এ. আর. মল্লিক, আমার জীবন কথা ও বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ.এম.এ. মুহিত, 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সালাহউদ্দিন আহমদ ও অন্যান্য সম্পাদিত, *বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রামের ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৭১)*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭, পৃ. ৩৬৬।

এইচ. টি. ইমাম, *বাংলাদেশ সরকার ১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০৪।

এম.আর. আখতার মুকুল, *আমি বিজয় দেখেছি*, ঢাকা:সাগর পাবলিশার্স, ১৩৯১।

এ.এস.এম. সামছুল আরেফিন, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে ব্যক্তির অবস্থান*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৫।

এম. আর. আখতার মুকুল (সম্পা.), *জয়বাংলা*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ১৯৯১।

এম. আর. আখতার মুকুল, *চরম পত্র*, ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স, ২০০০।

এম. আর. আখতার মুকুল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধে বুদ্ধিজীবিদের ভূমিকা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।

এম.এ, ওয়াজেদ মিয়া, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে ঘিরে কিছু ঘটনা ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৩।

কাজী হারুনর রশীদ, *নারী নির্যাতন '৭১*, ঢাকা: দি প্রিন্টাস কমপিউটার এন্ড পাবলিশার্স, ১৯৯১।

কাদের সিদ্দিকী, *স্বাধীনতা '৭১*, ঢাকা: বঙ্গবন্ধু প্রকাশনী, ১৯৯২।

কামরুদ্দীন আহমদ, *স্বাধীন বাংলার অভ্যুদয় এবং অতঃপর*, ঢাকা: নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮২।

কামরুজ্জামান লিটন, *বঙ্গবন্ধু স্মারক গ্রন্থ*, ঢাকা: রূপ প্রকাশনী ১৯৯৭।

খন্দকার মোশাররফ হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধে বিলাত প্রবাসীদের অবদান*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ২০০৮।

ছদরুদ্দীন, *মুক্তিযুদ্ধ : বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।

জে.ডব্লিউ. চৌধুরী, *অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো*, ঢাকা, ১৯৭১।

তপন কুমার দে, *মুক্তিযুদ্ধে নারী সমাজ*, ঢাকা: নিউ এজ পাবলিকেশন্স, ১৯৯৮।

তাজুল মোহাম্মদ, *মুক্তিযুদ্ধ ও প্রবাসী বাঙ্গালি সমাজ*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ২০০১।

নুরুল ইসলাম, *প্রবাসীর কথা*, সিলেট: প্রবাসী পাবলিকেশন, ১৯৮৯।

পারভেজ হোসেন, *একাত্তরের ঘাতক ও দালালদের অতীত ও বর্তমান*, ঢাকা: শিখা প্রকাশনী, ১৯৯২।

ফরিদ কবির (অনু.), *মুক্তিযুদ্ধের ঘাতক*, ঢাকা: পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮।

ফরিদা আখতার (সম্পা.), *মহিলা মুক্তিযোদ্ধা*, ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা, ১৯৯৪।

বদরুদ্দিন উমর, *একাত্তরের স্বাধীনতাযুদ্ধে বাংলাদেশের কমিউনিস্টদের রাজনৈতিক ভূমিকা*, ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন, ১৯৯৬।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বশীর আল হেলাল, *একাত্তরের গণহত্যা* : হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট, ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০১।
বেগম ফোরকান, *স্বাধীনতা সংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে নারী*, ঢাকা: সুমী প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১৯৯৮।
বেগম মুশতারী শফি, *স্বাধীনতা আমার রক্তা ঝরা দিন*, ঢাকা: প্রিতম প্রকাশনী, ১৯৮৯।
বেগম মুশতারী শফি, *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রামের নারী*, ঢাকা: প্রিতম প্রকাশনী, ১৯৯২।
বেলাল মোহাম্মদ, *স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।
বেবী মওদুদ, *বাংলাদেশের নারী*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
ভবেশ রায়, *বঙ্গবন্ধুর জীবন কথা*, ঢাকা: এশিয়া পাবলিশার্স, ১৯৯০।
মইদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৬।
মফিজুল হক, *বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ও বাংলাদেশ*, ঢাকা: মৌলিক প্রকাশনী, ১৯৯৭।
মযহারুল ইসলাম (সম্পা.) *শহীদ বুদ্ধিজীবী স্মরণে*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৭৩।
মালেকা বেগম, *বাংলার নারী আন্দোলন*, ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।
মিজানুর রহমান চৌধুরী, *রাজনীতির তিনকাল*, ঢাকা: হাফেজ মাহমুদা ফাউন্ডেশন, ২০০১।
নাসিরউদ্দিন, *যুদ্ধে যুদ্ধে স্বাধীনতা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
মোখলেছুর রহমান (অব.), *একাত্তরের শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা খালেদ মোশারফ বীর উত্তম*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপটে বিরোধী শক্তি ও বৃহৎ শক্তির প্রতিক্রিয়া*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম, *শেখ মুজিব ও স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৫।
রফিকুল ইসলাম, *উত্তর জনপদে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৬।
রফিকুল ইসলাম, *একটি ফুলকে বাঁচাবো বলে*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৮।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধের রণকৌশল*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৯।
রফিকুল ইসলাম, (সম্পা.), *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ : ঐতিহাসিক ভাষণ ইস্তেহার ও চিঠি*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৭।
রফিকুল ইসলাম, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ: প্রতিরোধের প্রথম প্রহর*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে প্রবাসী সরকার*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৯৩।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধ ও বুদ্ধিজীবী*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৯২।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রফিকুল ইসলাম, *রণাঙ্গনে জেড ফোর্স, কে ফোর্স, এস ফোর্স*, ঢাকা: অনিন্দ্য, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম, *দক্ষিণ রণাঙ্গন*, ১৯৭১, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৩।
রফিকুল ইসলাম, *মুক্তিযুদ্ধে দু'শো রণাঙ্গন*, ঢাকা: অনন্যা, ১৯৯২।
রফিকুল ইসলাম, *লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৮৮।
জেনারেল কে.এম. সফিউল্লাহ, বীর উত্তম (ভাষান্তর: সিদ্দিকুর রহমান), *মুক্তিযুদ্ধে বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।
মুনতাসীর মামুন, *ইয়াহিয়া খান ও মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১।
মুনতাসীর মামুন, *পরাজিত পাকিস্তানি জেনারেলদের দৃষ্টিতে মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৯।
মুনতাসীর মামুন, *ইতিহাসের আলোয় শেখ মুজিবর রহমান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৫।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *একাত্তরের বিজয় গাথা*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
মুনতাসীর মামুন ও মহিউদ্দিন আহমদ (সম্পা.), *পাকিস্তানিদের দৃষ্টিতে একাত্তর*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫।
মুনতাসীর মামুন, *বলে যেতে হবে মুক্তিযুদ্ধের গাথা*, ঢাকা: খান ব্রাদার্স এন্ড কোম্পানী, ১৯৯২।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ চর্চা-১*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৩।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ চর্চা-২*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৩।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *বাংলাদেশ চর্চা-৩*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৫।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ-৫ খণ্ড*, ঢাকা: সময় প্রকাশনী, ২০০৫।
মুনতাসীর মামুন, *যে সব হত্যার বিচার হয়নি*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।
মুনতাসীর মামুন, *রাজাকারের মন*, ২ খন্ড, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০০।
মুনতাসীর মামুন, *সেই সব পাকিস্তানি*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৯।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *চুকনগরে গণহত্যা*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০২।
মুনতাসীর মামুন, *বঙ্গবন্ধু ও বাংলাদেশ*, ২ খণ্ড, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৪।
মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধপঞ্জি-১*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৪।
মুনতাসীর মামুন ও হাসিনা আহমেদ (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ পঞ্জি-২*, ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা ২০০৪।
মুনতাসীর মামুন (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধ কোষ*, ৫ খন্ড, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০৫।
মুনতাসীর মামুন, *গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ১২ খণ্ড, ঢাকা: অনন্যা, ২০০৮।
মুহাম্মদ আব্দুশ শাকুর, *ময়মনসিংহে একাত্তর*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ২০০৫।
মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম, *রক্তের বদলে*, ঢাকা: সাহিত্যমালা, ১৯৯০।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মুহম্মদ নূরুল কাদের, *দুশো ছেষট্টি দিনে স্বাধীনতা*, ঢাকা: মুক্ত প্রকাশনী, ২০০০।
মোহাম্মদ নূরুল কাদের, *একাত্তর আমার*, ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৯।
মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশ মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতে রাজনৈতিক দল*, ঢাকা: ইউপিএল, ২০০৪।
মোহাম্মদ ফায়েক উজ্জামান, *মুজিবনগর সরকার ও বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী।
মঈদুল হাসান, *মূলধারা ৭১*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি:, ১৯৮৬।
মাসুদা ভাট্টি, *বাঙালির মুক্তিযুদ্ধ ব্রিটিশ দলিলপত্র*, ঢাকা: জোৎস্না পাবলিশার্স, ২০০৩।
মাসুদুল হক, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ*, ঢাকা: ১৯৯০।
মাজহারুল ইসলাম, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৮।
মনি সিংহ, 'মুক্তিযুদ্ধে কমিউনিস্ট পার্টি', মেসবাহ কামাল (সম্পা.), *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বামপন্থিদের ভূমিকা*, ঢাকা: গণপ্রকাশনী, ২০০১।
মফিদুল হক, 'পাকিস্তানের কারাগারে শেখ মুজিবের বন্দিজীবন', ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ, ১৯৯৮ ।
মৈত্রে দেবী, *এত রক্ত কেন*, কলকাতা: নাথ পাবলিশিং, ১৯৮৫।
মোস্তফা হারুন, *ভূট্টো, মুজিব, জিয়া*, ঢাকা: সৌখিন প্রকাশনী, ১৯৮১।
মোস্তাক হোসেন, *একাত্তরের পাকবাহিনীর বন্দি শিবির*, ঢাকা: দিনরাত, ১৯৮৯।
মোস্তাক হোসেন, *একাত্তরে ঘাতক ও দালালের বিচার*, ঢাকা: অবসর প্রকাশনী, ১৯৯০।
মো. আব্দুল আজিজ, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও সর্বাধিনায়ক ওসমানি*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।
মো. আলী নকী ও ইমাদ উদ্দিন (সম্পা.), *আমাদের সংগ্রাম চলবেই*, ২ খন্ড, ঢাকা: অপরাজেয় সংঘ, ১৯৮৯।
মো. কামরুজ্জামান (অধিনায়ক, শৈলকূপা বাহিনী), রক্তে রাঙা বিজয়–৭১, ঢাকা: ১৯৯৬।
মো. মমিনুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে ফ্রগম্যান*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০২।
মোহাম্মদ আজগর খান, *জেনারেল ইন পলিটিক্স, পাকিস্তান, ১৯৫৮-৮২*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লি., ১৯৮৩।
মোহাম্মদ আবদুল মোহাইমেন, *ঢাকা আগরতলা মুজিবনগর, ১ম খন্ড*, ঢাকা: পাইওনিয়ার পাবলিকেশন, ১৯৮৯।
মোহাম্মদ আলম খান (সম্পা.), *স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার বিদ্রোহী কণ্ঠ মওলানা ভাসানী*, খুলনা: স্বাধীকার প্রকাশনী
মোহাম্মদ জহিরুল ইসলাম, *বাংলাদেশের অভ্যুদয় : আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ*, ঢাকা: ইমপ্রেস পাবলিশার্স, ১৯৮৩।
মোহাম্মদ মফিকুল ইসলাম, *জয় বাংলা জয় মুজিব*, ঢাকা: মকসুদ প্রকাশনী, ১৩৭৮।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোহাম্মদ মোদাব্বের, *মুক্তি সংগ্রামে বাঘা সিদ্দিকী*, ঢাকা: শিরিন প্রকাশন, ১৯৭৩।
মোহাম্মদ সেলিম, *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ও ভারতের রাজনৈতিক দল*, ঢাকা : বাংলাদেশ চর্চা, ২০০৪।
মোহাম্মদ হাফিজুর রহমান, *মুক্তিযুদ্ধে আফছার ব্যাটালিয়ান*, ময়মনসিংহ: আজাদ প্রেস, ১৯৭২।
মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার ইতিহাস-একটি অনুসন্ধান*, ঢাকা: স্টুডেন্ট ওয়েজ, ১৯৯৬।
মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, (১৮৩০-১৯৫২), ১ম* খণ্ড, ঢাকা: ভিন্নমত, ১৯৮৪।
মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, (১৯৫৩-১৯৬৯), ২য় খণ্ড, ঢাকা: ওয়ার্সী প্রকাশনী, ১৯৮৭।
মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, প্রাক-মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, ৩য় খণ্ড, ঢাকা: গ্রন্থলোক, ১৯৯০।
মোহাম্মদ হান্নান, *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*, মুক্তিযুদ্ধ পর্ব, ৪র্থ খণ্ড, ঢাকা: গ্রন্থলোক, ১৯৯০।
যতীন চট্টোপধ্যায় (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৮৭।
রতনলাল চক্রবর্তী (সংকলন ও সম্পাদক), *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যা : ১৯৭১, জগন্নাথ হল*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ২০০০।
রফিকুল ইসলাম, *নরহত্যা ও নারী নির্যাতনের কড়চা, ১৯৭১*, ঢাকা: অন্যান্য প্রকাশনী, ১৯৯৪।
রফিকুল ইসলাম, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
রবার্ট পেইন, *ম্যাসাকার* (অনু: গোলাম হিলালী), ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৯।
রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *একাত্তরের দশ মাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
রশীদ হায়দার, *অসহযোগ আন্দোলন : একাত্তর*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষগ্রন্থ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৫।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *১৯৭১ : ভয়াবহ অভিজ্ঞতা*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, ১৯৮৯।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *স্মৃতি '৭১*, ১ম খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৭।
রশীদ হায়দার (সম্পা.), *স্মৃতি '৭১*, ২য় খন্ড, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৯।
রাও ফরমান আলী (ভূমিকা মুনতাসীর মামুন), *বাংলাদেশের জন্ম*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৯৬।
রিয়াজ আহমেদ, গণমাধ্যমে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, প্রথম খণ্ড, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস, লিমিটেড, ২০০৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রেহমান সোবহান, আমার সমালোচক আমার বন্ধু, ঢাকা: সেন্টার ফর পলিসি ডায়লগ, ২০০৭।
রেহমান সোবহান, *বঙ্গবন্ধু ও স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়*, ঢাকা।
রেহমান সোবহান, *বাংলাদেশের অভ্যুদয়: একজন প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৮।
রবীন্দ্রনাথ ত্রিবেদী, *৭১ এর দশ মাস*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
শেখ নাছির আহম্মেদ রাজিব, *সম্মুখ সমরে*, চুয়াডাঙ্গা: চুয়াডাঙ্গা সাহিত্য পরিষদ, ১৯৯৩।
শেখ আব্দুল মান্নান, *মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্যের বাঙালিদের অবদান*, ঢাকা : জ্যোৎস্না পাবলিশার্স, ১৯৯৮।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধে মুজিব নগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৫।
রাবেয়া খাতুন, *একাত্তরের নয় মাস*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।
রেভা. ফাদার যোসেফ রানা মন্ডল, *একাত্তরে দিনাজপুর ও শহীদ যাজকগণ*, খুলনা: গ্রন্থকার, ২০০১।
রুহুল আমিন বাবুল, *আগরতলা জটিলতা*, ঢাকা: রুনা প্রকাশনী, ১৯৭৮।
লায়লা সামাদ, *কড়চা '৭১*, ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী, ১৯৭৫।
শওকত ওসমান, *কাল রাত্রি খন্ড চিত্র*, ঢাকা: জনাচ্চিত্র প্রকাশনী, ১৯৮৬।
শফিক আহমেদ (সম্পা.), *একাত্তরের দালালেরা* (দালাল আইনে অভিযুক্তদের তালিকা, ১ম খণ্ড), ঢাকা: মুক্তিযোদ্ধা সংহতি পরিষদ, ১৩৯৪।
শামসুল আলম সাইদ, *মুক্তিযুদ্ধের মুখ চট্টগ্রাম*, ঢাকা: কাকলী প্রকাশনী, ১৯৯৪।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা*, ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স, ২০০০।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের রণাঙ্গনে*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *একাত্তরের বিজয়*, ঢাকা: প্রিমিয়ার বুক, ১৯৮৫।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *মুক্তিযুদ্ধ মুজিবনগর*, ঢাকা: বিজয় প্রকাশনী, ১৯৮৭।
শামসুল হুদা চৌধুরী, *রণাঙ্গনে মেজর সফিউল্লাহ*, ঢাকা: লেখক, ১৯৮১।
শাহ আবু রেজা, *৭ নং সেক্টর : মুক্তিযোদ্ধার ডাইরী*, নওগাঁ : বেগম মাসুমা ও ফারহানা রেজা, ১৯৯৫।
শাহ আহমদ রেজা, *ভাসানীর কাগমারী সম্মেলন ও স্বায়ত্তশাসন সংগ্রাম*, ঢাকা: গণ প্রকাশনী, ১৯৮৬।
শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *সেক্টর কমান্ডাররা বলেছেন মুক্তিযুদ্ধের স্মরণীয় ঘটনা*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ১৯৯৬।
শাহরিয়ার কবির (সম্পা.), *একাত্তরের দুঃসহ স্মৃতি*, ঢাকা: একাত্তরের ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি, ১৯৯৯।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শাহরিয়ার কবির, *একাত্তরের গণহত্যা, নির্যাতন এবং যুদ্ধাপরাধীদের বিচার*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।

শাহরিয়ার কবির, *শেখ মুজিব ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ১৯৯৭।

শেখ আবদুর রহমান, *জল্লাদের কবলে বাংলাদেশ*, ঢাকা: শেখ আবদুল ওয়াহেদ, ১৯৭২।

শেখ আবদুল জলিল, *একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ও বাম প্রগতিশীল শক্তি*, ঢাকা: ঢাকা প্রকাশনী, ২০০০।

শেখ মোহাম্মদ জাহিদ, *মুক্তিযুদ্ধে ছাত্রলীগ ও বাংলাদেশ লিবারেশন ফোর্স (বিএলএফ)*, ঢাকা: অঙ্কুর প্রকাশনী, ২০০২।

বিশ্ব বিশ্বাস, *জয় বাংলার মুক্তিযুদ্ধ*, কলকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস, ১৩৭৮।

সচ্চিনানন্দ সরকার, *বাংলার দামাল ছেলে*, কলকাতা: বিশ্বাস পাবলিশিং হাউজ, ১৩৭৮।

সত্যেন সেন, *প্রতিরোধ সংগ্রামে বাংলাদেশ*, ঢাকা: মুক্তধারা, ১৯৭১।

সুনীল কুমার গুহ, *মুক্তিযুদ্ধে বঙ্গবীর বাঘা সিদ্দিকী*, টাঙ্গাইল : মধুমতি, ১৯৭৩।

সুকুমার বিশ্বাস, *জাপান এন্ড ইমারজেন্স অফ বাংলাদেশ*, ঢাকা : আগামী প্রকাশনী, ...।

সেজান মাহমুদ, *মুক্তিযুদ্ধে নৌ কমান্ডোদের অভিযানের সত্য ঘটনা অপারেশন জ্যাকপট*, ঢাকা: প্রতীক, ১৯৯১।

সাইদ উদ দাহার, *রাষ্ট্রভাষা থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধ এবং অতপর*, ঢাকা; নওরোজ কিতাবিস্তান, ১৯৮৬।

সাইদুজ্জামান রওশন ও তুষার আবদুল্লাহ, *একাত্তরের অগ্নিকন্যা*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ১৯৯৭।

সিদ্দিক সালিক, *নিয়াজীর আত্মসমর্পণের দলিল (অনু: মামুদুল হক)*, ঢাকা: মডেল পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৮।

সিরাজুল রহমান, *বিবিসি'র দৃষ্টিতে বাংলাদেশের স্বাধীনতার পনের বছর*, ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড, ১৯৮৭।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চা, তত্ত্ব ও পদ্ধতি*, ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী, ২০০০।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে পরাশক্তির ভূমিকা*, ঢাকা: ডানা প্রকাশনী, ১৯৮২।

সৈয়দ আনোয়ার হোসেন, *'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে বহির্বিশ্বের ভূমিকা'*, সালাহ্উদ্দীন আহমদ ও অন্যান্য (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিসাহ ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: ১৯৯৭, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সালাহ উদ্দিন আহমেদ (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৭।
সাহিদা বেগম, *যুদ্ধে যুদ্ধে নয় মাস*, ঢাকা: নওরোজ সাহিত্য সংসদ, ১৯৮৩।
সুকুমার বিশ্বাস (সম্পা.), *মুক্তিযুদ্ধে দিনাজপুর : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৪।
সুকুমার বিশ্বাস, *অসহযোগ আন্দোলন '৭১ ও বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৬।
সুকুমার বিশ্বাস, *মুক্তিযুদ্ধে রাজশাহী : অংশগ্রহণকারী ও প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০০৬।
সুফিয়া কামাল, *মুক্তিযুদ্ধ মুক্তির জয়*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০১।
সুফিয়া কামাল, *একাত্তরের ডায়েরী*, ঢাকা: জ্ঞান প্রকাশনী, ১৯৮৯।
সুবেদার মেজর (অব.) এম. এমদাদুল হক, *শহীদের মর্মকথা*, ঢাকা: নুরুননেছা বেগম, ১৯৮৮।
সেলিনা হোসেন, *একাত্তরের ঢাকা*, ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস, ১৯৮৯।
স্বদেশ রায়, (সম্পা.) *একাত্তরে বিশ্বে বঙ্গবন্ধু*, ঢাকা: পল্লব পাবলিসর্স, ১৯৮৯।
স্বরোচিষ সরকার, *একাত্তরে বাগেরহাট*, ঢাকা: সাহিত্য বিলাস, ২০০৬।
হারুন হাবিব, *জনযুদ্ধের উপাখ্যান*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, ১৯৯৩।
হাশেম খান, *গুলিবিদ্ধ একাত্তর*, ঢাকা: সময় প্রকাশন, ২০০০।
হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকায় গেরিলা অপারেশন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৮৩।
হেদায়েত হোসাইন মোরশেদ, *অবরুদ্ধ সংবাদপত্র '৭১ এবং স্বাধীনতা যুদ্ধে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর রণনীতি ও রণকৌশল*, ঢাকা: নওরোজ, ১৯৮৩।
হেনা দাস, *একাত্তরের স্মৃতি*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনা, ১৯৯১।

গ. গ্রন্থ : ইংরেজি

Ahmad Salim, Blood Beaten Track: Sheikh Mujib's Nine Months in Pakistani Prison
Ahmed Moudud, *Bangladesh: Era of Sheikh Mujibur Rahman,* Dhaka: University Press Limited, 1990.
Alamgir Kabir, *This was Radio Bangladesh 1971*, Dhaka: Bangla Academy, 1984.
Rao Farman Ali, *How Pakistan Got Divided,* Lahore: Jang Publishers, 1992.
Aslam Siddiqi, *Pakistan seeks security*, Lahore: Longmans, 1960.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Azizul Haque, *Trends In Pakistan External Policy 1947-1971*, Appendix-xii, Dhaka: Asiatic Society Of Bangladesh, 1985.

Bhuiyan, Md. Abdul Wadud, *The Emergence of Bangladesh and Role of the Awami League,* new Delhi: 1982.

Bhutto, Zulfiqar Ali, Speeches in the United Nations Security Council, *Department of Films and Broadcasting, 1971.*

Craig Baxter (ed.), *Diaries Of Field Marshal Mohammad Ayub Khan 1966-1972*, Dhaka: The University Press Limited, 2007.

Ishtiaq Ahmad (ed.), *Pakistan is a Changing World,* Islamabad: Institute of Regional Studies, 1997.

Enayetur Rahim, Joyce L Rahim, *Bangladesh Liberation War And The Nixon White House 1971,* Dhaka: Pustaka, 2003.

Garg. Captain, S.K., *Spotlight: Freedom Fighters of Bangladesh,* Dhaka: Academic Publishers, 1984.

George Lenczowski, *The Middle East in World Affairs*, New York: University of California at Berkeley, Cornell University Press, 1964

Hasan Zahir, *The Separation Of East Pakistan The Rise And Realization Of Bengali Muslim Nationalism,* Dhaka: The Univeristy Press Limited, 1998.

Hassan, Lt. Gen, Gul, *Memoirs,* Karachi: Oxford Press, 1990.

Hassan, Zahir, *The Separation of East Pakistan,* Karachi: Oxford University Press, 1994.

Islam, Major Rafiqul, Psc. Retd, *Genocide in Bangladsh: Harrowing Accounts of Some Eye-Witness and the Extracts From the Press,* Dhaka: Upoma Prokashani, 1991.

Islam, Rafiqul, *A Tale of Millions Bangladesh Liberation War-1971,* Dhaka: Muktadhara, 1986.

Jacob, Lt. Gen. JFR., *Surrender at Dhaka: Birth of a Nation*, Dhaka: 2004

K M Shehabuddin, *There and Back Again A Diplomat's Tale*, Dhaka: The University Press Limited, 2006.

Khair, Md. Abul, United States Foreign Policy in the Indo-Pakistan Subcontinent (1939-1947) Vol. I, Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1968.

Khan, Air Marshal Asgor, *Generals in Politics, Pakistan, 1958-1982,* Dacca: University Press Limited, 1983.

Lt. Gen. (Retd) Kamal Matinuddin, *Tragedy of Errors East Pakistan* (Crisis 1968-1971), Rawalpindi: 1994.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

Mahfuz Ullah, *Ulfa & The Insuregency In Assam*, Dhaka: Adorn publication, 2012.
Major Jodh Singh (Army Educational Crops (Retd.), & P. N. Khera (Formerly of Ministry of Defense, Government of India, *Indira's India,* An Publication, 1972.
Martin Gilbert, *Challenge to Civilization*, London: Harper collins, 2000.
Mohammad Ali Asghar, *Bangladeshi Community Organisations in East London,* London: Heritage Limited.
Muhith AMA, *American Response to Bangladesh Liberation War*, Dhaka: UPL 2004.
Niaji, Lt-Gen. A.A.K., *The Betrayal of East Pakistan,* Dhaka: UPL, 2004.
Richard Sisson & Leo E Rose, *War And Secession Pakistan, India, and the creation of Bangladesh*, New Delhi: Vistaar Publications, 1990.
S. R. Chowdhury, *The Genesis of Bangladesh,* London: 1972.
Salik, Siddiq, *Witness to Surrender*, Oxford: Oxford University Press, 1977.
Selim Ahmad, A. Ismail & Dipu (ed.), *Bidrohi Bangla, Birmingham: East Pakistan Liberation Front*, London: 1971.
Shafiullah, Maj. Gen. K.M., *Bangladesh at War,* Dhaka:Academic Publishers, 1989.
Shyamali Ghosh, *The Awami League 1949-1971,* Dhaka: 1990.
Siddiq Salik, Witness to Surrender, Karachi: Oxford University Press, 1978.
Wolpert, Stanely, *Zulfikar Bhutto of Pakistan: His Life and Times,* Newyork: Oxford, 1993.
Zaidi, M. and S. G. Zaidi, *The Encyclopaedia of the Indian National congress,* Vol. 21, 1970-1971, New Delhi: 1984.

ঘ. পত্র-পত্রিকা

অমৃত বাজার, কলিকাতা, ১৯৭১।
দৈনিক আজাদ
দৈনিক আনন্দ বাজার, কলিকাতা
দৈনিক ইত্তেফাক
দৈনিক বাংলা
দৈনিক পূর্বদেশ
দৈনিক কালান্তর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৈনিক সংগ্রাম
দৈনিক পূর্বদেশ
দৈনিক পাকিস্তান
দৈনিক প্রথম আলো
দৈনিক বাংলা
দৈনিক যুগান্তর
দৈনিক সংবাদ, বাংলাদেশ।
The Daily New York Times
Asian Recorder (New Delhi)
India News
The Patriot
The Statesman
The Pakistan Times
The Pakistan Observer
The DAWN, Karachi
The Hindustan Times
Al-Ayyam, Khartom
Times of India, New Delhi.

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দসূচি

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শব্দ সূচি

অ

অশোক রায়
৫৭, ৫৯, ২৯১
অরুন্ধতি ঘোষ
৯০
অশোক সেন
১২৫
অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়
১২৭
অক্সফোর্ড
১২৯
অস্ট্রিয়া
১৩৫, ৩০৬, ৩১৭
অটোয়া
১৫৩, ১৫৪, ৩০১, ৩০৭
অরনল্ড স্মিথ
১৫৫
অপারেশন সার্চলাইট
২০৩
অস্ট্রেলিয়া
২২৭, ৩০৫, ৪২১
অটল বিহারী বাজপেয়ী
২৩৫, ২৭০, ২৮৫, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৮
অমৃত নাহাতা
২৭৭
অবজারভার (ব্রিটিশ পত্রিকা)
৩১৬
অমৃতশ্বর
৩২১, ৪১৯
অবন্তীপুর
৩২১, ৪১৯

আ

আকাশবাণী
১৬, ২০৬, ২৭৮, ২৭৯
আব্দুল মতিন
১৬, ১২০, ১২৩, ১৩৯
আবু সাঈদ চৌধুরী
১৬, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৭০, ৭২, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২, ১৬৭, ১৬৮, ৩১৫, ৩৩৮, ৪২৬, ৪২৭, ৫০০, ৫৭৫
আইয়ুব খান
১৮, ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৯, ৩৮, ১১৮, ১২০, ১২২, ২৫৮, ৩৩৩, ৩৫৭, ৩৬২, ৩৮৫, ৪৭০, ৪৮৬, ৪৯৬, ৫১৬, ৫১৮, ৫২৯, ৫৩২, ৫৬২, ৫৬৩
আওয়ামী লীগ
২১, ২২, ২৪, ৩০, ৫৩, ৫৪, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৭৬, ৭৮, ৭৯, ১২০, ১২১, ১২৮, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৬৭, ২০৬, ২১২, ২১৩, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৪, ২২৯, ২৩৩, ২৩৮, ২৫৯, ২৬০, ২৮৩, ২৮৯, ২৯০, ২৯৫, ২৯৬, ৩০৫, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩৭০, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৩, ৪০৪, ৫০০, ৫০২, ৫০৯, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৬৩
আব্দুল কাইয়ুম খান
২২
আতাউর রহমান খান
২২, ১৬৯, ১৭১, ১৭২
আবু হোসেন সরকার
২২
আনন্দ বাজার (পত্রিকা)
৬৭, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮
আব্দুল মোমেন
২৪, ১৩৩, ১৪৬
আগরতলা
২৪, ১২০, ২৭৮, ৫৬৩
আমজাদুল হক
৩২, ৫২, ১৪৫, ১৭৪
আব্দুস সামাদ আজাদ
৩৭, ৭৮, ১৩৯, ১৫২, ২৩৪, ২৭৭
আব্দুর রাজ্জাক
৬০, ১৩২, ১৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমীর-উল-ইসলাম
৬১, ১২৭
আব্দুল ফাতেহ
৬৩, ১৪৬
আব্দুল মান্নান
৬৩, ৬৪, ১১৬, ১৭১, ২৩৪
আনোয়ার সাদাত
৬৬
আলজেরিয়া
৭২, ১৩০, ২৭৩, ৩৫৮, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৯৪, ৪২১, ৪২২, ৪৭৩, ৪৭৫
অ্যালেক ডগল্যাস হিউম
৭৪, ৭৫ ১২৬, ১২৭, ১৩৪, ২০৭, ২১৭, ২২৫, ২৪১, ২৯৯, ৩০০, ৫০০, ৫০১, ৫০৯, ৫৭১, ৫৭২
আর্থার বটমূলী
৭৫, ১২৫, ২৩৬, ৫৭২
আব্দুর রহিম
৭৬, ১৪৬
আঁন্দ্রে মালরো
৭৭
আফগানিস্তান
৭৮, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৭, ৩৯৪, ৪২১, ৪২৩, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৫৭৩
আশরাফ আলী চৌধুরী
৭৮
আব্দুল গাফফার খান
৭৮
আর্চার কে ব্লাড
৮৬, ৮৭
আনোয়ারুল করিম চৌধুরী
৯০
আর্জেন্টিনা
৯১, ১৪৬, ১৬২, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৬, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৩
আলী মাষ্টার
১১৬
আগা হিলালী
১১৯, ৩৩৮
আলীম চৌধুরী
১১৯
আজিজুল হক
১১৯
আফরোজ মিয়া
১২০, ১৬৯
আরনল্ড স্মিথ
১২৭
আব্দুল মালেক
১৪০
আখতার সোলায়মান
১৪২
আইজুল হক মিয়া
১৪৪
আলবামা
১৫১
আরকানসাস
১৫১
আসহাবুল হক
১৫২
আলী ইউসুফ
১৫৭
আয়ারল্যান্ড
১৫৮
আমিনুল ইসলাম
১৫৮
আবুল ফজল শামসুজ্জামান
১৫৯, ১৬০
আব্দুর রহমান খান
১৬২
আঁন্দ্রেমালরো
১৬২
আন্দ্রেই ভজনেসেনস্কি
১৬৪
আবু আহমেদ
১৬৬
আব্দুর বশীর
১৬৬
আবুল কালাম আব্দুল সিদ্দিকুল্লা
১৬৬
আজিজুল হক ভুইয়া
১৬৮

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আফরোজ আফগান চৌধুরী
১২১, ১৬৮
আনোয়ারা জাহান
১৬৮, ১৬৯
আবুল হোসাইন
১৬৯
আমীর আলী
১৬৯, ১৭১
আহমেদ হোসাইন জোয়ারদার
১৭০
আব্দুস সালাম চৌধুরী
১৭০
আকবর আলী
১৭০
আর ইউ আহমেদ
১৭০
আব্দুল আহাদ
১৭১, ১৭৩
আবুল হামিদ
১৭১
আব্দুল্লাহ ফারুক
১৭১
আব্দুল মুদাব্বির তরফদার
১৭১
আলতাফুর রহমান চৌধুরী
১৭২
আসাব আলী
১৭২
আব্দুস সালাম চৌধুরী
১৭২
আলহাজ্ব আব্দুল মতিন
১৭২
আলফ্রেড ইভেনস্
১৭৩
আবুল আহাদ
১৭৩
আবুল কালাম
১৭৩
আজাদ চৌধুরী
১৭৩
আজমত আলী
১৭৩
আজম আলী
১৭৩
আনিসুর রহমান
১৭৩
আনওয়ারুল করিম চৌধুরী
১৭৪
আব্দুর রাজ্জাক খান
১৭৪
আবু রুশদ মতিন উদ্দিন
১৭৪
আব্দুর রউফ
১৭৫
আব্দুল মোমিন
১৭৫
আজিজুল হক চৌধুরী
১৭৫
আকবর মীর্জা
২১২
আগাশাহী
২১২, ২৩৯, ৪০৩, ৪২৪
আবুধাবী
২১৭
আব্দুল ফাতেহ
২৩৪
আর.ডি ভান্ডারী
২৬৩
আচার্য বিনোভাভ্
২৭৬
অমৃত বাজার (পত্রিকা)
২৭৮
আলাউদ্দিন
২৮৮
আম্বালা
৩২১, ৪১৯
আগ্রা
৩২১, ৪১৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আহমদ লারাকি
৩৬৩
আলবেনিয়া
৩৬৪, ৪২২
আহমেদাবাদ
৩৬৫
আব্দুল মালেক মুত্তালিব
৩৬৫
অ্যাডমিরাল মোজাফফর হাসান
৩৭৪
আনোয়ার সাদাত
৩৭৪
আলহাজ্ব গিয়াস উদ্দীন আব্দুল কাদেরী আখরেদী
৩৭৬
আল-আহরাম পত্রিকা (কায়রো)
৩৭৬
আমিন
৩৭৯
আদনান কামেল সালাহ
৩৮৪
আমির তাহেরি
৩৮৭, ৩৮৮
আয়ারল্যান্ড
৪২১
আইসল্যান্ড
৪২১
আদম মালিক
৪২১
আসাম
৪৭৮, ৫৩৩
আইভেরি কোস্ট
৪৮১
আইসেন হাওয়ার
৫১৪, ৫৩২
আলেকজেন্ডার এম হেগ
৫২৩, ৫৩৮
আজহারুল আনোয়ার চৌধুরী
৩৬৭
আহমেদ তারিক করিম
৩৬৭
আফসারুল কাদের
৩৬৭
আঙ্কারা
৩৬৭
আরউইন
৫৪১
অ্যাডমিরাল কৃষ্ণণ
৫৪৩

ই

ইন্দিরা গান্ধী
১৫, ৩১, ৩৩, ৫৭, ৬৫, ৭২, ৭৩, ৭৯, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯১, ৯২, ১৫৯, ২০৬, ২০৭, ২১৬, ২১৭, ২১৯, ২২২, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ২৪০, ২৪৪, ২৬২, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৯, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৫, ৩০৯, ৩১০, ৩১৪, ৩১৬, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২৪, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৯, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭৪, ৩৭৫, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪৩৭, ৪৪৪, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯১, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০১, ৫০৩, ৫০৪, ৫১১, ৫১২, ৫২১, ৫২৪, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৮, ৫৬৩, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭২
ইস্কান্দার মীর্জা
২০, ২২, ১১৭, ৪৯৬
ইয়াহিয়া খান
২৬, ২৯, ৩০, ৫৩, ৬১, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৭৪, ৭৯, ৮৩, ৮৫, ৮৮, ৯৩, ৯৫, ১২০, ১২১, ১২৬, ১২৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৪৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৪২, ২৪৪, ২৫৮, ২৬৪, ২৭৪, ৩০০, ৩০৬, ৩০৮, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৪, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৩, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৪০৩, ৪০৬, ৪০৭, ৪১০, ৪১৪, ৪১৮, ৪১৯, ৪৩৫, ৪৩৮, ৪৪৪, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৯৮, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৯, ৫১১, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৮, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৬৭, ৫৭০, ৫৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইসলামাবাদ
৫৩, ৬৯, ৭৭, ৮৭, ১৪৪, ১৪৫, ২১৭, ২২৮, ২৩৩, ২৪১, ২৪৩, ৩৬৬, ৩৭২, ৩৯২, ৪৮৪, ৪৯৯, ৫০২, ৫২৬, ৫৩৬, ৫৪০, ৫৪৫
ইরান
৭১, ৭২, ৭৮, ১৩০, ১৬১, ২১৭, ২৩৮, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৯০, ৩৯৩, ৪২১, ৪২২, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫০৭, ৫২৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৭৩
ইরাক
৭২, ৯১, ১৩০, ১৬১, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৩
ইয়ান সাদারল্যান্ড
৭৪, ১২৬
ইয়ার মিকার্গো
৭৫
ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট
৮০, ৩২২
ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস
৮০, ৩২২
ইয়ান মিকাডো
১২৪
ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়
১২৭
ইনগ্রিড গার্ডেওয়াইডেমার
১৩২
ইয়ান স্টেফেনসন
১৩২
ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৩
ইতালী
১৩৫, ৩০৬, ৩৭৫, ৪২১, ৪২২, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৪১, ৪৯৫
ই, রহমান
১৭০
ইস্রাইল আলী
১৭১
ইসহাক হোসাইন
১৭১
ইলিন কননেট
১৭৩
ইউ এ জনসন
২২০
ইউসুফ আজাদ
২৭৬
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস
২৭৮
ইন্দ্রজিৎ গুপ্ত
২৮৫
ইউলি ভোরোন্টসোভ
৩০৩
ইন্দোনেশিয়া
৩০৫, ৩০৬, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৬, ৪২১, ৪২২, ৪৭২, ৪৭৫, ৫১৫, ৫৩৫, ৫৭৩
ইসরাইল
৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৪, ৩৮৬, ৩৯৪, ৪২১
ইয়েমেন
৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৪২১
ইস্তাবুল
৩৬৭
ইদি আমিন
৩৭৪
ইকবাল আহমেদ আখন্দ
৩৭৪
ইসমাত টি কিত্তানি
৪০৭
ইকোয়েডর
৪২২, ৪২৪
ইথিওপিয়া
৪২২
ইন্টারকন্টিনেন্টাল (হোটেল)
৫৪৫

উ

উথান্ট
৩৪, ৬৬, ২১৭, ২১৮, ২৭৩, ৩০৪, ৩৩৬, ৪০৩, ৪০৫, ৪০৬, ৪১৪, ৫৩৫
উইলিয়াম
২১৯
উগান্ডা
২৩৬, ৪২১
উড়িষ্যা
২৮৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উইলি স্টফন
৩০৬
উইল ব্রান্ট
৩০৮
উগান্ডা
৩৭৪
উরুগুয়ে
৪২১, ৪২৪
উত্তর কোরিয়া
৪৯৫
উইনস্টন
৫১৬, ৫২৩, ৫২৭

এ

এফ. আর. খান
৩৫
এম. আর. সিদ্দিকী
৩৬, ৭২, ১৫২, ১৫৩
এ. আর. মল্লিক
৩৬, ৭২, ১৩৬, ১৫২
এ. এম. এ মুহিত
৩৬, ৭২, ১৩০, ১৩৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৫২, ১৫৬, ১৭৪
এ. আর. আক্তার মুকুল
৬৪, ২৩৪
এ. এইচ. এম কামারুজ্জামান
৬৪, ২২৭, ২৮৯
এডওয়ার্ড হীথ
৬৬, ১৪০, ২০৬, ২০৭, ২২৫, ২২৬, ২৯৯, ৩০০, ৩০৮, ৫০০, ৫০১, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫৭১, ৫৭২
এ. এইচ. মাহমুদ আলী
৭২, ১৩০, ১৪৫, ১৫০, ১৫২, ১৭৪
এস. এম. মাসউদ
৭৬, ১৪৬, ১৭৫
এইচ, কে, লাল
৭৮
এম. মাকসুদ আলী
৮২
এ, কে, রায়
৯০
এন্ড্রু ফাউলস
১২৪
এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস
১২৫
এগিলার
১২৬
এলিজাবেথ
১৩০
এনায়েত রহিম
১৪৮, ১৭৪
এ. এফ. এম. আবুল ফতেহ
১৫২, ১৭৪
এম ইউনুস
১৫৩
এফ ফয়সাল
১৫৩
এ টেইনার
১৫৩
এন্ড্রু ক্রুইন
১৫৪
এস. এম. রহমান
১৫৫
এম. এইচ. এ প্রামাণিক
১৫৬
একরাম আলী
১৬০
এস. এম. আলী
১৬১
এ . কে. এম নূরুল হুদা
১৬৬
এলফ্রেড এভাঙ্গে
১৬৬
এ. জেড. মোহাম্মদ হোসাইন
১৬৮
এ, কে নজরুল ইসলাম
১৬৮
এ. টি. এম. ওয়ালী আশরাফ
১৬৮
এম এনামুল হক
১৬৯
এম, এ রউফ
১৬৯
এম, এ হাকিম
১৬৯
এ. টি. এম জাফরুল্লাহ চৌধুরী
১৬৯

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এম এ আজিজুল হক ভুইয়া
১৬৯
এম. ইউ. আহমেদ
১৬৯
এম, এ রাজ্জাক খান
১৬৯
এ. এম. আইয়ুব
১৬৯
এইচ তালুকদার
১৭০
এ রহিম চৌধুরী
১৭০
এম. এ. সামাদ খান
১৭০
এ. এইচ. জোয়ারদার
১৭০
এ মুতালিব
১৭০
এম. এ. মতিন
১৭০
এম লতিফ আহমেদ
১৭০
এম জহিরুল এইচ চৌধুরী
১৭০
এ. এইচ. চৌধুরী
১৭১
এম. এন. জামান
১৭২
এ. এম. শরফুল আলম
১৭৪
এম মোস্তাফিজুর রহমান
১৭৫
এম রেজাউল করিম
১৭৫
এ. কে. ব্রোহী
২০৮, ২০৯, ২১০, ২২৫
এল. কে. ঝা
২২০, ২২১, ২৩৪, ৫৪১
এ. বি. এম. নূরুল ইসলাম
২৩৩
এইচ. বি. জামান
২৩৩
এয়ার মার্শাল আজগর খান
২৩৭
এ. কে. গোপালন
২৬৫
এস. এ. শামীম
২৬৫
এম, সি চাকলা
২৭৩
এস. কে. সেন
২৭৫
এন. জি. গোরে
২৮৫
এস. এন. মিশ্র
২৮৫
এম. মনসুর আলী
২৮৯
এম. মালহোত্রা
২৯২
এন মৃধা
২৯২
এন্থনী কেরশার
৩০৭
এ. এম. মালিক
৩১০, ৫৪৩
এন. বি. সি. টেলিভিশন
৩১৬
এম. এস. গুরুপাধ্যায় স্বামী
৩২৫
এম করুনানিধি
৩২৬
এ. এইচ. এম. মুখার্জী
৩৪০
এ. এইচ. কে. পন্নি
৩৬৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এ. এইচ. খান
৩৬৭
এইচ. এইচ. মারজুকি জাতিস
৩৬৯
এস. কোরেশী
৩৭৫
এল. মেজভ জোরে
৪০৯
এ. আর. সুকার্নো
৪৭৫
এডমিরাল মুরার
৫৩৫

ও

ওয়াশিংটন
২৯, ৩২, ৩৫, ৩৬, ৫৪, ৮৬, ৯০, ১৩৬, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫২, ১৫৩, ১৬৬, ২০৪, ২০৭, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২৩১, ২৩৪, ৩০১, ৩০২, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৯, ৩১৫, ৩২১, ৩৩৫, ৩৬২, ৪১৯, ৪৩৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৯, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৯০, ৫০৪, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২২, ৫২৩, ৫২৬, ৫২৯, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৪১, ৫৪৫, ৫৬৭
ওজুকো (জেনারেল)
৫১
ওসমানী (আতাউল গণি ওসমানী/কর্নেল/জেনারেল)
৫৭, ৮৯, ১৫৯, ৩২০, ৩২১, ৪১৮
ওয়ার উইক
৭৬
ওয়ালিউর রহমান
১৪৬, ১৭৫
ওমর আবুরিশ
৭৭
ওয়াই. বি. চ্যাবন
৮৭, ২৯২
ওয়ালী আশরাফ
১২৭, ১৫৬,
ওয়াং হুয়া
১৬৬, ৫২৩
ওমান
১৬১, ৩৬৩, ৩৭০
ওয়াহিদা রহমান
২৭২, ২৭৬
ওট্টো উইনজার
৩০৬
ও, আই, সি
৩৫৬

ক

কাশ্মীর
১৮, ৩৮, ২৫৮, ২৬১, ২৮৪, ২৯৪, ৩৩৩, ৩৬০, ৩৬১, ৪১৪, ৪২০, ৪৩৭, ৪৪০, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৯১, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০২, ৫০৩, ৫০৭, ৫২২, ৫২৪, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৮, ৫৬২
ক্রেমলিন
২৮
কলকাতা
৩২, ৫৭, ৬০, ৬২, ৬৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯০, ১৫০, ২২০, ২২৯, ২৩১, ২৩৪, ২৬৯, ২৭১, ২৭৫, ২৭৮, ২৯১, ২৯৭, ৩১৩, ৩২১, ৩৮৪, ৪১৯, ৫৪৫
কে. এম. শাহাবুদ্দিন
৩২, ৫২, ১৭৪, ৩৬৬
কোপেনহোগেন
৩৪
ক্রিস্টেন ওস্টেগার্ড
৩৪
কিসিঞ্জার
৩৪, ৭১, ৮৬, ৮৮, ১৩৬, ১৪৮, ১৬৬, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২১৪, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২৩৮, ৩০১, ৩০৩, ৩১১, ৩২৯, ৩৩১, ৪০২, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪১, ৪৪৪, ৪৭৫, ৪৮০, ৪৮৪, ৪৮৮, ৪৮৯, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৮, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেনেডি
৩৪, ৩৬, ৭১, ৮৯, ১৩৭, ২১৯, ২৩০, ৩৮৪, ৩৮৫, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭৩, ৫২০
ক্রিস্টেফার ভ্যান হোলেন
৫৫, ৮৬
কুমিল্লা
৬১, ৬৩, ২২৯, ২৩০, ৩৭২
কাজী জহিরুল কাইয়ুম
৬১, ৬২, ৬৩, ৮৫, ৮৬, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৯০, ৩১৩
কম্বোডিয়া
৬৭, ৪৭২, ৫১৮, ৫২০
কমিউনিস্ট পার্টি (বাংলাদেশ)
৬৭, ৬৮, ৭৩, ২৬০
কানাডা
৬৯, ১২২, ১৩৪, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬৭, ১৬৮, ২২৭, ৩৮৪
কোসিগিন
৭৩, ২৩৮, ২৯৮, ৩৩৩, ৩৩৬, ৩৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯৭, ৫৪৭, ৫৬৭
কবীর আহম্মদ
৭৬
কার্ডিফ বিশ্ববিদ্যালয়
৭৬
কিস্টেন ওয়েস্টগার্ড
৭৭
কন্সাল লুই সেকুতুবিচও
৭৮
কাবুল
৭৮
কে. এল. মেহতা
৭৮
কবির
১১৯
করাচী
১২৬, ১৬৬, ২০৩, ২০৬, ২১২, ২৬০, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৬৭, ৪৪১, ৪৭৩, ৪৭৫
কেনেথ ক্লার্ক
১২৬
কবীর চৌধুরী
১৩০, ১৬৮
কিস্টেন ওয়েস্ট গার্ড
১৩২
কলম্বিয়া
১৩৩, ১৩৬
কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়
১৩৬
কেথলী
১৩৯
কাজী ইসামুল হক
১৬৯
কাজী মুজিবুর রহমান
১৭০
কায়সারুল ইসলাম
১৭১, ১৭৩
ক্যানন কলিনস
১৭৩
কাজী নজরুল ইসলাম
১৭৪
কিউ এ, এম, এ করিম
১৭৫
কর্নেলিয়াস
২১১
কিটিং (রাষ্ট্রদূত)
২১৪, ৩১৯, ৩৩৭, ৩৩৮, ৫৪৬, ৫৬৯
কাউল (জেনারেল)
২১৯, ২৭৩, ২৯৩, ৩১৯
কায়রো
২৩৮, ৩০৬, ৩০৭, ৩৬৩, ৩৬৭
কামাল হোসেন
২৪৩
কমিউনিস্ট পার্টি (ভারত)
২৭০, ২৮১, ২৮২, ২৯০, ৩৩৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কমিউনিস্ট পার্টি মার্কসবাদী (ভারত)
২৭০, ২৮১, ২৮৩, ২৯০
কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
২৭১, ২৭৫
কবি আলি সর্দার জাফরী
২৭৬
কায়ফী আজমী
২৭৬
কে. হানারধন
২৭৬
কালান্তর
২৭৮
করণ সিং
২৮১, ২৮৩, ৩০৬
কুরমাইল (ক্যাম্প)
২৮২
কে মনোহারণ
২৮৫
কাজী জাফর
২৮৮
কে. বি. লাল
২৯৩, ৩৩০
কারিআপ্পা (জেনারেল)
৩২৬
কিমেল গুরশেল
৩৫৭
কুয়েত
৩৫৮, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭২, ৩৭৯
কাতার
৩৬৩
কুয়ালামপুর
৩৬৭, ৩৭৬, ৩৮৬
কাসিম গুল
৩৭২
কাবুল
৩৭৩, ৪৯৮
কমোডর আব্দুল হামিদ
৩৭৪
ক্লোডিস মাকসুদ
৩৭৮
কেনিয়া
৩৮০, ৪৮১
ক্রুশ্চেভ
৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৭, ৪৮৬, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৩৯৫
কিউবা
৪৭০, ৫৪০
কাঠমুন্ডু
৪৮৪
কৃষ্ণ মেনন
৪৯০, ৪৯৪
ক্রোমার
৫০৪
কর্নেগি
৫১৫, ৫১৬, ৫২০, ৫২৭
কে. এম. কায়সার
৫১৭
কর্নেল মেলভিন হোলস্ট
৫৪২
কেলী
৫৪৪
কুষ্টিয়া
৫৬৩

খ

খন্দকার মোশতাক
৫৭, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৭০, ৮৫, ২৩৩, ২৩৪, ২৮৯, ২৯০, ৩১৩, ৩১৪, ৫৬৪
খন্দকার আসাদুজ্জামান
৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

খায়রুল্লাহ (সাংবাদিক)
৭৭
খুররম খান পন্নী
১৫২, ১৭৫
খায়রুল বাশার
১৬৯, ১৭৩
খন্দকার আলী আকবর
১৭৩
খলিল ঘোষ
২৭৬
খেমকারান
৩২১, ৪১৯
খাজা সারজিল হাসান
৩৬৭

গ

গোলাম মোহাম্মদ
১৮, ২০
গর্ডন গটলিয়
৩৫
গেরিং ষ্ট্রিট
৭৪, ১২৯
গুয়েনভার এভেনস
৭৬
গাউস খান
৭৬, ১২০, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৬৯, ১৭২
গুসতাভ পাপানেক
১৩৬
গিয়াস উদ্দীন
১৬৯
গোলাম মোস্তফা
১৭২
গোলাম হোসেন
২০৯
গায়না
২৩৬, ৩৬২, ৩৭৬, ৪২১
গ্রীস
৩৫৭, ৪২২
গ্রীনল্যান্ড
৪২১
গ্রোমিকো
৪৮৮, ৫৬৭
গিলগিট
৫১৩
গ্যাভিন ইয়াং
৫৪৪

ঘ

ঘানা
৪২১, ৪২২, ৪৭২

চ

চীন
১৫, ২১, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৬১, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৮৮, ১১৯, ১২৪, ১২৮, ১৩৯, ১৪৩, ১৪৫, ১৫৪, ১৬০, ১৬৬, ২২৭, ২৩৮, ২৬০, ২৬৩, ২৭৩, ২৮৪, ২৮৮, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৭, ৩০২, ৩০৭, ৩০৮, ৩১১, ৩১২, ৩১৮, ৩১৯, ৩৩০, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৪০, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৯২, ৪১২, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২৩, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৪৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৭, ৪৯৮, ৫০২, ৫০৪, ৫০৭, ৫০৮, ৫১১, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৬, ৫৬২, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬
চৌ এন লাই
২১, ২২, ৬৬, ৬৮, ৩৩৫, ৪১৯, ৪৭০, ৪৭২, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৭, ৪৯৩, ৫১৬, ৫২৪, ৫৬৬, ৫৭০
চুন্ডিগড়
২২, ২৭৬
চিলি
৩৬, ৪২৪
চেকোশ্লোভাকিয়া
৩৭, ৪২৪, ৪৭৫, ৫১৪
চিয়াং কাইশেক
৬৭
চারু মজুমদার
৬৮
চন্দ্রঘোনা পেপার মিল
১১৭
চার্চ
১৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চট্টোগ্রাম
২২৭, ৪৮২
চৌধুরী আসলাম
২৩৭
চিত্ত বসু
২৮৫
চাদ
৩৬৮
চার্টার
৩৭৩
চেং ইং
৪৭৩
চেন ইউ
৪৭৬
চেগুয়েভার
৪৮১
চেন চুয়া
৫২৩

জ

জাতিসংঘ
১৩, ১৭, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৬৫, ৬৬, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৪, ৭৭, ৮২, ৯০, ৯১, ৯২, ১২৩, ১২৬, ১৩৩, ১৩৬, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৮, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৬, ১৬৮, ২২৭, ২৩৬, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৭৩, ২৭৯, ২৮১, ২৮৭, ২৯৫, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৮, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৮, ৩১৯, ৩২৪, ৩২৭, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৬, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬৫, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৮, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৬৯, ৪৭২, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৫, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০১, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩২, ৫৩৫, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৬৫, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫
জন ফস্টার ডালেস
১৮
জেমস. এইচ. নয়েস
২৮
জর্ডান
৩৪, ৭২, ১৩০, ১৪১, ৩৩৯, ৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৯৩, ৪২২, ৪২৪, ৫২৩, ৫৩৬, ৫৭৩
জর্জ হ্যারিসন
৩৫
জে. কে ব্যানার্জি
৩৬
জিয়াউর রহমান
৫২, ৫৭
জাপান
৬৯, ৯১, ৯২, ১৩৫, ১৪৫, ১৫৮, ১৬৭, ৩০৫, ৩০৬, ৩১৯, ৩৩৪, ৩৪১, ৪২১, ৪২২, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৪১, ৫৩৯
জনস্টোন হাউজ
৭৪, ৮৯, ১২৪, ১২৫, ১৪৪
জেমস রেমসটেন
৭৫
জেফ হ্যারিস
৭৬
জেনেভা
৭৬, ১২৬, ১৪৬, ১৪৭, ২৪০, ৪০৩, ৪০৮, ৪১৩, ৪৪২
জুলিয়াস সলিভার ম্যান
৭৬
জুনবালাত
৭৭
জহির শাহ
৭৮
জ্যোতিপাল মহাথেরো
৭৯
জেদ্দা
৮০
জহির রায়হান
৮২
জগৎ সিং অরোরা
৮৯
জাকারিয়া চৌধুরী
১১৯, ১২৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেবুন্নেসা বখৎ
১২৩
জিনকিন
১২৭
জয়প্রকাশ নারায়ণ
১৩০, ১৫৯, ২৭৩, ২৮২, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯
জার্মানী
১৩৪, ৪৪২
জাফরুল্লাহ চৌধুরী
১৪২
জর্জিয়া
১৫১
জজল্যাশান্স
১৫৪
জজ হ্যারিসন
১৬৩
জোয়ান বায়েজ
১৬৩
জহুরুল
১৬৬
জার্কাতা
১৬৭
জেবুন্নেসা খায়ের
১৬৯
জগলুলপাশা
১৬৯
জিল্লুর রহমান
১৭১
জাকারিয়া খান চৌধুরী
১৭১
জামসেদ আলী
১৭২
জাবের খান
১৭২
জাকির উদ্দিন আহমেদ
১৭২
জামাল আহমেদ
১৭৩
জেনারেল মিঠঠি
২০৫
জিল নাইট
২১৮
জগজীবন রাম
৮৭, ২৩৬, ২৮৫, ২৯২, ২৯৩, ২৯৬, ৩২১, ৩২২, ৩২৯, ৩৩১
জেনারেল পলোফ
২২৯
জনসংঘ
২৭০, ২৮১, ২৮৪, ২৮৫, ২৯০, ৩২৬, ৩২৮, ৩২৯
জি. রামচন্দ্র
২৯২
জি. পার্থ সারথি
২৯২
জওহরলাল নেহেরু
২৯৪, ৩৬০, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৭, ৪৭৯, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৪
জার্মানী
৩০৬, ৩১৭
জেনারেল জিলানী
৩১০
জয়কুমার অটলার
৩১০
জম্মু
৩২১, ৪১৯
জলান্ধর
৩২৯
জর্জ বুশ
৩৩৯, ৪২৮, ৪৩৩, ৪৩৫, ৪৩৬, ৫২৩
জ্যোতির্ময় বসু
৩৩৯, ৩৪০
জিবুতি
৩৬৩
জেরুজালেম
৩৬৫, ৩৭২
জেদ্দা
৩৬৬, ৩৮১, ৩৮৪
জাকার্তা
৩৬৯
জি. এস. কাহালন
৪০৯
জাম্বিয়া
৪২১
জনসন
৪৭৪, ৪৭৯, ৪৯৬, ৫৩১, ৫৩৫
জ্যাকব মালিক
৪৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেনারেল নিউমেরি
৪৮১
জন ম্যাককেইন
৪৮৩
জয়পুর
৪৯১
জেনারেল হেইগ
৫১৬
জর্জ পামপিডো
৫২২
জেনারেল জ্যাকব
৫৪২, ৫৪৫
জেনারেল নিয়াজী
৫৪১, ৫৪৩
জেনারেল মানেকশ
৫৪৩, ৫৪৫
জেনারেল হামিদ
৫৪৪
জেনারেল হার্বাট গর্ডন
৫৪৫
জয়বাংলা পত্রিকা
৫৭৪

ট

টরেন্টো (কানাডা)
৩৬, ১৫৪, ১৫৬
টিটো
৬৬
টোবিজেসেল
৭৫
টেড বোলেন
৭৬
টোকিও
৭৬, ১৪৬, ১৫৯
টেংকু আব্দুর রহমান
৮০, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৭৩, ৪০৩
ট্যাম্বুরিন রিঙ্গোষ্টার
১৬৩
টি. এ. তালুকদার
১৬৯
টাইমস অব ইন্ডিয়া
২৭৮
টিক্কা খান
৩৭২, ৩৮৭, ৩৯০
টুংকু আব্দুর রাজ্জাক
৩৭৫
টোবিজেসেল
৫৭২

ড

ডেনমার্ক
৩৪, ৭৭, ১৩২, ১৩৩, ৪৪২
ডীন রবার্ট মেসন
৩৪
ডি. পি. ধর (দূর্গা প্রসাদ ধর)
৬৩, ৬৫, ৮৯, ২৩৩, ২৮৫, ২৯২, ২৯৩, ৩১৩, ৩২০, ৩২১, ৩৩৮, ৪১৮, ৪৮০, ৫৪০, ৫৬৮
ডোনাল্ড চেসওয়ার্থ
৭৫
ডি. কে. সেনগুপ্ত
৮২
ডেইলি টেলিগ্রাফ
১২৫
ডেপার
১২৮
ডব্লিউ গ্রিনো
১৫৩
ডি, লেনিন
১৫৩
ডন প্রেষ্টন
১৬৩
ডেভিড ব্লি
২০৫
ডন
২০৬
ডেভিড ফ্রস্ট
২৪২
ডি পালমা
৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ঢ

ঢাকা
১৯, ২৪, ৫৪, ৬৮, ৭১, ৮৬, ৮৭, ১১৮, ১২০, ১২২, ২১১, ২১২, ২১৯, ২৪০, ৩০৩, ৩২১, ৩৭২, ৩৮৮, ৪০৩, ৪৪৪, ৪৪৬, ৪৮৫, ৫১৭, ৫১৯, ৫৪৩, ৫৪৪,
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
১২৬, ১২৭, ২৩০, ৩১৫

ত

তাসখন্দ
২৩, ৩৩৩, ৩৬১, ৪০৮, ৪৭৮, ৪৭৯, ৫৬২
তাজউদ্দীন আহমদ
৩১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬২, ৬৪, ৬৬, ৭৫, ৭৯, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ১২৯, ১৩১, ১৩৯, ১৪৯, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৪০, ২৪১, ২৬৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ৩১৩, ৩২৭, ৩৬৫, ৫৬৩,
তোফয়েল আহমদ
৬০
তাহের উদ্দীন ঠাকুর
৬৩, ২৩৪
তুরস্ক
৭১, ২১৭, ৩৫৭, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭২, ৩৭৯, ৩৮৪, ৩৯৩, ৪২১, ৪২২, ৪৯৫, ৪৯৭, ৫০৭, ৫২৩, ৫৭৩
তাছাদ্দুক আহমেদ
১১৭, ১২৩
তৈয়বুর রহমান
১৭২
তাইফুর হোসাইন
১৭২
ত্রিপুরা
২৭০, ৪৭৭
ত্রিগুণা সেন
২৭৫
ত্রিদিব চৌধুরী
২৮৫
তিব্বত
৩২২, ৪৭২, ৪৭৮, ৪৯৪, ৫১৪, ৫৪০, ৫৬৯, ৫৭০
তামিলনাড়ু
৩২৬
তাইওয়ান
৩৩৪, ৪২১, ৪৭২, ৪৭৬
তিউনেশিয়া
৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১
তেহরান
৩৬৭, ৩৮১, ৩৮২
তেলআবিব
৩৮১
ত্রিপোলি
৩৮৩
তাহসিন মুহাম্মদ
৩৮৭
তাহছির মুহাম্মদ
৩৮৮
তানজেনিয়া
৪২১, ৪২২
তাস (পত্রিকা)
৪৯২
তাং ওয়েংহেং
৫২৩

থ

থাইল্যান্ড
২৭, ৯১, ৯২, ৩০৫, ৪২১, ৫১৫, ৫৩৩

দ

দেওয়ান মাহবুব আলী
৩৭
দিল্লী
৩১, ৩২, ৫২, ৬১, ৭৮, ৮২, ৮৯, ৯০, ১৪৫, ২১৬, ২২০, ২৩৫, ২৪৪, ২৬৭, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৬, ২৭৮, ২৮০, ২৮৩, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩১১, ৩১৫, ৩২২, ৩২৪, ৩২৭, ৩২৯, ৩৩৬, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৮১, ৩৯২, ৪৮১, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৮, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫১৭, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৬, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৭, ৫৪১, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৬৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দেমেস্ক বিশ্ববিদ্যালয়
৭৮
দীক্ষিত
৮২, ২৭০, ৩৩০
দি টাইমস পত্রিকা
১৪৪
দাবির আহমদ
১৭২
দিনাজপুর
২২৭, ৩৯২
দি স্টেসম্যান
২৭৮
দামেস্ক
৩৬৭, ৩৭৫, ৩৮৬
দুবাই
৩৬৭
দার্জেলিং
৪৭৪
দেভক
৪৯৫
দাউদ খান
৪৯৬
দেবাশর
৫৪৩

ন

নিক্সন
১৪, ১৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৬৬, ৭১, ৭২, ৮১, ৮৭, ৮৮, ১৪১, ১৪৭, ১৪৮, ১৫০, ১৫৮, ১৬৫, ১৬৮, ২০৪, ২০৭, ২১৭, ২২৩, ২২৬, ২২৯, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৮, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৪, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৯৩, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪৩৪, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪২, ৪৭৫, ৪৮৭, ৪৮৮, ৫০৩, ৫০৪, ৫১১, ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯
নাজিমুদ্দিন
১৮
ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)
২১, ৯৩, ২৬০
নিউ টাইমস
২৯
নিউইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়
৩৫
নিউইয়র্ক
৩৫, ৩৬, ৭২, ১৩০, ১৩৩, ১৩৬, ১৪৫, ১৫২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ৩০১, ৩০৮, ৩১৫, ৩১৬, ৪৪১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৯, ৫৪০, ৫৪১
নূরুল ইসলাম
৩৬, ১১৮, ১৬০, ১৭৩, ২২২, ২৩০
নাইজেরিয়া
৫১, ২৩৬, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৭৯, ৩৮২, ৪১২
নূরুল হোসেন
৭৬
নেপাল
৭৬, ৯০, ৯১, ৩০৬, ৪২৪, ৪৮৪, ৫২৪, ৫৭১
নূরুল কাদের
৭৮
নূরজাহান মোরশেদ
৭৮
নিসার আলী
১২০
নজির উদ্দীন
১২০
নরওয়ে
১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৫৭, ৩০৮, ৪২১
নেদারল্যান্ড
১৩১, ৩০৮, ৪১২, ৪১৩, ৪২১, ৪২২
নিকোলাস ব্যারিংটন
১৩৪
নর্থ ক্যারোলিনা
১৩৬
নূরুল আলম
১৪২, ১৭২
নজরুল ইসলাম
১৫৬, ১৭২
নূরুল হক ওরফে বাদশা মিয়া
১৬১, ১৬৬
নূরুল হক চৌধুরী
১৭১
নৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ
১৭১
নূরুল হুদা
১৭২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

নিখিলেশ চক্রবর্তী
১৭৩
নূরুল আমিন
২২৪, ৩১০, ৩১২
নেভিল ম্যাক্সওয়েল
২০৮, ২১৮
নেভিল জেমস
২৩৬
নিউ এজ
২৭৮
নিউইয়র্ক টাইমস
২৯৬
নিকোলাই মোরুবিন
২৯৮
নটবর সিং
৩৩১
নর্থ কোরিয়া
৩৪০
নাসের
৩৫৬, ৩৫৮, ৩৬২, ৩৬৩
নাইজার
৩৬৪
নাবিল বারদি
৩৬৭
নোয়াখালি
৩৭২
নিউজিল্যান্ড
৪০৯, ৪১২, ৪১৩, ৪২১, ৪২২
নিকারাগুয়া
৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩
নক্সালবাড়ি
৪৭৪, ৪৯৯
নিকোলাই পেখভ
৪৮৪

প

পাকিস্তান
১৩, ১৪, ১৫, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫১, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৯, ৯১, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২,১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৭, ১৩০, ১৩২, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৪, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৭, ২৭৮, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৯১, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২ , ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩. ৩৮৫, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৬৮, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৯০, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ৫১৯, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পূর্ব পাকিস্তান
১৪, ১৯, ২২, ২৩, ২৫, ২৯, ৩০, ৫৩, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৭৩ , ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১৩২, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬৭, ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২৩৪, ২৩৮, ২৩৯, ২৬১, ২৬৩, ২৭০, ২৭৩, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮৪, ২৯১, ২৯২, ২৯৬, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৬, ৩১০, ৩১২, ৩২০, ৩২১, ৩২৩, ৩২৬, ৩২৭, ৩৩০, ৩৩৬, ৩৪১, ৩৫৫, ৩৬২, ৩৬৭, ৩৬৯, ৩৭২, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮২, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৭, ৪২৮, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৮২, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৭, ৪৯৯, ৫০২, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৩, ৫১৫, ৫১৯, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৭, ৫২৮, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৮, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৬২, ৫৬৫, ৫৬৮, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৫
পেন্টাগন
১৮, ২২
পশ্চিম পাকিস্তান
১৯, ২৩, ৩০, ৬৬, ৭১, ৭৩, ৭৯, ৮০, ৮৭, ৯৩, ৯৫, ১৪৭, ২০৪, ২১৭, ২২০, ২২১, ২৩৭, ২৪২, ২৪৪, ২৫৯, ২৬৪, ২৮৭, ৩০৭, ৩১২, ৩১৭, ৩২৫, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৫৫, ৩৬৬, ৩৭০, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৬, ৩৯১, ৩৯৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪২০, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৪৩, ৪৯৯, ৫০৭, ৫০৮, ৫১৩, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৬, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬১, ৫৭৬
পূর্ব বাংলা /বঙ্গ
১৯, ২০, ২৩, ২৪, ৫৯, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ১১৬, ১১৭, ১২৫, ২২৯, ২৩৫, ২৫৮, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৯, ২৭১, ২৭২, ২৭৭, ২৮২, ২৯৩, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৭, ৩১০, ৩১৩, ৩১৮, ৩২২, ৩২৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৮০, ৪০৯, ৪১২, ৪১৫, ৪১৬, ৪২৯, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৯৫, ৫০৯, ৫১০, ৫১৩, ৫১৬, ৫১৭, ৫২০, ৫৩০, ৫৬১, ৫৬৬, ৫৬৯, ৫৭৫
পশ্চিম বাংলা/ বঙ্গ
২৬৮, ২৭০, ২৭২, ২৭৫, ২৭৮, ২৮১, ৩০১, ৩২৬, ৩৮১, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৪৭৪, ৪৭৭, ৫০৭, ৫১৩, ৫৭১
পেশোয়ার
২১, ২৩, ৪৭৭, ৪৯৩, ৪৯৫, ৫৬২
পদ্মা (জাহাজ)
২৬, ১৬৫, ১৬৬
পিকিং
২৭, ২৯, ৬৭, ৬৮, ২৭২, ৩৩৫, ৪১৯, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৭, ৫১১, ৫১৭, ৫১৮, ৫২৬, ৫২৭, ৫৭১
প্যারিস
৩৪, ৬৩, ৭৫, ৭৭, ৯২, ২১২, ২৩৩, ৩০১, ৩০৬, ৩০৭, ৩১৭, ৩২০, ৩৩৪, ৫৭২
পন্ডিত রবিশংকর
৩৫, ১৬৩
পূর্ব জার্মানী
৩৭
পোল্যান্ড
৩৭, ২৪০, ৩৩১, ৪২১, ৪২২, ৪২৪, ৪২৬, ৪২৯, ৪৩২, ৪৩৯, ৪৪৩, ৪৪৪
পার্ক সার্কাস
৬৪, ২৩৪
পোদগর্নি
৬৬, ৬৭, ৭৩, ৮৫, ৪৮৫, ৪৮৮, ৪৯৮, ৫০০, ৫৬৭
পিটার শোর
৭৪, ৭৬, ৮৯, ১২১, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১৪৪, ৫০৯
পিটার কারগিল
৭৫
পল কননেট
৭৫, ১৪১, ১৭৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পি. এন. হকসার
৮৮, ২৯২, ২৯৩, ৫০৫, ৫৪৬
প্রিন্স সদরুদ্দিন আগা খান
৯১, ৪০৮, ৪১৩
পূর্ব জার্মানী
৯২, ৩০৬, ৩০৮
পিয়ের শোরি
১৩২
পেনসিলভেনিয়া
১৩৬
পিয়ের ট্রুডো
১৫৫
পল ইগনিটিক
১৫৪
পীরজাদা
২১১
পলোঅফ
২৩১
প্রফুল্ল সেন
২৭২
পি এস কৌটাভ
২৯৯
পাঠানকোট
৩২১, ৪১৯
পাঞ্জাব
৩২১, ৪১৯
পুঞ্জ
৩২১, ৪১৯
পেটরাপোল
৩২২
পাকিস্তান রেডিও
৩৪০
পাখতুনিস্তান
৩৬৫, ৪৯৫, ৪৯৬
প্রিন্স আব্দুর রহমান
৩৭৩
প্যালেস্টাইন
৩৮৬
পিপলস পার্টি (পাকিস্তান)
৩৮৭
পেরু
৪২০, ৪২৪
পলমার্ক হেনরী
৪৩৮
প্রাভদা (সোভিয়েত)
৪৭০
পিপলস ডেইলি
৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮২, ৫৭০
পশ্চিম জার্মানী
৪৯০
পুনে
৪৯১
পামফ্রে
৫০২
পিসি ভল্ল
৫৪৩
পঞ্চগড়
৫৭২৩

ফ

ফারল্যান্ড
১৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১৪, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২১, ২২২, ২২৫, ২৩১, ২৪১, ৪৪৪, ৫২৮, ৫৩৩, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৬৭
ফিরোজ খান নূন
২২, ৩৫৯
ফিলিপাইন
২৭, ৩৬, ৯১
ফ্রান্স
৩২, ৬৯, ৭৭, ৯১, ৯২, ১৩৪, ১৬২, ২৮৬, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৭, ৩৩৭, ৩৫৭, ৪২১, ৪২৩, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৫, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪৪, ৪৯৩, ৪৯৪, ৫৭৬
ফিনল্যান্ড
৩৪, ১৩২, ৩০৬, ৪৪২, ৫৩১
ফিনিশ টেলিভিশন
৩৪
ফুলব্রাইট
৩৪, ৭১, ১৪৮
ফজলুর রহমান খান
১৩০
ফজলুল হক চৌধুরী
৭৫, ১৪৫
ফণীভূষণ মজুমদার
৭৮, ১৫২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফ্রাঙ্ক চার্চ
৮৯
ফজলুল করিম
১৪৬, ১৬৯, ১৭৫, ৩৬৭
ফয়জুর রহমান
১৫০
ফিনিশ টেলিভিশন
১৩২
ফকির শাহবুদ্দিন
৭৩, ১৫২
ফ্রেডারিক কনসাল
১৫৪
ফ্রাংক চার্চ
১৬৫
ফেরদৌসি রহমান
১৬৯
ফয়েজ আহমেদ
২৩৭
ফখরুদ্দীন আলী আহমেদ
৩০৬, ৩৬৪
ফ্রেডরিক (সাংবাদিক)
৩১৬
ফিলিস্তিনি
৩৫৭, ৩৮১
ফেনী
৩৭২
ফিজি
৪২২
ফোর্ট উইলিয়াম
৫৪২, ৫৪৫

ব

বাংলাদেশ
১৩, ১৪. ১৫, ১৬, ১৭, ২৭, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১১৫, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৭, ১৬৮, ২০৪, ২০৫, ২১৬, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৪১, ২৪২, ২৫৭, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩,২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৫, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১৫, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২২, ৩২৩, ৩২৫, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩৫, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮১, ৩৮৬, ৩৮৮, ৩৯৩, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪১৭, ৪১৮, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৪, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৬৮, ৪৮০, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৯৯, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৬, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪২, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬১, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৭, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬
বেইজিং
১৪
বিবিসি
১৬, ১২৬, ১২৭, ২৭৮, ৩১৮
বগুড়া
১৮
ব্রেজনেভ
২৮, ২৯, ৩৯, ৬৬, ৪৭৫, ৪৭৭, ৪৮৭, ৪৯২, ৪৯৮, ৫১১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৫, ৫৩১, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৪১, ৫৪৬, ৫৬৯
ব্রিটেন/ ব্রিটিশ
৩১, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৫৪, ৬৭, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৮৬, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৭, ১২৮, ১৩৪, ১৩৫, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৬, ১৫৯, ১৬২, ১৬৪, ১৬৮, ২০৪, ২০৬, ২০৭, ২০৯, ২১৫, ২১৭, ২১৮, ২২৪,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

২২৭, ২৩৬, ২৪১, ২৪৪, ২৯৯, ৩০০, ৩০৬, ৩০৮, ৩১৮, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬১, ৩৭৭, ৩৮১, ৪২১, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৮৫, ৪৯০, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৭, ৫০৯, ৫১০, ৫৪০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৬
বুলগেরিয়া
৩৭, ৪২৪
বুদাপেস্ট
৩৭, ২৭৬, ২৭৭
বৈদ্যনাথ তলা
৫৪
বাগডোগরা
৫৭, ২৯১, ৫৬৪
বদরুদ্দীন উমর
৬৮
ব্রুস ডগল্যাস ম্যান
৭৪, ১২৪, ১২৫, ১৪৪, ১৭৩
ব্যাংকক
৭৯
বার্মা
৯০, ৯২, ১৫৯, ৩৬১, ৪২৩, ৪৭২, ৫১৩, ৫৩৩
ব্যারিংটন
১২৬
ব্লেচলি
১২৯
বেডফোর্ড
১২৯, ১৩২
বার্মিংহাম
১২৯, ১৩১, ১৩৯, ১৪১
ব্রায়ান ল্যাপিং
১৩৪
বেলগ্রেড
১৩৪, ৩০৭
বেলজিয়াম
১৩৪, ৩০৮, ৩১৭, ৩১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩১, ৪৩৫
বার্কলে
১৩৬
বাফেলা
১৩৬
বোস্টন
১৩৬, ১৬৬
বিমান মল্লিক
১৩৯
বর অ্যাডওয়ার্ডস
১৪০
বাদশা ফয়সাল
১৫৩, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৪
বিম্যাক শেরি
১৫৮
বীর্চ বে
১৫৯
বোর্হেস
১৬২
বিলি প্রেস্টন
১৬৩
বব ডিলান
১৬৩
ব্যাসলিওন রাসেন
১৬৩
বি, মিয়া
১৭১
বি, এইচ, তালুকদার
১৭১, ১৭২
বালুরঘাট
২২৭, ২৮২
বোম্বে
২৭২, ২৭৬
বদরুদ্দীন তায়েবাজী
২৭৬
বন
৩০১, ৩০৭
বৈরুত
৩০৬, ৩৬৭, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮৫
বিদ্যাচরণ শুকলা
৩২৪, ৩২৯
বাগদাদ
৩৬১
বাদশাহ জহির শাহ
৩৭৪, ৪৯৬, ৪৯৭
বাদশাহ্ হোসেন
৩৭৪

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ব্রাজিল
৩৭৫, ৪২৪
বুরুন্ডি
৪২২, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩২, ৪৩৩
বিহার
৪৭৮
বায়াফ্রো (নাইজেরিয়া)
৪৮১
বেইজিং
৪৮২
বুলগানিন
৪৯১
বাদশাহ কিং হোসেন
৫৩৪

ভ

ভারত
১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৯, ২৩, ২৫, ২৭, ২৮, ২৯, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৭, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ,৭৬, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৫, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১১৬, ১২৫, ১২৭, ১৩০, ১৩১, ১৪৩, ১৪৫, ১৫২, ১৫৩, ১৫৯, ২০৬, ২০৭, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২৩১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৯, ২৪০, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪২, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৮, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪০১, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫
ভয়েস অব আমেরিকা
১৬, ২৭৮
ভূট্টো
২৫, ৩০, ২৩৩, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ৩১০, ৩২০, ৩৭৫, ৩৮৭, ৪১৯, ৪৩৩, ৪৪১, ৪৪২, ৫০০, ৫১৮, ৫২৫, ৫৩৩, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৪১, ৫৪২
ভিয়েতনাম
২৭, ৫১, ৭১, ১২৫, ৩০৬, ৩৩৪, ৩৪০, ৪৭৩, ৪৮০, ৫১১, ৫১২, ৫১৪, ৫১৫, ৫২৭, ৫৩৯
ভ্যাটিও সারিও
১৩২
ভি.ভি, গিরি
২৪৪
ভি.কে কৃষ্ণ মেনন
২৬৫, ২৭৩
ভি. এন. টেন্ডন
২৯২
ভি. সিনেস্কি
৪৯০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভূটান
৫১৩
ভ্লাদিমির মেসকেভিকস
৫২১
ভরনসভ
৫৩৭, ৫৪১

ম

মোহাম্মদ সেলিম
১৬
মুজিবনগর সরকার
১৭, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৫২, ৫৩, ৫৫, ৫৬, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৯, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮১, ৮৩, ৮৪, ৮৮, ৮৯, ৯০, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩১, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৯, ১৪০, ১৪৩, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৯, ১৫৩, ১৬৪, ১৬৭, ১৬৮, ২১৩, ২১৬, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩১, ২৩৩, ২৩৪, ২৫৯, ২৬৩, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৯, ২৯০, ২৯৪, ২৯৭, ৩০৯, ৩১৪, ৩১৫, ৩২১, ৩৩৮, ৩৫৬, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৫৬৩, ৫৬৫, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫
মোহাম্মদ আলী
১৮, ৪৭৬
মওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানী
২১, ২৫, ৬৬, ৬৭, ১১৭, ১৪৩, ২৮৮, ৩৭০, ৪৭৭, ৫১৬
ময়মনসিংহ
২৪
মনুমিয়া
২৪
মোনায়েম খান
২৫
মেঘনা
২৬
মস্কো
২৭, ২৮, ২৯, ৭৩, ২৩০, ২৭২, ২৯৮, ৩০১, ৩০৭, ৩৩৪, ৩৮৪, ৪৭৯, ৪৮১, ৪৮৬, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯৪, ৪৯৭, ৫১১, ৫১২, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩৩, ৫৪০, ৫৬৮, ৫৭২
মেডিসিন স্কোয়ার গার্ডেন (নিউইয়র্ক)
৩৫
মেহেরপুর
৫৪, ৫৬৩
মিজান চৌধুরী
৫৭
মাহাবুব আলাম চাষী
৬০, ৬৩, ৬৪, ৭৮, ২২৯, ২৯০, ৩১৩
মোজাফফর আহমদ
৬৫, ১৫২, ১৫৬, ২৩০, ২৮৮
মাও সেতুং
৬৬, ৩৩৫, ৪১৯, ৪৭৭, ৪৮৪, ৪৯৩, ৫৬৬
মিশর
৬৬, ৭২, ৭৫, ১৩০, ১৪১, ১৫৮, ১৬১, ২৯৪, ৩০৭, ৩৩৪, ৩৫৬, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৭৪, ৩৭৬, ৩৯৪, ৪২১, ৪২৪
ম্যানচেষ্টার বিশ্ববিদ্যালয়
৭৬
মোল্লা জালাল উদ্দিন
৭৭, ৩৬৭
মাহমুদ শাহ কোরেশী
৭৭
মারুফ স্যার
৭৭
মওলানা খায়রুল ইসলাম যশোরী
৭৮
মুসা শফিক
৭৮
মওদুদ আহমেদ
৮২
মেহেদি মাসুদ
৮৭
মেহনাজ উদ্দীন
১১৬
মুসলীম লীগ
১১৬, ১১৭, ২৫৮, ২৮৩, ৩৭৯
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ
১১৬, ১২৯, ৩৫৯, ৪৬৮
মনোয়ার হোসেন
১১৯
মিনহাজ উদ্দীন
১২০
মকদ্দস বখ্‌ত
১২০
মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জুর
১২৩

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মোশাররফ হোসেন জোয়ারদার
১২৪
মোশাররফ হোসেন
১২৭, ১৬৯
মার্টিন এনালস
১২৭
মীরডালের
১৩২
মতিউর রহমান
১৩২, ১৭১, ১৭২
মাইকেল বার্নস
১৪৪
মুস্তাফিজুর রহমান
১৪৬
মাহবুব হোসেন
১৫০
মিসিসিপি
১৫১
মফিজ চৌধুরী
১৫২
মোয়াজ্জেম হোসেন
১৫৩, ১৭৩
মাহমুদ আলী
১৫৪
মান্টিয়াল
১৫৪
মোহাম্মদ হোসেন মঞ্জু
১৫৬
মাস্টার এ, আজিজ
১৬২
মোফাজ্জেল আহমদ
১৬৬
মোত্তালেব
১৬৬
মনোয়ার হোসেন
১৬৮
মুন্নি রহমান
১৬৯
মঞ্জু হাফিজ
১৬৯
মনজুর মোরশেদ তালুকদার
১৬৯, ১৭০
মিয়া মো. মোস্তাফিজুর রহমান
১৬৯
মো: আব্দুর রব
১৭০
মো: আব্দুস সালাম খান
১৭০
মো: বুরহান
১৭০
মোকলেসুর রহমান
১৭১
মোহাম্মদ রফিক
১৭১
মোতাসিম আলী
১৭১
মোহাম্মাদ আলী
১৭১
মাকসুদ আলী
১৭১
মাহফুজ হোসাইন
১৭২
মোছাব্বির আলী
১৭২
মিনহাজ উদ্দিন আহমেদ
১৭২
মোহাম্মদ এ, রউফ
১৭৩
মনজুর আহমেদ
১৭৩
মারিয়াটা প্রোরকোপ
১৭৩
মাইকেল রবার্ট
১৭৩
মিজান রহমান
১৭৩
মহিউদ্দিন আহমেদ
১৪৫, ১৭৪
মুহিউদ্দিন আহমেদ জায়গীরদার
১৭৫
মিরানওয়ালি
২০৫
মালেয়েশিয়া
২০৭, ২১৭, ৩০৫, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৫, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮৫, ৪২২, ৪৭৩, ৫০২, ৫৭৩
মরিস, জে, উইলিয়াম
২১২
মাস্কি
২৩৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মীর্জা মোহাম্মদ ইব্রাহিম
২৩৭
মাজাহার আলী খান
২৩৭
মিয়ানওয়ালি জেল
২৪২
মণিপুর
২৭০
মহবুব নসরুল্লাহ
২৭২, ২৭৬
মোহাম্মদ ইসমাইল
২৯৩, ২৮৪
মেঘালয়
২৮৭
মতিন
২৮৮
মোহাম্মদ তোয়াহা
২৮৮
মঈনুল হক চৌধুরী
৩০৬
মার্ক টালি
৩১৭
মালাক্কা
৩৪০
মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ খান
৩৫৭, ৩৫৯
মক্কা
৩৬২
মরক্কো
৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮
মৌরতানিয়া
৩৬৩, ৩৬৮, ৪২২
মঞ্জুর চৌধুরী
৩৬৭
মালি
৩৬৮
মারজুকি জাতিম
৩৬৯
মাহমুদ কাশিম
৩৭১, ৩৮১
মার্শাল টিটো
৩৭৪
মুয়াম্মর গাদ্দাফি
৩৭৪
মোহাম্মদ ফাহমী
৩৭৪
মিঃ মাকসুদ
৩৭৬
মোহাম্মদ রয়েম
৩৭৬, ৩৭৮
মোরিন
৩৭৬
মাল্টা
৪২১
মঙ্গোলিয়া
৪২১, ৪২২, ৪২৪
মেক্সিকো
৪২২, ৪২৪, ৪৪২
মালাগাছি
৪৮১
মালয়
৪৮১
মালেনকভ
৪৮৯, ৪৯০
মতিলাল নেহেরু
৪৯১
মাদ্রাজ
৪৯১
মার্শাল গ্রেসকো
৪৯৭
মিয়া আরশাদ হোসেন
৫০১, ৫৭২
মি. গার্ভে
৫০৫
মি. নজরুল ইসলাম
৫০৬
মি. সেলি
৫২৯
ম্যাক কনেগ
৫২৯
মহারাজ কৃষ্ণ রাজগোত্র
৫৩২

য

যুক্তরাষ্ট্র
১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ২০, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫২, ৫৬, ৫৯, ৬২, ৬৩, ৬৯,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

৭২, ৭৫, ৮১, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৯১, ৯২, ১২২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৭, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ২০৪, ২০৫, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩৩, ২৪০, ২৬৩, ২৭৩, ২৯০, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ৩০০, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩০৯, ৩১১, ৩১৩, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২৩, ৩২৯, ৩৩১, ৩৩৩, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৪১১, ৪১৮, ৪২১, ৪২২, ৪২৬, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৫, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫. ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৫০২, ৫০৩, ৫০৮, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫. ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫. ৫৩৭, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৬

যশোর
২৪, ৬৮

যমুনা
২৬

যুক্তরাজ্য
৩২, ৫৬, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৮৯, ৯১, ১১৬, ১২০, ১২০, ১২১, ১২৫, ১২৮, ১৬০, ১৬১, ২০৬, ২৭৩, ২৯৯, ৩০০, ৪১১, ৪২১, ৪২৬, ৪৩১, ৪৩৫, ৪৪৪, ৪৮৯, ৫০১, ৫১০

যুগোশ্লাভিয়া
৬৬, ২৯৪, ৩৭৪, ৪০৯, ৪২১, ৪২২, ৪৯১

যুগান্তর
২৭৮

যোগেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী
৩১৫

যোধপুর
৩২১

র

রাওয়ালপিন্ডি
২৬, ২০৫, ২৪২, ২৯৫, ৫৪২, ৫৪৩

রেহমান সোবহান
৩২, ৩৫, ৩৬, ৭২, ৭৫, ১২৫, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৫২, ১৫৪

রবার্ট মাকনামারা
৩২

রেসকোর্স ময়দান
৩৩, ৫৪৭

রজার্স
৩৪, ৭১, ১৪৮, ২০৭, ২১৪, ২১৫, ২১৯, ২২০, ২২২, ২২৩, ৩১৭, ৩৫৮, ৪৮৮, ৫১২, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৬৮, ৫৬৯

রবার্ট ডর্ফম্যান
৩৪, ১৩৬

রেডিও পাকিস্তান
৬৮, ২১১

রেভারেন্ড ইয়ান পেইসলি
১২৪

রেজিনাল্ড প্রিন্টিঙ্গ
৭৫, ৭৬, ৯০, ১২৫

রশিদ কারামি
৭৭

রাজকুমারী পুনে
৭৯

রেড প্রেন্টিস
১২৫

রিচার্ড উড
১২৬, ১২৭

রাজিউল হাসান রঞ্জু
১২৭

রাশেদ সোহরাওয়ার্দী
১৪২

রেজ প্রেন্টিস
১৪৪

রেজাউল করিম
১৪৬

রোকেয়া হল
১৫২

রাজিউল হাসান
১৫৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
১৪৮, ১৫৭

রফিকুজ্জামান
১৫৭

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রিচার্ড গোগ্যান
১৫৮
রুহুল আমিন
১৬০
রিচার্ড কে টেইলর
১৬৫
রমজান আলী
১৬৬
রুনি চৌধুরী
১৬৯
রফিউদ্দিন আহমেদ
১৬৯
রেভ ডেভিড ম্যাশন
১৭১
রানা ইসলাম
১৭৩
রফিকুল ইসলাম
১৭৪
রিচার্ড হেলমস
২০৪
রাশব্রুক উইলিয়াম
২১৮
রাজাকৃষ্ণ
২৭২
রমেশ মজুমদার
২৭২
রাশিদা খাতুন
২৭৬
রয়টার্স
২৭৮
রাজা গোপালাচারি
২৮৪, ৩২৬
রাশেদ খান মেনন
২৮৮
রোম
৩০৭
রহিম ইয়ার খান
৩১৪
রাজস্থান
৩২১
রেজা তাখওয়াই
৩৭৩
রাও ফরমান আলী
৩৮৭, ৩৮৮, ৩৯১, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬
রাজশাহী
৩৯২
রালফ জোসেফ
৩৯৩
রিভিউ পত্রিকা (পিকিং)
৪৭২,৪৭৪
রুয়ান্ড্রা
৪৮১
রাজেন্দ্র প্রসাদ
৪৯২
রৌমারি
৫৭৪

ল

লিয়াকত আলী খান
১৮, ৩৫৯, ৪৬৮, ৪৯৪, ৪৯৫
লন্ডন
৩২, ৩৪, ৭৫, ৭৬, ৯০, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৬, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩৩, ১৩৫, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫৭, ১৬৬, ২০৭, ২৪৩, ৩০১, ৩০৭, ৩১৫, ৩১৭, ৩৮২, ৪৯১, ৫৭২, ৫৭৩
লস এনজেলস টাইমস পত্রিকা
৭১
লিবিয়া
৭২, ১৩০, ১৬১, ৩৫৮, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭৪, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪২১, ৫৭৩
লুৎফুল মতিন
৭৫, ১৪৫, ১৭৪
লেবানন
৭৭, ৯০, ৩৫৭, ৩৬৩, ৩৬৮, ৪২৪
লাওস
৭৯, ৪২১
লেবার পার্টি
১২১, ১৩৪, ৫৭২
লর্ড ব্রকওয়ে
১২৫
লর্ড গিফোর্ড
১২৫
লুলু বিলকিস বানু
১২৫, ১২৮
লর্ড এলেন বুলেক
১২৭
লর্ড জেমস
১২৭
লিয়াকত হোসেন
১৩২

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

লংবিচ
১৩৬
লুটন
১৩৯
লগ গিফোর্ড
১৪৪
লুলু বিলকিস বানু
১৪৪
লেসসি
১৫৪
লংশোর মেনস
১৬৬
লুৎফর রহমান শাহজাহান
১৬৮
লিন বিকলে
১৭৩
লুৎফর কবির
১৭৩২
লে, জে, আর, ই, কুশান
২০৫
লয়ালপুর
২০৯, ২১০, ২৪২
লাহোর
২৩৭, ৩৪০
লন্ডন টাইমস
৩২৬
লালবাহাদুর শাস্ত্রী
৩৩৩, ৪৭২, ৪৭৮
লাইবেরিয়া
৪২১
লিয়েনো
৪২৮
লিও শাওচি
৪৮৪
লিন পি আও
৪৮৪
লক্ষীকান্ত ঝা
৫৩২

শ

শেখ মুজিবুর রহমান
১৭, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ৩০, ৩১, ৩৩, ৩৭, ৫২, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৬, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ১১৫, ১১৭, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২৩, ১২৬, ১২৭, ১৩৮, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৫২, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৬২, ১৬৭, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৭, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৮৯, ২৯৯, ৩০০, ৩০৩, ৩১১, ৩১২, ৩১৪, ৩২০, ৩৩০, ৩৩২, ৩৩৭, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৪০৩, ৪১২, ৪১৮, ৪৪০, ৪৪৩, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৪, ৫০৯, ৫১০, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫৩০, ৫৩৭, ৫৪৭, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৭২, ৫৭৬
শেরে বাংলা এ, কে ফজলুল হক
২০, ১১৭, ৩৭০
শাহেদ আলী
২২
শিকাগো
৩৫
শ্রীলঙ্কা
৩৬, ৯০, ৯২, ৩৭৭, ৪২১, ৪২৩, ৪২৪, ৪৮১, ৪৮৩
শিলিগুড়ি
৫৭, ৬৫
শেখ ফজলুল হক মণি
৬০
শাহ আজিজুর রহমান
৬০
শাহ মোয়াজ্জেম হোসেন
৭৮
শাহ আব্দুল মজিদ কোরায়েশি
১১৬
শেফিল্ড
১১৬
শামসুদ্দিন চৌধুরী মানিক
১২১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শেখ আব্দুল মান্নান
১২১৩, ১২৪, ১২৭, ১২৯, ১৪৪, ১৬৮, ১৭১
শামসুদ্দীন চৌধুরী মানিক
১২৭, ১৬৮
শামসুদ্দীন
১২৯
শাহীন মাহমুদ আলী
১৩০
শরণ সিং
১৩১, ২১৪, ২১৫, ২২০, ২৪০, ২৬৪, ২৭৯, ২৮৫, ২৯৬, ৩০১, ৩০৫, ৩১৩, ৩১৪, ৩৩০, ৩৩৯, ৪৩৩, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৫০১
শোন ম্যাক ব্রাইড
১৪৪
শামসুল বারী
৫২, ১৭৪, ৩৬৬
১৪৮
শফিকুদ্দিন আহমেদ বুলবুল
১৬৮
শামসুর রহমান
১৬৮, ১৭১
শাহ এ. এম. শামসুল কিবরিয়া
১৭৪
শেখ রুস্তম আলী
১৭৪
শেখ শহিদুল ইসলাম
২০৫
শিহালা
২৪২
শর্মিলা ঠাকুর
২৭২, ২৭৬
শিলিগুড়ি
২৯১, ৫৪২, ৫৬৪, ৫৭০
শারুদা প্রসাদ
২৯২
শ্রীনগর
৩২১, ৪১৯, ৪৯১
শিয়াচিং
৩৩০

স

সোভিয়েত রাশিয়া
১৬, ১৭, ২১, ২২, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৩, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৫৩, ৫৬, ৬৫, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৮৫, ৯২, ১৩৩, ১৪৫, ১৫৯, ১৬৭, ২২৭, ২৩৮, ২৯১, ২৬০, ২৮২, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৬, ৩১০, ৩১২, ৩১৬, ৩১৯, ৩২০, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬৪, ৩৬৭, ৩৯৪, ৪০২, ৪১১, ৪১৮, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০৭, ৫০৮, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৭, ৫১৯, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৮, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৬, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭৫, ৫৭৬
স্বাধীন বাংলা বেতার কেন্দ্র
১৬, ৫২, ৬৫, ৮৩, ২২৭, ৫৭৪
সলিমুল্লাহ মুসলিম হল
২১
সিলেট
২৪
সৈয়দ নজরুল ইসলাম
৩১, ৩৭, ৫৬, ৫৮, ৬২, ৬৪, ৬৫, ৭৯, ৮০, ৮৪, ৮৯, ৯২, ১৩০, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২৩১, ২৩৪, ২৪০, ২৮৯, ২৯১, ৩১৩, ৩৬৬, ৫৬৪
সুইডেন
৩২, ৩৪, ৯১, ১৩২, ৩০৬, ৪১২, ৪২১, ৪২২
স্টেটলার হিল্টন হোটেল
৩৫
সারোয়ার আলী
৩৭
সিংহল
৫৩
সেন্টো
৫৫, ১৬৫, ৩৩৩, ৩৩৯, ৩৬১, ৪৭৬, ৫১৬, ৫১৯, ৫৬২
সিয়াটো
৫৫, ১৬৫, ৪৭৬, ৩৩৩, ৩৫৭, ৩৬১, ৫০৯, ৫১৬, ৫১৯, ৫৬২
সিরাজুল আলম খান
৬০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সি আই এ
৬৪, ১১৯, ২৯০, ৩১৪, ৪৮৪
সিহানুক
৬৭
সাপ্তাহিক গণশক্তি
৬৮
সুখেন্দু দস্তিদার
৬৮
স্যার জেরাল্ড নেবারো
৭৫, ১২৪
সুইজারল্যান্ড
৭৬, ১৪৬
সিরিয়া
৭৭, ৭৮, ৯০, ১৩০, ৩৫৭, ৩৫৮, ৪২১, ৪২৮, ৪৪৪
সালমান হায়দা
৭৮
স্টোকহোম
৯০, ১৩২
সুলতান মাহমুদ শরীফ
১২০, ১২৩
স্যার টমাস উইলিয়াম
১২০
সাখওয়াত হোসেন
১২৩, ১৪৪
স্কটল্যান্ড
১২৬
স্যার হিউ স্প্রিংগার
১২৭
সৌদিআরব
১৩০, ৩৫৮, ৪২১, ৪২২, ৪২৯, ৫২৩
স্টন এন্ডারসন
১৩২
স্যার আব্দুর রাজ্জাক
১৩৩
স্যার সিউসাগর রামগোলাম
১৩৩
স্যামুয়েল হ্যান্টিংটন
১৩৬
স্টানফোর্ড
১৩৬
স্যাকসবি
১৩৭, ১৬৫
সেন্ট আলোবান্স
১৩৯
সাইদুর রহমান
১৪২, ১৭৩, ১৭৪
সৈয়দ আনোয়ারুল করিম
১৫২
সিরাজুল হক
১৫২
সৈয়দ আব্দুস সুলতান
১৫২, ১৫৬
স্ট্যানলি বারকি
১৫৪, ১৫৫
সত্যজিৎ রায়
১৫৫
স্পিয়ের অন্ড
১৫৭
স্টলটেন বার্গ
১৫৭
সুরু শিমার
১৫৮
সিদ্ধার্থ শঙ্কর রায়
১৫৯, ৩০৫
সিদ্দিক আহমেদ
১৬০
সানাউল্লাহ
১৬০
সিঙ্গাপুর
১৬০, ১৬১, ১৬৭, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৮, ৩৪০, ৪৭৩
সৌদি আরব
১৬১, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৯, ৩৯৩, ৩৯৪, ৪১২, ৪২১, ৫৭৩
সুন্দরবন (জাহাজ)
১৬৫
সুলতান মাহমুদ শরীফ
১৬৯, ১৭২
সাজেদুর রহমান
১৬৯
সাদিক আলী
১৭০
সাজ্জাদুর রহমান
১৭০
সৈয়দ মুজতবা হোসাইন
১৭০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সামছুল হুদা হারুন
১৭১
সৈয়দ আবু আহসান
১৭১
সামসুল হুদা চৌধুরী
১৭১
সুফিয়া কামাল
১৭১
সারাফাত
১৭১
সোনামিয়া
১৭২
সায়ামা প্রসাদ ঘোষ
১৭৩
সিরাজুল ইসলাম
১৭৩
সারওয়ার হোসেন
১৭৩
সাদত কাজী
১৭৩
সৈয়দ মোয়াজ্জেম আলী
১৭৪
সৈয়দ আমিরুল ইসলাম
১৭৫
সিরিল পিকার্ড
২০৬
সিসকো
২১৫, ২১৭, ২২০, ২২৩, ২২৪, ৩৪০, ৫০২, ৫১২, ৫৪৬
সালমান আলী
২২৫
সুলতান খান
২২৬
সমরগুহ
২৬৩, ২৬৫, ২৭৯, ২৮৬, ৩২২
সি, রাজেশ্বর রাও
২৭৫
সি এল নান্দা
২৭৬
সোশ্যালিস্ট ওয়ার্কার্স পার্টি (ভারত)
২৮৮, ২৯০
সৈয়দ আনোয়ার হোসেন
২৯৮
সমর সেন
৩০৪, ৩২৭, ৪০৫, ৪১৩, ৪২৪
সিডনি এইচ শ্যানবার্গ
৩১৫, ৩১৬
সোলায়মানকি
৩২১, ৪১৯
সুব্রামানিয়াম
৩২৬, ৩২৮
সুয়েজ খাল
৩৩৪, ৪৯১
সুদান
৩৫৮, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৪৮১
সংযুক্ত আরব আমিরাত
৩৬১, ৩৬৩, ৩৬৫, ৩৬৮, ৩৭০, ৩৭৭, ৩৭৮, ৪৭২
সোমালিয়া
৩৬৩, ৩৬৪, ৪০৩, ৪১২, ৪২৬, ৪২৮, ৪৩২
সেনেগাল
৩৬৮
সোলাইমান আবু দাউস
৩৭৩
সৈয়দ কামেল আল শারিদ
৩৭৪
সুহার্তো
৩৭৫
সোধপুর
৪১৯
সাইপ্রাস
৪২১, ৪২২
সিয়েরালিয়ন
৪২১
সিনকিয়াং
৪৭১, ৪৮১, ৫১৩, ৫৭০
সিংহল
৪৭২
সিকিম
৪৭৮, ৫১৩
স্টালিন
৪৮৯, ৪৯৪
স্যার সিরিল পিকার্ড
৫০০
সেক্সবে
৫২০
সিনেটর
৫২০

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ

হোসেন শহীদ সোহরওয়ার্দী
২১, ২২, ১১৭, ১১৮, ১৪২, ১৪৭, ৩৭০, ৪৯৬, ৫১৬
হোয়াইট হাউস
২৭, ৪৮৩, ৫১১, ৫১৫, ৫২১ ৫২৭, ৫২৮, ৫৩৬, ৫৩৮, ৫৪৬
হ্যারিস
৩৪, ৭১
হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়
৩৪, ৭২, ১৩৬
হাঙ্গেরী
৩৭, ৩০৬
হোসেন আলী
৫২, ৫৪, ৬২, ৮৭, ১৪৫, ১৭৪, ২৩১
হোসেন তৌফিক ইমাম
৬০
হিতাব আবদেল ছামাদ
৭৭
হাফিজ মজির উদ্দিন
১২০
হ্যান্স ইয়ান্টিস
১২৮
হারুনুর-অর-রশিদ
১৩০, ১৪৮
হল্যান্ড
১৩৯, ৩০৬
হ্যালিকস
১৩৯
হেনরি থরানাটন
১৪২
হামিদুল হক চৌধুরী
১৫৪, ১৫৭
হ্যারল্ড উইলসন
১৫১
হিম ম্যাকুয়ারি
১৫৪
হাবিবুর রহমান
১৬৯, ১৭৩, ১৭৪
হাজী নেসার আহমেদ
১৭১
হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
১৭৫
হিলালী
২০৭
হাবিব আলী
২৪২
হরীশ মহীন্দ্র
২৭২, ২৭৬
হায়দ্রাবাদ
২৭৬
হাঙ্গেরী
২৭৭
হিন্দুস্তান টাইমস
২৭৮
হীরেন্দ্র নাথ মুখোপধ্যায়
২৮১
হংকং
৩০৫, ৩১৫, ৪২০
হেলসিঙ্কি
৩০৭, ৩০৮
হুমায়ুন দারাইউস
৩৮২
হামফ্রে (সিনেটর)
৪৭১
হুয়াং হুয়া
৫২৪, ৫৭১
হান নেইন
৪৮৩
হোনজার
৫১৩
হ্যানয়
৫৩৯
হাইফং
৫৩৯
হার্বার্ট ডি. স্পিভাক
৫৪৪
হাসান জহির
৫৪৫
হিলি
৫৭৪
হুওয়াং
৪৮১

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~